কিশোর
কর্নেল সমগ্র

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

কিশোর কর্নেল সমগ্র

১

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

নীনা সিরাজ ও
সিরাজুল ইসলামকে
সস্নেহে—

লেখকের অন্যান্য বই

কর্নেল সমগ্র (১-১২)
দেবী আথেনার প্রত্নরহস্য
লালুবাবু অন্তর্ধান রহস্য
কর্নেলের একদিন
নিষিদ্ধ অরণ্য, নিষিদ্ধ প্রেম
উপন্যাস সমগ্র (১ম, ২য়)
থ্রিলার সপ্তক
থ্রিলার পঞ্চক
স্বর্ণচাঁপার উপাখ্যান
রূপবতী
বেদবতী
হাওয়া সাপ
জনপদ জনপথ
গোপন সত্য
অলীক মানুষ
বসন্ততৃষ্ণা
রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র
স্বপ্নের মতো
আনন্দমেলা
নিশিলতা
মায়ামৃদঙ্গ
কাগজে রক্তের দাগ
খরোষ্ঠী লিপিতে রক্ত
সমুদ্রে মৃত্যুর ঘ্রাণ
রোড সাহেব ও পুনর্বাসন
জিরো জিরো নাইন
শ্রেষ্ঠ গল্প
ডমরুডিহির ভূত
সন্ধ্যানীড়ে অন্ধকার
ছায়ার আড়ালে
কুয়াশার রঙ নীল
নাগমিথুন
তৃণভূমি
প্রেতাত্মা ও ভালুক রহস্য

ছোটদের জন্যে

কঙ্কগড়ের কঙ্কাল
কোকোদ্বীপের বিভীষিকা
কিশোর রোমাঞ্চ অমনিবাস
রহস্য রোমাঞ্চ
সবুজ বনের ভয়ঙ্কর
হাট্টিম রহস্য
কালো মানুষ নীল চোখ
ভয়-ভুতুড়ে
টোরা দ্বীপের ভয়ঙ্কর
বনের আসর
মাকাসিকোর ছায়ামানুষ
কালো বাকসের রহস্য
নিঝুমরাতের আতঙ্ক

কিছু কথা

কর্নেলের রহস্য কাহিনি লিখতে শুরু করেছিলাম বড়দের জন্য। তখন আমি আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। হঠাৎ তাঁরা আনন্দমেলা নামে ছোটদের একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করলেন। সাইজ ছিল চটি বইয়ের মতো। শ্রদ্ধেয় কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এই পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি একদিন আমায় ফরমাশ করলেন, ছোটদের জন্য একটা গল্প লিখে দে। ততদিনে আমার মাথায় কর্নেল ঢুকে বসে আছেন। নীরেনদা মুখে কিছু না-বললেও পত্রিকার সাইজ দেখে বুঝতে পেরেছিলাম গল্পটা বড় করা চলবে না। লিখতে বসে কলম দিয়ে বেরিয়ে এলেন কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। গল্পের নাম ছিল 'টুপির কারচুপি'। ওই টুকু গল্পে জমজমাট রহস্য আর কর্নেলকে নিয়ে প্রায় একটা অসাধ্য সাধন করেছিলাম। মনে পড়ছে না কোনও একটা হিন্দি পত্রিকায় সেই গল্পটি 'টোপি কী করতুত' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। উৎসাহ গেল বেড়ে। এর পর কর্নেল আমার ছোটদের জন্য লেখা অনেক গল্পেই ক্রমে জাঁকিয়ে বসলেন। শুকতারা, চিল্ড্রেন্স ডিটেকটিভ, পক্ষীরাজ ইত্যাদি পত্রিকায় ক্রমশ কর্নেল ছোটদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। একবার কর্নেলের ফোন নম্বর দিতে আমার নিজের ফোন নম্বর দিয়ে প্রচণ্ড ঝামেলায় পড়েছিলাম। যখন তখন ছোটরা টেলিফোনে আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলল। তারা সবাই রহস্যের কথা কর্নেলকে জানাতে চায়। আমার ফোন নম্বর অনেক তদ্বিরে বদল করে রেহাই পেয়েছিলাম এ বিপদ থেকে। এর পরে এমন একটা ঘটনা ঘটল যে ছোটদের জন্য লেখায় কর্নেল অনিবার্য হয়ে উঠলেন। ততদিনে আনন্দমেলার সাইজ গেছে বেড়ে। দু'সংখ্যায় একটা করে উপন্যাস ছাপা হচ্ছে। নীরেনদার ফরমাশে একটা উপন্যাস লিখতে হল। তারপর একদিন নীরেনদা জানালেন, সত্যজিৎ রায় নাকি আমার লেখার দারুণ ভক্ত হয়ে উঠেছেন। প্রথমে কথাটা বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু কিছুদিন পরে স্বয়ং সত্যজিৎ রায়ের লেখা একটি চিঠি আমার কাছে পৌঁছল। তিনি আমার লেখার প্রশংসা করে শারদীয় 'সন্দেশ'-এর জন্য গল্প চেয়েছেন। কপাল ঠুকে লিখে ফেললাম 'কাক ও ছড়ি রহস্য'। শারদীয় সন্দেশ হাতে পেয়ে দেখি সত্যজিৎ রায় নিজেই গল্পের ছবি এঁকেছেন এবং তাঁর ছবিতে কর্নেলকে দেখে খুব খুশি হয়েছিলাম।

সত্যি বলতে কী, নীরেনদা এবং সত্যজিৎ রায়ই আমার মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাই এই পরিণত বয়সেও ছোটদের জন্য লিখতে হলে কর্নেলই লেখায় এসে যান। এত বছর ধরে ছোটদের জন্য কর্নেলের যত রহস্য কাহিনি লিখেছি, দে'জ পাবলিশিং-এর কর্ণধার সুধাংশুশেখর দে তাকে এক মলাটের মধ্যে আনতে চেয়েছেন। সায় আমারও ছিল প্রবল। বড়দের জন্য লেখাগুলি নিয়ে 'কর্নেল সমগ্র' বারোটি খণ্ড প্রকাশের পর এবার 'কিশোর কর্নেল সমগ্র' খণ্ডে খণ্ডে ছোটদের হাতে তুলে দিতে চেয়েছি। আমার ভরসা আছে বড়দের মতো ছোটরাও তাদের প্রিয় কর্নেলকে একত্রে পেয়ে খুশি হবে।

নভেম্বর ২০০৫ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

৩৭/১ গোরাচাঁদ রোড

কলকাতা ৭০০ ০১৪

এতে আছে

কোকোদ্বীপের বিভীষিকা/৯
ঘড়ি রহস্য/৩০
প্যান্থার রহস্য/৩৬
মানুষখেকোর ফাঁদ/৪৩
অরুণাচলের ইয়েতি/৪৮
ডমরুডিহির ভূত/৫৯
কালো ছাতার উৎপাত/৭৪
অকালকুষ্মাণ্ড/৮৪
প্রতাপগড়ের মানুষখেকো/৯১
গুর্গিন খাঁর দেয়াল/৯৬
টুপির কারচুপি/১০৩
টোরাদ্বীপের ভয়ংকর/১০৭
হাড্রিমরহস্য/১৩২
কালোকুকুর/১৪২
ঘটোৎকচের জাগরণ/১৪৬
দুঃস্বপ্নের দ্বীপ/১৫২
চিরামবুরুর গুপ্তধন/১৬৩
কিংবদন্তির শঙ্খচূড়/১৭০
তিব্বতী গুপ্তবিদ্যা/১৭৭
লোহাগড়ার দুর্বাসামুনি/১৮৪
তুরুপের তাস/১৮৯
ভূত্রাক্ষস/১৯৮
যেখানে কর্নেল/২০২
সবুজ বনের ভয়ংকর/২০৭
কালো বাক্সের রহস্য/২৬৫
কোদণ্ডের টঙ্কার/৩০২
ওজরাকের পাঞ্জা/৩২৩

SATYAJIT RAY

শ্রীযুক্ত সুকুমার বিশ্বাস মহাশয়ে—

সবিনয় নিবেদন,

আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় নেই, কিন্তু আমার লেখার সঙ্গে আপনি সবিশেষ পরিচিত — বিশেষত কিশোর সাহিত্যে। আপনি এবং সুকুমার সাহেবের যত কিছু বিষয়ে লেখেন সেগুলো অত্যন্ত আনন্দিত হই। পরিচয় হবে কি? শুভেচ্ছা-র সঙ্গে লেখা পাঠাবেন

শুভেচ্ছান্তে

ভবদীয়

সত্যজিৎ রায়

৭/৭/৮৬

কোকোদ্বীপের বিভীষিকা

প্রজাপতি এবং হয়গ্রীব

ডঃ আলবের্তো ভাস্কোর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের জাদুঘরসদৃশ ড্রয়িংরুমে। ওঁর মাতৃভাষা পর্তুগিজ। কিন্তু ভাল ইংরেজি জানেন। কর্মসূত্রে থাকেন প্রশান্ত মহাসাগরের তাহিতি দ্বীপে। সেখানকার প্রকৃতি-পরিবেশ দফতরের অধিকর্তা। বাঙ্গালোরে এশিয়া পরিবেশ সংরক্ষণ সম্মেলনে এসেছিলেন।

আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে কর্নেল বললেন, "ডঃ ভাস্কো আমার মতোই একজন লেপিডপ্টারিস্ট।"

প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে. কে. হালদার—আমাদের প্রিয় হালদারমশাই আমি যাওয়ার আগেই সেখানে হাজির। তিনি অবাক চোখে সম্ভবত 'সায়েব-দর্শন' করছিলেন। বলে উঠলেন, "কী কইলেন খ্যান?"

হালদারমশাইয়ের মুখ থেকে মাঝে-মাঝে দেশোয়ালি ভাষা বেরিয়ে আসে। কর্নেল বললেন, "লেডিপপ্টারিস্ট। যাঁরা প্রজাপতি নিয়ে গবেষণা করেন।"

গোয়েন্দা-ভদ্রলোক যেন হতাশ হলেন। একটিপ নস্যি নিয়ে খবরের কাগজে চোখ রাখলেন। বুঝলাম, ডঃ ভাস্কো সম্পর্কে ওঁর আগ্রহ উবে গেছে।

কর্নেল ডঃ ভাস্কোকে বললেন, "আপনি 'নেচার' পত্রিকায় আউল বাটারফ্লাই সম্পর্কে আমার যে প্রবন্ধ পড়েছেন, তা কিছুটা স্মৃতিচারণা। কারণ আমি তখন বয়সে তরুণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর প্রশান্ত মহাসাগরের ফাতু হিভা দ্বীপের সামরিক ঘাঁটি থেকে যুদ্ধজাহাজে দেশে ফিরছিলাম। কোকো দ্বীপের পাশ দিয়ে আসার সময় বাইনোকুলারে জনমানবহীন দ্বীপটিতে ঝাঁকে-ঝাঁকে আউল বাটারফ্লাই দেখেছিলাম। 'কালিগো আপ্রেউস' প্রজাতির এই প্রজাপতি আকারে বিশাল। এক-একটা ডানা ছ' ইঞ্চি চওড়া। ডানায় দুটো করে গোল চোখের মতো ছোপ। হঠাৎ দেখলে প্যাঁচা মনে হয়। তাই ওই নাম। তবে সেই প্রথম এবং শেষ দেখা।"

ডঃ ভাস্কো বললেন, "কোকো দ্বীপ সম্পর্কে আপনি একটা সাংঘাতিক গুজবের উল্লেখ করেছেন।"

কর্নেল হাসলেন। "গুজব এখনও চালু আছে নাকি?"

"আছে। এবং গুজবটা যে মিথ্যা নয়, সেই কথাটা ফেরার পথে আপনাকে জানিয়ে যাওয়া উচিত মনে করলাম।" ডঃ ভাস্কো গম্ভীর হয়ে বললেন, "জানুয়ারিতে আপনার প্রবন্ধ পড়ার পর ছোট একটা টিম নিয়ে কোকো দ্বীপে গিয়েছিলাম। দ্বীপটি এখনও নির্জন। টিমে ছিলাম আমি, আমার সহকারী বিজ্ঞানী পিটার গিলম্যান, রাঁধুনি আউ তিউ, দু'জন গার্ড তিয়া এবং জুয়া। এরা তিনজন তাহিতির লোক। গিলম্যান মার্কিন। তো পরদিন রাঁধুনি আর দু'জন গার্ড নিখোঁজ হয়ে গেল। ভাবলাম, ভূতুড়ে দ্বীপে আসতে ওদের খুব আপত্তি ছিল। তাই পালিয়ে গেছে। মোটরবোটটা বিচ থেকে টেনে এনে ক্যাম্পের সামনে রাখা ছিল। সেটা আছে। তবে ফাতু হিভা থেকে নারকোলছোবড়া আর শুঁটকি মাছ আনতে অনেক ছোট জাহাজ কোকোর পাশ দিয়ে যায়। কাজেই ওদের পালানোর সুযোগ আছে। কিন্তু বিকেলে ফার্নের ঘন জঙ্গলে তিনজনের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ আবিষ্কার করে চমকে গেলাম। গার্ডদের রাইফেল কোনও হিংস্র জন্তু যেন দাঁতে চিবিয়ে ভেঙেছে। আশ্চর্য ব্যাপার, জন্তুটা মৃতদেহ থেকে মাংস খায়নি।"

হালদার মশাই নড়ে উঠলেন। "কন কী" বলেই শুধরে নিলেন, "ভেরি মিস্‌টিরিয়াস!"

ডঃ ভাস্কো বললেন, "আমাদের সঙ্গে পেট্রোম্যাক্স বাতি আর টর্চ ছিল। তখন আমরা নিরস্ত্র। দুটো ক্যাম্প গুটিয়ে জিনিসপত্র মোটরবোটে বোঝাই করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সবে জ্যোৎস্না উঠেছে। গিলম্যান এবং আমি মোটরবোট ঠেলতে-ঠেলতে বিচে নামাচ্ছি। হঠাৎ ঘোড়ার মতো বিকট চিঁ-হি-হি ডাক শুনে টর্চের আলো ফেললাম। আশ্চর্য, কর্নেল সরকার। ঘোড়ার মতো মুখ, মানুষের মতো শরীর একটা জন্তুকে কয়েক সেকেন্ডের জন্য দেখতে পেলাম। জন্তুটা সম্ভবত আলো সহ্য করতে পারে না।"

কর্নেল হাসলেন,"কোকো দ্বীপে ঘোড়া-মানুষের গুজব তা হলে সত্যি?"

"নিজের চোখকে অবিশ্বাস করা যেত। কিন্তু গিলম্যানও দেখেছে।"

"আপনি আর কোকো দ্বীপে যাননি?

"কোকো দ্বীপের মালিকানা নিয়ে ফরাসি এবং মার্কিন সরকারের মধ্যে বিতর্ক আছে। রাষ্ট্রপুঞ্জে চূড়ান্ত মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত ওখানে কোনও দেশ সশস্ত্র বাহিনী পাঠাতে পারে না। এমনকী, কেউ সেখানে যেতে পারে না। আমরা গোপনে গিয়েছিলাম প্যাঁচা প্রজাপতির খোঁজে। নইলে তো সেনাবাহিনী নিয়ে গিয়ে হিংস্র ঘোড়া-মানুষটাকে খুঁজে বের করা যেত। যাই হোক, ঘটনাটা আমরা চেপে গিয়েছিলাম।"

কর্নেল চোখ বুজে সাদা দাড়িতে হাত বুলোচ্ছিলেন। বললেন,"আবার একটা টিম নিয়ে গোপনে কোকো যাওয়া উচিত। আপনি আপনার দপ্তরকে বলে ব্যবস্থা করতে পারেন?"

ডঃ ভাস্কো একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "তা করা যায়। আপনি যেতে চান?"

"হ্যাঁ। আমি এবং আমার এই তরুণ সাংবাদিক বন্ধু জয়ন্ত চৌধুরি..."

হালদারমশাই বলে উঠলেন, "কর্নেলসার, আমাকে বাদ দেবেন না। চৌত্রিশ বৎসর পুলিশে চাকরি করছি।" তারপর ইংরেজিতে ডঃ ভাস্কোকে বললেন,"সার, ইউ নিড অলসো এ প্রাইভেট ডিটেকটিভ।"

ডঃ ভাস্কো ঘড়ি দেখে বললেন,"হোটেলে ফিরে ট্রাঙ্ক-কলে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব। তারপর জানাব। আমার ফ্লাইট বেলা একটা তিরিশে। এবার চলি, কর্নেল সরকার! সবকিছু ঠিকঠাক করতে পারলে আবার দেখা হবে।"

ডঃ ভাস্কো চলে যাওয়ার পর বললাম, "আজগুবি ব্যাপার! ওঁরা কী দেখতে কী দেখেছেন।"

কর্নেল টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, "ঘোড়া-মানুষ! হয়গ্রীব বলা চলে। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে হয়গ্রীবের কথা আছে। মহাভারতে আছে, বিষ্ণু হয়গ্রীব রূপ ধারণ করে বেদ-চোর দৈত্য মধুকৈটভকে নিধন করেছিলেন। দেবীভাগবত পুরাণ আর শ্রীমদ্ভাগবতে আছে হয়গ্রীব দৈত্যকে বধ করতে বিষ্ণু হয়গ্রীব রূপ ধারণ করেছিলেন। বিষে-বিষে বিষক্ষয়!"

হালদারমশাই বললেন, "শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা হয় না জয়ন্তবাবু!"

বললাম,"ঠিক, কিন্তু হয়গ্রীব বলুন কি ঘোড়া-মানুষ বলুন, তার সঙ্গে দেখছি মার্ডার জড়িয়ে আছে!"

"তা হলে গুপ্তধনও আছে?"

"থাকতেই পারে।"

"কোকো দ্বীপে আলবাত আছে। কোনও পর্তুগিজ জলদস্যুসর্দার মরে ভূত হয়ে তা পাহারা দিচ্ছে। কেউ গেলেই ঘোড়া-মানুষের রূপ ধরে তার ঘাড় মটকে মারছে।"

হালদারমশাই খি-খি করে হেসে উঠলেন,"কী যে কন!"

কর্নেলও এবার অট্টহাসি হাসলেন। তারপর হাঁকলেন, "ষষ্ঠী! কফি।"

লোকটা কে?

ডঃ ভাস্কো টেলিফোনে কর্নেলকে জানিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর দফতর কর্নেল সরকারের প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখবেন। কথাটা শুনে হতাশ হয়েছিলাম। কিন্তু দিন বিশেক পরে মার্চের মাঝামাঝি কলকাতার ফরাসি কনসুলেটের মারফত সরকারি আমন্ত্রণপত্র এসে গেল।

সেই চিঠিতে হালদারমশাইয়ের নামও ছিল। খবর পেয়ে গোয়েন্দপ্রবর কর্নেলের ডেরায় এসে উত্তেজিত ভাবে ঘন-ঘন নস্যি নিচ্ছিলেন। কর্নেল তাঁকে চমকে দিয়ে বললেন, "আমার এবং জয়ন্তের আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট আছে। আপনার পাসপোর্ট আছে কি?"

"পাসপোর্ট? খাইছে! পাসপোর্ট পামু কই?"

হালদারমশাই করুণ মুখে তাকালে কর্নেল তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, "ভাববেন না। ব্যবস্থা করে দেব। কিন্তু মনে রাখবেন, ফর্মে পেশার জায়গায় লিখতে হবে অর্নিথোলজিস্ট। পক্ষিবিজ্ঞানী।"

"সর্বনাশ! পক্ষীর আমি কী জানি?"

"দুটো ডানা আছে, এটুকু তো জানেন? ডানা মেলেই পাখি ওড়ে, তা-ও জানেন।"

"হঃ।"

"পাখিদের নামও জানেন!"

"কাক, চড়ুই, টিয়া, শালিখ, ময়না, বক, কাদাখোঁচা..."

"বাহ্! তবে এগুলো বাংলা নাম। আপনাকে আমি পাখি বিষয়ে সচিত্র একটা বই দিচ্ছি। মুখস্থ করে নেবেন। এতে দেশ-বিদেশের পাখির ইংরেজি নাম এবং প্রজাতির আন্তর্জাতিক নাম আছে।"

হালদারমশাই চিন্তিত মুখে বললেন, "ক্রিমিনোলজিস্ট লিখলে চলবে না?"

"না। আর-এক কাজ করুন। আজই চৌরঙ্গিতে গিয়ে একটা বাইনোকুলার কিনে নিন।"

"আপনার গলায় যে যন্তরটা ঝোলে?"

"হ্যাঁ। তবে একটা অসুবিধে হবে। পুলিশমহল আপনাকে প্রাইভেট ডিটেকটিভ হিসেবে চেনে। পাসপোর্টের ব্যাপারে তদন্ত করবে। ভাববেন না। আমি বলে রাখব কর্তৃপক্ষকে। পুলিশকে এ-যাবৎ অনেক সাহায্য করেছি। ওঁরা আশা করি আমার কথা রাখবেন।"

কর্নেলের তদ্বিরে হালদারমশাইয়ের পাসপোর্ট খুব শিগগির হয়ে গেল। ফরাসি কনসুলেট থেকে পনেরো দিনের ভিসাও মঞ্জুর হল। আমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে তিনজনের প্লেনের টিকিট ছিল। আমরা যাচ্ছি তাহিতির 'প্রকৃতি পরিবেশ রক্ষার আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবস্থা' পরিদর্শনে।

তাহিতি ফ্রান্সের উপনিবেশ। ফরাসি গভর্নরের অধীনে লোকদেখানো স্বায়ত্তশাসন আছে। কর্নেলের কাছে তাহিতির লম্বা-চওড়া যে ইতিহাস শুনলাম, তা আমার মাথায় ঢুকল না। হালদারমশাই পাখির বইটি বিড়বিড় করে মুখস্থ করেছিলেন। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের প্লেন তখন সপ্তাহে একদিন লন্ডন থেকে দমদম হয়ে হংকং যায়। আমরা সেই প্লেনের যাত্রী। তারপর হংকং থেকে প্যান অ্যামের লস অ্যাঞ্জেলিসগামী প্লেনে তাহিতির রাজধানী পাপিতির 'ফা-আ-আ' এয়ারপোর্টে পৌঁছলাম। ডঃ ভাস্কো গাড়ি নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, "সুস্বাগতম।"

হালদারমশাই বাইনোকুলারে চোখ রেখে বললেন, "খালি ফুল দেখি। পাখি কই?"

কর্নেল বললেন, "তাহিতিকে স্বর্গদ্বীপ বলা হয়। জানেন তো? এখানকার আদি বাসিন্দারা সবসময় ফুলের সাজ পরে থাকে।"

হালদারমশাই হঠাৎ দুই কানে আঙুল গুঁজে গুঁতোগুঁতি করতে করতে বললেন, "কান কটকট করে। ব্যথা।"

"উঁচু আকাশপথে প্লেনযাত্রায় এটা অনেকের হয়।"

ডঃ ভাস্কো গাড়ি চালাচ্ছিলেন। তাঁর পাশে কর্নেল। পেছনের সিটে আমি এবং হালদারমশাই। মসৃণ কালো রাস্তা, ঘন ঘাসে ঢাকা ঢেউখেলানো মাটি। নিবিড় ফার্নের জঙ্গল। নির্জন রঙিন বাড়ি। আর শুধু ফুল। যেন ছবির দেশে ঢুকেছি। হালদার-মশাই হঠাৎ আমার হাত খামচে ধরে উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলেন, "বুগেনভিলিয়া। বুগেনভিলিয়া।"

বুঝলাম, এতক্ষণে এখানকার একটা ফুল চিনতে পেরেছেন। কর্নেল মুখ ঘুরিয়ে তাঁকে বললেন, "জানেন তো? এই ফুলের আদি বাসস্থান এখানে। ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি অভিযাত্রী বুগেনভিলে এই দ্বীপে এসেছিলেন। তিনিই এই ফুলের চারা স্বদেশে নিয়ে যান। সেখান থেকে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর অন্যত্র। তাঁর নামেই ফুলের নাম।"

ডঃ ভাস্কো বললেন, "ফরাসি উচ্চারণে তাঁর নাম দ বুগেঁভিল।"

হালদারমশাই মুগ্ধভাবে বললেন, "গাড়িটা যেন ফ্লাইং বার্ড। নো সাউন্ড। মাখন বাটার!"

কর্নেল বললাম, "আচ্ছা কর্নেল, বাটারের সঙ্গে কি বাটারফ্লাইয়ের কোনও সম্পর্ক আছে?"

কর্নেল বললেন,"অবশ্যই আছে। একই গ্রিক শব্দ থেকে..."

ডঃ ভাস্কোর কথায় উনি থেমে গেলেন। "এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র চার মাইল দূরে রাজধানী পাপিতি। তবে আমরা পাপিতিতে ঢুকব না। তাহিতির গড়ন ইংরেজি আটের মতো। দুটো গোলাকার বড়-ছোট ভূখণ্ড জোড়া দিলে যেমন দেখায়। আপনাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে জোড়ের কাছে। সমুদ্রের ধারে আমাদের দফতরের গেস্ট হাউস। আশা করি আপনাদের ভালই লাগবে। ওখানে বিচটা অসাধারণ।"

আমরা একটা ছোট্ট নদী পেরিয়ে গেলাম। ডঃ ভাস্কো গাইডের ভঙ্গিতে বিবরণ দিচ্ছিলেন। নদীটার নাম পাপেনু। ওই নারকোলবাগানের ওধারে গেলে তাহিতির শেষ স্বাধীন রাজা পঞ্চম পোমারির কবর দেখা যাবে। আরও উত্তরে পয়েন্ট ভেনাস। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ অভিযাত্রী জেম্‌স কুক সূর্যের সামনে দিয়ে শুক্রগ্রহের পরিক্রমা পর্যবেক্ষণের জন্য এসেছিলেন।

কর্নেল আস্তে বললেন, "কুক ট্রানজিট অফ ভেনাস দেখতে এসেছিলেন।"

ডঃ ভাস্কো আওড়াচ্ছিলেন, জোড়ের পর দ্বিতীয় ভূখণ্ডের নাম তাহিতি ইতি। প্রকৃতিপরিবেশ দফতরের বাংলার কাছে মা-উ-উ গ্রাম। সেখানে একটা ছোট বাংলো আছে। বিখ্যাত ব্রিটিশ লেখক সমারসেট মম সেই বাংলোয় বসে বিখ্যাত ফরাসি চিত্রকর গগ্যাঁকে নিয়ে 'মুন অ্যান্ড সিক্স পেন্স' নামে বই লিখেছিলেন। গগ্যাঁ থাকতেন পুনা-আ-উ-ই- আ বসতি এলাকায় ভিলা ভেঁতুরা নামে একটা বাড়িতে। তাহিতির একজন মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। মমের বাংলো এবং গগ্যাঁর বাড়ি কাল মঙ্গলবার আমাদের দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

হালদারমশাই নড়ে উঠলেন। "অ্যাঁ, কাইল মঙ্গলবার হইলে আইজ সোমবার। আমরা দমদমে প্লেনে উঠছি শুক্রবার মর্নিংয়ে। দুইটা দিন গেছে। আইজ রবিবার। সানডে!"

কর্নেল হাসলেন। "হালদারমশাই! আমরা অন্তর্জাতিক তারিখরেখার পূর্বে চলে এসেছি। ওই রেখার পশ্চিমে যখন রবিবার, তখন পূর্বে সোমবার।"

"কন কী? একই দিনে দুই তারিখ।"

"হ্যাঁ। পরে আপনাকে বুঝিয়ে দেব।"

হালদারমশাই গুলিগুলি চোখে তাকিয়ে রইলেন। সরকারি বাংলোয় পৌঁছতে মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগল। লনে ফুল-বাগিচা, রঙিন টালির ঢালু ছাদ এবং দেওয়ালে আষ্টেপৃষ্ঠে বাহারি লতা—বাংলোটা সত্যিই অতুলনীয়। দু'জন সশস্ত্র রক্ষী সেলাম দিল গেটে। তাদের তাহিতির লোক বলে মনে হল। একজন উর্দিপরা দৈত্যাকৃতি লোক এসে আমাদের লাগেজ নিয়ে গেল।

এয়ারকন্ডিশনড বাংলোয় ঢুকে ডঃ ভাস্কো বললেন, "ওর নাম হুয়া, একসময় আমেরিকায় ছিল। তাই ইংরেজি জানে। খুব বিশ্বস্ত লোক। এখন স্থানীয় সময় বিকেল তিনটে। আপনারা ঘড়ি মিলিয়ে নিন। সাড়ে চারটেয় সূর্যাস্ত। আমরা পাঁচটায় ডিনার খাই। আপনারা কখন খাবেন বলে দেবেন। হুয়া আপাতত কফি আর হালকা কিছু খাবার আনো!"

হুয়া চলে গেল। হালদারমশাই বললেন, "বেডরুম কই? হোয়্যার ইজ দি বেডরুম?"

ডঃ ভাস্কো ওঁকে বেডরুম দেখিয়ে দিলেন। উনি তখনই ঢুকে গেলেন। বললাম, "হালদারমশাইয়ের খিদে পাওয়ার কথা। কিন্তু হঠাৎ বেডরুমে ছুটলেন কেন?"

আমরা ড্রয়িংরুমে বসে ছিলাম। চারদিকে র‍্যাকভর্তি বই এবং সুদৃশ্য টবে রকমারি খুদে উদ্ভিদ। একটু পরে হুয়া কফি এবং খাবার ভর্তি ট্রে আনল। ডঃ ভাস্কো সেই বেডরুমের দরজা খুলে হালদারমশাইকে ডাকতে গেলেন। তারপর ফিরে এসে মুচকি হেসে বললেন, "ডিটেকটিভ ভদ্রলোক ঘুমোচ্ছেন।"

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, "ডিটেকটিভ নন। উনি অর্নিথোলজিস্ট।"

ডঃ ভাস্কো হাসলেন, "ঠিক। ঠিক। ভুলে গিয়েছিলাম। এবার আমাদের প্রোগ্রামের কথা বলি। কাল বিকেলে পাপিতি-ইতির আহি বন্দর থেকে একটা প্রাইভেট কোম্পানির জাহাজ যাবে ফাতু হিভা দ্বীপে। ওরা যাবে খাদ্যসামগ্রী নিয়ে। পাতু হিভা মার্কিন তদারকে আছে। কিন্তু দ্বীপবাসীরা মার্কিন খাদ্য পছন্দ করে না। তা ছাড়া ওরা ডলারে দাম মেটাতে পারে না। তাই পণ্যবিনিময় প্রথা এখনও চালু আছে। খাদ্যের বদলে নারকোলছোবড়া, শুঁটকি মাছ, এক ধরনের সামুদ্রিক শ্যাওলা দেয়। সেই শ্যাওলা কিন্তু সুস্বাদু। খাবেন নাকি?"

"খাব।"

"হুয়াকে বলে দিচ্ছি। তো কাল ওই জাহাজে আমাদের দুটো মোটরবোট থাকবে। আমরা সূর্যাস্তের আগেই কোকো পৌঁছে যাব। এবার তৈরি হয়েই যাচ্ছি। সঙ্গে যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র থাকবে।"

ডঃ ভাস্কো চলে যাওয়ার পর কর্নেল বললেন, "হালদারমশাই ঘুমিয়ে নিন। চলো, আমরা বিচ থেকে একবার ঘুরে আসি। এখানে খুব শিগগির সন্ধ্যা হয়ে যায়।"

হুয়াকে বলে আমরা বাংলোর পূর্ব গেট দিয়ে বিচে নেমে গেলাম। ওদিকে কোনও রক্ষী নেই। কিন্তু কে বলে প্রশান্ত মহাসাগর প্রশান্ত? গর্জনে কানে তালা ধরে যাচ্ছিল। আর হাওয়া নয়, যেন সাইক্লোন বয়ে যাচ্ছে। সম্ভবত সরকারি সংরক্ষিত এলাকা বলে ছোট্ট বিচ জনশূন্য। কর্নেল বাইনোকুলারে সামুদ্রিক পাখির ঝাঁক দেখছিলেন। তারপর যেন বিশেষ কোনও পাখিকে অনুসরণ করার মতো বাঁ দিকে ঘুরলেন। অদূরে উঁচু টিলা। একটা হোটেল দেখা যাচ্ছিল সেখানে। বাইনোকুলার নামিয়ে কর্নেল বললেন, "অদ্ভুত!"

চমকে উঠে বললাম, "কী অদ্ভুত?"

"ওই লোকটা!"

"কোন লোকটা?"

"দমদমে ওকে দেখেছি। হংকংয়ে দেখেছি। ফা-আ-আ এয়ারপোর্টেও দেখেছি। গোয়ার পর্তুগিজ বংশোদ্ভূতদের মতো দেখতে। তো ওই হোটেলটার নাম দেখলাম,'ফারাতিয়া'। লোকটা বাইনোকুলারে আমাদের দেখছিল।"

"দেখতেই পারে। আপনি যেমন দেখছিলেন। নিছক কৌতূহল।"

"লোকটা জাহাজের নাবিক ছিল। কিংবা এখনও নাবিক। কারণ ওর বাহুতে উল্কি দেখেছি। নাবিকদের উল্কি এঁকে নেওয়ার হবি আছে। ওর গায়ে ছিল নেভিব্লু স্পোর্টিং গেঞ্জি। হংকং এয়ারপোর্টে ট্রানজিট লাউঞ্জে চোখাচোখি হতেই সে সরে যাচ্ছিল, সেই সময় ওঁর বাঁ বাহুতে উল্কিটা আমার চোখে পড়ে। আলো যথেষ্ট উজ্জ্বল ছিল। এক পলকের দেখা। উল্কিটা ঘোড়া-মানুষের।"

মনে-মনে একটু ভড়কে গিয়ে বললাম, "খোঁজ নিলে হয়তো দেখবেন লোকটা এই তল্লাটে কোনও জাহাজে চাকরি করে। এখানকার নাবিকদের হয়তো কিংবদন্তিখ্যাত ঘোড়া মানুষের উল্কি এঁকে নেওয়ার হবি আছে।"

"কিন্তু একজন সাধারণ নাবিক তাহিতির সেরা অভিজাত হোটেল ফারাতিয়ায় উঠেছে এবং আমাদের দিকে লক্ষ্য রেখেছে। ব্যাপারটা গোলমেলে।"

কর্নেল হন্তদন্ত হয়ে গেস্টহাউসে ফিরলেন। ড্রয়িংরুমে টেলিফোন ছিল। ডঃ ভাস্কোর সঙ্গে উনি চাপা গলায় কথা বলতে থাকলেন। ব্যাপারটা আমার কাছে অদ্ভুত মনে হয়নি। তাই সেই বেডরুমে ঢুকে পড়লাম। দেখি, গোয়েন্দা ভদ্রলোক চিত হয়ে নাক ডাকাচ্ছেন। বাইনোকুলার খাট থেকে ঝুলছে। ফিতে গলায় আটকানো। জুতোও খোলেননি। সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিয়ে ডাকলাম,"হালদারমশাই! হালদারমশাই!"

তিনি তড়াক করে উঠে বসলেন সঙ্গে-সঙ্গে। "এয়ারপোর্ট আইয়া পড়ল?"

"নাহ্। ঘোড়া-মানুষ।"

"কই? কই?"

"ফারাতিয়া হোটেলে।"

"অ্যাঁ?" বলে হালদারমশাই চোখ রগড়ে খি খি করে হেসে উঠলেন। "ও! জয়ন্তবাবু! আমি ভাবছিলাম—"

কী ভাবছিলেন, তা আর বললেন না। প্রশস্ত এবং সুন্দর করে সাজানো ঘরের সৌন্দর্য মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে থাকলেন। এই ঘরে দুটো বিছানা। হালদারমশাই হঠাৎ উঠে দ্বিতীয় বিছানার গদি টিপে দেখে যেটায় শুয়ে ছিলেন, সেটার গদি টিপলেন, তারপর বললেন, "মাখন, বাটার, কিন্তু হেভি ক্ষুধা পাইছে।"

"ড্রয়িংরুমে চলুন।"

কর্নেল তখন হুয়াকে আবার কফি আনতে বলছিলেন। হালদারমশাইকে দেখে ওঁর জন্য হালকা খাবার আনতে বললেন। হালদারমশাই হাসলেন। "প্যাসিফিক ওশেন এখান থেকে কত দূরে কর্নেলসার?"

"বাংলোর নিচেই। ওই দরজা খুলে বেরোলে বারান্দা। তারপর লন। লন থেকে নামলে বিচ।"

"বাল্যকালে ভূগোলে পড়েছিলাম। এবার ছুঁয়ে দেখব।"

"সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কাল ভোরে বরং দেখতে যাবেন।"

"এত কাছে-প্যাসিফিক ওশেন! আর তাকে ছোঁব না?"

হুয়া কফি আর স্ন্যাক্স আনল। হালদারমশাই গোগ্রাসে খেলেন। তারপর পুবের দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন। বিচ পর্যন্ত অবশ্য উজ্জ্বল আলো পড়েছে ল্যাম্পপোস্ট থেকে। কর্নেল এবং আমি বেরিয়ে ওদিকের বারান্দায় বসলাম। দেখলাম, হালদারমশাই বিচে নেমে থমকে দাঁড়িয়েছেন। রাতের সমুদ্র দেখে ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু হঠাৎ উনি গুঁড়ি মেরে বসলেন এবং বাঁ দিকে হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে এগিয়ে অদৃশ্য হলেন।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "চলো তো, দেখি কী ব্যাপার!"

বিচে নেমে দেখলাম, হালদারমশাই কার সঙ্গে বালির ওপর জড়াজড়ি কিংবা কুস্তি করছেন। আমরা দৌড়ে যেতেই লোকটা বিচের শেষ প্রান্তে পাথরের চাঁইয়ে উঠে কাঁটাতারের বেড়া গলিয়ে পালিয়ে গেল। হালদারমশাই ফোঁস-ফোঁস শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, "ঘুঘু দ্যাখছে, ফাঁদ দ্যাখে নাই। চুপিচুপি কাঁটাতাঁরের বেড়া গলিয়ে ব্যাটা যেই নিচে জাম্প করেছে। পড়েছে আমার কোলে।" বলে গোয়েন্দাপ্রবর খি খি করে হাসতে লাগলেন।

অদ্ভুত চিঠি এবং হত্যাকাণ্ড

কর্নেল ঘটনাটা হুয়াকে জানাতে নিষেধ করেছিলেন। হালদারমশাইয়ের মতে, "লোকটা চোর। সামনে দু-দুটো গার্ড রেখেছে। এদিকে পেছনে চোর আসার রাস্তা পরিষ্কার। চোর কি সামনের দিক দিয়ে আসে? গভর্নমেন্টের কাজ-কারবার সব দেশেই এক।"

বুঝলাম, প্রাক্তন দুঁদে দারোগা হাত ফসকে চোর পালানোর জন্য খাপ্পা হয়ে গেছেন। কিন্তু এবার আমার মনে আতঙ্কের ছায়া পড়েছিল। কর্নেল আবার টেলিফোনে ডঃ ভাস্কোর সঙ্গে কথা বললেন। তারপর চুরুট ধরিয়ে র‍্যাক থেকে একটা প্রকাণ্ড বই টেনে নিয়ে বসলেন। আমি পোশাক বদলে এলাম। দেখাদেখি হালদারমশাইও বদলে এলেন। সময় কাটছিল না। হালদারমশাই ক্রমাগত গোঁফে তা দিচ্ছিলেন এবং দুই কানে আঙুল ঢুকিয়ে গুঁতোগুঁতি করছিলেন। কতক্ষণ পরে ডঃ ভাস্কো এলেন। হুয়া আর-এক প্রস্থ কফি দিয়ে গেল।

ডঃ ভাস্কো বললেন, "ফারাতিয়া হোটেলে কোনও ভারতীয় নাগরিক ওঠেননি। আজ প্যান অ্যাম ফ্লাইটে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের কারও বাহুতে ঘোড়া-মানুষের উল্কি নেই। আমার ভয় হচ্ছে কর্নেল সরকার, এই তল্লাশির জন্য পর্যটন দফতর চটে যাবে। পর্যটন থেকেই তাহিতির মোট রাজস্বের ৭৫ শতাংশ আসে।"

কর্নেল বললেন, "তা হলে লোকটা অন্য কোথাও উঠেছে। সে ফারাতিয়ার পূর্ব লনে ঢুকেছিল আমাদের ওপর নজর রাখতে। তারপর সে খাড়ি বেয়ে নেমে বেড়া গলিয়ে বিচে লাফ দিয়ে পড়েছিল।"

"ঠিক।" সায় দিলেন ডঃ ভাস্কো। "সে কোন উদ্দেশ্যে আসছিল কে জানে? বিচের দিকে আমরা গার্ড রাখি না। কারণ বিচটা মাত্র পঞ্চাশ মিটার লম্বা। সারারাত আলো জ্বলে। দু'ধারে খাড়া পাহাড়। বিচটা প্রাচীন যুগে একটা খাড়িই ছিল। যাই হোক, আরও দু'জন গার্ড বিচের দিকে রাখা হচ্ছে। তারা এখনই এসে যাবে। আর একটা কথা, সতর্কতার জন্য আমাদের প্রোগ্রাম বদলেছি। জাঁ ব্লাঁকের জাহাজে যাচ্ছি না। একটা ট্রলার কোকো দ্বীপের ওদিকে মাছ ধরতে যায়। ট্রলারের একটা সুবিধে আছে। দ্বীপের খুব কাছাকাছি পৌঁছতে পারে। কাজেই আমাদের মোটরবোটের দরকার হবে না। দুটো রবারের ভেলাই যথেষ্ট।"

হালদারমশাই উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, "হঠাৎ দরকার হলে আমরা কি ভেলায় চেপে ফিরতে পারব?"

কর্নেল বললেন, "ভয় নেই হালদারমশাই। ভেলা অকূলে ভেসে যাবে না। হাজার-হাজার দ্বীপের মধ্যে যে-কোনও দ্বীপে পৌঁছে দেবে। অবশ্য সেখানে ঘোড়া-মানুষের চেয়ে সাংঘাতিক প্রাণীও থাকতে পারে।"

হালদারমশাই দেশোয়ালি ভাষায় বললেন, "না, না। তা কইতাছি না।"

ডঃ ভাস্কো বললেন, "আমাদের সঙ্গে ব্যাটারিচালিত রেডিয়োট্রান্সমিটার থাকবে। সিগন্যাল রিসিভিং সেট থাকবে ট্রলারের মালিক আইউংয়ের কাছে। সে কাছাকাছি দ্বীপগুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়াবে। সিগন্যাল পেলেই হাজির হবে। আইউং চিনা জেলে। তাহিতিতে যৌবনে পালিয়ে এসেছিল। সে আমাদের সরকারের বিশ্বস্ত লোক। মাছ ধরতে গিয়ে অন্য দেশের যুদ্ধজাহাজের গতিবিধির খবর এনে দেয়। এদিকে জাঁ ব্লাঁক কোম্পানি ফরাসি হলে কী হবে। তাদের নাবিকরা মাতাল হলেই বেফাঁস কথা উগরে দিয়ে নিজের সরকারকেই বেইজ্জত করে।"

হুয়া এসে জানাল, দু'জন গার্ড এসেছে।

ডঃ ভাস্কো উঠে দাঁড়ালেন, "তা হলে চলি কর্নেল করকার! আমি গার্ডদের নির্দেশ দিয়ে নিরাপত্তাবাহিনীর গাড়ির সঙ্গে ফিরে যাব।" শুকনো হাসি হাসলেন প্রকৃতিবিজ্ঞানী। "সত্যি বলতে কী, আমি নার্ভাস হয়ে পড়েছি।"

কর্নেল বললেন, "চিয়ার আপ ডঃ ভাস্কো! ঘোড়া-মানুষের চেয়ে স্বাভাবিক মানুষ কম বিপজ্জনক। তাকে এঁটে ওঠা সহজ। মিঃ হালদার তাকে প্রায় ধরেই ফেলেছিলেন! বোঝা যাচ্ছে, তার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র বা ছুরিও ছিল না। কাজেই তাকে পাত্তা দেওয়ার মানে হয় না।"

হালদারমশাই বললেন, "চোর! চোর! ছিঁচকে চোরের ইংরেজি কী জয়ন্তবাবু?"

বললাম, "ডিকশনারি দেখতে হবে।"

"পেটি থিফ!" গোয়েন্দাপ্রবর সহাস্যে বললেন, "কী কন কর্নেল সার?"

কর্নেলসার ডঃ ভাস্কোকে বিদায় দিতে গেলেন। হালদারমশাই প্যান্টের পকেট হাতড়াচ্ছিলেন। "নস্যির কৌটা গেল কই?" বলে শার্টের বুক পকেটে হাত গুঁজলেন। "এই তো, আরে! এটা আবার কী?"

উনি একটা দলাপাকানো কাগজ বের করে ফেলে দিলেন। কাগজটা আমি তুলে নিলাম কার্পেট থেকে। কাগজটার ভাঁজ সিধে করে দেখি ইংরেজিতে লেখা একটা অদ্ভুত চিঠি।

মাননীয় কর্নেল সরকার, আপনারা কোথায় যাবেন, আমি জানি। তাই আপনার সাহায্যপ্রার্থী। যদি আজ রাত ১০টা নাগাদ একা বিচে যান, মুখোমুখি সব কথা খুলে বলব। আমি সামান্য মানুষ। আমাকে ভয়ের কারণ নেই।

পি. জি.

হালদারমশাই নস্যি নিয়ে নাক মুছছিলেন। বললেন, "ও জয়ন্তবাবু, আমার পকেটে ওটা আইল ক্যামনে?"

বললাম, "মনে হচ্ছে, চোর বেগতিক দেখে এটা আপনার পকেটে গুঁজে দিয়ে পালিয়েছে।"

"সে কী!" বলে হালদারমশাই হাত বাড়ালেন। "দেখি, দেখি!"

"চিঠিটা কর্নেলকে লেখা। চুপিচুপি বিচ দিয়ে এসে ওই বাংলোয় পৌঁছে দিতে চেয়েছিল। আপনার পাল্লায় পড়ে সেটা হয়নি। অগত্যা আপনার পকেটে গুঁজে দিয়ে পালিয়েছে। কিন্তু আজ রাতে কর্নেল বিচে গার্ড মোতায়েনের ব্যবস্থা করে ফেললেন। আহা রে! বেচারা!" বলে হালদারমশাইকে চিঠিটা দিলাম।

এই সময় কর্নেল ফিরে গেলেন। হালদারমশাইয়ের হাত থেকে নিয়ে ওঁকে চিঠিটা দিলাম। উনি গম্ভীরমুখে পড়ার পর বুক-পকেটে ঢোকালেন। তারপর অন্য বুকপকেট থেকে একটা টাইপকরা লিস্ট বের করে বললেন, "প্যান অ্যামে আজ যারা তাহিতি এসেছে, তাদের নাম-ঠিকানা। ডঃ ভাস্কো এয়ারপোর্ট থেকে জোগাড় করেছেন একটা কপি। পি জি—"

হালদারমশাই বলে উঠলেন, "আমাগো নাম নাই?"

কর্নেল কান দিলেন না। বললেন, "পেদ্রো গার্সিয়া। পর্তুগিজ নাম মনে হচ্ছে। আজকাল সন্ত্রাসবাদীদের রুখতে প্লেনযাত্রীদের নাম, ঠিকানা, পরিচয়, গন্তব্য ইত্যাদি সব তথ্য পাসপোর্ট থেকে নিয়ে এয়ারপোর্ট টু এয়ারপোর্ট কম্পিউটার-ব্যবস্থার মাধ্যমে পাঠানো হয়। পেদ্রো গার্সিয়া ভারতীয় নাগরিক। ঠিকানা, রিপন লেন, কলকাতা। বয়স, ৩৫ বছর। পেশায় শিক্ষক। বিশেষ শনাক্তকরণ চিহ্ন, নাকের ডান পাশে জড়ুল। উদ্দেশ্য, পর্যটন।" কর্নেল চুরুট ধরালেন ব্যস্তভাবে। চোখ বুজে বললেন ফের, "হ্যাঁ। এরই হাতে হয়গ্রীবের উল্কি দেখেছিলাম। অথচ সে শিক্ষক। পথে সে আমার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছে। বলেনি কেন? এদিকে ডঃ ভাস্কো এর নামের পাশে লিখে রেখেছেন, মা-আ-উ-আ-ইন। রুম নম্বর ৩১। বাহুতে উল্কি দেখতে পায়নি সরকারি গোয়েন্দরা, আশ্চর্য তো!"

হালদারমশাই বলেন, "একটা কথা বুঝি না। সরকারি বাংলোয় এরা গার্ড রেখেছে কেন? কর্নেলসার বলেছিলেন স্বর্গদ্বীপ। স্বর্গদ্বীপে গার্ড কেন?"

কর্নেল চোখ বুজে আছেন। আমি বললাম, "নরকের পাপী-তাপীরা যাতে স্বর্গে হানা দিতে না পারে।"

"ঠিক। ঠিক।" সায় দিলেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ।

কর্নেল চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলেন। "আচ্ছা হালদারমশাই, আপনি যেদিন পাসপোর্ট অফিসে ফর্ম আনতে গিয়েছিলেন, সেদিন কোনও লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল?"

চমকে উঠলেন গোয়েন্দা ভদ্রলোক। "হ্যাঁ। লম্বা লাইন ছিল। আমার পেছনে এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ভদ্রলোক ছিলেন। লাইন নড়ে না দেখে উনি বললেন—"

"তার সঙ্গে আপনার আলাপ-পরিচয় হয়েছিল কি?"

"হ্যাঁঃ। আমিই জিজ্ঞেস করেছিলাম, কোথায় যাওয়া হবে বললেন, তাহিতি। তখন আমিও বললাম, আরে, আমিও তাহিতি যাব। এই করে আলাপ হয়ে গেল। তাহিতিতে একটা জাহাজ কোম্পানিতে চাকরি করেন ওঁর দাদা। উনি জানতে চাইলেন আমি কেন যাচ্ছি। তখন বললাম, গভর্নমেন্ট ইনভিটেশন। আমি একজন অর্নিথোলজিস্ট। উনি বললেন, সেটা আবার কী? তখন—"

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে ফের ওঁর কথার ওপর বললেন, "তখন সব কথা ফাঁস করে দিলেন আপনি?"

বিব্রত মুখে হালদারমশাই বললেন, "না, না। ঘোড়া-মানুষের কথা বলিনি। প্যাঁচা-প্রজাপতির কথা বলেছিলাম।"

"মানে—লাইনে দাঁড়িয়ে সময় কাটছিল না।" করুণ মুখে নস্যি নিলেন হালদারমশাই, "আমি আপনার প্রশংসা করেছিলাম কর্নেলসার। মা-কালীর দিব্যি, খারাপ কিছু বলিনি। তাই শুনেই না উনি বললেন, আপনারা কবে, কোন ফ্লাইটে যাচ্ছেন, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব।"

কর্নেল অনিচ্ছার ভঙ্গিতে হাসলেন। "সব বোঝা গেল। কিন্তু শুধু এটাই বোঝা গেল না, কেন পেদ্রো গার্সিয়া আমাকে এড়িয়ে চলল সারা পথ? কেন সে এভাবে গোপনে দেখা করতে চাইল? কী সাহায্য সে চায় আমার কাছে?"

কর্নেল টেলিফোনের কাছে গিয়ে ফোন গাইড বইয়ের পাতা ওলটাতে লাগলেন, তারপর ডায়াল করলেন। "মা-আ-উ-আ-ইন? আমাকে রুম নম্বর একত্রিশে মিঃ পেদ্রো গার্সিয়াকে দিন।" কিছুক্ষণ পরে ফোন রেখে কর্নেল বললেন, "ঘরে রিং হয়ে যাচ্ছে। কেউ ধরছে না।"

বললাম,"হয়তো বেরিয়েছে। পরে রিং করে দেখবেন। কিন্তু একটা কথা। তার যখন আপনাকে এত দরকার, সে এখানে আপনাকে রিং করছে না কেন?"

"এ-প্রশ্নের জবাবও পেদ্রো গার্সিয়াই দিতে পারে।" বলে কর্নেল বোতাম টিপে হুয়াকে ডেকে ডিনার রেডি করতে নির্দেশ দিলেন।

ডিনারে ডঃ ভাস্কো বর্ণিত সামুদ্রিক শ্যাওলা ছিল। আমার খারাপ লাগল। কিন্তু হালদারমশাই এবং কর্নেল খেতে-খেতে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। খাওয়া শেষ করে সবে ড্রেসিংরুমে ঢুকেছি, টেলিফোন বাজল। কর্নেল সাড়া দিলেন। "ডঃ ভাস্কো?...সে কী! কোথায়?... আপনি দয়া করে আসুন। আমি যেতে চাই। বডি যেন না নড়ানো হয়।... না, না ডঃ ভাস্কো! এটা গুরুত্বপূর্ণ।"

কর্নেল ফোন রেখে গম্ভীর মুখে বললেন, "পেদ্রো গার্সিয়াকে তার ঘরে কেউ খুন করে গেছে।"

কিছুক্ষণ পরে ডঃ ভাস্কোর গাড়ি এল। মা-আ-উ-আ ইনের দিকে ছুটে চলল গাড়ি। পাপেনু নদীর ধারে নিরিবিলি জায়গায় একতলা হোটেল। কেন 'ইন' বা 'সরাইখানা' নাম দেওয়া হয়েছে কে জানে! গিয়ে দেখি, বন্দুকবাজ নিরাপত্তাবাহিনী আর পুলিশ হোটেল ঘিরে রেখেছে। ৩১নং রুম দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এবং তার নিচেই নদী। নদীর ওপারে উঁচু গাছের জঙ্গলে চোখে পড়ল।

পেদ্রো বাথরুমের দরজায় খুন হয়েছে। দরজাটা খোলা। মাথা বাথরুমের ভেতর এবং ধড় বাইরে। উপুড় হয়ে আছে মৃতদেহ। বোঝা যায়, বাথরুমে ঢুকতে যাচ্ছিল, সেই সময় আততায়ী মাথার পেছনে শক্ত কিছু দিয়ে আঘাত করেছে। রক্ত জমাট বেঁধে গেছে। ডঃ ভাস্কো বললেন, "ডাক্তার ফ্লোরোয়াঁর মতে, আপাতদৃষ্টে এই ভদ্রলোক খুন হয়েছেন রাত আটটার আগে। পেছনের দরজা খোলা ছিল। দরজার বাইরে ব্যালকনি। ব্যালকনির নিচে নদী। কাজেই আততায়ীর পালানো সহজ ছিল। রাত সাড়ে আটটায় ডিনার দিতে এসে পরিচারক দরজায় নক করে। বারবার নক করে সাড়া না পেয়ে ম্যানেজারকে খবর দেয়। ইন্টারলকিং সিস্টেমের দরজা। ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে ম্যানেজার দরজা খুলেই আঁতকে ওঠেন। পুলিশে খবর দেন। আপনার নির্দেশে মিঃ পেদ্রোর দিকে ম্যানেজারকে নজর রাখতে বলেছিলাম। ম্যানেজার আমাকেও খবর দেন। টেলিফোন অপারেটর বলেছে, রাত আটটা পঞ্চাশে কেউ মিঃ পেদ্রোকে রিং করেছিল।"

"আমি। অপারেটর বলল, ঘরে রিং হয়ে যাচ্ছে।" বলে কর্নেল পেছনের ব্যালকনিতে গেলেন। ফিরে এসে ঘরের ভেতরে চোখ বুলিয়ে বললেন, "পেদ্রোর লাগেজ সার্চ করা হয়েছে?"

"হ্যাঁ। সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। কয়েকটা বই, ট্রাভেলগাইড আর জামাকাপড় আছে। একটা ব্যাগে পাসপোর্ট আছে। ক্যামেরা আর ভিউফাইন্ডার আছে—ওই দেখুন।"

কর্নেল লাশের দিকে ঝুঁকলেন। পেদ্রোর গায়ে চকরবকরা রঙিন গেঞ্জি। বাঁ বাহুর ওপর কর্নেল টর্চের আলো ফেলে আতস কাচ দিয়ে সম্ভবত হয়গ্রীবের উল্কি খুঁজলেন। দেখলাম, একটা মোটা জড়ুল আছে। হঠাৎ কর্নেল জড়ুলটা একটানে উপড়ে ফেললেন। একটা হয়গ্রীবের উল্কি দেখে চমকে উঠলাম। ডঃ ভাস্কো বললেন, "কী আশ্চর্য!"

জড়ুলটা নকল। ইঞ্চিটাক চৌকো স্বচ্ছ সেলোফেনজাতীয় জিনিসের ওপর বসানো। কর্নেল বললেন, "লাশটা চিত করতে হবে।"

ডঃ ভাস্কো একজন পুলিশ চিফকে ফরাসিতে কথাটা বললেন, পুলিশ চিফের মুখ বেজায় গোমড়া। বুঝলাম বিদেশির নাক গলানোতে খচে গেছেন। তাঁর নির্দেশে দু'জন পুলিশ লাশ চিত করে শোওয়াল। কর্নেল মৃত পেদ্রোর জিন্সের প্যান্ট তল্লাশ করে উঠে দাঁড়ালেন। ঘরে উজ্জ্বল আলো, তবু কর্নেল মেঝের কার্পেটে টর্চের আলো ফেলতে-ফেলতে বিছানার কাছে ঝুঁকে পড়লেন। কী একটা তুলে নিয়ে পেদ্রোর লাশের কাছে গেলেন। পেদ্রোর ডান হাতের আঙুল আতস কাচে পরীক্ষা করে সটান উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "আমার কাজ শেষ। ডঃ ভাস্কো! আমরা বাংলোয় ফিরে যাব।"

বাংলোয় ফেরার পথে কর্নেল বললেন, "ডঃ ভাস্কো, আপনি ফিরে গিয়ে মাছধরা ট্রলারের মালিক আইউংয়ের সঙ্গে কথা বলুন। আমরা আজ রাতেই কোকো দ্বীপের দিকে পাড়ি জমাতে চাই। প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। পেদ্রোর খুনি কোকোর দিকে এতক্ষণ রওনা হয়ে গেছে। সব কথা যথাসময়ে খুলে বলব।"

ডঃ ভাস্কো চিন্তিত মুখে বললেন, "কিন্তু আমার সহকারী পিটার গিলম্যান যে হাওয়াই দ্বীপের হনলুলুতে দু'সপ্তাহের ছুটি কাটাতে গেছে। কাল সকালের প্লেনে সে ফিরবে। তাকে সঙ্গে না নিয়ে—"

কর্নেল তাঁর কথার ওপর বললেন, "তাঁকে দরকার হবে না।"

হালদারমশাই এতক্ষণ উসখুস করছিলেন। নিজস্ব ভাষায় বললেন, "কর্নেলসার, ওনারে কইয়া আমারে একখান রিভলভার দেওনের ব্যবস্থা করতে পারেন না?"

পাখিরা ভয় পেল কেন?

রাত বারোটায় মৎস্যবন্দর হোয়ালাহা থেকে গোপনে চিনা জেলে আইউংয়ের ট্রলারে আমরা পাড়ি জমিয়েছিলাম। পেদ্রো গার্সিয়ার খুনি ভয়ঙ্কর দ্বীপ কোকোর দিকে কোন আক্কেলে ছুটে যাবে বুঝতে পারছিলাম না। সেখানে নাকি সাংঘাতিক হিংস্র ঘোড়া-মুখো মানুষের ডেরা! আমার বৃদ্ধ বন্ধু তখনও মৌনীবাবা। মুখে চুরুট। চোখ বন্ধ। সাদা দাড়িতে একটুকরো ছাই।

আইউংয়ের মাছধরা ট্রলারের নিচের খোলটা মাছের গুদাম। ওপরে এঞ্জিনঘর সংলগ্ন একটা কেবিন। দু'পাশে রেলিংয়ের খোলা ডেক। আমাদের দলে দু'জন সশস্ত্র রক্ষী কোয়া এবং তিকি। তারা তাহিতির আদিবাসিন্দাদের বংশধর। প্রাইভেট ডিটেকটিভ হালদারমশাই এঞ্জিনঘরে উঁকি মেরে সম্ভবত ট্রলার চালানো দেখছিলেন। চালকের নাম চিচিন। সে বুড়ো জেলে আইউংয়ের ছেলে। বাবা-ছেলে মাত্র দু'জনে মিলে প্রশান্ত মহাসাগরে মাছ ধরে বেড়ায়। তাদের সাহস আছে বটে।

কেবিনটা ছোট্ট। দু'ধারে দুটো শোওয়ার বাঙ্ক। মধ্যিখানে একটা ডাইনিং টেবিল। টেবিলে ম্যাপ বিছিয়ে কর্নেল এবং ডঃ ভাস্কো কোকো দ্বীপের অবস্থান দেখছিলেন। ডঃ ভাস্কো বললেন, "দ্বীপের এই ম্যাপটা রাষ্ট্রপুঞ্জের লোকেরা হেলিকপ্টার থেকে দেখে তৈরি করেছিলেন। দ্বীপের গড়ন লক্ষ করুন। প্রায় একফালি চাঁদের মতো। ইংরেজিতে ক্রেসেন্ট বলা চলে। তো পলিনেশীয় অঞ্চলের ভাষায় চন্দ্রকলাকে বলে 'কোকো'। মোটামুটি দৈর্ঘ্য তিন মাইল। মাঝখানে চওড়া অংশ মাত্র এক মাইল। পিঠের দিকটা খাড়া পাথুরে পাহাড়। উলটো দিকটা ঢালু এবং অজস্র খাড়ি আছে। এই জায়গাটুকু বালির বিচ। আমরা বিচ দিয়ে দ্বীপে পৌঁছেছিলাম।"

কর্নেল বললেন, "মনে হচ্ছে বিচের উত্তর অংশে ঘাস আর ফুলের জঙ্গলে প্যাঁচা-প্রজাপতির ঝাঁক দেখেছিলাম।"

ডঃ ভাস্কো বললেন, "এখন ওদিকটায় দুর্ভেদ্য জঙ্গল। আমরা ক্যাম্প করেছিলাম বিচের ওপরে এইখানে। কিছুটা জঙ্গল সাফ করতে হয়েছিল।"

কর্নেল আইউংকে বললেন, "ভাই আইউং! আপনার ট্রলার কতক্ষণে পৌঁছতে পারবে?"

আমুদে বুড়ো জেলে কুতকুতে চোখে হেসে বলল, "ঘন্টাতিনেক লেগে যাবে। আমরা সাপের লেজ ধরে এগোচ্ছি। মুরিয়া, রাইয়াতিয়া, তারপর বোরাবোরা দ্বীপের পাশ কাটিয়ে সাপ ব্যাটাচ্ছেলে দৌড়চ্ছে কোকোর বুক ঘেঁষে।"

ডঃ ভাস্কো একটু হাসলেন। "সাপ বলতে ও সমুদ্রস্রোতের কথা বলছে।"

আইউং বলল, "লেজ ছাড়লেই কিন্তু বিপদ। তবে ভাববেন না। চিচিনের মুঠোর জোর প্রচণ্ড।"

কর্নেল বললেন, আপনি কি কখনও কোকোর কাছাকাছি মাছ ধরেছেন?"

"ওখানে হাঙরগুলো রাক্ষুসে।"

কখন হালদারমশাই আমাদের কাছে এসেছেন, লক্ষ করিনি। বলে উঠলেন, "হাঙর ভেলা উলটে দেবে না তো?"

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, "দিতেও পারে। তখন সাঁতার দিতে হবে কিন্তু।"

গোয়েন্দা ভদ্রলোক সহাস্যে মাতৃভাষায় বলে উঠলেন, "রিভলভার পাইছি। গুলি করুম। আর কারে ডর? তবে ভেলা উলটাইলে সাঁতারের কথা কইলেন। কর্নেলসার, আমি জলপোকা।"

কর্নেল আইউংকে বললেন, "আচ্ছা ভাই আইউং, কোকো দ্বীপের ঘোড়া-মুখো মানুষ সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?"

আমুদে আইউংয়ের মুখ সঙ্গে-সঙ্গে কেমন যেন পাংশু হয়ে গেল। চাপা স্বরে বলল, "আমার ছেলে চিচিন একদিন দূরবিনে একপলকের জন্য ভয়ঙ্কর জন্তুটাকে দেখতে পেয়েছিল। তারপর থেকে আমারা কোকো দ্বীপ এড়িয়ে চলি। তবে এই যে আপনাদের পৌঁছে দিতে কোকো দ্বীপের কাছে যাচ্ছি, সেটা মাননীয় আলবের্তো ভাস্কোমশাইয়ের খাতিরে। ওঁর সাহায্য ছাড়া তাহিতিতে আমি 'রাজনৈতিক আশ্রয়' পেতাম না। আমি ওঁর কাছে ঋণী।"

"কোকো দ্বীপে আপনি বা চিচিন সন্দেহজনক আর কিছু কখনও লক্ষ করেছেন কি?"

আইউং একটু চুপ করে থেকে বলল, "দ্বীপটা সত্যিই ভূতুড়ে। ক'মাস আগে একরাত্রে ওখানে একটা আলো দেখেছিলাম। আলোটা কিছুক্ষণ নড়াচড়া করে নিভে গেল।"

ডেকে প্রচণ্ড হাওয়া আর জলের ঝাপটানি। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের আলো ফুটেছে। কিন্তু গাঢ় কুয়াশার সঙ্গে জ্যোৎস্না মিশে সবকিছু অস্পষ্ট। ট্রলারের আলোর ছটায় কালো জলের আলোড়ন দেখা যাচ্ছে। আইউং এঞ্জিনঘরে গিয়ে কম্পাসের ওপর ঝুঁকে ছেলেকে কিছু নির্দেশ দিচ্ছিল।

কিছুক্ষণ পরে ডঃ ভাস্কো ডেকে গেলেন। তিনি রক্ষিদ্বয় কোয়া এবং তিকির সাহায্যে রবারের ভেলা পাম্প করে ফুলিয়ে তাতে জিনিসপত্র বোঝাই করতে ব্যস্ত হলেন। দেখলাম ভেলায় দুটো করে ছোট্ট বৈঠা আটকানো আছে। হালদারমশাই তাঁর বাইনোকুলার নিয়ে ডেকে পা বাড়িয়েই পিছিয়ে এলেন। কর্নেল ডেকের রেলিংয়ে ভর দিয়ে বাইনোকুলারে সমুদ্র দর্শন করতে থাকলেন। হালদারমশাই বাঁকা মুখে বললেন, "গা গুলোচ্ছে। কী বিচ্ছিরি গন্ধ! বাথরুম কই?"

দেখিয়ে দিতেই গোয়েন্দপ্রবর সবেগে ঢুকে গেলেন। সমুদ্রে ভাসলে 'সি সিকনেস' হয় তাই আমাকে এবং ওঁকে কর্নেল ওষুধ খাইয়েছিলেন। বুঝলাম, হালদারমশাইয়ের ওষুধ খাওয়া ব্যর্থ হয়েছে। ঢেউয়ের নাগরদোলায় এই রোগটার প্রাদুর্ভাব ঘটে। মানুষকে কাহিল করে ছাড়ে। আমারও অবশ্য বমিভাব আসছিল। কিন্তু তার চেয়ে কাবু করেছিল মাথার যন্ত্রণা। বেগতিক দেখে অ্যাসপিরিনের বড়ি গিলব ভাবছি, সেই সময় ডঃ ভাস্কো কেবিনে ঢুকলেন। আমার হাতে অ্যাসপিরিনের বড়ি দেখে হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। "সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া হবে মিঃ চাউদ্রি। সহ্য করুন। আর আধঘন্টা পরে আমরা ডাঙায় পৌঁছে যাব। দেখবেন, মাথায় আর যন্ত্রণা হচ্ছে না।"

হালদারমশাই করুণ মুখে বেরিয়ে এসে বাঙ্কে চিত হলেন। পরক্ষণেই বাঙ্ক থেকে গড়িয়ে পড়ে মাতৃভাষায় কিছু একটা গালমন্দ করে উঠলেন।

ডঃ ভাস্কো তাঁকে উঠতে সাহায্য করে বললেন, "উপকূলের কাছাকাছি বলেই ঢেউটা বেশি।"

কর্নেলের ডাক ভেসে এল, "ডঃ ভাস্কো, ডঃ ভাস্কো, ডঃ ভাস্কো!"

ডঃ ভাস্কো কেবিনের দরজা দিয়ে ডেকে ফিরে গেলেন। আমি টলতে-টলতে দরজায় উঁকি দিলাম। সমুদ্রের গর্জন আর এঞ্জিনের শব্দে ওঁদের কথা শোনা যাচ্ছিল না। কিন্তু ওঁদের হাবভাব দেখে মনে হল দু'জনেই উত্তেজিত। ততক্ষণে হালদারমশাই আবার বাথরুমে ঢুকেছেন।

কর্নেল এবং ডঃ ভাস্কো কেবিনে ফিরে এলেন একটু পরে। দেখলাম, কর্নেলের দাড়ি ভিজে একাকার। দাড়ি থেকে জল ঝেড়ে তুম্বো মুখে বললেন, "তা হলে যা ভেবেছিলাম, তা-ই ঠিক হল ডঃ ভাস্কো!"

ডঃ ভাস্কো উদ্বিগ্নমুখে বললেন, "কিন্তু আপনার দেখতে ভুল হয়নি তো?"

"নাহ! আলোটা টর্চেরই।"

"কে এমন দুঃসাহসী যে কোকো দ্বীপে টর্চ জ্বেলে ঘুরে বেড়ায়?"

"সঙ্গে দলবল এবং অস্ত্রশস্ত্র থাকলে দুঃসাহসী হওয়া মানুষের স্বভাব, ডঃ ভাস্কো!" কর্নেল চুরুট ধরালেন। একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে ফের বললেন, "ওই বিচ দিয়ে দ্বীপে ওঠা উচিত হবে না। আইউংকে ডেকে পরামর্শ করা যাক।"

ডঃ ভাস্কোর ডাকে আইউং এল এঞ্জিনঘর থেকে। কর্নেল সেই ম্যাপটা বের করে টেবিলে বিছিয়ে বললেন, "ভাই আইউং, এই বিচ ছাড়া অন্য কোথাও কি কোকো দ্বীপে ওঠা যায় না?"

আইউং বলল, "বিচের উত্তরে একটা খাড়ি আছে। খাড়িটা বড়-বড় পাথরে ভর্তি। পাথরগুলো এড়িয়ে আপনাদের ভেলা যদি কিনারায় পৌঁছতে পারে, খানিকটা ঢালু জায়গা পাবেন। কিন্তু ঢালু জমিটা ঘন জঙ্গলে ঢাকা। তা ছাড়া পাশেই একটা ছোট্ট প্রপাত দেখেছি। প্রপাতের জল সমুদ্রে পড়ে হুলা-হুলা নাচছে। এই মুলুকেরই নাচ কিন্তু!"

ডঃ ভাস্কো ম্যাপে আঙুল রেখে বললেন, "এই সে প্রপাত। আসলে দ্বীপে একটা মিঠে জলের প্রস্রবণ আছে। সেটা সরু ঝরনার মতো নেমে এসেছে। আমরা জানুয়ারি মাসে গিয়ে সেখান থেকেই পানীয় জল আনতাম। তো এই খাড়ি দিয়ে পৌঁছতে পারলে বরং ঝরনার ধারেই জঙ্গল কেটে ক্যাম্প করা যাবে। সেবার শুধু একটাই সমস্যা ছিল। নারকোলবনের ভেতর দিয়ে মাথা বাঁচিয়ে জল আনতে হত। কারণ ক্রমাগত শুকনো নারকোল বোমার মতো মাথায় পড়ত। মাথায় হেলমেট পরে যেতেই হত। নইলে খুলি ফেটে মরার আশঙ্কা ছিল। আর সে কী বিচ্ছিরি ফট ফট শব্দ! জানেন কর্নেল সরকার? পাথরে নারকোল পড়ে ফেটে যায়। সেই নারকোল-শাঁস খেতে আসে ঝাঁকে-ঝাঁকে রাক্ষুসে সামুদ্রিক কাঁকড়া, সে-ও আর এক উপদ্রব!"

আইউং প্রায় নেচে উঠল। "বাহ, আমারও আপনাদের সঙ্গী হতে ইচ্ছে করছে। ওই কাঁকড়ার নাম নারকোল-কাঁকড়া। খুব সুস্বাদু! এক বস্তা ধরতে পারলে রাজা হয়ে যাব। তবে বেজায় ধূর্ত ব্যাটাচ্ছেলেরা! দেখি, চিচিনের সঙ্গে পরামর্শ করে আসি।"

বুড়ো এঞ্জিনঘরে চলে গেল। হালদারমশাই ততক্ষণে বাথরুম থেকে বেরিয়ে মেঝেয় কম্বল পেতে চিত হয়েছেন। তাঁর শোচনীয় অবস্থা দেখে ডঃ ভাস্কো তাঁকে ওষুধ খাইয়ে দিলেন।

কর্নেল ম্যাপের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। আইউং ফিরে এসে বলল, "চিচিন রাজি হচ্ছিল না। ওকে অনেক বুঝিয়ে একটা শর্তে রাজি করালাম। বললাম, সরকারি বড়কর্তারা এবং সশস্ত্র রক্ষী আছে। সাংঘাতিক জন্তুটাকে মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেবে। তো ওই খাড়িতে ট্রলার ঢোকানো যাবে না। পাশের একটা খাড়িতে চিচিন ট্রলার নোঙর করে রাখবে। কিন্তু চিচিনের একটা রাইফেল আর ডজনচারেক গুলি দরকার। এই হল ওর শর্ত।"

ডঃ ভাস্কো বললেন, "এখনই দিচ্ছি। আমরা অনেক অস্ত্র এনেছি।"

আবার প্রোগ্রাম বদলানোর দরুন আধঘন্টা দেরি হল। ট্রলারের এঞ্জিন যখন বন্ধ হল এবং ঘড়ঘড় শব্দে নোঙর পড়ল, তখন রাত সাড়ে তিনটে বাজে। দড়ির সিঁড়ি বেয়ে রবারের দুলন্ত ভেলায় নামা এক বিপজ্জনক কসরত। অবাক হয়ে দেখলাম, সি-সিকনেস-এ কাহিল হালদারমশাই অক্লেশে ভেলায় অবতরণ করলেন। পুলিশ-ট্রেনিং সম্ভবত এর কারণ। তারপর বৈঠা টানতেও তিনি দক্ষ। তার কারণ সম্ভবত তাঁর অতীত জীবন, যা নদ-নদীর দেশ পূর্ববঙ্গে কেটেছে।

আইউং নিজের পেলিনেশীয় ক্যানো নামিয়েছিল। ছিপনৌকোর গড়ন সেই ক্যানোতে মাছধরা জাল ছিল। বড়-বড় পাথর এড়িয়ে ঢেউয়ের নাগরদোলায় কীভাবে কিনারায় পৌঁছেছিলাম, বলতে পারব না। আমি সারাক্ষণ চোখ বন্ধ করেছিলাম। লোনা জলে পোশাক ভিজে জবুথবু অবস্থা।

হালদারমশাইকে বলতে শুনলাম, "হাঙর গেল কই? বুড়া কইছিল হাঙর আছে। হঃ!"

তারপরই যেন একটা হুলস্থূল বেধে গেল। সমুদ্র আর প্রপাতের গর্জন ছাপিয়ে হঠাৎ হাজার-হাজার সামুদ্রিক পাখির চিৎকার শুরু হল। আবছা জ্যোৎস্নায় তাদের ওড়াউড়ি দেখতে পেলাম। আইউং ভয়ার্ত স্বরে বলে উঠল, "ওরা তো এখন ঘুমিয়ে থাকে। কেন ওরা জেগে উঠল? মশাইরা, সাবধান হোন। সাংঘাতিক দানোটা নিশ্চয় আমাদের সাড়া পেয়েছে। আমি শুনেছি, সে যেখানে যায়, সেখানকার ঘুমন্ত পাখিরা ভয় পেয়ে পালাতে থাকে।"

ডঃ ভাস্কো ব্যস্তভাবে বললেন, "কোয়া! তিমি! হ্যান্ডগ্রেনেড হাতে নাও।"

কর্নেল খাড়ির দিকে ঘুরে পাখিদের ওড়াউড়ি দেখছিলেন। বললেন, "আশ্চর্য তো! হঠাৎ ভয় পেল কেন ওরা? পাখিগুলো সি-গাল। সারারাত ওরা ঘুমিয়ে থাকে।"

ফিকে জ্যোৎস্নায় লক্ষ করলাম, পাখির ঝাঁক। খাড়ি থেকে দ্বীপের ওপর কিছু অংশ জুড়ে চক্কর দিচ্ছে, হাজার-হাজার পাখি মিলে যেন একটা বিশাল কালো চাকা অদ্ভুত শব্দে ঘুরপাক খাচ্ছে।

কর্নেলের পাল্লায় পড়ে জীবনে অনেক বিপজ্জনক অবস্থায় কাটিয়েছি, যখন সব সাহস উবে গিয়ে আতঙ্কে রক্ত ঠাণ্ডা হিম হয়ে গেছে। কিন্তু কোকো দ্বীপে পা দিয়েই যে আতঙ্কের মধ্যে কিছু সময় কাটিয়েছিলাম, জীবনে তা ভুলব না।

আমরা কর্নেলের নির্দেশে গুঁড়ি মেরে বসে পড়লাম। উনি টর্চ জ্বালতে নিষেধ করেছিলেন। আমরা আছি ঢালু জমির নিচে এবং ওপরে ঘন ঝোপঝাড়। কোয়া এবং তিকির এক হাতে দুর্ধর্ষ কালাশকিভ রাইফেল, অন্য হাতে গ্রেনেড। তারা আমাদের সামনে একটা পাথরের দু'পাশে হাঁটু দুমড়ে বসেছে। প্রতি মুহূর্তে ঘোড়া-মুখো দানবটার আবির্ভাব আশঙ্কা করছিলাম।

কতক্ষণ পরে কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "সি-গালগুলো চুপ করেছে। ওরা ডেরায় ফিরে গেছে কিন্তু আমাদের আপাতত এখানেই অপেক্ষা করা উচিত। ভোরের আলো ফুটলে আমরা রওনা হব। তবে সত্যিই এ একটা রহস্যময় ঘটনা। হঠাৎ ওরা ভয় পেল কেন?"

রহস্যের বেড়াজালে

দিনের আলো সত্যিই মানুষকে হারানো সাহস ফিরিয়ে দেয়। হাতিঘাস, ফার্ন, রঙিন পাতাওয়ালা মানকচুজাতীয় গাছের ঝোপ, বুগেনভিলিয়া আর রংবেরঙের নাম-না-জানা ফুলের জঙ্গল পেরিয়ে সেই ঝরনাধারার পাশে আমাদের দুটো ক্যাম্প পাতা হয়েছিল। উত্তরে ছটফটিয়ে চলা ঝরনাধারার ওপারে এবং ক্যাম্পের পশ্চিমে নিবিড় নারকোলবন। সামনে দক্ষিণে রবারগাছের জঙ্গল। ব্রেকফাস্ট করে কর্নেল এবং ডঃ ভাস্কো গার্ড তিকিকে সঙ্গে নিয়ে বেরোলেন। এঁদের হাতে প্রজাপতিধরা জাল দেখে বুঝলাম, প্যাঁচা প্রজাপতির খোঁজে যাচ্ছেন।

কর্নেল আমাকে এবং হালদারমশাইকে ক্যাম্প ছেড়ে যেতে নিষেধ করেছিলেন। না করলেও অন্তত আমি এক পা বাড়াতে রাজি নই। আইউং কিছুক্ষণ দোনামনা করার পর একটা সাঁড়াশি এবং বস্তা হাতে নারকোলবনের দিকে চলল। ওর পিঠে গোঁজা লম্বাটে একটা দা। কোয়া তাহিতি ভাষায় ওকে কিছু বলল। কিন্তু আইউং যেন নারকোলখেকো কাঁকড়ার নেশায় আচ্ছন্ন। কোয়ার কথা গ্রাহ্য করল না।

হালদারমশাই বাইনোকুলারে চারদিক দেখছিলেন। হঠাৎ বললেন, "ওগুলি কী ফল? বাতাবি লেবু নাকি?" বলেই কোয়াকে জিজ্ঞেস করেলেন, "হোয়াট ইজ দ্যাট ফ্রুট! বিগ ট্রি অ্যান্ড বিগ ফ্রুট!"

কোয়া জিভে একটা শব্দ করে বলল, "ব্রেডফ্রুট! ডেলিশাস মিস্টার!"

"ক'য় কী জয়ন্তবাবু? রুটিফল? গাছে রুটি ধরে নাকি? রূপকথায় যা শুনেছিলাম, তা দেখি সত্যি। সেই যে একটা রাখাল পিঠে পুঁতেছিল। তা থেকে পিঠেগাছ হল। পড়েননি?"

বললাম, "পড়েছি। তারপর এক রাক্ষসী বুড়ি সেজে এসে পিঠে চাইল। রাখাল যেই তার হাতে পিঠে দিয়েছে, বুড়ি তাকে খপ করে ধরে ঝুলিতে পুরেছে। কাজেই সাবধান!"

হালদারমশাই খি খি করে একচোট হাসলেন। তারপর ফের বাইনেকুলারে রবারগাছের জঙ্গলের পাশে ব্রেডফ্রুট গাছটা দেখতে লাগলেন। একটু পরে দেখি, উনি বাইনোকুলার নামিয়ে পকেট থেকে রিভলভার বের করে এগিয়ে যাচ্ছেন। বললাম, "হালদারমশাই, হালদারমশাই, কোথায় যাচ্ছেন?"

"একখান পিঠা না খাইয়া ছাড়ুম না!"

"যাবেন না। হয়গ্রীব ওত পেতে আছে।"

কোয়া চেঁচিয়ে উঠল, "ডোন্ট গো মিস্টার!"

গোয়েন্দাপ্রবর কানে নিলেন না। লম্বা পায়ে এগিয়ে গেলেন। গাছটা অন্তত পঞ্চাশ মিটার দূরে। হঠাৎ ওঁকে একটা পাথরের আড়ালে বসে পড়তে দেখলাম। তারপর গুঁড়ি মেরে রবারগাছের জঙ্গলে ঢুকললেন। উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম, "কোয়া, দেখো তো উনি কোথায় গেলেন।"

কোয়া নির্বিকার মুখে বলল, "আমি ক্যাম্প ছেড়ে নড়ব না। আমার চাকরি যাবে।"

কী করব ভাবছি, সেইসময় ঝরনার দিক থেকে আইউং ছুটে এল। তার হাতে সেই ধারালো দা। ভয়ার্ত মুখে সে কোয়াকে কিছু বলল। কোয়া রাইফেল বাগিয়ে ঝরনার দিক করে দাঁড়াল। বললাম,"কী হয়েছে মিঃ আইউং?"

"ঘোড়া-মুখো দানো। ঝরনার ওপারে ঝোপের ভেতর মুখ বের করে উঁকি দিচ্ছিল।"

"বলেন কী।"

"হ্যাঁ মশাই! আমি স্পষ্ট দেখেছি। চারটে কাঁকড়া ধরেছিলাম। বস্তা আর সাঁড়াশি ফেলে পালিয়ে এসেছি।"

আমি হালদারমশাইয়ের জন্য উদ্বিগ্ন। বললাম, "কর্নেল এবং ডঃ ভাস্কো ফিরে আসুন। তারপর আপনার সাঁড়াশি ও বস্তা উদ্ধার করা যাবে। কিন্তু এদিকে এক কাণ্ড!"

কোয়া তাহিতি ভাষায় ওকে কিছু বলল। আইউং আমার দিকে ঘুরে বলল, "দানোটা ঝরনার ওপারে আছে। কাজেই আপনাদের সঙ্গী ভদ্রলোকের কোনও ভয় নেই। উনি হয়তো খরগোশ দেখেছেন। খরগোশের মাংস সুস্বাদু!"

মরিয়া হয়ে এগিয়ে গেলাম। রবারবনের কছে গিয়ে ডাকলাম, "হালদারমশাই, হালদারমশাই!"

কোনও সাড়া এল না। আরও কয়েকবার ডাকাডাকি করে ক্যাম্পে ফিরলাম। বরাবর দেখে আসছি, অত্যুৎসাহী এই প্রাইভেট ডিটেকটিভ কেলেঙ্কারি না বাধিয়ে ছাড়েন না। কোয়া তার ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে বলল, 'ইটিং ব্রেডফ্রুট। শিওর!"

বললাম, "কিন্তু ডাকাডাকি করে কোনও সাড়া পেলাম না। হয় তো—"

আমার কথার ওপর আইউং বলল, "পাকা ব্রেডফ্রুট খেলে ভীষণ ঘুম পায়।"

কিছুক্ষণ পরে কর্নেল এবং ডঃ ভাস্কো ঝরনার দিক থেকে ফিরে এলেন। আইউং হাউমাউ করে ঘোড়া-মুখো দানোর খবর দিল এবং তার সাঁড়াশি-বস্তা উদ্ধারের জন্য কাকুতিমিনতি শুরু করল। ডঃ ভাস্কো বললেন,"কোয়া, তুমি আইউংয়ের সঙ্গে গিয়ে ওর জিনিসগুলো উদ্ধার করো।"

ইতিমধ্যে কর্নেলকে আমি হালদারমশাইয়ের দুঃসংবাদ দিয়েছি। কর্নেল ডঃ ভাস্কোকে ঘটনাটা জানিয়ে ব্যস্তভাবে বললেন, "মিঃ হালদার সম্ভবত পেদ্রোর খুনি কিংবা তার দলের কাউকে অনুসরণ করেছেন। আমাদের এখনই ওঁর খোঁজে যেতে হবে।"

ডঃ ভাস্কো ক্যাম্পে ঢুকে একটা রাইফেল নিয়ে এলেন। বললেন, "তিকি তুমি আমাদের সঙ্গে এসো। কোয়া এখনই ফিরে আসবে।"

রবারগাছের জঙ্গল এমন নিবিড় আর দুর্ভেদ্য যে, কয়েকগজ এগিয়ে ডাইনে ব্রেডফ্রুট গাছের জঙ্গলে ঢুকতে হল। কর্নেল বাইনোকুলারে গাছপালার ফাঁক দিয়ে কিছু দেখার পর বললেন, "একটা পাথরের শৈলশিরা দেখতে পাচ্ছি। ওই শৈলশিরার নিচেই কি সমুদ্র?"

ডঃ ভাস্কো সায় দিলেন। "দ্বীপের শেষ সীমানা ওটা।"

কর্নেল সতর্ক দৃষ্টিতে হালদারমশাইয়ের গতিবিধির সূত্র খুঁজতে-খুঁজতে হাঁটছিলেন। পাশে একটা নারকোল বনে অনবরত পটকা ফাটার শব্দে চমকে উঠেছিলাম। তারপর বুঝলাম, শুকনো নারকোল খসে পড়ছে। এবার ফার্ন আর বুগেনভিলিয়ার জঙ্গল পেরিয়ে ঢালু হয়ে ওপরে ওঠা মোটামুটি খোলামেলা বিস্তীর্ণ জায়গা। নানা গড়নের পাথর, ঘাস আর ফলের হাসিতে ঝলমলে ঝোপঝাড়। কর্নেল হঠাৎ একখানে থেমে বললেন, "ওই দেখুন ডঃ ভাস্কো! প্যাঁচা প্রজাপতির ঝাঁক!"

ডঃ ভাস্কো আস্তে বললেন, "হ্যাঁ।"

"ডঃ ভাস্কো, বুঝতে পেরেছি, আপনার মন প্রজাপতিতে নেই। আগেও ছিল না। তবে এবার পেদ্রোর খুনি এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।"

উনি চমকে উঠে কর্নেলের দিকে তাকালেন। কিন্তু কিছু বললেন না।

কর্নেল একটু হাসলেন। "পেদ্রো গার্সিয়া একসময়ে ছিল তাহিতির জাঁ ব্লাঁক জাহাজ কোম্পানির নাবিক। সম্ভবত কারও হুমকিতে চাকরি ছেড়ে কলকাতা পালিয়েছিল। মা-আ-উ-আ ইন থেকে ফিরে গতরাত্রে আমি জাঁ ব্লাঁক কোম্পানিতে ফোন করে এ-কথা জেনেছি। তার আগেই অবশ্য আমার একটু সন্দেহ জেগেছিল। বাংলোয় আপনার লেখা প্রজাপতির বইয়ে আপনার পুরো নাম দেখেছিলাম। ডঃ ভাস্কো বিরক্ত মুখে বললেন, "গার্সিয়া একটা সাধারণ নাম। আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছি না!"

"পেদ্রো খুন হওয়ার খবর গতরাত্রে আপনিই যেচে পড়ে আমাকে দিয়েছিলেন। তার মানে, পেদ্রোর দিকে আপনার নজর ছিল। আমি খুব কৌতূহলী চরিত্রের লোক ডঃ গার্সিয়া! এখানে আসার আগে কোকো দ্বীপ সম্পর্কে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে গিয়ে পুরনো সামরিক নথিপত্র ঘেঁটেছিলাম। ১৭৬০ সালে পর্তুগিজ জলদস্যু ওস্‌ভালদো দে মেলো দে গার্সিয়ার ঘাঁটি ছিল কোকো দ্বীপ। পরে জেনেছি, পেদ্রো গার্সিয়া ছিল তার বংশধর। জাঁ ব্লাঁক কোম্পানিতে ফোন করে এ-ও জেনেছি আপনারই সুপারিশে পেদ্রোর চাকরি হয়েছিল। কিন্তু সম্ভবত সে কারও হুমকি চাকরি ছেড়ে পালায়।"

"এক কথা বারবার শুনতে চাইনে। আপনার বক্তব্য কী?"

"আপনি বাঙ্গালোর সম্মেলন থেকে কলকাতা হয়ে ফেরার সময় পেদ্রোর সঙ্গে রিপন লেনে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সতর্কতার দরুন আপনি কাছেই ইলিয়ট রোডে আমার সঙ্গে দেখা করেন। যাই হোক, পেদ্রো আপনার কথায় আবার তাহিতি এসেছিল। তারপর সম্ভবত সে টের পায় আপনি তাকে ফাঁদে ফেলেছেন। কলকাতার পাসপোর্ট অফিসে মিঃ হালদার তাকে আমার কীর্তিকলাপ জানিয়েছিলেন। তাই সে আমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে। আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলতে সাহস পায়নি, তার কারণ অনুমান করা যায়। ফোনে আপনার আড়িপাতার ভয় ছিল পেদ্রোর।"

ডঃ ভাস্কো ফুঁসে উঠলেন, "কিন্তু আমি ওকে খুন করিনি।"

কর্নেল চুরুট জ্বেলে বললেন, "না হয় আপনি ওকে খুন করেননি। তবে পূর্বপুরুষের গুপ্তধনের ম্যাপ হাতাতে দরকার হলে তা করতেন আপনি। আপনার দুর্ভাগ্য। তার আগেই আপনার প্রতিপক্ষ পেদ্রোকে খতম করে ম্যাপ নিয়ে পালিয়ে এসেছে। পেদ্রোর সঙ্গে আপনার রক্তের সম্পর্ক ছিল ডঃ গার্সিয়া!"

"প্রমাণ দিতে পারেন?"

"পারি। নিহত পেদ্রোর পকেট থেকে পকেটমারদের কৌশলে এই চিঠিটা আমি হাতিয়েছিলাম। চিঠিটা পর্তুগিজ ভাষায় লেখা। পর্তুগিজ ভাষা রোমান হরফে লেখা হয়। তবে আপনার দফতরের

বাংলোর পরিচারক হুয়া পর্তুগিজ জানে। সে আমাকে সাহায্য করেছে। এটা আপনার লেখা চিঠি।" বলে কর্নেল ওঁকে চিঠিটা দিলেন।

ডঃ ভাস্কো চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে বললেন, "ঈশ্বরের দোহাই কর্নেল সরকার। আর এ-সব কথা নয়। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আপনাকে আমি..."

কর্নেল তাঁর কথার ওপর বললেন, "গুপ্তধনের ভাগ দেবেন তো? গুপ্তধনে অমার মাথাব্যথা নেই ডঃ গার্সিয়া! আমি সাংঘাতিক ঘোড়া-মুখো মানুষ সম্পর্কেই আগ্রহী!"

এতক্ষণে বললাম, "কর্নেল আপনি হালদারমশাইয়ের কথা ভুলে গেছেন! তিনি হয়তো বিপন্ন।"

কর্নেল হাসলেন। "না ডার্লিং, বাইনোকুলারে দেখে নিয়েছি হালদারমশাই ওই শৈলশিরার নিচে একটা পাথরের আড়ালে ঘাপটি পেতে বসে আছেন!" বলে তিনি ডঃ ভাস্কোর দিকে ঘুরলেন। "হিংস্র দানবটির ভয়ে আপনি আর কোকো দ্বীপে আসার আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। তা ছাড়া এই বিতর্কিত দ্বীপে বরবার আসতে দেওয়ার অনুমতি তাহিতি সরকার দিতে না। কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রকৃতি পরিবেশবিজ্ঞানী মহলে সুপরিচিত এই কর্নেল নীলাদ্রি সরকার আপনার আবার কোকো দ্বীপে আসার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তবে সতর্কতার জন্য আপনি পেদ্রোকে কি আমার ছায়া না মাড়াতে নির্দেশ দিয়েছিলেন?"

ডঃ ভাস্কো গলার ভেতর থেকে বললেন, "হ্যাঁ।"

"নিহত পেদ্রোর আঙুলে এবং খাটের নিচে আতসকাচে আমি জীর্ণ প্রাচীন কাগজের আঁশ দেখেছি। ওটাই সম্ভবত গুপ্তধনের ম্যাপ। কিন্তু আপনি শুনলে দুঃখিত হবেন ডঃ গার্সিয়া, কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে সামরিক নথিপত্রে দেখেছি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানিরা কোকো দ্বীপে সামরিক ঘাঁটি গড়ার সময় ডিনামাইটে ওই শৈলশিরার একটা অংশ ধসিয়েছিল। ব্রিটিশ গুপ্তচর সংস্থার সূত্রে খবর পাওয়া যায়, জাপানিরা সেখানে প্রচুর সোনাদানা, হিরে, জহরত আবিষ্কার করে।"

ডঃ ভাস্কো প্রায় আর্তনাদ করলেন, "হায় ঈশ্বর!"

এই সময় তিকি বলে উঠল, "কর্নেল সরকারের সঙ্গী ভদ্রলোক পালিয়ে আসছেন।"

দেখলাম, প্রাইভেট ডিটেকটিভ উর্ধ্বশ্বাসে আমাদের দিকে দৌড়ে আসছেন। আমাদের দেখতে পেয়ে ওঁর গতি বেড়ে গেল। কাছে এসে হাঁসফাঁস করে বলেন, "পলাইয়া যান, পলাইয়া যান। হয়গ্রীব ইজ কামিং!"

কর্নেল কিছু বলার আগেই উনি পাশ কাটিয়ে গিয়ে পেছনে একটা নারকোল গাছে তরতর করে উঠে গেলেন। আমরা দৌড়ে গেলাম। কর্নেল বললেন, "মাথায় নারকোল পড়বে হালদারমশাই! খুলি ফেটে যাবে।"

তখনই একটা নারকোল নিচের পাথরে পড়ে ফটাস শব্দে ফেটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গোয়েন্দপ্রবর নেমে এলেন। ডঃ ভাস্কোকে উত্তেজিতভাবে ইংরেজিতে বললেন, "এ কী রিভলভার মশাই! দু'নম্বরি জিনিস! ট্রিগার টেনে গুলি বেরোল না।"

কর্নেল বাংলায় বললেন, "ডঃ ভাস্কো আমাদের তিনজনকে তিনটে খেলনা রিভলভার দিয়েছেন হালদারমশাই!"

"ক্যান?"

"উনি চাননি আমরা আত্মরক্ষা করতে পারি।"

"ক্যান? ক্যান?"

"গুপ্তধনের অভিযাত্রীদের এই স্বভাব। তবে পরে বুঝিয়ে বলব।" বলে কর্নেল ডঃ ভাস্কোর হাত ধরে টানলেন। "দুঃখ করে লাভ নেই ডঃ গার্সিয়া! এবার পেদ্রোর খুনি এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গদের একটি বিহিত না করে দ্বীপ থেকে চলে যাওয়া উচিত হবে না। সেইসঙ্গে ঘোড়া-মুখো মানুষটাকে পাকড়াও করা দরকার। চলুন। আপাতত ক্যাম্পে ফেরা যাক।"

কিন্তু ক্যাম্পে ফিরে হকচকিয়ে গেলাম। দুটো ক্যাম্প মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। জিনিসপত্র চারদিকে ছড়ানো। ভাঙচুর অবস্থা। কোয়া এবং আইউংয়ের কোনও পাত্তা নেই।

হয়গ্রীবের মুখোমুখি

ডঃ ভাস্কোকে এখন কাকতাড়ুয়া দেখাচ্ছিল। ভাঙা গলায় অতিকষ্টে বললেন, "আমাদের এখনই দ্বীপ ছেড়ে পালাতে হবে। সাংঘাতিক জন্তুটা কোয়া এবং আইউং বেচারাকে নিশ্চয় মেরে ফেলেছে। এ আমারই পাপের ফল!"

তিনি হতাশ মুখে বলল, "আমাদের ভেলা দুটো ছিঁড়ে ফেলেছে। আইউংখুড়োর ক্যানোটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। আমরা চিচিনের ট্রলারে ফিরব কী করে? হায়! হায়! এবার বেঘোরে প্রাণটা যাবে! শুনেছি, ঘোড়া-মুখো দানোটার গায়ে গুলি বেঁধে না?"

কর্নেল বাইনোকুলারে ঝরনার দিকটা দেখছিলেন। বললেন, "আচ্ছা হালদারমশাই, হয়গ্রীবকে আপনি কোথায় দেখেছিলেন?"

হালদারমশাই উত্তেজনার উপশমে নস্যি নিচ্ছিলেন। বললেন, "একটা লোক উঁকি দিচ্ছিল দেখে তাকে ফলো করে যাচ্ছিলাম। ওদিকে পাহাড়ের একটা চাতালে হঠাৎ দেখি হয়গ্রীব। রিভলভারে গুলি বেরোল না। কী করব? পালিয়ে এলাম। আমাকে দেখে বিকট চিঁহিঁ করে দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে আসছিল।"

কর্নেল বললেন, "একটা খটকা লাগছে। ক্যাম্প থেকে ওই শৈলশিরার দূরত্ব সিধে অন্তত দু' মাইল। কাজেই এই ক্যাম্পে জন্তুটা হামা দিয়ে অতদূর পৌঁছতে হলে তার ডানা থাকা দরকার। হালদারমশাই! জন্তুটা দেখতে কেমন?"

ভয়পাওয়া গলায় গোয়েন্দাপ্রবর বললেন, "ধড় গোরিলার মতো। মুখ ঘোড়ার মতো। কালো কুচকুচে রং। লোমে ভর্তি।"

ডঃ ভাস্কো এবং তিকি ক্যাম্প টেনে সরাচ্ছিলেন। ডঃ ভাস্কো বললেন, "সর্বনাশ! রেডিয়ো ট্রান্সমিটারটা আছড়ে ভেঙেছে। খাবারের প্যাকেট বোঝাই পেটি দুটো দেখছি না। এ কী! অস্ত্রের বাক্সটাও নেই। এ কখনও জন্তুটার কাজ নয়।"

"নাহ।" বলে কর্নেল হঠাৎ ঝরনার দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর হাঁক দিলেন, "মিঃ আইউং, ভয় নেই। গাছ থেকে নেমে আসুন।"

দেখলাম, ঝরনার ধারে একটা ঝাঁকড়া গাছ থেকে আইউং নেমে এল। আমি এবং হালদারমশাই দৌড়ে গেলাম। আইউং বেজারমুখে বলল, "ছ্যা ছ্যা, কোয়া এত ভীতু জানতাম না! হঠাৎ আমাকে ফেলে পালিয়ে গেল। আমি ভাবলুম, ও দানোটাকে দেখেছে। তাই গাছে উঠে প্রাণ বাঁচালাম।" তারপর তার চোখ গেল ক্যাম্পের দিকে। "দানোটা তা হলে সত্যিই হানা দিয়েছিল ক্যাম্পে। সর্বনাশ! আমার ক্যানোটাকে ব্যাটা আস্ত রাখেনি দেখছি!"

কর্নেল বললেন, "আপনি ক্যাম্পের দিকে তাকাননি? কোনও শব্দ পাননি?"

"নাহ্। ভয়ে চোখ বুজে ছিলাম। আর ঝরনার যা বিচ্ছিরি শব্দ! কিছু শোনা যায় না!"

কর্নেল ক্যাম্পের কাছে ফিরে এসে বললেন, "ডঃ ভাস্কো! ক্যাম্প দুটো খাটাতে হবে। খাদ্যের

অভাব হবে না। দ্বীপে নারকোল আর ব্রেডফ্রুট আছে। ঝরনার জলে মাছের অভাব হবে না। নারকোল-খেকো কাঁকড়াও আছে। কী বলুন ভাই আইউং?"

আইউং দোনামনা করে সায় দিল। কিন্তু ডঃ ভাস্কো রুষ্ট হয়ে বললেন, "আপনারা থাকুন। আমরা আর এক মুহূর্ত এখানে থাকছি না। কোয়া নিশ্চয় হিংস্র জন্তুটার পাল্লায় পড়েছে। আবার আমাকে সরকারের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। চলো তিকি, আইউং এসো।"

আইউং বেজার মুখে বলল, "কিন্তু যাবেন কী করে কর্তা? ওদিকের খাড়িতে চিচিন আমাদের জন্য ট্রলার নিয়ে অপেক্ষা করছে। ট্রলারে পৌঁছতে হলে সাঁতার কাটতে হবে। জলে নামলেই হাঙর গিলে খাবে যে!"

এইসময় তিকি তাহিতি ভাষায় ডঃ ভাস্কোকে কিছু বলল। শুনেই উনি চমকে উঠলেন। আইউংয়ের মুখেও বিস্ময় লক্ষ করলাম। তারপর ফোঁস শব্দে শ্বাস ফেলে ডঃ ভাস্কো বললেন, "ঠিক আছে কর্নেল সরকার! আমরা থাকছি।"

কর্নেল হাসলেন, "কোয়ার বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দেওয়ার জন্য আপনার থাকা দরকার।"

বললাম, "তার মানে?"

"মানে যথাসময়ে বুঝবে ডার্লিং!" কর্নেল ক্যাম্পের তেরপলে হাত লাগালেন। "এসো তোমরাও হাত লাগাও!"

ক্যাম্প দুটো খাটানো হল। তিকি আইউংয়ের সঙ্গে গিয়ে ওর থলে এবং সাঁড়াশি নিয়ে এল। অনেক নারকোল আর কাঁকড়া ছিল থলেয়। খুশি হয়ে দেখলাম, ওরা এককাঁদি কলাও এনেছে। ঝরনার ধারে একটা কলাবনের খবর পাওয়া গেল। কর্নেল বললেন, "পলিনেশিয়ার সব দ্বীপে অজস্র কলাগাছ আছে। আমরা এগুলোকে বলি সিঙ্গাপুরি কলা। আসলে এ-সবই প্রকৃতির দান।"

ডঃ ভাস্কো কর্নেলের কাছে ক্ষমা চেয়ে আমাদের রিভলভার তিনটে ফেরত নিলেন। তিনটেই খেলনা মাত্র। ভাবতে বুক কেঁপে উঠল, হয়গ্রীবের কথা আলাদা—কিন্তু পেদ্রোর খুনির দলের হাত থেকে খেলনা অস্ত্র দিয়ে কি আত্মরক্ষাও করা যেত?

এবার ডঃ ভাস্কোর সত্যিকার রিভলভার কর্নেলের পাতলুনের পকেটে ঢুকল। তিকির কোমরে বেল্টে আটকানো হ্যন্ডগ্রেনেড ভর্তি ছোট্ট হ্যাভারস্যাক। সে তার রাইফেলটা আমাকে দিতে এলে হালদারমশাই ছিনিয়ে নিলেন। "জয়ন্তবাবুর কাম না। আমি চৌতিরিশ বৎসর পুলিশে চাকরি করছি। মিঃ টিকি, গিভ মি ওয়ান এক্সট্রা বুলেটকেস।"

অগত্যা কর্নেলের পরামর্শে আইউং তার দা দিয়ে একটা গাছের ডাল কেটে লাঠি বানাল। সেটা আমাকে দিয়ে আমুদে লোকটি বলল, "নাকে ঘা মারলে সব পালোয়ান জব্দ। এ আমাদের চিনা প্রবাদ কর্তা!"

কাঁকড়ার রোস্ট, রুটিফল, নারকোলের শাঁস আর কলা দিয়ে সুস্বাদু লাঞ্চ খাওয়ার পর কর্নেল বললেন, "আমরা ঝরনার ধার দিয়ে শৈলশিরার দিকে যাব। আমার ধারণা, প্রতিপক্ষ প্রস্রবণের কাছাকাছি কোথাও আছে। কারণ, ওখানেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানিরা ঘাঁটি করেছিল।"

ক্যাম্প-লুঠেরারা ভাগ্যিস টর্চগুলো নিয়ে যায়নি। আসলে প্রত্যেকের টর্চ ছিল ক্যাম্পখাটে বিছানার তলায়। ওরা বিছানা খাটসুদ্ধু উলটে ফেলেছে। টর্চগুলো বিছানার তলায় চাপা পড়েছিল।

নারকোলবনগুলো এড়িয়ে ফার্ন আর ফুলেঢাকা ঝোপের আড়াল দিয়ে আমরা সতর্ক দৃষ্টি রেখে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। একখানে আইউং একটা সাপকে দু' টুকরো করল। এবার প্রতিমুহূর্তে সাপের আতঙ্ক। কোথাও-কোথাও ঘাসে ঢাকা খোলা জমি আর পাথর। সেখানে আমরা পাথরের আড়ালে গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছিলাম। তারপর চড়াই শুরু হল। বাঁ পাশে ঝরনাধারার ছলছল শব্দ। উঁচু গাছের অরণ্যের ঢুকে কর্নেল চাপা স্বরে বললেন, "একে বলে রেনফরেস্ট।"

প্রতিটি গাছ থেকে ঘন লতাপাতার ঝালর নেমে এসেছে। আইউং দা দিয়ে সাবধানে ঝালরগুলো কেটে পথ করে দিচ্ছিল। আবছা আঁধার। কিন্তু কর্নেল টর্চ জ্বালতে নিষেধ করেছেন। সাপের আতঙ্কে লতা দেখলেই শিউরে উঠছিলাম। একবার আঁতকে উঠে লাঠির ঘা মেরে একটা লতাকে ছেতরে দিলাম।

সামনে খোলা পাথুরে জমি দেখা গেল। কর্নেলের ইশারায় আমরা থমকে দাঁড়ালাম। বাঁ দিকে পাথরের একটা প্রকাণ্ড প্রাকৃতিক চৌবাচ্চা দেখা যাচ্ছিল। ওটাই তা হলে প্রস্রবণ। সামনে ন্যাড়া পাথরের পাহাড়ের নিচে কয়েকটা ভাঙাচোরা পাথরের ঘর। কর্নেল বললেন, "জাপানিদের ঘাঁটির ধ্বংসাবশেষ। ওই পাঁচিলগুলো বাঙ্কার ছিল সম্ভবত। পাঁচিলে কামান এবং মেশিনগানের নল ঢোকানোর গর্তগুলো এখনও টিকে আছে।"

উনি বাইনোকুলারে দেখতে থাকলেন। হালদারমশাইও বাইনোকুলার চোখে রেখে হাঁটু দুমড়ে বসে পড়লেন। একটু পরে একটা বাঙ্কারের আড়াল থেকে একটা লোক বেরিয়ে চারদিক দেখে নিল। তার হাতে রাইফেল। শৈলশিরার ফাঁক দিয়ে আসা রোদের কাছে আসতেই চিনতে পারলাম তাকে। আমাদের গার্ড কোয়া!

ডঃ ভাস্কো রাইফেল তাক করতেই কর্নেল বাধা দিলেন। ডঃ ভাস্কো চাপা স্বরে বললেন, "বিশ্বাসঘাতক কোয়া তিকিকে গোপনে তার সঙ্গে পালাতে বলেছিল। গুপ্তধনের লোভ দেখিয়েছিল।"

কর্নেল বললেন, "একটু অপেক্ষা করুন।"

কোয়া প্রস্রবণের ধারে গিয়ে রাইফেল রেখে আঁজলা ভরে জল খেল। তারপর পায়ের জুতো খুলে পা চুবিয়ে বসে রইল। আইউং ফিসফিস করে বলল, "তাহিতির লোকের এই বিচ্ছিরি অভ্যাস! ঘন্টার পর ঘন্টা জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকবে।"

কর্নেলের ইশারায় আমরা ডাইনে ঘুরে জাপানি ঘাঁটির কাছাকাছি চলে গেলাম। মাত্র বিশ মিটার দূরত্ব। বাঙ্কারের পেছনে দু'জন লোক শাবল দিয়ে খুঁড়ছে। একজন পাশে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিচ্ছে। ডঃ ভাস্কো শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে বলে উঠলেন, "এ কী? এ যে দেখছি গিলম্যান।"

কর্নেল বললেন, "হ্যাঁ। আপনার সহকারী বিজ্ঞানী পিটার গিলম্যান।"

কর্নেল বাধা দেওয়ার আগেই ডঃ ভাস্কো একলাফে বেরিয়ে গর্জন করলেন, "নড়লেই খুলি উড়িয়ে দেব গিলম্যান!"

পিটার গিলম্যান একলাফে ওপরে একটা ভাঙা ঘরে ঢুকে গেল। ওর সঙ্গী দু'জনও ভ্যাবাচাকা খেয়ে ওকে অনুসরণ করল। কর্নেল দৌড়ে গেলেন। ততক্ষণে ডঃ ভাস্কো এবং তিকি সেখানে পৌঁছে গেছে। আইউং এবং আমি দিয়ে দেখি দুটো রাইফেল পড়ে আছে। ভাঙা ঘরের ভেতর কয়েকটা ক্যাম্পখাট এবং আরও কিছু জিনিস। আমাদের ক্যাম্প থেকে লুঠ করে আনা জিনিসপত্রও নিশ্চয় ওর মধ্যে আছে। ডঃ ভাস্কো এবং তিকি ঘরে ঢুকে উধাও হয়ে গেল।

ঘরগুলো শৈলশিরার গায়ে। বারকতক গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। কিন্তু হালদারমশাই কোথায় গেলেন? কর্নেল বাঙ্কারের শেষপ্রান্তে গিয়ে বললে, "বাঃ, হালদারমশাই, এই তো চাই!"

গিয়ে দেখি, হালদারমশাই সবে প্রস্রবণ থেকে উঠছেন। একেবারে বেড়ালভেজা অবস্থা। তবে ওঁর হাতে এখন দুটো রাইফেল। মুখের জল মুছে বললেন, "ব্যাটা বানর। পলাইয়া গেল।"

বুঝলাম, কোয়ার রাইফেল বাগাতে পারলেও তাকে বাগাতে পারেননি। গুঁড়ি মেরে গিয়ে আগে তার রাইফেল হাতিয়ে ছিলেন। ভাগ্যিস কোয়া এদিকে পেছন ফিরে বসে ছিল। কর্নেল উদ্বিগ্নমুখে বললেন, "ডঃ ভাস্কো ওদের তাড়া করে গেছেন। চলো তো দেখি।"

বাঙ্কারের রাইফেল দুটোতে গুলি ভরা ছিল। কর্নেল এবং আমি সে-দুটো নিলাম। হালদারমশাই ধপাস করে বসে পড়লেন। আমরা একটার পর একটা ঘর পেরিয়ে গিয়ে দেখি, শৈলশিরার প্রকাণ্ড ফাটলের পাশে একটা চাতালে দাঁড়িয়ে আছেন ডাঃ ভাস্কো এবং তিকি। ডঃ ভাস্কো হতাশ মুখে বললেন, "নিচের খাড়িতে ওদের মোটরবোট ছিল। পালিয়ে গেল। এখানে একটা মোটা শেকল ঝুলছে। এটা বেয়ে ওরা উঠে এসেছিল। এটা বেয়েই নেমে গেছে।"

কর্নেল বললেন, "জাপানি সেনাদের কীর্তি। তবে আশ্চর্য, শেকলটা এখনও ছিঁড়ে যায়নি!"

আমরা নিচে সেই বাঙ্কারে ফিরে এলাম। তারপর একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে আঁতকে উঠলাম। হালদারমশাই বাঙ্কারে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছেন। ভিজে রাইফেল দুটো তবু ছাড়েননি। মুখে আতঙ্কের ছাপ। তবু কাকে ধমক দিচ্ছেন,"আর আউগ্গাইলেই খুলি উড়াইয়া দিমু! আবার আউগ্গায়? শ্রীবিষ্ণুরে ডাকুম নাকি? দ্বাপরে ব্যাদ চুরি করছিলা। শ্রীবিষ্ণু তোমার ঘাড় মটকাইয়া মারছিলেন। মনে নাই।"

হ্যাঁ, সেই সাংঘাতিক হয়গ্রীবই বটে। কালো লোমে ঢাকা দু'পেয়ে প্রাণীটির মুখ অবিকল ঘোড়ার মতো। মোটাসোটা, হিংস্র দাঁত বেরিয়ে আছে। সে বিকট চিঁহিঁ করে উঠতেই কর্নেল আমাদের অবাক করে আচমকা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। প্রাণীটি অমনই ধরাশায়ী হল। ডঃ ভাস্কো, তিকি এবং আমি রাইফেল বাগিয়ে ঘিরে ধরলাম। কর্নেল একটানে ঘোড়ার মুন্ডুটা উপড়ে নিতেই এক সায়েবের মুখ দেখা গেল।

কর্নেল তার পিঠের বোতাম পটাপট ছাড়িয়ে ফেলে কালো লোমে ঢাকা খোলসটি খুলে ফেললেন। ডঃ ভাস্কো কিছু বলার আগেই তিকি বলে উঠল, "আরে। এ তো দেখছি সেই ফেরারি জলদস্যু জন হফগ্রিব!"

হালদারমশাই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "হঃ! হয়গ্রীব।"

ডঃ ভাস্কো সহাস্যে বললেন,"মার্কিন সরকার এর মাথার দাম ঘোষণা করেছে পঞ্চাশ হাজার ডলার! যাক। পূর্বপুরুষের গুপ্তধনের কিছুটা উসুল হবে। আইউং! তিকি! হফ্গ্রিবকে বেঁধে ফেলো। ওই ঘরে দড়ি আছে দেখলাম।"

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, "এর ডেরা খুঁজে বের করতে হবে। সেখানে একালের এই জলদস্যুর গুপ্তধন থাকতে পারে।"

হফগ্রিব মিঁউমিঁউ করে বলল, "আমার কোনও ডেরা নেই। গুপ্তধনও নেই! আমি প্রাণ বাঁচাতে এই দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছিলাম। বিশ্বাস করুন মশাইরা!"

ডঃ ভাস্কো ধমক দিলেন, "চুপ, তুমি খুনি। অমার তিনটে লোককে খুন করেছ।"

জন হফগ্রিবকে বন্দি করে ক্যাম্পে ফেরার পথে কর্নেল বললেন, "এই লোকটা কোকো দ্বীপের ভয়ঙ্কর কিংবদন্তির সুযোগ নিয়েছিল, যাতে কেউ সাহস করে দ্বীপে পা না দেয়। ওকে দেখেই সি-গাল পাখিরা ভয় পেয়েছিল। তবে ওর ডেরা নিশ্চয় আছে কোনও গুহায়। বাঘনখ জাতীয় অস্ত্রও আছে। ও গুলির শব্দ শুনে দেখতে এসেছিল কী ব্যাপার।"

হালদারমশাই হঠাৎ করুণ মুখে বললেন, "কিন্তু ফিরে যাব কেমন করে?"

আইউং হাসতে হাসতে বলল, "ভাববেন না। কলাগাছের ভেলা তৈরি করব। হাঙর কলাগাছের গন্ধ সহ্য করতে পারে না।"

ঘড়ি রহস্য

কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের প্রিয় পরিচারক ষষ্ঠীচরণের দু'দিন থেকে সামান্য সর্দিজ্বর। পাড়ার ডাক্তার তারকবাবু তাকে দেখতে এসেছিলেন। প্রচুর আশ্বাস দিয়ে এবং লম্বা-চওড়া প্রেসক্রিপশন লিখে তিনি আড্ডার মেজাজে বসলেন। দেশের হালচাল নিয়ে কিছুক্ষণ বকবক করে গেলেন। তারপর হঠাৎ মুচকি হেসে বললেন, "আচ্ছা কর্নেলসায়েব, আপনি তো বিখ্যাত রহস্যভেদী। এ যাবৎ বিস্তর জটিল রহস্য ফাঁস করেছেন শুনেছি। কিন্তু কখনও কি এমন কোনও কেস আপনার হাতে এসেছে, যার রহস্য ফাঁস করতে পারেননি?"

কর্নেল প্রেসক্রিপশনটা দেখছিলেন। বললেন, "প্রশ্নটা আপনাকেও করা যায়।"

ডাক্তারবাবু একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে বললেন, "কেন? কেন?"

"ডাক্তার হিসেবে আপনার সুনাম আছে। আপনি কি সব রোগীর সঠিক রোগ ধরতে পেরেছেন?"

ডাক্তারবাবু একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে বললেন, "কেন? কেন?"

"ডাক্তারবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "কোনও ডাক্তারই এমন দাবি করতে পারেন না।"

কর্নেল প্রেসক্রিপশনটা ভাঁজ করে টেবিলে রাখলেন। তারপর ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে সাদা দাড়ি থেকে চুরুটের ছাই ঝেড়ে বললেন, "আমার ক্ষেত্রেও তা-ই। কিছু কিছু রহস্য ফাঁস করতে শেষাবধি আমি ব্যর্থ হয়েছি।"

তারকবাবু আগ্রহ দেখিয়ে বললেন, "অন্তত তেমন একটা কেসের কথা বলুন। আমার জানতে ইচ্ছে করছে।"

কর্নেল চোখ বুজে চকচকে টাকে হাত বুলোতে শুরু করলেন। এবার আমারও খুব আগ্রহ হল। কারণ দীর্ঘকাল যাবৎ আমি ওঁর প্রায় ছায়াসঙ্গী। অসংখ্য জটিল রহস্য ওঁকে নিপুণ দক্ষতায় ফাঁস করতে দেখেছি। আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন, কোনও ক্ষেত্রে উনি ব্যর্থ হয়েছেন। তাই না বলে পারলাম না, "আশ্চর্য! কখনও তো আপনাকে ব্যর্থ হতে দেখিনি! তা ছাড়া তেমন কোনও কেসের কথা আপনি আমাকে বলেনওনি।"

"জয়ন্ত! তুমি সৈদাবাদ রাজবাড়ির জড়োয়া নেকলেস হারানোর ঘটনা ভুলে গেছ।"

মনে পড়ে গেল। বললাম, "কিন্তু নেকলেস হারানোটা যত রহস্যময় হোক, কে ওটা চুরি করেছে, আপনি তো জানতে পেরেছিলেন। এখন চোর যদি নিপাত্তা হয়ে যায়, আপনার কী করার আছে? খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার কাজটা পুলিশের।"

ডাক্তারবাবু অধীর আগ্রহে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, "একটু ডিটেলস বলুন কর্নেলসায়েব। রাজবাড়ির জড়োয়া নেকলেস যখন তখন নিশ্চয় প্রচুর দামি। কীভাবে ওটা চুরি গিয়েছিল?

কর্নেল বললেন, "সেটাই একটা জটিল রহস্য। সেই রহস্য আমি ফাঁস করতে পারিনি। নেকলেসটা নাকি রাজপরিবারের সৌভাগ্যলক্ষ্মীর প্রতীক। পরিবারে নতুন বউমা এলে বউভাতে জমকালো পার্টি দেওয়া হত। পার্টিতে নতুন বউমা নেকলেস পরে সিংহাসনে বসে থাকতেন। পার্টি শেষ হলে ওটা খুলে নিয়ে গিয়ে পাতালঘরে লক্ষ্মী প্রতিমার গলায় পরানো হত। এটাই ছিল বংশানুক্রমে রীতি। সে রাত্রে পার্টি শেষ হতে তখন প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে। হঠাৎ দেখা গেল বউমার গলায় নেকলেস নেই।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "জয়ন্তবাবু বলছেন আপনি নেকলেস চোরকে চিনতে পেরেছিলেন।"

"হ্যাঁ। কিছু সূত্র থেকে অনুমান করেছিলাম রাজবাড়ির জয়গোবিন্দ নামে এক কর্মচারী যেভাবেই হোক, নেকলেস চুরি করেছে। সে একা থাকত রাজবাড়ির একটা ঘরে। কিন্তু তার ঘরে শেষরাত্রে হানা দিয়ে দেখা গেল তল্পিতল্পা গুটিয়ে সে উধাও হয়ে গেছে। তবে রহস্যটা থেকে গেল। জয়গোবিন্দ কখন কীভাবে নেকলেস চুরি করল? হলঘরের পার্টিতে প্রচুর লোক ছিল। চোখধাঁধানো আলো ছিল। সবচেয়ে আশ্চর্য, নতুন বউমাও টের পাননি কখন তাঁর গলা থেকে নেকলেস উধাও হয়েছে।"

ডাক্তারবাবু ঘড়ি দেখে ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন। "উঠি কর্নেলসায়েব! এতক্ষণ রোগীরা আমার মুণ্ডপাত করছে।"

তারকডাক্তার চলে যাওয়ার পর কর্নেল একটু হেসে বললেন, "তারকবাবু ডাক্তার হিসেবে জনপ্রিয়। কিন্তু মশা মারতে কামান দেগেছেন। একে তো ষষ্ঠী ওষুধ খেতেই ভয় পায়, তাতে এত সব ক্যাপসুল, ট্যাবলেট, সিরাপ! তুমি একটু বোসো জয়ন্ত! দেখি, কাউকে দিয়ে ওষুধগুলো আনানো যায় নাকি।"

বললাম, "আমি এনে দিচ্ছি।"

এই সময় ডোরবেল বাজল এবং ড্রয়িং রুমের দরজায় পর্দার ফাঁকে অবাক হয়ে দেখলাম, ষষ্ঠীচরণ গিয়ে দিব্যি দরজা খুলে দিল। তারপর প্রায় তাকে ঠেলে সরিয়ে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক সটান এ-ঘরে এসে ঢুকলেন। নমস্কার করে কাঁচুমাচু মুখে তিনি বললেন, "কর্নেলসায়েবের মূল্যবান সময় নষ্ট করার জন্য দুঃখিত। দাদা বলে গেছেন, টাইম ইজ মানি। তো কাগজে আপনার কীর্তিকলাপ পড়েছি। ছবি দেখেছি। অনেক চেষ্টায় ঠিকানা জোগাড় করে ছুটে এসেছি। টাইম ইজ মানি। কিন্তু—"

ওঁর কথার ওপর কর্নেল বললেন, "আপনি বসুন। বলুন কী ব্যাপার।"

ভদ্রলোক সোফায় বসে রুমালে মুখ মুছে বললেন, "সব কথা গুছিয়ে বলতে সময় লাগবে। কিন্তু ওই যে বললাম! দাদা বলে গেছেন টাইম ইজ মানি! ইংরিজি প্রবাদ হলেও কথাটা সত্যি।"

ভদ্রলোক পাগল নন তো? একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, "বারবার বলছেন টাইম ইজ মানি! অথচ নিজেই টাইম নষ্ট করছেন।"

ভদ্রলোক চটে গিয়ে বললেন, "আমার কথা হচ্ছে কর্নেলসায়েবের সঙ্গে।"

কর্নেল হেসে ফেললেন। "ঠিক। তবে উনি একজন সাংবাদিক। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার রিপোর্টার জয়ন্ত চৌধুরি। আপনি নিশ্চয় জানেন, রিপোর্টাররা সবকিছুতে খবর খোঁজেন?"

কী সৌভাগ্য! আপনি আমার এই খবরটা দয়া করে লিখুন! বজ্জাতদের মুখোশ খুলে দিন। হ্যাঁ, এবার খবরটা সংক্ষেপে বলি। কারণ, টাইম ইজ মানি।"

বলে উনি কর্নেলের দিকে ঘুরে বসলেন। "আগে আমার নাম-ঠিকানা বলি। আমার নাম প্রাণনাথ রায়। সাতাশ বাই তিন, নকুড় মিস্ত্রি লেনে একটা মেসবাড়িতে একখানা আলাদা ছোট্ট ঘরে থাকি। চাকরি করি মতিলাল ট্রেডিং কোম্পানিতে। তো কিছুদিন থেকে একটা ভূতুড়ে ঘটনা লক্ষ করছি। ধরুন, টেবিলে যে পাঁজিখানা যেখানে রেখে বেরিয়েছিলাম, বাসায় ফিরে দেখি, সেখানা ঠিক সেইখানে নেই। কিংবা ধরুন, যে শার্টটা হ্যাঙারে যেভাবে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম, ফিরে এসে, দেখি, সেটা সেইভাবে ঝোলানো নেই। একটা কাঠের ছোট্ট আলমারি আছে। তার তালা তেমনই আটকানো। অথচ ভেতরকার জিনিসপত্র এদিক-ওদিক হয়ে আছে। রোজ বিকেলে ছড়ি হাতে পার্কে বেড়াতে যাওয়ার অভ্যাস। কাল ছড়িটা দেখি, ব্র্যাকেটের যেখানে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম, সেখানে নেই। এইরকম অসংখ্য ব্যাপার প্রতিদিন ঘটছে। আমি এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি

না। চোর ঢুকলে তো সে কিছু চুরি করত। কিন্তু এ-পর্যন্ত কিছুই চুরি যায়নি। আমার সন্দেহ হয়েছিল, কেউ বজ্জাতি করে আমাকে তাড়াতে চাইছে। কিন্তু গত রাত্রে হঠাৎ একটি শব্দে ঘুম ভেঙে যেতেই টেবিলবাতি জ্বেলে দেখি কাঠের আলমারিটা নড়ছিল। সদ্য থেমে গেল। আতঙ্কে সারা রাত্রি আর ঘুম হয়নি। তো টাইম ইজ মানি। আর দেরি করা চলে না। আপনার শরণাপন্ন না হয়ে উপায় ছিল না।"

কর্নেল চুপচাপ শুনছিলেন। এতক্ষণে বললেন, "আপনার ঘরে কোনও দামি জিনিস আছে?"

"নাহ্। যৎসামান্য টাকাকড়ি ব্যাঙ্কে রাখি। এই রিস্টওয়াচটা যদি দামি বলেন, এটা প্রায় সারাক্ষণ আমার হাতে বাঁধা থাকে। শুধু স্নানের সময় টেবিলে খুলে রেখে যাই। কিন্তু এটা চুরি হয়নি।"

"আপনার দাদার নাম কী?"

"আমার দাদার নাম ছিল হরনাথ রায়।"

"তিনি বেঁচে নেই?"

"আজ্ঞে না। এখন আমি মেসবাড়ির যে-ঘরে থাকি, দাদা সেখানেই থাকতেন। বাউণ্ডুলে ছন্নছাড়া প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। বিয়ে করেননি। আমার সঙ্গে বহু বছর দাদার কোনও যোগাযোগ ছিল না। হঠাৎ দু'মাস আগে টেলিগ্রাম পেলাম, হার্ট অ্যাটাক হয়ে দাদা হাসপাতালে আছেন। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলাম কলকাতা।"

"আপনি কোথায় ছিলেন তখন?"

"সাহেবগঞ্জে। আমার কোম্পানির একটা ব্রাঞ্চ আছে সেখানে। আমাদের পৈতৃক বাড়িও সেখানে। আমার ফ্যামিলি এখনও সাহেবগঞ্জে আছে।"

"তারপর কী হল বলুন।"

"হাসপাতালে দাদা তখন মরণাপন্ন। আমাকে চিনতে পেরে শুধু বললেন, "পানু! টাইম ইজ মানি। কথাটা মনে রাখিস!" ব্যস! ওই শেষ কথা।"

"কথাটা একটা ইংরেজি প্রবচন। যাই হোক, তারপর?"

"দাদার শেষকৃত্য করে কোম্পানির হেড অফিসে গেলাম। আমার অনেকদিনের ইচ্ছে ছিল কলকাতায় বদলি হওয়ার। হেড অফিসে থাকলে অনেক সুযোগসুবিধে, বুঝলেন তো?"

"বুঝলাম। কোম্পানি তা হলে আপনাকে কলকাতায় বদলি করল?"

"আজ্ঞে। দাদার সঙ্গে মেসের ম্যানেজার প্রভাতবাবুর বন্ধুতা ছিল। তাই দাদার ঘরটা আমাকে একই ভাড়ায় ছেড়ে দিলেন।"

"ওই ঘরে তো আপনার দাদার জিনিসপত্র ছিল?"

"ছিল। একটা তক্তাপোশ, বিছানাপত্তর, চেয়ার টেবিল, একটা সুটকেস, একটা ছোট্ট কাঠের আলমারি—এইসব।"

"আর কিছু?"

প্রাণনাথবাবু একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "আর তেমন কিছু—হ্যাঁ! একটা প্রকাণ্ড দেওয়ালঘড়ি। ঘড়িটা অচল। দাদা কেন ওটা কিনেছিলেন, কেনই বা আর সারাননি, কে জানে! আমি ওটা বেচে দেব ভেবেছিলাম। কিন্তু দাদার স্মৃতি।"

কর্নেল হাসলেন। "হ্যাঁ। টাইম ইজ মানি।"

প্রাণনাথবাবু সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, "কথাটা দাদা বলেছিলেন। সেই থেকে কেন কে জানে কথাটা আমাকে ভূতের মতো পেয়ে বসেছে।"

"আমাকেও।" বলে কর্নেল চুরুট ধরালেন। একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে ফের বললেন, "আপনার ঘরের ভূতুড়ে ঘটনার কথা কি ম্যানেজার প্রভাতবাবু কিংবা আর কাউকে বলেছেন?"

"প্রভাতবাবুকে বলেছিলাম।"

"উনি কী বলেছিলেন?"

"উনি হেসে উড়িয়ে দিলেন। বললেন, আপনার দাদাও ঠিক একই কথা বলতেন।"

প্রাণনাথবাবু এবার চাপা গলায় বললেন, "ওই মেসবাড়িতে যাওয়ার পরদিন মেসের একজন বোর্ডার ননীবাবু আমাকে বলেছিলেন, ওই ঘরে নাকি ভূত আছে। বহুবছর আগে কে নাকি আত্মহত্যা করেছিল।"

"ঠিক আছে। টাইম ইজ মানি। আমরা আজ বিকেল পাঁচটা নাগাদ আপনার বাসায় যাব। তবে আপনি যেন কথাটা গোপন রাখবেন। আমরা আপনার কোম্পানির অফিসার হিসেবে যাব।"

প্রাণনাথবাবু আশ্বস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন। কর্নেল অভ্যাসমতো টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, "কী বুঝলে জয়ন্ত?"

"ম্যানেজার ওঁকে তাড়াতে চাইছেন। কারণ নতুন বোর্ডার ঢোকাতে পারলে বেশি ভাড়া এবং সেলামিও পাবেন।"

"তাড়াতে চাইলে হরনাথবাবুর মৃত্যুর পর ওঁকে একই ভাড়ায় থাকতে দিলেন কেন?"

"তা হলে কোনও বোর্ডার—ধরুন, এই ননীবাবু ঘরটা পাওয়ার জন্য ওঁর পেছনে লেগেছেন।"

কর্নেল হাসলেন। "টাইম ইজ মানি। কথাটা গুরুত্বপূর্ণ ডার্লিং!"

বিরক্ত হয়ে বললাম, "কথাটা দেখছি সত্যিই ভূতের মতো আপনাকে পেয়ে বসেছে।"

"হ্যাঁ। ওটাই আসলে ভূত। সেই ভূতের উপদ্রব ঘটেছে প্রাণনাথবাবুর ডেরায়।" বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। "নিচের ফ্ল্যাটের লিন্ডার দাদা গোম্‌সকে দিয়ে ষষ্ঠীর ওষুধগুলো আনিয়ে নিই। তুমি বোসো। দু'জনে আজ রান্নাবান্না করব। তারপর বিকেলে নকুড় মিস্ত্রি লেনে যাব।"

দোতলা মেসবাড়িটা খুঁজে বের করতে অসুবিধে হয়নি। ঘিঞ্জি গলির বাঁকের মুখে একটা ছোট্ট পার্ক দেখা যাচ্ছিল। প্রাণনাথবাবু নিচে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বাড়ির একতলায় দোকানপাট। দোতলায় মেস। শেষপ্রান্তে প্রাণনাথবাবুর ডেরা। তার লাগোয়া ম্যানেজারের ঘর। সেই ঘরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় প্রাণনাথবাবু ম্যানেজার প্রভাতবাবুকে জানিয়ে গেলেন, ওঁর কোম্পানির অফিসাররা 'ইমপর্ট্যান্ট' কাজে এসেছেন। প্রভাতবাবু চেয়ারে বসেই করজোড়ে নমস্কার করলেন। ভদ্রলোক রোগা এবং বেঁটে। মুখে অমায়িক ভাব। তালা খুলে প্রাণনাথবাবু বললেন, "আপনারা দয়া করে একটু বসুন। আমি চায়ের ব্যবস্থা করে আসি।"

"টাইম ইজ মানি!" বলে কর্নেল দেওয়ালঘড়িটার দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলেন। ঘড়ির কাঁটা বারোটা তিরিশে থেমে আছে।

বললাম, "একেই বলে বারোটা বেজে যাওয়া।"

কর্নেল আমার রসিকতায় কান দিলেন না। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে গিয়ে তার ওপর উঠে আতস কাচ বের করলেন। একটু পরে বললেন, "ডায়ালে কিছু কথা লেখা ছিল। ঘষে ফেলা হয়েছে। তবে ঘড়িটা বিলিতি এবং খুব দামি। হরনাথ কিংবা তাঁর পূর্বপুরুষকে কেউ হয়তো উপহার দিয়েছিল।"

চেয়ার থেকে নেমে কর্নেল চেয়ারটা আগের জায়গায় রেখে কাঠের আলমারিটার কাছে গেলেন। উঁকি মেরে পেছন দিক দেখে আপন মনে বললেন, "সত্যিই এটা নাড়ানো হয়েছে। ডান দিকের দুটো পায়া ইঞ্চিটাক সরে এসেছে।"

এইসময় প্রাণনাথবাবু ফিরে এলেন। তাঁর হাতে চায়ের দুটো কাপপ্লেট। বললেন, "আগে চা খেয়ে নিন আপনারা। তারপর সব দেখাচ্ছি।"

কর্নেল বললেন, "আপনি এই আলমারিটা খুলুন।"

"খুলছি। ওতে দাদার জামাকাপড় আর বইপত্তর ছাড়া কিছু নেই।"

প্রাণনাথবাবু কাঠের আলমারিটা খুলে দিলেন। কর্নেল আলমারির ভেতর যেন তল্লাশ শুরু করলেন, "আপনার দাদার সেই সুটকেসটা দেখতে চাই।"

চামড়ার সুটকেসেও কিছু জামাকাপড় আর-একটা ফাইল পাওয়া গেল। ফাইলের কাগজপত্র দেখে কর্নেল বললেন, "আপনার দাদা দেখছি শেয়ার মার্কেট ব্রোকার ছিলেন!"

"তাই বুঝি? আমি কিন্তু দাদার কোনও কাগজপত্র এখনও খুঁটিয়ে দেখিনি।"

"আপনি ম্যানেজার প্রভাতবাবুকে ডাকুন। ওঁর সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে চাই।"

প্রাণনাথবাবু অবাক হয়ে বললেন, "ওঁকে ডাকা কি ঠিক হবে?

"আপনি ওঁকে ডাকুন।"

কর্নেলের কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা ছিল। প্রাণনাথবাবু বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু উনি বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওঁকে পাশ কাটিয়ে প্রভাতবাবুর আবির্ভাব হল। প্রাণনাথও ফিরে এলেন। আমার সন্দেহ হল, প্রভাতবাবু দরজার পাশেই হয়তো আড়ি পেতে দাঁড়িয়েছিলেন। কর্নেল বললেন, "আসুন প্রভাতবাবু, আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।"

প্রভাতবাবু মিটিমিটি হেসে বললেন, "আমি বুঝতে পেরেছি, আপনারা লালবাজার থেকে এসেছেন। তবে সার, বড্ড দেরি করে এসেছেন। মরার আগে হরনাথ চোরাই জিনিস হাফিজ করে গেছে।"

কর্নেল বললেন, "চোরাই জিনিস। তার মানে?"

"মানে আপনারা ভালোই জানেন! তবে আমি সার ওসব সাতে-পাঁচে ছিলাম না। হরনাথ আমাকে বলত বটে, 'খদ্দের দেখে দাও। সিকিভাগ তোমার।' আমি ওকে পাত্তা দিইনি।"

"কিন্তু জিনিসটা কী?"

"খুলে কিছু বলেনি হরনাথ। কাজেই জিনিসটা কী আমি জানি না। শুধু এইটুকু জানি, জিনিসের দাম ছিল বড্ড বেশি। হরনাথ আভাস দিয়েছিল লাখের ওপরে দাম। আমার মালিক ভদ্রলোক, যাঁর এই মেসবাড়ি, তিনি কোটিপতি লোক। হরনাথ গোপনে তাঁর কাছেও গিয়েছিল। কিন্তু তিনিও কিনতে সাহস পাননি। আমাকে বলেছিলেন, 'ওই লোকটাকে তাড়াও।' কিন্তু তাড়াব কী করে? এ পাড়ার সব গুণ্ডা, বদমাশ ছিল হরনাথের হাতে।"

প্রাণনাথ ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, "এসব কী বলছ প্রভাতদা! আমার দাদা—"

প্রভাতবাবু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "খাল কেটে কুমির এনেছ। এখন তুমিই ঠেলা সামলাও পানু! আমাকে এসব ব্যাপারে জড়িয়ো না।"

বলে উনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। প্রাণনাথবাবু ধপাস করে বিছানায় বসে বলেন, "আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। আমার দাদা বাউন্ডুলে ছন্নছাড়া ছিলেন বটে, কিন্তু ওঁকে চোর অপবাদ কেউ কস্মিনকালে দেয়নি। আর দামি চোরাই জিনিস যদি ওঁর কাছে থাকবে, আমি তার খোঁজ পাব না? যদি বেচে দিয়েও থাকেন, সেই টাকাই বা গেল কোথায়?"

কর্নেল চুরুট ধরালেন। আমি বললাম, "এবার মনে হচ্ছে, আপনার ঘরে কেউ আপনার দাদার চোরাই জিনিস বা তা বিক্রি করা টাকা খুঁজতেই ঢোকে।"

প্রাণনাথবাবু প্রায় আর্তনাদ করলেন, "তেমন কিচ্ছু এ ঘরে নেই।"

কর্নেল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, "আপনার দাদা বলেছিলেন টাইম ইজ মানি। তাই না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"টাইমের সঙ্গে ঘড়ির সম্পর্ক আছে। আপনি ঘড়িটা সারাতে দিচ্ছেন না কেন?"

"সারাতে অনেক টাকা লাগবে। অত টাকা পাব কোথায়?"

"আমি নিজের খরচে সারিয়ে দেব। আমার ধারণা, ঘড়িটা চালু হলে আপনার ঘরে আর ভূতের উপদ্রব হবে না। ওই অচল ঘড়িই আপনার ঘরে ভূত ডেকে আনছে।"

প্রাণনাথবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

কর্নেল চেয়ার টেনে নিয়ে দেওয়ালঘড়ির তলায় গেলেন। তারপর চেয়ারে উঠে প্রকাণ্ড ঘড়িটা নামিয়ে আনলেন। বললেন, "দিনসাতেক পরে আমার কাছ থেকে এটা ফেরত দিয়ে আসবেন। কোনও বড় কোম্পানিতে এটা সারাতে দেব।"

ইলিয়ট রোডে তিনতলার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে কর্নেল ঘড়িটা খুলতে শুরু করলেন। বললাম, "সব ছেড়ে এই ঘড়ি নিয়ে পড়লেন কেন?"

কর্নেল হাসলেন, "কারণ টাইম ইজ মানি।"

"কর্নেল! আমার ভয় হচ্ছে এই অচল ঘড়ি আপনার মগজও অচল করে দিয়েছে।"

ডায়ালের কাচ খুলে আতস কাচ রেখে কী দেখতে দেখতে কর্নেল বললেন, "এবার স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে। প্রেজেন্টেড টু মিঃ জয়গোবিন্দ রায় ফর হিজ সিনসিয়ার সার্ভিস অ্যান্ড অনেস্টি, অন দা অকেশন অব কুমারবাহাদুর প্রমথনারায়ণ চৌধুরি'স সেভেনটি ফার্স্ট বার্থ অ্যানিভার্সারি...."

চমকে উঠলাম। "কর্নেল! এটা তো তা হলে সৈদাবাদ রাজবাড়ির উপহার। এই উপহার হরনাথের হাতে গেল কী করে?"

"ডার্লিং! হরনাথই জয়গোবিন্দ। হরনাথের সুটকেসের ভেতর কয়েকটা পুরনো নেমকার্ড খুঁজে পেয়েছি। এই দ্যাখো, হরনাথ নাম ভাঁড়িয়ে রাজবাড়িতে কেয়ারটেকারের চাকরি জুটিয়েছিল।"

"বুঝেছি। কিন্তু জড়োয়া নেকলেসটা গেল কোথায়?"

"ভুলে যাচ্ছ জয়ন্ত! মৃত্যুর সময় হরনাথ বলেছিল, 'পানু! টাইম ইজ মানি। কথাটা মনে রাখিস।' পানুবাবু সূত্রটা বুঝতে পারেননি। নেকলেস চুরি যায় রাত সাড়ে বারোটায়। এই ঘড়ির কাঁটা তাই সাড়ে বারোটায় রেখেছিল হরনাথ। আর নেকলেসটা—" বলে কর্নেল ডায়াল খুলে ফেললেন এবং ভেতর থেকে একটা লাল ভেলভেটে মোড়া প্যাকেট বের করলেন। প্যাকেট খুলতেই দেখা গেল ঝলমলে হিরে-মুক্তোবসানো সোনার ঝালর দেওয়া একটা জড়োয়া নেকলেস। কর্নেল মিটিমিটি হেসে ফের বললেন, "টাইম ইজ মানি! তবে হরনাথ কীভাবে নেকলেসটা চুরি করেছিল, এখন বুঝতে পারছি। এই দ্যাখো, পিঠের দিকে নেকলেসটার ক্লিপ ঠিকভাবে আঁটা নেই। সহজেই খোলা যায় কিংবা নিজে থেকেও খুলে পড়তে পারে। বিয়ের পার্টিতে নতুন বউমা নিশ্চয় ঘুমে ঢুলছিলেন। সেই সময় নেকলেস খসে পড়ে থাকবে। কেয়ারটেকার উপহারসামগ্রীর দায়িত্বে ছিল। সে সুযোগটা ছাড়েনি। ক্লিয়ার?"

সায় দিয়ে বললাম, "অল ক্লিয়ার। টাইম ইজ মানি, এটাও ক্লিয়ার।"

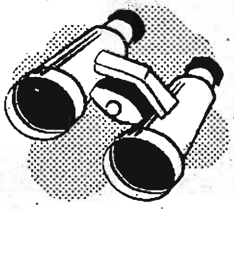

ব্ল্যাক প্যান্থার রহস্য

সেবার অক্টোবরে ধরমতাল হ্রদ দেখে লোহাগড় ফেরার পথে বিকেল হয়ে গেল।

ওটা আসলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে মৃত একটা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ। হাজার-হাজার বছর ধরে বর্ষার জল জমে বিশাল হ্রদ হয়েছে। মধ্যিখানে ক্ষুদে দ্বীপের মতো কয়েকটা জঙ্গুলে জলটুঙি।

আমার বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ বন্ধু বাইনোকুলারে কোনও জলটুঙির শীর্ষে কবে নাকি সেক্রেটারি বার্ড আবিষ্কার করে গিয়েছিলেন। এবারকার অভিযান তার ছবি তুলতে। দুঃখের বিষয়, সেবার তাঁর ক্যামেরায় টেলিলেন্স ছিল না। এবার তাই টেলিলেন্স এনেছিলেন।

সেক্রেটারি বার্ডকে বাংলায় 'কেরানি পাখি বলা হয়। কারণ সারসজাতীয় এই পাখিকে দেখলে মনে হয় কানে কলম গোঁজা আছে। কিন্তু ধুরন্ধর প্রকৃতিবিদের চেয়ে পাখিটা আরও ধুরন্ধর। কয়েক ঘন্টা ছুটোছুটি, বাইনোকুলারে খোঁজাখুঁজি এবং ক্যামেরার টেলিলেন্স তাক করা ব্যর্থ হল। কতবার টুপি খসে গিয়ে ওঁর টাক চকমক করল। সাদা সান্তাক্লজ দাড়িতে মাকড়সা জালসমেত আটকে গেল। অবশেষে লোহাগড় খনিজ সম্পদ দফতরের পাবলিক রিলেশন অফিসার (পি আর ও) ইকবাল আমেদ তাড়া দিলেন, "কর্নেল, এবার ফেরা যাক। এলাকার পরিস্থিতি ভাল নয়। কয়েকটা জঙ্গি গেরিলা গ্রুপ মাথাচাড়া দিয়েছে। হাইওয়েতে প্রায়ই হামলা চালায় ওরা। আমার আগের পি. আর. ও—"

তাঁকে থামিয়ে কর্নেল তুম্বোমুখে বললেন, "শুনেছি। তবে আলো কমে আসছে। চলো, ফেরা যাক।"

আমাদের জিপে প্রায় তিন কিলোমিটার সঙ্কীর্ণ বিচ্ছিরিরকমের উতরাই পথ দিয়ে নেমে হাইওয়েতে পৌঁছলাম। সেই সময় হঠাৎ কর্নেল বললেন, "আমেদ, চা খাব।"

আমেদ জিপ থামিয়ে বললেন, "এখানে চা খাবেন কী! পাবেন কোথায়?"

প্রকৃতিবিদ জিপ থেকে নেমে অমায়িক হাসলেন। "পাহাড়ি রাস্তার ধারে নিরিবিলি চায়ের আড্ডায় একটু বসলে ক্লান্তি দূর হয়। চলে এসো!"

পাশেই শালপাতার ছাউনি-দেওয়া একটা চায়ের দোকান চোখে পড়ল। চাওয়ালার চেহারা আদিবাসীর। একা বসে ঝিমোচ্ছিল সে। আমাদের দেখে ব্যস্তভাবে উনুনে লকড়ি গুঁজে দিল। গাছের ডাল দিয়ে তৈরি বেঞ্চে আমরা বসলাম। উদ্বিগ্ন আর বিরক্ত মুখে তরুণ পি. আর. ও ঘনঘন ঘড়ি দেখছিলেন। কর্নেল চাওয়ালার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন। ওঁর গল্প মানে পাখি, প্রজাপতি, অর্কিডের খোঁজখবর। তবে চাওয়ালা হাইওয়ের ওধারে পাহাড় দেখিয়ে শুধু একটা শম্বর হরিণের খবর দিচ্ছিল, যার শিং নাকি গোনা যায় না।

হাইওয়েতে দিনশেষে যানবাহনের আনাগোনা এখন সত্যিই কম। আমরা চা খেতে-খেতে একটা সবুজ অ্যাম্বাসাডার বাঁক ঘুরে এসে গতি কমাল। তারপর চায়ের দোকানের সামনে থেমে গেল। পেছনের সিটে দু'জন প্রৌঢ় ছিলেন। একজন মুখ বাড়িয়ে হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলেন, "বরমদেও থান আর কতদূর?"

চাওয়ালা ভাঙা হিন্দিতে বলে দিল, "সামনে ব্রিজ পেরিয়ে গিয়ে ডাইনে জঙ্গলের ভেতর বটের ডগায় লাল কাপড় উড়ছে দেখবেন।"

গাড়িটা চলে গেল। আমেদ বাঁকা মুখে হাসলেন। "বাইরের লোক। নইলে ঝুঁকি নিত না।"

কর্নেল বললেন, "বাঙালি। বাঙালির হিন্দিটা সহজে রপ্ত হয় না। তা ছাড়া বাঙালি সম্ভবত বাতিকগ্রস্ত জাত। আমাকে একটা সেরা নমুনা বলতে পারো। কাজেই অবেলায় বরমদেও নামে কোনও দেবতার থান দর্শনে যাত্রা বাঙালির পক্ষেই স্বাভাবিক। কিন্তু খটকা খটকা লাগছে।" বলে উনি বাইনোকুলারে গাড়িটা দেখতে থাকলেন।

আমেদ বললেন, "কিসের খটকা?"

কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে চায়ে চুমুক দিলেন। "অপূর্ব"! বলে আমাদের দিকে ঘুরলেন। "গাড়ির পেছনে কাচে লেখা আছে আলফা ট্রেডিং কোম্পানি, তারাপুর।"

আমেদ বললেন, "তারাপুর প্রায় উনিশ-কুড়ি কিলোমিটার আগে। সেখানে অনেক বাঙালি আছে। কিন্তু খটকাটা কিসের?"

"ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালি আজকাল পিছিয়ে পড়েছে। সিদ্ধি-দাতা গণেশ যেন কোনও কারণে অপ্রসন্ন। বরমদেও কি ঠেকাতে পারবেন?"

আমেদ চা শেষ না করেই উঠে দাঁড়ালেন। ঘড়ি দেখে বললেন "আমাদের এখনও তিরিশ কিলোমিটার যেতে হবে। পৌনে পাঁচটা বাজে।"

তাঁর তাড়ায় উঠে পড়তে হল। জিপ চালানোয় তাঁর দক্ষতা ধরমতাল রোডে দেখছি। নদীর ব্রিজে পৌঁছে দূরে উতরাইয়ের নিচে সেই সবুজ অ্যাম্বাসাডার চোখে পড়ল। দু'ধারে ঘন জঙ্গল আর বড়-বড় পাথর। আমেদ সম্ভবত জঙ্গি গেরিলাদের আতঙ্কে জিপ ছোটাচ্ছিলেন। সবুজ গাড়িটার কাছে যাওয়ার আগেই কর্নেল বলে উঠলেন, "রোখো, রোখো, জাস্ট আ মিনিট।"

আমেদ অগত্যা ব্রেক কষলেন। কর্নেল নেমে গিয়ে বললেন, "বরমদেও নিশ্চয় ব্রহ্মদেব। সম্ভবত ব্রহ্মা, ব্রহ্মার মন্দির এ-যাবৎ একটিই আবিষ্কৃত হয়েছে। দ্বিতীয়টি আবিষ্কারের কৃতিত্ব আমারই হোক—চান্স ছাড়তে চাই না।"

উনি হন্তদন্ত ডাইনের জঙ্গলে ঢুকলেন। একফালি পায়ে-চলা পথ দেখা যাচ্ছিল। সবুজ গাড়িটার মুখ এখন উলটো দিকে ঘোরানো। ড্রাইভার হেলান দিয়ে চোখ বুজে আছে। নাইট ডিউটির পর ঘুমনোর সময় পায়নি নাকি? জিপের শব্দেও চোখ খুলল না।

আমেদ নামলেন না। আমি নেমে গেলাম। ব্রহ্মামন্দির দর্শনের কৌতূহল জেগেছিল। পায়ে-চলা পথে এগিয়ে গেলাম। দু'পাশে বড়-বড় পাথরও পড়ে আছে। সামনে বিশাল বটগাছের তলায় পাথরের বেদির কাছে কর্নেল বাঁ দিকে ঘাসের ওপর ঝুঁকে কিছু দেখছিলেন। এতক্ষণে সোজা হলেন। তারপর ক্যামেরা তাক করলেন। ফ্লাশগান কয়েকবার ঝিলিক দিল। কাছে গিয়ে বললাম, "শুধু বেদি দেখছি! মূর্তি নেই?"

কর্নেল নির্বিকার মুখে শান্তভাবে বললেন, "শিগগির আল্‌ফা কোম্পানির ড্রাইভার আর আমেদকে ডাকো।"

"কেন?"

"সদ্য একটা মার্ডার হয়েছে। ওই দ্যাখো।"

প্রায় ঝাঁপ দিয়ে এগিয়ে দেখি, ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা একটা লোক বেদির নিচে বাঁ-পাশে ঘাসের ভেতর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মাথার পেছনে টাটকা রক্ত। রক্ত তখনও গড়িয়ে পিঠে আর ঘাসে পড়ছে। আমার মাথা ঘুরে গেল। কর্নেলের সঙ্গদোষে এ-যাবৎ অনেক খুনখারাপি দেখেছি। তাই হয়তো ভিরমি খেয়ে পড়ে গেলাম না। কর্নেল বললেন, "হাঁ করে কী দেখছ? ওদের খবর দাও।"

দৌড়ে গিয়ে আমেদকে বললাম, "মার্ডার! মার্ডার! কর্নেল ডাকছেন!"

আমেদ প্রলাপ বকতে থাকলেন, "কর্নেলকে চলে আসতে বলুন, কর্নেলকে ডাকুন!"

সবুজ গাড়ির ড্রাইভার আমার ডাকাডাকিতে চোখ খুলে প্রথমে বলল, "নেহি! কৈ টেরাক

পাকাড় লিজিয়ে।” তারপর আমার বিদঘুটে হিন্দিতে ঘটনা শুনে সে কী বুঝল জানি না, আস্তেসুস্থে বেরিয়ে গদাইলশকরি চালে থানের পথে পা বাড়াল। আমেদ তখনও প্রলাপ বকছেন।

পরে শুনেছিলাম, আগের পিআরও-র মুক্তিপণের টাকা সরকারি লালফিতের ফাঁসে আটকে পড়ার দরুন জঙ্গিরা তাঁর মৃতদেহ ফেরত পাঠিয়েছিল।

তো আমেদকে কিছুতেই ধাতস্থ করা যাচ্ছিল না। তখন আবার থানের দিকে ছুটে গেলাম। আলফা কোম্পানির ড্রাইভার আচমকা আমাকে প্রায় ধাক্কা মেরে গাড়ির দিকে চলে এল। তারপর গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম। কর্নেল অকুস্থলের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। উত্তেজিতভাবে বললাম, “ড্রাইভারটা পালিয়ে গেল যে!”

কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রেখে বললেন, “পালায়নি। কুঁয়ারডি থানায় খবর দিতে গেল।”

“এঁর সঙ্গী ভদ্রলোক কোথায় গেলেন?”

বাইনোকুলার নামিয়ে কর্নেল বললেন,“যাচ্ছেতাই জঙ্গল আর পাথর। জঙ্গিদের দেখতে পাওয়া অসম্ভব।”

বুক ধড়াস করে উঠল। “জঙ্গি মানে?”

“আমেদ ঠিকই বলেছিল।” বলে কর্নেল পকেট থেকে একটা ভাঁজকরা কাগজ দিলেন। “ডেডবডির পাশেই একটুকরো পাথর চাপিয়ে রাখা ছিল এটা।”

কাগজটা খুলে দেখি একটা লেটারহেড। ওপরে ছুটন্ত একটা কালো চিতাবাঘের ছবি। হিংস্র মুখটা এদিকে ঘুরে আছে। তার নিচে ইংরেজিতে ছাপানো ‘ব্ল্যাক প্যান্থার লিবারেশন ফ্রন্ট’। তারপর লাল কালিতে যে কথাগুলো ছাপানো, বাংলায় মোটামুটি তা এরকম :

> নিপীড়িত মানবতার স্বার্থে একটি ছারপোকা আটক করা হয়েছে। এর মুক্তিপণ তিন লক্ষ টাকা। কান্হো প্রপাতের মাথায় যে গুহা আছে, তার মধ্যে টাকা রেখে রেখে এলে এর মুক্তি। পুলিশ নাক গলালে মৃতদেহ ফেরত যাবে। ৪৮ ঘন্টা সময় দেওয়া হল।....

আমার হাত কাঁপছিল। কাগজটা কর্নেলকে ফেরত দিলাম। কর্নেল বললেন, “তুমি গিয়ে আমেদের কাছে থাকো। বেচারার নার্ভাস হয়ে পড়া স্বাভাবিক। তুমি থাকলে ও সাহস পাবে।” ...

কুঁয়ারডি থানায় বসে ওসি. রামলগন সিংহের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তখন রাত প্রায় ন'টা। কর্নেলকে উনি চেনেন, এতে অবাক হইনি। বললেন, “কেন্দ্র সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য নিরাপত্তাবাহিনী পাঠিয়েছে। কোনও ঘটনা ঘটলেই পাহাড়-জঙ্গলে চিরুনি-তল্লাশ চালায়। আমরা সঙ্গে থাকি। কিন্তু এ-পর্যন্ত অবস্থা যা ছিল, তা-ই। নাহ্, ভুল বলছি। ক্রমশ বাড়ছে বলাই উচিত। কিন্তু আমার ধারণা, জঙ্গিদের লক্ষ্য ছিলেন অবনী মুখার্জি। সুভাষ সিংহ বাধা দিতে গিয়েই মারা পড়েছেন। কেন বলছি, শুনুন। সারা জেলায় সুভাষবাবু ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়। বিশেষ করে আদিবাসীদের জন্য উনি অনেক করেছেন। আপনি তারাপুরে গেলে সব জানতে পারবেন। তাই বলছি, জঙ্গিরা বাধ্য হয়ে ওঁকে মেরেছে। চ্যাঁচামেচি করেছিলেন কিংবা বাধা দিয়েছিলেন। এও সম্ভব, জঙ্গিদের মধ্যে চেনা মুখ ছিল। আমি তারাপুরে যখন ছিলাম, তখন আইবি-র গোপন রিপোর্টে আভাস ছিল, সুভাষবাবু নাকি জঙ্গিদের ফান্ডে টাকা দেন। কিন্তু শক্ত প্রমাণ ছাড়া ওঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গেলে হইহই শুরু হয়ে যাবে। বিধানসভা থেকে সংসদ পর্যন্ত নড়ে উঠবে। এই দেখুন না, সুভাষবাবুর মৃত্যুর খবর পেয়ে কী ঘটে। আমার তো বুক টিপ-টিপ করছে!”

সিংহ অট্টহাসি হাসলেন। কর্নেল বললেন, “ড্রাইভার কিষেনচাঁদ কোনও শব্দ বা চ্যাঁচামেচি শুনতে পায়নি। অথচ বাতাস বইছিল থানের দিক থেকে।”

“বলছে নাইট ডিউটি করে আজ দিনে ঘুমনোর সময় পায়নি।”

"কান্‌হো প্রপাত কোথায়?"

"এখান থেকে কম করে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে, দুর্গম পাহাড়-জঙ্গল এলাকায়। তারাপুর থেকে অবশ্য বিশ-পঁচিশের মধ্যে। রিজার্ভ ফরেস্টের কোর এরিয়ার পড়ে। জন্তু-জানোয়ার আছে। আমি ভাবছি, অবনীবাবুর পক্ষ থেকে ওখানে টাকা পৌঁছে দেবে কী করে?

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন, "খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট তুলেছেন মিঃ সিংহ!"

মিঃ সিংহ ঘড়ি দেখে বললেন, "ব্ল্যাক প্যান্থার বলেছে, আমরা যেন নাক না গলাই। ঠিক আছে। আগে অবনীবাবুর ফ্যামিলির লোকেরা কী বলে জানা যাক। আমারা রিস্ক নেব না। ওরা যদি টাকা দেয়, বরং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকেদের মারফত পাঠানো যাবে। অবনীবাবু বহাল-তবিয়তে ফেরত এলে তখন ওঁর স্টেটমেন্ট নিয়ে তার ভিত্তিতে চিরুনি-তল্লাশে নামব। কর্নেলসায়েব কী বলেন?"

"মর্গের প্রাথমিক রিপোর্ট কখন আশা করছেন?"

"তারাপুর এখান থেকে চব্বিশ কিলোমিটার। কাজেই আজ রাত্রে পাওয়ার আশা নেই। তবে আপাতদৃষ্টে রাইফেলের বাঁট দিয়ে মেরেছে মনে হল। খুলি লম্বালম্বি ফেটে গেছে। আপনিও তো পরীক্ষা করলেন।"

কর্নেল কিছু বলতে ঠোঁট ফাঁক করেছিলেন, বললেন না। ইকবাল আমেদ ব্যস্তভাবে বললেন, "কর্নেল, পৌনে দশটা বাজে।"

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। মিঃ সিংহ একটু হেসে বললেন, "সঙ্গে পুলিশভ্যান এসকর্ট করবে। পিআরও সায়েবের মাথার দাম আমরা বুঝি।"

লোহাগড়ে নদীর ধারে খনিজ সম্পদ দফতরের সুদৃশ্য বাংলোয় আমরা উঠেছিলাম। একবাল আমেদ গেটে আমাদের নামিয়ে দিয়ে কোয়ার্টারে চলে গেলেন। পেছনে পুলিশভ্যান।

লনে হাঁটতে-হাঁটতে কর্নেল হঠাৎ হেসে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলাম, "কী ব্যাপার?"

"তিনটে পটকা।"

"তার মানে?"

কর্নেল প্যান্টের পকেট থেকে সত্যি তিনটে পটকা বের করে দেখালেন। "বরমদেও থানে এই তিনটে টাটকা পটকা ঘাসের মধ্যে খুঁজে পেয়েছি। মশলায় ভেজাল থাকলে বা দৈবাৎ ভিজে গেলে কিংবা ঠিকঠাক আছাড় না মারলে পটকা ফাটে না। তা ছাড়া ঘন ঘাসের ওপরও পটকাবাজি নিষ্ফল।"

"জঙ্গিরা পটকা ফাটাতে চাইবে কেন? ওদের তো এ-কে-৪৭ রাইফেল থাকে।"

"হুঁ। কালাশনিকভ! এই নামের এক সামরিক অফিসার এই দুর্ধর্ষ আগ্নেয়াস্ত্র অনেক দুঃখে মাথা খাটিয়ে তৈরি করেছিলেন। তবে এক্ষেত্রে একটা যুক্তি আছে। চ্যাচামেচি শুনে কিষেনচাঁদ কিংবা রাস্তা থেকে কেউ ছুটে এলে তাদের ভাগিয়ে দিতে পটকা যথেষ্ট। কালাশনিকভের গুলি খামোখা খরচ করে লাভ কী? হাতে রাইফেল দেখবে এবং পটকার শব্দ শুনবে। দুয়ে-দুয়ে চার হবে এবং লেজ তুলে পালাবে।"

কর্নেল আবার হেসে উঠলেন। বললাম, "কিষেনচাঁদের ঘুমনোটা আশ্চর্য! নাইট ডিউটি বাজে কথা। জঙ্গিদের সঙ্গে ওর নিশ্চয় যোগসাজশ আছে।"

"অনেক ড্রাইভার সুযোগ পেলেই ঘুমোয় দেখছি। কিন্তু কথা হল, আলফা কোম্পানির দুই মালিক বরমদেও থানে আসবেন, জঙ্গিরা জানত তা হলে?"

সায় দিয়ে বললাম, "হ্যাঁ। কিষেনচাঁদের কাছেই জেনেছিল। আর দেখুন, ওরা আগে থেকেই অপহরণপত্র ছাপিয়ে রেখেছে।"

কর্নেল হঠাৎ হললেন, "সকালে তারাপুর যাচ্ছি কিন্তু!"

আঁতকে বললাম, "কর্নেল, ওরা সাধারণ খুনে নয়, জঙ্গি গেরিলা গ্রুপ। এতবড় একটা দেশের সরকার ওদের জব্দ করতে পারছে না।"

এই সময় কেয়ারটেকার ভদ্রলোক এসে পড়লেন। "পি আর ও সায়েব এইমাত্র ফোন করেছিলেন। ডিনার রেডি সার।"

এই বাতিকগ্রস্ত বৃদ্ধের পাল্লায় পড়ে অনেক দুর্ভোগে ভুগেছি। এবার নির্ঘাত জঙ্গিদের গুলিতে প্রাণটা যাবে। ওঁর অবশ্য কিচ্ছু হবে না। ব্ল্যাক প্যান্থারদের গেরিলা যুদ্ধের কৌশল শেখাতে চাইবেন। ওটা নাকি ওঁর সামরিক জীবনের সেরা লাভ।

সকাল সাড়ে সাতটায় ব্রেকফাস্ট করে বাসস্টেশনে গেলাম। আমেদ তখনও ওঠেননি। তাঁর জন্য কর্নেল চিরকুটে বার্তা রেখে এসেছিলেন। আটটায় তারাপুরগামী বাস ছাড়ল। কুঁয়ারডি পেরিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ দীর্ঘ জ্যাম। কন্ডাক্টর খোঁজ নিয়ে এসে ঘোষণা করল, বরমদেও থানের সামনে দশ-বিশ হাজার লোক রাস্তা আটকেছে।

এক বাঙালি যাত্রী মাতৃভাষায় ফুঁসে উঠলেন,"রোজ এই অবরোধ। কথায়-কথায় রাস্তা আটকানো চাই।" বলে রাষ্ট্রভাষায় কন্ডাক্টরকে জিজ্ঞেস করলেন, "আজ হুয়া ক্যা? কিস্‌কা বিল্লি মর গেয়ি?"

কন্ডাক্টর হাসল। "বহুত্ বড়ি বিল্লি বাবুজি! সুভাষজিকো মার ডালা।"

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। "ওরে বাবা! কৌন মারা?"

"মালুম নেহি।"

ভদ্রলোক বোঁচকা-বুঁচকি গুছিয়ে নেমে গেলেন। কর্নেল পিঠে তাঁর কিটব্যাগ এঁটে বললেন, "ওঠ জয়ন্ত! নেমে পড়া যাক।"

নেমে দেখি, সেই ভদ্রলোক এবং আরও কিছু বাসযাত্রী একটা টিলার নিচে পায়ে-চলা পথের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। কর্নেল হন্তদন্ত হয়ে সঙ্গ ধরলেন। ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলেন, "ওদিকে কোনও বাসরুট আছে নাকি?"

ভদ্রলোক থমকে দাঁড়ালেন। "কী আশ্চর্য! আপনাকে সায়েব ভেবেছিলাম। এরিয়ার মিশনারি সায়েবরা আছেন। তা ..."

কর্নেল পকেট থেকে নেমকার্ড বের করে দিলেন। উনি বিড়বিড় করে পড়তে থাকলেন, "কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। নেচারিস্ট।" তারপর মুখ তুলে বললেন, "নমস্কার! নমস্কার! আপনি মিলিটারির লোক। তা নেচারিস্ট মানে?"

"প্রকৃতিপ্রেমিক বলতে পারেন। আপনি কোথায় থাকেন? এদিকে কোথায় যাচ্ছেন?"

"তারাপুরে আমার বাড়ি। ছোটখাটো ব্যবসা করি। আমার নাম সদানন্দ রায়। এই পথে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গেলে নদীর ব্রিজে পৌঁছনো যাবে। তারপর ধরমতাল রোডের মোড়ে একটা কিছু পেয়ে যাব—জিপ কিংবা অটোরিকশা।"

"চলুন, আমরাও তারাপুর যাব। গল্প করতে-করতে হাঁটলে ক্লান্তি আসে না।"

"আজ্ঞে, কথাটা ঠিকই বলেছেন।"

"কে এমন মারা গেলেন যে, লোকে রাস্তা আটকাল?"

"সুভাষ সিঙ্গির কথা আর বলবেন না সার! বিয়েটিয়ে করেনি। সমাজসেবা করে বেড়াত। কোম্পানি লাটে তুলে দিয়েছিল। এবার অবনী হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে। অবনী ওর পার্টনার স্যার! বুঝলেন তো?"

"ওঁদের ব্যবসা কিসের?"

"রকমারি অর্ডার সাপ্লাইয়ের। ধরুন, এরিয়ার মিশনারি স্কুল-কলেজ অর্ডার দিল, এত খাতা চাই, কি কালি-কলম চাই কি চেয়ার-টেবিল চাই—আবার গভমেন্ট অফিস যদি অর্ডার দিল—"

কর্নেল বললেন, "বুঝেছি। বাঘের দুধের অর্ডার দিলেও সাপ্লাই দেয়।"

অদ্ভুত শব্দে হাসতে লাগলেন সদানন্দবাবু। "ঠিক ধরেছেন। তবে ওই যে বলছিলাম, সিঙ্গি ব্যবসা লাটে তুলেছে দান-খয়রাত করে। ইদানীং বাতিক উঠেছিল বরমদেওয়ের থানে মন্দির গড়ে দেবে। অবনী মুখুজ্যে বেগতিক দেখে কলকাতায় ব্রাঞ্চ করেছে। ওর ছেলে মৃণাল দেখাশোনা করছে। এবার পাড়াতাড়ি গুটিয়ে অবনী কাটবে। ফ্যামিলি অলরেডি পাঠিয়ে দিয়েছে, জানেন?"

"তারাপুরের বাড়িতে অবনীবাবু এখন একা থাকেন বুঝি?"

"হ্যাঁ। সুভাষ সিঙ্গিও থাকত। নিজে কোনও বাড়ি করেনি।"

জঙ্গলের গাঢ় ছায়ায় যেতে-যেতে কানে এল, ডাইনে দূরে মানুষ-জনের কোলাহল। কর্নেল বললেন, "বরমদেওয়ের থান কি কাছাকাছি?"

সদানন্দবাবু বললেন, "আজ্ঞে! ডান দিকে ওই যে বটগাছ দেখছেন। তবে এবার একটু পা চালিয়ে আসুন সার! অবরোধ হটাতে পুলিশ গুলি ছুড়তে পারে।"

"ছুড়ুক না! আমরা দমাদ্দম পটকা ফাটাব।"

সদানন্দবাবু গুলি-গুলি চোখে তাকালেন। "পটকা ফাটাবেন? ওরে বাবা! টেররিস্ট ভেবে সিকিউরিটি ফোর্স ছুটে আসবে।"

"আপনার ওই ব্যাগে তারাকাঠির প্যাকেট দেখছি। আসন্ন দেওয়ালি উপলক্ষে বাজি, পটকা, হাওয়াই, তুবড়ি কিনতে নিশ্চয় কলকাতা গিয়েছিলেন?"

"আজ্ঞে। তা—"

"দিন না কয়েকটা পটকা। দাম দেব।"

"কী বলছেন সার?"

কর্নেল পকেট থেকে একটা পটকা বের করে বললেন, "তা হলে আমারটা ফাটাই।" উনি একটা পাথরে জোরে পটকাটা ছুড়ে মারলেন। প্রচণ্ড শব্দে ফাটল এবং কানে তালা ধরে গেল।

সদানন্দবাবু অমনই প্রায় দৌড়তে শুরু করলেন। বললাম, "কোনও মানে হয়? যদি সত্যি সিকিউরিটি ফোর্স ছুটে আসে?"

কর্নেল একচোট হেসে বলেন, "কষ্ট করে আর তারাপুর যেতে হল না। সদানন্দবাবুর কাছেই সব হদিশ পাওয়া গেল। এবার ওঁকে সঙ্গছাড়া করার দরকার ছিল। দ্বিতীয়ত, একাগ্রচিত্ত এক বালক ব্যাধের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল।"

একটি বনচর ছেলে গুলতি আর মুঠোয় বাঁটুল নিয়ে বাঁ দিকের ঝোপ থেকে কখন বেরিয়ে এসেছে, লক্ষ করিনি। কর্নেল তাকে ইশারায় ডাকলেন। তার মুখে ক্ষোভের চিহ্ন স্পষ্ট। কর্নেল হিন্দিতে বললেন, "পাখিটা উড়ে গেছে। সেজন্য দুঃখ কোরো না। বখশিশ দিচ্ছি।"

তার হাতে একটা দশ টাকার নোট গুঁজে দিলেন কর্নেল। সে অবাক চোখে নোটটা দেখতে থাকল।

কর্নেল বললেন, "ওটা লুকিয়ে রাখো। তুমি থাকো কোথায়?"

সে আঙুল তুলে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দেখাল। তারপর ছেঁড়া-খোঁড়া নোংরা হাফপেন্টুলের পকেটে নোটটা ঢোকাল।

"এখানে কাছাকাছি কোথাও জল আছে?"

সে ইশারায় আমাদের অনুসরণ করতে বলল। ঝোপঝাড়, পাথর আর উঁচু গাছের ভেতর দিয়ে কিছুদূর চলার পর একটা ছোট্ট ডোবা দেখা গেল। ডোবার জলটা গাঢ় হলুদ। কর্নেল আমাকে

অবাক করে ডোবার চারদিকে ঘুরতে শুরু করলেন। কখনও ঝুঁকে বা হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরতে-ঘুরতে একখানে থামলেন। তারপর ছেলেটিকে কাছে ডেকে বললেন, "আরও বখশিশ পাবে। জলে মাছ আছে মনে হচ্ছে। পাঁক হাতড়ে একটা মাছ ধরতে পারলে মাছটা তোমার। পাঁকে অন্য কিছু পেলে আমার।"

ছেলেটি একটু দোনামনা করছিল। কর্নেল আবার একটা দশ টাকার নোট তার হাতে গুঁজে দিলেন। তখন সে নোটটা পেন্টুলের পকেটে ভরে ফেলল এবং নিঃসঙ্কোচে পেন্টুল খুলে রেখে জলে নামল! জল তত গভীর নয়। তার কোমর অবধি ডুবল মাত্র। কমবয়সীদের যা স্বভাব। জল তার সরল আদিম মনকে ভূতের মতো পেয়েছিল। কর্নেল বারবার বলছিলেন, "পাঁক হাতড়াও! পাঁকে মাছ পাবে।"

আমি থ হয়ে বসে ব্যাপারটা দেখছিলাম। কিছুক্ষণ পরে সে হাত-খানেক লম্বা কী একটা জিনিস তুলে ধরল। কর্নেল শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলে উঠলেন, "ওটা আমার! ছুড়ে দাও।"

এতক্ষণে দেখলাম জিনিসটা ইঞ্চিদেড়েক মোটা একটা লোহার রড। কর্নেল রডটা কিটব্যাগে ঢুকিয়ে বললেন, "কুইক জয়ন্ত, কুঁয়ারডি থানায় মার্ডার-উইপনটা জমা দিয়ে লোহাগড় ফিরতে হবে। ধরমতালের সেক্রেটারি বার্ডের ছবি না তুলে কলকাতা ফিরছি না।"

বললাম, "জঙ্গিরা তা হলে এই রডটা দিয়েই—"

"জঙ্গিরা না। অবনী মুখুজ্যে।"

"অ্যাঁ? সে কী!"

কর্নেল হাঁটতে-হাঁটতে বললেন, "তিনটে পটকা দেখেই খটকা বেধেছিল। সদানন্দবাবুর কথাগুলো স্মরণ করো। ওইখানে সুভাষবাবু মন্দির গড়ে দিতে চেয়েছিলেন। কাজেই তাঁকে ডেকে এনে আচমকা পেছন থেকে মাথায় রডের ঘা মারা সো ইজি। জঙ্গিদের লেটারহেড? সুভাষবাবুর সঙ্গে ওদের যোগাযোগ ছিল, আই বি রিপোর্টে তার আভাস আছে। অর্ডার সাপ্লায়ার কোম্পানির পার্টনার সুভাষবাবুর পক্ষে লেটারহেড সাপ্লাই করা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু অবনীবাবুর অগোচরে এ কাজ অসম্ভব। কাজেই অবনীবাবু একটা লেটারহেড আত্মসাৎ করেছিলেন। তবে অতিবুদ্ধির গলায় দড়ি বলে কথা আছে। পটকা ফাটিয়ে কিডন্যাপিং কেসকে আরও মজবুত ভিত্তিতে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন অবনীবাবু। ঘাসে পটকা ফাটেনি। কাজেই আমার খটকা ...কালাশনিকভ হাতে থাকলে পটকার কথা মাথায় আসবে কেন? হ্যান্ডগ্রেনেডের অভাব নেই জঙ্গিদের।" কর্নেল অট্টহাসি হাসলেন। "নিজেকে নিজে কিডন্যাপ করলে ঘরের টাকা ঘরেই ফিরবে। তবে আমার ধারণা, অবনীবাবু অত ঝুঁকি নেবেন না। কান্হো প্রপাত এলাকায় অবশ্যই জঙ্গিদের ঘাঁটি আছে। তার প্রমাণ ওই লেটারহেড। অবনীবাবু ধুলো-কাদা মেখে থানায় হাজির হয়ে বলবেন, পালিয়ে এসেছি।"

বৃদ্ধ রহস্যভেদী সত্যি অন্তর্যামী। কুঁয়ারডি থানায় ছেঁড়া শার্ট এবং ধুলো-কাদামাখা অবনী মুখুজ্যে করুণ মুখে বসেছিলেন। কয়েক মিনিট পরেই অবশ্য তাঁকে হাজতে ঢোকানো হয়েছিল ...।

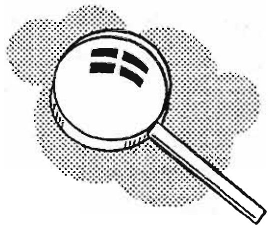

মানুষখেকোর ফাঁদ

খ্যাতনামা বেসরকারি ঘুঘু অর্থাৎ গোয়েন্দা কর্নেল নীলাদ্রি সরকার ডাকলে এই রিপোর্টার জয়ন্ত চৌধুরি নরকে যেতেও রাজি। কিন্তু নরকে নয়, সেবারে ডাক এল রাজস্থান থেকে। জায়গাটার নাম মাধোপুর। জয়পুর থেকে অনেক দূরে একটা জঙ্গুলে জায়গা। কীভাবে যেতে হবে, সব পথনির্দেশ ছিল টেলিগ্রামে। তাই পৌঁছতে কোনও অসুবিধে হল না।

মাধোপুরে গিয়ে দেখলুম, আমার জন্যে একটা জিপ অপেক্ষা করছে। জিপের ড্রাইভারের কাছে জানলুম, আমার বৃদ্ধ বন্ধুটি এখন বাঘ শিকারের নেশায় মেতেছেন। জয়পুরের মহারাজার এক সংরক্ষিত বনাঞ্চল আছে মাধোপুরের মাইল পাঁচেক দূরে। এখন অবশ্য তার মালিক ভারত সরকার। সেখানে বনবিভাগের বাংলোয় কর্নেল সায়েব মহামান্য অতিথির সম্মানে বাস করেছেন। সম্প্রতি ওই এলাকায় একটি মানুষখেকো বাঘের ভীষণ উপদ্রব দেখা দিয়েছে। কর্নেলের মাথায় বাঘটা নিকেশ করার ঝোঁক চেপে গেছে বিলক্ষণ।

শুনে আমার বুক কেঁপে উঠল। আফসোস হল, খুলে জানালে আমার হেভি এক্সপ্রেস রাইফেলটা আনতুম! তারপর মনে পড়ল, কিছুদিন আগে কর্নেলকে কথায় কথায় বলেছিলুম, মানুষখেকো বাঘ মারার সুযোগ আজ অব্দি পাইনি। পেলে একবার চেষ্টা করে দেখতুম। তার জবাবে কর্নেল ঠাট্টা করে বলেছিলেন, আদতে সাধারণ বাঘ কি তুমি কখনও মেরেছ, জয়ন্ত? হাজারটা সাধারণ বাঘ যে না মেরেছে, তার পক্ষে মানুষখেকো বাঘ মারার স্বপ্ন দেখা উচিত নয়।

বুড়ো কথাগুলো মনে রেখেছিলেন বোঝা যাচ্ছে। কারণ, আমি জোর তর্কাতর্কি করেছিলাম, ওঁর বক্তব্য মেনে নিতে পারিনি। তাই কি এই ডাক? কিন্তু তাহলে আমাকে রাইফেল আনতে বলেননি কেন? এইসব ভেবে খুব রাগও হল। উনি আমাকে নিয়ে বরাবর এমন পরিহাস করেন কেন?

পৌঁছে দেখি, একটা ছোট্ট টিলার গায়ে সুন্দর বাংলোর বারান্দায় কর্নেল আর আমার অচেনা এক ভদ্রলোক বসে রয়েছেন। কর্নেল আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন—হ্যাল্লো ডার্লিং! কনগ্রাচুলেশনস! গুড লাক ফর ইউ!

বললুম—আগাম ওটা নিতে চাইলেন কর্নেল!

কর্নেল হেসে উঠলেন। তারপর সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। ওঁর নাম রাজাধিরাজ আচরল। পুলিশ সুপার। একজন জবরদস্ত শিকারি উনি।

কর্নেলের সঙ্গে সর্বময় পুলিশকর্তাদের যোগাযোগ ঘটে যায়—এটা অবাক লাগে আমার। ঠাট্টা করে বললুম—ম্যান ইটার পাকড়াও করতেও প্রাইভেট গোয়েন্দা আর পুলিশ দরকার হয় আজকাল। বাঃ!

মিঃ আচরল কিন্তু হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন—না না! জাস্ট আকস্মিক যোগাযোগ!

গল্পগুজব বন্ধ করে কর্নেল আমাকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিতে বললেন। পথশ্রমের ক্লান্তি দূর করার জন্য স্নান করলুম। তারপর তিনজনে একসঙ্গে বসে লাঞ্চটা সেরে নেওয়া হল।

সেই ফাঁকে মানুষখেকো বাঘটার খবরাখবর দিলেন কর্নেল। ক'দিন আগে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যে হাইওয়ে গেছে, তিনজন লোক সাইকেল চেপে আসছিল একের পর এক—কেউ পাশাপাশি ছিল না। প্রথম সাইকেলটা বাঁকের দশগজ দূরে যখন, তখন হঠাৎ বাঁদিকের পাথরের পাঁচিলে

একটা বাঘ উঠে আসে। ব্রেক কষবার আগেই সে রাস্তার মাঝখানে লাফিয়ে পড়ে। তার ফলে সাইকেলের সঙ্গে তার ধাক্কা লাগে। অমনি সে গর্জন করে ওঠে। এদিকে লোকটা সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে ছিটকে সরে আসে, সাইকেলটা পড়ে যায় এবং চাকা ঘুরতে থাকে। পিছনের লোক-দুটো কিছু লক্ষ্য করেনি। তাই তারাও এসে প্রথম সাইকেলটার ওপর একসঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং সামনে বাঘ দেখে লাফ দিয়ে সরে আসে। তিনটে সাইকেলের চাকা বোঁ বোঁ করে তখন ঘুরছে এবং একটা বাঘ ক্ষেপে গিয়ে থাবা মারছে একবার এটায়, একবার অন্যটায়। আর প্রচণ্ড গর্জাচ্ছে। অন্যদিকে পাথরের গায়ে সেঁটে তিনটে ভয়পাওয়া মানুষ কাঠ হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। তাদের পালানোর ক্ষমতাও নেই।

বাঘটা কিছুক্ষণ সাইকেল তিনটের সঙ্গে লড়াই করার পর বিরক্ত হয়েই যেন শেষ ডাক ছেড়ে ডানদিকের পাঁচিলে লাফিয়ে ওঠে এবং অদৃশ্য হয়। তখন লোক তিনটে ধীরে সুস্থে সাইকেলের কাছে আসে। আশ্চর্য, সাইকেলের কোনও ক্ষতিই হয়নি।

তারা এরপর কী করেছিল বোঝাই যায়। ঘন্টায় কমপক্ষে পঞ্চাশ ষাট মাইল জোরে পালিয়ে যাওয়া এক্ষেত্রে স্বাভাবিক। প্রথমেই যে বসতিতে তারা পৌছয়, সেখানে হুলুস্থুলু শুরু হয়েছিল। কারণ লোকেরা দেখে, তিনটে সাইকেলওয়ালা আচমকা ঝড়ের মতো এসে সাইকেল থেকে লাফ দিয়ে পনে অজ্ঞান হয়ে যায়। সাইকেলগুলো আবার চারদিকে ছিটকে পড়ে।

জ্ঞান হলে তাদের মুখে সব জানা যায়। কিন্তু ঘটনার শেষ এখানে নয়। পরদিন সকালে দেখা গেল, সেই বসতির এক বুড়ি উঠোনে পড়ে আছে। ক্ষতবিক্ষত শরীর। বোঝা যায় বাঘটা টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল বুড়িকে—পারেনি। কেন পারেনি কে জানে। কিন্তু পায়ের খানিকটা মাংস খুবলে খেয়ে গেছে।

এরপর দ্বিতীয় শিকারের খবর পাওয়া গেল মাঠের খেতে। একটা বুড়ো ঘাস কাটতে গিয়েছিল বিকেলে। কিন্তু রাতেও ফিরল না। ব্যাপারটা অনুমান করে গাঁয়ের লোক পরামর্শে বসল। কিন্তু রাতের বেলায় সাহস করে কেউ খুঁজতে বের হল না। পরদিন সকালে দেখা গেল একই দৃশ্য। এবারেও বাঘটা বুকের কিছুটা খেয়েছে—টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। পারেনি।

আজ সকালে ঘটেছে আরেক বীভৎস কাণ্ড। সেই গাঁয়ের মোড়লকে বাঘটা একইভাবে মেরে রেখে গেছে। মোড়লের বাড়ির পিছনে জঙ্গল আছে। তার নিচে ধাপবন্দি পাহাড়ি খেত। মোড়লকে সম্ভবত শেষ রাতে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু এবার বাঘটা ঘরে ঢুকেছিল। ঘর থেকে তাকে টেনে উঠোন পার করে খেতে নিয়ে যায়। তারপর একইভাবে বুকের খনিকটা খেয়ে রেখে যায়। লাশটা এখনও রয়েছে। কাছেই দুটো গাছে দুটো মাচান বাঁধা হয়েছে। কর্নেল এবং মিঃ আচরল সেখানে বাঘটার আশায় বন্দুক হাতে অপেক্ষা করবেন।

কর্নেল আরও জানালেন, প্রথম ঘটনার পরই সরকারি শিকারিরা লাশের কাছে ওত পেতে রাত জাগেন। কিন্তু বাঘটা আর আসেনি। দ্বিতীয় লাশের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটে। এ থেকে মনে হচ্ছে, মোড়লের লাশের কাছেও সে আসবে কি না সন্দেহ। তবে...

ওঁকে চুপ করতে দেখে মিঃ আচরল বললেন—তবে কী কর্নেল?

কর্নেল কেমন হেসে বললেন—আমার ধারণা এবার বাঘটার আসার চান্স আছে। অন্ততঃ যদি বুদ্ধিমান বাঘ হয়, তাহলে তো আসা একান্ত উচিত। না এলে যে সে প্রাণে মারা পড়বে!

আমরা দু'জনেই হতভম্ব হয়ে গেলুম। বলেন কী! বাঘটা মড়ির কাছে না এলে মারা পড়বে! এ কী উদ্ভট কথা; মড়ির কাছে এলে তবে না গুলি খেয়ে বাঘ মারা পড়ে। মিঃ আচরল অবাক হয়ে বললেন—এ হেঁয়ালির মানে কী কর্নেল?

—হেঁয়ালি? মোটেও না! বলে কর্নেল ঘনঘন মাথা নাড়তে থাকলেন। একটু পরে বললেন—বুঝলেন না?

বাঘ মানুষখেকো হয় কেন? যখন শিকার ধরার স্বাভাবিক ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়, তখন বাঘ সবচেয়ে সহজে ধরার মতো শিকার মানুষের ওপর হামলা করে। এই বাঘটার ব্যাপারস্যাপারগুলো দেখুন। প্রথম ঘটনা সেই সাইকেল পর্ব। ওই অবস্থায় বাঘ বিরক্ত হয়ে ওদের আক্রমণ করাটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তা করেনি। বোঝা যায়, বাঘটার মধ্যে সুস্থতার লেশমাত্র নেই। অর্থাৎ সে ভীতু, কিংবা স্বাভাবিক প্রবৃত্তিজাত ক্ষমতা তার মধ্যে নেই। এ অবস্থা বাঘের কখন হয়? যখন কোনও কারণে সে শারীরিক কিছু দরকারি ক্ষমতা হারায়। এটা নিছক বার্ধক্যের দরুন না হতেও পারে। বরং কোনও শিকারির গুলিতে সে স্বাভাবিক তৎপরতা হারিয়ে অক্ষম হয়ে গেছে, কিংবা কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী জন্তুর সঙ্গে যুদ্ধে তা হারিয়েছে। এই বাঘটার প্রথম একটা বৈশিষ্ট্য দেখুন—সে তার মড়ি টেনে নিয়ে গিয়ে নিরাপদ জায়গায় লুকোতে পারে না। অর্থাৎ তার শিকার বওয়ার ক্ষমতা নেই। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য—সে আর মড়ির কাছে ফেরে না। তার মানে, নিশ্চয় কোথাও মড়ির ওপর বসা অবস্থায় গুলি খেয়েছিল।

মিঃ আচরল বললেন—তাহলে বলছেন কেন সে মোড়লের মড়ির কাছে এবার ফিরবেই?

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন—না এলে যে ক্ষিধের জ্বালায় মরতে হবে ওকে! প্রতিবার মড়ি পেট পুরে না খেয়ে পালাবে নাকি? ক্ষিদের জ্বালা বড় জ্বালা। এবার হয়তো সে একটা রিস্ক নেবে।

এই ব্যাখ্যায় মিঃ আচরল সন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু আমি হলুম না। এই বুড়ো ঘুঘুকে তো হাড়ে হাড়ে চিনি। ওঁর হেঁয়ালি বোঝার ক্ষমতা কারও নেই।

কথা হল, আমরা ঠিক সূর্যাস্তের আগে সেই গাঁয়ে যাব এবং মড়ির কাছে মাচানে উঠব। তখনও ঘন্টা দুই দেরি। আমি গড়িয়ে নিতে গেলুম ততক্ষণ। মিঃ আচরল সেই ফাঁকে তাঁর জরুরি কয়েকটা ফাইল নিয়ে বসলেন—থানা থেকে লোক এসেছিল। আর কর্নেল বেরোলেন। বলে গেলেন—গ্রামেই অপেক্ষা করব আপনাদের জন্যে। আপনারা টাইমলি চলে যাবেন।

রাইফেল হাতে কর্নেল বেরিয়ে গেলেন। এটা ওঁর পক্ষে স্বাভাবিক। সব কাজ ভালভাবে খুঁটিয়ে না দেখে এগোবেন না। গ্রামে গিয়ে হয়তো বাঘটার সম্পর্কে আরও খবর জেনে নেবেন।

সূর্য ডুবতে ডুবতে আমি আর মিঃ আচরল জিপে করে যথাস্থানে গেলুম। জিপটা গাঁয়ের কাছারির সামনে রেখে পায়ে হেঁটে আমরা ধাপবন্দি পাহাড়ি খেত ধরে এগোচ্ছি, হঠাৎ দেখি কর্নেল একটা কাঁটাঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন।

কাছে গেলে বললেন—আসুন মিঃ আচরল। এস জয়ন্ত ডার্লিং। গুড ইভনিং!

মিঃ আচরল বললেন—এখানে কী করছেন কর্নেল?

কর্নেল ঝোপে আটকানো একটা কাপড় দেখিয়ে বললেন—এটা পরীক্ষা করছিলুম। মোড়লের জামাটা আটকে আছে। চলুন, মাচানে ওঠার সময় হয়ে গেছে।

লাশটা দেখে আমি শিউরে উঠলুম। আর দ্বিতীয়বার তাকানোর সাহস হল না। দশ গজ চড়া পনেরো গজ লম্বা ছোট্ট খেতের মধ্যিখানে সেটা পড়ে আছে একপাশে কাত হয়ে। বীভৎস! তার পশ্চিমে একটা মস্ত নিম গাছ—সেখানে বিশফুট উঁচুতে মাচান দেখলুম। কর্নেল বললেন—মিঃ আচরল, আপনি ওই মাচানে উঠুন। একটা কথা বলে রাখি। আমি শিস না দিলে কিন্তু কোন প্রলোভনেও গুলি করবেন না—প্লিজ, কথা দিন।

মিঃ আচরল বললেন—অবশ্যই। কথা দিচ্ছি।

কর্নেল আমার দিকে ঘুরে বললেন—ডার্লিং, তোমাকেই গুলি করার সুযোগটা দিতে চাই! এই নাও রাইফেল। এবার দেখব, তোমার হাতের টিপ কেমন! কিন্তু মনে রেখো, আমি শিস না দিলে তুমিও গুলি ছুড়বে না। কথা দাও।

এর পরে বুড়োর সঙ্গে আমি পুবদিকের একটা গাছের মাচানে উঠলুম।

কোনওরকম নড়াচড়া চলবে না। চুপচাপ বসে রইলুম। দেখতে দেখতে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠল। সময় কাটতেই চায় না। তারপর আমাদের পিছনে চাঁদ উঠলে স্বস্তি পেলুম। হাল্কা জ্যোৎস্না গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে মড়ির ওপর পড়ল। আরও কিছুক্ষণ পরে মড়িটা জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট হয়ে উঠল।

কিন্তু বাঘের কোনও লক্ষণ নেই। ঝিঁঝি ডাকছে একটানা। অনেক দূরে একবার শেয়াল ডাকল। তারপর আবার সব স্তব্ধ হয়ে গেল। গ্রামের দিকে শেষ আলোটিও নিভে গেল। চোখ জ্বালা করতে লাগল—একদৃষ্টে কতক্ষণ আর তাকিয়ে থাকা যায়। আস্তে আস্তে উত্তেজনা থিতিয়ে একটা ঝিমধরা ভাব জাগল শরীরে। রাইফেলটা অসম্ভব ভারী লাগছিল। এবার হাত পা ছড়াতে পারলে আরাম পাওয়া যেত। কিন্তু নড়াচড়া করা বারণ।

গ্রামের দিকে সেই সময় কুকুরের ডাক শোনা গেল। কুকুরগুলোর বোকামি রেখে রাগ হচ্ছিল—কারণ ওরা ডাকতে ডাকতে এদিকেই আসছে মনে হচ্ছিল—সাবধানে কর্নেলের দিকে ঘুরলুম। দেখি, বুড়োর চোখদুটো যেন জ্বলছে এবং কখন হুমড়ি খেয়ে বসে কিছু দেখছেন, লক্ষ্য করিনি।

কুকুরের ডাক থেমে গেলে কর্নেল নড়ে বসলেন। এটা কি ঠিক হল? বাঘের চোখ খুব তীক্ষ্ণ। বিন্দুমাত্র নড়াচড়া সে টের পেয়ে যায়। কিন্তু কী আশ্চর্য, আমাকে আরও অবাক করে কর্নেল দেখলুম পা বাড়াচ্ছেন। এক পা নামিয়েছেন, যেন নামতে যাচ্ছেন। ফিসফিস করে ওঠার আগেই উনি আমার হাঁটুতে চাপ দিয়ে চুপ করার ইঙ্গিত দিলেন। তখন হতভম্ব হয়ে বসে ওঁর কাণ্ড দেখতে থাকলুম।

কর্নেল নিঃশব্দে গাছ থেকে নেমে গেলেন। তারপর আর ওঁকে তন্ন তন্ন খুঁজেও দেখতে পেলুম না। ব্যাপারটা কী? যেচে বিপদের মুখে পড়তে গেলেন কেন?

হঠাৎ আমার চোখ গেল মড়ির দিকে। কী একটা কালো বস্তু নড়াচড়া করছে ওখানে? তাহলে বাঘটা এসে গেছে! কিন্তু কর্নেলের শিস না শুনলে গুলি করা করা বারণ। হাত নিশপিশ করতে থাকল। কালো জন্তুটা কিন্তু মড়িতে বসল না! আশেপাশে ঘুরঘুর করছে। তখন মনে হল, ওটা তাহলে বাঘ নয়—সম্ভবত হায়েনা অথবা ভালুক। তা যদি হয়, তাহলে বোঝা যাচ্ছে বাঘটার আসা এখন অনিশ্চিত হয়ে গেল।

আমার চোখ ছিল জন্তুটার দিকে। একটু পরে সেটা মড়ির কাছে স্থির হয়ে বসতেই দেখলুম, আমাদের মাচানের তলা থেকে আরেকটা জন্তু হামাগুড়ি দেওয়া মানুষের মতো এগোচ্ছে। চাঁদের আলো এই জায়গায় স্পষ্ট নয়—ছায়া আছে। কিন্তু জন্তুটা যে মড়ির দিকেই এগোচ্ছে, তা ঠিক। উত্তেজনায় অস্থির হয়ে দেখতে থাকলুম।

দ্বিতীয় জন্তুটা মড়ির কাছাকাছি যেতেই প্রথম জন্তুটা যে লাফ দিয়ে উঠল। সে পালিয়ে যাওয়ার তালে—তার ভঙ্গি দেখেই সেটা বোঝা গেল। কিন্তু অমনি দ্বিতীয় জন্তুটা তার ওপর ঝাঁপ দিল। নির্ঘাৎ মড়ি নিয়ে হায়েনা আর ভালুকে লড়াই বাধল।

কিন্তু সেই মুহূর্তে কর্নেলের চিৎকার শুনলাম, আর টর্চও জ্বলে উঠল। কর্নেল ডাকছিলেন—মিঃ আচরল! জয়ন্ত! চলে এস। বাঘ ধরেছি!

বাঘ ধরেছেন! আমি মাচান থেকে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে নেমে গেলুম। মিঃ আচরলও ততক্ষণে এসে পড়েছেন। হাতে টর্চ। গিয়ে দেখি, যে দুটো কালো জিনিসকে জন্তু ভেবেছিলুম—তা মানুষ এবং প্রথম জন্তুটা একজন অচেনা মানুষ, দ্বিতীয় জন্তুটা স্বয়ং কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। লোকটাকে উনি জাপটে ধরে আছেন— লোকটার হাতে একটা বড় ছোরা। হাতদুটোসুদ্ধ ধরে কর্নেল ওকে রেকায়দায় ফেলেছেন।

মিঃ আচরল ছোরাটা কেড়ে নিয়ে হুইসিল বাজিয়ে দিলেন। অমনি গাঁয়ের দিক থেকে টর্চ জ্বেলে কারা সব দৌড়ে এল। ধুপধুপ শব্দ শুনে বুঝলুম, সবাই পুলিশ!

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। কোথায় ম্যান-ইটার? এ যে নিতান্ত মানুষ!

বাংলোয় ফিরতে রাত একটা বেজেছে। ফেরার পর কর্নেল বললেন—জয়ন্ত কি খুব হতাশ হলে? বাঘের বদলে মানুষ! আই অ্যাসিওর ডার্লিং, এরপর তোমাকে সত্যিকার মানুষখেকো বাঘ মারার চান্স দেব। প্লিজ, রাগ কোরো না।

আমি গুম হয়ে থেকেছি সারাক্ষণ। এবার বললুম—কিন্তু ব্যাপারটা কী?

কর্নেল বললেন—সামান্য। এ আমার বরাত জয়ন্ত। যেখানে যাব, খুন আর খুনি এসে আমার ঘাড়ে পড়বেই! এই দেখো না—ম্যান-ইটার মারব বলে আসর জাঁকিয়ে বসলুম এখানে। অথচ এখানেও সেই খুন আর খুনি!

এই বলে কর্নেল সব হেঁয়ালির সমাধান করলেন। সংক্ষেপে তা বর্ণনা করছি। তিনটি সাইকেলের সঙ্গে একটা খেয়ালী বাঘের সংঘর্ষ থেকেই এই খুনি লোকটার মাথায় মতলব খেলেছিল। সে হতভাগ্য মোড়লের একজন পুরনো শত্রু। জমিজমা নিয়ে বিবাদ ছিল। মামলায় হেরে সে ভূত হয়েছিল। কিন্তু মোড়লকে খুন করার সুযোগ পাচ্ছিল না। কারণ, মোড়ল খুন হলেই তার ওপর স্বাভাবিক দায় পড়বে খুনের। সবাই জানে এই শত্রুতার কথা। অতএব সে সাইকেল ও বাঘের সংঘর্ষ থেকে মতলব আঁটল। কিন্তু প্রথমেই মোড়লকে খুন করলে পাছে কেউ কিছু সন্দেহ করে বসে—তাই সে অন্য রাস্তা নিল। এই ধূর্ততার কোনও তুলনা হয় না।

প্রথমে খুন করল এক নিরীহ বুড়িকে। ঠিক বাঘে ধরার মতো চিহ্ন রাখল। ছুরি দিয়ে এমনভাবে খুনটা করল যে বাঘের নখ ও দাঁতের দাগ বলে সবার মনে হবে। মড়ি টেনে নিয়ে যাওয়ার চিহ্নও রাখল। দ্বিতীয়বার খুন করল একই ভঙ্গিতে। তারপর তার নির্দিষ্ট লক্ষ্য মোড়লকে খুন করতে আর অসুবিধে হল না। কারণ ততদিনে মানুষখেকো বাঘের খবর রটে গেছে। শিকারিরা এসেছে। মাচানে বসেছে। আবহাওয়া তৈরি হয়ে গেছে। অতবে মোড়লকে মারতে আর অসুবিধা নেই।

কিন্তু কর্নেলের চোখ তীক্ষ্ণ। প্রথমেই তিনি একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে অবাক হলেন। কোনও মড়ির আশেপাশে বাঘের পায়ের দাগ নেই কেন? মোড়লের মড়িটা তিনি হাতেনাতে দেখলেন—অন্যদুটো দেখার সুযোগ পাননি। মড়ি পরীক্ষা করেই ওঁর সন্দেহ বেড়ে গেল। মাথার খুলি দু'ফাঁক হয়েছে। এটা বাঘের থাবায় হতে পারে। চুলে রক্ত নেই। তার মানে মড়ার ওপর ছুরি চালানো হয়েছে। আর জামা বা ধুতি যেভাবে ঝোপে আটকানো আছে, বাঘ টেনে নিয়ে গেলে অমনভাবে থাকতেই পারে না। সবচেয়ে অদ্ভুত কাণ্ড, মোড়লের লাশের নিচে মাটিতে একটা ফাটল আছে—ফাটলের মধ্যে একটা মোটা হাতুড়ির মাথা কর্নেলের চোখে পড়েছিল। হাতল থেকে খুলে গিয়েছিল মাথাটা। সম্ভবত খুনির হাতে হাতুড়িটা ছিল। ওই অবস্থায় টেনে এনেছিল মড়িটা—তারপর কীভাবে খুলে ওখানে ঢুকে যায়। বাঘের মড়ি বলে লাশ কেউ ঘাঁটাঘাঁটি করেনি। তাই চোখে পড়েনি। কিন্তু কর্নেল তা দেখেছিলেন। তারপর কৌশলে গাঁয়ে রটিয়ে দিয়েছিলেন যে গাঁয়ের কারও একটা হাতুড়ির মাথা হারিয়ে গেছে কি না। এর ফলে খুনি সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে এবং ফাঁদে পা দেয়। সে এসেছিল হাতুড়ির মাথাটা নিয়ে যেতে।...

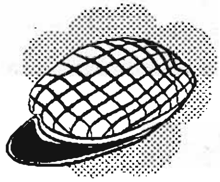

অরুণাচলের ইয়েতি

কর্নেলের মাথায় কখন কোন মতলব গজিয়ে ওঠে, আগে থেকে তার আঁচ পাওয়া ভারি কঠিন। এক উৎকট গ্রীষ্মের সকালে তাই যখন তাঁর তলব পেলুম, আজই দুপুরের ফ্লাইটে গৌহাটি রওনা হতে হবে এবং আমি যেন তৈরি হয়েই বেরোই—একটুও অবাক হইনি।

এই বুড়ো দাড়িওলা টেকো লোকটিকে প্রশ্ন করলে সব সময় জবাব মেলে না। তাই গৌহাটি পৌঁছনো অব্দি কোনও প্রশ্ন করিনি। দেখেছি, প্লেনে ওঁর হাতে একটা মোটা ইংরেজি কেতাব এবং তার পাতায় বুঁদ হয়ে আছেন। বইটার নাম : দি প্রি-হিসটোরিক অ্যানিম্যালস অফ ইন্ডিয়া।'

গৌহাটিতে আমরা একটা প্রাইভেট লজে উঠলুম। বুড়ো আগে থেকেই দেখলুম ব্যবস্থা করে রেখেছেন। লজের মালিক হংসধ্বজ সান্যাল। পঞ্চাশের এদিকেই বয়স। শক্তসমর্থ গড়নের মানুষ। একটু গম্ভীর চালচলন। পোড়খাওয়া চামড়া গায়ে। তিনটে চা বাগিচার মালিক নাকি উনি। বিমানঘাঁটি থেকে আমাদের গাড়ি করে নিয়ে গেছেন।

কর্নেল চমৎকার সাজানো বসার ঘরে একটা ইজিচেয়ারে হাত-পা ছড়িয়ে বসে অস্ফুট একটা আরামের আওয়াজ তুললেন—আঃ! তারপর বললেন—মিঃ সান্যাল, আপনার পার্টনার ভদ্রলোক কি এখনও আসেননি?

হংসধ্বজ বললেন—আগরওয়াল? এসে পড়বে নেক্সট ফ্লাইটে। তারপর আশেপাশের অবস্থা দেখে নিয়ে একটু হেসে আবার বললেন—সন্ধ্যা ছ'টায় ল্যান্ড করবে। ঝড়জলের সম্ভাবনা দেখছি না আজ। আগরওয়ালের পয় আছে।

ঘড়িতে তখন বিকেল তিনটে। আমরা লাঞ্চ সেরেই কলকাতা থেকে বেরিয়েছি। তবু সান্যাল সায়েব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন অতিথি সৎকারে। সেই ফাঁকে কর্নেলকে এতক্ষণে প্রশ্ন করে ফেললুম—হ্যালো ওল্ড বস! ব্যাপারটা কী?

কর্নেল চোখ বুজে কী যেন ভাবছিলেন। চোখ খুলে বললেন—তুমি কি কিছু বলছ ডার্লিং?

খচে গিয়ে বললুম—না।

কর্নেল হেসে উঠলেন। তারপর আমার চোখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকিয়ে বললেন— জয়ন্ত তুমি তো খবরের কাগজের লোক। একজন ক্রাইম রিপোর্টার। দৈনিক সত্যসেবক তোমাকে...

বাধা দিয়ে বললুম—আমাকে মাসে পাঁচ হাজার টাকা মাইনে দিয়ে পুষছে। তাতে আপনার কী? আপনিও তো মিলিটারি সার্ভিসে কম পেতেন না!

কর্নেল একইভাবে তাকিয়ে বললেন—জয়ন্ত, ইয়েতি কাকে বলে জানো নিশ্চয়? হিমালয় পর্বতমালার এই রহস্যময় প্রাগৈতিহাসিক দানবের খবর মাঝে মাঝে তোমাদের কাগজেও বেরিয়েছে। সম্প্রতিও বেরিয়েছে। আশা করি তা লক্ষ্য করেছ। জয়ন্ত, রিপোর্টার হিসেবে এবার একটা দারুণ রকমের সুযোগ তুমি পেয়ে যাচ্ছ। ইয়েতির ওপর একটা অনবদ্য কভারেজ দৈনিক সত্যসেবকে এক্সক্লুসিভলি বেরোলে কী ব্যাপার ঘটবে, টের পাচ্ছ কি? তোমার মাইনে তো বাড়বেই—উপরন্তু ম্যাগসেসে পুরস্কার প্রাপ্তিও ঘটতে পারে। সুতরাং বৎস, দয়া করে মাথাটা ঠাণ্ডা করো।

আমি থ ততক্ষণে। হাঁ করে তাকিয়ে থাকলুম বুড়োর দিকে।

কর্নেল বললেন—সম্প্রতি এই পূর্বাঞ্চলে অরুণাচল প্রদেশের চৌখাম আদিবাসীরা দুটো অদ্ভুত প্রাণীকে পাকড়াও করেছে। এই জঙ্গল লোহিত জেলার পাহাড়ি এলাকার খামতি উপত্যকায় রয়েছে।

এবার মুখ খুললুম।—হ্যাঁ। আমরা বক্স করে সে খবর ছেপেছি। দশ ফুট উঁচু দুটো জানোয়ার—দেখতে অবিকল নাকি মানুষের মতো। একটা পুরুষ অন্যটা স্ত্রী। বিশেষজ্ঞরা তাদের পরীক্ষা করে দেখছেন। কেউ বলছেন, এক জাতের গেরিলা—কেউ বলছেন, একরকম ভালুক। কারও মতে এরাই হচ্ছে সেই ইয়েতি বা তুষার দানব। কোনও কারণে তুষার এলাকা থেকে চলে এসেছিল।....

—দ্যাটস রাইট, জয়ন্ত। বলে কর্নেল তাঁর পকেট থেকে একটা কাগজের কাটিং বের করলেন। পড়তে থাকলেন সেটা।..... '১৯৫৭ সালে জুগন হিমল থেকে টম স্লিক এভারেস্টের পূর্বে তিনশো মাইল এলাকা ইয়েতির খোঁজে তোলপাড় করেন। ককেশাস অঞ্চলে ১৯৪৬ সালে এক রুশ অভিযাত্রীদল ইয়েতির খোঁজে বেরিয়ে একটা একশো বছরের পুরনো বিশাল কঙ্কাল আবিষ্কার করেন। রুশ বিশেষজ্ঞদের মতে ককেশাসে এখনও ইয়েতি আছে। ১৯৬৯ সালের জুনে থাই-বর্মা-লাওস সীমান্তে মেকং নদীর ধারে দুটো অতিকায় মনুষ্যাকৃতি প্রাণী দেখা গিয়েছিল। দর্শক ছিল অনেক। প্রাণীরা তাদের দিকে পাথর ছুড়েছিল। রেঙ্গুনের এক দৈনিক পত্রিকায় খবরটি বেরোয়।'

বাধা পড়ল সান্যাল সায়েবের কথায়—কর্নেল, ও তো কাগজের খবর। আমার পার্টনার বন্ধু আগরওয়ালসায়েব কী বিবরণ দিয়েছেন আপনাকে জানি না। তবে...

পাল্টা বাধা দিয়ে কর্নেল গম্ভীর হয়েই বললেন—হ্যাঁ। সেটা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ বলা যায়। তাই শুনেই আমি উৎসাহ দেখিয়েছি। সত্যি বলতে কী, ওঁর কথায় এতটুকু গরমিল অথবা সন্দেহ করার মতো কিছু খুঁজে পাইনি মিঃ সান্যাল।

হংসধ্বজ হেসে উঠলেন। বললেন—এবার আমার দিক থেকে ব্যাপারটা শুনুন কর্নেল। গত ২৫শে মে অরুণাচলের উপজাতি অধ্যুষিত খামতি এলাকার জঙ্গলে আমি ও আগরওয়াল ক্যাম্প করে দিন-রাত্রিটা কাটাই। আমাদের সার্ভেয়ার টিম পাহাড়ের তলায় খোঁড়া-খুঁড়ি করছিল। ওখানে সাতশো একর মতো জায়গা আমরা সরকারের কাছে লিজ নিয়েছি। সেখানে সীসের খনি আছে বলে আমাদের ধারণা। যাই হোক, হঠাৎ অনেক রাতে ঘুম ভেঙে যায়। নাকে কেমন একটা বিকট গন্ধ লাগে। ফুটফুটে জ্যোৎস্না ছিল। সার্ভেয়ার কুলিকামিনরা আশেপাশে তাঁবুতে ঘুমোচ্ছিল। আমাদের তাঁবুতে পাশাপাশি দুটো ক্যাম্পখাটে আমি ও আগরওয়াল। গন্ধটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল তাঁবুটার ওপর কোনও জন্তু চাপ দিচ্ছে। টর্চ নেব এবং আগরওয়ালকে ডাকব ভাবছি, কিন্তু কোন ফুরসত পেলুম না। আচমকা কী একটা জন্তু আমার ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমার বুকে বসে সেটা মানুষের মতো দুহাতে আমার গলা টিপে ধরল। দম আটকে গেল। কিন্তু ঝাঁপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়েছিলুম একটুখানি, সেটা পাশের ক্যাম্পে কেউ কেউ শুনতে পায়। তার ফলে তক্ষুনি হল্লা শুরু হয়। বন্দুকের আওয়াজ করা হয়। ওরা তো জানে না, আমার তাঁবুতেই কী ঘটেছে। আগরওয়াল বোকার মতো দৌড়ে বেরিয়ে যায়। তার পাশেই আমি আক্রান্ত ও বুঝতে পারেনি। আমার ধারণা ওই, হল্লা ও আওয়াজে ভয় পেয়ে জন্তুটা আমাকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু তাকে বেরিয়ে যেতে দেখে সবার বীরত্ব উবে যায়। আন্দাজ সাতফুট উঁচু—বরফের মতো সাদা উলঙ্গ প্রকাণ্ড ওই মূর্তি দেখলে তা অস্বাভাবিক মনে হয়। যাই হোক, সে যখন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, তখন একজন সার্ভেয়ার গুলি ছোড়ে। আশ্চর্য! দানবটা ঘুরেও তাকায় না। জঙ্গলে উধাও হয়ে যায়। তখন দুঃসাহসী আগরওয়াল তার পিছনে দৌড়ে যায়।

কর্নেল বললেন—দানবটা বাইরে যাওয়ার পর আপনি কি দেখেছিলেন ওটাকে?

হংসধ্বজ বললেন—না। কারণ, আমি বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারিনি। অজ্ঞান হয়ে গেছলুম।

—তবে কেমন করে জানলেন যে ওটা প্রকাণ্ড এবং বরফের মতো সাদা?

—আমার লোকেরা বর্ণনা করেছে।

—হুম! আগরওয়াল সায়েব আমাকে যা বলেছেন—তা আপনার বর্ণনার সঙ্গে এক। উনি কিছুদূর তাড়া করে ফিরে আসেন। পাহাড়ের আড়ালে ওটা অদৃশ্য হয়।

বলে কর্নেল চুরুট বের করে জ্বেলে নিলেন। তারপর ফের বললেন—আগরওয়াল সাহেব ফিরে এসে আপনাকে অজ্ঞান দেখেন। তখন লোকজনকে খুব বকাবাকি করেন। তাদের অবশ্য দোষ ছিল না। ওই বিস্ময়কর প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীটা প্রত্যক্ষ দেখে সবাই আতঙ্কে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। সেটাই স্বাভাবিক। আচ্ছা মিঃ সান্যাল, যে সার্ভেয়ার ভদ্রলোক গুলি ছুড়েছিলেন, তিনি কি এখনও আছেন ওখানে?

হংসধ্বজ মাথা নাড়ালেন।—সে একটা দুঃখের ব্যাপার কর্নেল। ভদ্রলোক ওই ভয়ানক প্রাণীটা দেখার পর থেকে কেমন অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর চাকরি ছেড়ে চলে যান। খুব অভিজ্ঞ খনিতত্ত্ববিদ ছিলেন। ধাতুবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ বটে। কী করি? থাকলেনই না যখন, আটকালুম না। আর শুধু উনি একা নন—সার্ভেয়ার গ্রুপের বাকি সবাই চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছে। এলাকার কুলিকামিনারও পালিয়েছে। অবশেষে নতুন সার্ভেয়ার গ্রুপ এবং কুলিকামিন সংগ্রহ করেছি আমরা।

আমি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলুম ভেতরে ভেতরে। তাহলে সেই রহস্যময় ভয়ঙ্কর দানবের খোঁজেই কর্নেল নীলাদ্রি সরকার এখানে চলে এসেছেন? উত্তেজনা দমন করলুম। 'অরুণাচলে ইয়েতি' নামে একটা সম্ভাব্য রিপোর্টাজ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। দৈনিক 'সত্যসেবকে'র বিক্রিসংখ্যা আবার একদফা বেড়ে যাবে।...

সন্ধ্যায় এসে পৌঁছলেন হরিহর আগরওয়াল। বয়সে হংসধ্বজেরই কাছাকাছি। আয়তনে একটু মোটা এই যা। রংটা ধবধবে ফর্সা। খুব হাসিখুশি মানুষ। দু'জনে ছাত্রজীবন থেকেই বন্ধু। চা বাগিচা ও একটা খনিতে দু'জনের অংশীদারীত্ব সমান সমান। চমৎকার বাংলা বলতে পারেন আগরওয়াল। অবাঙালি বলে চেনা কঠিন। এসে জানালেন—নতুন সার্ভেয়ার গ্রুপ এবং লোকজন অলরেডি চলে গেছে। কাজ শুরু হয়েছে। শীগ্‌গির পৌঁছনো দরকার। নয়তো তারাও পালাবে।

পরদিন সকালে আমাদের যাত্রা শুরু হল। ট্রেনে লামডিং, ডিমাপুর হয়ে তিনসুকিয়া এবং তারপর ডিব্রুগড়। সেখান থেকে আবার ট্রেনে ডাঙ্গোরি। ডাঙ্গোরি থেকে জিপের ব্যবস্থা করা ছিল। লোহিত নদী পেরিয়ে মদিয়া নামে একটা জায়গায় পৌঁছলুম—সেখানেই সভ্যজগতের সীমানা শেষ হয়েছে। দুটো দিন দুটো রাত কেটে গেল রাস্তায়। মদিয়া থেকে দুর্গম পাহাড় ও জঙ্গল শুরু। রাস্তা বলতে তেমন কিছু নেই। আমাদের জিপ কিন্তু হেলেদুলে নির্ভয়ে চলতে থাকল।

খামতি পৌঁছলুম সন্ধ্যা নাগাদ। তখন শরীর একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। নার্ভও বিপর্যস্ত। কর্নেল বুড়ো কিন্তু আশ্চর্য নির্বিকার। সারাপথ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা শুনিয়েছেন। এই সব অঞ্চলেই নাকি উনি ছিলেন এবং সব নখদর্পণে। এমনকি অনেক পাহাড়ি সর্দারের সঙ্গে ভাব হয়েছিল—কর্নেলের বিশ্বাস, দেখলে তারা এখনও চিনতে পারবে।

একটা সুদৃশ্য উপত্যকায় সান্যালসায়েবদের লোকেরা কাজ করছে। ছোট নদী আছে। তার দু'ধারে নিবিড় জঙ্গল। জঙ্গলের একদিকে খনি খোঁড়ার এবং মাটি পরীক্ষার কাজ চলছে। তাঁবুগুলো একটা টিলার গায়ে। কাজের চেয়ে হল্লাটা খুব বেশি মনে হল। সম্ভবত ইয়েতির আতঙ্কে সবাই

জড়োসড়ো। এখানে ওখানে আগুন জ্বালানো হয়েছে। তার ওপর এখন নিজেদের জেনারেটর থেকে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আলোয় জায়গাটা দিনের মতো ফর্সা হয়ে রয়েছে। মনে হল, ইয়েতির কর্তাবাবার সাহস হবে না, আবার এখানে এসে টুঁ মারে। কর্নেল জায়গাটা দেখতে দেখতে একটু হেসে ঠিক তাই বলে উঠলেন।

খাওয়ার পর ক্যাম্পচেয়ারে বসে সবাই যখন গল্পগুজব শুরু করেছে, আমি তখন তাঁবুর ভেতরে গড়িয়ে পড়েছি। শরীর একেবারে অচল। ঘুম পাচ্ছে প্রচণ্ড। আতঙ্কও হচ্ছে—যদি ইয়েতি এসে আমারও গলা চেপে ধরে।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে অব্দি বাইরে ওদের কথাবার্তার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলুম। কর্নেল বলছিলেন—ইয়েতির চামড়া কেমন মনে হয়েছিল বললেন মিঃ সান্যাল? খসখসে—শক্ত, তাই না? দ্যাটস পসিবিল্।

হংসধ্বজবাবুর গলা শুনলুম।—হ্যাঁ, খসখসে, শক্ত! কেমন যেন প্লাস্টার আঁটা মানুষের মতো।...

তারপর ঘুমিয়ে গেছি। এমন গভীর ঘুম জীবনে ঘুমোইনি। ইয়েতি এলে দিব্যি আমাকে মেরে যেতে পারত। ঘুম যখন ভাঙল, অভ্যাসমতো হাতঘড়ির দিকে তাকালুম—ছ'টা। কিন্তু প্রচুর রোদ ফুটেছে বাইরে। অরুণাচল কি না। তখন নিজের ঘুমের প্রতি ব্যাজার হলুম। এমন ঘুম তো কলকাতায় দেখি না আসতে! এই ইয়েতির জঙ্গলে এত ঘুম!

পাশের ক্যাম্পখাটের দিকে তাকিয়ে দেখি বুড়ো নেই। উঠে পড়লুম। বাইরে যেতেই দেখা হল হংসধ্বজের সঙ্গে। বললেন—গুড মর্নিং মিঃ চৌধুরি!

—গুড মর্নিং! কর্নেল কোথায়?

—উনি তো পাঁচটায় বেরিয়েছেন। ওরা নিষেধ করেছিল—শোনেননি। এখন আগরওয়াল ওঁর খোঁজে গেল। ... উদ্বিগ্ন মুখে হংসধ্বজ একথা বললেন।

আমি হেসে বললুম—ভাববেন না। ওঁর নানান বাতিক। সঙ্গে অদ্ভুত ক্যামেরা দেখেছেন? বাইনাকুলারটাও আশা করি দেখেছেন? হয়তো দেখবেন, ইয়েতির ছবি তুলে নিয়েই ফিরে আসবেন।

হংসধ্বজ তবু আশ্বস্ত হতে পারলেন না। বললেন—এলাকার উপজাতীয় কোনও কোনও গোষ্ঠী এখনও খানিকটা বন্য স্বভাবের এবং হিংস্র। সভ্য মানুষ দেখলে মেরে ফেলে। তাছাড়া বৈরী নাগারাও থাকতে পারে! বেশিদূর গিয়ে পড়লে......

বাধা দিয়ে বললুম— কর্নেল তো বলেছিলেন, এলাকা ওঁর চেনা। ভাববেন না। ওই বুড়োকে তো আমি চিনি।

চা-ব্রেকফাস্টের পর আমাকে হংসধ্বজ ওঁদের খনির কাজ দেখাতে নিয়ে গেলেন। সব ঘুরে দেখতে দশটা বেজে গেল। তারপর কর্নেল ফিরলেন। সঙ্গে আগরওয়ালও আছেন। আগরওয়াল এসেই বললেন—সান্যাল! ইউরেকা! এইজন্যেই তো আমি তোমাকে বলেছিলুম—কর্নেল সায়েব ছাড়া এই ইয়েতি রহস্য ফাঁস করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। ক্লু পাওয়া গেছে।

হংসধ্বজ অবাক হয়ে বললেন—তার মানে?

—কর্নেল এই ইয়েতির পায়ের ছাপ খুঁজে পেয়েছেন। আমিও গিয়ে স্বচক্ষে দেখলুম। একেবারে মানুষের মতো!

কর্নেল একটু হেসে বললেন—না, কতকটা মানুষের মতো!

হংসধ্বজ উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করলেন—কোথায় দেখলেন? কত দূরে? কাছাকাছি নাকি?

—খুব বেশি দূরে নয়। ওই নদীর বালিতে—মাত্র তিনশো গজ দূরে।

হংসধ্বজের মুখ সাদা হয়ে গেল।—সর্বনাশ! বলেন কী!

আগরওয়ালকে দেখে মনে হল, ভয় পাননি। বললেন—শুধু তাই নয়। ওই পায়ের ছাপ অনুসরণ করে আমরা ওপারের পাহাড়ের একটা গুহার সামনে পৌঁছলুম। গুহায় অবশ্য ঢুকতে সাহস পাইনি। পরে লোকজন নিয়ে ঢুকব বলে দু'জনে বড় একটা পাথর ঠেলাঠেলি করে মুখটা বন্ধ করে লেুম। সান্যাল, অবিকল সেই রাতের মতো বিটকেল গন্ধও আমি টের পেয়েছি সেখানে।

কর্নেল মাথা নেড়ে বললেন—আমি অবশ্য পাইনি।

আমি বললুম—ইয়েতির কাছে ওই পাথরটা কি বাধা হবে মনে করেন কর্নেল? ও তো এক ধাক্কায় গুহার দরজা ফাঁক করে বেরিয়ে আসবে!

কর্নেল মাথা নাড়লেন আবার।—ইউ আর রাইট, জয়ন্ত।

—তাহলে পাথর ঠেলাঠেলি করতে গেলেন কেন, শুনি?

—আগরওয়াল সায়েব জেদ করলেন, তাই।

আগরওয়াল ব্যস্তভাবে বললেন—কর্নেল! পাথরটা কিন্তু এমনভাবে খাঁজে আটকে দিয়েছি আমরা যে গুহার ভেতর থেকে ঠেলে সরানো অসম্ভব।

কর্নেল তাঁর দিকে ঘুরে বললেন—ইউ আর রাইট।

আমি হতভম্ব। আমাকেও রাইট বললেন, আবার আগরয়ালকেও রাইট বলেন? অর্থাৎ ইয়েতিটা গুহার মুখের পাথর ঠেলে বেরিয়ে আসতে পারবে এবং পারবে না—এমন পরস্পরবিরোধী কথা কেন বললেন কর্নেল? বুড়িয়ে বাহাত্তুরে ধরেছে নির্ঘাৎ। মনে মনে হাসলুম—আবার উদ্বিগ্নও হলুম।

হংসধ্বজ ভয়ে ভয়ে বললেন—আপনি কি মনে করেন, সত্যি গুহার মধ্যে ইয়েতি আছে?

কর্নেল আবার মাথা নাড়লেন।—জানি না। তবে পায়ের ছাপ আমরা গুহার ভেতর অব্দি দেখেছি। এটুকুই বলতে পারি। যাইহোক, আপনারা লোক জোগাড় করুন। দু'ঘন্টার মধ্যে আমরা বেরোব....

একটু পরেই দেখি, খবরটা কীভাবে পাচার হয়ে গেছে। ইতস্তত জটলা এবং আলোচনা চলছে। কুলিকামিন, সার্ভেয়ার গ্রুপ সবাই উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। হংসধ্বজ এবং আগরওয়াল বেগতিক দেখে সবাইকে সাহস দিয়ে বেড়াচ্ছেন। সেই ফাঁকে কর্নেল আমার হাত ধরে টানলেন। তারপর একটা গাছের তলায় গিয়ে চাপা এবং গম্ভীরস্বরে বললেন—জয়ন্ত! এক অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছি এখানে এসে। মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না। কিন্তু এখানে এসে যা বুঝতে পারছি তাতে....

বাধা দিয়ে বললুম— পুরো ব্যাপারটা গুল?

— স্রেফ গুলই বা বলি কী করে? আগের লোক যারা জনাকতক এখনও দলে রয়েছে, সকালে তাদের প্রত্যেকের কাছে ঘটনাটা জেনেছি। সবাই ইয়েতিকে দেখেছে। বিরাট সাদা মূর্তি। দু'হাত সামনে ঝুলিয়ে হেঁটে গেছে। সে-রাতে ফুটফুটে জ্যোৎস্না ছিল। দেখতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। অথচ আমার ইনটুইশন বলছে—জয়ন্ত,আমার সেই বিস্ময়কর ইনটুইশনের কথা স্মরণ করো—যা থেকে আমি আবহাওয়ায় কোনও হত্যাকাণ্ডের গন্ধ টের পাই।

ভয় পেয়ে বললুম—সে কী; আপনার মনে হচ্ছে এখানেও কোনও হত্যাকাণ্ড হবে?

—হবে, জয়ন্ত। আই জাস্ট স্মেল ইট। কিন্তু কীভাবে হবে—কে খুন করবে, কেই বা খুন হবে—কিচ্ছু জানি না। কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। আমি নিজেকে এক অসহায় দেখছি—কহতব্য নয়।

উদ্বিগ্ন মুখে বললুম—হংসধ্বজ আর আগরওয়ালের মধ্যে পার্টনারশিপের ব্যাপারে কোনও রেষারেষি নেই তো?

—কোনও প্রমাণ পাইনি। কলকাতায় আগে ওঁদের কনসার্ন সম্পর্কে খোঁজখবর স্বাভাবিক কৌতূহলবশতই নিয়ে এসেছি। দুজনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বললে ভুল হয়—একেবারে একাত্মা। একসঙ্গে খায় ও ঘুমোয়। দুজনেই বাবার ত্যাজ্যপুত্র—ঘরপালানো দুঃসাহসী ছেলে। যা কিছু সম্পত্তি করেছে সব নিজের উদ্যমে। তাছাড়া, যা বুঝেছি—এইসব সম্পত্তি অর্জন, ওদের কাছে নেশার মতো। উদ্দেশ্যহীন। জীবনে এমন অনেক মানুষ আছে জয়ন্ত—যারা নেশার ঘোরে নানা কাজ করে বেড়ায়। টাকার মালিক হওয়াটাই তাদের সুখ নয়—সুখ বিচিত্র সব কাজে। এমন মানুষ এই দুই বন্ধু। এদের মধ্যে এমন কি ঘটতে পারে, আমি জানি না—যাতে কেউ কাউকে খুন করতে চাইবে?

আমি চুপ করে থাকলুম। বুড়োর এ স্বভাবের কথা জানি। কেউ কোনও ব্যাপারে ডাকলেই উনি তার সম্পর্কে বিশদ হালহদিশ না জেনে এগোবেন না। ইয়েতিই হোক, আর বাড়িতে ভূতের ঢিল পড়ুক কিংবা চুরি-ডাকাতিই হোক—মক্কেলের আতিপাতি জানা চা-ই।

কর্নেল টুপি খুলে টাকে বাতাস লাগাচ্ছিলেন। হঠাৎ বললেন—এস জয়ন্ত, আমরা সার্ভেয়ার গ্রুপের হেড ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করি। উনি শুনেছি ভারতের শ্রেষ্ঠ ভূতত্ত্ববিদদের অন্যতম। অনেক চড়া দামে ওকে হংসধ্বজবাবুরা ক'মাসের জন্য এনেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার আজকাল এসব ব্যাপারে এক্সপার্টদের সহায়তা পাইয়ে দিচ্ছে—তাই ওঁকে পেতে অসুবিধে হয়নি। তুমিও কোথাও খনিটনির সম্ভাবনা খুঁজে বের করো না! সরকার তোমাকে সবরকম টেকনিক্যাল নো-হাউ দিয়ে সাহায্য করবে। করবে নাকি জয়ন্ত?

কথাটা বলে কর্নেল হাসতে হাসতে পা বাড়ালেন। কিন্তু হাসিটা কেমন শুকনো মনে হল।...

দুপুর সাড়ে বারোটার মধ্যেই হংসধ্বজ আর আগরওয়াল প্রায় একশো লোকের একটা অভিযাত্রী বাহিনী গড়ে তুললেন। অধিকাংশই ওই অঞ্চলের অধিবাসী। তারা যেমন দুঃসাহসী, তেমনি গোঁয়ার মানুষ। অস্ত্রশস্ত্র প্রত্যেকের হাতেই রয়েছে। বন্দুকও মোট পাঁচটি। আমি ও কর্নেল সঙ্গে এনেছিলুম শিকারের রাইফেল। হংসধ্বজ ও আগরওয়ালেরও শিকারের রাইফেল আছে। হেড সার্ভেয়ার মিঃ পরেশ পুরকায়স্থের নিজস্ব রাইফেল রয়েছে। তাছাড়া আমাদের প্রত্যেকের একটা করে রিভলবারও আছে। কাজেই আয়োজন খুব সাংঘাতিক হল। দেখলুম স্থানীয় লোকেরা ঢাকও নিয়েছে কয়েকটা। শিঙাও আছে গোটা দুই।

এছাড়া কয়েক টিন পেট্রোল আর ফার্স্ট এডের সরঞ্জামও নেওয়া হল। সার্ভেয়ার গ্রুপের সঙ্গে একজন ডাক্তারও ছিলেন এখানে। ব্রজবিলাস বর্মন আমাদের লোক। তিনি বড় ভীত মনে হল। মুখ পাংশু। ভিড়ের ভিতর ঢুকে অনিচ্ছায় পা বাড়ালেন।

রীতিমতো ইয়েতি অভিযান। সব খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে হাঁটছিলাম। জব্বর রকমের রিপোর্টাজ লিখতে হবে কাগজের জন্যে।

একঘন্টা কষ্টকর যাত্রার পর প্রায় দুর্গম এক পাহাড়ের গুহার সামনে আমরা পৌঁছলুম। কর্নেলকে দেখলুম, যেন মোটেও নেতৃত্ব নিতে রাজি নন। সব আগরওয়ালের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। অনেক জল্পনার পর ব্যূহ সাজানো হল কয়েকটা। গুহামুখ থেকে তিরিশ গজ দূরে একটা ঝোপের আড়ালে হংসধ্বজের নেতৃত্বে একদল ওত পেতে বসল। দুটো দল যথাক্রমে হেড সার্ভেয়ার পরেশবাবু ও ভীতু ডাক্তারের নেতৃত্বে ডাইনে ও বাঁয়ে পাথরের আড়ালে বসল। চতুর্থ দল গুহামুখের উপরে পাহাড়ে গেল। সেখানে গাছ ও পাথরের আড়ালে তারাও বসল। চতুর্থ দল গুহামুখের উপরে পাহাড়ে গেল। সেখানে গাছ ও পাথরের আড়ালে তারাও বসল। তাদের নেতাকে আমি চিনি না—মনে হল সার্ভেয়াদের কেউ। পঞ্চম দলে আমি ও কর্নেল—সঙ্গে কুড়িজন উপজাতীয় কুলিকামিন। আমরা চলে গেলুম পাহাড়ের পিছনের দিকে—একটা ফাটলে গিয়ে

ঠাসাঠাসি বসে পড়লুম। ফাটলটা ভূমিকম্পের ফলে হয়েছে। আন্দাজ হাত ছয়েক চওড়া। অনেক ছোট বড় পাথরে ভর্তি। ইয়েতি তাড়া করলে নির্ঘাত মারা পড়তে হবে। এখানে বসার কারণ, গুহার অন্যমুখে ইয়েতি বেরোলে আমরা তাকে আক্রমণ করব। কিন্তু তাকে প্রাণে মারা চলবে না। ঠ্যাং খোঁড়া করে কাবু করতে হবে, অর্থাৎ জ্যান্ত ধরারই প্ল্যান করা হয়েছে।

কথা হয়েছে, গুহার মুখে শুকনো লকড়ি ঠেসে দিয়ে পেট্রোল ছড়িয়ে আগুন ধরানো হবে। ধোঁয়া দেখলেই আমরা প্রত্যেকটি দল সতর্ক হব।

হঠাৎ দেখি কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। তারপর দলের একজনকে ডেকে হিন্দিতে বললেন—নাতানুক! তুমি ওদের লিডার হও। আমি আর এই জয়ন্তবাবু নীচের দিকে গিয়ে বসি। না না—আমরা দু'জনই যথেষ্ট। মনে রেখো, তুমিই লিডার নাতানুক?

নাতানুক নামে লোকটা প্রৌঢ়। দারুণ শক্ত সমর্থ চেহারা—বেঁটে খাটো, থ্যাবড়া নাক, কুতকুত চোখে হাসি। বুঝলুম ও খুশি হয়েছে। কুলিদের সর্দার সে। সায় দিয়ে একটা ধারালো প্রকাণ্ড দায়ের মুঠো যেভাবে চেপে ধরল, মনে হল ইয়েতির একটা ঠ্যাং সে কাটবেই। আমরা পিছনের দিকে দ্রুত এগোলুম। অবশ্য আমি কর্নেলের মতলব একটুও টের পাচ্ছি না। পাথরের বাধা পেরিয়ে অনেক কষ্টে ওঁকে অনুসরণ করছি। মনে প্রচণ্ড উত্তেজনা। তাহলে সেই কিংবদন্তিখ্যাত রহস্যময় তুষারদানব সত্যি কি স্বচক্ষে দেখার অমূল্য অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চলেছি? আমার সঙ্গে ক্যামেরাও আছে। ফিল্ম রেডি। শুধু শাটার টেপার ওয়াস্তা। এই প্রথম দৈনিক সত্যসেবকের পাতায় সত্যিকার ইয়েতির ছবি দেখা যাবে। হে ঈশ্বর, সদয় হও!

কিন্তু কর্নেল থামবার তালে নেই। কোথায় যাচ্ছেন উনি? ফাটলের শেষে একটা খোলা জায়গায় পড়লুম। অমনি পাহাড়ের অন্যদিক থেকে ভেসে এল তুমুল চিৎকার ও বন্দুকের শব্দ। তারপর ধোঁয়া দেখতে পেলুম। কর্নেল বলে উঠলেন—জয়ন্ত! কুইক, ওই পাথরের আড়ালে চলো।

প্রকাণ্ড পাথরের পিছনে গিয়ে বসলুম দুজনে। চেঁচামেচির সঙ্গে ঢাকের আওয়াজ ও বন্দুকের শব্দ বাড়তে থাকল। রুদ্ধশ্বাসে মুহূর্ত গুনছি। জানি না ইয়েতিটা কোনদিকে বেরোবে। পাহাড়ের উপর আকাশে মেঘের মতো ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছি।

তারপর আমার পাঁজরে খোঁচা দিলেন কর্নেল। তাকিয়েই আমি হতবাক, চোখ নিষ্পলক। ক্যামেরার কথা ভুলেই গেলুম। দিন দুপুরের ঝলমলে রোদে এদিকটা ভরে আছে। পাহাড়ের এ-পিঠ সম্পূর্ণ ন্যাড়া। উপরের একটা খাঁজের তলায় দাঁড়িয়ে আছে ...

হ্যাঁ, সেই কিংবদন্তিখ্যাত প্রাগৈতিহাসিক তুষার মানব অথবা দানব। সেই রহস্যময় ইয়েতি! বিশাল উঁচু ও চওড়া দেহ। উলঙ্গ। সম্পূর্ণ সাদা। চামড়া যেন ভাঁজবহুল। হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম। স্বপ্ন দেখছি না তো? আমাদের মাথার উপর পাথরের চাতালে আন্দাজ কুড়িফুট দূরত্বে প্রাণীটা দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছে। লাফ দিলেই আমাদের উপর এসে পড়বে।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর কর্নেল আচমকা হাততালি দিলেন। আর অমনি ইয়েতিটা আমাদের দেখতে পেল। তারপর চাতালের অন্যদিকে সরে গেল। আমি রাইফেল তুললেই কর্নেল বললেন—ক্যামেরা জয়ন্ত, ক্যামেরা!

তখন রাইফেল নামিয়ে ক্যামেরা তুলে পটাপট কয়েকটা ছবি নিলুম। ততক্ষণে ইয়েতি লাফ দিয়েছে। চাতাল আছে ধাপে ধাপে। কয়েকটি লাফে আমাদের পাথরটার আড়ালে যেতেই কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। আমিও উঠলুম। দেখলুম, ইয়েতিটা সমতলে পড়ে দৌড়চ্ছে। একেবারে মানুষের মতো দৌড়চ্ছে। কর্নেল দৌড়তে শুরু করলেন তার পিছনে। আমি একটু ইতস্তত করে তাঁকে অনুসরণ করলুম। চেঁচিয়ে উঠলুম—সাবধান কর্নেল।

গাছপালার মধ্যে তখন ঢুকে পড়েছে জন্তুটা। কর্নেল কি পাগল? তিনি পিছনে দৌড়চ্ছেন—আমিও বোকার মতো দৌড়চ্ছি। হাঁফাতে হাঁফাতে বললুম, গুলি করুন। কর্নেল, গুলি!

কর্নেল আমাকে বোকা বানিয়ে জোরে হেসে উঠলেন এবং চাপা গলায় ইয়েতিটার উদ্দেশে বললেন—আমরা আপনার বন্ধু মিঃ সান্যাল! প্লিজ, একটু দাঁড়ান। আপনার কোনও ভয় নেই।

আমাদের চারপাশে ঘন জঙ্গল। ছায়া আছে। ইয়েতিটা তক্ষুণি দাঁড়িয়ে গেল। ঘুরে মানুষের কণ্ঠস্বরে বলে উঠল—কে আপনারা?

কর্নেল অকুতোভয়ে এগিয়ে গিয়ে বললেন—আমি প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। ইনি কলকাতার দৈনিক সত্যসেবকের প্রখ্যাত রিপোর্টার জয়ন্ত চৌধুরী। আর জয়ন্ত, ইনিই হলেন আদি ও অকৃত্রিম মিঃ হংসধ্বজ সান্যাল।

আমি আকাশ থেকে পড়লুম। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলুম। কর্নেল বললেন—আপাতত মিঃ স্যান্যাল, আপনার গায়ের প্লাস্টারগুলো আগে ছাড়িয়ে ফেলা দরকার। আপনার আর ইয়েতি সাজবার কোনও কারণ নেই। আমি সব টের পেয়েছি।

ইয়েতি ক্লান্তস্বরে বললেন—কিন্তু আগরওয়াল আর ওই শয়তান প্রতারকটার কী হবে? ওদের যে আমি শাস্তি দিতে পারলুম না! বরং আমাকেই ওরা পুড়িয়ে মারার ষড়যন্ত্র করল।

কর্নেল হাত তুলে তাকে আশ্বস্ত করে বললেন—সেজন্যে আইন আছে, মিঃ সান্যাল। এসব ব্যাপারে আপনি আমার ওপর নির্ভর করতে পারেন। কিন্তু প্রতিশোধ নিতে আপনি যে অভিনব পন্থা নিয়েছেন, তা মোটেও কাজের নয়; উল্টে আপনিই পুড়ে মরতেন।

এখন চলুন কোনও ঝরনায় গিয়ে সেখানে গায়ের প্লাস্টার খুলে আমরা তিনজনে কোনও উপজাতীয়দের গ্রামে যাব। সেখানে আপনাকে নিরাপদে রেখে আমরা দু'জনে ফিরব। কথা দিচ্ছি, আগামিকাল যে কোনও সময় আমরা এসে আপনাকে নিয়ে যাব। ততক্ষণে আপনার পার্টনার আগরওয়াল এবং তার সহকারী জাল হংসধ্বজ সান্যালকে গ্রেফতার করা হয়েছে জানবেন।...

তখন বিকেল হয়েছে।

দাফাং নামে একটা গ্রামের মোড়লের বাড়ি সত্যিকার হংসধ্বজবাবুকে রেখে আমরা ফিরলুম ক্যাম্পে। দেখি, সবাই কখন ফিরেছে। আমাদের দেখে আগরওয়াল ও জাল হংসধ্বজ দৌড়ে এলেন। কর্নেল ক্লান্ত স্বরে বললেন—ইয়েতিটার পিছনে অনেকদূর গিয়েছিলুম। গুলিও করলুম। কিন্তু আমাদের বরাত। পালিয়ে গেল।

কথামতো আমি ইনিয়ে বিনিয়ে সব ব্যাপারটা বানিয়ে শোনালুম। শুনে ওঁরা খুব নিরাশ হলেন। তারপর কর্নেলের পরামর্শমতো আমি কলকাতায় আমার কাগজে খবর পাঠাতে তক্ষুণি মদিয়া যেতে চাইলুম। জিপের ব্যবস্থা হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। অনেক রাতে সেখানে সরকারি বাংলোর চৌকিদারকে ঘুম থেকে তুলিয়ে নিজের পরিচয় দিলুম। জিপের ড্রাইভারকে বললুম—আপাতত এখানেই রাত কাটাতে চাই। কাল সকালে আমরা ফিরব। সে রাজি হল। রাস্তা দুর্গম—তাতে বৈরী নাগাদের ভয় আছে। রাতে ফেরা নিরাপদ নয়।

সেই রাতেই কর্নেলের চিঠি নিয়ে থানায় যোগাযোগ করলুম। তারপর রাতটা বাংলোয় কাটিয়ে পরদিন সকালে ক্যাম্পে পৌঁছলুম। পুলিশ আসবে কথামতো দুপুরের মধ্যেই।

কিন্তু তখনও রহস্যের চাবিকাঠি কর্নেলের হাতে। এই ওঁর অভ্যাস।

কর্নেল কিছুক্ষণের জন্যে একবার একা জঙ্গলে ঘুরে এলেন। বিরল জাতের পাখি দেখতেই বেরিয়েছিলেন। আমি আগরওয়ালদের নানা কথায় ভুলিয়ে রাখলুম। তারপরে সবে লাঞ্চ সেরে কর্নেল ও আমি তাঁবুতে গড়াচ্ছি—পুলিশের জিপের আওয়াজ কখন শোনা যাবে সেই প্রতীক্ষা

করছি—হঠাৎ আগরওয়ালের তাঁবু থেকে চাপা ধস্তাধস্তির শব্দ কানে এল। কর্নেল অমনি লাফিয়ে উঠে বললেন—কুইক জয়ন্ত! রিভলভার লোড করে নাও। চলে এস। দেখলুম উনিও রিভলভার হতে নিলেন! দু'জনে দৌড়ে আগরওয়ালের তাঁবুতে গেলুম। কর্নেল পর্দা তুলেই গর্জে উঠলেন—মিঃ আগরওয়াল, দাঁড়ান!

উঁকি মেরে একপলকেই দেখলুম দৃশ্যটা। দুটো ক্যাম্প খাটের মাঝে মেঝেয় জাল হংসধ্বজকে ফেলে তার বুকে বসে আছেন আগরওয়াল। দু'হাতে গলা টিপে ধরেছেন।

আগরওয়াল তখুনি উঠে কাঠ হয়ে দাঁড়লেন। কর্নেল বললেন—কাজে নেমে ঝগড়া মারামারি কাজের কথা নয় মিঃ আগরওয়াল। বখরা নিয়ে এসব ক্ষেত্রে খুনোখুনি হয়েই থাকে। তবে খুন করে ইয়েতির ঘাড়ে চাপানোর আর উপায় নেই মশাই!

আগরওয়াল ঘোঁত ঘোঁত করে বললেন—কী বলছেন, বুঝতে পারছি না।

—নিশ্চয় পারছেন। বিশেষ করে যখন সত্যি সত্যি ইয়েতির আবির্ভাব ঘটেছে। তখন সবাই টের পেয়ে গেছেন বই কি। নিশ্চয় আঁচ করেছেন, এই ইয়েতিটা আসলে কে!...কর্নেল একটু হাসলেন।—অবশ্য, আপনি যখন আমার কাছে ইয়েতির খবর নিয়ে যান, তখন একটুও ভাবেননি যে ওই ইয়েতিটা আপনার পার্টনার ও আজীবন বন্ধু হতভাগ্য হংসধ্বজ সান্যাল। তখন সত্যিকার ইয়েতির আতঙ্কেই আমার সাহায্য চেয়েছিলেন। কিন্তু এবার যখন কথায় কথায় আমি এই জাল হংসধ্বজের কাছে জেনে নিলুম যে ইয়েতির গায়ের চামড়া খসখসে শক্ত এবং ভাঁজবহুল—কতকটা প্লাস্টারের মতো, তখনই আপনি সন্দেহ করতে শুরু করেন। তারপর ওই গুহার দরজায় গতকাল সকালে আমার সঙ্গে গিয়ে ঠিক আমারই মতো এমন কিছু চিহ্ন আপনার চোখে পড়েছিল, যাতে ইয়েতিটা যে কে চিনতে আপনার দেরি হয়নি। তাই তাকে পুড়িয়ে মারতে ব্যবস্থা করলেন। সবই ঠিক ছিল। বাদ সাধলুম আমি। গুহার পেছন দিকটায় আমি থাকতে চাইলুম। তাতে আপত্তির কারণ ছিল না। কারণ ইয়েতি বেরোলে নাতানুক সর্দাররা ঝোঁকের বশে তাকে মেরেই ফেলত। আপনি কৌশলে ইয়েতির লাশটা নিশ্চয় আমার অগোচরে নষ্ট করার ব্যবস্থা করতেন। কিংবা একটা গল্প রটাতেন। যাই হোক, এবার আপনি দ্বিতীয় খুনের উদ্যোগে ব্যস্ত ছিলেন। কারণ, এই জাল হংসধ্বজ সব টের পেয়ে আপনাকে ব্ল্যাকমেল শুরু করেছিলেন। গত রাতে সুবিধে হয়নি—কারণ জয়ন্ত ছিল না বলে আমি জাল হংসধ্বজকে শুতে ডাকলুম। তাই মরিয়া হয়ে আজ কাজে নেমেছিলেন।

জাল হংসধ্বজ উঠে বসেছিল। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—সবে ঘুম এসেছে। হঠাৎ দেখি ব্যাটা আমার বুকে চেপে গলা টিপে ধরেছে। উঃ! আগে যদি জানতুম ওর মতলবটা কী!

কর্নেল বললেন—হ্যাঁ। ওর তর সইছিল না। স্পষ্ট বোঝা যায়, এরপর আগরওয়াল চাদর মুড়ি দিয়ে লাশ ঢেকে রাখতেন। আমাদের বলতেন— সান্যাল অসুস্থ, বিশ্রাম নিচ্ছেন। তারপর রাতে হইচই করে রটাতেন যে ইয়েতিটা এসেছিল। সেই গলা টিপে মেরে গেছে। বাঃ! চমৎকার সুযোগ! কারণ, গুহায় তখন ইয়েতিটা মারা পড়েনি। অতএব কি না প্রতিশোধ নিয়ে গেছে। অপূর্ব, মিঃ আগরওয়াল!

পুলিশের জিপের আওয়াজ শোনা গেল এতক্ষণে!...

আমরা মদিয়ার ডাকবাংলোয় রাত কাটাচ্ছিলুম। কলকাতা ফিরে আসছি। 'অরুণাচলের ইয়েতি' নিয়ে ভাবছি, কর্নেল বললেন—বৎস জয়ন্ত কি হতাশায় ভুগছ?

—অবশ্যই! ইয়েতি যে গুল, সাতকাহন লেখার মানে হয় না।

—কিন্তু তার বদলে 'সীমান্তে গুপ্তচর চক্র উচ্ছেদের' কী চমৎকার একটা খবর তোমরা এবার ছাপাবার সুযোগ পেলে দেখ!

অবাক হয়ে বললুম—গুপ্তচর চক্র! তার মানে? কোথায় গুপ্তচর?

কর্নেল দাড়ি চুলকে বললেন—ও, আই অ্যাম সরি। তোমাকে মূল ব্যাপারটা তো বলাই হয়নি।

—কিছু বলা হয়নি। কেনই বা জাল হংসধ্বজ—কেন এসব ঘটল...

—এক মিনিট। বলছি সব। বলে কর্নেল চুরুট ধরালেন। আরামে হাত পা ছড়িয়ে বসলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন : হংসধ্বজ সান্যাল লোকটি সৎ—কিন্তু নির্বোধ। তাছাড়া তাঁর মাথায় কিঞ্চিৎ পাগলামিও আছে। নানান অদ্ভুত কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধাও করেন না। দুর্গম এলাকায় খনি খোঁজা তাঁর বাতিক। নেফা এলাকায় তিনি সেই উদ্দেশ্যেই যাতায়াত করতেন। আর তাঁর বন্ধু হরিহর আগরওয়াল তাঁর উল্টো—অসম্ভব ধূর্ত। যেভাবে হোক, এই এলাকায় এসে আগরওয়াল হংসধ্বজের অগোচরে এক বিদেশি রাষ্ট্র ও বৈরী নাগাদের যোগাযোগের মূল মাধ্যম হয়ে ওঠে। হংসধ্বজ আগে জানলে তাঁকে বাধা দিতেন। জানলেন সীসের খনি খুঁজতে এসে যখন ক্যাম্প করা হল, তখন। বিস্ময়ে দুঃখে হতচকিত হলেন হংসধ্বজ। বোঝানোর চেষ্টা করলেন বন্ধুকে। কিন্তু তখন আর আগরওয়ালেরও ফেরার পথ নেই। বৈরী নাগাদের যে গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ, তখন উল্টো গাইলে তারা তাকে মেরে ফেলবে—আবার হংসধ্বজকেও খুন করবে।

এদিকে হংসধ্বজ তাঁকে শাসাচ্ছেন—নাগাদের সঙ্গে আর এতটুকু যোগাযোগ রাখলে পুলিশকে জানাতে বাধ্য হবেন। অবশ্য সেটা নিছক হুমকি। এই সীসের খনি আর বন্ধুত্ব দুই-ই হংসধ্বজের কাছে মূল্যবান। আগরওয়াল দেখলেন, যেদিকে পা বাড়াবেন, সেদিকেই বিপদ। যদি চিরদিনের নির্বোধ ও ছিটগ্রস্ত এই বন্ধুটি সত্যি সত্যি ঝোঁকের বশে টহলদার পুলিশ বা সেনাবাহিনীর কানে কথাটা তুলে দেন, সাংঘাতিক কাণ্ড হবে। শেষ অবধি আগরওয়ালের মাথায় খুন চড়ে গেল। ক্যাম্পে তখনও সার্ভেয়াররা পৌঁছায়নি। কেবল একদল কুলি জোগাড় করা হয়েছে। তারা স্থানীয় লোক। এসে হাজিরা দিয়েই নিজেদের গাঁয়ে ফিরে যায়। একরাতে আগরওয়াল ঘুমন্ত বন্ধুর বুকে বসে গলা টিপে ধরলেন। যখন দেহটা নেতিয়ে পড়ল, চুপিচুপি সেটা নিয়ে গিয়ে পাহাড় থেকে গড়িয়ে ফেলে দিলেন। রান্না ও অন্যান্য কাজের লোক জনা পাঁচ ছিল। তারা কেউ টের পেল না। সকালে রটিয়ে দিলেন, হংসধ্বজ রাতে মদিয়া গেছেন। ফিরতে দু' একদিন দেরি হবে। ওদিকে একটা পাহাড়ের খাদে যেখানে দেহটা ফেলেছেন, তার নিচেই নদী। নদীতে গভীর বালি আছে। আশ্চর্য শক্ত প্রাণ হংসধ্বজের! পরদিন একদল উপজাতীয় শিকারি তাঁকে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তুলে নিয়ে যায় নিজেদের গাঁয়ে। সেবাশুশ্রূষা করে। তারপর সাত মাইল দূরে বাংলা মিশনারি হাসপাতালে রেখে আসে। এ ঘটনা ২০শে মে ঘটেছিল। ২৩শে মে ক্যাম্পে সার্ভেয়াররা আসে। কাজ শুরু হয়। কিন্তু রাঁধুনি চাকরবাকর সবাইকে রাতারাতি তখন সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা এই ভূতুড়ে বন-বাদাড় থেকে পালাতে পারলে বেঁচে যায়। সব ছিল সমতলের বাসিন্দা। নতুন রাঁধুনি ও চাকর-বাকর এনেছে আগরওয়াল। আর এনেছে ওই জাল হংসধ্বজকে। হংসধ্বজের উদ্যোগে এবং তাঁর পার্টপারশিপেই খনির লাইসেন্স, সরকারি লোন ও টেকনিক্যাল সহায়তার ব্যবস্থা। অতএব হংসধ্বজ একজন থাকা চাই পাশে। পরে যখন দরকার বুঝত, তখন সে জালটাকেও খতম করে দিত এবং ইয়েতির নামেই সেটা রটাত। এই জঙ্গলে মানুষ খুন করা এমন কিছু কঠিন নয়। যাই হোক, জাল হংসধ্বজকে নিয়ে নির্বিঘ্নে কাজ চলছিল। ২৫শে মে রাতে হঠাৎ ক্যাম্পে ইয়েতির আবির্ভাব ঘটল। ভয় পেয়ে গেল আগরওয়াল।

ইয়েতিটা সেও স্বচক্ষে দেখল। একেবারে সত্যিকার আতঙ্ক। সার্ভেয়াররা পালিয়েছে। কুলিরা ভেগে গেছে। তাই সে কলকাতায় গিয়ে আমার শরণাপন্ন হল। কোন এক সূত্রে আমার সঙ্গে তার অল্পস্বল্প চেনা ছিল। আমি ইয়েতিটা ধরতে বা হত্যা করতে পারলে তার সীসের খনি এবং গুপ্তচরচক্র দুটোই বজায় থাকে।

এবার প্রশ্ন করলুম—ইয়েতির প্ল্যান হংসধ্বজবাবুর মাথায় এল কীভাবে?

কর্নেল হেসে উঠলেন। বললেন—মে মাসের মাঝামাঝি এই এলাকায় একজোড়া দশফুট উঁচু মানুষের মতো প্রাণী ধরা পড়ে উপজাতীয়দের হতে। সে খবর তোমরাও বক্স করে ছেপেছিলে। আসলে আমার ধারণা ও দুটো একজাতের ভালুক।

বললুম—হংসধ্বজবাবুর মাথায় তাহলে ওই থেকেই ইয়েতি সেজে প্রতিশোধের বাসনা গজায়?

কর্নেল আরও জোরে হাসলেন—ভদ্রলোক রীতিমতো পাগল। অনায়াসে কোনও সেনাবাহিনীর কাছে বা টহলদার পুলিশকে জানাতে পারতেন। তা না করে শত মাইল দূরের বাংলা মিশনারি হাসপাতাল থেকে সারা গায়ে প্লাস্টার জড়ানো অবস্থায় রাতারাতি উধাও হন। জঙ্গলে এসে সাদা কাপড়ে বাকি অংশও জড়ান। ওই বিকটমূর্তিতে হানা দেন ২৫ মে রাতে। ভাগ্যিস, গুলি ফসকেছিল ওদের। অথচ কাণ্ড দেখ, তবু দমে যাননি ভদ্রলোক। পাগল আর বলে কাকে? অবিবাহিত লোকেরা যত বয়স বাড়ে, তত অদ্ভুত হয়ে ওঠে। তুমি ভাগ্যিস বিয়েটা সেরে নিয়েছ জয়ন্ত।

হেসে বললুম—ওই পাহাড়ের গুহায় থাকতেন হংসধ্বজ। কিন্তু খেতেন কী?

—হ্যাঁ। গুহাটা থাকার উপযোগী। আর খেতেন চুরি করে।

—চুরি করে? সে কী?

—হ্যাঁ। রাতে উপজাতিদের গ্রামে হানা দিতেন চুপি চুপি। ওই বিকটমূর্তি দেখে অমন হিংস্র লোকেরাও গর্তে সেঁধিয়ে যেত কিনা। কুকুরগুলোও ভয়ে কাঠ হয়ে যেত। গোটা এলাকা জুড়ে এখন ইয়েতির খবর শুনতে পাবে। ভাগ্যিস সভ্য জগতের বাইরে পাহাড় জঙ্গল এলাকা। নয়তো ধুন্ধুমার পড়ে যেত। হ্যাঁ—জয়ন্ত শোন! এই এলাকায় ইয়েতিকে বলে 'বুরু'। মনে রেখো, বুরু। এই উপজাতীয়রা এত সাহসী ও হিংস্র মানুষ, অথচ তারা বুরুর নাম শুনলে কেঁচো হয়ে যায়।

একটু চুপ করে থেকে বললুম—গৌহাটিতে আমাদের জাল হংসধ্বজই রিসিভ করেছিলেন। এতটুকু টের পাইনি কিন্তু।

কর্নেল বললেন—না। আমার কেমন একটু লেগেছিল। গেটে নেমপ্লেটটা যেন সদ্য বসানো হয়েছে। টাটকা চকচকে পালিশ। তাছাড়া বাড়ির চাকরগুলোও মনে হল নতুন এসেছে। মনে একটা খটকা লেগেছিল বইকি। তখন থেকেই আমার তদন্ত শুরু।

—ওর আসল নাম কী?

—চন্দ্রনাথ সিং। পাঞ্জাবি।

লাফিয়ে উঠলুম—বলেন কী! এতটুকু ধরতে পারিনি কথাবার্তায়।

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন—আমি পেরেছিলুম। তবে যা জাল তা সহজেই যদি জাল বলে লোকে ধরতে পারে, তাহলে জাল হতে যাবে কোন দুঃখে? এটি খাঁটি জাল। তাই ধরা কঠিন ছিল।

একটু পরে আমি বললুম—আমার রিপোর্টাজের নাম তাহলে হওয়া উচিত ছিল 'অরুণাচলের বুরু'। কর্নেল কোনও জবাব দিলেন না। চোখ বুজে কী ভাবছেন কে জানে।...

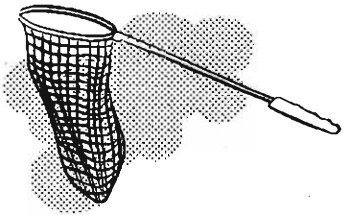

ডমরুডিহির ভূত

এক

বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রাণ সৃষ্টির জন্য হন্যে হচ্ছেন। অথচ প্রকৃতিতে কী অনায়াসে সবসময় প্রাণ সৃষ্টি হয়ে চলেছে।—বলে কর্নেল নীলাদ্রি সরকার নিভে যাওয়া চুরুটটি ধরালেন। তারপর সাদা দাড়িতে হাত বুলোতে থাকলেন। এটা ওঁর চিন্তা-ভাবনার লক্ষণ। আর মুখটাও বেশ গম্ভীর।

. একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম—হঠাৎ প্রাণ নিয়ে মাথাব্যথার কারণ কী জানতে পারি?

—একটুকরো কাঠ জয়ন্ত! ছোট্ট একটুকরো কাঠ!

সোফার শেষপ্রান্তে হেলান দিয়ে বসে প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে কে হালদার—আমাদের প্রিয় 'হালদারমশাই' খবরের কাগজ পড়ছিলেন। তড়াক করে সোজা হয়ে বললেন, কাঠ দিয়া মার্ডার? কে কারে মারল?

বুঝলুম ডিটেকটিভ ভদ্রলোক প্রাণ এবং একটুকরো কাঠ এই দুটি কথা শুনেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। চৌত্রিশ বছর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে চাকরির পর প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খোলা এবং রহস্যের খোঁজে ছোঁকছোঁক করে বেড়ানো তাঁর পক্ষে অবশ্য খুবই স্বাভাবিক। আজ সকালে কর্নেলের ড্রয়িং রুমে তাঁর আবির্ভাব দেখে আশা করেছিলুম নিশ্চয়ই কোনও রহস্যময় কেস হাতে পেয়েছেন এবং শলাপরামর্শের জন্য কর্নেলের সাহায্য নিতে এসেছেন।

কিন্তু প্রায় একঘণ্টা কেটে গেছে এবং ষষ্ঠীচরণের তৈরি স্পেশাল কফি শেষ করে খবরের কাগজে ডুবে গেছেন। তত বেশি নস্যিও নেননি। কাজেই বুঝতে পেরেছিলুম, ওঁর হাতে কোনও কেস নেই।

বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ ওঁর কথায় কান না দিয়ে বললেন, আমার ছাদের বাগানে অনেকদিন থেকে ওই কাঠের টুকরোটা পড়ে ছিল। বর্ষা এবং এই শরৎকালের সব বৃষ্টি খেয়ে কালো হয়ে গিয়েছিল। কাল ভোরে গিয়ে দেখি, ওতে কয়েকটা খুদে ছত্রাক গজিয়েছে। আশ্চর্য! আজ গিয়ে দেখলুম, ছত্রাকগুলো ইঞ্চিটাক চওড়া হয়েছে। তারপর হঠাৎ কোথা থেকে একটা প্রজাপতি এসে ছত্রাকে বসে পড়ল। প্রাণ টেনে এনেছে প্রাণকে। সত্যি জয়ন্ত! প্রকৃতিতে এ এক বিস্ময়কর ঘটনা। খুবই রহস্যময়। হালদারমশাই হেসে উঠলেন,—গ্রামাঞ্চলে ওগুলিরে ব্যাঙের ছাতা কয়।

কর্নেল সায় দিয়ে বললেন,—কথাটা লাগসই। কুনো ব্যাঙেরা ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে জায়গায় থাকতে ভালবাসে। কারণ বেচারারা গরম সহ্য করতে পারে না। তবে প্রজাপতিরাও ছত্রাক ভালবাসে। ছত্রাক তাদের খাদ্যও বটে।

বললুম,—কিন্তু এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে আপনার এত চিন্তার কারণ কী?

হালদারমশাই কাঠ দিয়ে মার্ডার করার কথা বললেন, এটাও চিন্তাযোগ্য। এক টুকরো কাঠ প্রাণকে যেমন ধ্বংস করতে পারে, তেমনই প্রাণ সৃষ্টি করতেও পারে। ধন্যবাদ হালদারমশাই! আপনি একটা চমৎকার খেই ধরিয়ে দিয়েছেন।—বলে কর্নেল চোখ বুজে ইজিচেয়ারে হেলান দিলেন।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ কর্নেলের দিকে কিছুক্ষণ নিষ্পলক তাকিয়ে থাকার পর আমার দিকে ঘুরলেন। তাঁর চোখে প্রশ্ন ছিল। আমি তাঁকে 'কিছুই জানি না' বোঝাতে একটা ভঙ্গি করলুম। কিন্তু

তাঁর দৃষ্টিতে সন্দেহের চিহ্ন থেকেই গেল। একটিপ নস্যি নিয়ে তিনি একটু ইতস্তত করে আস্তে ডাকলেন,—কর্নেলসার।

—বলুন হালদারমশাই!

—আমার একটু খটকা বাধছে।

কর্নেল কী বলতে যাচ্ছেন, এমনসময় ডোরবেল বাজল। কর্নেল সোজা হয়ে বসলেন। একটু পরে ষষ্ঠী এসে বলল,—যমের দিঘি থেকে একটা লোক এয়েছে বাবামশাই!

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে বললেন,—যমের দিঘি?

ষষ্ঠী কাঁচুমাচু মুখে বলল,—শুনে তা-ই তো মনে হল। পেল্লায় লোক বাবামশাই! কালো কুচকুচে গায়ের রং। চুল গোঁফ বেজায় সাদা।

—নিয়ে আয়।......

ষষ্ঠী ঠিকই বলেছিল। পেল্লায় লোকের বদলে কালো দৈত্য বললেই ঠিক হয়। ব্ল্যাকবোর্ডে খড়ি দিয়ে আঁকা মূর্তির মতো। পরনে খাটো করে পরা ধুতি আর হাফহাতা ফতুয়া। পায়ে যেমনতেমন চপ্পল। কাঁধ থেকে একটা কাপড়ের ব্যাগ ঝুলছে। কর্নেলকে করজোড়ে প্রণাম করে সে বলল, —চিনতে পারছেন তো সার? আমি ডমরুডিহি রাজবাড়ির সেই রাঘব।

কর্নেল বললেন,—তোমাকে না চেনার কোনও কারণ নেই রাঘব! বোসো। তারপর বল কী খবর। কুমারসায়েব কেমন আছেন?

রাঘব বলল,—বসব না সার, ট্রেন ফেল হয়ে যাবে। কুমারসায়েবের শরীর ভাল না। ভবানীপুরে মেয়েকে খবর পাঠিয়েছিলেন। সেখান থেকেই আসছি। কুমারসায়েব আপনাকে এই চিঠিটা দিয়ে আসতে বলেছেন।

বলে সে ফতুয়ার ভেতরপকেট থেকে একটা খাম বের করে কর্নেলকে দিল। কর্নেল খামের মুখ ছিঁড়ে চিঠি বের করলেন। তারপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন,—তোমার ট্রেন ক'টায়?

—আজ্ঞে সওয়া বারোটায় ছাড়ার কথা। কিন্তু কলকাতার যা অবস্থা দেখলাম! ট্রাম-বাসের ভরসা না করে হেঁটেই যাব।

—কুমারসায়েবের মেয়ে-জামাই কি ডমরুডিহি যাচ্ছেন?

—জামাইবাবু খুব ব্যস্ত। আজ দিল্লি তো কাল বোম্বাই। পরে যাবেন বললেন। আর দিদিমণি যাবেন কাল ভোরের ট্রেনে। আমাকে থাকতে বলছিলেন। কিন্তু আমি থাকি কী করে বলুন? কাল সন্ধেবেলায় এসেছি। কুমারসাবের দেখাশুনোর ভার দিয়ে এসেছি গদাইকে। তাকে তো ভালই চেনেন সার। গাঁজাগুলি খেয়ে সবসময় ঢুলে বেড়ায়। তবে ওর বউটাই যা ভরসা। রান্নাবান্না সেবাযত্ন—আচ্ছা, চলি সার।

আবার একটু ঝুঁকে করজোড়ে কর্নেলকে প্রণাম করে কালো দৈত্যটি বেরিয়ে গেল।

হালদারমশাই হাসলেন,—ষষ্ঠী ঠিক কইছিল। যমের দিঘির যমই বটে।

বললুম,—ডমরুডিহি! অদ্ভুত নাম তো!

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন,—ওখানে অবিকল ডমরুর মতো গড়নের একটা পাহাড় আছে। তবে ডমরুর সঙ্গে শিবের সম্পর্ক থাকায় রাজবাড়ির শিবমন্দিরের খুব নামডাক। পাহাড়টার নামও ডমরুপাহাড়। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, ডমরুপাহাড়ে শিবের চেলাদের বাস। তাই পারতপক্ষে দিনদুপুরেও কেউ একা ওদিকে পা বাড়ায় না।

—শিবের চেলা মানে ভূতপ্রেত?

—তা ছাড়া আর কী?

হালদারমশাই বললেন,—আপনি দেখছেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—দেখিনি। তবে ডমরুপাহাড় থেকে সন্ধ্যাবেলায় নেমে আসার সময় অদ্ভুত একটা কান্না শুনেছিলুম। কারা যেন আহা-উহু করে কেঁদে বেড়াচ্ছিল।

ভূতেরা কান্দে ক্যান?—বলে অন্যমনস্কভাবে হালদারমশাই একটিপ নস্যি নিলেন।

কর্নেল গম্ভীর হয়ে বললেন,—ডমরুপাহাড়ে ভূতের ওই অদ্ভুত কান্না প্রথমে কুমারসায়েব শুনেছিলেন। গত অক্টোবরে আমি তাঁর ডাকেই ডমরুডিহি গিয়েছিলুম। কিন্তু প্রায় একসপ্তাহ কাটিয়ে সেই রহস্যের সমাধান করতে পারিনি। কুমারসায়েব এই চিঠিতে লিখেছেন, সম্প্রতি সেই ভূতেরা রাজবাড়িতে এসে রাতবিরেতে কান্নাকাটি করে বেড়াচ্ছে। তার মানে পাহাড় থেকে ওরা এবার নেমে এসেছে। এই উৎপাতে নাকি কুমারসায়েব ঘুমোতে পারছেন না। অস্থির হয়ে উঠেছেন। চিন্তা করুন হালদারমশাই! কুমারসায়েবের বয়স আমার চেয়ে দু-তিন বছর বেশি। অবশ্য এখনও শক্তসমর্থ মানুষ। কিন্তু রাতের পর রাত ওইরকম উৎপাত হলে কী অবস্থা হয়!

লক্ষ করলুম উত্তেজনায় প্রাইভেট ডিটেকটিভের গোঁফ তিরতির করে কাঁপছে। বললেন, —আপনি কইলে আমি ভূতগুলিরে জব্দ করতে পারি।

হাসতে হাসতে বললুম,—আপনি ভূত জব্দ করার মন্ত্র জানেন তাহলে?

কী যে কন?—হালদারমশাই চটে গেলেন। চৌতিরিশ বৎসর পুলিশে চাকরি করছি। রাত্রে কত শ্মশান-মশান বনবাদাড়ে—হঃ! ভূত না। বজ্জাত লোকের কাজ। কর্নেলসার! আপনি যদি যান আমারে সঙ্গে লইবেন।

কর্নেল গম্ভীরমুখেই বললেন,—আপনি বরং আগেই চলে যান। হাওড়া-গয়া প্যাসেঞ্জারে আসানসোল হয়ে ডমরুডিহি। ওখানে অনেক হোটেল আছে। একটা সুন্দর লেক আছে। চমৎকার টুরিস্ট স্পট।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ সটান উঠে দাঁড়ালেন। তারপর চাপা স্বরে বললেন,—ওই কালো লোকটা—কী য্যান নাম?

—রাঘব।

—রাঘবেরে ফলো করব।

—হালদারমশাই! রাঘবের সঙ্গে যেন ঝামেলা বাধাবেন না। ওই তল্লাটে ওকে সবাই সমীহ করে চলে। ওর গায়ে সত্যিই দৈত্যের মতো জোর।

হালদারমশাই গুলিগুলি চোখে তাকিয়ে কথাগুলি শুনলেন। তারপর সবেগে বেরিয়ে গেলেন।

বললুম,—হালদারমশাইকে লড়িয়ে দিলেন। দেখবেন, ঠিকই ঝামেলা বাড়বে।

কর্নেল হাসলেন,—তুমি ওঁকে বরাবর তুচ্ছ কর জয়ন্ত! কিন্তু কত সময় ওঁর পুলিশ জীবনের অভিজ্ঞতা আমাকে কতটা সাহায্য করেছে, তা তোমার মনে রাখা উচিত। প্রয়োজনে উনি যে সব কাজ করতে পারেন, আমার পক্ষে তা করা সম্ভব নয়।

হেসে ফেললুম,—যেমন ছদ্মবেশ ধরা।

—হ্যাঁ। পুলিশের গোয়েন্দারা ছদ্মবেশ ধরতে পটু। হালদারমশাইয়ের এ ব্যাপারে রীতিমতো ট্রেনিং আছে। বিশেষ করে সাধুসন্ন্যাসীদের খুব সম্মান করে লোকে।

—ঠিক বলেছেন। তা আপনি কবে যমের দিঘি—সরি! ডমরুডিহি যাচ্ছেন?

কর্নেল হো হো করে হেসে উঠলেন,—তুমি আমাকে যমের দিঘিতে একা পাঠাতে চাও? না জয়ন্ত! তোমাকেও নিয়ে যাব।

কর্নেল ইজিচেয়ারে আবার হেলান দিলেন। আমি ওঁর দিকে উদ্বিগ্ন মুখে তাকিয়ে রইলুম। ভূতপ্রেত থাক বা না থাক, ওঁর সঙ্গে কোথাও যাওয়া মানেই পাহাড়জঙ্গলে ঘোরাঘুরি। এ বয়সে পারেনও বটে!...

দুই

ডমরুডিহির রাজবাড়ি দেখে হতাশ হয়েছিলুম। দু'ধারে ধ্বংস্তূপ আর যাচ্ছেতাই রকমের জঙ্গল। মধ্যিখানে একফালি সংকীর্ণ পাথরের ইটে বাঁধানো পথ। পথের শেষপ্রান্তে কোনও রকমে টিকে থাকা একটা দোতলা পুরনো বাড়ি। একপাশে তেমনই পুরনো একটা শিবমন্দির। পেছনে উঁচু পাহাড়। পাহাড়টার গড়ন কতকটা ডমরুর মতো। মাঝখানে উচ্চতা কম এবং দু'দিকে ভাগ করা বোঝা যাচ্ছিল, অতীতে এই বাড়িটা রীতিমতো একটা দুর্গপ্রাসাদ ছিল।

রাঘব আমাদের দেখতে পেয়ে দোতলা থেকে হন্তদন্ত হয়ে নেমে এসেছিল। সে চাপা গলায় বলেছিল,—দিদিমণি কাল সন্ধ্যায় এসেছেন। কুমারসায়েবকে কলকাতা নিয়ে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছেন। কিন্তু উনি এখান থেকে নড়বেন না। এই নিয়ে বাবা-মেয়ের মধ্যে খুব তর্কাতর্কি হচ্ছে।

সে আমাদের নিচের একটা ঘরে বসিয়ে রেখে কুমারসায়েবকে খবর দিতে গিয়েছিল। ঘরটার আসবাব পুরনো হলেও আভিজাত্যের চিহ্ন প্রকট। দেয়ালে ঝোলানো পূর্বপুরুষদের তৈলচিত্র, কিছু ব্রোঞ্জ আর পাথরের ভাস্কর্য, চিনেমাটির কারুকার্য-করা প্রকাণ্ড ফুলদানি এবং একটা ঝাড়বাতিও চোখে পড়ল। মাথার ওপর সিলিংফ্যান দেখে বুঝলুম, এ বাড়িতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে।

একটু পরে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে কুমারসায়েব নেমে এলেন। শক্তসমর্থ গড়নের এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। পরনে সাদাসিধে ধুতি-পাঞ্জাবি। হাতে একটা মোটাসোটা ছড়ি। চেহারায় বনেদি ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে। কর্নেলের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার পর আমার দিকে হাত বাড়ালেন।

কর্নেল পরিচয় করিয়ে দিলেন,—কুমারসায়েব! আমার এই তরুণ বন্ধু জয়ন্ত চৌধুরির কথা আপনাকে বলেছিলুম। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার সাংবাদিক।.... আর জয়ন্ত! ইনি ডমরুডিহি রাজপরিবারের একমাত্র বংশধর কুমার ধ্রুবনারায়ণ রায়।

রাঘব এসে দাঁড়িয়ে ছিল। কুমারসায়েব তাকে বললেন,—কর্নেলসায়েবের থাকার জন্য কোন ঘরের ব্যবস্থা করেছ?

রাঘব বলল,—গতবার যে ঘরে উনি ছিলেন।

—চলুন কর্নেলসায়েব। আর রাঘব! তুমি গিয়ে ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করো।

কর্নেল বললেন,—আমরা স্টেশনেই ওটা সেরে নিয়েছি কুমারসায়েব! আপাতত শুধু কফি!

পূর্ব-দক্ষিণ কোণের একটা ঘরে গিয়ে বুঝলুম, এই বাড়িটা উঁচু জায়গায় অবস্থিত। দক্ষিণে ভাঙাচোরা পাঁচিলের নিচে বিশাল জলাশয়। ওটাই তা হলে সেই লেক। পূর্বদিকে সানবাঁধানো একটা প্রশস্ত চত্বরের পর শিবমন্দির। মন্দিরের তিনদিকে ঘন জঙ্গল আর ধ্বংসস্তূপ।

আমাদের বসতে বলে কুমারসায়েব দক্ষিণের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। উঁকি মেরে কিছু দেখে নিয়ে চাপা গলায় বললেন,—কাল থেকে একটা সন্দেহজনক ব্যাপার লক্ষ্য করছি। একজন জটাজুটধারী সন্ন্যাসী এদিকটায় উকিঝুঁকি মেরে বেড়াচ্ছে। রাঘবকে পাঠিয়েছিলুম। কিন্তু তেমন কাউকে খুঁজে পায়নি। অথচ আমি স্পষ্ট দেখেছি।

কর্নেল বললেন,—ও নিয়ে আপনার চিন্তার কারণ নেই। আপনি বরং রাতবিরেতে ভূতুড়ে কান্নার ঘটনাটা বলুন।

কুমারসায়েব একটা চেয়ারে বসে বললেন,—আট-দশদিন ধরে এটা ঘটছে। আপনি জানেন, আমি দোতলায় দক্ষিণে-পশ্চিম কোণের ঘরে থাকি। প্রতি রাত্রে যখন-তখন জানালার নিচে ওই

অদ্ভুত কান্নার উৎপাত। খেপে গিয়ে বন্দুক ছুড়েছি। রাঘব টর্চ-বল্লম নিয়ে খুঁজতে বেরিয়েছে। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। আমি অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি।

কালও সারারাত মাঝেমাঝে ওই উপদ্রব। রাঘব প্রথম প্রথম রাত জেগে টহল দিত। আমিই বারণ করলুম। কর্নেলসায়েবকে খবর দেওয়া যাক। কারণ আমার ধারণা, এর পেছনে একটা দুষ্টচক্র আছে। আপনি ভালই জানেন, ভূতপ্রেত আমি মানি না।

—আপনার মেয়ের আসার কথা ছিল। সে কি এসেছে?

—রানু কাল বিকেলের ট্রেনে এসেছে। সে-ও বলেছে, কোনও বজ্জাত দলবল নিয়ে ভূতের ভয় দেখিয়ে আমাকে এ বাড়ি থেকে তাড়াতে চায়। কিন্তু পূর্বপুরুষের এই ভিটে ছেড়ে কোথাও গিয়ে তো আমি শান্তি পাব না। তা ছাড়া আমি এখান থেকে চলে গেলে জয়গোপালের পোয়াবারো। বাড়ি দখল করে ফেলবে।

—জয়গোপালবাবু তো কলকাতায় থাকেন।

কুমারসায়েব বাঁকা হেসে বললেন,—ওটা ওর চালাকি। এখানকার বাড়িতে একজন কেয়ারটেকার রেখেছে। লোকদেখানো ব্যাপার মাত্র। প্রায়ই সে এখানে এসে থাকে। আপনাকে বলেছিলুম, এই এলাকার যত খুনে ডাকু গুণ্ডা বদমাশ সব্বাই ওর চেলা।

রাঘব একটা ট্রেতে কফি স্ন্যাক্স এনে টেবিলে রাখল। একটু হেসে সে বলল,—গদাই সেই সাধুবাবাকে দেখে এসেছে কুমারসায়েব! ঝিলের ধারে শ্মশানতলায় ধুনি জ্বেলে বসে আছেন। ক'জন চেলাও জুটে গেছে। গদাইয়ের কথা শুনে মনে হল সে-ও চেলা হয়ে গেছে।

কুমারসায়েব হাসলেন,—যতসব গাঁজাখোরের কাণ্ড! তুমি রাণুকে পাঠিয়ে দাও। কর্নেল সায়েবের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

রাঘব চলে গেলে কর্নেল বললেন,—জয়গোপালবাবুর সঙ্গে আপনার মামলা চলছিল, কী হল শেষ পর্যন্ত?

—হাইকোর্টে হেরে ভূত হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে যাবে শুনেছিলুম। যায়নি। গিয়ে লাভ হত না। আমরা ভাইবোন দু'জনেই সেই পঁচিশ একর পোড়ো জমি একটা আশ্রমকে দান করেছিলুম। জয়গোপালের যুক্তি হল,সে তখন নাবালক ছিল। তার মাকে আমি নাকি বোকা বানিয়ে—হুঁ! এ যুক্তি ধোপে টেঁকে?

এতক্ষণে বুঝতে পারলুম, জয়গোপাল নামে এক ভদ্রলোক কুমারসায়েবের ভাগ্নে। তার মানে, মামা-ভাগ্নের বিবাদ। বললুম,—আচ্ছা কুমারসায়েব, ভূতুড়ে উৎপাতের কথা পুলিশকে জানিয়েছেন কি?

আপনার মাথাখারাপ? —কুমারসায়েব বিরক্ত হয়ে বললেন, আপনি জয়গোপালকে চেনেন না। পুলিসের তা-বড় তা-বড় কর্তা থেকে শুরু করে নেতা, এমনকী মন্ত্রীদের সঙ্গে ওর খুব খাতির। ডমরুডিহি এলাকায় অনেক খনি আছে। জয়গোপাল একসময় খনিশ্রমিকদের নিয়ে রাজনীতি করত। ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হয়েছিল। শেষে ইউনিয়নের মধ্যে দলাদলি মারপিট শুরু হয়ে গেল। ফণীশ্বর সিং নামে আরেক নেতা জয়গোপালকে টিট করে দিল। ফণীশ্বরের ভয়ে সে আর ডমরুপাহাড়ের পশ্চিমে পা বাড়ায় না।

—ওদিকেই খনি এলাকা?

—হ্যাঁ। কর্নেলসায়েব গতবারে আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন। এবার কর্নেলসায়েবের সঙ্গে আপনি যেতে পারেন। কাগজে লেখার মতো অনেক কিছু পেয়ে যাবেন।

রাঘব এসে বলল,—দিদিমণি ঝিলের ঘাটে চান করতে গেছে।

কুমারসায়েব আঁতকে উঠে বললেন,—সর্বনাশ! ঝিলের জল এখন বেজায় ঠাণ্ডা। জ্বরজ্বালা হতে পারে। চামেলী ওকে বারণ করেনি?

—ছোটবেলার অভ্যেস। যখনই আসে, তখনই তো ঝিলে সাঁতার কাটতে নামে দিদিমণি!

কুমারসায়েব হাসলেন,—কলকাতার লেক পেয়েছে! ও রাঘব! তুমি একটু লক্ষ্য রেখ। বেশিক্ষণ যেন জলে না থাকে।

রাঘব চলে গেলে কর্নেল বললেন,—তা হলে ভূতুড়ে কান্নাটা ডমরুপাহাড় থেকে নেমে এসেছে?

কুমারসায়েব গম্ভীর হয়ে বললেন,—কান্নার সুরটাও বদলেছে। আগে ছিল শুধু আহা হা হা! উ হু হু হু। এখন ঘনঘন আহাঃ উহুঃ! শুনলে সত্যি বুক ধড়াস করে ওঠে। গতবার আপনি নিজের কানে শুনতে পেয়েছিলেন। এবার শুনলে তফাতটা বুঝতে পারবেন। যাই হোক, আপনারা বিশ্রাম করুন, আজকাল ট্রেনজার্নির যা অবস্থা!

কর্নেল বললেন,—আমরা দিব্যি ঘুমিয়ে এসেছি। এখন একটু বেরোতে চাই।

প্রজাপতি ধরতে নাকি পাখি দেখতে?—কুমারসায়েব সকৌতুকে বললেন, বেশি দেরি করবেন না যেন। একসঙ্গে খেতে বসব। আপনারা না ফিরলে আমি উপোস করে থাকব।

এখন প্রায় দশটা বাজে। সাড়ে বারোটার মধ্যেই ফিরে আসব।—বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওঁকে অনুসরণ করতে হল। ট্রেনে আমার ভাল ঘুম হয়নি। তা ছাড়া এই খামখেয়ালি সঙ্গীর পাল্লায় পড়ে পাহাড়-পর্বত বনবাদাড়ে কতক্ষণ ঘোরাঘুরি করতে হবে কে জানে?

বেরিয়ে গিয়ে বললুম,—পাখি-প্রজাপতির পেছনে আমি কিন্তু ছুটছি না কর্নেল!

—নাহ জয়ন্ত! আমরা আপাতত শ্মশানতলায় যাচ্ছি।

—তার মানে সেই সাধুবাবার কাছে? কিন্তু কর্নেল উনি যদি—

কর্নেল আমার কথার ওপর বললেন,—উনি হালদারমশাই ছাড়া আর কে?

—যদি হালদারমশাই না হয়ে সত্যি-সত্যি কোনও সাধুবাবা হন?

কনেল হাসলেন,—তাতে কোনও অসুবিধে নেই। সাধুসঙ্গ করলে পুণ্য হয়।

—আচ্ছা কর্নেল, কুমারসায়েবের মধ্যে সায়েবি কিছু তো দেখলুম না। একেবারে দিশি ভদ্রলোক।

—একসময় পুরোদস্তুর সায়েব ছিলেন। ঘোড়ায় চেপে বেড়াতেন। শিকারে যেতেন। সেইজন্য ওঁকে সবাই কুমারসায়েব বলত।

কর্নেল হঠাৎ-হঠাৎ থেমে গিয়ে অভ্যাসমতো বাইনোকুলারে চোখ রেখে সম্ভবত পাখি-টাখি দেখছিলেন। রাজবাড়ির ভেঙেপড়া ফটকের কাছে পৌঁছেছি, সেইসময় ডানদিকে ধ্বংসস্তূপ-ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে কেউ চাপাগলায় ডাকল,—কর্নেল স্যার! জয়ন্তবাবু!

চমকে উঠেছিলাম। ঘুরে দেখি, ছদ্মবেশী প্রাইভেট ডিটেকটিভ উঁকি দিচ্ছেন। মাথায় প্রকাণ্ড জটাজুট, মুখে তেমনই দাড়ি-গোঁফ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। কর্নেল দ্রুত চারপাশ দেখে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। বললেন,—আপনার কাছে শ্মশানতলায় যাচ্ছিলুম।

গোয়েন্দা ভদ্রলোক করুণমুখে বললেন,—থাকতে দিল না। খালি ঢিল ছোড়ে। শেষে একখান পাথর আইয়া পড়ল।

—তাহলে বোঝা যাচ্ছে, শ্মশানতলায় আপনি থাকুন এটা কেউ বা কারা চায় না।

—নাকি আমারে চিনছে?

কর্নেল হাসলেন,—আপনাকে চিনবে কী ভাবে? যাই হোক, কাল রাতের খবর বলুন!

হালদারমশাই উত্তেজিতভাবে বললেন,—ব্যাটম্যান! এক্কেরে ব্যাটম্যান। শিবমন্দিরের পিছনে লুকাইয়া গেল। মুখে আহাঃ উহুঃ সাউন্ড। মানুষ না কর্নেলসার। কোনও জন্তু।

কর্নেল বললেন,—আপনি ছদ্মবেশ ছেড়ে লেকে স্নান করে ফেলুন। তারপর পোশাক বদলে নিন। আমরা ততক্ষণ আপনার জন্য অপেক্ষা করছি এখানে।.....

তিন

হালদারমশাইয়ের বগলদাবা গেরুয়া কাপড়ের পুঁটুলি দেখছিলুম। সম্ভবত ওটার ভেতরে একপ্রস্থ পোশাক ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই উনি প্যান্টশার্ট জুতো পরে এসে গেলেন। কাঁধে ঝোলানো মোটাসোটা কিট ব্যাগ দেখে বুঝলুম, নকল জটাজুট গোঁফদাড়ি কৌপিন ইত্যাদি এখন ওর ভেতর ঢুকে গেছে। তিনি কাঁচুমাচু হেসে বলেন,—ত্রিশূল ফ্যালাইয়া আইছি।

কর্নেল বললেন,—আপনার ত্রিশূল কেউ নেবে বলে মনে হয় না।

আমি জিজ্ঞেস করলুম—আপনি এত নিশ্চিত হলেন কী ভাবে?

কর্নেল আমার কথায় কান দিলেন না। হালদারমশাইকে গতরাতের ঘটনা সম্পর্কে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে ব্যস্ত হলেন। হালদারমশাইয়ের কথা থেকে জানা গেল, উনি গত পরশু রাত আটটা নাগাদ এখানে পৌঁছন। স্টেশনের ভিড়ে রাঘবকে হারিয়ে ফেলেন। অগত্যা স্টেশনের কাছাকাছি একটা হোটেলে ওঠেন। সেখানে খাওয়াদাওয়া করে উনি একটা সাইকেলরিকশা ভাড়া করে রাজবাড়ির কাছে আসেন। রিকশাওয়ালারা রাতবিরেতে রাজবাড়ি এলাকায় আসতে চায় না। কিন্তু ডবল ভাড়ার লোভে এক রিকশাওয়ালা এসেছিল। সাততাড়াতাড়ি ভাড়া নিয়ে সে কেটে পড়েছিল। সে সাবধান করে দিয়েছিল, ডমরুপাহাড়ের সব ভূত নাকি রাজবাড়ির আনাচেকানাচে নেমে এসেছে।

এর পর হালদারমশাই রাজবাড়ির ভেতরে ঢোকেন। এই রাস্তাটা রাত্রে অন্ধকার ছিল। সাবধানে এগিয়ে শিবমন্দিরের কাছে পৌঁছে উনি আলো দেখতে পান। তখন মন্দিরের পেছনে গিয়ে দোতলা বাড়িটার দিকে লক্ষ্য রাখেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি কালো একটা জন্তুকে উল্টোদিক থেকে বাড়ির দক্ষিণ দিকে গুটিগুটি আসতে দেখেন। প্রথমে তিনি ওটাকে ভালুক ভেবেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ জন্তুটা দুই ঠ্যাঙে ভর করে দাঁড়ায় এবং মানুষের মতো হেঁটে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ায়। তারপর অদ্ভুত নাকিস্বরে আঁহাঃ উঁহুঃ শব্দ করতে থাকে। চাপা গোঙানির মতো সেই শব্দ।

তারপরই দোতলা থেকে কেউ বন্দুকের গুলি ছোড়ে। হাঁকডাক শুরু হয়। রাঘব বল্লম আর টর্চ হাতে বেরিয়ে আসে। অমনি কালো বিদঘুটে জন্তুটা ওদিকে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে যায় হালদারমশাই ওটাকে কোনও জন্তু বলেই ধরে নেন। তাই রিভলভার তাক করে আরও ঘন্টা দুই বসে থাকেন। জন্তুটা আবার এলে তিনি ছুটে গিয়ে গুলি করে মারবেন। কিন্তু আর ওটা আসেনি। তা ছাড়া ততক্ষণে এই পাহাড়ি এলাকায় বেশ হিম পড়ছিল। সেই সঙ্গে ঘন কুয়াশাও জমছিল। অগত্যা তিনি হোটেলে ফিরে যান।

কাল সকালে হালদারমশাই লেকের ধারে ঘুরতে বেরিয়েছিনে। স্থানীয় লোকেরা অবশ্য ঝিল বলে। ঝিলের দক্ষিণে-পশ্চিম কোণে ডমরুপাহাড়ের নিচে পুরনো একটা শ্মশান আছে। এখন আর ওখানে মড়া পোড়ানো হয় না। আদ্যিকালে ওখানে একটা মন্দির ছিল। তার ধ্বংসাবশেষের ওপর প্রকাণ্ড বটগাছ আছে। সেখান থেকে রাজবাড়ির ওপর নজর রাখার সুবিধে হয়। তাই হালদারমশাই ঠিক করেন, শ্মশানতলায় সাধুবাবা সেজে বসে থাকবেন।

হোটেলে ফিরে দুপুরের খাওয়া সেরে হালদারমশাই শ্মশানতলায় চলে যান। ঝোপের আড়ালে সাধুবাবা সেজে গিয়ে বটতলায় একটা পাথরের ওপর বসে থাকেন। শুকনো কাঠ কুড়িয়ে ধুনি জ্বালানোর অসুবিধে হয়নি। গাঁজার লোভে একজন-দু'জন করে গাঁজাখোর জুটেছিল। কিন্তু সাধুবাবর ধ্যানভঙ্গ হচ্ছে না, বা গাঁজার কোনও আয়োজন না দেখে তারা চলে যায়।

বুদ্ধি করে সঙ্গে চাপাটি আর আলুরদম নিয়ে গিয়েছিলেন হালদারমশাই। রাতের খাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়েন। গত রাতে তিনি যে দিক থেকে জন্তুটা এসেছিল, সেদিকে এগিয়ে রাজবাড়ির ভাঙা পাঁচিলের আড়ালে ওত পেতে বসেন। কিন্তু আশ্চর্য, কালো বিদঘুটে জন্তুটা যেন টের পেয়েছিল। এ রাতে তাকে শিবমন্দিরের দিক থেকে আসতে দেখা যায়। তারপর সেই একই ঘটনা। জন্তুটা শিবমন্দিরের দিকে পালিয়ে যায়। কোনও সাধুসন্ন্যাসী রিভলভার হাতে তাকে তাড়া করেছেন দেখে কী প্রতিক্রিয়া হবে—হয়তো হিতে বিপরীত হয়ে যাবে, এই ভেবে হালদারমশাই সেখান থেকে কেটে পড়েন। তাঁর পুলিশজীবনে যেখানে-সেখানে বসে বা শুয়ে রাত কাটানোর অভিজ্ঞতা ছিল। কাজেই শ্মশানতলায় রাত কাটাতে অসুবিধে হয়নি। ধুনিটা জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। ধুনির তাপে হিম জব্দ হয়েছিল।

তাঁর বিশ্বাস জন্তুটা রাজবাড়ির কোনও ধ্বংসস্তূপে, গুহা বা গর্তের মধ্যে বাস করে। তাই আজ সকালে আনাচে-কানাচে খুঁজতে এসেছিলেন। কিন্তু কুমারসায়েবের চোখে পড়ে যাওয়ায় বেকায়দায় পড়েছিলেন। খামোকা ঝামেলা বাধিয়ে লাভ কী? ঝোপঝাড় পাথরের আড়ালে গুঁড়ি মেরে তিনি আবার শ্মশানতলায় চলে গিয়েছিলেন।

কিন্তু তারপর হঠাৎ কোথা থেকে ঢিল পড়তে শুরু করল। তর্জনগর্জন শাপমন্যি করেও লাভ হল না। উপরন্তু একটা বড় পাথরের টুকরো এসে পড়ল। একটুর জন্য বেঁচে গেলেন। তারপর পড়ি-কি-মরি করে পালিয়ে এসেছেন।...

কর্নেল বললেন,—তাহলে আপনার ব্রেকফাস্ট হয়নি এখনও। চলুন। আগে কিছু খেয়ে নেবেন।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ সহাস্যে বললেন,—একডজন বিস্কুট খাইছি। বোতলে জল ছিল। খাইছি।

কথা বলতে বলতে আমরা রাজবাড়ির খণ্ডহর পেরিয়ে নিচের রাস্তায় পৌঁছুলুম। কর্নেল বললেন,—আপনার ওপর অনেক ধকল গেছে হালদারমশাই! আপনি হোটেলে ফিরে খাওয়া দাওয়া করে জিরিয়ে নিন। তারপর চারটে নাগাদ রাজবাড়িতে আসবেন।

—কিন্তু এখন আপনারা যান কোথায়?

—ডমরুপাহাড়ে অর্কিড খুঁজতে যাচ্ছি।

—রাজবাড়ির পেছনেই তো ডমরুপাহাড়। উল্টোদিকে আইলেন ক্যান?

—ওদিক থেকে পাহাড়ে ওঠা যায় না। আপনি হোটেলে গিয়ে বিশ্রাম নিন।

হালদারমশাই সন্দিগ্ধ দৃষ্টে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে থাকার পর হনহন করে এগিয়ে গেলেন। তারপর একটা সাইকেলরিকশা দাঁড় করিয়ে একলাফে উঠে বসলেন।

বললাম,—সত্যিই পাহাড়ে চড়তে যাচ্ছেন নাকি?

কর্নেল হাসলেন—নাহ্। কুমারসায়েবের ভাগ্নের বাড়ি যাচ্ছি। দেখি, ভাগ্নেবাবাজি এ বিষয়ে কী বলেন?

—ব্যাটম্যান বিষয়ে?

তুমিও হালদারমশাইয়ের মতো ব্যাটম্যান বলছ?—কর্নেল বাঁদিকের রাস্তায় পা বাড়িয়ে বললেন, ঠিক আছে। ব্যাটম্যান বলতে আমারও আপত্তি নেই। অন্তত যতক্ষণ না তার চাক্ষুষ দর্শন পাচ্ছি। তবে ব্যাটম্যানের ডানা থাকা দরকার।

এই রাস্তাটা রাজবাড়ির সমান্তরালে এগিয়ে গেছে। টানা পাঁচিলঘেরা একটা করে বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। পুরনো আমলের বাগানবাড়ির মতো দেখতে। কয়েকটা বাড়ির পর একটা বাড়ির গেটে গিয়ে কর্নেল ডাকলেন,—মিঃ মজুমদার আছেন নাকি?

সঙ্গে সঙ্গে সাড়া এল—কে?

—এসেই দেখুন না আমি কে!

একটু পরে গেট খুলে গেল। একজন মধ্যবয়সি ভদ্রলোক, পরনে প্যান্ট, স্পোর্টিং গেঞ্জি, হাত বাড়িয়ে কর্নেলের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বললেন,—এসে গেছেন তাহলে? আসুন ভেতরে আসুন।

লনের শেষে পোর্টিকোর তলায় একটা গাড়ি দেখলুম। কর্নেল বললেন,—আপনি কখন এসেছেন?

কাল বিকেলে।—বলে আমার দিকে তাকালেন ভদ্রলোক, ইনিই কি সেই—

—হ্যাঁ জয়ন্ত চৌধুরি। জয়ন্ত, ইনি মিঃ জয়গোপাল মজুমদার।

সাজানো গোছানো সুদৃশ্য ড্রয়িং রুমে আমাদের বসিয়ে জয়গোপাল বললেন,—কেয়ারটেকার গোবিন্দকে বাজারে পাঠিয়েছি। এখনই ফিরে আসবে। তারপর আপনার কফি।

—ধন্যবাদ মিঃ মজুমদার!

—মামার খবর কী বলুন?

—একই কথা ওঁর। আপনিই নাকি তাঁর পেছনে ভূত লেলিয়ে দিয়েছেন।

জয়গোপাল গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন,—মামাও যে আমার পেছনে ভূত লেলিয়ে দিয়েছেন কর্নেলসায়েব।

—একটু খুলে বলুন!

—কাল রাতে আমার বাড়ির পেছনে ভূতের কান্না শুনেছি।

—আহাঃ উহুঃ?

জয়গোপাল নড়ে বসলেন,—হ্যাঁ। টর্চ জেলে আমি আর গোবিন্দ বাড়ির চারদিক তন্ন তন্ন খুঁজেছি। তারপর যেই আবার শুয়ে পড়েছি, আবার সেই একই উৎপাত।

—বলেন কী! আপনার মামাবাড়িতেও একই ঘটনা।

—গোবিন্দ এক পলকের জন্য নাকি দেখেছে, কালো কুচকুচে একটা জন্তু পাঁচিল ডিঙিয়ে পালিয়ে গেল।

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বলনে,—আপনার মামাতো বোন রাণু এসেছে।

—তাই বুঝি? জামাইবাবু আসেনি?

—না। আচ্ছা মিঃ মজুমদার, আপনি আমাকে একটা কথা বলেছিলেন। গন্ধর্বমূর্তির কথা।

জয়গোপাল জোরে শ্বাস ছেড়ে বললেন,—হ্যাঁ। মায়ের কাছে শোনা কথা। রাজবাড়িতে নাকি দুটো গন্ধর্বমূর্তি ছিল। যুগ্মবিগ্রহ বলতে পারেন। দামি ধাতুর তৈরি। মায়ের ছোটবেলায় রাজবাড়ির তখন খুব দাপট। বাড়ির কুমারী মেয়েরা গন্ধর্বপুজো করত। এখন তো রাজবংশের কে কোথায় কেটে পড়েছে। মামা একা খণ্ডহর পাহারা দিচ্ছেন যখের মতো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মামা জানেন কোথায় সেই যুগ্মবিগ্রহ লুকানো আছে।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—রহস্যটা তা হলে কিছুটা ফাঁস হল।

—তার মানে?

—মিঃ মজুমদার! আপনি এবং কুমারসায়েব ছাড়া তৃতীয় কোনও লোক ওই বিগ্রহের কথা জানে। কিন্তু সে এখনও জানে না, বিগ্রহ আপনার মামার কাছে আছে, নাকি আপনার মা ওটা আপনাকে গোপনে দিয়ে গেছেন। তাই কুমার সায়েব এবং আপনার প্রতিক্রিয়া বুঝতেই এই

ভূতুড়ে কাণ্ড করছে। তার ধারণা আপনাদের দুজনের মধ্যে যাঁর ওই বিগ্রহ থাকবে, তিনিই ভয় পেয়ে ওটা ফেলে দেবেন এবং সে তা কুড়িয়ে নিয়ে পালাবে।

জয়গোপাল মাথা নেড়ে বললেন, মা আমাকে কোনও গন্ধর্ব মূর্তি দিয়ে যাননি। বিশ্বাস করুন। কিন্তু সে যাই হোক, আহা কেন?

—মিঃ মজুমদার! আহাঃ উহুঃ নয়। কথাটা হল হাহা হুহু। রামায়ণে হাহা হুহু নামে দুই গন্ধর্বের কথা আছে। এই যুগ্মবিগ্রহ তাদেরই। আচ্ছা, চলি।

জয়গোপাল হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন।....

চার

কুমারসায়েবের মেয়ে রাণুকে আমার দাম্ভিক প্রকৃতির বলে মনে হয়েছিল। কুমারসায়েব আমাদের সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে নেহাত সৌজন্যমূলক নমস্কার এবং কথাবর্তা বলে চলে গিয়েছিল। পরে কুমারসায়েব কৈফিয়ত দিয়েছিলেন,—রাণুর মনমেজাজ ভাল নেই। কারণ আমি ওর কথায় কান দিচ্ছি না। পিতৃপুরুষের এই ভিটে ছেড়ে আমি অন্য কোথাও গিয়ে শান্তি পাব না।

খাওয়ার পর কুমারসায়েব বললেন,—আপনারা বিশ্রাম নিন। আমিও একটু দিবানিদ্রার চেষ্টা করব।

কর্নেল বললেন,—তার আগে আপনার সঙ্গে কয়েকটা জরুরি কথা আছে। চলুন, ও ঘরে বসে কথা হবে।

আমাদের থাকার ঘরে গিয়ে কুমারসায়েব একটা চেয়ার টেনে বসলেন। তারপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টে কর্নেলের দিকে তাকালেন।

কর্নেল বললেন,—গতবার এসে শিবমন্দিরের যে সেবায়েতকে দেখেছিলুম, তিনি এখনও আছেন কি?

কুমারসায়েব একটু অবাক হয়ে বললেন,—থাকবে না কেন?

পাঁচু ঠাকুর বংশানুক্রমে রাজবাড়ির সেবায়েত। রোজ ভোরবেলা এসে পুজোআচ্চা করে চলে যায়। ও থাকে বাঙালিটোলায়। তবে বয়স হয়েছে। ওর শরীরটা তত ভাল যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে এসে বলে ওর ছেলে নকুলকে বহাল করতে। কিন্তু নকুলের বদনাম শুনেছি। নেশাভাঙ করে। যাদের সঙ্গে মেলামেশা করে, তার হাড়-বজ্জাত বখাটে। রাঘবের কাছে শুনেছি, জয়গোপালের সঙ্গে নকুলের যোগাযোগ আছে। কাজেই ওকে বহাল করার প্রশ্নই ওঠে না। ওর ভাই মুকুল অবশ্য ভাল ছেলে। কিন্তু সে পড়াশুনা করছে। পুজোআচ্চার কাজ তার পছন্দ নয়।

কর্নেল আস্তে বললেন,—আপনার কাছে গন্ধর্ব মূর্তি আছে। যুগ্মবিগ্রহ। দামি ধাতুতে তৈরি। তাই না?

কুমারসায়েব চমকে উঠেছিলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন,—হ্যাঁ। আছে। কিন্তু হঠাৎ এ কথা কেন? তাছাড়া আপনি কোন সূত্রে জেনেছেন?

—যেভাবে হোক, জেনেছি। আপনি কি ওই মূর্তিদুটোর নাম জানেন?

কুমারসায়েবকে বিব্রত দেখাচ্ছিল। মাথা নেড়ে বললেন,—নাম জানি না। তবে ওটা আছে।

—মূর্তিদুটি রামায়ণে বর্নিত হাহা-হুহু গন্ধর্বের। রাতবিরেতে আপনি যে ভূতুড়ে আহাঃ উহুঃ শোনেন, তা আসলে হাহা-হুহু।

কুমারসায়েব কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে বসে রইলেন। তারপর বললেন,—আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

—খুব সোজা অঙ্ক কুমারসায়েব! কেউ হাহা-হুহু গন্ধর্ব বিগ্রহের কথা জানে। তাই সে ভেবেছে রাতবিরেতে নামদুটো ভূতুড়ে গলায় উচ্চারণ করলে আপনি ভয় পাবেন এবং ভাববেন, স্বয়ং দুই গন্ধর্বের আত্মা এসে মূর্তি ফেরত চাইছে তখন মূর্তিদুটি তাদের উদ্দেশে ছুড়ে ফেলে নিষ্কৃতি চাইবেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আপন গন্ধর্বমূর্তির নাম জানেন না।

কুমারসায়েব ফুঁসে উঠলেন, এ তাহলে জয়গোপালেরই বদমাইশি!

কর্নেল হাসলেন, না কুমারসায়েব। জয়গোপালবাবুর বাড়িতেও এবার একই কাণ্ড শুরু হয়েছে।

—কে বলল আপনাকে?

—আমি দুপুরে ওঁর কাছে গিয়েছিলুম।

—ও মিথ্যুক!

কর্নেল চুরুটের একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন,—জয়গোপালবাবুও যে মূর্তিদুটির নাম জানেন না এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। যাই হোক, আপনি এখনই গিয়ে দেখে আসুন, গন্ধর্বমূর্তি যথাস্থানে আছে কি না।

কুমারসায়েব বেরিয়ে গেলেন।

কর্নেল বললেন, তুমি কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিতে পার জয়ন্ত। হালদারমশাই এলে আমরা বেরুব।

বলে উনি দক্ষিণের জানালার কাছে গিয়ে বাইনোকুলারে লেক বা ঝিলটা দেখতে থাকলেন। একটু পরে কুমারসায়েব ফিরে এসে ধপাস করে বসে বলেন, আশ্চর্য ব্যাপার কর্নেলসায়েব! বিগ্রহ উধাও।

কর্নেল বললেন, কোথায় রেখেছিলেন?

—আমার ঘরে রাণুর মায়ের একটা প্রকাণ্ড ছবি টাঙানো আছে। তার পেছনের কুলুঙ্গিতে ওটা লুকোনো ছিল। কাউকে জানতে দিইনি! রাণুকে পর্যন্ত না।

ঠিক আছে। এ নিয়ে আপনার চিন্তার কারণ নেই।—বলে কর্নেল বললেন, বিগ্রহের কথা আপাতত ভুলে যান। গতবার এসে ঝিলে ছিপ ফেলে মাছ ধরেছিলুম। আপনারও ছিপ ফেলার অভ্যাস ছিল। এখন নেই?

কুমারসায়েবকে উদ্ভ্রান্ত দেখাচ্ছিল। অন্যমনস্কভাবে বললেন, আছে। আপনি ছিপ ফেলতে চাইলে অসুবিধে নেই। রাঘবকে চার তৈরি করতে বলছি। কিন্তু এ কী সর্বনাশ হল দেখুন!

—আপনি রাণুকে জিজ্ঞেস করেছেন কিছু?

—নাহ্। রাণু ওর ঘরে দরজা বন্ধ করে ঘুমুচ্ছে। ওর এই অভ্যাস। এখানে এলেই—

কর্নেল তাঁর কথার ওপর বললেন, ঠিক আছে। আপনি রাঘবকে চার তৈরি করে ঠিক জায়গায় ফেলতে বলুন। ছিপ টোপ সবকিছু যেন তৈরি রাখে। আমি একটু জিরিয়ে নিয়ে ঘাটে যাব। আপনি বিশ্রাম করুন গিয়ে। আশা করি বিগ্রহ উদ্ধার করতে পারব।

কুমারসায়েব ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে এসেছিল। কতক্ষণ পরে কর্নেলের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। কর্নেল বললেন, উঠে পড় জয়ন্ত! তুমি-আমি পালাক্রমে ছিপ নিয়ে বসব। ঝিলের জলে মাছ আছে ঠিকই। তবে খুব ধূর্ত ওরা। দেখা যাক।

ঘড়ি দেখলুম। সাড়ে তিনটে বাজে। ঝিলের উত্তর-পশ্চিম কোণে রাজবাড়ির সানবাঁধানো ঘাট। টুটাফাটা হয়ে আছে। রাঘব ছিপ আর টোপ নিয়ে অপেক্ষা করছিল। কর্নেল তাকে বললেন, তুমি একটু লক্ষ্য রাখবে রাঘব। এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। এলে তাঁকে এখানে নিয়ে আসবে।

রাঘব চলে গেল। কর্নেল ছিপ ফেলে বাইনোকুলারে দূরে কী দেখতে থাকলেন। জিজ্ঞেস করলুম—কোনও বিরল প্রজাতির পাখি খুঁজছেন নাকি?

—নাহ্। শ্মশানতলা দেখছি।

—শ্মশানতলায় সন্দেহজনক কিছু ঘটছে বুঝি?

—হ্যাঁ। হালদারমশাই রিভলবার খুলে কাকে তাড়া করে এদিকেই আসছেন।

—সে কী! কাকে তাড়া করছেন উনি?

—তাকে দেখতে পাচ্ছি না। ওদিকটায় ঘন জঙ্গল। শুধু হালদারমশাইকে দেখতে পাচ্ছি।

পাহাড়ের নিচে বলে এখনই ওদিকে ছায়া ঘন হয়েছে। খালি চোখে কিছু দেখা যাচ্ছে না। এদিকে কর্নেল ঘাটের নিচের ধাপে গুঁড়ি মেরে নেমে গেলেন। লক্ষ্য করলুম, শেষ ধাপের বাঁদিকে জলের তলায় গুঁজে রাখা একটা ডাল ইঞ্চি ছয়েক উঁচু হয়ে আছে। ঢেউয়ে ওটা বারবার ডুবে যাচ্ছে আর মাথা তুলছে। কর্নেল ডালটা উপড়ে তুললে দেখলুম, ওতে একটা নাইলনের দড়ি বাঁধা আছে। দড়িটা টানতে থাকলেন কর্নেল।

একটু পরে অবাক হয়ে দেখলুম দড়ির শেষ প্রান্তে ইঞ্চি ছয়েক উঁচু এবং ইঞ্চি চারেক চওড়া হলদে রঙের ধাতব প্লেটে সাঁটা দুটো কারুকার্যচিত মূর্তি। কর্নেল দ্রুত ওটা রুমালে জড়িয়ে জ্যাকেটের ভেতর পকেটে চালান করলেন। তারপর ঘাটের পাশে ভেঙেপড়া একটুকরো পাথর সেই দড়িতে বেঁধে জলে ছুড়ে ফেললেন এবং সেই ডালে আগের মতো দড়িটা বেঁধে ঠিক জায়গায় পুঁতে দিলেন।

ওটা যে সেই গন্ধর্ববিগ্রহ তা বুঝতে পেরেছিলুম। ঘাটটা খুব নিচুতে। তাছাড়া পাঁচিল থাকায় পেছন থেকে কারও এ ব্যাপারটা চোখে পড়ার কথা নয়।

কর্নেল উঠে এসে ছিপ হাতে নিয়ে হাসলেন, এটাই অনুমান করেছিলুম। এবার দেখা যাক, হালদারমশাই কী করেন।

একটু পরে ঘাটের ডানদিকে ঝোপঝাড়ের ভেতর হালদারমশাইকে দেখা গেল। উনি সে ফোঁস ফোঁস শব্দে শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে বললেন, বজ্জাতটা পলাইয়া গেল। শ্মশানতলায় কী একটা করছিল। আমি গেছি আর দৌড় দিছে। আমারে ঢিল ছুড়ছিল ওই ব্যাটাই।

কর্নেল বাইনোকুলারটা একহাতে তুলে ফের শ্মশানতলা দেখতে দেখতে বললেন, সে আবার শ্মশানতলায় গিয়ে একটা কিছু করছে হালদারমশাই ! স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু থাক—আপনি আর ওর কাজে বাগড়া দেবেন না। এখানে বসুন। আশা করছি, রাঘব কফি নিয়ে আসবে। ঘাটে বসে কফি খাবার চেয়ে আনন্দ আর কিসে আছে?

ঝিলের মাছগুলো মহা ধূর্ত, টোপ খেয়ে নিচ্ছে। কিন্তু বঁড়শিতে, বেঁধানোর সুযোগ দিচ্ছে না। হালদারমশাই ঘাটের ধাপের পাশে বসে শ্মশানতলার দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিলেন। কর্নেলের বাইনোকুলারের মহিমা সম্ভবত এতদিনে বুঝতে পারছিলেন। কিন্তু কর্নেলের দু'হাতে ছিপ এবং একাগ্র দৃষ্টি ফাতনার দিকে। তাই হালদারমশাই বাইনোকুলার চাওয়ার সুযোগ পাচ্ছিলেন না। কতবার তাঁকে ঠাট্টা করে বলেছি,—আপনিও একটা বাইনোকুলার কিনে ফেলুন হালদারমশাই! গোয়েন্দগিরিতে খুব কাজে লাগবে।

তিনি বলেছিন, ধুর! ধুর! ওই যন্তর কী কাজে লাগবে? ক্রিমিন্যালরা কি পক্ষী?

কিছুক্ষণ পরে রাঘব এল কফির পট আর পেয়ালা নিয়ে। হালদারমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে সে নমস্কার করে বলল, সারকে কোথায় যেন দেখেছি?

কর্নেল বললেন, হালদারমশাইকে কলকাতায় আমার ঘরে দেখেছিলে। তোমাকে ওঁর আসবার কথাই তখন বলেছিলুম। তুমি ওঁর জন্য আর একটা পেয়ালা আন।

রাঘব যাচ্ছিল। কর্নেল তাকে পিছু ডেকে ফের বললেন, কুমারসায়েব কী করছেন রাঘব?

কী হয়েছে বুঝতে পারছি না। আবার বাবা-মেয়ের মধ্যে তর্কাতর্কি হচ্ছে। বলে রাঘব চলে গেল।

চাপা গলায় বললুম, কর্নেল! আমার মনে হচ্ছে, বাবা-মেয়ের মধ্যে তর্কাতর্কিটা আসলে গন্ধর্ববিগ্রহ নিয়েই। তাই না।

হালদারমশাই নড়ে বললেন—কী কইলেন? কী কইলেন?

কর্নেল বললেন, পরে সব বলব হালদারমশাই! তবে জয়ন্তের অনুমান ঠিক। গন্ধর্ববিগ্রহ তো এই রাজবংশের রীতি অনুসারে মেয়েদেরই প্রাপ্য। এতদিনে রাণু বিগ্রহের খোঁজ পেয়ে স্নানের ছলে ঝিলের জলে লুকিয়ে রাখতে এসেছিল। আমার এই যন্ত্রটি দূরকে নিকট করে। তখন শিবমন্দিরের কাছ থেকে পাঁচিলের ভাঙা অংশ দিয়ে এই ঘাটটা দেখতে পাচ্ছিলুম। আসলে একটা কৌতূহল ছিল। রাণু কলকাতায় থাকে। ঝিলের জলে স্নানের বয়স তার পেরিয়ে গেছে। যাই হোক, লক্ষ্য করলুম নাইলনের দড়ি নিয়ে এখানে সে কিছু করেছে। তাই ছিপ ফেলার প্ল্যান করেছিলুম।...

পাঁচ

দিনের আলো দ্রুত কমে যাচ্ছিল। অবশেষে কর্নেল ছিপ গুটিয়ে ফেললেন। ঘাটের ওপর দিকে পাঁচিল কবে মুখ থুবড়ে পড়েছে। দু'ধারে ঝোপঝাড় গজিয়েছে। আমরা রাজবাড়িতে ঢুকলাম। সেই সময় কুমারসায়েবের মেয়ে রাণু আমাদের পাশ কাটিয়ে ঘাটের দিকে এগিয়ে গেল। কোনও কথা বলল না। মেয়েটা দাম্ভিক, নাকি মাথায় ছিট আছে?

কর্নেল ঘুরে তাকে একবার দেখে নিয়ে চুপচাপ পা বাড়ালেন। হালদারমশাই চাপা স্বরে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কে গেল জয়ন্তবাবু?

একটু হেসে বললুম,—রাজকন্যা।

অ্যাঃ? কন কী? বলেই হালদারমশাই ধাতস্থ হলেন। কুমারসায়েবের ডটার! কিন্তু এই সন্ধেবেলা একা ঘাটে গেল ক্যান?

খোলা বারান্দায় কুমারবাহাদুর একা বসেছিলেন। এতক্ষণে আলো জ্বলে উঠল। আমাদের দেখে তিনি হাঁক দিলেন, রাঘব! চেয়ার নিয়ে এস।

কর্নেল বললেন, আমরা ঘরেই বসব কুমারসায়েব।

ঘরে ঢুকে কর্নেল কুমারসায়েবের সঙ্গে হালদারমশাইয়ের আলাপ করিয়ে দিলেন। কুমারসায়েব বললেন, রাঘব এঁর কথা বলছিল। ইনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ? ব্যাপারটা কী খুলে বলুন তো?

কর্নেল বললেন, অনেকক্ষেত্রে আমি এঁর সাহায্য নিয়ে থাকি। ইনি রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে ছিলেন।

বাহ্! খুব ভাল!—কুমারসায়েব খুশি হয়ে ফের ডাকলেন, রাখব! কফি-টফি নিয়ে এস।

ঝিলের জলের মাছ নিয়ে কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর কর্নেল হঠাৎ বললেন, এক মিনিট! আমি আসছি। আপনারা গল্প করুন।

কর্নেল বেরিয়ে যাওয়ার একটু পরে রাঘব কফি আনল। সেই সময় মেয়েলি গলার আর্ত চিৎকার শোনা গেল, রাঘবদা! রাঘবদা!

রাঘব দৌড়ে গেল। হালদারমশাইও একলাফে বারান্দার নিচে গিয়ে পড়লেন। তারপর উধাও হয়ে গেলেন। আমিও বেরিয়ে গেলুম। কুমারসায়েব বারান্দায় বেরিয়ে "কী হয়েছে, কী হয়েছে" বলে হাঁকডাক জুড়ে দিলেন। মাত্র দু-তিন সেকেন্ডের ব্যাপার।

ঘাটের দিকে ছুটে যাওয়ার সময় হালদারমশাইয়ের গলা শুনতে পেলুম,—তবে রে হালার বান্দর!

তারপর ঝিলের জলে অদ্ভুত সব শব্দ।

কর্নেল ঘাটের ধাপ থেকে রাণুকে টেনে তুললেন। আবছা আলোয় দেখলুম, হালদারমশাই জলে একটা কালো জন্তুকে বগলদাবা করে ফেলেছেন এবং তাঁর একহাতে রিভলভার জলের ওপর নাচানাচি করছে। রাঘব ঝটপট জলে নেমে গিয়ে জন্তুটাকে কাবু করে ফেলল। হালদারমশাই আর রাঘব ওটাকে টেনে ঘাটের ধারে ওঠাল।

ইতিমধ্যে গদাই আর চামেলী এসে গেছে। চামেলী রাণুকে ধরে নিয়ে গেল। রাণু ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

কদাকার জন্তুটাকে হালদারমশাই আর রাঘব শূন্যে তুলে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেল। কুমারবাহাদুর বোবাধরা গলায় বলে উঠলেন,—কী ওটা কী?

কর্নেল বললেন, এই সেই ভূত কুমারসায়েব! রাঘব! হালদারমশাই! ভূতটাকে এবার দু'ঠ্যাঙে দাঁড় করিয়ে দিন।

ভূতটাকে দাঁড় করানো গেল না। সে হাত-পা ছুড়তে শুরু করল। কর্নেল ওটার দুই কান ধরে টান দিতেই চামড়া খুলে যাওয়ার ব্যাপার হল। বেরিয়ে পড়ল একটা মানুষের মাথা। তারপর পিঠের অংশ খুলে ফেললেন কর্নেল। কী অবাক! পিঠের দিকে জিপ আঁটা ছিল। এবার বেরিয়ে পড়ল হাফপ্যান্টপরা একটা রোগা লিকলিকে লোক।

কুমারসায়েব বলে উঠলেন, এ কী! এ যে দেখছি নকুল! পাঁচু ঠাকুরের গুণধর পুত্র! অ্যাই হারামজাদা ভূত! তোমার হাড়ে-হাড়ে এত বুদ্ধি?

নকুল হাঁউমাউ করে কান্না জুড়ে দিল কর্নেল বললেন, আমার যেতে আর একটু দেরি হলেই রাণুকে শয়তানটা মেরে ফেলত। রাণুর মাথায় আঘাত করার জন্য একটা বেঁটে কাঠের টুকরো তুলেছিল। ওটা ঘাটে পড়ে আছে। রাঘব! তুমি থানায় গিয়ে পুলিশকে খবর দাও। গদাই! একটা দড়ি এনে একে বেঁধে রাখো।

গদাই দড়ি নিয়ে এল। হালদারমশাই পুলিশি কায়দায় নকুলকে পিঠমোড়া করে বেঁধে টানতে টানতে বারান্দায় ওঠালেন।

কুমারসায়েব বললেন, নকুল হারামজাদা রাণুকে মারতে গেল কেন? কিছু তো বুঝতে পারছি না।

কর্নেল বললেন, ঘরে চলুন। কফি খেতে খেতে সব বলছি।

হালদার মশাই বললেন—আমি আসামিরে পাহারা দিচ্ছি। একখান চেয়ার চাই। চেয়ারে বসে কফি খাব আর পাহারা দেব।

গদাই তাঁকে একটা চেয়ার এনে দিল। তারপর একপেয়ালা কফি দিয়ে এল। হালদারমশাই পুলিশি কায়দায় আসামিকে উপুড় করে দিয়ে তার পিঠে জলে ভেজা দুই পা চাপিয়ে রাখলেন। তাঁর প্যান্টশার্টও ভেজা। কিন্তু গ্রাহ্য করলেন না। এক হাতে রিভলভার, অন্য হাতে কফির পেয়ালা।

কর্নেল বললেন—রাণু আজ গন্ধর্বমূর্তি চুরি করে ঝিলের জলে ডুবিয়ে রেখেছিল। তার দোষ নেই। প্রথমত, আপনাদের বংশের রীতি অনুসারে এ বিগ্রহ বাড়ির মেয়েদেরই পূজ্য। দ্বিতীয়ত, রাণু বুঝতে পেরেছিল, কেউ বা কারা ওটার জন্যই আপনাকে ভয় দেখাচ্ছে। ভয় পেয়ে আপনি যদি দৈবাৎ বিগ্রহ কোথাও ফেলে দেন, এমন আশঙ্কাও অমূলক ছিল না।

যাই হোক, ব্যাপারটা দৈবাৎ আমার চোখে পড়ে যায়। ছিপে মাছ ধরার ছলে ঘাটে গিয়ে মূর্তিটা খুঁজে বের করেছিলুম। এই নিন সেই বিগ্রহ। এই যুগ্ম গন্ধর্ব আর পেছনকার প্লেট নিরেট সোনার বলে মনে হচ্ছে।

কুমারসায়েব হাত বাড়িয়ে বিগ্রহ নিয়ে বললেন, হ্যাঁ, নিরেট সোনা।

—নকুল নিশ্চয় কোথাও ওত পেতে ছিল। রাণু জলে কিছু লুকিয়ে রাখছে এটা ওর চোখে পড়েছিল। কিন্তু দিনের বেলা ঘাটের দিকে আসতে সাহস পায়নি। এদিকে ঘাট থেকে আমরা উঠে আসার পর রাণু গিয়েছিল। আমি বিগ্রহের বদলে দড়িতে একটুকরো পাথর বেঁধে জলে ডুবিয়ে রেখেছিলাম। রাণু সেটা টেনে তুলে নিশ্চয় হতবাক হয়ে বসেছিল। সেই সময় মওকা বুঝে শ্রীমান নকুল গিয়ে হানা দেয়। রাণু অবশ্য ভূত দেখেই চেঁচিয়ে উঠেছিল। আমি গিয়ে দেখি, বজ্জাতটা একটা কাঠ তুলে ওকে মারতে যাচ্ছে। আমি ওকে ধরে ফেলার আগেই হালদারমশাই ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ফলে দু'জনেই জলে পড়ে মল্লযুদ্ধ শুরু হয়েছিল।

কর্নেল হেসে উঠলেন।

বাইরে থেকে হালদারমশাই বললেন, বান্দরটা আমারে শ্মশান থেকে তাড়াইয়া দিছিল ক্যান?...... এই ভূত! ক্যান ঢিল ছুড়ছিলি?

কর্নেল বললেন, ওখানে ওর এই ভূতের পোশাক লুকোনো থাকত। কাজেই আপনাকে তাড়ানোর দরকার ছিল ওর। বিকেলে সে পোশাকটা অন্য নিরাপদ জায়গায় রাখতে গিয়েছিল। আপনি গিয়ে না পড়লে কী সাংঘাতিক কাণ্ড হত!

বারান্দা থেকে নকুল চিঁ চিঁ করে বলল, আর কক্ষনও এমন হবে না কুমারসায়েব!

কুমারসায়েব লাঠি তুলে গর্জন করলেন, শাট্ আপ ভূত কোথাকার!

তারপর ভেতরে চলে গেলেন।

হালদারমশাই!—কর্নেল বারান্দায় গেলেন। আপনি এক কাজ করুন। জয়ন্তের পাজামা-পাঞ্জাবি পরে ভেজা প্যান্টশার্ট ছেড়ে ফেলুন। ঠাণ্ডায় কতক্ষণ বসে থাকবেন? পুলিশ আসতে একটু দেরি হবে। থানা প্রায় দু'-কিলোমিটার দূরে।

আসামিকে কর্নেলের জিম্মায় রেখে প্রাইভেট ডিটেকটিভ ঘরে ঢুকলেন। করুণ হেসে বললেন, বড্ড হিম জয়ন্তবাবু!.....

কালো ছাতার উৎপাত

প্রাইভেট ডিটেকটিভ কৃতান্ত কুমার হালদার, সংক্ষেপে কে কে হালদার ওরফে আমাদের প্রিয় 'হালদারমশাই' মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। হঠাৎ খি খি করে হেসে বললেন, খাইছে।

কোনও মজার খবর পড়লেই উনি এই কথাটি নিজের দেশোয়ালি ভাষায় সহাস্যে উচ্চারণ করেন। এবং আমিও ওঁর সঙ্গে মজা করার জন্য বলে থাকি, কে কাকে খেল হালদারমশাই?

এদিন আমার কৌতুকের মেজাজ ছিল না। সল্টলেক থেকে আসার পথে ইস্টার্ন বাইপাসে একটা পাজির পাঝাড়া ট্রাক আমার ঝকমকে গাড়িটার গা ঘষে দিয়ে গেছে। বেশ কিছু টাকা খরচের ধাক্কা। তাই হালদারমশাইয়ের দিকে মন ছিল না।

হালদারমশাই প্যান্টের পকেট থেকে নস্যির কৌটো বের করে একটিপ নস্যি নিলেন। তারপর বললেন, জয়ন্তবাবু কিছু জিগাইলেন না?

এতএব জিজ্ঞেস করতেই হল, খবরটা কী হালদার মশাই?

ছাতা।—বলে তিনি তাঁর লম্বা তর্জনী দিয়ে বিজ্ঞাপনের পাতায় একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপনের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। লিখেছে : কার্জন পার্কে একটি কালো ছাতা কুড়াইয়া পাইয়াছি। মালিক উপযুক্ত প্রমাণ দিয়া লইয়া যান। গোবর্ধন সর্বাধিকারী। ৩৩/১ নস্কর লেন। কলিকাতা—৬১।

—এতে তো মজার কিছু দেখছি না হালদার মশাই। তা ছাড়া এটা তো বিজ্ঞাপন।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ আবার একচোট হেসে বললেন, ছাতার উপযুক্ত প্রমাণ মানে কী? ছাতা নানা সাইজের হয়। একই সাইজের ছাতা অসংখ্য লোকের আছে। আবার সেই অসংখ্য লোকের মধ্যে অনেকেরই কালো ছাতা হারাইতে পারে।... কী কন কর্নেলসার?

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার চুরুট কামড়ে কয়েকটা পোস্টকার্ড সাইজের ছবি নাড়াচাড়া করছিলেন। ওঁর এই জাদুঘর সদৃশ ড্রয়িংরুমে ঢোকার সময়ই দেখে নিয়েছি, ছবিগুলো রংবেরঙের প্রজাপতির। হালদারমশাইয়ের কথা শুনে উনি বললেন, হালদারমশাই কি সুকুমার রায়ের বিখ্যাত সেই 'গোঁফচুরি' পদ্যটা পড়েছেন?

গোঁফচুরি? হালদারমশাই খুব অবাক হয়ে বললেন, গোঁফ চুরি যায় ক্যামনে?

—বলেছিলেন, 'গোঁফের আমি, গোঁফের তুমি, গোঁফ দিয়ে যায় চেনা।' কাজেই ছাতা দিয়েও মানুষ চেনা যায়। ছাতার আমি, ছাতার তুমি, ছাতা দিয়ে যায় চেনা।

হালদারমশাই গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, বুঝলাম না।

বুঝতে হলে আপনি এখনই গোবর্ধন সর্বাধিকারীর কাছে গিয়ে কালো ছাতাটি দাবি করুন।

অ্যাঁ? আমার তো ছাতা হারায় নাই।

—ধরুন, হারিয়েছে। এমন লোক নেই, জীবনে যে কখনও ছাতা হারায়নি।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ হাঁ করে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ?

—ধরুন, বেঁটে কালো একটা ফোল্ডিং ছাতা, মেড ইন জাপান এবং কোম্পানির নাম তাকামিও আকামা। ...বিখ্যাত কোম্পানি হালদারমশাই।

হালদারমশাই কেন যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তাঁর গোঁফ তিরতির করে কাঁপতে লাগল। বললেন, কী কোম্পানি কইলেন য্যান? তাকাচ্ছি না—

—তাকামিও আকামা।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ বিড়বিড় করে আওড়ে নামটা মুখস্থ করে ফেললেন। তারপর তাঁর মুখে কৌতুক ফুটে উঠল। বললেন, তবে যাই গিয়া!

—হ্যাঁ। এখনই চলে যান। গিয়ে হয়তো দেখবেন নস্কর লেনে লম্বা লাইন পড়ে গেছে।

হালদারমশাই উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সবেগে বেরিয়ে গেলেন। দরজার পর্দা বেশ কিছুক্ষণ ধরে দুলতে থাকল।

আমি অবাক হয়ে আমার প্রাজ্ঞ বন্ধুর কাণ্ডকারখানা লক্ষ্য করছিলাম। এতক্ষণে বললাম, হালদারমশাইকে এভাবে একটা কালো ছাতার পেছনে লেলিয়ে দিলেন যে? খামোকা বেচারা—

কর্নেল আমার কথার ওপর বললেন, খামোকা নয় ডার্লিং। ইদানীং হালদার মশাইয়ের ডিটেকটিভ এজিন্সির ওপর শনির দৃষ্টি পড়েছে। না—কথাটা আমার নয়, ওঁরই। তুমি আসার আগে উনি তাই নিয়ে দুঃখ করেছিলেন। কোনও রহস্যময় ঘটনা কোথাও ঘটছে না। উনিও তাই হাতে কেস পাচ্ছেন না।

শুনে চমকে উঠেছিলাম। বললাম, এই কালো ছাতার বিজ্ঞাপনে কি আপনি কোনও রহস্যের গন্ধ পেয়েছেন?

বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ তাঁর সাদা দাড়ি থেকে চুরুটের ছাই ঝেড়ে বললেন, জয়ন্ত! তোমাকে একবার বলেছিলাম, কালো জিনিস সবসময় রহস্যময় বলে মনে করা হয়। কালো বেড়াল, কালো কুকুর, কালো—

হঠাৎ থেমে উনি টাকে হাত বুলোতে থাকলেন—হুঁ। কালো জিনিসকে মানুষ ভয় পায়। গোবর্ধনবাবুর ভয় পাওয়া স্বাভাবিক।

এইসময় ভেতরের ঘরের পর্দা তুলে ষষ্ঠীচরণ বলল,—বাবামশাই। আর কফি খাবেন নাকি? আমাকে এখনই বাজারের জন্য বেরুতে হবে।

—কফি দিয়ে তুই গোল্লায় গেলেও আপত্তি করব না।

বলে উনি ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে অভ্যাসমতো চোখ বুজলেন। বললাম, কর্নেল। তা হলে মনে হচ্ছে, বিজ্ঞাপনদাতা গোবর্ধন সর্বাধিকারী আপনার কাছে এসেছিলেন এবং আপনার পরামর্শেই বিজ্ঞাপন দিয়েছেন।

কর্নেল মাথা নাড়লেন, নাহ, সশরীরে আসেননি। কদিন আগে উনি টেলিফোন করেছিলেন। একটা কালো ছাতা কুড়িয়ে পেয়ে ভদ্রলোক নাকি সমস্যায় পড়েছেন।

—কী সমস্যা?

কর্নেল চোখ খুলে একটু হাসলেন, সমস্যাটা ভৌতিক।

—তার মানে?

—ছাতাটা বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে নাকি ভূতের উপদ্রব শুরু হয়েছে।

অস্থির হয়ে বললাম, আহা! খুলে বলুন না শুনি।

ষষ্ঠী যে কেটলিতে জল চাপিয়েই পর্দা তুলে কফি খাওয়ার কথা জানতে চাইছিল, সেটা বুঝলাম কারণ সে খুব শিগ্‌গির কফি নিয়ে হাজির হল। কফিতে চুমুক দিয়ে কর্নেল বললেন, কোনও বাড়িতে ভূতের উপদ্রবের কতকগুলো ধরাবাঁধা লক্ষণ আছে। রাতদুপুরে ছাদে ধুপধুপ পায়ের শব্দ, কিংবা দরজায় নক করা, কখনও কিছু অদ্ভুত শব্দ—তুমি ভূতের ব্যাপারে নতুন কিছু আশা কোরো না ডার্লিং! এই মহাকাশযুগেও ভূতেদের চরিত্র বদলায়নি।

—হ্যাঁ। আপনি হালদারমশাইকে দেখছি আসলে ভূতের পেছনেই ছোটালেন?

—কী আর করা যাবে? উনি চৌত্রিশ বছর গোয়েন্দা পুলিশে চাকরি করেছেন। অবসর নিয়েও গোয়েন্দগিরির অভ্যাস ছাড়তে পারেননি! তাই আজও অনেক আশা নিয়ে আমার কাছে এসেছেন মনে হচ্ছিল। দেখা যাক, উনি ভূতকে জব্দ করতে পারেন কি না।

হেসে ফেললাম, বরাবর দেখে আসছি, হালদারমশাই গোয়েন্দাগিরি করতে বিভ্রাট বাধিয়ে ফেলেন। নিজেও কম নাকাল হন না। এবারও দেখব, উনি ফেঁসে গেছেন।

কর্নেল আমার কথায় কান না দিয়ে আবার প্রজাপতির ফোটোতে মন দিলেন। এবার ড্রয়ার থেকে আতস কাচ বের করে ফোটোগুলো দেখতে থাকলেন।

কিছুক্ষণ পরে ডোরবেল বাজল। ষষ্ঠী বেরিয়ে গেছে। দরজায় ইন্টারলকিং সিস্টেম আছে। ভেতর থেকে নব ঘুরিয়ে খুলে বেরুনো যায়। কিন্তু বাইরে থেকে ঢুকতে হলে চাবির দরকার হয় কর্নেল বললেন, জয়ন্ত। দেখ তো কে এল?

ড্রয়িংরুমের পর ছোট্ট ওয়েটিংরুম। তারপর বাইরের দরজা। সেটা খুলে দেখি, একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। পরনে সাদাসিধে ধুতিপাঞ্জাবি, কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলছে। নমস্কার করে বললেন, আমি একটু কর্নেলসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই। জরুরি দরকার আছে।

ওঁকে কিছু জিজ্ঞেস করার সুযোগ পেলাম না। উনি আমাকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়লেন। তারপর ড্রয়িং রুমের পর্দা তুলে বললেন, বড় বিপদে পড়ে ছুটে এসেছি সার। আমাকে বাঁচান।

ওঁর পেছন পেছন গিয়ে আমি সোফার কোনার দিকে বসলাম। কর্নেল ওঁকে না দেখেই বললেন, বসুন গোবর্ধনবাবু তারপর কথা হবে।

ভদ্রলোক ধপাস করে বসেই বললেন, আপনি আমাকে কী করে চিনলেন সার?

—আপনার কণ্ঠস্বর শুনে। আপনার কণ্ঠস্বরের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সম্ভবত এর কারণ আপনার টনসিলের অসুখ। কিন্তু আপনি অপারেশন করাতে ভয় পাচ্ছেন।

—আপনি সাক্ষাৎ অন্তর্যামী সার।

নাহ্।—কর্নেল এবার ওঁর দিকে ঘুরে বসলেন। বলুন, আবার আপনার কী বিপদ হয়েছে? এই বিপদটা নিশ্চয় ভূতের নয়?

—আজ্ঞে না। মানুষের।

—যেমন?

—আমার বাড়ির সামনে সকাল থেকে লম্বা লাইন পড়ে গেছে। আপনার কথায় বিজ্ঞাপন দিয়ে এই বিপদে পড়েছি সার। কী ভাবে এতলোকের সঙ্গে কথা বলব বলুন? একে তো আমার টনসিলে ব্যথা। তাই পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে তালা এঁটে চলে এসেছি। এতক্ষণ হয় তো ওরা হুলস্থূল বাধিয়েছে। আজকাল লোকেদের মতিগতি তো জানেন সার। একটুতেই ভাঙচুর শুরু করে দেয়।

—ছাতাটা আপনি নিয়ে এসেছেন দেখতে পাচ্ছি।

হ্যাঁ সার। ব্যাগে ভরে কী সাবধানে না নিয়ে এসেছি, বলার নয়। এই নিন— বলে গোবর্ধন সর্বাধিকারী ব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট কালো ফোল্ডিং ছাতা বের করে কর্নেলকে দিলেন।

কর্নেল ছাতাটা টেবিল রেখে বললেন, এবার আপনি কয়েকটা দিন গা ঢাকা দিন।

গোবর্ধনবাবু অবাক হয়ে গেলেন,—আজ্ঞে?

—গা ঢাকা দিন। যদি প্রাণে বাঁচতে চান, অন্যত্র আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে গিয়ে থাকুন। বাইরে বেরুবেন না কিন্তু। হ্যাঁ—দেরি নয় এখনই। কুইক।

গোবর্ধন সর্বাধিকারী হতবাক হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমিও তেমনই হতবাক হয়ে কর্নেলের দিকে তাকালাম।

কর্নেল এবার ছাতাটা খুলে উল্টোপাল্টে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে ব্যস্ত হলেন। ভেতরটা আতস কাচ দিয়ে দেখে নিলেন। তারপর ওটা গুটিয়ে ভাঁজ করে বললেন,—গোবর্ধনবাবুর মতো এই ছাতাটারও টনসিলের অসুখ আছে বলে মনে হচ্ছে।

—ছাতার আবার টনসিল থাকে নাকি?

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন,—ছাতা খুললে শিকগুলো বাঁটের ওপরদিকে উঠে আটকে দিয়ে সেখান থেকে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে, তার ওপরের অংশটাকে টনসিল বললে মহাভারত অশুদ্ধ

হয় না জয়ন্ত। তাকামিও আকামা কোম্পানির এই ছাতার টনসিল যে অসুস্থ, তার কারণ ওটা বেজায় মোটা। ঠাণ্ডা লেগে ফুলে গেছে যেন।

কিছু জিজ্ঞেস করলে আবার হেঁয়ালি শুনতে হবে। তাই চুপ করে গেলাম।

সেদিন সন্ধ্যায় দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার অফিসে পুলিশসূত্রে পাওয়া একটা ডাকাতির খবর জম্পেশ করে লিখছি, সেই সময় কর্নেলের টেলিফোন এল।

—জয়ন্ত! যত শিগগির পারো, চলে এসো।

—তাকামিও আকামা?

—না, হালদারমশাই।

হাসতে হাসতে বললাম, ভূতের হতে জব্দ হয়ে ফিরেছেন তো?

—জব্দ হয়েছেন এবং ভূতেরা ওঁকে ফিরতে দিচ্ছে না।

—সে কী!

—ফোনে সব কথা বলা যাবে না। চলে এস কুইক।...

খবরটা দ্রুত লিখে চিফ রিপোর্টারের কাছে জমা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সারা রাস্তায় যেখান-সেখানে যানজট। কর্নেলের বাড়ি পৌঁছতে সাড়ে সাতটা বেজে গেল।

ড্রয়িং রুমে ঢুকে দেখি কর্নেল তৈরি হয়েই আছেন। বললেন, আগে এক পেয়ালা কফি খাও। নার্ভ চাঙ্গা করো। তারপর বেরুব। ষষ্ঠী—।

বললাম, হালদারমশাইয়ের কথা বলুন আগে।

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট জ্বেলে নিয়ে একরাশ ধোঁয়ার মধ্যে বললেন, তোমাকে ফোন করার একটু আগে হালদারমশাই ফোন করেছিলেন। উনি গোবর্ধনবাবুর ঘরে বন্দি।

—কে ওঁকে বন্দি করল?

নস্কর লেনের পেছনেই একটা কবরখানা। কাজেই ভূতের অভাব নেই।

—ওঃ কর্নেল! প্লিজ! ভূত-টুত বোগাস।

—ভূত ছাড়া কী বলা যাবে? নস্কর লেনে গোবর্ধনবাবুর বাড়ির সামনে থেকে লাইন পড়েছিল। সে এক হুলস্থূল কাণ্ড। পাড়ার বাসিন্দারা অতিষ্ঠ হয়ে পুলিসকে খবর দেয়। পুলিস এসে লাঠি চার্জ করে সবাইকে ভাগিয়ে দেয়। হালদারমশাই পুলিশের তাড়া খেয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে গোবর্ধনবাবুর বাড়িতেই ঢুকে পড়েন। তারপর ওঁর যা স্বভাব!

ষষ্ঠী কফি আনল। কফিতে চুমুক দিয়ে বললাম, তারপর?

—কর্নেল হাসলেন, গোবর্ধনবাবু পেছনের দরজা দিয়ে পালানোর সময় বেডরুমের তালা দিতে সম্ভবত ভুলে গিয়েছিলেন। কারণ দরজায় তালা আটকানো ছিল না। হালদারমশাই গোয়েন্দাগিরি করতে সেই ঘরে ঢুকে পড়েন। কিছুক্ষণ পরে—ভূত ছাড়া আর কী বলা যাবে, আচমকা বাইরে থেকে দরজা কেউ বন্ধ করে দেয়। এবার অবস্থাটা বোঝো! হালদারমশাই যে কাউকে ডাকবেন, তার উপায় নেই। কারণ অন্যের ঘরে বেআইনিভাবে ঢুকে বসে আছেন। জানলাগুলোও বন্ধ। সুইচ টিপে আলো জ্বলেনি। উনি সিগারেট খান না যে সঙ্গে দেশলাই বা লাইটার থাকবে। ওই অবস্থায় বেলা এগারোটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নাকি মশার কামড়। ওঃ! মর্মান্তিক অবস্থা যাকে বলে!

কর্নেল চুপ করলে বললাম, তারপর কী হল বলুন?

—জানলার ফাঁকে বাইরের আলোর ছটা দেখে হালদারমশাই টের পান সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। তখন একটা জানলা একটু ফাঁক করেন। সেই সময় বিছানার পাশে টেলিফোনটা চোখে পড়ে। তারপর আমাকে টেলিফোন করেন। চলো! গিয়ে ওঁকে আগে উদ্ধার করা থাক।

তিনতলা থেকে নেমে কর্নেল বললেন, তোমার গাড়ি এখানেই থাক। আমরা ট্যাক্সি করে যাব। তারপর হাঁটতে হবে একটুখানি।

বরাবর দেখে আসছি, কলকাতার কোনও ট্যাক্সিচালক কর্নেলকে না করেন না। সম্ভবত ওঁর দাড়ি আর লম্বাচওড়া সায়েবি চেহারা দেখেই তাঁরা ওঁকে সমীহ করেন। ট্যাক্সিচালক শর্টকাটে আমাদের মোটামুটি চওড়া একটা রাস্তায় নামিয়ে দিলেন। এলাকাটা পূর্ব কলকাতায় গোবরা কবরখানার কাছাকাছি। নস্কর লেন একটা আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ গলি। দূরে-দূরে এক-একটা ল্যাম্পপোস্ট। একে তাকে জিজ্ঞেস করে ৩৩ নম্বরটা যদি বা পাওয়া গেল, ৩৩/১ খুঁজতে বেশ দেরি হল। ৩৩ নম্বরে একটা কারখানা। তার পাশে এঁদো পুকুর। পুকুরের খানিকটা ভরাট করে বাড়ি উঠেছে। গোবর্ধনবাবুর একতলা ছোট্ট পুরনো বাড়িটা সেই পুকুরের একধারে গাছপালার ভেতর লুকিয়ে ছিল। সদর দরজা নস্কর লেন থেকে বেরুনো একটা কানাগলির মুখে। সেখানে অন্ধকার ঘন হয়ে আছে। সম্ভবত ল্যাম্পপোস্টের আলোর ছটা চোখে পড়েই হালদারমশাই সাহস করে জানলা ফাঁক করেছিলেন।

কর্নেল টর্চের আলো ফেলে একটু কাসলেন। কোনও সাড়া এল না। তখন এদিকের জানালার কাছে গিয়ে চুপি চুপি ডাকলেন,'হালদারমশাই'!

তারপর সত্যিই ভৌতিক উপদ্রব শুরু হয়ে গেল। আমাদের আশেপাশে কয়েকটা ছোট-ছোট ঢিল পড়ল। ছাদের ওপর কী একটা শব্দ হল। কর্নেল টর্চের আলো ফেললেন। কিন্তু কিছু দেখা গেল না। পাশেই একটা খাটাল। সেখানে চালাঘরে মিটমিটে একটা ল্যাম্প জ্বলছিল। খাটালের লোকেরা ছায়ামূর্তির মতো বসে চাপা গলায় গল্প করছিল। তাই বললাম,—কর্নেল, বরং চলুন, ওদের ডেকে হালদারমশাইকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করি।

আমার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার কয়েকটা ঢিল পড়ল। কর্নেল বললেন, চলো! পুকুরের পাড় ঘুরে পেছনের দরজায় যাই। গোবর্ধনবাবুর বাড়িটা এমন জায়গায়, তা ভাবিনি। অথচ বাড়িতে টেলিফোন আছে।

কারখানার পাঁচিলের পাশ দিয়ে ঘুরে পুকুরপাড়ে গেলাম। পাড় বলতে একমিটার চওড়া জায়গা। সেখানে আগাছার জঙ্গল। পায়ের কাছে টর্চের আলো ফেলে দু'জনে সেই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পেছনের দরজায় গেলাম। কর্নেল একটু হেসে বললেন, ভূত এত ভীতু হয় জানতাম না। এই দরজা দিয়ে কেটে পড়েছে দেখছি।

তারপর তিনি দরজায় টর্চের আলো ফেললেন। এ দরজায় তালা থাকার কথা। কিন্তু তালা নেই!

ভেতরে ঢুকে কর্নেল দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। টর্চের আলোয় অপরিচ্ছন্ন ছোট্ট উঠোন, একটা টিউবেল আর পাশাপাশি দুটো ঘর দেখা গেল। দুটো ঘরেই তালা আটকানো আছে। কর্নেল প্রথমে ডানদিকের ঘরের কড়া নাড়লেন। কোনও সাড়া না পেয়ে বাঁদিকের ঘরের দরজার কড়া নাড়তে থাকলেন। কিছুক্ষণ পরে ঘরের ভেতর একটা নড়াচড়ার শব্দ শোনা গেল। কর্নেল চাপা গলায় ডাকলেন, হালদারমশাই!

এবার হালদারমশাইয়ের সাড়া পেলাম। ঘুমজড়ানো গলায় বললেন, আবার ডিসটার্ব করে! গুলি করব কইয়া দিলাম। কর্নেল বললেন, হালদারমশাই! অন্যের বিছানায় ঘুমুনো উচিত নয়। উঠে পড়ুন।

—অ্যাঃ! আমি ঘুমাইতাছি?

—হ্যাঁঃ। জেগে উঠুন। শিগগির।

আমি টর্চের আলোয় বারান্দার এক কোণে দেয়ালের গায়ে ইলেকট্রিক মিটারবক্স আর মেইন সুইচ দেখছিলাম। সুইচটা অফ করা আছে। তখনই অন করে দিলাম। ততক্ষণে হালদারমশাই ঘরের ভেতরে দরজার কাছে এসে শাসাচ্ছেন, পরিচয় না দিলে গুলি করব!

বললাম, হালদারমশাই! আমি জয়ন্ত। আমার সঙ্গে কর্নেল আছেন।

ঘরের দরজা টানাটানির শব্দ হল। হালদারমশাই বললেন, সুইচ গেল কই?

খুঁজে দেখুন। সুইচ কোথায় তা আপনি নিশ্চয় দেখেছিলেন।—বলে কর্নেল পাশের ঘরের দরজায় চলে গেলেন।

সেই সময় ঘরের ভেতর এবং বরান্দায় আলো জ্বলে উঠল। কর্নেল পাশের ঘরের তালাটা পরীক্ষা করে ফিরে এলেন। তারপর পকেট থেকে একগোছা নানা সাইজের চাবি বের করে অনেক চেষ্টার পর এই ঘরের তালাটা খুলে ফেললেন। দরজা খুলে দুজনে ঘরে ঢুকলাম। হালদারমশাই দু'হাতে চোখ মুছে বললেন,—আমি কি স্বপ্ন দেখতাছি?

বললাম, না হালদারমশাই! স্বপ্ন নয়।

কর্নেল ঘরের ভেতরটা দেখতে ব্যস্ত হয়েছেন। হালদারমশাই "বড্ড মশা!" বলে বেরিয়ে বারান্দায় গেলেন। দেখলাম, উনি মশার কামড় থেকে বাঁচতে মশারি মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন। অন্ধকারে মশারি খুঁজে পেলেও তা খাটাতে পারেননি। ঘরে একটা খাটে সাদাসিধে বিছানা, একটা কাঠের আলমারি, দুটো চেয়ার আর একটা ছোট্ট টেবিল। দেওয়ালের তাকে খানকতক পুরনো ধর্মগ্রন্থ, ওষুধের শিশি, এইসব নানা জিনিস।

কর্নেল, বিছানার পাশে টুলে রাখা টেলিফোনের রিসিভার তুলেই বললেন, ডেড! বোঝা যাচ্ছে, আমরা আসার পরই টেলিফোনের তার ছেঁড়া হয়েছে। খুব চালাক ভূত! জয়ন্ত! বাইরে গিয়ে লক্ষ্য রাখো। হালদারমশাইকে বলো, দরকার হলে ভূতকে ভয় দেখানোর জন্য উনি যেন ওঁর ফায়ার আর্মস রেডি রাখেন। কিন্তু না—গুলি ছোড়া চলবে না।

বেরিয়ে গিয়ে হালদারমশাইকে কথাটা বলতেই উনি পকেট থেকে খুদে আগ্নেয়াস্ত্র বের করে বললেন, আই অ্যাম অলওয়েজ রেডি।

একটু পরে কর্নেল বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে সেই 'মাস্টার কি'-র সাহায্যে আগের মতো তালাটা এঁটে দিলেন। তারপর আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে বলে পাশের ঘরের তালা খুললেন এবং ভেতরে ঢুকে গেলেন।

আর ঢিল পড়ল না। ছাদেও কোনও শব্দ শোনা গেল না। মিনিট দু-তিন পরে কর্নেল পাশের ঘর থেকে বেরুলেন, এবং দরজা বন্ধ করে তালাটা দিব্যি আগের মতো এঁটে দিলেন। তারপর বললেন, আর নয়। এবার কেটে পড়া যাক।

কিন্তু অবাক কাণ্ড বাড়ির পেছনের দরজা কখন কে বাইরে থেকে আটকে দিয়ে গেছে। হালদারমশাই পাঁচিল টপকে ওধারে গিয়ে চাপা হুঙ্কার দিয়ে একটা কিছু করলেন এবং দরজাটা খুলে গেল। তিনি খি খি করে হেসে বললেন,—পুরানো কড়া। এক টানেই ব্রেকডাউন।

কর্নেল বললেন, কুইক! ভূতের মুখে খবর পেয়ে যে কোনও সময় পুলিশ এসে পড়তে পারে। পুলিশ অনধিকার প্রবেশের দায়ে আমাদের অ্যারেস্ট করলে একটু ঝামেলা হবে।

আমরা পুকুরপাড়ের ভেতর দিয়ে কারখানার পাঁচিলের কাছে গিয়ে আবার নস্কর লেনে পৌঁছুলাম।

সে-রাতে কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে কাজুবাদাম পটাটোচিপসের সঙ্গে কফি খেতে খেতে ক্ষুধার্ত হালদারমশাই শুধু মশা নিয়ে বকবক করছিলেন। বোঝা গেল, পাশে খাটাল এবং এঁদো পুকুর থাকার দরুন ওখানে মশার বড় উপদ্রব আছে। এক ফাঁকে ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম, মশার উপদ্রব তো থাকারই কথা। কিন্তু ভূতের উপদ্রব টের পাননি?

হালদারমশাই চমকে উঠে বললেন, কী কইলেন? ভূতের উপদ্রব?

কর্নেল বললেন, হালদারমশাই! গোবর্ধন সর্বাধিকারী কালো ছাতাটা কুড়িয়ে পাওয়ার পর থেকে ওঁর বাড়িতে ভূতের উৎপাত শুরু হয়েছিল।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন, কর্নেলসার! চৌতিরিশ বৎসর পুলিশে চাকরি করছি। কিন্তু এমন সাংঘাতিক এক্সপিরিয়েন্স হয় নাই। হঃ! ছাদের উপর ধুপধুপ শব্দ শুনছি। দরজার কড়া নড়ছিল—একবার নয়, অনেকবার। তারপর

পাশের ঘরে কী সব খুট্‌খাট্ নাড়াচাড়া। কিন্তু তখন কান দিই নাই। এখন মনে খটকা বাধল। আপনারা ভূতের উপদ্রব কইলেন!

—গোবরা কবরখানা কিন্তু বাড়িটার কাছাকাছি হালদারমশাই!

আমিও না বলে পারলাম না, কর্নেল! আমরা গিয়েও কিন্তু ভূতুড়ে উৎপাত দেখেছি। ঢিল পড়ছিল। ছাদের ওপর কী একটা অদ্ভুত শব্দ শুনেছি। সে-কথা হালদারমশাইকে বলা উচিত।

হালদারমশাই উত্তেজিতভাবে বললেন, হেভি মিস্ট্রি! তবে আমার নামও কে.কে. হালদার। ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ যদি করতে না পারি, আমার কান কাইট্ট্যা কুত্তার গলায় লটকাইয়া দিমু।

বলেই উনি সবেগে বেরিয়ে গেলেন। বরাবর দেখে আসছি, প্রচণ্ড উত্তেজনায় ওঁর মুখে দেশোয়ালি ভাষা বেরিয়ে যায়। আমি হেসে ফেললাম, কর্নেল! হালদারমশাই আবার ওবাড়িতে হানা দিতে গেলেন না তো?

কর্নেল সে-কথায় কান না দিয়ে বললেন, তুমি কী বুঝলে বলো জয়ন্ত?

বললাম, অনেক আগেই বুঝে গেছি।

—বাহ্। বলো শুনি!

—পুকুর বুজিয়ে যে-প্রোমোটার ওখানে বাড়ি তুলছে, এটা তারই চক্রান্ত। ভূতের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে গোবর্ধনবাবু বাড়ি বেচে অন্য কোথাও চলে যেতে চাইবেন এবং প্রোমোটার ওঁর বাড়িটা কিনে নিয়ে বহুতল বাড়ি তুলবে।

—কিন্তু তাকামিও আকামা কোম্পনির তৈরি ছাতার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক?

—হঠাৎ ভূতের উৎপাতের সঙ্গে ওই কালো ছাতাটা তো জড়িয়েই গেছে। গোবর্ধনবাবু ওটা কুড়িয়ে পাওয়ার পর থেকে ভূতের উৎপাত শুরু হয়েছে। প্রোমোটারের লোক কার্জন পার্কে গোবর্ধনবাবুর চোখে পড়া জায়গায় ছাতাটা ফেলে রেখেছিল।

—হুঁ। গোবর্ধনবাবু কার্জন পার্কে ঘাসের ওপর বসেছিলেন। হঠাৎ পাশেই ওই ছাতাটা পড়ে থাকতে দেখেছিলেন বটে!

ঘড়ি দেখে বললাম, আমি উঠি। এগারোটা বাজতে চলল।

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন, এত রাতে সল্টলেকে একা ফিরবে! ইস্টার্ন বাইপাসে তোমার গাড়ির ভেতর ভূত ঢুকে গেলেই বিপদ। নস্কর লেন থেকে বাইপাস বেশি দূরে নয়। হ্যাঁ—এমনও হতে পারে, নস্কর লেন থেকে আমাদের ফলো করে এস, ভূত তোমার গাড়ির তলায় ঘাপটি পেতে বসে আছে।

—ভূত-টুত বোগাস!

—টুত আরও সাংঘাতিক, ডার্লিং! কাজেই আমার বাড়িতেই রাতটা কাটিয়ে যাও। ষষ্ঠী! আমরা এবার খেতে যাচ্ছি।

কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে রাত কাটানো নতুন কিছু নয়। তবে আমি বিছানা থেকে দেরি করে উঠি। এদিন ঘুম ভাঙল পৌনে আটটায়। তা-ও ষষ্ঠী না ডাকলে আরও কিছুক্ষণ বিছানায় পড়ে থাকতাম।

আটটা নাগাদ ড্রয়িংরুমে ঢুকতেই কর্নেলের সম্ভাষণ শুনলাম, মর্নিং জয়ন্ত! আশাকরি সুনিদ্রা হয়েছে।

—মর্নিং! আপনার দেখছি সত্যিই পেছনে একটা চোখ আছে!

প্রাজ্ঞ রহস্যভেদী একটা আলমারির কাচের দিকে তর্জনি তুলে বললেন,—ওখানে তোমার প্রতিবিম্ব পড়েছিল। ডার্লিং! সবসময় সচেতন থাকলে অনেককিছু জানা এবং দেখা হয়ে যায়। তো বসো! হালদারমশাইকে টেলিফোন করে আসতে বলেছি। না, উনি গতরাতে আর নস্কর লেনে

ওত পাততে যাননি। আজ রাতে যেতেন। আমি বললাম, আর ওখানে যাওয়ার দরকার হবে না। বরং এখানে চলে আসুন।

—কী ব্যাপার?

—সাতটায় ছাদের বাগানে ছিলাম। তখন ষষ্ঠী গিয়ে খবর দিল, গোবর্ধনবাবু নামে এক ভদ্রলোক টেলিফোন করেছেন। জরুরি দরকার। অগত্যা নেমে এসে কথা বলতে হল। গোবর্ধনবাবু আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। জরুরি দরকার আছে।

—কিন্তু আপনি তো ওঁকে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে বলেছেন!

—বলেছি। অথচ উনি দেখা করতে চান। তাই ওঁকে নটার মধ্যেই আসতে বলেছি।

ষষ্ঠী ট্রেতে কফি-দুধ-চিনি-পেয়ালা আর স্ন্যাক্স রেখে গেল। কর্নেল কফি শেষ করে চুরুট ধরালেন। তারপর হঠাৎ উঠে ভেতরে চলে গেলেন। সেই কালো ছাতাটা নিয়ে ফিরে এলেন। ছাতাটা টেবিলে রেখে কর্নেল বললেন, তাকামিও আকামা কোম্পানির এই ছাতাটার গলায় টনসিলের অসুখ ছিল। কাল দুপুরে অসুখটা সারিয়ে দিয়েছি।

—ওঃ কর্নেল! আবার হেঁয়ালি করছেন।

—হেঁয়ালি? মোটেও না। ছাতাটার গলায় প্রায় এক ইঞ্চি ব্যাস এবং তিন ইঞ্চি লম্বা গোল শক্ত জিনিস আটকে ছিল। ছাতার মাথার টুপি খুলে সেটা বের করে ফেলেছি। ছাতাটা এখন সুস্থ।

—জিনিসটা কী?

—জানি না। যথাস্থানে পরীক্ষা করাতে হবে। তবে এখন ওসব কথা নয়।

মুখটি বুজে থাকো।

বলেই কর্নেল সোজা হয়ে বসলেন।

দোতলায় লিন্ডাদের কুকুরটা চ্যাঁচামেচি করছে। হালদারমশাই আসছেন। কেন জানি না, কুকুরটা ডিটেকটিভ ভদ্রলোককে সহ্য করতে পারে না।—ষষ্ঠী! দরজা খুলে দে।

তখনই ডোরবেল বাজল। এবং একটু পরে হালদারমশাই সবেগে ঘরে ঢুকে সোফায় বসে বললেন, মিস্ট্রি সল্‌ভ্‌ড্ হইল ক্যামনে?

কর্নেল বললেন, কফি খান। নার্ভ চাঙ্গা করুন। খবরের কাগজ পড়ুন। তারপর সে-সব কথা হবে।

ষষ্ঠী হালদারমশাইয়ের জন্য বেশি দুধ-মেশানো স্পেশাল কফি নিয়ে এল। উনি গম্ভীর মুখে কফিতে চুমুক দিয়ে খবরের কাগজ টেনে নিলেন। অন্যদিনের মতো একটা 'খাইছে' শোনার জন্য উদগ্রীব ছিলাম। কিন্তু উনি আমাকে নিরাশ করলেন।

কিছুক্ষণ পরে আবার ডোরবেল বাজল। ষষ্ঠী দেখে এসে বলল—কালকের সেই ভদ্রলোক এসেছেন।

কর্নেল ধমক দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, ওঁকে নিয়ে আয় হতভাগা। এরপর আস্তে পর্দা তুলে গোবর্ধন সর্বাধিকারী ঘরে ঢুকে বিনীতভাবে নমস্কার করে বললেন, কর্নেলসাহেবকে বিরক্ত করার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু—

কর্নেল বললেন, আপনি বসুন।

গোবর্ধনবাবু বসলেন। তারপর আমাকে এবং হালদারমশাইকে একবার দেখে নিলেন। হালদারমশাই তাঁকে দেখছিলেন। কর্নেল বললেন, আলাপ করিয়ে দিই! উনি হালদার প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির মিঃ কে কে হালদার। হালদারমশাই! ইনিই মিঃ গোবর্ধন সর্বাধিকারী।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ নড়ে বসলেন, আপনার ছাতা? আপনিই বিজ্ঞাপন দিছিলেন পেপারে?

গোবর্ধনবাবু বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। ওই ছাতা নিয়ে কী বিপদে পড়েছিলাম বলার নয়।

কর্নেল বললেন, বলুন গোবর্ধনবাবু!

—আজ্ঞে, ছাতাটার আসল মালিকের খোঁজ পেয়ে গেছি। আমার এক ভাগনে ভবানীপুরে থাকে। সে আমাকে কথায়-কথায় কাল সন্ধ্যাবেলা—

—এক মিনিট! আপনি তা হলে কলকাতাতেই ছিলেন?

—থাকব না তো কোথায় যাব? আমার কি কোথাও যাওয়ার উপায় আছে?

—বেশ। আপনি ছাতা ফেরত নিতে এসেছেন তো?

—আজ্ঞে!

কর্নেল টেবিল থেকে ছাতাটা তুলে ওঁকে দিলেন। উনি ছাতাটা বগলদাবা করে উঠে দাঁড়ালেন। কর্নেল একটু হেসে বললেন, আপনার টনসিল সেরে গেছে দেখছি!

গোবর্ধনবাবু কেমন একটু হকচকিয়ে গেলেন। বললেন, আজ্ঞে তা—

—আপনার ছাতারও টনসিলের অসুখ ছিল গোবর্ধনবাবু! সারিয়ে দিয়েছি।

—ছাতার টনসিলের অসুখ। কী বলছেন কর্নেলসাহেব!

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট ফেলে বললেন, আপনার টনসিলের অসুখ সেরেছে বটে, কিন্তু আপনি একটু রোগা হয়ে গেছেন।

গোবর্ধনবাবু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, ভয়ে কর্নেলসাহেব! ভয়ে আর দুশ্চিন্তায়। আচ্ছা চলি।

—একটু কফি অন্তত খেয়ে যান!

—আরেকদিন এসে খাব। একটু তাড়া আছে।

—আচ্ছা গোবর্ধনবাবু! আপনি কি রোজই কার্জন পার্কে বেড়াতে যান?

—যাই কর্নেলসাহেব। অফিস থেকে বেরিয়ে কার্জন পার্কে কিছুক্ষণ বসে থাকি।

—আপনি এত সকালে চুল ছেঁটেছেন দেখছি! গোঁফটাও ছেঁটেছেন!

গোবর্ধনবাবু আবার একটু ভড়কে গেলেন। যাওয়ারই কথা। আমিও কর্নেলের প্রশ্নের মাথামুণ্ডু খুঁজে পাচ্ছি না। হালদারমশাই গুলি-গুলি চোখে তাকিয়ে আছেন। উত্তেজনায় তাঁর গোঁফ তরতর করে কাঁপছে। গোবর্ধনবাবু কাঁচুমাচু হেসে বললেন, আসার পথে ফুটপাতে ছেঁটে নিলাম।

—আপনার বাড়ি টেলিফোন আছে। আপনি ফুটপাতে চুল আর গোঁফ ছাঁটলেন? এটা আপনাকে মানায় না। যাই হোক, কাল আপনি বাড়ি থেকে বেরুনোর সময় ঘরে তালা দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। তাই প্রাইভেট ডিটেকটিভ হালদারমশাই আপনার ঘরে ঢুকতে পেরেছিলেন। তাই না হালদারমশাই?

হালদারমশাই শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে শুধু বললেন,—হঃ!

সর্বনাশ! তা হলে তো এতক্ষণ আমার সব চুরি হয়ে গেছে।—বলে গোবর্ধনবাবু পা বাড়ালেন।

কর্নেল বললেন, না। আপনার ঘরের দরজায় একটা তালা আমরা কাল রাতে দেখে এসেছি। তাই না হালদারমশাই?

প্রাইভেট ডিটেকটিভ বললেন, হঃ! কোন ব্যাটা তালা আটকাইয়া দিছিল। তখন আমি ওনার ঘরে ভরা। ওঃ। সে কী মশা! ও বাড়িতে থাকেন কী কইরা বুঝি না।

কর্নেল বললেন, তাকামিও আকামা কোম্পানির ছাতাটা নিয়ে যাচ্ছেন, যান। কিন্তু মনে রাখবেন, ছাতাটার টনসিলের অসুখ আমি সারিয়ে দিয়েছি।

গোবর্ধনবাবু কেমন চোখে তাকিয়ে থাকার পর আবার ঘুরে দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

কর্নেল এবার খুব গম্ভীর কণ্ঠস্বরে বলে উঠলেন, আপনাকে একটু বসতে হবে জনার্দনবাবু!

ঘরে যেন বিনামেঘে বাজ পড়ল। আমি ও হালদারমশাই পরস্পর তাকাতাকি করলাম। কর্নেল পকেট থেকে সেই ছোট্ট গোল ফিল্মরোলের মতো জিনিস বের করে বললেন, জনার্দনবাবু! এই জিনিসটা আপনার কাছে পৌঁছুনোর কথা। এটাই ছাতার টনসিলের মধ্যে ছিল। কিন্তু আপনার দুর্ভাগ্য! আপনি কোনও কারণে সেদিন কার্জন পার্কে সময়মতো পৌঁছুতে পারেননি। এদিকে আপনার যমজভাই গোবর্ধনবাবু সেখানে নেহাত খেয়ালে গিয়ে পড়েছিলেন। তাই এই ছাতাটা তাঁরই সামনে ফেলে রেখে চলে যায় আপনার স্মাগলিং গ্যাংয়ের কোনও লোক।... না-না। পালানোর চেষ্টা করবেন না।

হালদারমশাই ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। একলাফে এগিয়ে গিয়ে জনার্দন সর্বাধিকারীকে ধরে ফেললেন, এই ব্যাটা আমারে ঘরে আটকাইয়া রাখছিল! এই সে ভূত। এই ভূতের জন্য—ওঃ! সে কী মশা!

কর্নেল বললেন,—জনার্দনবাবু! কাল রাতে আপনার ঘরে ঢুকে সব দেখেছি। আপনার নামও জানতে পেরেছি। খাটের তলায় বিদেশি ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম থেকে শুরু করে নানা দামি জিনিস ঠাসা আছে। আপনি আপনার যমজ ভাই গোবর্ধনবাবুর টেলিফোন ট্যাপ করে রেখেছিলেন, তা-ও দেখেছি। আমরা যাওয়ার পর বেগতিক বুঝে ওঁর টেলিফোনের তার ছিঁড়ে ফেলেছিলেন আপনি।

এই সময় ডোরবেল বাজল। কর্নেল হাঁকলেন, ষষ্ঠী!

একটু পরে আমার পরিচিত কাস্টমস অফিসার রথীন মৈত্র এবং তাঁর দুজন অনুচর ঘরে ঢুকলেন। রথীন মৈত্র বললেন, ৩৩/১ নম্বর লেনের একটা ঘরে রেইড করে প্রচুর ড্রাগ ক্যাপসুল পেয়েছি কর্নেল সরকার! তো এই বুঝি সেই জনার্দন সর্বাধিকারী? একবার ভুল করে এঁর যমজ ভাইকে অকারণ হ্যারাস করেছিলাম আমরা। এই জনার্দনরা ড্রাগ পাচার করে এনে দেশটার সর্বনাশ করছে।

কর্নেল সেই ফিল্মরোলের মতো জিনিসটা ওঁর হাতে দিয়ে বললেন,—এতেও নিষিদ্ধ ড্রাগ ভরা আছে। আপনারা পরীক্ষা করলে বলতে পারবেন, এর কত দাম। আর জনার্দনবাবুর ছাতাটাও নিয়ে যান।

রথীন মৈত্র জনার্দনবাবুকে ছাতাসহ পাকড়াও করে নিয়ে গেলেন। হালদারমশাই একটিপ নস্যি নিয়ে বললেন, কী কাণ্ড! যমজ ভাই, তা বুঝলেন ক্যামনে কর্নেলসার?

কর্নেল বললেন, গতরাতে যখন জনার্দনবাবুর ঘরে ঢুকি, তখন কিছু বুঝতে পারিনি। জনার্দন সর্বাধিকারীর বিজনেস কার্ড ওই ঘরে দেখতে পেলেও ওঁকে তো তখনও চর্মচক্ষে দেখিনি! এদিকে গোবর্ধনবাবুও বলেননি তাঁর কথা। হাজার হলেও সহোদর ভাই। তাই আমার কাছে কথাটা গোপন রাখা স্বাভাবিক। তবে হ্যাঁ—এটা সুস্পষ্ট যে, উনি টের পেয়েছিলেন ভূতের উৎপাত কে বাধিয়েছে। আসলে উনি ভাইটিকে বাঁচানোর জন্যই শেষ পর্যন্ত ছাতাটা আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ সকালে যখন ওঁর ফোন এল, তখন প্রথমে একটু খটকা লাগল। কণ্ঠস্বর কতকটা এক হলেও টনসিলের রোগীর মতো নয়। তারপর কিছুক্ষণ আগে যখন ষষ্ঠী এসে বলল, কালকের সেই ভদ্রলোক এসে দাঁড়িয়ে আছেন, তখন খটকাটা বেড়ে গেল। গোবর্ধনবাবুর তো সোজা এ ঘরে ঢুকে পড়া উচিত ছিল। তারপর আমার প্রশ্নগুলো স্মরণ করুন। চুলের ছাঁট, গোঁফ, একটু রোগাটে গড়ন এবং আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর থেকে স্পষ্ট বুঝলাম, ইনি কখনই গোবর্ধনবাবু নন। এঁকে যমজভাই বলে সাব্যস্ত করতেই হল।

যমজদের বিষয়ে আমি কিছু পড়াশুনা করেছি। দেখতে একইরকম হলেও যমজদের মধ্যে আচরণগত কিছু তফাত থাকে। দু'জনের আঙুলের ছাপও আলাদা। তার চেয়ে বড় কথা, কাল গোবর্ধনবাবুর সঙ্গে আমার কী কথা হয়েছিল ইনি তা জানেন না।

হালদারমশাই খি খি করে হেসে উঠলেন। আমি বললাম, এ তা হলে সুকুমার রায়ের সেই গোঁফচুরি পদ্যটার ব্যাপারই হয়ে দাঁড়াল। ছাতার আমি, ছাতার তুমি, ছাতা দিয়ে যায় চেনা! কিন্তু গোবর্ধনবাবুকে আপনি গা-ঢাকা দিতে বলেছিলেন কেন?

কর্নেল হাঁকলেন, ষষ্ঠী! আরেক রাউন্ড কফি!

তারপর বললেন, আমার সন্দেহ হয়েছিল, ছাতার মধ্যে এমন কিছু লুকোনো আছে, যার জন্য গোবর্ধনবাবু আরও সাংঘাতিক বিপদে পড়তে পারেন।

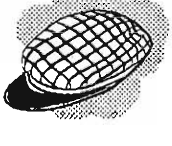

অকালকুষ্মাণ্ড

স্টেশন তখনও অন্তত আধকিলোমিটার দূরে, ট্যাক্সিটা বিগড়ে গেল। ট্রেনের সময় হয়ে এসেছে। ট্যাক্সির সামনে ও পিছনে গাদাগাদি করে প্রায় এক ডজন যাত্রী ঠাসা ছিল। এ-মুল্লুকে নাকি এটাই রেওয়াজ। তবে শীতের দাপটে অবস্থাটা খুব একটা অসহনীয় মনে হচ্ছিল না। তো ট্যাক্সিওয়ালা দশ কিলোমিটার পথ আসতে ইতিমধ্যে তিনবার ভাড়া বাড়িয়েছে। এবার এই কলকব্জা বিগড়ে যাওয়ার ব্যাপারটাকে চতুর্থ দফা ভাড়া বাড়ানোর ফন্দি ভেবেই আমরা যাত্রীরা ঝটপট নেমে এলুম। এবং যাঁদের ঠ্যাংগুলো লম্বা তাঁরা সবার আগে দেখতে-দেখতে উধাও হয়ে গেলেন।

একটু পরে দেখি, আমি আর ট্যাক্সিওয়ালা ছাড়া আর জনপ্রাণীটি নেই। ট্যাক্সিওয়ালার মুখের দিকে তাকিয়ে কোনও ফন্দিফিকির বা ধূর্তামির চিহ্ন খুঁজে পাচ্ছিলুম না। লোকটা করুণ মুখে এঞ্জিনের কলকব্জার দিকে তাকিয়ে আছে। বললুম, "কী দাদা, কী বুঝছেন?"

লোকটা হতাশভাবে মাথা নেড়ে বল,"নেহি সাব। আপ পাঁয়দল চলা যাইয়ে।"

হুঁ, ভেবেছে আমি ওর হাড়জিরজিরে গাড়িটার মূর্ছাভাঙার অপেক্ষায় আছি। আসলে এতক্ষণ ঠাসাঠাসিতে আমার শরীর আগাগোড়া ঝিম মেরে গেছে। পা দুটোতে কোনও সাড় নেই। তাই সেই ঝিমুনি কাটিয়ে নিচ্ছি। এবং সেটা ওকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যেই রাস্তার উপরে পা দুটো ঘোড়ার মতো ঠুকতে-ঠুকতে কয়েক পা এগিয়ে গেলুম। কাছেই একটা ব্রিজ রয়েছে। নদীটা বেশ চওড়া। তবে আদ্ধেকের বেশি বালিতে ভরা, বাকিটায় কালো জল। স্রোত বইছে বলে মনে হচ্ছিল না।

বিকেল হয়ে গেছে। শীতের দিন ঝটপট ফুরিয়ে যায়। হিসেব করে দেখলুম, ট্রেনের এখনও মিনিট কুড়ি দেরি। স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে গেলেও ট্রেন ধরা যাবে। সঙ্গে একটা কিটব্যাগ ছাড়া কোনও বোঝা নেই। তাছাড়া জায়গাটা কেন যেন খুব ভাল লাগছিল। একধারে ছোটবড় পাহাড়। তার উপত্যকা শীতের শস্যে সবুজ হয়ে আছে। অন্যধারেও পাহাড় আছে। আর আছে ঝোপঝাড় আর মাঝে-মাঝে ঘন জঙ্গল। সামনে ওই স্টেশনের কাছে যা একটা বসতি—তাছাড়া কাছাকাছি কোনও বসতির চিহ্ন চোখে পড়ছিল না। মনে হল, জায়গাটা ভ্রমণবিলাসীদের পক্ষে মোটামুটি পছন্দসই।

হঠাৎ আমার চোখ গেল ডাইনে নদীর পাড়ে জঙ্গলের দিকটায়। ঝোপের মধ্যে কী একটা বসে আছে যেন। বাঘ-ভালুক নাকি? বলা যায় না, এই জঙ্গলে জনহীন জায়গায় বিশেষ করে শীতকালে জন্তু-জানোয়ার বেরিয়ে পড়তেও পারে।

ধূসর রঙের প্রাণীটি আমার দিকে পিঠ রেখে ওত পেতে আছে। একবার ভাবছি, ট্যাক্সিওয়ালাকে ডেকে সাবধান করে দিই। আবার ভাবছি, আমার ডাকাডাকি শুনে যদি দাঁত-নখ বাগিয়ে তেড়ে আসে! অবশ্য রাস্তাটা যথেষ্ট উঁচু এবং আন্দাজ দেড়শো মিটার দূরত্বে রয়েছে ওটা।

কিন্তু আমাকে হকচকিয়ে দিয়ে ওটা উঠে দাঁড়াল এবং তক্ষুনি বুঝলুম, চোখের ভুল হয়েছে। ওটা ধূসর রঙের কোট-প্যান্ট পরা একজন মানুষই বটে। হাতে কী একটা রয়েছে। গা ছমছম করে উঠল এবার অন্যরকম ভয়ে। হাতে কি ওটা পিস্তল? কাউকে খুন করার জন্যে ওত পেতে আছে লোকটা? কিন্তু কোটপ্যান্ট এবং দস্তুরমতো সায়েবি টুপিপরা কোনও লোক কাউকে খুন করার জন্যে ওভাবে ওত পেতেছে, এটা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত মনে হল না।

অথচ ওর গতিবিধি সন্দেহজনক। সন্দেহ আরও বাড়ল, যখন দেখলুম, লোকটা হাতের কালোরঙের জিনিসটা তুলে গুলি ছোড়ার ভঙ্গিতে একটু কুঁজো হল এবং ওইভাবে পা টিপে টিপে ঝোপঝাড় ভেঙে এগুতে থাকল।

তারপর দেখি, সে দৌড়তে শুরু করেছে। গুরুতর দুর্ঘটনার আশঙ্কায় আমার বুক ঢিপঢিপ করছে এবার। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছি, গুলির শব্দ আর মানুষের আর্তনাদ শুনব। ওর হাতের জিনিসটা যদি বন্দুক হত, তাহলে তো শিকারিই ভাবতুম। পিস্তল দিয়ে কি কেউ পাখি বা জন্তুজানোয়ার শিকার করে?

দৌড়ে সে যেখানে ঢুকলে, সেখানে কিছু উঁচু-উঁচু গাছ রয়েছে। ছায়ায় অস্পষ্টভাবে তাকে দেখতে পাচ্ছি। তারপর সে অন্তত একমিনিটের জন্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। ট্যাক্সিওয়ালা ব্যাপারটা দেখেছে নাকি জানার জন্যে ওদিকে ঘুরলুম। না, ও এখনও এঞ্জিনের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে।

আবার যখন সেই লোকটাকে দেখতে পেলুম, তখন সে নদীর পাড়ে হাঁটু দুমড়ে বসেছে এবং পিস্তল তাক করে রেখেছে। আর চুপ করে থাকতে পারলুম না। দৌড়ে গিয়ে ট্যাক্সিওয়ালাকে ব্যাপারটা দ্রুত জানিয়ে দিলুম। দু-দু'জন মানুষ এখানে থাকতে একটা খুনখারাপি হবে। যে ট্যাক্সিওয়ালা তিন-তিনবার যাত্রীদের চাপ দিয়ে ভাড়া বাড়িয়েছে, তার বিবেকও এবার নড়ে উঠল। "এইসা?" বলে সে তার ট্যাক্সি থেকে একটা লোহার রড বের করল। তারপর চোখ কটমট করে আমাকে ডাক দিল। আমারও একটা কিছু হাতে নেওয়া দরকার। অগত্যা ওর এঞ্জিনের মধ্যে রাখা একটা রেঞ্জ তুলে নিয়েই রওনা দিলুম। উত্তেজনায় মাথার ঠিক নেই।

ট্যাক্সিওয়ালা উঁচু রাস্তা থেকে নামতে গিয়ে গড়িয়ে পড়ল। তারপর দুর্বোধ্য ভাষায় চাপা স্বরে কী বলতে বলতে ঝোপঝাড় ভেঙে এগুতে থাকল। আমি ওর পিছু-পিছু চলেছি। দু'জনেই সতর্ক। আচমকা ধরে ফেলব ওকে।

আমাদের দিকে পিঠ রেখে লোকটা এখনও তেমনি বসে আছে। টুপিপরা মাথাটা সামনে ঝুঁকেছে, হাতের পিস্তল একেবারে নাকের ওপর তুলে তাক করে রেখেছে। সম্ভবত হতভাগ্য মানুষটি অর্থাৎ যাকে খুন করবে, সে নিচে নদীতে নিশ্চিন্তে কিছু করছে-টরছে। কিছু টের পাচ্ছে না। খুনে লোকটির হাতে পিস্তল আছে বলেই আমরা এ সাবধানী হয়েছি। পা টিপে এগিয়ে কয়েক মিটার দূর থেকে ট্যাক্সিওয়ালা রড তুলল এবং আমিও রেঞ্জটা বাগিয়ে চেঁচিয়ে উঠলুম, "খুন করলে! খুন করলে! পাকড়ো পাকড়ো!" ভুলেই গেলুম যে, ওর হাতে পিস্তল আছে।

কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে গুপ্তঘাতক ঘুরে ব্যাপারটা দেখেই হুড়মুড় করে নদীতে ঝাঁপ দিল। ট্যাক্সিওয়ালা রড নাচিয়ে পাড় থেকে শাসাতে শুরু করল। "পিস্তল ফেক দো! নেহি তো ডাণ্ডা মারেগা হাম!"

আমি তখন হতভম্ব দাঁড়িয়ে গেছি। কী বলব, ভেবে পাচ্ছি না। নাকি এখনও লিটনগঞ্জের সেই সরকারি অতিথিশালায় শুয়ে একটা বিদ্‌ঘুটে স্বপ্ন দেখছি।

কালো এবং প্রচণ্ড ঠাণ্ডা জলে বুক-অব্দি ডুবিয়ে হতভাগ্য গুপ্তঘাতক এখন ফ্যালফ্যাল করে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। তার টুপিটাও খুলে পড়ে কাগজের নৌকোর মতো ভেসে যাচ্ছে অল্প অল্প স্রোতে, এবং তার ফলে মাথাজোড়া যে টাকটি এই গোলাপি রোদ্দুরে চিকমিক করছে, সেটি অতি প্রসিদ্ধ এবং আমার সুপরিচিত। তার সান্টা ক্লজ-সদৃশ সাদা অনবদ্য গোঁফ- দাড়িতে এখন বিস্তর জলকাদা লেগেছে।

এবং তার হাতের সেই পিস্তলটা পরিণত হয়েছে বাইনোকুলারে। হয়েছে বলেই আমাদের বোকামির শাস্তি পাইনি। কিন্তু ততক্ষণে আমার পেটে হাসি ঘুলিয়ে উঠছে। হায় বুড়ো ঘুঘু। এ কী

দশা তোমার! ট্যাক্সিওয়ালা লোহার রডটা ফের তুলতেই করুণ আওয়াজ এল, "জয়ন্ত! ওকে একটু বুঝিয়ে বলো যে, এটা পিস্তল-টিস্তল নয়, সামান্য একটা দূরবীন।"

এতক্ষণে আমি হাসতে পারলুম। হো-হো করে হেসে উঠলুম। ট্যাক্সিওয়ালা অবাক হয়ে বলল, "ক্যা জি? কোই জান-পহচান্ আদমি? কৌন হ্যায় উও?"

বললুম, "থোড়া গলতি হুয়া দাদা! মাফ কিজিয়ে। উও দেখিয়ে আপকা ট্যাক্সিমে বাচ্চালোগ ক্যা গড়বড় কর রহা।"

সত্যি-সত্যি কাচ্চাবাচ্চারা ওই জনহীন রাস্তায় ওর ট্যাক্সিতে হামলা করেনি, কিন্তু উপায় নেই। ওই নিমজ্জিত বৃদ্ধ ভদ্রলোককে উদ্ধার করতে হবে। শীতের বিকেলে নদীর জল ওঁর পক্ষে নিশ্চয় আরামদায়ক হচ্ছে না। যাইহোক, আমার মিথ্যে কথায় কাজ হলো। ট্যাক্সিওয়ালা ঘুরে দাঁড়াল। তারপর ওর হাতে সেই ছোট্ট রেঞ্জটা গুঁজে দিতেই সে জঙ্গল ভেঙে রাস্তায় ট্যাক্সির দিকে দৌড় দিল।

নিমজ্জিত বৃদ্ধের দিকে ঘুরে সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে বললাম, "জলটা কি খুবই ঠাণ্ডা?"

উনি করুণ হেসে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, "ধন্যবাদ! আমি এবার উঠতে পারব। তবে দয়া করে তুমি আমার টুপিটা উদ্ধার করো।"

হাসতে-হাসতে একটা গাছের ডাল ভেঙে ধীরে ধীরে ভাসমান টুপিটা উদ্ধার করে দেখি, উনি পাড়ে উঠেছেন এবং কী আশ্চর্য আবার চোখে বাইনোকুলার রেখে পা টিপে টিপে এগোচ্ছেন! ভিজে পোশাক থেকে জল ঝরছে সমানে। কিন্তু এতক্ষণে সব রহস্য আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। বিরক্ত হয়ে ওঁর প্রচলিত নাম বা বদনাম ধরে ডেকে ফেললুম, "হাই ওল্ড ঘুঘু! নিমুনি হবে যে!"

উনি কানই দিনেল না। দৌড়ে গিয়ে ওঁর কাঁধ খামচে ধরলুম। তখন হতাশ ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়ালেন। "মাই ডিয়ার ইয়ংম্যান! তুমি জানো না, কী সাংঘাতিক ক্ষতি করেছ আমার! অনেক কষ্টের পর বিরল প্রজাতির একটা উড-ডাকের দেখা পেয়েছিলুম! আর কি তাকে খুঁজে পাব?"

ওঁর কথায় এবার অনুতাপ জাগল। বললুম, "এই দুর্ঘটনার জন্যে আমি যথেষ্ট লজ্জিত এবং দুঃখিত। ক্ষমা করুন এবং চলুন, যেখানে উঠেছেন, সেখানে গিয়ে পোশাক বদলাবেন।"

"এক মিনিট, জয়ন্ত! আমি প্রজাপতিধরা জালটা নিয়ে আসি।"

বলে উনি সামনের দিকে পা বাড়ালেন। সেদিকে তাকিয়ে দেখি, গাছপালার ফাঁকে একটা কাঠের বেড়া দেখা যাচ্ছে। বুড়ো দেখতে দেখতে কী কৌশলে সেই বেড়ার ফাঁক গলিয়ে অদৃশ্য হলেন। তখন ব্যাপারটা ভাল করে দেখার জন্য বেড়ার দিকে এগিয়ে গেলুম।

একটা কৃষিফার্ম বলে মনে হল। নদীর ধারে চারপাশে পাহাড় আর জঙ্গলের মধ্যে কেউ চাষবাস করছে। অঢেল শীতের ফসল ফলে রয়েছে। তরিতরকারিও লাগানো আছে। বুড়ো এখন হামাগুড়ি দিয়ে কুমড়োখেতের দিকে এগোচ্ছেন। দুর্লভ প্রজাতির কতকগুলো প্রজাপতি ওঁর জালে ধরা পড়েছে জানি না, তবে আমার চোখ পড়ল কুমড়োগুলোর দিকে। কিন্তু ওগুলো কি সত্যি কুমড়ো, না পাথর? চতুর্দিকে অজস্র ছোটবড় পাথর পড়ে আছে। অনেকরকম গড়ন, নানান রঙের। কিন্তু কুমড়োখেতের ওগুলোর মসৃণ নিটোল গড়ন আর সোনালি রং দেখেই বুঝতে পারলুম, পাথর নয়। অতএব কুমড়ো ছাড়া আর কী?

আমার বৃদ্ধ বন্ধু ওখানে হাঁটু মুড়ে সাবধানে জাল গুটোচ্ছিলেন। হঠাৎ কোত্থেকে বাজখাঁই গলায় কে চেঁচিয়ে উঠল, "অ্যাই! অ্যাই! অ্যাই!" তারপর দেখি, গমবুটপরা, বেঁটে, নাদুনুদুস চেহারার এক ভদ্রলোক হাতে খুরপি নিয়ে দৌড়ে আসছেন! এই রে! এবার আর বুড়োকে বাঁচানো যাবে না। আমি বেড়ার ফাঁক গলিয়ে ঢোকার জন্যে সাধ্যসাধনা করছি। তার মধ্যে শুনি, উভয়পক্ষই হা-হা- হো-হো করে হেসে উঠলেন।

"জয়ন্ত! চলে এসো। আলাপ করিয়ে দিই।"

ডাক শুনে বেড়া গলিয়ে ঢুকে পড়লুম। খামারের মালিক অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন। বেড়ার ফাঁকটা বেড়ে গেছে। সম্ভবত সেদিকেই ওঁর নজর। ...

খামারের মালিকের পরিচয় পেয়ে আমি অবাক। ভদ্রলোক আসলে একজন কৃষিবিজ্ঞানী। নাম ডঃ রঘুনাথ গিন্‌তিওয়ালা। সংক্ষেপে ডঃ গিন্‌তি। অনেককাল পশ্চিমবঙ্গে ছিলেন। ভাল বাংলা বলেন। এই খামার তাঁর ল্যাবরেটরি। গাছগাছড়া নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তাছাড়া এক ঋতুর ফসল কীভাবে অন্য ঋতুতে ফলানো যায়, তা নিয়েও মাথা ঘামান। আমার কৌতূহল ওঁর ফলানো কুমড়ো সম্পর্কে। প্রশ্ন শুনে হাসতে-হাসতে বলনে, "আপনার বাঙালিরা কুমড়োর ছক্কা খেতে খুব ভালবাসেন। ওদিকে লিটনগঞ্জের কলকারখানা এলাকায় অজস্র বাঙালি আছেন। বলতে পারেন, তাঁদের মুখ চেয়েই আমি এই উৎকৃষ্ট জাতের কুমড়ো ফলিয়েছি। ওখানকার অফিস ক্যান্টিনগুলোতে তরিতরকারি জোগায় একটা এজেন্সি। তারা আমার খেতের কুমড়ো ট্রাকবোঝাই করে কিনে নিয়ে যায়। আপনার বন্ধু কর্নেলসাহেবকেই জিজ্ঞেস করুন, সত্যি না মিথ্যে।"

কর্নেলসায়েব অথাৎ 'বুড়ো ঘুঘু' বলে পরিচত কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। এই খামারবাড়ির পাশের ঘর থেকে ভিজে পোশাক ছেড়ে ডঃ গিন্‌তি বেঁটে পাজামা-পানজাবি এবং একখানা আস্ত কম্বল জড়িয়ে এতক্ষণ এলেন। ফায়ারপ্লেসের সামনে আরাম করে বসে বললেন, "জয়ন্ত, ডঃ গিন্‌তির ওই কুমড়োগুলো কিন্তু অকাল-কুষ্মাণ্ড!"

ডঃ গিন্‌তি হো-হো করে হেসে উঠলেন। "কী বললেন? অকাল-কুষ্মাণ্ড?"

কর্নেল বলেন, "তাছাড়া আর কী বলব? সচরাচর কুমড়ো পরিণত আকার পেতে এবং পাকাপোক্ত হতে অনেক দিন লেগে যায়। আপনার এই কুমড়ো মাত্র তিনমাসেই প্রকাণ্ড হয়ে ওঠে। ভেতরটা লাল টুকটুকে।"

ডঃ গিন্‌তি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন যেন। বললেন, "না, না। লাল বলা ঠিক নয়, হলদে। আপনি তো ভেতরটা দেখার সুযোগ পাননি এখনও। বরং কাল সকালে আপনার ফরেস্টবাংলোয় খানিকটা পাঠিয়ে দেব। তখন..."

বাধা দিয়ে কর্নেল বললেন, "সরি! ভেতরটা তো এখনও দেখিইনি। তবে যেন মনে হচ্ছে, ভেতরটা লাল হওয়াই উচিত।"

"কেন বলুন তো?"

"বুঝলেন ডঃ গিন্‌তি, আমার ইদানীং উদ্ভিদ বিজ্ঞানের দিকেও ঝোঁক চেপেছে। সেদিন একটা পত্রিকায় দেখছিলুম, অবিকল এই জাতের কুমড়ো পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে ফলে। প্রশান্ত মহাসাগরের ওই সব দ্বীপে দু'শো বছর আগে কুমড়ো কী তা কেউ জানই না। ১৭৩৯ সালে বিখ্যাত অভিযাত্রী টমাস কুক প্রথম তাহিতি দ্বীপে বিলিতি কুমড়োর কিছু বীজ পুঁতে এসেছিলেন। তার প্রায় একশো বছর পরে বিবর্তনবাদের প্রবক্তা চার্লস ডারউইন গিয়ে দেখেন, মাটির গুণে বিশাল আকারের কুমড়ো ফলেছে। তো তখনও দ্বীপের লোকেরা ভয়ে কুমড়ো ছোঁয় না। ওখানকার একটা দ্বীপের নাম ইস্টার দ্বীপ। সেখানে লোকেরা যে পক্ষিদেবতার পুজো করে এ বুঝি তারই ডিম। বুঝুন অবস্থা!"

আমি ও ডঃ গিন্‌তি হেসে উঠলুম। এই সময় কফি এল। আমরা আরাম করে কফিতে চুমুক দিলুম। কর্নেলবুড়ো কোনও ব্যাপারে একবার মুখ খুললে তো থামতে চান না। আবার পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে ফিরেছেন। গতিক দেখে ডঃ গিন্‌তি আমার দিকে চোখ ইশারা করে বললেন, "ইয়ে, এবার জয়ন্তবাবুর ব্যাপারটা শোনা যাক। বলুন জয়ন্তবাবু, কী দেখে এলেন লিটনগঞ্জে?"

কর্নেল চিমটেয় অগ্নিকুণ্ড থেকে এক টুকরো অঙ্গার তুলে চুরুট ধরাতে ব্যস্ত হলেন। আমি বললুম, "ব্যাপার সত্যি সাংঘাতিক। হেভি ওয়াটার প্ল্যান্টের প্রায় অর্ধেকটা বিস্ফোরণে গুঁড়ো হয়ে

গেছে। সরকারি গোয়েন্দারা এখনও তদন্ত করছেন। কয়েকজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। কিন্তু আঁচ করা যাচ্ছে না যে, অত কড়াকড়ি নিরাপত্তা ব্যবস্থা সত্ত্বেও কীভাবে অন্তর্ঘাত ঘটল!"

ডঃ গিন্‌তি শিউরে উঠলেন। "বলেন কী! অন্তর্ঘাত? তাহলে ফিরে গিয়ে আপনাদের পত্রিকায় কড়া করে লিখবেন জয়ন্তবাবু।"

কর্নেল আমার দিকে ঘুরে দুষ্টু হেসে বললেন, "রিপোর্টার হিসেবে জয়ন্তের খুব সুনাম আছে ডঃ গিন্‌তি। ওর কলমের জোরে সরকারি অফিসের চেয়ারগুলো কেঁপে ওঠে শুনেছি।"

পালটা খোঁচা মেরে বললুম, "আর আপনার? আপনারও তো বুড়ো ঘুঘু বলে যথেষ্ট নাম আছে।"

কর্নেল আচমকা কাশতে শুরু করলেন। সর্বনাশ! জলে নাকানিচোবানি খাওয়ার ফলাফল। ডঃ গিন্‌তি আমাকে কী প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, উদ্বিগ্ন হয়ে থেমে গেলেন। কিন্তু না, কর্নেল সামলে নিয়েছেন। বুড়ো হাড়ে ভেল্কি দেখানোর ক্ষমতা আছে ওঁর। রুমালে নাক মুছে বললে, "এবার ওঠা যাক। বাংলোয় ফিরতে রাত হয়ে যাবে।"

ডঃ গিন্‌তি বললেন, "সঙ্গে লোক দেব। আলো দেব। কিছু ভাববেন না। তা জয়ন্তবাবু, ওই হেভিওয়াটার প্ল্যান্ট ব্যাপারটা আদতে কী বলুন তো? বুঝতেই পারছেন, আমি নিছক কৃষিবিদ্যার চর্চা করি।"

কর্নেল হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। "এবার উঠি ডঃ গিন্‌তি। আপনার আতিথ্য এবং সাহায্যের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কাল সকালে আপনার এই কাপড়-চোপড় আর কম্বল ফেরত পাঠাব! এসো জয়ন্ত।"

বলে উনি সটান বেরিয়ে গেলেন। বাইরে এতক্ষণে চাঁদ উঠেছে। কিন্তু কুয়াশাও ঘন হয়ে জমেছে, আর কনকনে ঠাণ্ডার কথা না তোলাই ভাল। মনে হচ্ছিল, কর্নেলবুড়োর পাল্লায় পড়াটা ঠিক হয়নি। সোজা ভারুণ্ডি স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরলে ভাল করতুম।

এই জঙ্গলের পথে হাড়কাঁপানো শীতে ফরেস্ট বাংলোর দিকে হাঁটতে হাঁটতে এবার বাঘভালুকের ভয় হচ্ছিল। শুনলুম বারুণ্ড জঙ্গলে বুনো হাতিরও উৎপাত আছে। তবে ডঃ গিন্‌তির লোকটির হাতে আলো আছে।

ফরেস্ট বাংলোয় আরাম করে বসে কর্নেল বললেন, "জয়ন্ত, সবার সামনে আমাকে বুড়ো ঘুঘু বলাটা তোমার বদ অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। না—আমি রাগ করিনি। কিন্তু কথাটা তোমার তলিয়ে দেখা উচিত। তুমি কি এলিয়ট রোডে আমার ফ্ল্যাটের নতুন নেমপ্লেটটা লক্ষ্য করোনি?"

একটু হেসে বললুম, "করেছি। লেখা আছে : 'কর্নেল নীলাদ্রি সরকার, প্রকৃতিবিদ'। বুড়ো-ঘুঘুর বাসা বলে পরিচিত ফ্ল্যাটের মধ্যে এখন কাচের জার-ভর্তি। তাতে প্রজাপতি-পোকামাকড়েরা ডিম পাড়ছে। হরেক পাখপাখালির মমি সাজানো রয়েছে। দুর্লভ এবং বিরল প্রজাতির নমুনা। কিন্ত হে বৃদ্ধ, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। তাছাড়া অভ্যাস যায় না মলে। দশ কিলোমিটার দূরে লিটনগঞ্জে হেভিওয়াটার প্ল্যান্টের রহস্যময় দুর্ঘটনা আর ভারুণ্ডি ফরেস্ট বাংলোয় এক প্রাক্তন গোয়েন্দার অবস্থিতি কি নেহাত কাকতালীয় ব্যাপার? দুয়ের মধ্যে কোনও যোগাযোগ নেই? আমি মোটেও বিশ্বাস করি না।"

কর্নেল জোরে মাথা দুলিয়ে বললেন, "একেবারে কাকতালীয়। আমাকে সরকার ওসব ব্যাপারে কোনও অনুরোধ করেনি। আমি এসেছি, উড-ডাকের খবর পেয়ে। খবরের কাগজের লোক হলেও ওসব খবরে তোমার মাথাব্যথা থাকে না। নইলে সম্প্রতি ভারুণ্ডির জঙ্গলে উড-ডাকের আবির্ভাবের খবর তোমার চোখে পড়ত। যাক গে, এবার খাওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। তোমার নিশ্চয় খুব খিদে পেয়েছে। আমি চৌকিদারকে দেখি। ততক্ষণ তুমি ফায়ারপ্লেসের অগ্নিকুণ্ডটার দায়িত্ব নাও। কাঠ গুঁজে দিতে ভুলো না।"

উনি বেরিয়ে গেলেন। তারপর আমি বসে আছি তো আছি। আর ওঁর পাত্তা নেই। বাংলো গোরস্থানের মতো স্তব্ধ। একা বসে থাকতে গা ছমছম করছে। প্রায় দু'ঘন্টা পরে কর্নেল ফিরলেন। বললুম, "এত দেরি যে?"

কর্নেল বললেন, "রাতের কাজটুকুও সেরে এলুম। আশা করি, আমার সে অত্যদ্ভুত ক্যামেরার কথা তুমি ভোলোনি।"

হ্যাঁ, অত্যদ্ভুত ক্যামেরাই বটে। প্রতাপগড় জঙ্গলে ওটা পেতে রাখতে দেখেছিলুম সেবার। জন্তুদের জল খেতে যাওয়ার পথে গাছের ডালে বেঁধে রেখেছিলেন। একটা তার নিচে মাটিতে পোঁতা ছিল। ক্যামেরার লেন্সের সামনে দিয়ে পঞ্চাশ গজ অব্দি মাটিতে কেউ হেঁটে গেলেই অতিসূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক সিস্টেমে সেই স্পন্দন ধরা পড়বে এবং আপনাআপনি শাটারটা ক্লিক করবে। ফ্লাশ বাল্ব জ্বলবে এবং ছবি উঠে যাবে। কর্নেলের মতে, জন্তুদের স্বাভাবিক চেহারার ছবি এভাবেই তোলা সহজ।

বললুম,"কোথায় ক্যামেরা পেতে এলেন।"

চাপা হেসে কর্নেল বললেন, "ডঃ গিন্‌তির কুমড়োখেতে। কারণ, তখন ওখানে কয়েকটি অদ্ভুত পায়ের ছাপ দেখছিলুম। ওটা কী প্রাণী দেখা দরকার।"

বুড়োর বাতিকের কোনও তুলনা নেই। ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। এখন একমাত্র ভাবনা, সকাল হলেই আমাকে কেটে পড়তে হবে। লিটনগঞ্জ হেভিওয়াটার প্লান্টের রিপোর্ট কীভাবে লিখব, তাই ভাবতে থাকলুম। কর্নেলও অবশ্য আর মুখ খুললেন না। কেমন গম্ভীর হয়ে চুরুট টানতে থাকলেন।

খেয়েদেয়ে শুতে রাত প্রায় দশটা বেজে গেল। ক্লান্তির ফলে কখন ঘুমিয়ে গেছি! সেই ঘুম ভাঙল কর্নেলের ডাকে। দেখি, সকাল হয়ে গেছে। কর্নেল অভ্যাসমতো কখন এই প্রচণ্ড শীতের ভোরে বাইরে ঘুরে এসেছেন। গায়ে ওভারকোট, মাথায় হনুমান টুপি, হাতে ছড়ি। বললেন, "গুড মর্নিং! আশা করি সুনিদ্রা হয়েছে। এখন উঠে পড়ো এবং দ্রত চোখমুখ ধুয়ে এসো।"

বললুম, "দ্রুত কেন? কোথাও বেরুবেন বুঝি?"

"বেরুব। অবশ্য তাতে তোমার লাভই হবে। কথা দিচ্ছি।"

"লাভের দরকার নেই। আমি সোজা গিয়ে ট্রেন ধরব।" বলে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলুম।

কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এসে দেখি কর্নেল বিছানায় গুচ্ছের ফোটোর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন। আমাকে দেখে বললেন, "জয়ন্ত, আমার রাতের ফসল! দেখে যাও, তোমার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যাবে।"

একটা ফোটো তুলে নিয়ে সত্যি সত্যি চক্ষু চড়কগাছ আমার। এ কী দৃশ্য! কুমড়োখেতে একটা বিশাল কুমড়োর ওপর ঝুঁকে ডঃ গিন্‌তি কী যেন করছেন, এক হাতে ক্ষুদে টর্চ রয়েছে। বললুম, "কী ব্যাপার?"

কর্নেল হাসলেন। ডঃ গিন্‌তি নিশ্চয় রাতদুপুরে নিজের কুমড়ো নিজে চুরি করছেন না।"

"তাহলে কী করছেন? নিশ্চয় কোনও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-টরীক্ষা করছেন।

"ঠিক তাই। অসাধারণ ওঁর গবেষণা।" কর্নেল তারিফ করে বললেন। "খুব অধ্যবসায়ী লোক ও বলব, জয়ন্ত। যাগগে। সেই অদ্ভুত পায়ের ছাপের রহস্যই থেকে গেল। সম্ভবত জন্তুটা ওঁকে দেখে আর ওখানে পা বাড়ায়নি।"

চৌকিদার কফি দিয়ে গেল। কফি খাওয়ার পর কর্নেল ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। "জয়ন্ত, দেরি হয়ে যাচ্ছে।" বলে আমাকে আপত্তির সুযোগ না দিয়ে হাত ধরে টানতে-টানতে বেরুলেন। কুয়াশার ফাঁকে হাল্কা রোদ ফুটেছে। কিন্তু ঠাণ্ডার কথা না বলাই ভাল। বাংলো থেকে উতরাই রাস্তায় আমরা নেমে গেলুম কিছুদূর। তারপর সমতলে আরও কিছুটা এগিয়ে চমকে উঠলুম! গাছপালার আড়ালে

একটা জিপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। জিপে কারা বসে আছে। কর্নেল তাদের দিকে হাত ইশারা করে আমার হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে ঝোপে ঢুকলেন। তারপর ফিসফিস করে বললেন, "এবার হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে হবে জয়ন্ত। একটু কষ্ট করো।"

"কিন্তু ব্যাপারটা কী?"

"স্বচক্ষে দেখবে। চলো।

পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে, উপায় কী! ঝোপঝাড় পাথরের আড়ালে এগোচ্ছি। ঠাণ্ডায় হাত পা জমে যাচ্ছে। গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ শুনছি। কতক্ষণ পরে কর্নেল একটু উঁচু হয়ে চোখে বাইনোকুলার রেখে বললেন, "এসে গেছে! দেখবে নাকি জয়ন্ত? দেখই না।"

বাইনোকুলারে চোখ রাখতেই ডঃ গিন্‌তির খামারবাড়ির গেট নজরে পড়ল। একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। ট্রাকের গায়ে যা লেখা আছে, স্পষ্ট পড়তে পাচ্ছি। উম্মর সিং ক্যাটারিং কোম্পানি। ট্রাকে তরিতরকারি বোঝাই হচ্ছে। ডঃ গিন্‌তি এবং তাঁর লোকেরা তদারক করছেন। আমি মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারলুম না। এই স্বাভাবিক ব্যাপারে এত লুকোচুরি বা ওত পেতে বেড়ানোর কারণ কী?

হঠাৎ কর্নেল বলে উঠলেন, "চলে এসো জয়ন্ত। পাখি ফাঁদে পড়েছে।"

তারপর আমার প্রায় বাঘের লেজে-বাঁধা শেয়ালের অবস্থা হল। খামারবাড়ির গেটে পৌঁছে ফের চমকে উঠলুম। ট্রাক ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে বন্দুকধারী একদঙ্গল পুলিশ। ডঃ গিন্‌তি দু'হাত তুলে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকাচ্ছেন। কর্নেলকে দেখে কাঁদোকাঁদো গলায় বললেন, "দেখছেন, দেখছেন কর্নেল, কী জঘন্য অত্যাচার।"

কর্নেল গম্ভীর মুখে কোনও কথা না বলে ট্রাকের কাছে গেলেন এবং কাঠবেড়ালির মতো উঠে পড়লেন। তারপর হেঁট হয়ে একটা বিশাল কুমড়ো তুলে বললেন, "আসুন মিঃ শর্মা। খুব সাবধানে ধরবেন কিন্তু। এর মধ্যে সাংঘাতিক এক্সপ্লোসিভ আছে। বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।"

একজন পুলিস অফিসার হাত বাড়িয়ে কুমড়োটা নিলেন। সাবধানে ধরে রইলেন। কর্নেল নেমে এসে তাঁর হাত থেকে কুমড়োটা নিলেন। তারপর মাটিতে রেখে বোঁটার কাছে চাপ দিলেন। একটা লম্বা-চওড়া ফালি উঠে এল। উঁকি মেরে দেখি, ভেতরে একটা ধূসর রঙের মস্ত গোল জিনিস ভরা রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি খুলে গেল। থরথর করে কাঁপতে থাকলুম।

কর্নেল বললেন, "তাহলে বুঝতে পারছ জয়ন্ত, তোমার কাজের জন্যে কেমন একখানা স্টোরি পেয়ে গেলে। আশাকরি, এবার এও বুঝেছ যে, লিটনগঞ্জের হেভিওয়াটার প্ল্যান্টের দ্বিতীয় টাওয়ারকেও ধ্বংস করার ব্যবস্থা হচ্ছিল। ক্যান্টিনে এই বিশেষ চিহ্নিত কুমড়োটি যেত এবং সেখান থেকে পাচার হত টাওয়ারের মধ্যে। যাকগে, আমার কাজ শেষ। বাকি যা কিছু, মিঃ শর্মার হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। এসো জয়ন্ত। আমরা বাংলোয় ফিরি। তোমার ট্রেন সেই এগারোটায়। ততক্ষণ তুমি এই অকালকুষ্মাণ্ডের রহস্যময় কাহিনীর একটা খসড়া করে নিতে পারবে। তবে মনে রেখো, কুমড়োরহস্য আমি দৈবাৎ টের পেয়েছিলুম, প্রজাপতি ধরা জাল পাততে গিয়েই।"

আসতে আসতে শুনলুম, পেছনে ডঃ গিন্‌তি গর্জে বলছেন, "নেমক-হারাম! আমার পাজামা-পাঞ্জাবি-কম্বলটা পর্যন্ত এখনও ফেরত দিল না।"

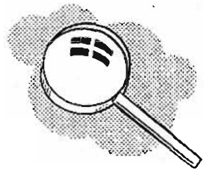

প্রতাপগড়ের মানুষখেকো

আগে জানলে এ বুড়োর পাল্লায় কিছুতেই পড়তুম না। ঢের ঢের বুড়ো মানুষ দেখেছি, গ্রীষ্মকালে তাঁরা নাতির হাত ধরে পার্কে গিয়ে বসে থাকেন এবং শীতের সময় ঘরের কোণে আলোয়ান মুড়ি দিয়ে কাগজ পড়েন। দু-চারজন বুড়োমানুষ অবশ্যি নেতা হয়ে দেশ শাসনও করেন। খবরের কাগজের খবর জোগাড় করতে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে চেনাজানাও হয়েছে অল্পস্বল্প। কিন্তু তাঁরা কেউ এঁর মতো পাহাড়-জঙ্গলে বুনো ঘোড়ার দাপটে ছোটাছুটি করে বেড়ান না—স্রেফ দু'খানা ঠ্যাঙের জোরেই। কিংবা প্রজাপতি বা পাখির পেছনে বাচ্চা ছেলের মতো হন্যে হয়ে ঘোরেন না তাঁরা!

এ-বুড়োর কাণ্ডকারখানাই অদ্ভুত। নইলে এই জানুয়ারির হাড়কাঁপানো শীতে কেউ প্রতাপগড়ের জঙ্গলে ক্যামেরা নিয়ে রাতবিরেতে টো-টো করে ঘুরবে কোন সাহসে? বিশেষ করে যে জঙ্গলে সম্প্রতি একটা মানুষখেকো বাঘের দৌরাত্ম্য চলছে।

জঙ্গলে রাতবিরেতে ক্যামেরার কথা শুনে কেউ যদি ভাবে নিশ্চয় ফ্লাশ বাল্বের সাহায্যে জন্তুজানোয়ারের ছবি তোলা হচ্ছে—তাহলে সে মস্ত ভুল করবে। ক্যামেরাটাও বিষম বিদঘুটে। ভুতুড়ে বলতেও আমার আপত্তি নেই। কারণ, ওতে ফ্লাশ বাল্বের দরকার হয় না। অথচ অন্ধকারে লেন্সের সামনে কমপক্ষে বিশ-পঁচিশ মিটার দূরত্বে ১৮০ ডিগ্রির মধ্যে যা কিছু থাকে সবেরই ছবি উঠে যায়। শাটার টেপার জন্যে কারও বসে থাকার দরকার নেই। ওটার ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা এত সূক্ষ্ম আর স্পর্শকাতর যে, শুধু দরকার লেন্সের সামনে ওই দূরত্বের মধ্যে মাটিতে একটুখানি কাঁপন। কোনও জন্তু মাটিতে হাঁটলেই কিছু-না-কিছু কাঁপন জাগে। সেই যথেষ্ট শাটার ক্লিক করবে।

প্রতাপগড় জঙ্গলের বাংলোয় রাত দশটায় উনি যখন ফিরে এলেন ক্যামেরার ফাঁদ পেতে, আমি তখন ফায়ারপ্লেসের সামনে ইজিচেয়ারে বসে কড়া কফি খাচ্ছি আর পরদিন সকালে কেটেপড়ার মতলব ভাঁজছি। কী শীত, কী শীত! বিহারের শীতের নামডাক আছে জানতুম। কিন্তু প্রতাপগড় এলাকা যে উত্তর-মেরুরই ছোট ভাই, সেটা জানতে বাকি ছিল।

"হ্যালো ডার্লিং!" যথারীতি সম্ভাষণ করে উনি টুপি ও ওভারকোট খুললেন এবং আমার পাশে বসে মৃদু হেসে বললেন, "জয়ন্ত কি আমার ওপর রাগ করেছ?"

আমার কাঁধে একটা হাত রেখে অন্য হাতে কফির মগ ধরে উনি হঠাৎ চাপা স্বরে বললেন "ডার্লিং! আশা করছি, কাল সকালের মধ্যে তোমার চোখ ছানাবড়া হয়ে ওঠার মতো এক অত্যদ্ভুত ছবি তোমায় দেখাতে পারব। অতএব ধৈর্যসহকারে অন্তত আর একটা দিন অপেক্ষা করো। এবং জয়ন্ত এমনও হতে পারে, তুমি এবার প্রতাপগড় থেকে তোমার দৈনিক সত্যসেবকের জন্য একটি রোমাঞ্চকর সংবাদও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে।"

ওঁর লোভ-দেখানো কথায় একটুও না গলে বললুম, "কিসের ছবি দেখাবেন আর? গত রাতে তো ঝরনার জল খেতে আসা এক পাল হরিণের ছবি উঠেছিল আপনার ক্যামেরায়। কাল বড় জোর দেখব হয়তো একটা রোগা বাঘ!"

"ঠিক বলেছ ডার্লিং!" বুড়ো সাদা দাড়ি খামচে ধরে—হাসলেন। তারপর অভ্যাসমতো টাকে সেই হাতটা বুলিয়ে কী একটা ফেলে দিলেন। দেখলুম লাল রঙের একটা পোকা, অনেক সময় টাকে মাকড়সার জাল বা পাখির বিষ্ঠাও দেখেছি। বুড়ো পোকাটার গতিবিধিতে নজর রেখে বললেন, "বাঘের ছবিই দেখাব। তবে এটা যে সে বাঘ নয়, সেই কুখ্যাত মানুষখেকো বাঘ! সরকার যাকে মারার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছে।"

বিরক্ত হয়ে বললুম, "ধরুন তাই না হয় হল। মানুষখেকো বাঘটার ছবি আপনার ক্যামেরার সামনে এসে হাজির হবে, তাহলে ওই শিকারি ভদ্রলোকদের বললেন না কেন? ওঁরা তো বাঘটাকে মারার জন্য হন্যে হচ্ছেন। আজ বিকেলে আপনার সামনেই ওঁরা দু'জনে বেরিয়ে গেলেন। কোথায় মোষের বাচ্চা বেঁধে রেখে গাছের ওপর মাচান করে বসে থাকবেন সারা রাত। খামোকা ওঁরা কষ্ট পাবেন ঠাণ্ডায়!"

আমার কথার জবাব দেবার জন্যে ঠোঁট ফাঁক করেছেন, এমন সময় চৌকিদার দরজায় উঁকি মেরে একটু কেশে বলল, "হুজুর কর্নেলসাব! খানা তৈয়ার হ্যায়। হুকুম হোগা তো আভি লাবে গা।"

"জরুর।" বলে হুজুর কর্নেলসাব অর্থাৎ আমার বৃদ্ধ বন্ধু কর্নেল নীলাদ্রি সরকার ওরফে 'বুড়ো ঘুঘু' অভ্যাসমতো বুকে ক্রস এঁকে যথার্থ ধার্মিকের মতো খাদ্য গ্রহণে প্রস্তুত হলেন।

বাংলোটা একেবারে জঙ্গলের মধ্যে। তাই সতর্কতার জন্য বারান্দা জুড়ে গ্রিল এবং এই শীতে গোটাটা রেলে ঢাকা রয়েছে। বারান্দার একদিকে কিচেন। চৌকিদার কিচেনের সামনে খাটিয়া পেতে ঘুমোয়। সম্প্রতি মানুষখেকো বাঘের উপদ্রব হওয়াতে সে আরও সতর্কতার জন্য পাশে একটা টর্চ আর বল্লমও রাখে। কর্নেলবুড়ো মানুষখেকোর ভয় তুচ্ছ করে এত রাত অব্দি জঙ্গলে ঘোরেন এবং নিরাপদে ফিরে আসেন। বারান্দায় গ্রিলের একটা অংশ খুলে সে হুজুর কর্নেলসাবকে ভেতরে আসতে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ফের সেই ফাঁকটা অর্থাৎ দরজা বন্ধ করে তালা এঁটে সন্দিগ্ধদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। আমার ধারণা, সে ভূত দেখছে, না মানুষ, তার দৃষ্টিতে এরকম একটা চাঞ্চল্য থাকে। কর্নেলের ওপর তার ভক্তি ক্রমশ বেড়ে গেছে।

জেলিমাখানো মোটা মোটা চাপাটির সঙ্গে বুনো মুরগির মাংস বেশ জমিয়ে খাওয়া গেল। খেতে খেতে কর্নেল আমার সেই কথাটার জবাব দিলেন। "ঠিকই জয়ন্ত! মিঃ সেন এবং মিঃ দত্তকে আমার বলা উচিত ছিল, আপনারা ঝরনার ভাটিতে টোপ না বেঁধে আরও একটু উজানে এসে বাঁধুন। কারণ আমার ধারণা, বাঘটা ওখানেই টিলার ওপর একটা গুহায় থাকে। তার পায়ের দাগও খুঁটিয়ে দেখেছি। জঙ্গলবিদ্যায় আমারও কিঞ্চিৎ জ্ঞানগম্যি আছে।"

"তাহলে বললেন না কেন?"

কর্নেল হাসলেন। "যেচে পড়ে বলাটা সঙ্গত মনে করিনি। তাছাড়া লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়, বিশেষ করে মিঃ দত্ত কেমন যেন অভদ্র প্রকৃতির লোক। এসেই আমাদের এখানে দেখে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছিলেন না? মিঃ সেনও কেমন আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, দু-দুটো মানুষ-টোপ থাকতে আর মোষের বাচ্চা কিনতে খামোকা পয়সা খরচ কেন? ব্যাপারটা আমার গায়ে লেগেছে জয়ন্ত!"

ওঁর দুঃখ দেখে ঠাট্টা করে বললুম, "আহা! ওঁরা তো কর্নেল নীলাদ্রি সরকার নামক প্রখ্যাত 'বুড়ো ঘুঘুকে' চেনেন না! চিনলে নিশ্চয় সমীহ করে কথা বলতেন। তাছাড়া যে জঙ্গলে মানুষখেকো বাঘ রয়েছে, সেখানে যারা বেড়াতে এসেছে শখের বশে, তারা নিছক টোপ হতেই এসেছে বৈ-কি!"

কর্নেল কিন্তু হাসলেন না। গোমড়ামুখে গ্লাসের কনকনে ঠাণ্ডা জলটা পুরো গিলে ফেললেন।

শেষ রাতে কী একটা গণ্ডগোলের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। জেগে কয়েক সেকেন্ড ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। লণ্ঠনের দম বাড়িয়ে কর্নেল ব্যস্তভাবে ডাকছেন, "জয়ন্ত! জয়ন্ত!" বাইরে চৌকিদার দুর্বোধ্য ভাষায় চেঁচামেচি করছে। আর কেউ হাউমাউ করে কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে।

কম্বল ছেড়ে বেরুনো সহজ কথা নয়। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে সহজাত বোধ কাজ করে। হুড়মুড় করে উঠে পড়লুম। তারপর দেখি, কর্নেল লণ্ঠন হাতে এগিয়ে দরজা খুললেন। তাঁর পিছন-পিছন দৌড়ে গেলুম। বারান্দায় বেরিয়ে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য চোখে পড়ল। মেঝেয় পা ছড়িয়ে বসে আছেন সেই শিকারি মিঃ দত্ত এবং দু-হাতে মুখ ঢেকে ছেলেমানুষের মতো কাঁদছেন। তাঁর পোশাকে

চাপ-চাপ টাটকা রক্ত লেগে রয়েছে। পাশে দুটো রাইফেল পড়ে রয়েছে। আর তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে চৌকিদার বেচারা জড়ানো গলায় ক্রমাগত কী বলছে, বোঝা যাচ্ছে না।

কর্নেল মিঃ দত্তের কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "মিঃ দত্ত শান্ত হোন, বলুন কী হয়েছে।" কর্নেলের কথা শুনে মিঃ দত্ত একটু শান্ত হলেন। তারপর ফ্যাচ করে নাক ঝেড়ে বললেন, "ও হো হো হো! আমি কী করব? কী করব আমি? আমার সারাজীবনের সঙ্গী আমার প্রাণের বন্ধু অমল......ও।"

কর্নেল বললেন, "প্লিজ মিঃ দত্ত! শান্ত হোন, শান্ত হোন। কী হয়েছে বলুন তো?"

মেজাজি মিঃ দত্ত বিকৃত মুখে বললেন, "বুঝতে পারছেন না মশাই কী হয়েছে? অমলকে বাঘে মেরে ফেলেছে। ও হো হো! কেমন করে ওর স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের সামনে এ-মুখ দেখাব?"

এটাই অনুমান করেছি ততক্ষণে। কর্নেল ওঁর কাঁধ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, "সর্বনাশ! মিঃ সেনকে মানুষখেকো বাঘটা মেরে ফেলেছে! কিন্তু কীভাবে ব্যাপারটা ঘটল বলুন তো মিঃ দত্ত? আপনারা কি একই মাচানে ছিলেন?"

দত্ত সাহেব রুমালে চোখ নাক মুছে বললেন, "একই মাচানে তো ছিলুম। কখন বাঘটা চুপিচুপি গাছে উঠেছিল টের পাইনি। আমার একটু তন্দ্রামতো এসেছিল। হঠাৎ অমলের আর্তনাদে জেগে গেলুম। টর্চ জ্বালতেই দেখি, ওঃ! সে এক বীভৎস দৃশ্য। বাঘটা অমলের গলা কামড়ে ধরে ঝাঁপ দিল।"

কর্নেল বললেন, "আপনি নিশ্চয় গুলি করেননি? ওঁর রাইফেলটাও তো নিয়ে এসেছেন দেখছি।"

দত্তসায়েব শ্বাস টেনে বললেন, "আমার গায়ে ধাক্কা লেগেছিল। টর্চ আর রাইফেল নিচে পড়ে গিয়েছিল তক্ষুনি। ওঃ। ও হো হো হো। অমল!"

"তারপর? তারপর?" আমি দম-আটকানো গলায় প্রশ্ন করলুম।

মিঃ দত্ত বললেন, "তারপর কীভাবে যে পালিয়ে এসেছি আমিই জানি। এই দেখুন, কত জায়গায় ছড়ে গেছে! আর এই দেখুন, কত রক্ত। অমলের রক্ত! ও হো হো হো!"

কর্নেল একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "বড্ড দেরি হয়ে গেছে। এতক্ষণে নিশ্চয় বাঘটা শিকার নিয়ে সরে পড়েছে। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া কোনও উপায় নেই... "

বাকি রাত আর ঘুমোনো গেল না। পাশের ঘরে দত্তসায়েব সমানে বিড়বিড় করে শোকপ্রকাশ করছেন শোনা যাচ্ছিল। কর্নেল ও আমি ফায়ারপ্লেসের কাছে বসে রইলুম। কর্নেলবুড়ো একেবারে চুপচাপ। কোনও প্রশ্ন করেও জবাব পেলুম না। অভ্যাসমতো দাড়ি বা টাকে হাত বুলোচ্ছেন, কখনও চোখ বুজে বুকে ক্রস আঁকছেন।

জঙ্গল ও পাহাড় জুড়ে ঘন কুয়াশা। রোদ বাড়লে সেটা কাটল। তখন কর্নেল আমাকে নিয়ে বেরুলেন। দত্তসায়েবকে দেখলুম লনে রোদে বসে আছেন। হাতে রাইফেল। হিংস্র চেহারা। লাল চোখ। কর্নেল ডাকলেন, "আসুন মিঃ দত্ত। দেখি, আপনার বন্ধুর ডেডবডি খুঁজে পাই নাকি।"

দত্তসায়েব উঠলেন। "ওই শয়তানটাকে খতম না করে আর আমি কলকাতা ফিরছি না। এই আমার প্রতিজ্ঞা।"

যেতে যেতে কর্নেল বললেন, "প্রথমে আমাদের মাচানের ওখানে যাওয়াই উচিত।"

মিঃ দত্ত শুধু বললেন, "হুঁ!"

বাংলো থেকে ঝোপজঙ্গলে ভরা ঢাল বেয়ে নেমে আমরা ছোট্ট একটা সোঁতার ধারে পৌঁছলুম, যেটা একটু দূরে ঝরনা থেকে বয়ে এসেছে। পাথরের ওপর দিয়ে ঝিরঝিরে স্বচ্ছ জল বইছে। ধারে ধারে কিছুটা যাওয়ার পর মিঃ দত্ত বললেন, "ওই যে ওখানে।"

চারপাশে ঘন গাছপালা, মধ্যিখানে এক টুকরো ফাঁকা ঘাসজমি। একটা বাচ্চা মোষ মনের সুখে

এখন ঘাস খাচ্ছে। বুঝলুম, ওটাই টোপ। জমিটায় পৌঁছেই আমরা থমকে দাঁড়ালুম। মাচানের ঠিক নিচেই একটা ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। তারপর বিকট চিৎকার করে মিঃ দত্ত ছুটে গিয়ে মৃতদেহটার কাছে হাঁটু মুড়ে বসলেন এবং রাতের মতোই বুকফাটা কান্না জুড়ে দিলেন।

কর্নেল ও আমি এগিয়ে গেলুম। শিকারি মিঃ সেনের গলায় গভীর ক্ষতচিহ্ন এবং বুকে ওপরটা তীক্ষ্ণ নখের আঘাতে ফালাফালা। পুরু পুলওভার ফেঁড়েফুঁড়ে গেছে। জমাট কালচে রক্তের ছোপ সবখানে। কর্নেল মুখ তুলে মাচানের দিকে তাকালেন। তারপর বেমক্কা গাছে চড়তে শুরু করলেন। গাছটার গুঁড়ি ও ডালে রক্তের ছোপ দেখতে পাচ্ছিলুম।

একটু পরে কর্নেল মাচান থেকে নেমে এসে বললেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন মিঃ দত্ত। বাঘটা ওঁকে আচমকা মাচানের ওপরেই আক্রমণ করেছিল। উনি আত্মরক্ষার ফুরসত পাননি। তো ইয়ে ডেডবডিটা......"

দত্তসায়েব শান্তভাবে বললেন, "চৌকিদারকে বলেছি কজন লোক ডেকে আনতে। জিপে করে কলকাতা নিয়ে যাব। কিন্তু জানি না, অমলের স্ত্রীর সামনে দাঁড়াব কোন মুখে। ওঃ!"

কর্নেল অন্যমনস্কভাবে মাচানের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ ঘুরে বললেন, "দেখুন মিঃ দত্ত, আমার মনে হচ্ছে, আপনার বন্ধু মিঃ সেনকে যে বাঘটা মেরে ফেলেছে, সেটা মানুষখেকোটা নয়।"

মিঃ দত্ত ভুরু কুঁচকে বললেন, "আপনি কি শিকারি? কীভাবে বুঝলেন যে মানুষখেকোটা নয়? মানুষখেকো না হলে ওভাবে কোনও বাঘ চুপিচুপি গাছে উঠে শিকারির ওপর হামলা করে না।"

কর্নেল বললেন, "তা ঠিক। তবে এ-জঙ্গলে আরও বাঘ থাকাও তো সম্ভব।"

ধমকের সুরে দত্তসায়েব বললেন, "যা জানেন না, তা নিয়ে বাজে বকবেন না।"

কর্নেল ধমক খেয়ে কাঁচুমাচু মুখে সরে এলেন। "চলো জয়ন্ত, ডেডবডি তো পাওয়া গেছে। আমরা নিজের কাজে যাই।"

ঝরনার ধারে এসে বললুম, "লোকটা অভদ্র। গোঁয়ার। একটা হামবাগ!"

কর্নেল হেসে বললেন, "শিকারিদের একটু রাগ হওয়া স্বাভাবিক। যাক গে, জয়ন্ত! তুমি বাংলোয় গিয়ে বিশ্রাম করো গে! এ-বুড়োর পিছনে ছোটাছুটি করা তোমার পোষায় না জানি।"

"সে আর বলতে ? কিন্তু আপনি যাবেনটা কোথায়?"

"আপাতত ক্যামেরাটা নিয়ে আসি।" বলে কর্নেল হনহন করে এগিয়ে গেলেন। আমি বাংলোয় ফিরলুম।....

কর্নেল ফিরলেন একেবারে দুপুর গড়িয়ে। তারপর খেয়েদেয়ে ফিল্ম ডেভলপ করতে বাথরুমে ঢুকলেন। ওটাই ওঁর ডার্করুম। রাতে ঘুম হয়নি। তাই আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লুম। সেই ঘুম ভাঙল কর্নেলের ডাকাডাকিতে। "জয়ন্ত জয়ন্ত! শিগগির সব গুছিয়ে নাও। আমরা এক্ষুনি রওনা দেব। জিপ এসে গেছে।"

বললুম, সে কী! অরণ্যপিপাসা এরই মধ্যে মিটে গেল? না কি মানুষখেকো বাঘের আতঙ্কে? আর জিপ কোথায় পেলেন? আমরা এই অবেলায় যাবই বা কোন চুলোয়?"

বুড়ো ঘুঘু রহস্যময় হেসে বললেন, "ওয়েট, ওয়েট ডার্লিং। সব প্রশ্নের জবাবে আপাতত আমার রাতের ফসল তোমাকে উপহার দিতে চাই। নাও।"

হাত বাড়িয়ে যা পেলুম, তা একটা ছোট্ট ফটোগ্রাফ। কিন্তু দেখামাত্র চমকে উঠলুম। এ! কী এ যে দেখছি মিঃ দত্ত হাঁটু দুমড়ে পাথরের খাঁজে হাত পুরে কী একটা করছেন! অবাক হয়ে বললুম, "এর মানে? কাল রাতে তো ওঁরা দু'জনে মাচানে ছিলেন?—মানে মিঃ দত্ত এবং মিঃ সেন! অথচ মিঃ দত্ত দেখছি একা এখানে কী যেন করছেন।"

কর্নেল বিদঘুটে ভঙ্গিতে ফের হাসলেন। "রেডি হয়ে নাও ঝটপট। তোমায় যা দেখাব বলেছিলুম, তা দেখালুম। বাকিটা প্রতাপগড় টাউনশিপে গিয়ে দেখাব।"

"কিন্তু আপনি মানুষখেকো বাঘটা দেখাবেন বলেছিলেন!"

"তাই তো দেখালুম।" বলে বৃদ্ধ গোয়েন্দাপ্রবর নিজেই আমার কম্বল বেডিং পত্তর গোছাতে শুরু করলেন। আমি তো হতভম্ব হয়ে গেছি। কিছুক্ষণ পরে জিপে ওঠার সময় কর্নেল বললেন, "আসলে যে বুড়ো এবং রোগা বাঘটা তল্লাটে পাঁচটা মানুষ মেরে খেয়েছে, সে তার পাহাড়ি গুহায় স্বাভাবিকভাবে মরে পড়ে আছে। তাকে গতকাল আবিষ্কার করে এসেছিলুম। কবে কোন শিকারির গুলি খেয়ে বাঘটার অবস্থা এমনিতে শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। যাক গে, উঠে পড়ো বৎস, যথাস্থানে পৌঁছে সব টের পাবে। "

প্রতাপগড় টাউনশিপে পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যা হল। অবাক হয়ে দেখি, জিপ থানায় ঢুকছে। বুক কাঁপল। তাহলে কি মিঃ সেন বাঘের হাতে মারা পড়েননি? নিছক খুনখারাপির ঘটনা?

হুঁ, ঠিক তাই। লাল চোখে হিংস্র মুখভঙ্গিতে বসে আছেন মিঃ দত্ত। তাঁর হাতে হাতকড়া। টেবিলের চারপাশ ঘিরে কয়েকজন পুলিশ অফিসার রয়েছেন। আমাদের দেখে একজন পুলিশ অফিসার চেঁচিয়ে উঠলেন, "হ্যাল্লো কর্নেল!"

কর্নেল কোটের পকেট থেকে একগাদা ছবি এগিয়ে দিয়ে বললেন, "আমার অত্যদ্ভুত ক্যামেরার রাতের ফসল মিঃ শর্মা। একটা ছবিতে দেখবেন দত্তসায়েব দুটো বাঘনখ লুকিয়ে রাখছেন। সময়ও ফিল্মে সাঙ্কেতিকভাবে লেখা হয়ে যায়। রাত দু'টো তেত্রিশ মিনিট। এই দেখুন!"

মিঃ শর্মা একগাল হেসে বলনে, "আপনার নির্দেশমতো জায়গায় মার্ডার উইপন দুটো উদ্ধার করা হয়েছে। ডেডবডি মর্গে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট আসতে দেরি নেই।" বলে উনি ড্রয়ার থেকে কাগজে মোড়া দুটো বাঘের থাবার মতো নখওলা সাংঘাতিক অস্ত্র বের করলেন। রক্তের ছোপ কালো হয়ে আছে।

মিঃ দত্ত মুখ নিচু করে বসে আছেন পাথরের মতো।

অনেক রাতে সার্কিট হাউসের একটা ঘরে কর্নেলের মুখোমুখি হলুম। বললুম, দত্তসায়েব বন্ধুকে খুন করলেন কেন?

কর্নেল জবাব দিলেন, "কলকাতার প্রখ্যাত হোসিয়ারি দত্ত অ্যান্ড সেনের নাম শোননি জয়ন্ত? সেই যে বাঘমার্কা গেঞ্জি ইত্যাদি যাদের। যেটুকু অনুমান করছি, তাতে মনে হয় দত্তসায়েব ভেতর ভেতর পার্টনার বন্ধু সেনাসায়েবকে ঠকিয়ে একা মালিক হওয়ার চক্রান্ত করছিলেন। কারণ ওঁদের চাপা গলায় আগের রাতে কী সব তর্ক করতে শুনেছিলুম। যাইহোক, সেই চক্রান্তের চরম অবস্থা এই হত্যাকাণ্ড। বুঝে দ্যাখো জয়ন্ত, কী চমৎকার ফন্দি এঁটেছিলেন মিঃ দত্ত! মানুষখেকো বাঘ শিকার করতে এসে তার পাল্লায় একজনের মারা পড়াটা কত স্বাভাবিক দেখাত। শুধু বাদ সাধল এই বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ এবং তার অত্যদ্ভুত ক্যামেরা। তবে ডার্লিং জয়ন্ত, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—যদি তুমি এই বৃদ্ধকে নির্দয়ভাবে পরিত্যাগ না করে যাও, তাহলে কয়েকদিনের মধ্যে তোমায় সত্যিকার বাঘ দেখাবই দেখাব।"

দাড়ি ও টাকওয়ালা 'বুড়ো ঘুঘু' কর্নেল নীলাদ্রি সরকার নিজের বিশাল বুকে খাঁটি পাদ্রির মতো একবার ক্রস আঁকলেন। তারপর অস্ফুট স্বরে আওড়ালেন, "আমেন! আমেন!"

গুর্গিন খাঁর দেয়াল

জিপ থেকে নেমেই আমরা মাঠের দিকে তাকালুম। চোখে পড়ল সেই বিখ্যাত ঐতিহাসিক দেয়াল—যেটা দেখতেই চলে এসেছি এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায়। অজানা ভয়ে বুক কেঁপে উঠল। ওই সেই রহস্যময় দেয়াল—যেখানে অদ্ভুত সব আলো আর ছায়ামূর্তি দেখা যায় নিশুতি রাতে। কারা চেরা গলায় বিকট চেঁচিয়ে ওঠে। শুনলে মহাদুঃসাহসীরও বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়।

আমার একা আসার ক্ষমতা ছিল না। প্রাণ গেলেও আসতুম না। অথচ চাকরি করি খবরের কাগজে। রিপোর্টার আমি। তাই আর সব কাগজে যখন খবরটা বেরিয়ে গিয়েছিল, আমাদের দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক তেড়েমেড়ে আমাকেই বললেন—জয়ন্ত কি বেঁচে আছ, না তুমিও ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ? সবাই এমন একটা সাংঘাতিক খবর ছাপিয়ে তাক লাগিয়ে দিল, আর আমরা বসে গাল চুলকোতে থাকলুম? আজই বেরিয়ে পড়ো। সবাই শুধু খবরটাই ছেপেছে, আমরা ছাপব এর পেছনের রহস্যটা আসলে কী। বুঝেছ তো?

প্রথমে যা খবর বেরিয়েছিল, তা অনেকেই গাঁজাখুরি বলে মেনেছিলেন। কিন্তু পরে যখন আজমগড়ের পুলিশ সুপার স্বচক্ষে দেখে এসে সাংবাদিকদের কাছে বর্ণনা দিলেন, তখন আর উড়িয়ে দেওয়া গেল না। পুলিশকে ভূতপ্রেতও ভয় পায়। সেই পুলিশের লোক যখন বলছে, তখন ঘটনা নিখাদ সত্যি।

পুলিশ সুপার মিঃ দীক্ষিত স্থানীয় লোকের কাছে যা শুনেছিলেন, তা গুজব ভেবেছিলেন। তবু একটা তদন্ত করা তো দরকার। তিনি সেই জনমানুষহীন মাঠে তাঁবু ফেলে পরপর তিনটে রাত জেগে কাটান। তারপরেই রাতে সেই ভূতুড়ে কাণ্ড দেখতে পান। দেয়ালের ওপর দুটো জ্বলজ্বলে লাল চোখের মতো আলো দেখা যায়। টর্চ জ্বেলে তিনি চমকে ওঠেন। একটা কঙ্কাল নাকি নাচছে। তারপর বিকট আর্তনাদ শোনেন। অসংখ্য ছায়ামূর্তি ছুটোছুটি করতে থাকে পাঁচিলের কাছে। বন্দুক ছুড়তেই অবশ্য সব থেমে যায়। আলো নিভে যায়। ভৌতিক কাণ্ডটা আর ঘটে না। খুঁটিয়ে দিনের আলোয় সব দেখেছেন মিঃ দীক্ষিত। কিন্তু কোনও হদিশ পাননি। উঁচু পাঁচিলে অবশ্য ওঠেননি—ওঠা সম্ভব ছিল না।

তারপর যথারীতি সরকার একদল বিজ্ঞানী পাঠিয়েছিলেন সেখানে। তাঁদের বরাত—পরপর সাত রাত জেগেও কিছু দেখতে পাননি। তখন তাঁরা পুলিশ সুপারকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে রিপোর্ট পাঠান মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। মিঃ দীক্ষিতের অবস্থা তখন শোচনীয়। চাকরি যায়-যায় আর কী!

সত্যসেবক পত্রিকার বার্তা-সম্পাদকের তাড়া খেয়ে আমি যখন আজমগড় যাওয়া ঠিক করে ফেলেছি, তখন হঠাৎ ইলিয়ট রোড থেকে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের ফোন পেলুম।—হ্যাল্লো জয়ন্ত! জরুরি দরকার। এক্ষুনি চলে এস।

অমনি আমার মাথা খুলে গেল। আরে তাই তো! কর্নেলের কথা তো ভুলেই গিয়েছিলুম! এসব ব্যাপারে এই ধূর্ত বুড়ো ঘুঘুর সাহায্য নেওয়া যায়। উনি সামরিক বিভাগে একসময় চাকরি করতেন। যুদ্ধে গেছেন। কত সব রোমাঞ্চকর কীর্তি করেছেন। এখন অবসর জীবনে নানান হবি নিয়ে থাকেন। যেমন—দুর্লভ জাতের পাখি প্রজাপতি পোকামাকড় খুঁজে বেড়ানো, পাহাড়ে-

জঙ্গলে সমুদ্রে ঘোরাঘুরি। তবে এখন ওঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় উনি প্রাইভেট গোয়েন্দা। নিতান্ত শৌখিন গোয়েন্দা আর কী! ধুরন্ধর কর্নেল এ অব্দি যে কত খুনি আর চোরডাকাত ধরতে সরকারকে সাহায্য করেছেন, তার সংখ্যা নেই। যেখানে রহস্যের গন্ধ, সেখানেই ষাট-বাষট্টি বছরের বুড়ো যেচে পড়ে নাক গলাবেন—এই ওঁর অভ্যাস। এই দাড়ি ও টাকওয়ালা বুড়োর খ্যাতি পুলিশমহলে অসাধারণ।

এমন মানুষ থাকতে আমি ভেবে মরছিলুম! তক্ষুনি ওর বাসায় চলে গেলুম। গিয়ে দেখি, এক অবাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে উনি কথা বলছেন। ভদ্রলোকটির বয়স চল্লিশ-বেয়াল্লিশ হবে। খুব স্বাস্থ্যবান বলিষ্ঠ চেহারা। সিভিল পোশাকে ছিলেন বলে জানতেও পারিনি যে, উনিই আজমগড়ের সেই পুলিশ সুপার মিঃ রামধন দীক্ষিত!

ব্যস। তারপর আর কী! আকস্মিক যোগাযোগ এমনটি আর দেখা যায় না। আমরা পরদিন সকালেই বেরিয়ে পড়েছিলুম। ছোটনাগপুর অঞ্চলের আজমগড়ে পৌঁছতে আমাদের দুপুর লেগেছে। সেখানে মিঃ দীক্ষিতে কুঠিতে বিশ্রাম ও খাওয়া-দাওয়া সেরে অকুস্থলে পৌঁছেছি, তখন বিকেল চারটে।

সময়টা শীতের। বাপ্‌স্। কী শীত কী শীত! বিহারের মাঠে দিনে হাঁড়কাপানো এমন শীত যখন, তখন রাতে কী অবস্থা হবে ভেবে ঘাবড়ে গেলুম। জিপে তাঁবু ও রান্নার সরঞ্জাম আনা হয়েছে। একজন রান্নার লোক রয়েছে—তার নাম মাধোরাম। আর আছে জনা চার সশস্ত্র সেপাই।

ওভারকোটটা কেন আনিনি তাই ভাবছি, দেখি কর্নেলবুড়ো দিব্যি বাদামি রঙের বুশ শার্ট প্যান্ট পরে ঘুরছেন। মাথায় শুধু লাল রঙের টুপি। শীতের বাতাস বইছে প্রচণ্ড। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে উনি চোখে বাইলোকুলার রেখে দেয়ালটা দেখছেন। আশ্চর্য বুড়ো!

একটা শুকনো নদীর তলায় আমাদের তাঁবু খাটানো হচ্ছে। জিপটা ঢালু পাড় গড়িয়ে নামাতে অসুবিধা হয়নি। ওপারে উঠে উঁচু জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি। দেয়ালটা দেখছি। আন্দাজ ছ'সাতশো মিটার দূরে একটা বিশাল স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আছে দেয়ালটা। গুর্গিন খাঁর দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। কে এই গুর্গিন খাঁ? কর্নেল তাও জানেন। মোঘল আমলের এক দুর্ধর্ষ শাসনকর্তা। তাঁর ছেলের নাম ছিল আজম খাঁ। যার নামে ছ'মাইল দূরের ওই শহর আজমগড়। দুর্গের সব ভেঙেচুরে গেছে। শুধু এই ষাট ফুট লম্বা বিশ ফুট উঁচু একটামাত্র পাথুরে দেয়াল খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে অবাক লাগে।

আশেপাশে অনেক ঢিবি আছে। ধ্বংসাবশেষ আছে। ঝোপঝাড়ও প্রচুর। কিছু ক্ষয়াখর্বুটে গাছও চোখে পড়ল। তার ওধারে ধু ধু মাঠ। দূরে কিছু পাহাড়। কাছাকাছি কোনও বসতি দেখতে পেলুম না শুনলুম একদল রাখাল গোরু-মোষ চরাতে একটা বাথান করেছিল ওখানে। তারাই প্রথমে ভূতুড়ে কাণ্ডটা দেখে এবং পালিয়ে যায়। তারপর থেকে দিনদুপুরেও কেউ এদিকে পা বাড়ায় না। কোন্ কোম্পানি সীসের খনির খোঁজে এসেছিল। রাতারাতি তাঁবু গুটিয়ে পালিয়ে বাঁচে।

কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রেখে দেয়ালটাই হয়তো দেখছিলেন। মিঃ দীক্ষিত ও আমি কথা বলছিলুম! শীতের বেলা হু-হু করে পড়ে যাচ্ছে। শীগ্‌গির অন্ধকার এসে যাবে। আজ বরং অপেক্ষা করা যাক। কাল সকালে ওখানে গিয়ে সবকিছু খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা যাবে। আমরা দু'জনে এসব কথাই আলোচনা করছিলুম। হঠাৎ দেখি কর্নেল এগোচ্ছেন। মিঃ দীক্ষিত বললেন—এখনই—যাচ্ছেন নাকি? উনি কোনও জবাব দিলেন না। যেন সম্মোহিতের মতো চোখে দূরবীনটা রেখে হেঁটে যাচ্ছেন। আমি একটু হেসে চাপা গলায় বললুম—যাক না বুড়ো। ভূতে ঘাড় মটকে

দেবে। মিঃ দীক্ষিত হাসলেন। কিন্তু মুখটা কেমন করুণ দেখাল। বললেন—আসুন জয়ন্তবাবু। আমরাও যাই!

অগত্যা আমরা দু'জনেও পা বাড়ালুম। তারপর অবাক হয়ে দেখি, বুড়ো দৌড়তে শুরু করেছেন। আমরা পরস্পর তাকাতাকি করলুম। আমরাও দৌড়ব নাকি? কিন্তু দেখতে দেখতে ততক্ষণে কর্নেল ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য। তখন আমরা হন্তদন্ত ছুটলুম।

ঝোপঝাড় পেরিয়ে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। বড় বড় পাথর পড়ে আছে। কিন্তু কর্নেলের পাত্তা নেই। বেমালুম উবে গেলেন যে! মিঃ দীক্ষিত ডাকলেন—কর্নেল! কর্নেল সাহেব! কোনও সাড়া এল না। বললুম—ছেড়ে দিন। বুড়োর স্বভাবই এরকম। ঠিক এসে পড়বেন'খন।

তখন সূর্য ডুবেছে। শীতও ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। হাঁটতে-হাঁটতে আমরা গেলুম সেই দেয়ালটার কাছে। উঁচু ঢিবির কাছে রয়েছে। তাকাতেই আমার গা শিউরে উঠল। মনে হল দেয়ালটা যেন হিংস্র চোখে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। চোখের ভুল ছাড়া কিছু নয়। ঢিবির ওপর ওঠা শুরু করলুম। সেই সময় মিঃ দীক্ষিত মনে পড়িয়ে দিলেন—আমাদের সঙ্গে টর্চ নেই।

অতএব বেশিক্ষণ থাকা যাবে না। ঢিবিতে উঠে দেখলুম একটা প্রশস্ত পাথরের মেঝে। ফাটলে ঘাস গজিয়ে আছে। সামনে পূর্বে-পশ্চিমে লম্বা দেয়ালটা আন্দাজ বিশ ফুট উঁচু। মনে হল, ওটা কমপক্ষে দু'গজ চওড়া। সুতরাং ওর ওপর দৌড়াদৌড়ি করা সম্ভব বইকি। এক জায়গায় একটা মস্ত ফাটল দেখছিলুম। সেখানে একটা শুকনো কোনও গাছের গুঁড়ি ও শেকড় মেঝে অবধি নেমে এসেছে। গাছটা যেভাবেই হোক, মারা গেছে কবে এবং ডগার দিকটা ক্ষয়ে ভেঙে গেছে সম্ভবত। দীক্ষিত বললেন—দেখুন জয়ন্তবাবু, মনে হচ্ছে—কেউ ইচ্ছে করলে ওই গাছটা বেয়ে দেয়ালের ওপর উঠতে পারে। তাতে সায় দিলুম।

কিন্তু কর্নেল গেলেন কোথায়? দীক্ষিত আবার ডাকলেন—কর্নেল! কর্নেল সায়েব! অমনি ডাকটা দ্বিগুণ জোরে প্রতিধ্বনি তুলল। উনি বললেন—দেখছেন জয়ন্তবাবু? দেয়ালটা কেমন প্রতিধ্বনি তোলে?

বললুম—হ্যাঁ। ঐতিহাসিক দালানগুলো দেখছি এ ব্যাপারে ওস্তাদ। সবখানে এটা লক্ষ্য করছি। আমার ধারণা, সেকালের স্থপতিরা কোনও কৌশল জানতেন। তুঘলকাবাদে...

আমার মুখের কথা শেষ না হতেই কর্নেলের চিৎকার শুনলুম— মিঃ দীক্ষিত! জয়ন্ত! হেল্প! হেল্প! বাঁচাও! বাঁচাও!

চকিতে আমরা আওয়াজ লক্ষ্য করে দৌড়ে গেলুম। গিয়ে দেখি ঢিবির উত্তর দিকের ঝোপ-ঝাড়ের ওপর কর্নেল একটা কাঁটা গাছের ডগায় চড়ে রয়েছেন এবং মাথার টুপিটা জোরে নাড়ছেন। ব্যাপার কী? চেঁচিয়ে উঠলুম—কী হয়েছে কর্নেল?

কর্নেল পাল্টা চেঁচিয়ে বললেন—সাবধান জয়ন্ত! এগিও না। যাচ্ছে—তোমাদের দিকে যাচ্ছে!

আমরা হতভম্ব। কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখি, ওরে বাবা! একটা প্রকাণ্ড কালো ষাঁড় শিং নাড়তে নাড়তে ঝোপঝাড় ভেঙে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। অমনি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আমি দৌড় লাগালুম। আছাড় খেলুম বারকতক। হাত-পা ছড়ে গেল নিশ্চয়। ঢিবি থেকে নেমে আর পিছন ফিরেও তাকালুম না। উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়লুম। সেই সময় কানে এল গুলির আওয়াজ। ঘুরে দেখার সাহসও হল না। একেবারে নদীর তলায় গিয়ে পড়লুম। সেপাইরা ব্যস্ত হয়ে বলল—ক্যা হুয়া? বাবুজি?

আঙুল তুলে দেয়ালের দিকটা দেখালুম শুধু। ওরা বন্দুক বাগিয়ে তক্ষুনি দৌড়ে চলে গেল।

কিন্তু অমন ষাঁড় ওখানে এল কোত্থেকে? এতো ভারি বিদঘুটে ব্যাপার। নাকি আসলে ওটা

একটা ভূতপ্রেত! রাঁধুনি লোকটা স্টোভ জ্বেলে কেটলিতে জল গরম করছিল। সভয়ে বললে—কুছ দেখা বাবুজি? কৈ পেরেত বা?

জোরে মাথা নাড়লুম। শীত চলে গিয়ে ঘাম দিচ্ছে যেন। হাঁপানি থামছে না। একটু পরে কথাবার্তার আওয়াজ পেলুম। তখন দিনের আলো আর নেই। টর্চ জ্বালতে-জ্বালতে দীক্ষিত, কর্নেল ও সেপাইরা আসছিল। দীক্ষিতের কথা শুনতে পেলুম—হ্যাঁ, আমার ধারণা, আপনার লাল টুপিটাই ষাঁড়টাকে রাগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য! ওখানে ষাঁড় এল কোত্থেকে? রাখালরা তো এক মাস আগে গোরু-মোষ নিয়ে পালিয়ে গেছে। কর্নেল বললেন—সম্ভবত, ওদের দলের একটা ষাঁড় দলছুট হয়ে থেকে গেছে ওখানে। দীক্ষিত বললেন—তাও বটে।

আমার কাছে কর্নেল এসে বললেন—হ্যাল্লো জয়ন্ত! আশা করি, হাড়গোড় ভাঙেনি?

তখন হেসে উঠলুম।—আশা করি, আপনিও অক্ষত আছেন।

—আছি বৎস! কিন্তু—ওঃ! হরিবল, জয়ন্ত! আশ্চর্য বটে!

—হঠাৎ ষাঁড়ের পাল্লায় পড়তে গেলেন কেন? দৌড়েই গেলেন দেখছিলুম!

কর্নেল বিমর্ষ মুখে বললেন—দূর থেকে ওটাকে চিনতে পারিনি। যেই দৌড়ে গেছি—ব্যস।

দীক্ষিত বললেন—লাল টুপি! ওতেই ষাঁড়টা ক্ষেপে যায়। যাক গে, গুলির আওয়াজে ব্যাটা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় বলেই রক্ষে। কিন্তু কর্নেল, এ তো এক সমস্যায় পড়া গেল। ওখানে গেলেই তো ব্যাটা আবার তেড়ে আসবে।

কর্নেল চিন্তিত মুখে বললেন—হ্যাঁ। তা তো আসবেই। তবে যা বোঝা গেল, গুলির আওয়াজে বড্ড ভয় পায় ব্যাটা। তেমন দেখলে বরং আমরা তাই করব।

হ্যাসাগ জ্বালা হল। ক্যাম্পচেয়ার পেতে বসে আমরা কফি খেতে থাকলুম। রাত জাগতে হবে। কত রাত জাগতে হবে, জানি না। ভূতগুলোর মর্জি তো! কোন রাতে তাদের খেলা শুরু হবে, তার ঠিক তো নেই।

কিন্তু ব্যাপারটা ভাবতেই আমার এত ভয় হল যে অন্য কথা ভাবতে থাকলুম।...

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর তাঁবুর সামনে যে আগুন জ্বালা হয়েছিল, কিছুক্ষণ আমরা তার উত্তাপ নিলুম। তিনটে তাঁবু খাটানো হয়েছে। একটা তাঁবুতে মিঃ দীক্ষিত ও রাঁধুনি মাধোরাম, অন্য একটায় সেপাই চারজন, অরেকটায় আমি ও কর্নেল শোব। শোব বলা ভুল হল। শোওয়ার ভাগ্য আর মাত্র ঘন্টা তিনেক। ভূতুড়ে কাণ্ড নাকি ঠিক রাত একটার পর ঘটতে থাকে। অতএব তখন আমাদের সেই প্রচণ্ড শীতেই বেরোতে হবে। নদীর পাড়ে যেতে হবে। জায়গা দেখে রাখা হয়েছে আগেই। তারপর কী করতে হবে, সে নির্দেশ কর্নেল দেবেন।

দুটো ক্যাম্প খাটে পাশাপাশি শুয়েছি কর্নেল ও আমি। তিনটে কম্বলেও শীত যাচ্ছে না। তাই ঘন্টা তিনেক ঘুমোবার সুযোগ হল না। দেওয়ালটা আমাদের উত্তরে— সেদিকেই নদীর পাড়। এখান থেকে দেখা যায় না। আর তাঁবুর দরজা স্বভাবত দক্ষিণে। দরজায় পর্দা ঝুলছে। একদিকে সামান্য ফাঁক। তাকিয়ে আছে সেদিকে। আকাশের দু-একটা নক্ষত্র চোখে পড়ছে। কর্নেলের রীতিমতো নাক ডাকছে। হঠাৎ দরজার ফাঁকের নক্ষত্র ঢেকে গেল। তারপর চাপা খসখস শব্দ কানে এল। শব্দটা ভাল করে শোনার জন্যে কম্বল থেকে কান বের করলুম এবং মাফলার খুলে ফেললুম মাথা থেকে। হ্যাঁ—ঠিকই শুনেছি। তাছাড়া দরজার ফাঁকে নক্ষত্র আর দেখা যাচ্ছে না। ভয়ে বুক ঢিব ঢিব করে উঠল। বালিশের পাশ থেকে টর্চটা যেই টেনেছি, আবার সেই ফাঁকে নক্ষত্র দেখলুম। এর মানে কেউ কি এসেছে? কেউ কি কোনও দুষ্টু মতলবে তাঁবুতে উঁকি দিচ্ছিল? কে সে? কী

তার উদ্দেশ্য? ভাবলুম টর্চ জ্বালার আগে কর্নেলকে চুপি চুপি জাগিয়ে দিই। অমনি নাকে একটা বোঁটকা গন্ধ এসে লাগল। নাড়িভুঁড়ি উগরে পড়ার জোগাড় সেই পচা গন্ধে। নাক ঢেকে চোখ খুলে ভয়ে কাঁপতে থাকলুম। আর কর্নেলকে ডাকারও সাহস হচ্ছে না। যদি ওই নিশুতি রাতের আগন্তুক আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে?

দম বন্ধ করে শুয়ে আছি। সেই সময় কর্নেলের নাক ডাকা বন্ধ হল। একটু সাহস পেলুম। বুড়ো জাগুক, হে ভগবান! বুড়ো ঘুঘুকে জাগিয়ে দাও। এ সব ব্যাপারে ওঁর মাথা খেলে ভাল। এ বয়সে গায়ের জোরও অসাধারণ। যোদ্ধা লোক। যুযুৎসু জানেন কতরকম। শত্রুকে ঢিট করতে জুড়ি নেই ওঁর।

হঠাৎ আবার চমকে উঠলুম। আমার পাশেই তাঁবুর গয়ে খসখস শব্দ! সেই গন্ধটা আরও বিকট এবার। তারপরই কী একটা আমার কপালে এসে পড়ল। ঠাণ্ডা অতি ঠাণ্ডা কিছু শক্ত জিনিস। ওমনি আঁতকে উঠে চেঁচালুম—কর্নেল! কর্নেল! আর যন্ত্রের হাতে টর্চের বোতামও টিপে দিলুম। ওদিক কর্নেলের টর্চও জ্বলে উঠেছে। এক মুহূর্তের জন্য দেখলুম, আমার মাথার উপর দিয়ে একটা—অবিশ্বাস্য! রীতিমতো অবিশ্বাস্য! একটা কঙ্কালের হাত সাঁৎ করে সরে গেল। তাঁবুটা জোরে নড়ে উঠল। পরক্ষণে বাইরে দূরে—অনেক দূরে কারা মিহি খনখানে গলায় হেসে উঠল—হি হি হি হি ......হি হি হি হি... হি হি হি হি!

তারপর কী হল মনে নেই। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলুম। । যখন জ্ঞান ফিরল, দেখি হ্যাসাগটা কখন জ্বালা হয়েছে। রাতে ওটা নিভিয়ে রাখা হয়েছিল—কারণ আলো থাকলে পাছে দেওয়ালের আলৌকিক শক্তির লীলাখেলায় বাধা পড়ে।

কর্নেল ও দীক্ষিত বললেন—জয়ন্ত! জয়ন্তবাবু!

উঠে বসলুম। অমনি সব মনে পড়ে গেল। রুদ্ধশ্বাসে বলুম—ওরা কি পালিয়েছে? ওরা কারা এসেছিল কর্নেল?

কর্নেল গম্ভীর মুখে মাথা নাড়লেন। বললেন—জানি না। সত্যি জয়ন্ত, আমি অবাক। হতভম্ব। বিস্তর ঘটনা ঘটতে দেখেছি জীবনে। কিন্তু এর কোনও মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছিনে! একটা জীবন্ত কঙ্কাল! সত্যিকারের কঙ্কাল। বালিতে এইমাত্র তার পায়ের ছাপ আমরা দেখে এলাম। ও ছাপ কোনও মানুষ বা প্রাণীর নয়, তা হলফ করে বলতে পারি। আর ওই বিকট হাসিই বা কারা হাসছিল কে জানে?

দীক্ষিত বললেন—হাসিগুলো গুর্গিন খাঁর দেয়াল থেকে আসছে মনে হচ্ছিল কর্নেল। আমিও সেবার এসে ওই হাসি শুনেছিলুম। তখন বুঝতে পারিনি।

কর্নেল ঘড়ি দেখ বললেন—সাড়ে বারোটা প্রায়। আর কী? আলোটা আবার নিভিয়ে দেওয়া যাক। আধ ঘন্টা পরে আমরা বেরোব! জয়ন্ত, আর ঘুমিও না।

বেরোতে হবে? কাঁচুমাচু মুখে তাকালুম। তা লক্ষ্য করে কর্নেল চাপা স্বরে ধমক দিয়ে বললেন—এই রকম ভয় পেলে তো চলবে না, জয়ন্ত। তুমি না খবরের কাগজের রিপোর্টার!... ..

ঠিক একটায় আমরা বেরিয়েছি। প্রচণ্ড শীত। আমার তো সবসময় বুক ঢিব ঢিব করছে। কিন্তু উপায় নেই। কর্নেল আমাকে জোর করে নিয়ে এসেছেন। নদীর উত্তর পাড়ে অন্ধকারে চুপি চুপি আমরা তিনজন এবং তিনজন সেপাই একটা পাথরের আড়ালে ওত পেতে বসেছি। একজন সেপাই রয়ে গেল তাঁবুর পাহারায়। রয়ে গেল মাধোরাম বাবুর্চিও।

বসে আছি তো আছি। আমাদর তিরিশ গজ সামনে গুর্গিন খাঁর দেয়াল অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে ওই কালো দেয়ালটা! মনে হচ্ছে হাজার হাজার অদৃশ্য চোখ দিয়ে সে

আমাদের দেখছে আর দেখছে। শয়তানি মতলব ভাঁজছে। যেন উত্তুরে হাওয়ার ভাষায় শনশন করে বলছে—চলে আয়! আয় রে আয়! এই সময় দূরে প্লেনের শব্দ শুনলুম। দেয়ালের আড়ালে পড়ে গেল বলে প্লেনটা দেখতে পেলুম না।

কতক্ষণ পরে হঠাৎ কর্নেল ফিসফিস করে উঠলেন—ও কী?

তাকিয়ে দেখি, হ্যাঁ—যা শুনেছিলুম, তাই। দুটো লাল জ্বলজ্বলে চোখ যেন দেয়ালের ওপর স্থির হয়ে আছে। একটু পরে চোখ দুটো দুলতে শুরু করল। ওপরে-নিচে। কখনও দ'পাশে। দুলছে আর মাঝে মাঝে যেন চলে বেড়াচ্ছে।

অন্তত দীর্ঘ পাঁচ মিনিট ব্যাপারটা ঘটল। তারপর এক ঝলক আলো আকাশের দিকে ছুটে গেল ধূমকেতুর মতো। কয়েক সেকেন্ড ওই আলোর ঝাঁটাটা স্থির হয়ে থাকার পর ডাইনে বাঁয়ে দু'বার নড়ে উঠল। তারপর আবার স্থির।

ঠিক এই সময় কানে এল বিকট এক চিৎকার। ও কি মানুষের না দানবের? মাথায় পুরু করে মাফলার কান অব্দি জড়ানো। তবু মনে হল কানে তালা ধরে যাচ্ছে। আঁ—আঁ—আঁ—আঁ—আঁ! অদ্ভুত সেই আওয়াজ যেন আর্তনাদ, যেন প্রচণ্ড ক্রোধ। আমরা শক্ত হয়ে বসলুম। দীক্ষিত কী বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ দেখি কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। তারপর চাপা স্বরে 'চলে এস তোমরা' বলেই হাঁটতে শুরু করলেন।

কী সর্বনাশ! এ যে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করার শামিল। কিন্তু উপায় নেই। একা এখানে পড়ে থাকার সাহস আমার নেই। এমনকী দৌড়ে নদীর তলায় তাঁবুর কাছেও যেতে পারব না—যদি ফের জ্যান্ত কঙ্কালের পাল্লায় পড়ে যাই!

পিছনে অন্ধের মতো মরিয়া হয়ে চললুম। কয়েক পা যেতেই দেওয়ালের অশরীরীরা আওয়াজ আরও বাড়িয়ে দিল। সে বিকট চেঁচামেচির বর্ণনা ভাষায় দেওয়া দুঃসাধ্য। যেন হাজার হাজার প্রাগৈতিহাসিক দত্যি-দানো হঠাৎ নিশুতি রাতে ঘুম ভেঙে হইচই বাধিয়েছে। কখনও মনে হচ্ছে তারা আর্তনাদ করছে, কখনও হি হি হি করে তখনকার মতো বিকট ভূতুড়ে অট্টহাসি হাসছে।

ঢিবির কাছে আমরা পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে কর্নেল টর্চ জ্বেলে দেয়ালে আলো ফেললেন। অমনি আমার পিলে চমকে উঠল। পাঁচিলের সেই ফাটলে মরা গাছটার ডালে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে আছে সেই জ্যান্ত কংকালটা। এই দৃশ্য দেখামাত্র সেপাইরা হুকুম পাওয়ার আগেই দুমদাম বন্দুক ছুড়তে শুরু করল। প্রচণ্ড প্রতিধ্বনি উঠল। সবাই দৌড়ে ঢিবিতে উঠলুম। কর্নেলের টর্চ সামনে কঙ্কালটার ওপর পড়ে রয়েছে। কঙ্কালটা নড়ছে এবার। কর্নেল জ্বলন্ত টর্চ ও রিভলভার হাতে নিয়ে সেদিকে দৌড়ে গেলেন। অমনি সব বিকট আওয়াজ থেমে গেল। অস্বাভাবিক স্তব্ধতা জাগল।

কর্নেলের চিৎকার শুনলুম—মিঃ দীক্ষিত! এখানে আসুন।

আমি পা বাড়িয়েছি সবে, সেপাইরা সবাই একসঙ্গে টর্চ জ্বলেছে—দেখি পাশের ঝোপ ঠেলে সেই ষাঁড়টা বেরিয়ে আসছে—হ্যাঁ, আমার দিকেই।

অমনি ভূতের ভয়, এই ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানা, সব কিছু মুহূর্তে ভুলে তক্ষুনি দৌড় দিলুম। সন্ধ্যাবেলায় যেভাবে দৌড়েছিলুম, ঠিক সেভাবেই।

ঠাহর করে নদীর ধারে পৌঁছে তখন টর্চ জ্বালালুম। ষাঁড়টাকে পিছনে দেখতে পেলুম না। কিন্তু দূরে দেয়ালের ওখানে আবার মুহুর্মুহু গুলির আওয়াজ শুনতে শুনলুম। টর্চের আলোও ঝলকে উঠল বারবার। তারপর প্লেনের আওয়াজ শুনলুম। কিন্তু দেখতে পেলুম না প্লেনটা।

বোবাধরা গলায় চেঁচিয়ে উঠলুম—মাধোরাম! মাধোরাম!

সাড়া এল—বাবুজি বাবুজি! আপ কিধার হ্যায়?

সে রাতে কর্নেল, দীক্ষিত এবং সেপাই তিনজন ফিরে এলেন যখন, তখন রাত প্রায় তিনটে। হ্যাসাগ জ্বালা হল। সেই আলোয় দেখি, ওঁরা একগাদা তার, প্রকাণ্ড ব্যাটারি সেট, বাল্ব, টেপরেকর্ডার মাইক্রোফান এনেছেন সঙ্গে। ব্যাপার কী? তারপর আমার পিলে চমকাল আবার। কর্নেল দস্তানা পরা হাতে সেই কঙ্কালটার হাত ধরে আছেন এবং সেটা মাটিতে আধখানা গড়াচ্ছে গড়াচ্ছে—অর্থাৎ আসামিকে টানতে টানতেই এনেছেন, যেন আসতে চায়নি—মাটিতে লুটিয়ে আনতে হয়েছে ব্যাটাকে। আমি ফ্যালফাল করে তাকিয়ে রইলুম।

কর্নেল বললেন—জয়ন্ত, আশা করি রহস্যটা টের পেয়ে গেছ এখন।

জোরে মাথা দোলালুম।—পাইনি।

—পাওনি? তোমার ভয়টা আসলে এখনও কাটেনি। বলে কর্নেল তাঁবুর সামনেকার নিভন্ত আগুনে কয়েকটা কাঠ ফেলে দিলেন। আগুন জ্বলে উঠল। ক্যাম্পচেয়ার বের করে তার সামনে বসে চুরুট ধরালেন।

দীক্ষিত বললেন—তাহলে গাড়ি নিয়ে অর্জুন চলে যাক, কর্নেল। রেডিওমেসেজ পাঠানোর ব্যবস্থা করুক।

কর্নেল বললেন—অবশ্যই। হেলিকপ্টারটা পাকড়াও করা যাবে অন্তত। মালগুলো হয়তো পাচার হয়ে যাবে।

হতভম্ব হয়ে বললুম—মাই ডিয়ার ওল্ড ম্যান, ব্যাপারটা খুলে বলবেন কি?

কর্নেল হাসলেন।—এখনও খুলে বলতে হবে? এ স্মাগলিংয়ের কারবার, জয়ন্ত। স্রেফ চোরাচালানী মালের ব্যাপার। গাঁজা আফিং চরস কোকেন এসব মাদকদ্রব্য এই অখাদ্য এলাকায় চোরাচালানীরা এনে ওই গুর্গিন খাঁর দেয়ালে একটা গুপ্ত জায়গায় মজুত করে। ব্যাটারি থেকে বিদ্যুতের সাহায্যে দেয়ালের মাথায় লাল বাল্ব জেলে হেলিকপ্টারকে সংকেত দেয়। কখনও স্রেফ হলদে আলোও দেখায়। এই হেলিকপ্টার তখন মাঠে নেমে পড়ে। এরা মালগুলো ওতে পৌঁছে দেয়। আমাদের দুর্ভাগ্য শয়তানগুলোকে তাড়া করতেই ব্যস্ত ছিলুম, হেলিকপ্টারটা গতিক বুঝে উড়ে পালাল।

বললুম—এই কঙ্কালটা? আর ওই অট্টহাসি?

কর্নেল বললেন—কঙ্কালটা নকল। এতে দুর্গন্ধ এমিনো অ্যাসিড মাখানো আছে। চোরাচালানীদের কেউ এটা নিয়ে এসেছিল আমাদের তাঁবুতে। ভয় দেখাতে চেয়েছিল। আর আওয়াজ হত একটা টেপরেকর্ডারে। মাইক্রোফোন ফিট করা ছিল দেয়ালে। নির্বিঘ্নে চোরাচালানী লেনদেনের ঘাঁটি গড়ার জন্য ব্যাটাদের এতসব আয়োজন। যাক গে! মাধোরাম কফি বানাও!

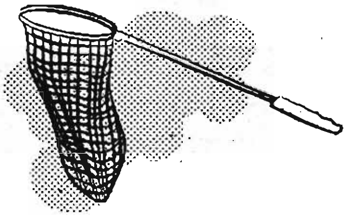

টুপির কারচুপি

কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের ফ্ল্যাটে আড্ডা দিতে গিয়েছিলুম। কর্নেল ষাট-বাষট্টি বছরের বুড়ো। মাথায় টাক ও মুখে দাড়ি আছে। একেবারে সায়েবদের মতো চেহারা। ভারি অমায়িক আর হাসিখুশি মানুষ। একা থাকেন।
কিন্তু বুড়ো হলে কী হবে!
এখনও ওঁর গায়ে পালোয়ানের মতো জোর আছে। দৌড়ে পাহাড়ে চড়তে পারেন। বাঁ হতে রাইফেল ছুড়ে বাঘ মারতে পারেন। পারেন না কী, তাই-ই বলা কঠিন। সারাজীবন নানা দেশে বিদঘুটে অ্যাডভেঞ্চারে গেছেন—জঙ্গলে, সমুদ্রে, দ্বীপে, বরফের দেশে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আফ্রিকা আর বর্মা ফ্রন্টে যুদ্ধ করেছেন। অবসর নেওয়ার পর ওঁর হবি হচ্ছে দুর্লভ জাতের পাখি, পোকামাকড় ও প্রজাপতি খুঁজে বেড়ানো। এজন্যে প্রায়ই উনি পাহাড়ে জঙ্গলে বেরিয়ে পড়েন। সঙ্গী বলতে আমি—এই জয়ন্ত চৌধুরি। আমার মতো একজন যুবকের সঙ্গে ওই বুড়োর গলাগলি ভাব যে কতটা, না দেখলে বিশ্বাস হবে না কারও।

এই কর্নেলবুড়োর আরেক বাতিক গোয়েন্দাগিরি। অনেক বড় বড় ডাকাতি আর খুনের হিল্লে করে খ্যাতি কুড়িয়েছেন। শুধু পুলিশ মহলের নয়, সবখানেই ওর নামটা বিলক্ষণ চেনা। কেউ যদি বলে 'বুড়ো ঘুঘু' তাহলে বুঝতে হবে সে নির্ঘাৎ কর্নেলের কথাই বলছে।

সেই রোববারের সকালে ওঁর বাসায় গেলুম, তার পিছনে একটা উদ্দেশ্যও ছিল। আমি দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার এক রিপোর্টার। আমাদের কাগজেই একটা অদ্ভুত খবর বেরিয়েছিল। জানতুম, অদ্ভুত যা কিছু—তাতেই কর্নেলের কৌতূহল। উনি নাক না গলিয়ে থাকতে পারবেন না। আর এই খবরটা শুধু অদ্ভুত নয়, রীতিমতো অবিশ্বাস্য।

তো, আমাকে দেখেই বুড়ো হাসতে হাসতে বললেন—এস জয়ন্ত; এক্ষুনি তোমার কথা ভাবছিলুম। নিশ্চয় তুমি সেই ভূতুড়ে টুপির ব্যাপারে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছ।

বললুম—ভূতুড়ে টুপি, না জ্যান্ত টুপি?

—একই কথা। বলে কর্নেল খবরের কাগজ খুলে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর বললেন—ব্যাপারটা বেশ মজার, তাই না জয়ন্ত? চোঙার মতো সূঁচলো ডগাওয়ালা এই ধরনের টুপি ক্রিস্টমাসের পরবে পরা হয়। আবার সার্কাসের ক্লাউনরাও এমন টুপি পরে ভাঁড়ামি করে। সেই টুপি কি না ইচ্ছেমতো চলে বেড়ায়। লাফায়। নাচে। বিছানায় ঘুমোয়। খাবার টেবিলে গিয়ে খেতে বসে। ইজিচেয়ারে আরামে গড়ায়। খাসা! ভাবা যায় না! টুপির মালিক যে ঘাবড়ে যাবেন, তাতে সন্দেহ কী!

বললুম—শুধু তাই নয় কর্নেল। বাগানে গিয়ে গোলাপগাছে চড়ে চমৎকার দোল খায় ব্যাটা।

কর্নেল খুব হাসলেন। তারপর বলন—বোসো। এক্ষুনি টুপির মালিক মিঃ গজেন্দ্রকিশোর সিংহরায় এসে পড়বেন। একটু আগে আমায় ফোন করেছিলেন।

কর্নেলের পরিচারিকা মিস অ্যারাথুন একটা ট্রেতে কফি রেখে গেল। কফির পেয়ালায় সবে মুখ দিয়েছি, দরজায় ঘন্টা বাজল। তারপর এক প্রকাণ্ড দশাসই চেহারার স্যুট পরা ভদ্রলোক ঢুকলেন। ওঁর হাতে একটা কিটব্যাগ। আমাকে নমস্কার করলেন, আর কর্নেলের সঙ্গে করলেন

হ্যান্ডশেক। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন কর্নেল। সোফায় গম্ভীর মুখে উনি বসলে কর্নেল বললেন—মিং সিংহরায়, বলুন কী করতে পারি আপনার জন্যে?

সিংহরায় বললেন—আপনাকে ফোনে তো সবই বলেছি, কর্নেল। নতুন করে কিছু বলার নেই। ব্যাপারটা আজ তিনদিন ধরে সত্যি সত্যি ঘটছে। খবরের কাগজে তো দূরের কথা, বাড়ির কাউকে আমি বলিনি। অথচ কীভাবে ফাঁস হয়ে গেল, কে জানে! খবরের কাগজেই বা কে খবরটা দিল—কিছু বুঝতে পারছিনে! সেজন্যেই তো আপনার সাহায্য চাইছি।

কর্নেল মুখ খোলার আগে আমি অবাক হয়ে বললুম—খবরটা নিশ্চয় কোনও রিপোর্টারকে কেউ দিয়েছে! না দিলে কাগজে বেরোতেই পারে না।

সিংহরায় উদ্বিগ্নমুখে বললেন—সেটাই তো আশ্চর্য লাগছে।

কর্নেল ভুরু কুঁচকে কী ভাবছিলেন। বলেন—হুম। কিন্তু টুপিটা যে ওইসব অদ্ভুত কাণ্ড করছে, তা তো সত্যি?

সিংহরায় জবাব দিলেন—একেবারে হুবহু সত্যি। টুপিটা কিনেছি গত বিষ্যুৎবার চৌরঙ্গির একটা নিলামের দোকানে। অদ্ভুত-অদ্ভুত জিনিস কিনে ঘরে সাজিয়ে রাখা আমার বাতিক। টুপিটা দেখতে অদ্ভুত লাগল। পঁচিশ টাকা থেকে দর হাঁকাহাঁকি শুরু হল। তিরিশে উঠেই অন্যরা ছেড়ে দিল। শুধু একজন...

—হুম! বলুন।

—একজন অবাঙালি ভদ্রলোক ছাড়ল না। দর চড়াতে থাকল। তাই আমারও জেদ চড়ে গেল। শেষ অব্দি রোখের মাথায় তেরোশো টাকা হাঁকলুম। তখন লোকটা সরে গেল। টুপি নিয়ে বিজয়গর্বে বাড়ি ফিরলুম। এবং তারপর সন্ধ্যাবেলা থেকেই টুপি খেল দেখানো শুরু করল। ড্রয়িংরুমের কোনায় একটা ছোট্ট টেবিলে ওটা রেখেছিলুম। বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছি, হঠাৎ দেখি টুপিটা টেবিলের ওপরে চলতে চলতে নিচে পড়ে গেল। তখনও সন্দেহ হয়নি। ওটা সেখানেই তুলে রেখে ওপরের ঘরে গেছি, খাওয়াদাওয়া করেছি। শুতে গিয়ে দেখি, আশ্চর্য। টুপিটা বিছানায় শুয়ে আছে। বাড়ির সব্বাইকে জিগ্যেস করলুম—কেউ কিছু জানে না। সবচেয়ে আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল শুক্রবার রাতে। টুপিটা শোওয়ার ঘরেই রেখেছিলুম। রাত দুটোয় হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ঘরে খসখস শব্দ শুনে সুইচ টিপে টেবিলল্যাম্প জ্বালালুম। দেখি—টুপিটা মেঝেতে দিব্যি হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে জানলার দিকে যাচ্ছে। তারপর চোখের সামনে সেটা জানলা গলিয়ে লাফ দিল। বিশ্বাস করুন কর্নেল, যা বলছি—এর মধ্যে এর মধ্যে এতটুকু মিথ্যে নেই।

—হুম! বলুন, বলুন!

মিঃ সিংহরায়ের মুখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল। দম নিয়ে বললেন—তক্ষুণি টর্চ আর পিস্তল নিয়ে নিচে গেলুম। দেখলুম, টুপিটা বুগনভিলিয়ার গাছে কাত হয়ে যেন ঘুমোচ্ছে। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড হল গত রাতে। টুপিটা কখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। একটা গোলাপ গাছে চড়ে বসেছে। আজ ভোরবেলা মালি দেখতে পেয়ে...

কর্নেল বাধা দিয়ে বলেন—হুম, বুঝেছি। টুপিটা কি এনেছেন?

—এনেছি! এই বিদঘুটে জিনিস আর কাছে রাখতে একটুও ইচ্ছে নেই কর্নেল।...বলে সিংহরায় কিটব্যাগ খুলে একটা চোঙার মতো টুপি বের করলেন। প্রকাণ্ড টুপি। কালোরং। সূঁচলো ডগায় একটা রেশমি টুপি আছে। দুপাশে দুটো দুষ্টুহাসিভরা মুখ—একদিকেরটা ছেলের, অন্যদিকেরটা মেয়ের। আমার নাকে কড়া গন্ধ লাগল। নিশ্চয় টুপির গন্ধ।

কর্নেল টুপিটা নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে বললেন—হুম, বেশ ওজন আছে দেখছি।

শক্ত-সমর্থ মাথা না হলে ঘাড় ব্যথা করবে। কিন্তু এ টুপি তো প্রশান্ত মহাসাগরের মাকাসিকো দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দারা পরে। বুনো বেড়ালজাতীয় পশুর চামড়ায় তৈরি।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম—কর্নেল কর্নেল! গত বছর মাকাসিকোতে রাজাকে হটিয়ে এক সেনাপতি সিংহাসন দখল করেছিল না? রাজা অনুহিটিক পালিয়ে গিয়ে আমেরিকায় আশ্রয় নিয়েছিলেন! খুব খুনোখুনি আর লুটপাট হয়েছিল রাজপ্রাসাদে।

কর্নেল আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—অপূর্ব জয়ন্ত, অপূর্ব! তাই-ই তো বটে। হাজার হলেও তুমি খবরের কাগজের লোক! ইয়ে মিঃ সিংহরায়, তাহলে টুপিটা আমার কাছে আপাতত থাক। আপত্তি আছে?

সিংহরায় যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।—মোটেও না! বরং বেঁচে গেলুম, কর্নেল! বাপ্‌স! এখনও আমার বুক টিপ টিপ করছে। ওই ভূতুড়ে টুপি এবার হয়তো গলা টিপে মেরেই ফেলবে মশাই!

কর্নেল বললেন—ঠিক আছে। আমি সন্ধ্যার দিকে আপনার বাড়িতে যাচ্ছি। জয়ন্তও যাবে আমার সঙ্গে। কেমন!

সিংহরায় মাথা দুলিয়ে সায় দিলেন।

কথামতো সাড়ে পাঁচটায় আবার কর্নেলের ফ্ল্যাটে গেলুম। দেখি, আমারই অপেক্ষা করছেন উনি। একটু হেসে বললুম—টুপিটা নিশ্চয় আপনাকে খুব জ্বালিয়েছে কর্নেল?

কর্নেল গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন—না জয়ন্ত। এবং সেটাই আশ্চর্য!

—কেন, কেন?

—টুপিটা যদি সত্যি ভূতুড়ে হবে, তাহলে সবখানেই ভূতুড়ে কাণ্ড করবে! অথচ আমার ঘরে এসে একেবারে শান্ত খোকাবাবুটি বনে গেল! কোনও মানে হয় না জয়ন্ত!

—তাহলে কি সিংহরায় মিথ্যে বলছেন? খবরের কাগজেও কি উনি নিজেই খবরটা দিয়েছেন? কিন্তু এসবের উদ্দেশ্য কী কর্নেল? সিংহরায় কেন এমন আজগুবি ঘটনা রটাচ্ছেন?

—সব কিছু জানতেই ওঁর বাড়ি যাচ্ছি আমরা। চলো, বেরিয়ে পড়া যাক।...

নিউ আলিপুরে সিংহরায়ের ইভনিং লজে যখন আমরা পৌঁছলুম, তখন সন্ধ্যা ছ'টা। বিশাল বাড়ি। চওড়া লন। ফলবাগিচা, টেনিস কোর্ট আছে। আমাদের অভ্যর্থনা করে প্রকাণ্ড ড্রয়িংরুমে নিয়ে গিয়ে বসালেন। টুপিটা কর্নেলের হাতে ছিল। সোফার এককোণে রেখে পাশেই বসলেন। তারপর কথাবার্তা শুরু হল। দেখলুম, কর্নেল টুপির কথা মোটেও তুললেন না। ঘরের নানান শিল্পসামগ্রী নিয়ে পুরাতত্ত্বে চলে গেলেন। ওসব পণ্ডিতি ব্যাপার আমি বুঝিনে। চুপচাপ বসে রইলুম।

হঠাৎ আমার চোখে পড়ল টুপিটা নড়ছে। নড়তে নড়তে সোফার পিছনে চলে যাচ্ছে। ঘরে আলো খুব উজ্জ্বল নয়। হাল্কা ধূসর আলো জ্বলছে। আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না। এত অবাক, আর ভয়ে কাঠ হয়ে গেছি যে মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। টুপিটা সোফার পিছন দিয়ে মাতালের মতো টলতে টলতে এগোচ্ছে। ডগার থুপিটা ঝাঁকুনি খাচ্ছে। দেখতে দেখতে ওটার গতি বাড়ল। দরজার কাছে যেতেই আমি এতক্ষণে চেঁচিয়ে উঠলুম—কর্নেল! কর্নেল! টুপি! টুপিটা পালাচ্ছে!

সিংহরায় হাঁ করে তাকিয়ে আছেন। কর্নেলকে দেখলুম, মিটিমিটি হেসে এবার উঠে দাঁড়ালেন। তারপর দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। তখন টুপিটা দরজার বাইরে অদৃশ্য হয়েছে!

কর্নেল দেখলুম দরজার কাছে গিয়েই আচমকা লাফ দিলেন। তারপর উনিও অদৃশ্য। এতক্ষণে আমার হুঁশ হল যেন। দৌড়ে বেরিয়ে ডাকলুম—কর্নেল! কর্নেল!

অমনি লনের ওদিকে গেটের কাছে দুড়ুম দুড়ুম আওয়াজ হল। নিশ্চয় কেউ গুলি ছুড়ল। দারোয়ান চাকর-বাকর চেঁচিয়ে উঠল। দৌড়াদৌড়ি শুরু হল! গেটে গিয়ে দেখি, কর্নেল একহাতে টুপি অন্য হাতে পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে সেই মিটিমিটি হাসি। রুদ্ধশ্বাসে বললুম—কী ব্যাপার কর্নেল?

কর্নেলের সামনে নুড়িবিছানো রাস্তায় একটা ছোট্ট বিলিতি কুকুর মরে পড়ে আছে। বুকের কাছে রক্তের ছোপ। সিংহরায় এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর্তনাদ করে উঠলেন—জিমি। জিমি! কে তোকে খুন করল?

কর্নেল ওঁর কাঁধে হাত দিয়ে ডাকলেন—মিঃ সিংহরায়, জিমিকে ওর আসল মালিকরা এইমাত্র গুলি করে মেরে গেল। জিমিকে আপনি নিশ্চয় সদ্য কিনেছেন! তাই না?

সিংহরায় উঠে দাঁড়ালেন। —হ্যাঁ। যেদিন টুপিটা কিনি সেদিনই বিকেলে একটা লোক বেচতে এসেছিল। কিন্তু আমি তো এসব কিছু বুঝতে পারছি না!

দেখুন, এই টুপির মধ্যে নিশ্চয় কিছু দামি মণিমুক্তো লুকোনো আছে। টুপিটা হাতানোর জন্যেই জিমিকে ওরা আপনার কাছে বেচেছিল। টুপিতে একরকম গন্ধ মাখানো আছে। মাকাসিকো দ্বীপের একজাতের ফুলের গন্ধ। বহুকাল টিকে থাকে এই গন্ধ। ওরা এই গন্ধ জোগাড় করে জিমিকে শুঁকিয়ে খুব ট্রেনিং দিয়েছিল বোঝা যাচ্ছে। তবে ট্রেনিং জিমির তেমন রপ্ত হয়নি। সময় যথেষ্ট পায়নি। তাই টুপিটা ওদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ওরা এই ক'দিন রাস্তায় ওত পেতে অপেক্ষা করেছে বেচারা জিমির!

সিংহরায় হতভম্ব হয়ে বললেন—তাহলে টুপির তলায় জিমিটাই ঘুরে বেড়াত?

—অবশ্যই। ভুতুড়ে টুপির রহস্য হচ্ছে এই। আর খবরের কাগজে খবর দিয়েছিল ওরাই—যাতে টুপিটা হারালে ভূতের ঘাড়েই দোষটা চাপানো যায়। বুঝলেন তো? অট্টুকুন কুকুর—খাড়াই মোট ছ'ইঞ্চি। টুপির তলায় ঢুকলে তো ওকে দেখা যাবে না।

এর পর আমরা ড্রইংরুমে ফিরে গেলুম। ছুরি দিয়ে টুপির ভেতরটা চিরে দিতেই গুচ্ছের রঙিন পাথর ঠিকরে পড়ল। চোখ-ধাঁধানো রং সব। আমি লাফিয়ে উঠলুম—কর্নেল! রাজা অনুহিটিক পালানোর সময় অনেক ধনরত্ন নিয়ে যান। পথে অনেক খোওয়া গিয়েছিল নাকি। এই টুপিটার মধ্যেও কিছু ছিল দেখা যাচ্ছে।

কর্নেল চুরুট জ্বেলে শুধু বললেন—হুম!

মনে মনে বললুম—ওহে বুড়োঘুঘু! সত্যি, তোমার তুলনা নেই।...

চৌরাদ্বীপের ভয়ংকর

ফোনে দশাবতার

কাজের সময় কোনও ফোন বাজলে বড্ড বিরক্ত লাগে। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার অফিসে বসে খুব মন দিয়ে বিদ্যুৎমন্ত্রীর ভাষণ লিখছি, কাল সকালের কাগজে যেটা পড়ে লোকেরা এই ভয়াবহ বিদ্যুৎ সঙ্কটের অন্ধকারে অন্তত আশার আলোটি দেখতে পাবে—এমন সময় ফোন বাজল ক্রিরিরিরিরিং...

খাপ্পা হয়ে ফোন তুলেই বললুম—স্পেশাল রিপোর্টার জয়ন্ত চৌধুরীকে চাই তো? নেই। ছুটিতে গেছে।

—ডার্লিং, অবতার কাকে বলে জানো কি?

অপ্রস্তুত ও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলুম। তারপর বললুম—খুব জানি। পাপীতাপী উদ্ধারে ভগবান নানারূপে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। সেই রূপের নাম অবতার। ইদানীংকালে যেমন এক অবতার কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। রাজ্যের চোর ডাকাত খুনির হাত থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। তো হে গোয়েন্দারূপী অবতার মশাই! হঠাৎ এই সন্ধ্যাবেলায় অবতার নিয়ে জ্বালাতন কেন?

—মাইডিয়ার ইয়ংম্যান! কারণ ছাড়া কার্য হয় না।

—ভাল কথা। বেশি বকবক না করে সোজা সেই কারণটা জানিয়ে দিন। আমার হাতে জরুরি কাজ রয়েছে। তাছাড়া আপনার জানা উচিত, এই সন্ধ্যাবেলাটাই হল গিয়ে খবরের কাগজের পিক আওয়ার্স। সারাদিনের সব ঘটনার খবর এখন বন্যার মতো এসে টেবিল ডুবিয়ে দিয়েছে। অতএব...

—জয়ন্ত, জয়ন্ত! এ বৃদ্ধ সবই অবগত।

—তাহলে কাজে বাগড়া দিচ্ছেন কেন?

—হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো।

—শুনছি, বলুন।

—তোমার কলম চালনার শব্দ শোনা যাচ্ছে। কলম থামিয়ে মন দিয়ে শোনো।

জ্বালাতন! কাগজ থেকে ফোনের দূরত্ব অন্তত হাফ মিটার। আপনার কি পাঁচটা কান আছে?

—না। কিন্তু তুমি লেখার সময় কাগজের ওপর মুখটা ঝুঁকিয়ে রাখো দেখছি। এখনও তাই রেখেছ। লেখা বন্ধ করে হাসতে হাসতে বললুম—বেশ। এবার বলুন আপনার অবতার তত্ত্বটা কী?

—ডার্লিং, অবতারের সংখ্যা কত এবং কী তাদের নাম নিশ্চয় জানো?

—হুঁউ। দশ অবতার। যথা : মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, বামন, নৃসিংহ...

—এনাফ জয়ন্ত, এনাফ! আমার বক্তব্য শুধু নৃসিংহ সম্পর্কে। তুমি কাহিনিটা নিশ্চয়ই জানো?

—খুউব জানি। দৈত্যরাজ হিরণকশিপু কৃষ্ণভক্ত বালক প্রহ্লাদকে বললেন, কোথায় থাকে তোমার কৃষ্ণ? প্রহ্লাদ বলল, সর্বত্র। দৈত্যরাজ বললেন, তাহলে এই স্তম্ভেও আছে সে? প্রহ্লাদ বলল, নিশ্চয় আছেন। তখন দৈত্যরাজ স্তম্ভের গয়ে মুদ্গারের আঘাত করলেন, আর স্তম্ভ বিদীর্ণ হয়ে নৃসিংহ মূর্তির আবির্ভাব ঘটল। বড় ভয়ঙ্কর সেই মূর্তি। অর্ধেক সিংহ, অর্ধেক মানুষ।

—খাসা! অর্ধেক সিংহ, অর্ধেক মানুষ!

—কর্নেল, আসলে এই অবতারের ব্যাপারটা ডারউইন সাহেবের সেই থিওরি অফ এভোলশান, অভিব্যক্তিবাদ। নানান প্রাণী থেকে আকার বদলাতে বদলাতে শেষে বাঁদর জাতীয় প্রাণী থেকে মানুষের উৎপত্তি। আমাদের ভারতীয় ঋষিরা কিন্তু সায়েবদের চেয়ে চার হাজার বছর আগেই ব্যাপারটা জানতেন। সেটাই অবতারতত্ত্বের মধ্যে ঠারে-ঠোরে বলেছেন। দেখুন না—গোড়ার অবতাররা নিছক প্রাণী। তারপর আদ্ধেক প্রাণী, আদ্ধেক মানুষ। শেষের অবতাররা খাঁটি মানুষ।

—এই অভিনব ব্যাখ্যা শুনে চমৎকৃত হলুম, বৎস! কিন্তু কিন্তু ব্যাখ্যাটি তোমার নিজস্ব কি?

—মোটেও না। প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ ডঃ হরিহর গড়গড়ির কাছে শুনেছি।

—কী অপূর্ব যোগাযোগ! ডার্লিং ডঃ গড়গড়ি এখন আমার পাশেই বসে আছেন।

—তাই বলুন। সেই তো ভাবছিলুম, আপনার মাথায় খুলির ভেতরকার নরম বস্তুটিতে হঠাৎ মৎস্য-কূর্ম-বরাহ-নৃসিংহ-বামনরা হঠাৎ কিলবিল করে ঢুকে পড়ল কী ভাবে? হাই ওল্ড ম্যান! যদি মঙ্গল চান, ওঁকে বিদেয় করুন। নইলে শীগগির আপনাকে লুম্বিনী পার্ক, কিংবা গোবরা, কিংবা সেই রাঁচি দৌড়ুতে হবে। খবর এসেছে, সব বেডে পেশেন্ট ভর্তি। সাবধান!

—হাঃ হাঃ হাঃ!

—হাসবেন না। একবার আমি ডঃ গড়গড়ির বক্তৃতা শোনার পর সত্যি হাফ পাগল হয়ে গিয়েছিলুম!

—চুপ, চুপ! আমার ফোন খুব সেন্সিটিভ। অন্যেরাও শুনতে পায়।

—যাক্ গে। যথেষ্ট হল। এবার ছাড়ি। এক্ষুনি প্রেসে কপি পাঠাতে হবে।

—জয়ন্ত, তুমি ইউনির্কন নামে কোনও প্রাণীর কথা শুনেছ?

—হে বৃদ্ধ ঘুঘু! সত্যি আপনি বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন।

—প্রাচীন গ্রিক ও রোমান পুঁথিতে ইউনিকর্নের কথা আছে। এ প্রাণী একটা-শিংওলা ঘোড়ার মতো। এই প্রাণী নাকি ভারতে ছিল। তাছাড়া বাইবেলেও এমনি সব বিদ্ঘুটে জন্তুর কথা আছে। কিন্তু নৃসিংহ সত্যি অভিনব। আদিম পৃথিবীতে টেরাডাকটিল, ডাইনোসরাস ইত্যাদি প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর কথা বিজ্ঞানীরা বলেছেন। তারা কবে লুপ্ত হয়ে গেছে। এখন কথা হচ্ছে, নৃসিংহরূপী কোনও প্রাণী যদি নিছক কল্পনা না হয়, তাহলে বলতে হবে যে এই প্রাণী ডাইনোসরাসদের পরবর্তী যুগে দেখা দিয়েছিল। এমনকী, মানুষ অর্থাৎ হোমোসেপিয়েন প্রাণীদের আবির্ভাবের পরেও দু'চারটে নৃসিংহ টিকে গিয়েছিল। নৃসিংহ অবতারের গল্পে তারই আভাস রয়েছে।

—সর্বনাশ! ডঃ গড়গড়ি আপনার মাথাটি খেয়েছেন।

—জয়ন্ত, ধর যদি এমন হয়, বর্তমান যুগেও কোথাও কোনও দুর্গম জায়গায় নৃসিংহ নামক জীব টিকে রয়েছে?

—থাকলে খুব ভাল হয় নিশ্চয়। দৈনিক সত্যসেবক সে-খবর ছেপে হই-চই ফেলে দেয়। তবে ফোটো চাই। নইলে লোকে গুলতাপ্পি বলে উড়িয়ে দেবে। ইয়েতি-টিয়েতি নিয়ে অনেক দেখা গেল না?

—ডার্লিং, তবে শোন! আমার কাছে নৃসিংহের ফোটো রয়েছে।

—অ্যাঁ!

—অ্যাঁ নয় বৎস, হ্যাঁ।

—নিশ্চয় ডঃ গড়গড়ি এনেছেন আপনার কাছে?

—দ্যাটস রাইট।

—ফোটোটা যে ক্যামেরার কারিকুরি নয়, তার প্রমাণ কী? ডঃ গড়গড়ি কোথায় দেখলেন নৃসিংহ?

—টোরা আইল্যান্ডে। আন্দামান থেকে একশো সাঁইত্রিশ কিলোমিটার দক্ষিণে একটা ছোট্ট দ্বীপে গিয়েছিলেন সম্প্রতি।

—একা?

—মোটেই না। পাঁচজনের একটা বিজ্ঞানী টিম ভারত সরকার ওই এলাকায় পাঠিয়েছিল। একজন পুরাতত্ত্ববিদ—ডঃ গড়গড়ি, একজন ভূতত্ত্ববিদ—ডঃ গজরাজ মালহোত্র, একজন প্রাণীবিজ্ঞানী—ডঃ মুজফফর আমেদ, একজন নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিত—ডঃ রঘুনাথ সিং এবং প্রখ্যাত জার্মান উদ্ভিদ বিজ্ঞানী—ডঃ গুটেনবার্গ।

—কর্নেল, কর্নেল! আমি এখনই যাচ্ছি। উত্তেজনায় অস্থির হয়ে ফোন নামিয়ে রাখলুম।

নৃসিংহাবতারের অন্তর্ধান

ইলিয়ট রোডে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের ফ্ল্যাটটি যেন দিনে দিনে একটি ল্যাবরেটরি হয়ে উঠেছে। কর্নেল বুড়ো রাজ্যের পোকামাকড় নিয়ে কী সব গবেষণা করেন এবং মাঝে মাঝে মাঝে বিদেশি পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন। ইদানীং গোয়েন্দাগিরির দিকে আর তত মনোযোগ নেই।

সেই শীতের সন্ধ্যায় 'বুড়ো ঘুঘুর বাসায়' ঢোকার আগে টের পাইনি যে টোরাদ্বীপে নৃসিংহ নামক প্রাণীর খবর শুধু নয়, আরও সাংঘাতিক খবর আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

ভারত সরকার টোরাদ্বীপে নানা ষিয়ে খোঁজ-খবরের জন্য যে পাঁচজন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিকে পাঠিয়েছিল, নৃসিংহের কবলে পড়ে তাঁদের তিনজন প্রাণ হারিয়েছেন। বেঁচে অক্ষত দেহে ফিরতে পেরেছেন শুধু ডঃ হরিহর গড়গড়ি এবং গুটেনবার্গ। তবে ডঃ গুটেনবার্গের শরীর একেবারে অক্ষত নেই। কিছু আঁচড়ের দাগ নিয়ে ফিরেছেন। নার্সিং হোমে চিকিৎসার পর সেরে উঠেছেন তিনি।

কিন্তু এতবড় একটা ঘটনা এখনও গোপন রাখা হয়েছে 'জাতীয় স্বার্থে'। তাই শেষ পর্যন্ত নিরাশ হলুম। কর্নেল বললেন—দু' একটা দিন ধৈর্য ধরো, জয়ন্ত। এমন সাংঘাতিক খবর চেপে রাখা যাবে না, সেটা সরকার ভালই জানে। যথাসময়ে সাংবাদিকদের দিল্লিতে ডেকে কর্তৃপক্ষ ঘটনাটা জানাবে। তখন তোমাদের সত্যসেবক পত্রিকাও তা বিশদ ছাপতে পারবে। তবে কথা দিচ্ছি, ঠিক তার আগের দিন তুমি স্কুপ নিউজ হিসেবে 'বিশ্বস্তসূত্রে' একটুখানি যাতে ছেপে দিতে পার, তার ব্যবস্থা করব। সংক্ষিপ্তভাবে কিন্তু! নইলে আমি ঝামেলায় পড়ব।

খুশি হয়ে বললুম—তাতেই চলবে। কিন্তু তার সঙ্গে ছবিটা ছাপলে ক্ষতি কী?

কর্নেল হেসে বললুম—তাহলে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর ডঃ গড়গড়ি বিপদে পড়বেন।

ডঃ গড়গড়ি জোরে মাথা নেড়ে বললেন—না জয়ন্তবাবু, ছবিটবি আমি ছাপতে দিতে পারব না।

ছবিটা দেখে শিউরে উঠতে হয়। ক্লোজ শটে তোলা ফোটো। ডঃ গুটেনবার্গ প্রাণের তোয়াক্কা না করে কী দুঃসাহসে যে জন্তুটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ক্যামেরার শাটার টিপে পালিয়ে গিয়েছিলেন, শুনে রক্ত হিম হয়ে যায়।

ডঃ গড়গড়ি আগাগোড়া খুলে কিছু বললেন না। কর্নেলও যেন ওঁর মুখ চেয়ে বেশি কিছু জানালেন না। তখন ভাবলুম, ডঃ গড়গড়ি চলে গেলে কর্নেলের কাছে আদ্যোপান্ত জেনে নেব।

কিছুক্ষণ একথা-ওকথার পর ডঃ গড়গড়ি চলে গেলেন। তখন কর্নেলকে বাগে পেয়ে বললুম—হাই ওল্ডম্যান! ডঃ গড়গড়ি আপনার দ্বারস্থ হলেন কেন খুলে বলুন তো?

কর্নেল চুরুটের ধোঁয়ার রিং পাকিয়ে রইলেন সেদিকে। এক মিনিট পরে টাকে হাত বুলোলেন। তার এক মিনিট পরে সাদা দাড়ি খামচে ধরলেন। তারপর একটু হেসে আমার চোখে চোখ রেখে বললেন—টোরা আইল্যান্ডে যাওয়ার ইচ্ছে আছে, জয়ন্ত?

চমকে উঠলুম।—ওরে বাবা! নৃসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবেন ভাবছেন নাকি?

—ক্ষতি কী?

—কর্নেল, ভুলে যাবেন না, আপনি পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ো মানুষ। আর দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ছিলেন রীতিমতো পালোয়ান। নৃসিংহের পাল্লায় পড়ে তাঁর প্রাণটি বেঘোরে গিয়েছিল।

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন—তবে সে-নৃসিংহ ছিল সত্যযুগে স্বয়ং ভগবানের অবতার। আর এ নৃসিংহ কলিযুগের নিছক প্রাণী বলেই অনুমান করছি। নইলে জনপ্রাণীহীন টোরাদ্বীপে তার আবির্ভাবের অর্থ কী? কাদের উদ্ধারে সেখানে ভগবান অবতীর্ণ হবে বলো?

—সত্যি কি টোরাদ্বীপে যাবেন ভাবছেন?

—যাব। ডঃ গড়গড়ি সেইজন্যেই এসেছিলেন। তবে এবার উনি যাবেন গোপনে, বেসরকারি ভাবে। আমার সাহায্য চান।

—কেন?

—ওঁর মনে একটা ধাঁধা ঢুকছে।

—খুলে বলুন।

—টোরাদ্বীপ আসলে একটা তিনকোনা পাহাড়। সমুদ্র থেকে ঠেলে উঠেছে টুপির মতো। চারধার অবশ্যি ততকিছু খাড়া নয়, অনেকটা গড়ানে বা ঢালু। জায়গায়-জায়গায় সমতল চত্বরও আছে। আগাগোড়া জঙ্গলে-ঢাকা। পাথর তো আছেই। খাড়ি বলতে মাত্র শ'তিনেক ফুট উঁচু এবং শ'খানেক ফুট চওড়া একটা অংশ। সেখানটা দেয়ালের মতো সোজা উঠেছে সমুদ্র থেকে। প্রচণ্ড বেগে জল আছড়ে পড়ে আর দেয়ালের মাথা অবধি ছিটকে ছড়িয়ে যায়। কানে তালা ধরে যায় তার শব্দে। তো ডঃ গড়গড়ির ধারণা ওইখানে কোথাও বিদ্‌ঘুটে সিংহ-মানুষটা থাকে এবং কিছু পাহারা দেয়।

—পাহারা দেয়? কী পাহারা দেয়? গুপ্তধন বুঝি?

—কে জানে! তবে ডঃ গড়গড়ির মাথায় আরও একটা আজব ধারণা ঢুকেছে যে নৃসিংহটা হয়তো একালেরই বিজ্ঞানীর তৈরি একটা রোবো অর্থাৎ নিছক যন্ত্রমানুষ।

কর্নেলের পাশে সোফার ওপর খামে ছবিটা রয়েছে। হাত বাড়িয়ে সেটা নিলুম। খুলে ছবিটা দেখতে দেখতে বললুম—অসম্ভব। লোমওয়ালা একটা মানুষের মাথা সিংহের মতো। একরাশ কেশর আছে। বড় বড় হিংসুটে দাঁত বের করে আছে। এ কখনও যন্ত্র হতে পারে না।

কর্নেল আনমনে বললেন—ঠিক বলেছ। আতস কাচ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি। যন্ত্র বলে মনে হয় না।

আমরা কথা বলতে বলতে ফোন বাজল। কর্নেল ফোন ধরে কার সঙ্গে চাপা গলায় কিছুক্ষণ কথা বললেন। তারপর ফোন নামিয়ে রেখে গম্ভীর মুখে টাকে মৃদু মৃদু টোকা দিতে লাগলেন। দেখলে মনে হবে, ওস্তাদ তবলচী তবলায় হাতুড়ির ঘা মেরে সুর লাগাচ্ছেন। অবশ্য ব্যাপারটা কতকটা সেরকমই। কর্নেল বলেন, ডার্লিং! মাঝে মাঝে মাথার ঘিলু নানারকম চিন্তার চাঁটি খেয়ে বেসুরো হয়ে যায়। তখন ঠিক সুরে বাঁধতে হলে এই কাজটি জরুরি।

মগজের সুর বেঁধে কর্নেল হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে বললেন, জয়ন্ত। এইমাত্র এক ভদ্রলোক ফোনে বললেন, তাঁর বাড়িতে সম্প্রতি এক বিদ্‌ঘুটে ব্যাপার ঘটেছে, তিনি আমার সাহায্য চান।

বললুম—তা কে না চায়? আপনি প্রখ্যাত বুড়ো ঘুঘু। সেখানে বিদ্‌ঘুটে কিছু ঘটে, সেখানেই আপনার ডাক পড়ে। এতে এমন গোমড়া মুখে ঘিলু নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার কী আছে?

কর্নেল একটু হাসলেন।—আছে মনে হচ্ছে। কারণ মাস তিনেক আগে ভদ্রলোকের ঠাকুরঘর থেকে পুরনো আমলের একটি দশাবতার মূর্তি চুরি গিয়েছিল। কষ্টিপাথরের একটা চওড়া ফলকের ওপড়া খোদাই করা দশটি মূর্তি। অদ্ভুত ব্যাপার, গতকাল ফলকটা উনি বাগানের মধ্যে কুড়িয়ে পেয়েছেন। কিন্তু ফলকের একটা মূর্তি খুবলে নিয়েছে চোর। বাকি ন'টা মূর্তি যেমন ছিল, তেমনি আছে। কোন মূর্তিটা নিয়েছে জানো? নৃসিংহের।

—অ্যাঁ! আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম।

কর্নেল দাড়ি চুলকে বললেন—টোরাদ্বীপের ঘটনার সঙ্গে এ ঘটনার যোগাযোগ-আছে কি না বলা কঠিন। নিছক আকস্মিক যোগাযোগও হতে পারে। অর্থাৎ কাকতালীয় যোগ।

—তাই হবে, কর্নেল! কাক এসে তালগাছে বসল, আর একটা পাকা তাল পড়ল দেখে কেউ যদি ভাবে, কাক এসে বসল বলেই তালটা পড়ল—তাতে কোনও যুক্তি নেই। কাক না বসলেও তালটা পড়ত। কাজেই টোরাদ্বীপের জ্যান্ত নৃসিংহ, আর আপনার ওই ভদ্রলোকের চুরি যাওয়া পাথুরে নৃসিংহের মধ্যে কোনও সম্পর্ক থাকতেই পারে না।

কর্নেল বললেন—কিন্তু এটাও অদ্ভুত যে এই ভদ্রলোক একজন নামকরা চিকিৎসাবিজ্ঞানী। শল্যচিকিৎসা বা সার্জারিতে এঁর বিশ্বব্যাপী খ্যাতি আছে।

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলুম—কী নাম বলুন তো?

—ডঃ পরমেশ পুরকায়স্থ।

—নাম শুনেছি। কিন্তু এতে অদ্ভুত কী দেখতে পাচ্ছেন?

কর্নেল আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না। নিভে-যাওয়া চুরুটটা ধরিয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—জয়ন্ত, হাতে যদি সময় থাকে তো এস আমার সঙ্গে।

—কোথায় বলুন তো?

—ডঃ পুরকায়স্থের বাড়ি। উনি সল্টলেকে বাড়ি করেছেন বছর দুই আগে। ঠিকানা ফোন গাইডে পেয়ে যাব বললেন।

—আপনার মাথা খারাপ? এই রাত্রিবেলা জনমানুষহীন ওই ভূতুড়ে এলাকায় আপনি ওঁর বাড়ি খুঁজে বের করতে পারবেন, ভেবেছেন? গেছেন কখনও ওই এলাকায়?

কর্নেল হাসলেন।—তুমি ঠিকই বলেছ বৎস! একবার রাত্রিবেলা সল্টলেকে আমার এক বন্ধুর বাড়ি গৃহপ্রবেশের নেমন্তন্নে গিয়ে ফেরার সময় তিন ঘন্টা ঘুরে মরেছিলুম। সব রাস্তা একরকম—দূরে দূরে একটা করে বাড়ি। লোকজন নেই রাস্তায়। গোলকধাঁধা!

—তাহলে কোন সাহসে যেতে চাইছেন এখন?

কর্নেল ফোন গাইডের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললেন —ডার্লিং! কলকাতার লোকেরা নীরস একঘেয়ে জীবনযাত্রার মধ্যে থেকে যখন হাঁপিয়ে ওঠেন, আমি তাঁদের পরামর্শ দিতে চাই—যদি বৈচিত্র চান, রোমাঞ্চ চান, বুক ঢিপঢিপ-করা আতঙ্ক আর তার সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চারের দুঃসাহসী আনন্দও পেতে চান, তাহলে আপনারা রাত্রিবেলা সল্টলেকে চলে যান। সারারাত ঘুরুন। মনে হবে সে এক অজানা রহস্যময় দেশ। মাথার ওপর ঝলমল নক্ষত্র, কিংবা ভূতুড়ে চাঁদ—প্রান্তরব্যাপী ধূসর কুয়াশা আর হলুদ জ্যোৎস্নার মধ্যে একটা করে বাড়ি—নিঃশব্দ নির্জন বাড়ি—কী তাদের রহস্য! কী আশ্চর্য রূপমহল! সেখানে আরব্য উপন্যাসের দৈত্য আর পরীরা সারারাত ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়ায় এবং...

আমি আবাক হয়ে আমার বৃদ্ধ বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থিয়েটারি সংলাপ বা প্রলাপ শুনছিলুম, সেই সময় ওঁর ভৃত্য ষষ্ঠীচরণ কফির পেয়ালা সাজানো ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকে আমাকে দেখে একগাল হেসে বলল—স্যার! আমাদের পেরজাপতিগুলো ডিম পেড়েছে আজ। সেদিনকে বললেন না আপনি—ষষ্ঠী, পেরজাপতির ডিম দেখিও। এবার দেখবেন আসুন।

কর্নেল সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে লাফিয়ে উঠলেন।—অ্যাঁ! ডিম পেড়েছে, ডিম? ও হো, কী সুখের কথা! জয়ন্ত! বুঝতে পারছ কি, কী প্রকাণ্ড অসম্ভব আমি সম্ভব করেছি? শীতকালে প্রজাপতিদের ডিম পাড়িয়েছি। দৈনিক সত্যসেবকের জন্যে এই অত্যাশ্চর্য খবর তুমি নিয়ে যেতে পার, বৎস!...বলেই উনি ওঁর পরীক্ষাগারের দিকে দৌড়লেন। ফোন গাইড পড়ে রইল।

ঠাকুরমশাইয়ের নতুন যজমান

প্রজাপতিগুলোকে অশেষ ধন্যবাদ। তারা জানুয়ারি মাসের ঠাণ্ডা কনকনে রাতে সল্টলেকে অ্যাডভেঞ্চারের হাত থেকে রক্ষা করল। কল্পনা করে শিউরে উঠেছিলুম, কুয়াশায় ঢাকা সল্টলেকের জনহীন রাস্তায় আমাদের গাড়ি সারারাত পেট্রল পুড়িয়ে হন্যে হচ্ছে—কিন্তু বেরুনোর পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

সে রাতে, আন্দাজ দশটায় যখন 'বুড়ো ঘুঘুর বাসা' থেকে বেরুচ্ছি, তখনও ঘুঘুমশাই প্রজাপতির খাঁচার সামনে ঝুঁকে ধ্যানে মৌনীবাবা হয়ে রয়েছেন। আমার বিদায় সম্ভাষণ কানে শুনলেন বলে মনে হল না। দরজা আটকাতে এসে বেচারা ষষ্ঠী করুণ মুখে বলল—আজ রাতে আর আমার খাওয়া-শোওয়া হবে না স্যার।...

পরদিন সকালে উনি হঠাৎ আমার ফ্ল্যাটে হাজির হয়ে বললেন—এস জয়ন্ত, বেরিয়ে পড়া যাক।

অতএব বেরুতে হল। হ্যাঁ, সেই সল্টলেকে পরমেশ ডাক্তারের বাড়ি। সারা পথ কর্নেল প্রজাপতি বিষয়ে সমানে বকবক করলেন। কান পাতলুম না। বাড়ি খুঁজে বের করতে পারায় মিনিট কুড়ি লাগল। গেটের মুখে প্রকাণ্ড একটা অ্যালসেশিয়ান কুকুর আমাদের দেখে আপত্তি জানাল। তারপর যিনি হাসিমুখে এসে কুকুরটার বকলেস ধরে আমাদের সম্ভাষণ জানালেন, তিনি প্রখ্যাত শল্যবিদ ডঃ পুরকায়স্থ।

প্রথমে কর্নেল গেলেন বাগানে, যেখানে দশাবতার ফলক ফেরত পাওয়া গেছে। বাগান বলতে আমি যা ভেবেছিলুম, তেমন কিছু নয়। অল্প একটুখানি জায়গায় নানারকম ফুলের গাছ আর ক্যাকটাস। এটা বাড়ির পেছন দিক। তার ওপাশে অনেকটা খোলা পোড়ো জায়গা। কাশকুশের বনে ভরা। কর্নেল বেড়ার ওধারে গিয়ে সেই ঘাসের জঙ্গলে কী সব খুঁজে-টুজে এসে বললেন—হুম! চলুন পরমেশবাবু, আপনার দশাবতার দর্শন করা যাক!

পরমেশ ম্লান হেসে বললেন—নবমাবতার বলুন কর্নেল!

কর্নেল হাসলেন । ঠিক বলেছেন। নবমাবতার।

বসার ঘরে আমাদের রেখে পরমেশ ভেতরে গেলেন এবং একটু পরে পেতলের সুদৃশ্য রেকাবে একটা কষ্টিপাথরের ফলক নিয়ে এলেন। ফলকটা মোটে ইঞ্চি নয় লম্বা এবং ইঞ্চি ছয়েক চওড়া। দশটা ভাগে ভাগ করা আছে। প্রত্যেক ভাগে একটা করে অবতারের মূর্তি খোদাই করা। ঠিক মধ্যিখানে একটা এবড়ো-খেবড়ো খোঁদল। বুঝলুম ওখানেই নৃসিংহ মূর্তিটা ছিল।

কর্নেল কোটের পকেট থেকে আতস কাচ বের করে খুঁটিয়ে দেখতে থাকলেন ফলকটা। পরমেশ বললেন—একটা ব্যাপার লক্ষ্য করুন। ফলকটার চারটে ভাগ। প্রথম সারি ও দ্বিতীয় সারিতে রয়েছে তিনটে করে ছ'টা মূর্তি। পদ্মফুল দেখতে পাচ্ছেন। চোর শুধু ওই মূর্তিটাই খুবলে তুলে নিয়েছে। চতুর্থ সারিতে তিনটে মূর্তিও অক্ষত আছে।

কর্নেল মুখ তুলে বললেন—এই ফলকটা ঠাকুরঘরে ছিল বলছেন। ঘরটা একবার দেখতে পারি?

পরমেশ বললেন—নিশ্চয়! তবে একটু অপেক্ষা করুন। আমার স্ত্রী এখন ও-ঘরে পুজো দিচ্ছেন। ঠাকুরমশাই রয়েছেন। পুজোটা শেষ হোক।

ভেতর থেকে আবছা ক্ষীণ ঘন্টার শব্দ শুনছিলুম। কর্নেল বললেন—হুম! ফলকটার গায়ে সিঁদুরের ছোপ দেখছি পরমেশবাবু! তার মানে দশাবতারেরও পুজো হত। এই তো?

পরমেশ বললেন—হ্যাঁ। তবে আমাদের গৃহদেবতা কিন্তু রাধাকৃষ্ণ। আমাদের পূর্বপুরুষ বৈষ্ণব।

কর্নেল হঠাৎ হেসে উঠলেন। সর্বনাশ! বৈষ্ণব হয়ে আপনি ছুরি চালিয়ে প্রাণীদের কাটাকুটি করেন এবং রক্তপাত ঘটান?

পরমেশও হো হো করে হেসে উঠলেন।—আমি মশাই ধর্মটর্মের ধার ধারিনে। পাষণ্ড নাস্তিক বলতে পারেন। আমার বাবাও তাই ছিলেন। আপনি শুনে থাকবেন বাবার নাম—কারণ আপনি মিলিটারিতে ছিলেন। আমার বাবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিলিটারি ডাক্তার ছিলেন। বাবার নাম ডাঃ অজিতেশ পুরকায়স্থ। মেজর পুরকায়স্থ নামে সবাই তাঁকে চিনতেন।

কর্নেল নড়ে বসলেন।—মাই গুডনেস! মেজর পুরকায়স্থকে আমি ভীষণ চিনতুম। সিঙ্গাপুর পুনর্দখলের সময় আমার উরুতে সামান্য জখম হয়েছিল। টুকরো একটা শার্পনেল লেগেছিল। আপনার বাবা অপারেশন করেছিলেন। আমার চেয়ে বয়সে বেশ বড় ছিলেন। তাহলেও আমাদের বন্ধুত্বে আটকায়নি।

পরমেশ খুশি হয়ে বললেন—এখন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে, যেন বাবার আত্মাই আমাকে আপনার পরামর্শ নিতে প্রেরণা দিয়েছে। নইলে পুলিশের কাছে না গিয়ে আপনাকে জানাতে গেলুম কেন?

কর্নেল বললেন—যাক গে। এবার আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকুন।

—বেশ তো, বলুন।

—দশাবতার ফলকটা দেখে আমার মনে হচ্ছে, এ ধরনের মূর্তি এদেশে কখনও দেখিনি। এই ফলক আপনাদের পরিবারে কীভাবে এল?

—বাবা ওটা কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। ১৯৪৪ সালে মালয়েশিয়া এলাকায় উনি ছিলেন। সেই সময় ওঁকে একবার টোরাদ্বীপে যেতে হয়েছিল। যেখানে...

কর্নেল ও আমি মুখ তাকাতাকি করলুম। আমি চমকে উঠেছি। কিন্তু কর্নেল শান্তভাবে বললেন—হুম! বলুন!

—টোরাদ্বীপে আমেরিকান সৈন্যদের একটা গোপন ঘাঁটি ছিল। জাপানিরা পালানোর সময় ঘাঁটিতে গোলাবর্ষণ করে যায়। কয়েকজন সৈন্য সাংঘাতিক আহত হয়। তাই বাবাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওখানে। যাই হোক, উনি ওই দ্বীপেই ফলকটা কুড়িয়ে পান। উনি রিটায়ার করার পর ফলকটা ঠাকুরঘরে রাখা হয়। তারপর তো বাবা মারা গেলেন। আমি সল্টলেকে বাড়ি করে চলে এলুম। ফলকটা যথারীতি এ বাড়িতেও ঠাকুরঘরে রাখা হয়েছিল।

—বেশ। ফলকটা চুরি গেল কবে এবং কীভাবে?

—গত পুজোয় আমরা কাশ্মীর বেড়াতে গিয়েছিলুম। দারোয়ান রেখে গিয়েছিলুম। বাড়িতে আসবাবপত্র ছাড়া খুব দামি জিনিস আমি রাখিনে। সব ব্যাংকের লকারে থাকে। অবশ্যি চোরের কাছে সবই দামি। তো কাশ্মীর থেকে ফিরে দেখি কিছু খোওয়া যায়নি। দারোয়ান খুব বিশ্বাসী। ঠাকুরঘরের চাবি অবশ্যি তার কাছে রেখে গিয়েছিলুম। ঠাকুরমশাই এসে পুজো করে যেতেন রোজ। আমার স্ত্রীর আবার ধর্মকর্মের প্রচণ্ড বাতিক। যাই হোক, বাড়ি ফেরার কয়েকদিন পরে হঠাৎ ঠাকুরমশাই জানালেন, দশাবতার নেই। আসলে আমরা কেউ লক্ষ্য রাখিনি ব্যাপারটা। কাজেই ঠিক কবে বা কখন চুরি গেল, বলা খুব কঠিন।

—ঠাকুরমশাইয়ের সঙ্গে একটু আলাপ করতে পারি কি?

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। পুজোটা হয়ে যাক।

এতক্ষণে চা সন্দেশ ইত্যাদি এল। অতিথি সৎকারে ব্যস্ত হলেন পরমেশবাবু। চা খেতে খেতে কর্নেল হঠাৎ বললেন—আচ্ছা পরমেশবাবু, যদি আপনাকে অনুরোধ করি—আমাদের সঙ্গে টোরাদ্বীপে চলুন, আপনি যাবেন?

পরমেশ হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন—কেন বলুন তো?

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন—আপনার যাওয়া দরকার। আপনিই টোরাদ্বীপের নৃসিংহ রহস্য ভেদ করতে পারবেন। কারণ আপনি একজন কুশলী শল্যবিদ। তবে তার আগে আপনাকে আগাগোড়া সব কথা জানানো দরকার। আমার বিশ্বাস, আপনার নৃসিংহ মূর্তি চুরির পেছনে একটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার রয়েছে।

এরপর কর্নেল চাপা গলায় সম্প্রতি টোরাদ্বীপে সরকারি সমীক্ষকদলের ভীষণ পরিণতির ঘটনা বলতে শুরু করলেন। শুনতে শুনতে ডঃ পরমেশ পুরকায়স্থ যে উত্তেজিত হয়ে উঠছেন, তা ওঁর মুখের ভাবে টের পাচ্ছিলুম। সবটা শোনার পর উনি বললেন—এ তো ভারি অদ্ভুত ব্যাপার! টোরাদ্বীপে সত্যিসত্যি নৃসিংহ রয়েছে—এবং আমার বাবা সেখানেই এক ফলক কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, দুটোতেই কেমন যেন যোগসূত্র আছে মনে হচ্ছে। ঠিক আছে। আমি যাব আপনাদের সঙ্গে।

কিছুক্ষণ পরে আমরা ঠাকুরঘরে গেলুম। দরজার পাশে একটা টিকিওয়ালা লোক বসে আছে দেখলুম। গায়ে একটুকরো উত্তরীয় এবং পরনে কোরা ধুতি। কাঁধে একটা থলে। বুঝলুম, ইনিই ঠাকুরমশাই।

কর্নেল খুব ভক্তিভরে ঠাকুরঘরে উঁকি মারার পর ঠাকুমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে থাকলেন। দু'জনে যে কথাবার্তা হল, তা এই :

—নমস্কার ঠাকুরমশাই।

—নমস্কার স্যার, নমস্কার।

—এতদূরে পুজোআচ্চা করতে আসেন কি পায়ে হেঁটে। নাকি সাইকেলে?

—না স্যার, সাইকেল। সল্টলেকে তো মাঠ ময়দান জায়গা। পায়ে হেঁটে কি অতগুলো বাড়ির পুজো সারা যায়? এক যজমানের বাড়ি টালা, তো আরেক যজমানের বাড়ি বাঙ্গুরে। বুঝলেন না ঝামেলাটা?

—বুঝলুম বইকি। তা এতসব পুজো না করে বড়সড় দুতিনটে যজমান ধরলেই তো হয়।

—মাথা খারাপ স্যার! এ কি সে সত্যযুগ আছে? ঘোর কলি। লোকের ধর্মবোধই নেই। ধর্মকর্মে এক পয়সা খরচ করতে হলেই মুখ ভার।

—আচ্ছা ঠাকুরমশাই, যদি—ধরুন বড়সড়ো যজমান পেয়ে যান, আপনাকে ভাল মাইনে-কড়ি দেবে, জামাকাপড় মায়-খোরাকিও দেবে, আপনি যাবেন?

—এক্ষুনি যাব স্যার, এক্ষুনি। কাঁহাতক আর বাড়ি-বাড়ি দু'চার পয়সা কুড়িয়ে ঘোরা যায়?

—ভাল! তাহলে ঠিকানা দিন। কথা বলে আপনাকে জানাব।

আমি অবাক হয়ে শুনছিলুম। এরপর দেখলুম, কর্নেল নোটবই বের করে নাম-ঠিকানা টুকে নিলেন। ঠাকুরমশাই গদগদ হয়ে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। পরমেশবাবুর স্ত্রী কড়া চোখে ব্যাজার মুখে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আরও কিছুক্ষণ ডঃ পুরকায়স্থের বাড়িতে কাটিয়ে আমরা যখন রাস্তায় পৌঁছলুম, তখন দেখি ঠাকুরমশাই সাইকেলে চেপে সোজা কাশকুশের জঙ্গল ভেঙে চলেছেন। মনে হল, সাইকেলে চাপার ব্যাপারে ভারি দক্ষ লোক। পথ-বিপথ মানেন না। পাখির মতো ডানা মেলে দিয়েছেন যেন।

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বললুম—হাই ওল্ড ঘুঘু! ব্যাপারটা কী?

অন্যমনস্ক জবাব এল—উঁ?

—আপনি তো সয়েব মানুষ। হঠাৎ ঠাকুরমশাইয়ের বড়লোক যজমান খুঁজে দিতে এত উৎসাহ কেন?

—ডার্লিং। যজমানটি কে হবেন জানো? স্বয়ং লালবাজার গোয়েন্দা দফতরের ডেপুটি কমিশনার আনোয়ার খান।

ঘ্যাঁচ করে গাড়ির ব্রেক কষে দিলুম। নইলে পাথরের ওপর দিয়ে চাকা গড়িয়ে গর্তে পড়ত। এবং আকাশ থেকে পড়ে বললুম—মুসলমান যজমানের বাড়ি পুজোআচ্চার কাজ? কী বলছেন আবোল-তাবোল। এর অর্থ কী?

কর্নেল হাসলেন।—লোকটা দাগি। দেখেই চিনেছি। আনোয়ার খানের সামনে ওকে পৌঁছে দিতে পারলেই জানতে পারবে, নৃসিংহ রহস্যের পেছনে কে বা কার রয়েছে। যাই হোক, স্টার্ট দাও বৎস। আমাদের এখন অনেক জায়গায় ছোটাছুটি করতে হবে।...

ডঃ গড়গড়ির চমকপ্রদ আবিষ্কার

জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী ডঃ গুটেনবার্গের সঙ্গে সেদিন আলাপ হয়েছিল। খুব আমুদে মানুষ। ইংরেজির চেয়ে বরং হিন্দিই রপ্ত করছেন বেশি। কথায় কথায় হেসে বলেন—ম্যায় হিন্দি সমঝ্তে হেঁ। কর্নেলের বয়সী এই জার্মান বিজ্ঞানী চেহারায় অবিকল কর্নেলের মতো। দূর থেকে দেখলে বোঝা কঠিন, কর্নেল, না ডঃ গুটেনবার্গ।

তাঁর কাছেই জানা গেছে টোরা আইল্যান্ড একটা বেওয়ারিশ দ্বীপ। পুবে ইন্দোনেশিয়া, উত্তরে আন্দামান নিকোবর এবং পশ্চিম ও দক্ষিণে ফাঁকা অনন্ত অথই ভারত মহাসাগর। টোরাদ্বীপের মালিকানা নিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের আদালতে তিন দেশের মধ্যে বহুকাল ধরে মামলা চলছে। ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া তিন দেশেরই দাবি, টোরা আমাদের। এখনও ফয়সালা হয়নি। ক'বছর আগে পর্যন্ত ওখানে রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রহরীবাহিনী টহল দিত। কিন্তু নানা অসুবিধার জন্য তাদের সরিয়ে নিতে হয়। সেই অসুবিধেগুলো কী, খুলে বলা হয়নি। কিন্তু এখন আমরা সবাই আঁচ করেছি। তবে ভারত সরকার যে ওখানে সমীক্ষক দল পাঠিয়েছিল, সেটা খুব গোপন ব্যাপার। কারণ যে দ্বীপ নিয়ে মামলা চলছে, সেখানে সমীক্ষক দল পাঠানো চলে না। তাই নৃসিংহের হাতে বিজ্ঞানীদের খুন হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে এত লুকোচুরি।

এই যে জার্মান বিজ্ঞানীরও সাহায্য নিয়েছে ভারত, তাও গোপনে। আসলে ডঃ গুটেনবার্গ ভারত-জার্মান বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা- চুক্তি অনুসারে ভারতে আছেন। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কাজ করছেন। তাঁর টোরা অভিযানে যাওয়ার ব্যাপারটা বেসরকারি ভাবে। অর্থাৎ নিজের দেশের সরকারকেও উনি এটা জানাননি। সবসময় সরকারি নিষেধাজ্ঞা মেনে চললে কোনওকালে কি বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানকে এতখানি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন? এক সময় রাষ্ট্র তো বিজ্ঞানীকে শত্রু ভাবত।

কাজেই পুরো ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপন। অথচ সরকারি গোপনীয়তার পাঁচিল ডিঙিয়ে ব্যাপারটা কর্নেলের হাতে এসে পড়ল এবং আমিও তার সঙ্গে জড়িয়ে গেলুম। সেই সঙ্গে এও বুঝতে পারলুম যে কর্নেল যথাসময়ে দিল্লিতে সাংবাদিকদের ডেকে কর্তৃপক্ষ যে বিবৃতি দেবে বলেছেন—সে নিতান্ত ধোঁকা। সরকার অত বোকামি করবেই না। তাহলে যে ইন্দোনেশিয়া আর মালয়েশিয়া হইচই জুড়ে দেবে। কেন বিচারাধীন এলাকায় ভারত নাক গলাতে গেল?

আমাদের একটা বড় সুবিধে, পাসপোর্ট-ভিসা কিছু লাগছে না। আমরাও গোপনে যাচ্ছি। প্রথমে আন্দামানের পোর্টব্লেয়ারে বিমান থেকে নামলুম। পাঁচজন স্রেফ পর্যটক বেড়াতে এসেছি অন্যদের মতো।

ওদিকে কলকাতা থেকেই ব্যবস্থা করা হয়েছে, গভীর সমুদ্রে মাছধরা জাহাজ 'শার্ক' অর্থাৎ হাঙর আমাদের নিয়ে গিয়ে টোরাদ্বীপের কাছাকাছি নামিয়ে দেবে।

না, জলে নামিয়ে দেবে না। কর্নেলের এ বাহাদুরির তুলনা নেই। নৌ-বাহিনীতে তাঁর পরিচিত এক কর্তাব্যক্তির সাহায্য জোগাড় করেছেন। টোরাদ্বীপের একমাইল দূরে রাত তিনটে নাগাদ চুপি চুপি একটা মিলিটারি মোটরবোট এসে অপেক্ষা করবে। আমরা 'শার্ক' থেকে তাতেই নামব এবং দ্বীপে পৌঁছব।

পোর্টব্লেয়ারের একটা হোটেলে আড্ডা দিলুম আমরা। সত্যি বলতে কী, এবার আমার মনে রীতিমতো আতঙ্ক ছমছম করে উঠেছে। বিশাল সমুদ্রের মধ্যে এক অজানা ছোট্ট দ্বীপ। তার বিভীষিকা মনে এখনই ছায়া ফেলেছে। আমি খুব মনমরা হয়ে গেলুম। পৈতৃক প্রাণটি এবার বেঘোরে না হারাতে হয়।

কর্নেল তো সারাক্ষণ সমুদ্রের ধারে ধারে নানা জাতের কাঁকড়া শামুক সংগ্রহে ব্যস্ত। ডঃ গুটেনবার্গ গাছপালার জঙ্গল ঢুঁড়ে কী খুঁজে বেড়াচ্ছেন। ডঃ হরিহর গড়গড়ির শরীর ভাল নয়। সামুদ্রিক হাওয়া বাতাস নাকি সয় না। ঘরে চুপচাপ বসে প্রকাণ্ড বই পড়ছেন। ভাগ্যিস পরমেশবাবু এসেছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে ঘুরছি। দু'জনে মতলব আঁটছি, শার্ক এসে পৌঁছনোর আগেই একবার জারোয়াদের এলাকায় ঘুরে আসতে পারলে মন্দ হত না। জারোয়ারা আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের এক জংলি উপজাতি। ভারি হিংস্র আর বুনো মানুষ। গভীর জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে। সভ্য মানুষ দেখলেই নাকি বিষাক্ত তির ছোড়ে। তবে আমরা বেশি কাছে যাব না। ওই এলাকাটা একটু দূর থেকে দেখেই চলে আসব।

পরমেশ এখানকার এক বাঙালি ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলে নৌকার ব্যবস্থা করে ফেললেন। পরদিন সকালে আমরা দু-জন যাব। কর্নেল বা আর কাউকে জানাব না, পাছে বাগড়া দেন ওঁরা।

কিন্তু আমাদের ভাগ্যে জারোয়া যাওয়া আর হলো না। সেই রাতেই দেড়টার সময় ঘুম থেকে তুলিয়ে কর্নেল বললেন, শার্ক এসে গেছে। এক্ষুনি বেরুতে হবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পিঠে বোঁচকাবুঁচকি বেঁধে পায়ে হেঁটে আমরা চারজনে প্রথমে ডক এলাকায় গেলুম। শার্কের একজন লোক আমাদের নিয়ে যাচ্ছিল। ডক এলাকার ধারে-ধারে মাইলটাক গিয়ে মেছো জেটির কাছে পৌঁছলুম। ওদিকটায় আলো খুব কম। মাছের আঁশটে গন্ধে গা ঘুলিয়ে যাচ্ছিল। জায়গায়-জায়গায় কাদায় পা ডুবে যাচ্ছিল। তারপর একবারে অন্ধকার চারিদিক। খালি গর্জন শোনা যাচ্ছে সমুদ্রের। পাথরে খাড়ির মধ্যে শার্ক অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু মাস্তুলের মাথায় একটু আলো জুগ জুগ করছে। আমাদের পথ-প্রদর্শক এবার টর্চ জ্বেলে আমাদের একটা ছোট্ট বোটে ওঠাল। খাড়ির মধ্যে প্রচণ্ড ঢেউ। প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছে, আমরা জলে তলিয়ে যাব। ঢেউয়ের ঝাপটায় প্রায় ভিজে গেলুম সবাই। নোনা জলের কুচ্ছিত গন্ধ আর মাঝে মাঝে মুখে ঝাপটা মারা জল এসে ঢুকছে। ব্যাপারটা বড্ড বিরক্তিকর।

তবে মিনিট দশেক এই লাঞ্ছনা পোহাতে হল। আমরা দড়ির সিঁড়ি বেয়ে শার্কে উঠে পড়লুম।

শার্কেই গোপনে কলকাতা থেকে আমাদের রাইফেলের বাক্সটা এসেছে। মোটমাট চারটে রাইফেল আর অজস্র গুলি আনা হয়েছে। ডিনামাইট, গ্রেনেডও আনা হয়েছে। তাছাড়া চারটে রিভলভার আমাদের কাছেই আছে, শুধু গড়গড়ি সায়েবের কোনও অস্ত্র নেই। উনি বেজায় অহিংস মানুষ। নিরামিষ খান। অস্ত্রশস্ত্র দেখে আঁতকে উঠে বললেন—ওরে বাবা! এ যে যুদ্ধের আয়োজন!

পরমেশবাবু মুচকি হেসে বললেন—বরং নৃসিংহবধ পালা বলতে পারেন।

ডঃ গড়গড়ি মনমরা হয়ে গেলেন। বললেন—রক্ষে করুন মশাই। গোলাগুলির মধ্যে আমি নেই।

আমি বললুম—কিন্তু নৃসিংহ ঠেকাবেন কী দিয়ে?

ডঃ গড়গড়ি বললেন—এই বিদ্‌ঘুটে জন্তুটাকে ঘাঁটানোর কী দরকার? জানেন? আমি ওবারেও পইপই করে বলেছিলুম, ওটাকে এড়িয়ে যে যা কাজ করতে এসেছেন করুন। আমি পুরাতাত্ত্বিক জিনিস কিছু পাই নাকি খুঁজি। ডঃ গুটেনবার্গ উদ্ভিদের খবরাখবর জোগাড় করুন। প্রত্যেককে বলেছি এমন কথা। কেউ কান দিলেন না। জন্তুটার গুহার কাছে গিয়ে বেমক্কা গণ্ডগোল বাধিয়ে ছাড়লেন। প্রাণ তো গেলই, কাজ ভণ্ডুল হল—সেটাই বড় কথা কি না বলুন?

কর্নেল বললেন—কিন্তু ডঃ গড়গড়ি, নৃসিংহকে না ঘাঁটালে তার রহস্য কীভাবে ভেদ করতেন বলুন? ডঃ গড়গড়ি বললেন—সেটাই খুঁজে বের করুন। ওকে না ঘাঁটিয়ে...

বাধা দিয়ে ডঃ গুটেনবার্গ ইংরেজিতে বললেন—ভাববেন না ডঃ গড়গড়ি। প্রাণীটাকে এবার আমরা বন্দি করে ফেলব কৌশলে। সে আক্রমণের কোনও সুযোগই পাবে না।

—তা পারলে ভালই হয় কিন্তু আমার বিশ্বাস, ও কাজ মানুষের সাধ্য নয়। বলে ডঃ গড়গড়ি হঠাৎ মাতালের মতো টলতে টলতে আর্তনাদ করে উঠলেন—এ কী! এ কী! সমুদ্রে ভূমিকম্প হচ্ছে যে।

আমরা হেসে উঠলুম। কর্নেল বললেন—না ডঃ গড়গড়ি! জাহাজ চলতে শুরু করেছে।

আমরা খোলের মধ্যে একটা সুন্দর আরামদায়ক ঘরে আছি। শার্কের পাঞ্জাবি মালিক জগদীপ সিং এতক্ষণে আলাপ করতে এলেন। তারপর কফি এল। কফি খেতে খেতে হঠাৎ ডঃ গড়গড়ি বলে উঠলেন—আপনাদের একটা কথা এবার বলা কর্তব্য, যা এ যাবৎ বলিনি। টোরাদ্বীপে গিয়ে আমি প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগের এক প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করেছি। তাই আমার উদ্দেশ্য নৃসিংহ রহস্য ভেদ নয়, সেই সভ্যতার আরও নিদর্শন সংগ্রহ। পৃথিবীকে আমি চমকে দিতে চাই—সুমের মিশর বা মহেনজোদারোর প্রাচীন সভ্যতার চেয়ে আরও পুরনো এক সভ্যতা আমি আবিষ্কার করেছি, যা থেকে প্রমাণিত হবে যে স্থলচর মানুষরা নয়, জলচর মানুষই প্রথম সভ্যতার জনক। রথ নয়, জলযানই প্রথম সভ্যতা বহনকারী।...

মনে মনে বললুম—তাই করুন। সেজন্যেই আপনার মতো রোগা-পটকা লোকের এত উৎসাহ।

ঘটনার ঘোরপ্যাঁচে

আমাদের খোলের মধ্যে প্রায় বন্দির মতো রেখে শার্ক পরদিন মাছ ধরে বেড়াল এখানে ওখানে। তারপর যেন মাছ ধরার উদ্দেশ্যেই চলেছে, এমন ভাব দেখিয়ে জাহাজটা সন্ধ্যানাগাদ টোরাদ্বীপ থেকে তিন মাইলের মধ্যে পৌঁছুল। সেখানে দ্বীপের মতো সমুদ্র থেকে কয়েকটা পাহাড় যেন আচমকা মাথা তুলেই রয়ে গেছে, আর ডোবেনি। ওই এলাকায় কোনও জাহাজ যায় না। খুব বিপজ্জনক এলাকা। প্রচুর ডুবোপাহাড় রয়েছে। একটা পুরনো আমলের পোড়ো লাইটহাউসও দেখা যাচ্ছিল। অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গায় একটা মাথা তোলা পাহাড় থেকে নিরাপদ দূরত্বে শার্ক নোঙর ফেলল। এখানে প্রচুর মাছ আছে নাকি। তবে হাঙরও বড় কম নেই।

সারারাত এখানে কাটল। ভোরবেলা ঘন কুয়াশায় সমুদ্র ও আকাশ একাকার। তার মধ্যে আমাদের ছোট্ট বোট রওনা দিল টোরাদ্বীপের দিকে। শার্কের নাবিকরা খুব অভিজ্ঞ এবং দক্ষ মানুষ। কেরলের লোক। কুয়াশার মধ্যে ডুবোপাহাড় বাঁচিয়ে কীভাবে যে আমাদের টোরাদ্বীপে পৌঁছে দিল, আশ্চর্য ব্যাপার। তবে সমুদ্র এখন শান্ত। তাই বিশেষ নাকানি চোবানি খেতে হল না।

ভারত মহাসাগরের এই এলাকাটা নিরক্ষরেখার কাছাকাছি। তাই শীত ক্রমশ কমে গেছে। আরও দক্ষিণে নিরক্ষরেখা ছাড়িয়ে গেলে আবহাওয়া একেবারে উল্টো। উত্তর গোলার্ধে যখন শীত, দক্ষিণ গোলার্ধে তখন গ্রীষ্মকাল। কাজেই টোরাদ্বীপে যেন চিরবসন্ত বিরাজ করছে।

টোরাদ্বীপের ত্রিভুজের মতো অর্থাৎ পিরামিড-গড়ন দেখে অবাক হলুম। দু'দিকে ঢালু ও খাড়া পাথুরে দেওয়াল, একদিকে—পশ্চিমে খানিকটা বেলাভূমি আছে। সেখানে আমাদের নামিয়ে দিয়ে বোট চলে গেল। কথা থাকল, আমরা উঁচু জায়গা থেকে সাংকেতিক আলো দেখালে শার্ক থেকে আবার বোটটা এখানে চলে আসবে। শার্ক আমাদের জন্যে বাহাত্তর ঘন্টা অপেক্ষা করবে।

কুয়াশা মুছে গেলে দ্বীপের জঙ্গল এবং থমথমে চেহারা দেখে এতক্ষণে আমার গা ছমছম করে উঠল। বালির বিচে দাঁড়িয়ে কর্নেলরা চাপাগলায় কিছু আলোচনা করছিলেন। আমি ও পরমেশবাবু বিচের একটু তফাতে ঘন নারকেলগাছের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছিলুম। হঠাৎ যদি নৃসিংহটা বেরিয়ে এসে হামলা করে, রিভলভার দিয়ে ঠেকানো যাবে কি? রাইফেলগুলো তো এখনও বাক্সতে ভরা।

বোধকরি, সেকথা ভেবেই ডঃ গড়গড়ি গুটেনবার্গ সায়েবের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন। একটু পরে কর্নেল বললেন—চলুন ডঃ গুটেনবার্গ। তাহলে সেখানেই যাওয়া যাক।

রাইফেলের বাক্সটা খোলা হল। গুলি ভরে যে-যার রাইফেল হাতে নিয়ে আশ্বস্ত হলুম। কর্নেল ডিনামাইট-গ্রেনেডের বাক্সটা একহাতে ঝোলালেন। তারপর ডঃ গড়গড়িকে বললেন—ডঃ গড়গড়ি! কিছু যদি মনে না করেন, রাইফেলের খালি বাক্সটা আপনাকে নিতেই অনুরোধ জানাব।

রোগাপটকা মানুষটি যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেটা কাঁধে নিলেন। আমরা কেউ কেউ লুকিয়ে হাসলেও বুঝলুম, বেচারার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু কর্নেল এখন দলের নেতা। তাঁর কথা মেনে চলতেই হবে। আমি দেখেছি, এ সব অভিযানের ক্ষেত্রে কর্নেল একবারে রাশভারি মিলিটারি লোক হয়ে ওঠেন। সেই আমুদে চেহারাটি আর থাকে না।

নারকেল বনটাকে দুর্ভেদ্য মনে হল। অজস্র নারকেল পড়ে আছে এবং দু' এক মিনিট অন্তর দুমদাম করে নারকেল পড়ছে। মাথা বাঁচিয়ে আমরা সাবধানে চলেছি। তারপর অন্যরকম গাছপালার ঘন জঙ্গল শুরু হল। কিন্তু মোটেও সমতল জায়গা নয়। ক্রমশ চড়াই হয়ে উঠে গেছে ওপরের দিকে। মধ্যে মধ্যে বিরাট ন্যাড়া পাথর রয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দরদর করে ঘাম ঝরতে থাকল।

এখন পথপ্রদর্শক ডঃ গুটেনবার্গ। সেবারকার জায়গায় তিনি ক্যাম্প করতে চান না। নতুন জায়গায় নিয়ে গেলেন। ওপরে একটা পাহাড়ি প্রস্রবণ থেকে জলপ্রপাত সৃষ্টি হয়েছে এবং একটা খাদে জমা সেই জল আরও নিচে গড়িয়ে আবার একটা খাদে পড়ছে। সেখানে সমতল পাথরের ওপর আমরা জিনিসপত্র নামিয়ে হাঁফ ছাড়লুম। কাছে মিঠে জল থাকায় জলের অভাবে অন্তত তেষ্টায় মরতে হবে না। অবশ্য নারকেলগাছ রয়েছে নিচের দিকে। ডাবের জলে তেষ্টা মেটানো যায় কিন্তু গাছগুলোর গায়ে ঘন লতাপাতার বেড়া। তাছাড়া অনেক লতা নাকি বিষাক্ত এবং তলায় পড়ে থাকা নারকেল কুড়োতে গিয়ে সেবারে নাকি ডঃ গড়গড়ি সাপের পাল্লায় পড়েছিলেন।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তাঁবু পাতা হল তিনটে। ডঃ গড়গড়ি একা একটা তাঁবুতেই থাকতে চান। সঙ্গীর নাকডাকার শব্দে নাকি ওঁর বড্ড বিরক্তি জাগে। তাছাড়া সারাক্ষণ বই পড়ার স্বভাব। কেতাব সঙ্গে আনতে ছাড়েননি।

সঙ্গে আনা টিনের খাবারে আমরা খিদে মেটালুম এবং প্রকাণ্ড ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢেলে আনন্দে পান করলুম। ক্লান্তি চলে গেল। তারপর কর্নেল নির্দেশ দিলেন—এবার বেরিয়ে পড়া যাক।

সবাই তৈরি। ডঃ গড়গড়ি বললেন—কিন্তু ক্যাম্পে তো একজন থাকা দরকার। অন্তত টিনের খাবারগুলো পাহারা না দিলে দ্বীপের রাক্ষুসে ইঁদুরগুলো সব শেষ করে ফেলবে। তাই না ডঃ গুটেনবার্গ?

ডঃ গুটেনবার্গ বললেন—তাও বটে। সেবারে আমাদের পঞ্চাশটা টিনের কৌটো খালি করে ফেলেছিল ইঁদুরগুলো। একেকটা বেড়ালের মতো প্রকাণ্ড। দাঁত নয় যেন ইস্পাতকাটা করাত।

কর্নেল আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—তাহলে জয়ন্ত বরং পাহারা দাও।

আমি তীব্র আপত্তি জানিয়ে বললুম—কক্ষনও না। এমন কথা তো ছিল না কর্নেল!

ডঃ গড়গড়ি বললেন—আপত্তি করবেন না জয়ন্তবাবু! বরং আপনি আর আমি ক্যাম্পে থাকি। নৃসিংহ বিজয়ে আমার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। বরং আমরা ক্যাম্পে পাহারাও দেব, আবার ধারেকাছে প্রত্নদ্রব্যও খোঁজাখুজি করব। সারা দ্বীপে ভাঙা মৃৎপাত্রের টুকরো ছড়ানো। বিশ্বাস না হয় এই দেখুন!

উনি সত্যিসত্যি পাথরের একটা খাঁজ থেকে একটা খোলামকুচি কুড়িয়ে দেখালেন। আমার দিকে জনান্তিকে চোখ টিপলেন। কর্নেল বললেন—দেরি হয়ে যাচ্ছে। বেশ, তাই হোক। আপনারা দু'জনেই থাকুন। আসুন ডঃ গুটেনবার্গ! আসুন পরমেশবাবু!

ওঁরা পাহাড়ের ওপর দিকে জঙ্গলের আড়ালে অদৃশ্য হলে ডঃ গড়গড়ি একটু হেসে বললেন—খুব বেঁচে গেলেন মশাই! দেখবেন, এক্ষুনি ভিরমি খেতে খেতে পালিয়ে আসবে। ওসব ঝুটঝামেলায় যাওয়ার কী দরকার বলুন না? বরং আসুন, আমরা পটারি কুড়োই। ওই দেখুন কত সব টুকরো পড়ে আছে।

বলে উনি ছেলেমানুষের মতো লাফালাফি করে পাথরের চত্বরে ফাটলগুলো থেকে খোলামকুচি কুড়োতে শুরু করলেন। আমি চুপচাপ মনমরা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি দেখে ঘুরে বললেন—কুড়োন! কুড়োন! দৈনিক সত্যসেবকে ছেপে দেবেন। এসব পটারি অন্তত পাঁচ হাজার বছর আগেকার। হিড়িক পড়ে যাবে মশাই!

একটা ভাঙা খোলামকুচি কুড়িয়ে পরখ করে দেখলুম, সুন্দর নকশার চিহ্ন রয়েছে কিন্তু একটু চাপ দিতেই গুঁড়ো হয়ে গেল। ডঃ গড়গড়ি যা বলেছেন, তাতে সম্ভবত কোনও ভুল নেই। এই মাটির পাত্রগুলো খুবই প্রাচীনকালের। আর এই দ্বীপে যে মানুষ বাস করত তাও জানা যাচ্ছে। বললুম—আচ্ছা ডঃ গড়গড়ি, তাহলে কি নৃসিংহজাতীয় প্রাণীর হাতেই এখানকার অধিবাসীরা কোনও একসময়ে সবংশে মারা পড়েছিল?

ডঃ গড়গড়ি বললেন—সেটা খুবই সম্ভব। তবে আমাদের হাতে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ থাকা চাই। সেই প্রমাণ সংগ্রহ করতেই আমি এত আগ্রহী। নইলে যে বীভৎস ঘটনা চোখের সামনে দেখেছি তারপর কস্মিনকালে এই ভূতুড়ে দ্বীপে কি আর পা বাড়াতে চাইতুম জয়ন্তবাবু? যাক গে, আসুন না। আমরা কাছাকাছি আরও কিছুটা খোঁজাখুঁজি করে দেখি—যদি দৈবাৎ কোনও শিলালিপি কিংবা কোনও মূর্তি বা পুতুল কুড়িয়ে পাই।

আমার আগ্রহ বেড়ে গেছে। তাই পাথরের চাতাল থেকে নেমে গেলুম ওঁর সঙ্গে। ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে চাপা গলায় ডঃ গড়গড়ি বলেন—চারদিকে নজর রাখবেন মশাই। রাইফেলে গুলি পোরা আছে তো?

বললুম—আছে। আপনার উদ্বেগের কারণ নেই ডঃ গড়গড়ি!

—হুঁ। রাইফেল সব সময় তাক করে রাখবেন। বলে উনি ঝোপের ধারে একটা পাথরের ওপর যেই পা রাখলেন, অমনি পা পিছলে গড়াতে গড়াতে নিচের দিকে চললেন। ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে একটা বলের মতো গড়িয়ে নামছেন। দেখে আমি আর হাসি থামাতে পারলুম না।

কিন্তু সর্বনাশ; কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই মধ্যেই গড়গড়ি পাহাড়ের ঢালু বেয়ে ঝোপের আড়ালে কোথায় যেন তলিয়ে গেলেন।

আমিও লাফ দিয়ে সেই পাথরে পড়লুম। তারপর চেঁচিয়ে উঠলুম ডঃ গড়গড়ি! ডঃ গড়গড়ি!

মনে হল, অনেক নিচে থেকে যেন ক্ষীণ স্বরে সাড়া এল। কিংবা আমার কানের ভুল হতেও পারে। ভাবলুম, নিশ্চয় উনি এভাবে পড়ে গিয়ে ভাল রকমের জখম হয়েছেন। অজ্ঞান হয়েই গেছেন হয়তো। তাই যত দ্রুত পারা যায়, নামতে শুরু করলুম।

এবার বোঝা গেল, পাথরগুলো খুব পিছল এবং ওপাশে সেই ঝরনা থাকায় ফার্ন জাতীয় গাছগাছড়া আর শ্যাওলা গজিয়ে আছে। তার ফাঁকে ফাঁকে যত রাজ্যের গাছপালা ও ঝোপঝাড় মাথা তুলেছে। তাই নিচের দিকে কিছু দেখা যাচ্ছে না।

নামতে নামতে ফের চেঁচিয়ে ডাকলুম—ডঃ গড়গড়িকে দেখতে পেলুম না। যেখানে পৌঁছেছি, সেখানে মোটামুটি সমতল জায়গা এবং সেই নারকেল বনটা শুরু হয়েছে। তার ফাঁক দিয়ে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। আবছা তার গর্জন কানে আসছে। প্রচণ্ড জোরে হাওয়া বইছে তার ফলে নারকেল পড়ছে। ক্রমাগত বোম্ পটকার মতো আওয়াজ হচ্ছে। এখানে দাঁড়ানোও নিরাপদ নয় আমার পক্ষে। কখন মাথার ওপর নারকেল পড়ে কুপোকাত হয়ে যাব ঠিক নেই।

আমি ফের ওপরে উঠে দু'পাশে চোখ বুলিয়ে ডঃ গড়গড়িকে খুঁজতে থাকলুম। কিন্তু আশ্চর্য, ভদ্রলোক যেন বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

আমার বুক কেঁপে উঠল এতক্ষণে। মনে হলো, দ্বীপের গাছপালা ঝোপজঙ্গল পাথরের আড়াল থেকে কে বা কারা যেন চুপি চুপি আমাকে দেখছে। কাঁপা-কাঁপা হাতে রাইফেলটা শক্ত করে বাগিয়ে আবার চেঁচিয়ে ডাকলুম—ডঃ গড়গড়ি!

আমার ডাক পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হতে হতে মিলিয়ে গেল। কোনও সাড়া এল না। তখন ক্যাম্পের দিকে উঠতে শুরু করলুম।

উঠে এসে পাথরের চওড়া চাতালে দাঁড়িয়ে হাঁফ সামলাচ্ছি, হঠাৎ চোখে পড়ল এক বিদ্‌ঘুটে দৃশ্য।

প্রথমে ভাবলুম খরগোশের পাল। তারপর মনে হল, বেড়াল। কিন্তু বেড়ালের মুখ এমন লম্বাটে হবে কেন? হঠাৎ মনে পড়ে গেল, এই দ্বীপে প্রকাণ্ড ইঁদুরের কথা শুনেছি। এরা সেই রাক্ষুসে ইঁদুরই বটে।

ইঁদুরগুলো ঠিক মানুষের ভঙ্গিতে তাঁবুর ভেতর থেকে টিনের কৌটো পিঠে নিয়ে বেরিয়ে আসছে এবং একটা ফাটল দিয়ে অদৃশ্য হচ্ছে। দুধের কৌটো, জেলির কৌটো, রান্না করা মাংসের কৌটো আর পাউরুটির পকেট—সব একত্রে লুঠ হয়ে যাচ্ছে।

দৌড়ে গিয়ে তাদের মধ্যে পড়তেই বেয়াদপ ইঁদুরগুলো চারপাশ থেকে আমাকে ঘিরে ধরে হাঁটু অবধি লাফ দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করতে থাকল আর কামড় দিল।

ভাগ্যিস পায়ে হান্টিং বুট ছিল। হাঁটু অবধি শক্ত চামড়ার বর্ম এবং প্যান্টের কাপড়টাও বেশ শক্ত। দাঁত বসল না। কিন্তু ওদের বেয়াদপিতে মাথা খারাপ হয়ে গেল। আমি লাথি ছুড়তে থাকলুম। লাফালাফি করে বেজায় চেঁচামেচিও শুরু করলুম। কিন্তু তাতে ওরা আরও খাপ্পা হয়ে আমার পা আঁকড়ে গায়ে ওঠার চেষ্টা করতে লাগল।

এমন পাজি হতচ্ছাড়া ইঁদুর তো দেখা যায় না ভূ-ভারতে। এরা আমাকে নাকাল করে ছাড়বে দেখছি। বড় জন্তু হলে রাইফেল ছোড়া যায়। অগত্যা পাথরে গড়াগড়ি দিয়ে ওদের কাবু করার জেষ্টা করলুম। রাইফেল পড়ে রইল। চোখ বুজে রইলুম। পাছে ওরা চোখের ভেতর নখ বসিয়ে দেয়।

তারপর কী ঘটল কে জানে, চোখ বুজে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ টের পেলুম ইঁদুরগুলো চলে যাচ্ছে। আপনি চোখ খুলে তাকালুম। সামনে ফাটলের মুখে সম্ভবত ইদুরটি কাঁধে একটা প্যাকেট নিয়ে লাফ দেওয়ার তাক করছে—কিন্তু প্যাকেটটা ফাটলের তুলনায় বড় বলে আটকে যাচ্ছে।

ইচ্ছে হল, বলি—ওরে নির্বোধ! ওরে হতচ্ছাড়া গবেট! ওটা খাবার নয়, ওটা চুরুটের প্যাকেট। ওই চুরুটের মালিক কে জানিস? প্রখ্যাত বুড়ো ঘুঘু কর্নেল নীলাদ্রি সরকার! অতএব, যদি প্রাণে বাঁচতে চাস, ওটা রেখে যা। ওরে মূর্খ! তুই কোথায় ওটা লুকিয়ে রাখবি? লুকিয়েও পার পাবি? বুড়ো গোয়েন্দপ্রবর পাতাল হাতড়ে ঠিকই উদ্ধার করে তোকে হাতকড়া পরিয়ে ছাড়বেন! সাবধান! সাবধান!

ইঁদুরটা কি আমার মনের কথা টের পেল? চুরুটের বাক্সটা রেখে ফাটল গলিয়ে চলে গেল। আমি উপুড় হয়ে আছি। এবার উঠে বসার জন্য যেই ঘুরেছি কোমরে একটা ভারী জিনিস পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরিয়ে দেখি, একটা বেঁটে খ্যাঁদানেকো মোটাসোটা লোক আমার কোমরে একটা ঠ্যাং চাপিয়ে আমার রাইফেলটা তুলে নিল।

তার চেহারা চিনাদের মতো। কিন্তু সে চিনা কি না বোঝা কঠিন। কারণ সারা পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার লোকেদের এমনি চেহারা ও গড়ন। তার হাতে একটা স্টেনগান, পরনে সবজে মিলিটারি পোশাক এবং চোখে সানগ্লাস।

আমি আপত্তি করে ইংরেজিতে বললুম—এটা কী হচ্ছে? অ্যাঁ? পা সরাও বলছি।

লোকটা দাঁত বের করে হেসে দুর্বোধ্য ভাষায় কী বলল এবং পা তুলে নিয়ে আমাকে দাঁড়াতে ইশারা করল।

উঠে দাঁড়িয়ে দেখি, সে একা নয়। আরও একজন অমনি চেহারা ও পোশাকপরা সশস্ত্র লোক ক্যাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এবং চোখে বাইনোকুলার রেখে সমুদ্রের দিকে কী দেখছে।....

নৃসিংহের গর্জন

আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। এটা আমার বোকামিরই খেসারত। যদি সতর্কভাবে চারদিকে নজর রাখতুম এবং ইঁদুরের দলে ঢুকে না পড়তুম, এই কাণ্ডটি হত না। এখন একমাত্র ভরসা কর্নেলরা যদি এখনই ফিরে আসেন।

তবে জানি না, কীভাবে এদের হাত থেকে আমাকে বাঁচাবেন। আমি প্রাণের আশা ছেড়ে দিলুম।

বাইনোকুলার নামিয়ে রেখে দ্বিতীয় লোকটি আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর ভাঙাভাঙা ইংরেজিতে বলল—গুড মর্নিং! আপনার নাম কী?

তার কথায় ভদ্রতার সুর আছে। জবাব দিলুম—আমার নাম জয়ন্ত চৌধুরি। আমি কলকাতার একটি দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিক। আপনারা কে? কেনই বা এভাবে হামলা করছেন?

লোকটি বলল—সেকথা পরে। যা জিজ্ঞেস করছি, অনুগ্রহ করে তার জবাব দিন। আপনাদের সঙ্গে একজন মেডিকেল সার্জন এসেছেন, তিনি কোথায়?

বুঝলুম, ডঃ পরমেশ পুরকায়স্থের কথা বলছে। বললুম—তিনি একটু আগে বেরিয়েছেন।

ওরা দু'জনে পরস্পর দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু বলাবলি করল। তারপর বাইনোকুলারধারী এগিয়ে এসে আমার হাতটা নিয়ে হ্যান্ডশেক করে বলল—যদি কোনও ত্রুটি ঘটে থাকে, অনুগ্রহ করে ক্ষমা করবেন। আচ্ছা, আবার দেখা হবে।

বলে সে তার সঙ্গীকে ইশারা করল। সঙ্গীটি কিন্তু আমার রাইফেলটা ফেরত না দিয়ে চলতে শুরু করল। তখন বলে উঠলুম—এ কি! আমার রাইফেল নিয়ে যাচ্ছেন কেন?

দু'জনেই ঘুরে একটু হাসল। কিন্তু কিছু বলল না। ক্যাম্পের ওপাশে গিয়ে চড়াইয়ে উঠল। তখন আমি পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে চেঁচিয়ে বললুম—রাইফেল না দিলে গুলি ছুড়ব বলে দিচ্ছি।

বাইনোকুলারধারী তার হাতের স্টেনগান বাগিয়ে রূঢ়কণ্ঠে বলল—মরতে সাধ থাকলে তাই কর বোকারাম!

হুঁ, ঠিকই বলেছে, ওরা দু'জন, আমি একা। দু'জনেরই হাতে স্টেনগান। একজনকে বড়জোর গুলি ছুড়ে কাবু করতে পারি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্যজন স্টেনগানের গুলিতে আমার শরীর ঝাঁঝরা করে ফেলবে। অতএব চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলুম।

লোকটা স্টেনগান আমার দিকে তাক করে বলল—রিভলভার পকেটে ঢোকাও। ভদ্রলোকদের প্রতি ভদ্রব্যবহার করাই আমার রীতি।

ভাল ছেলের মতো রিভলভার ঢুকিয়ে দেখি, ওরা পাহাড়ের গায়ে একটা খোঁদলে আমার রাইফেলটা রাখল। তারপর বাইনোকুলারধারী হাসতে হাসতে বলল—তোমার মতো নির্বোধের হাতে রাইফেল থাকলে নিজেরই বিপদ ঘটবে। তাই ওটা নিরাপদ দূরত্বে রেখে গেলাম। আমরা চলে যাওয়ার পর তুমি এসে নিয়ে যেও। কেমন?

রাগ হলেও বুঝলুম, কথাটা ঠিকই বলেছে, রাইফেলটা তখনই ফেরত দিলে হয়তো আমি ঝোঁকের বশে কী করে বসতুম, বলা যায় না।

ওরা পাহাড়ের ওপাশে অদৃশ্য হলে রাইফেলটা নিয়ে এলুম। তারপর ভাবতে বসলুম এতক্ষণ কি একটা বিদঘুটে স্বপ্ন দেখছিলুম? কে ওরা? কেন পরমেশবাবু এসেছেন কি না জানতে এসেছিল? অজ্ঞাত আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠল।

আর ডঃ গড়গড়িই বা কোথায় গেলেন?

এতক্ষণ পরে মনে পড়ল, কিছু ঘটলে তিনবার বাঁশি বাজিয়ে সংকেত জানানোর কথা আছে। তাই পকেট থেকে হুইসলটা বের করে ফুঁ দিলুম। পরপর দিনবার।

তারপর দেখি, পাহাড়ের ওপর দিকে একটা চাতালের ওপর কর্নেল উঁকি দিচ্ছেন এদিকে। চোখে বাইনোকুলার। আমি ওঁকে দেখামাত্র বাজখাঁই চেঁচিয়ে ডাকলুম—কর্নেল! কর্নেল! শিগগির আসুন আপনারা! ভীষণ বিপদ!

আমার কথাগুলো বিকট প্রতিধ্বনি তুলল।

কিন্তু মিনিটের পর মিনিট কেটে গেল। ওঁদের আর পাত্তা নেই। কর্নেল সেই যে উঁকি মেরে অদৃশ্য হলেন তো হলেন। রাগে দুঃখে ছটফট করতে থাকলুম। অস্থিরভাবে পায়চারি করে সব দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখলুম। এখান থেকে নারকেল বনের মাথার ওপর দিয়ে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। অনন্ত বিশাল জলের ফেনায় ওপর সূর্যের আলো ঝকমক করে উঠছে। 'শার্ক' কোথায় অপেক্ষা করছে, দেখতে পাচ্ছি না। দিগন্তে দু' একটা কালো ঢিবির মতো পাহাড় মাঝে মাঝে ঢেউয়ের ফাঁকে ডুবছে আর ভেসে উঠেছে। আর ডাইনে দূরে এই দ্বীপের খাড়ির ওপর অজস্র সামুদ্রিক পাখি ওড়াউড়ি করছে, তাদের তীক্ষ্ণ চিৎকার হাওয়ায় ভেসে আসছে।

সবচেয়ে খারাপ লাগছে, আমাদের খাদ্য ভাণ্ডারটি লুঠপাট হওয়ার কথা ভেবে। কপালে কর্নেলের বকুনি তো আছেই। আমি দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করতে পারিনি। অতএব ওপর রাগ করা আমার সাজে না।

প্রায় একটি অস্থির ঘণ্টা কেটে গেল। তারপর কর্নেলেরা ফিরলেন।

আমি প্রায় এক নিঃশ্বাসে পুরো ঘটনা জানিয়ে দিলুম। ওঁরা তিনজনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর কর্নেল বললেন—হুম্! তাহলে ডঃ গুটেনবার্গ, বোঝা যাচ্ছে আমার ধারণায় কোনও ভুল নেই। এ নিশ্চয় টংকু আরেগোনার দল না হয়ে যায় না। কিন্তু ওরা পরমেশবাবুর সম্পর্কে এত আগ্রহী কেন?

পরমেশবাবু ভয় পেয়েছেন মনে হল। মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ডঃ গুটেনবার্গ

বললেন—আচ্ছা ডঃ পুরকায়স্থ, আপনি তো একবার ভিয়েনায় বিশ্ব চিকিৎসাবিজ্ঞানী সম্মেলনে বলেছিলেন হৃদ্‌যন্ত্র যেমন বদল করা যায় শরীরে, তেমনি মাথাও বদল করা যায়।

পরমেশবাবু বললেন—হ্যাঁ, এ ব্যাপারে কিছুটা পরীক্ষা করে দেখার পরই ওই সিদ্ধান্তে এসেছিলুম। ধরুন, দুর্ঘটনার ফলে কারও মাথায় আঘাত লাগল এবং পরিণামে মস্তিষ্কের রোগ দেখা দিল। কিংবা মনে করুন, আগের সব কথা সে ভুলে গেল। সেক্ষেত্রে তার মস্তিষ্ক বদল সম্ভব। তবে মানুষের বেলায় কিন্তু মুশকিলটা কী হবে জানেন? সুস্থ মস্তিষ্ক পাওয়া যাবে কোথায়? রামের মাথায় আঘাত লেগে মগজ বিগড়েছে বলে শ্যাম তো নিজের মগজ দান করতে যাবে না। কারণ তার মানে তাকে মরতে হবে! অবশ্য একটা উপায় আছে। কোনও সদ্যমৃত মানুষের মস্তিষ্ক ব্যবহার করা যায়। কিন্তু তাই বা তার আত্মীয়রা দিতে চাইবেন কেন?

কর্নেল একটু হেসে বলেন—এই মগজ বদল নিয়ে উপভোগ্য গল্পের বই আছে। যাক্‌গে, পরমেশবাবু, আপনার পরীক্ষার কথা বলুন।

পরমেশবাবু বললেন—আমি একটা কুকুরের মগজ বদল করেছিলুম। দুটো কুকুরই দুর্ঘটনায় মারা পড়েছিল। একটার মাথা অক্ষত ছিল, অন্যটার মাথা ট্রাকের চাকার ধাক্কায় জখম হয়েছিল। আমি দ্বিতীয় কুকুরটার মাথা অপারেশন করে প্রথম কুকুরটার মগজ বসিয়ে দিয়েছিলুম।

কর্নেল আগ্রহে বললেন—তারপর, তারপর?

—কুকুরটা ঘণ্টা দশেক বেঁচে ছিল। তারপর মারা যায় ফের। তবে দেখুন, শুধু মগজ কেন, মানুষ হয়তো একদিন পুরো মাথাই বদলাতে পারবে। উদোর মাথা বুধোর ঘাড়ে বসিয়ে দেবে! কেন? আমাদের পৌরাণিক গল্পে গণেশের মাথার আশ্চর্য কাহিনী ভুলে যাচ্ছেন? শনির দৃষ্টি লেগে গণেশের মাথাটি উড়ে গেল। তখন ঐরাবতের মাথা কেটে এনে জোড়া দেওয়া হল। গণেশের মাথাটি তাই হাতির। আমার কেমন যেন সন্দেহ, প্রাচীন ভারতের শল্য চিকিৎসকরা সম্ভবত এসব নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। তা না হলে এমন কাহিনীর অর্থ কী?

ডঃ গুটেনবার্গ বললেন—আমি কিন্তু ওটা কাহিনী বলে মনে করিনে। ওটা একটা প্রকৃত ঘটনা!

কর্নেল বললেন—কেন বলুন তো?

ডঃ পুরকায়স্থের বাবা এই দ্বীপে দশাবতার ফলক কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। এই দ্বীপেই আমরা নৃসিংহের মতো বিচিত্র প্রাণীর দেখা পেয়েছি—যার মূর্তি ওই ফলকে ছিল এবং সম্প্রতি চুরি গেছে।

—আপনি কী বলতে চান ডঃ গুটেনবার্গ?

—ধরুন, এই প্রাচীন অধিবাসীরা শল্যবিদ্যায় এত দক্ষ ছিল যে তারা মানুষের ধড়ে সিংহের মুণ্ডু বসিয়ে এই নৃসিংহ নামক প্রাণী সৃষ্টি করতে পেরেছিল এবং সেই নৃসিংহের বংশধরকে আমরা দেখতে পেয়েছি।

—বেশ। তাই মানলুম। তারপর?

—কে বলতে পারে, ওই দশাবতার ফলকে নৃসিংহ মূর্তিটির মধ্যেই শল্যবিদ্যার সেই রহস্যময় পদ্ধতি সাংকেতিক ভাষায় দ্বীপবাসীরা রেখে গেছে কি না!

—আপনার কথায় যুক্তি আছে! বলে যান ডঃ গুটেনবার্গ!

—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি যে কুখ্যাত টংকু আরেগোনার দলের কথা বললেন—যারা দেশবিদেশের চোরাই প্রত্নদ্রব্যের কারবার করে—তারা কোনও সূত্রে দশাবতার ফলকে নৃসিংহ মূর্তির মধ্যে সাংকেতিক লেখাগুলোর রহস্য টের পেয়েছে এবং তাই সেই পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। অতএব আপনি ওদের জন্য নৃসিংহ সৃষ্টি করে দেবেন।

আমি অবাক হয়ে বললুম—ওরা নৃসিংহ নিয়ে করবেটা কী?

জবাবটা দিলেন কর্নেল। হাসতে হাসতে বললেন—জয়ন্ত, নৃসিংহের চেয়েও বিচিত্র প্রাণী এই মানুষ। সবাইকে তাক লাগিয়ে কিছু করতে পারলে সে আর কিছু চায় না। বিশেষ করে টংকু

আরেগোনা শুনেছি খুব খামখেয়ালি লোক। সে হয়তো ভেবেছে, এরপর নৃসিংহ-চালানী কারবার ফেঁদে বসবে।

—কী কাণ্ড! কিনবেটা কে?

—কেন? সার্কাস কোম্পানিগুলো কিনবে। আর কিনবে সারা বিশ্বের সব চিড়িয়াখানা।

ডঃ গুটেনবার্গ বললেন— আপনার কথায় তামাশার সুর থাকলেও সত্যি হতে পারে।

কর্নেল বললেন—আলবাৎ পারে। টংকু আরেগোনা খুব খামখেয়ালি লোক। একবার তার মাথায় কিছু ঢুকলে তাই নিয়ে পাগল হয়ে যায়। সিঙ্গাপুরে তার কিউরিও শপে একবার আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আরেগোনা কথাটা যে আসলে অর্জুন, তার কাছেই শুনেছি। সে খুব গর্ব করে বলেছিল—জানেন কর্নেল? আমার পূর্ব-পুরুষরা ভারতেরই লোক।

এবার আমি বললুম—কিন্তু কর্নেল, আপনার তো দিব্যি গপ্পগাছা চালাচ্ছেন—এদিকে ডঃ গড়গড়ি বেচারার কী হল, খুঁজে দেখা উচিত নয় কি?

কর্নেল হো হো করে হেসে উঠলেন। আমি তো অবাক।

ডঃ গুটেনবার্গ বলনে—জয়ন্তবাবু, ডঃ গড়গড়ির জন্য ভাববেন না।

—সে কী?

—উনি আপনাকে বোকা বানিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন আসলে। ওঁর পদস্খলন এবং পতন একটা চালাকি।

—তার মানে?

—কর্নেল বললেন—ডার্লিং! ডঃ হরিহর গড়গড়ি বহাল তবিয়তে কলকাতায় রয়েছেন। ডঃ গড়গড়ি আমার কাছে গিয়েছিলেন নৃসিংহের ছবি নিয়ে তিনি—অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে যিনি এসেছিলেন স্রেফ নকল ডঃ গড়গড়ি। আমারই পরামর্শে ডঃ গুটেনবার্গ ওঁকে জাল জেনেও অভিনয় চালিয়ে যান।

—অসম্ভব! ডঃ গড়গড়িকে আমি চিনি! আমার ভুল হতে পারে না। আমি ওঁকে একবার...

—বৎস জয়ন্ত, কবে একবার দেখেছ এবং সম্ভবত এশিয়াটিক সোসাইটির সভায় দূর থেকে বক্তৃতা নোট করেছে—তাই দিয়ে কিছু প্রমাণ হয় না।

—কিন্তু চেহারা তো মনে আছে। ধরে নিচ্ছি, মাইক্রোফোনে আসল কণ্ঠস্বর না হয় ধরা যায়নি।

—হুঁ, এই নকল লোকটি আসল লোকের মতো দেখতে, এই যা।

—ওরে বাবা! বলেন কী! এই জাল গড়গড়ি লোকটা কে তাহলে?

—লালবাজারের গোয়েন্দাকর্তা আনোয়ার খানের কাছে পরমেশবাবুর সেই ঠ্যাকুরমশাই সব কবুল করেছেন। ফলক চুরি ঠাকুরমশাই করেছিলেন জাল গড়গড়ি অর্থৎ শ্রীযুক্ত বনবিহারী রায়ের টাকা খেয়ে। এই রায়মশাই একজন কুখ্যাত চোরাচালানী পাণ্ডা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও হংকং থেকে প্রচুর জিনিস চোরাচালানে ভারতে যায়। সেই সূত্রে টংকু আরেগোনার সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ ছিল।

—যাক গে। প্রচুর জ্ঞান হল। কিন্তু বনবিহারী নৃসিংহের ছবি পেল কোথায়?

—ডঃ গুটেনবার্গ যখন নার্সিং হোমে ছিলেন, ওঁর পার্ক স্ট্রিটের ফ্ল্যাট থেকে ছবিটা চুরি গিয়েছিল। পরে যখন সে ডঃ গড়গড়ি সেজে আমাদের দলে ভিড়ল, ডঃ গুটেনবার্গ তাকে দেখে অবাক। আমি ওঁকে পরামর্শ দিলুম, চেপে যান। তবে বনবিহারী এ রিস্ক নিয়েছিল, কারণ তার চেহারা অবিকল ডঃ গড়গড়ির মতো। তাছাড়া সে ভেবেছিল, সাহেবদের এ ব্যাপারে ঠকানো সোজা।

একটু রাগ দেখিয়ে বললুম—তাহলে গোড়া থেকেই সব জানতেন অথচ আমাকে কিছু বলেননি। বললে আমি নজর রাখতুম ওর দিকে। অন্তত ডঃ গুটেনবার্গও যদি একটু আভাস দিতেন।

কর্নেল আমার একটা হাত নিয়ে আদর করে বললেন—বৎস জয়ন্ত! বেশি জানলে মাথার ঠিক থাকে না। মাঝে মাঝে মানুষের যত কম জানা হয়, তত মঙ্গল। যাক গে, তুমি অনেক হেনস্থা হয়েছ মানুষ ও ইঁদুরের হাতে। এবার একটু বিশ্রাম করো। আর আসুন পরমেশবাবু, আসুন ডঃ গুটেনবার্গ! আমরা শাবল গাঁইতিতে হাত লাগাই। বদমাশ লুঠেরা ইঁদুরদের গর্ত থেকে লুঠের মালগুলো উদ্ধার করা যাক। নইলে কিছু খেতে পাব না।

তিনজনে শাবল ও গাঁইতি নিয়ে পাথরের চাতালে সেই ফাটলটার কাছে গেলেন। এবং হেঁইয়ো হেঁইয়ো করে বড় বড় পাথরের টুকরো ওপড়াতে শুরু করলেন।

তারপরই তখনকার মতো বিদঘুটে দৃশ্য দেখা গেল। ইঁদুরগুলোর সঙ্গে তিনটি মানুষের জব্বর লড়াই বেধে গেল। তিনজনেই শাবল ও গাঁইতি চালিয়ে প্রচণ্ড পরাক্রমে ইঁদুরদের নিধনযজ্ঞে মেতে উঠলেন। বেগতিক দেখে বেচারারা কোথায় গা ঢাকা দিলে শেষমেশ।

সাতটা ইঁদুর হত। লেজ ধরে নিচে ছুড়ে ফেলা হল। আহতগুলো কোনওরকমে পালিয়ে গেল। আমি ক্যাম্পখাটে শুয়ে ব্যাপারটা খুব উপভোগ করলুম। কিছুক্ষণ পরে উদ্ধারকরা টিনগুলোর মুখ কেটে সবে সবাই খেতে বসেছি, হঠাৎ পাহাড়ের ওপর দিকে অমানুষিক জান্তব গর্জন শুনে চারজনে আঁতকে উঠলুম।

সেই ভয়ঙ্কর গর্জনের কোনও তুলনা হয় না। যেন একশোটা সিংহ একসঙ্গে আকাশ ফাটিয়ে পাহাড় কাঁপিয়ে হুঙ্কার দিচ্ছে।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে ব্যস্তভাবে বললেন—চলে আসুন সবাই। নৃসিংহ ফাঁদে পড়েছে।

নৃসিংহ না গরিলা?

আগেই বলেছি, দ্বীপটা সমুদ্র থেকে পিরামিডের মতো মাথা তুলেছে এবং তার গায়ে আগাগোড়া ঘন জঙ্গল—কোথাও কোথাও ন্যাড়াপাথর আছে এই যা।

নৃসিংহের ফাঁদের কাছে পৌঁছতে প্রায় পাঁচশো ফুট চড়তে হল। ঢালু বলে তত কষ্ট হল না। সমুদ্রতল থেকে আন্দাজ আটশো ফুট উঁচুতে বলে সবসময় প্রচণ্ড জোরে হাওয়া বইছে। কিন্তু এখানে উঁচু উঁচু গাছের জঙ্গল রয়েছে। ফাঁদটা পাতা হয়েছে সেই জলপ্রপাতের দিকে। ফাঁদ মানে একটা গভীর গর্তের মধ্যে শক্ত স্প্রিং দেওয়া জাঁতাকল। গর্তের ভেতরটা অন্ধকার। সেখান থেকে মুহুর্মুহু গর্জন করছে প্রাণীটা। কানে তালা ধরানো সেই গর্জন। হৃদপিণ্ডে খিল ধরে যাওয়ার জোগাড় হচ্ছে আমার। গোটা পাহাড়টা যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। কর্নেল ব্যস্তভাবে বললেন—ডঃ গুটেনবার্গ! এবার আর দেরি না করে আপনার ঘুমপাড়ানি গুলি ছুড়ুন।

ডঃ গুটেনবার্গ ওঁর রিভলভারের নলের মুখে একটা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ এঁটে ট্রিগার টিপলেন। হিস্ করে একটা শব্দ হল।

প্রায় পাঁচমিনিট কেটে গেল। তারপর প্রাণীটার আর কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

কর্নেল বললেন—আসুন, এবার গর্তে নেমে প্রাণীটাকে ভাল করে দেখা যাক। জয়ন্ত, তুমি চারদিকে নজর রেখে পাহারা দাও। সাবধান, এবার আর বোকামি কোরো না।

আমি বেজার মুখে বললুম—নৃসিংহ দেখার ইচ্ছে বুঝি আমার নেই?

কর্নেল হেসে বললেন—দেখবে বৎস, দেখবে। প্রাণভরে দেখতে পাবে। কীভাবে ওকে টেনে তুলব, আগে দেখে আসতে দাও।

ওঁরা তিনজনে গর্তের ধারের পাথর আঁকড়ে নামতে থাকলেন। গর্তটা খুব গভীর এবং প্রকাণ্ড।

এ গর্ত কোন আদিম যুগে ভূমিকম্পের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে হয়তো। চারধারে ঘন ঝোপ ও গাছ থাকায় হঠাৎ কারও নজরে পড়া সম্ভব নয়। গর্তের মুখের উপর অনেকটা জায়গা জুড়ে ডালপালা ছড়িয়ে রয়েছে। তাই বেচারা নৃসিংহ আচমকা...

আমার ভাবনা বাধা পেল। না—আচমকা নয়। গর্তের এধারে অনেকগুলো সেই রাক্ষুসে ইঁদুরের টোপ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে দেখতে পেলুম। ও হরি! তাহলে নৃসিংহ এইসব ইঁদুর কড়মড়িয়ে খেয়েই বেঁচে আছে। এককেটা ইঁদুরের ওজন কমপক্ষে দু' আড়াই কিলোর কম নয়। কটা খেলে ওর পেট ভরে কে জানে।

ইঁদুরের লোভেই বেচারা হুড়মুড় করে এসে ফাঁদে পড়েছে। নিশ্চয় ওর এই খাদ্যের ব্যাপারটা ডঃ গুটেনবার্গ জানতেন।...

এই সময় হঠাৎ আমার চোখ গেল এই দ্বীপ পাহাড়ের পূর্বে—সমুদ্রের দিকে।

দেখি, একটা ছোট্ট স্টিমবোট ঢেউয়ে দুলছে। স্টিমবোটের গড়ন একটা লম্বাটে মাকুর মতো। ওতেই কি টংকু আরেগোনা বা অর্জুনের লোকেরা এসেছে? দেখে মনে হল, বোটটা অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে।

আমি বোটের দিকে নজর রেখেছি, এমন সময় আমার পিছনে কোথাও একটা শব্দ হল। সম্ভবত একটা পাথর গড়াতে গড়াতে পড়ল। অমনি ঘুরে দাঁড়ালুম।

এক পলকের জন্য দেখলুম, ওপারে গাছপালার মধ্যে একটা বড় পাথরের আড়ালে ডঃ গড়গড়ির মুখটা স্যাঁৎ করে সরে গেল। আমি চেঁচিয়ে উঠলুম—হ্যালো বনবিহারীবাবু!

অমনি আমার দুপাশে দুমদাম আওয়াজ করে কেউ গুলি ছুড়ল। একলাফে গর্তের ধারে একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে ডাকতে থাকলুম—কর্নেল! কর্নেল!

ভেতর থেকে গমগমে আওয়াজে কর্নেলের সাড়া এল—কী হয়েছে জয়ন্ত?

—বনবিহারী গুলি ছুড়ছে।

—তুমি গুলি ছুড়ে বোসো না তাই বলে। সাবধান।

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম—ভাল বলেছেন বটে! আমি...

আমাকে থামিয়ে দিয়ে মাথার ওপরকার পাথরের চটা ছাড়িয়ে ফের বনবিহারীর গুলি কুচ্ছিত আওয়াজ দিল। সঙ্গে সঙ্গে গর্তে ঝাঁপ দিলুম।

তারপর পড়েছি একটা নরম বা শক্ত জান্তব কিছুর ওপর। নাকি ঘাসের জঙ্গলে? টর্চ জ্বলে উঠল। কর্নেল বললেন—সরে এস জয়ন্ত। তুমি বেচারার পেটের ওপর পড়ে আছ!

তাকিয়ে দেখেই আঁতকে সরে গেলুম।

গর্তটা ভেতরে খুব চওড়া। মধ্যিখানে দু'পা ছড়িয়ে ফাঁদের স্প্রিংয়ে মাথা রেখে কাত হয়ে শুয়ে আছে একটা দানবাকৃতি প্রাণী। শরীরটা বিশাল গরিলার মতো—কিংবা লোমওয়ালা মানুষেরই মতো—কিন্তু মাথাটা সিংহের মতো। বড় বড় দাঁত ছরকুটে চোখ বুজে কাঠ হয়ে আছে। মাথাটা ঢাকের মতো বড়। ঘন ধূসর রঙের কেশরে ঢাকা। দুই পায়ের গোড়ার স্প্রিংয়ের দাঁত আটকে রয়েছে স্পিংয়ের পাতের সঙ্গে একটা মোটা লোহার শেকল কোণের দিকে লোহার গোঁজে আটকানো আছে। ফাঁদটা চমৎকার পাতা হয়েছিল বটে।

টর্চের আলো নিভিয়ে কর্নেল বললেন—নৃসিংহ দর্শন হল তো জয়ন্ত?

—হল। কিন্তু ওপরে বনবিহারী যে ওত পেতে আছে!

—থাক। আমরা ওপরে আর উঠছি না।... বলে কর্নেল পরমেশবাবুর দিকে ঘুরে বললেন—তাহলে আপনি বলতে চান, যাকে আমরা নৃসিংহ বলছি—তা আসলে মালয় দ্বীপপুঞ্জের অধুনালুপ্ত একজাতের গরিলা ছাড়া কিছু নয়?

পরেমেশবাবু বললেন—আমার তাই অনুমান। প্রাণীবিজ্ঞান আমাকে পড়তে হয়েছে। সেই জ্ঞানমতেই একথা বলছি। অবশ্য সিংহের মাথা মানুষের শরীরে জোড়া দেওয়া বিজ্ঞানের তত্ত্বর দিক থেকে সম্ভব হতেও পারে। কিন্তু এ প্রাণী গরিলা ছাড়া আর কিছু নয়। যেটা আপনারা সিংহের কেশর ভাবছেন, ওটা গরিলারই চুল। মালয় দ্বীপপুঞ্জ এলাকার গরিলাদের মাথায় মানুষের মতো চুল ছিল। আর ওর চোয়াল লক্ষ্য করুন। সিংহের চোয়ালের সঙ্গে কোনও মিল নেই। দাঁতের গড়ন দেখুন। প্রত্যেকটা দাঁত সমান। মানুষের মতো চোয়ালের দাঁতগুলো ভোঁতা। এ একটা গরিলাই বটে।

ডঃ গুটেনবার্গ বললেন—তা হোক। তবে এও একটা বিস্ময়কর আবিষ্কার বই কি।

কর্নেল বললেন—তা আর বলতে! যাক গে, এর ঘুম অন্তত পাঁচ ঘন্টা ভাঙবে না। এর মধ্যে একটা ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে। চলুন, আমরা বেরিয়ে পড়ি। তারপর...

আমি বাধা দিয়ে বললুম—বেরুবেন কীভাবে? ওপরে বনবিহারীরা তাক করে আছে।

কর্নেল বললেন—এস তো আমার সঙ্গে। ঠিক বেরিয়ে যেতে পারবে নিরাপদে। ততক্ষণে ভেতরের অন্ধকার অতটা মালুম হচ্ছে না। এর কারণ আবিষ্কার করে খুশিতে নেচে উঠলুম। সামনে দেওয়ালের প্রকাণ্ড ফাটল দিয়ে আবছা আলো আসছে। সে পথে আমরা সার বেঁধে এগিয়ে চললুম। কিছুক্ষণ পরে সুড়ঙ্গপথ থেকে বেরিয়ে দেখি, জলপ্রপাতের কাছে এসে পৌছেছি, কর্নেল বললেন—তখন ফাঁদ পাততে এসে এই পথটা দেখে গিয়েছিলুম। তবে এদিক দিয়ে সেই বিচে পৌছতে অনেক মেহনত হবে এই যা মুশকিল।

দুর্ভাবনায় মুষড়ে গিয়ে বললুম—অন্যপথ জানা আছে তো?

কর্নেল বললেন—এস তো, দেখা যাক। ডঃ গুটেনবার্গ যখন পথপ্রদর্শক, চিন্তার কারণ নেই।

ডঃ গুটেনবার্গ দাড়ি চুলকে বললেন—আমি এদিকটা বিশেষ চিনি না। সেবার এই উত্তর দিকটায় ঘোরাঘুরির ফুরসত পাইনি।

এই সময় হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, পুবের খাড়িতে সেই মোটরবোটটার কথা। বললুম—কর্নেল! ভুলে গিয়েছি বলতে। ওদিকে একটা মোটরবোট দেখেছিলাম তখন। মাকুর মতো লম্বাটে গড়ন।

কর্নেল বললেন—টর্পেডোবোট? তারপর ঘুরে চোখে বাইনোকুলার রাখলেন।

সবাই ঘুরে দাঁড়ালুম। কর্নেল বোটটা দেখার পর বললেন—তাহলে কি টংকু আরেগোনা স্বয়ং দ্বীপে এসে জুটেছে? ব্যাপারটা কী?

পরমেশবাবু গম্ভীর মুখে বললেন—আর তার লোক আমার কথাই বা কেন জিগ্যেস করে গেল জয়ন্তবাবুকে?

কর্নেল বললেন—একটা সূত্র আমার মাথায় এসেছে।

আমরা সবাই একসঙ্গে বললুম—কী, কী?

কর্নেল বললেন—বনবিহারীর বাসায় আনোয়ার খান, মানে লালবাজার গোয়েন্দা দফতরের সেই কর্তা ভদ্রলোক হামলা করেছিলেন। কিছু কাগজপত্র পাওয়া গিয়েছিল। তাতে দেখা যায়, বনবিহারী সিঙ্গাপুরের একটা লোককে খুব পুরনো একটা দুষ্প্রাপ্য মূর্তি বেচতে চেয়েছিল—তার জবাবে সিঙ্গাপুরের লোকটি লিখেছে, ওসব বিশ্বাস করি না। হাতেনাতে দেবেন, তাতে আমি রাজি আছি। প্রমাণ পেলে মূর্তিটা পাঁচলক্ষ ডলারে কিনব। আপনি টোরাদ্বীপে আসুন—যে ভাবে পারুন।

ডঃ গুটেনবার্গ বললেন—অতএব বোঝা গেল, ডঃ গড়গড়ি সেজে পরমেশবাবুর ফলকের নৃসিংহ ছবিটা নিয়ে সে আমাদের সঙ্গে টোরাদ্বীপে কেন এসেছে!

আমি বললুম—একা আসতে পারত না? এত রিস্ক নিয়ে এল কেন? বিশেষ করে ডঃ গুটেনবার্গের কাছে ধরা পড়া সম্ভব ছিল।

কর্নেল বললেন—একা তার পক্ষে আসা অসম্ভব। আরেগোনা বিরাট লোক। সে পারে বলে কি অন্য কেউ এই দুর্গম দ্বীপে আসতে পারে? তাই সে ডঃ গড়গড়ি সেজে আমাকে উৎসাহিত করে দ্বীপে আসার সুযোগ নিয়েছে। তাছাড়া ওই যে 'হাতেনাতে' প্রমাণ কথার অর্থও বোঝা যাচ্ছে। সত্যি সত্যি নৃসিংহ-জাতীয় প্রাণী এখানে আছে। কাজেই আমার ধারণা, কোনও সূত্রে ভারতীয় সরকারি সমীক্ষকদলের অভিযান ও নৃসিংহের হাতে মর্মান্তিক পরিণতির কথা বনবিহারী জানতে পেরেছিল। জেনে সে আরও লোভে অস্থির হয়ে উঠেছিল। সত্যি সত্যি নৃসিংহ দেখাতে পারলে আরেগোনা বিশ্বাস করবে যে সত্যি নৃসিংহমূর্তিতে সেই প্রাচীন শল্য চিকিৎসা পদ্ধতির কথা সাংকেতিক ভাষায় লেখা আছে।

বললুম—তাহলে পুরো দশাবতার হাতালেই পারত বনবিহারী। কেন শুধু নৃসিংহ মুর্তির অংশটা খুবলে তুলে নিয়েছে?

কর্নেল বললেন—আরেগোনা ধূর্ত। সে দশাবতার চেনে। পুরো ফলকটা দেখলে তার সন্দেহ হবে যে এটা সাধারণ একটা দশাবতার ফলক। নৃসিংহ মূর্তিটা আলাদা থাকলে অন্য অর্থ দাঁড়ায় না কি? তখন একটা নৃসিংহের পুরাতাত্ত্বিক তাৎপর্য আরও গভীর হয়ে ওঠে। বুঝেছ?

বললুম—তাহলে প্রাচীন শল্য চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যাপারটা বনবিহারীর গুল?

কর্নেল জবাব দিলেন—স্রেফ গুল। পরমেশবাবু প্রাণীটাকে গরিলা বললেন। হ্যাঁ, আমার মনে পড়ছে, ওইরকম একটা প্রাণীর কথা আমি একটা বইয়ে পড়েছিলুম বটে।

কথা বলতে বলতে আমরা সেই নারকেল বনটার কাছে নেমে গেলুম। আর পথ চিনতে কোনও ভুল হল না।

ক্যাম্পে গিয়ে একেবারে সটান গড়িয়ে পড়লুম ক্যাম্পখাটের ওপর। শরীর ভীষণ ক্লান্ত।...

বনবিহারী বনাম আরেগোনা

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে, তখন প্রায় দুটো বাজে, কর্নেল ও ডঃ গুটেনবার্গ ইয়া মোটা নাইলনের রশিটা গোছাতে শুরু করলেন। ব্যাপার কী? গরিলাটাকে বেঁধে ফেলা হবে বুঝি? কিন্তু আনা হবে কীভাবে, বুঝতে পারলুম না। পরমেশবাবু খুঁতখুঁতে গলায় বললেন—ওর গায়ে অসম্ভব জোর আছে।

কর্নেল বললেন—গায়ের জোরে কিছু হয় না, ডঃ পুরকায়স্থ! আপনি তো প্রাণী বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ। আপনি তো জানেন, আসল জোরটা মস্তিষ্কের। সেই জোর আছে বলেই মানুষ টিকে থেকে সব জোরওয়ালা প্রাণীর ওপর প্রভুত্ব করছে।

কিন্তু ওকে আনবেন কেমন করে?

ডঃ গুটেনবার্গ বললেন—আষ্টেপৃষ্ঠে এই দড়ি জড়িয়ে ওকে মমির মতো লম্বা করে ফেলব এবং তার আগে একটা ঘুমের ইঞ্জেকশন অবশ্যই দেব।

তারপর? ওটার ওজন তো কমপক্ষে দুই কুইন্টালের কম নয়।

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন—চারজনের ভাগে কত ওজন পড়বে? মাথা পিছু পঞ্চাশ কিলোগ্রাম। কি জয়ন্ত? খুব বেশি ওজন কি? তবে ভেব না। স্ট্রেচার বানিয়ে নেব। জঙ্গলে প্রচুর কাঠ আছে।

পাহাড়ি ঢাল বেয়ে এই প্রকাণ্ড প্রাণী মড়ার মতো খাটে বয়ে আনার কথা ভেবে মোটেও স্বস্তি পেলুম না।

আমার মনের কথা যেন আঁচ করে কর্নেল আরও হেসে বললেন—জয়ন্ত! পাহাড়ে চড়ার চেয়ে নামা সোজা। ভাবনার কারণ নেই ডার্লিং। স্ট্রেচারে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নামানো অতি সরল ব্যাপার। না, না—সত্যি সত্যি তোমায় কাঁধে করে বইতে হবে না। টোরাদ্বীপের এটাই মজা।

একটু পরে সবাই মিলে বেরিয়ে পড়লুম আগের পথে। চড়াই ভেঙে পিঠে রোদ নিয়ে উঠতে কষ্ট যা হওয়ার হচ্ছিল। কিন্তু উপায় নেই। ক্যাম্পে আর একা থাকার সাহস আমার নেই—নইলে বরং একটা ঘুম দিয়ে নিতুম।

ফাঁদের গর্ত যেখানে, তার কাছাকাছি একটা পাথরের দেয়াল খাড়া উঠে গেছে।

দেয়ালের নিচে ঝোপ জঙ্গল ঘন হয়ে আছে। যেই সেখানে পৌঁছেছি, হঠাৎ ঝোপ থেকে চারটে বেঁটে মিলিটারি পোশাকপরা লোক সামনে লাফ দিয়ে দাঁড়াল।

প্রত্যেকের হাতে স্টেনগান বা রাইফেল। চোখে সানগ্লাস। মাথায় গোল টুপি। সেই লোকদুটোও রয়েছে ওদের মধ্যে—যারা আমাকে হেনস্থা করেছিল।

আমাদের সঙ্গে রাইফেল আছে। কিন্তু কর্নেল সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলায় বললেন—বাধা দিও না।

সেই বাইনোকুলারধারী একটু হেসে ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে বলল—ডঃ পরমেশ কে?

পরমেশ কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন—আমি।

লোকটা এগিয়ে এসে বলল—আমরা বন্ধু। কারও কোন ক্ষতি করতে চাইনে। আপনারা অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে আসুন। দলপতি আপনাদের সাক্ষাৎপ্রার্থী। বিশেষ করে ডঃ পরমেশের সঙ্গে তিনি কথা বলতে চান।

আমরা ওকে অনুসরণ করলুম। পিছনে তিনজন অস্ত্র তাক করে আসতে থাকল। খুব অপমানজনক অবস্থা। কিন্তু এখন লড়াই করা মানে অকারণ প্রাণটি খোয়ানো।

কিছুটা যাওয়ার পর একটা সুড়ঙ্গপথে আমাদের ঢুকতে হল। ঘন অন্ধকার। ওরা সামনে ও পেছনে টর্চ জ্বেলে আমাদের নিয়ে চলল।

এই সময় অবাক হয়ে দেখলুম, আমরা একটা সুড়ঙ্গপথে সেই ফাঁদের গর্তের তলায় এসে গেছি। ফাঁদে আটকানো গরিলাটা এখনও তেমনি ঘুমিয়ে আছে।

আর একপাশে দাঁড়িয়ে আছে একটা মোটা গব্দা-গোব্দা লোক। তার চুল সাদা। কিন্তু মুখে দাড়ি গোঁফ নেই। থ্যাবড়া নাক। সে আমাদের দেখে চমৎকার হিন্দিতে বলে উঠল— আইয়ে, আইয়ে! হাম আপলোগোঁকা ইন্তেজার কর রাহা। লেকিন হেঁয়াপর বইঠনেকা জায়গা নেহি হ্যায়। মাপ কিজিয়ে!

অন্য পাশে কাঁচুমাচু মুখে বসে আছে সেই জাল ডঃ গড়গড়ি—ওরফে বনবিহারী।

কর্নেল হাত বাড়িয়ে বললেন—হ্যালো মিঃ টংকু আরেগোনা!

আরেগোনা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে হাত বাড়াল—হ্যালো কর্নেল-সাহাব! কেতনা বরষ বাদ আপকা সাথ মিল্‌তা হ্যায়।

কিছুক্ষণ এইসব সম্ভাষণ ও আলাপ হল। তারপর আরেগোনা বলল— ডঃ পরমেশ কে?

পরমেশবাবু বললেন—আমি।

আরেগোনা তাঁকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলল—আরে পুরকায়স্থ সাহেব। আপনার বাবা মেজর সাহেবের সঙ্গে আমার দোস্তি ছিল। উনি যখন সিঙ্গাপুরে ছিলেন, তখন খুব ভাব ছিল আমাদের। তো এবার কাজের কথাটা সেরে নিই।

বলে আরেগোনা বনবিহারীর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে শুরু করল—এই লোকটা আমাকে ধাপ্পা দিচ্ছে, না সত্যি কথা বলছে আমি এখনও জানি না। ও আমাকে একটা পাঁচ হাজার বছরের পুরনো মূর্তি বেচতে চায়। সেই মূর্তির গায়ে নাকি সাংকেতিক ভাষায় লেখা আছে...

পরমেশবাবু বাধা দিয়ে বললেন—স্রেফ মিথ্যে কথা। ওটা একটা দশাবতার ফলক থেকে খুবলে নেওয়া মূর্তি। আমার বাবা ফলকটা এই দ্বীপে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন।

আরেগোনা দ্রুত বলে উঠল—সেই কথাই আমার মাথায় এসেছিল। মেজর সাহেব আমাকে দশাবতার ফলকটা দেখিয়েছিলেন। তাই যখন বনবিহারি আমাকে নৃসিংহ মূর্তির ফোটো পাঠিয়ে দিল, আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল। তাই খোঁজখবর নিতে শুরু করলুম। পরে আমার কলকাতার এজেন্ট খবর দিল, মেজর সাহেব বেঁচে নেই। তাঁর ছেলেও বড় ডাক্তার। এবং দশাবতার ফলকটা চুরি গেছে ওদের বাড়ি থেকে। তখন এই বনবিহারীর ওপর সন্দেহ বেড়ে গেল। এই সময় জানতে পারলুম, টোরা আইল্যান্ডে নাকি নৃসিংহের হাতে কয়েকজন ভারতীয় বিজ্ঞানী মারা পড়েছেন। তারপর বনবিহারীও লিখে পাঠাল যে টোরা আইল্যান্ডে সত্যি নৃসিংহ আছে এবং সে আমাকে স্বচক্ষে দেখাতে পারবে, তখন ভাবলুম, তাহলে বনবিহারী হয়তো কোনওভাবে টের পেয়েছে। নৃসিংহ মূর্তির গায়ে সাংকেতিক ভাষায় প্রাচীন শল্য চিকিৎসার ফরমুলা লেখা আছে। হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করে ফেললুম সব কিন্তু...

বনবিহারী বলে উঠল—তাহলে আর অবিশ্বাসের কারণ কী? ওই তো নৃসিংহ পড়ে আছে আপনার সামনে। এই দ্বীপের লোকেরাই মানুষের মাথায় সিংহের মাথা কেটে বসিয়ে নৃসিংহ তৈরি করেছিল। তাই দশাবতার ফলক এখানেই কুড়িয়ে পেয়েছিলেন পরমেশবাবুর বাবা।

আরে গোনা বলল—কিন্তু প্রাণীটাকে দেখে আমার যে সন্দেহ হচ্ছে ব্রাদার!

—কী সন্দেহ?

—ওটা কি সত্যি নৃসিংহ?

নৃসিংহ মূর্তিটা বনবিহারী কোটের পকেট থেকে বের করে বলল—মিলিয়ে দেখুন।

—মিলছে না ব্রাদার। একটু গোলমাল ঠেকছে।

—হুবহু কীভাবে মিলবে? এটা কষ্টিপাথরের খোদাই করা মূর্তি, আর ওটা হল সত্যিকার নৃসিংহ। শিল্পীর হাতে কি অবিকল নকল সম্ভব? একটু আধটু খুঁত থাকবেই।

পরমেশবাবু এতক্ষণে বলে উঠলেন—ওটা আসলে একটা গরিলা।

আরেগোনা লাফিয়ে উঠে বলল—আলবৎ তাই! আমি মালয়েশিয়ার বাসিন্দা। আমি জানি, আজ থেকে ষাট-সত্তর বছর আগেও মালয়ের জঙ্গলে গরিলা ছিল। প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক দ্বীপেও ছিল। ব্রাদার বনবিহারী! তাহলে এবার তৈরি হও। তুমি আমাকে প্রতারণা করে পাঁচ লাখ ডলার হাতাতে চেয়েছ—এ তো কম অপরাধ নয়।

আমার বুক কাঁপল। হতভাগা বনবিহারীর কী পরিণতি ঘটবে কে জানে!

বনবিহারী গ্রাহ্য করল না। ফুঁসে উঠে বলল—ভুল বলছেন পরমেশবাবু!—উনি কিস্যু জানেন না! আলবাৎ এটা নৃসিংহ।

আরেগোনা বলল—বেশ। ধরে নিচ্ছি, এটা নৃসিংহ। কিন্তু তোমার ওই মূর্তির গায়ে ওগুলো সাংকেতিক ভাষায় লেখা ফরমুলা, তার প্রমাণ কী?

—প্রমাণ? এই দ্বীপে নৃসিংহ স্বচক্ষে দেখেও প্রমাণ চাই? বনবিহারী কুৎসিত হেসে উঠল।

—বাঃ! ওই ফরমুলা উদ্ধার করবে কে?

—আপনাকে তো বলেইছি, ডঃ হরিহর গড়গড়ি ওর পাঠোদ্ধার করতে পারবেন, তাঁকে ধরে নিয়ে আসুন। আমি সাহায্য করব।

আমি শিউরে উঠলুম। লোকটা কী শয়তান!

আরেগোনা বলল—বেশ। ফরমুলা উদ্ধার হল। তারপর সেটা কাজে পরিণত করবে কে?

—কেন? ওই তো পরমেশবাবু আছে। ওকে আটকে রাখুন।

পরমেশ রাগে চেঁচিয়ে উঠলেন—মুখ সামলে কথা বলবে বনবিহারী!

আরেগোনার মুখের ভাব দেখে তার মতলব আঁচ করা কঠিন কিন্তু সে হেসে উঠল। বলল—বনবিহারী, ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি। আমার সঙ্গে ধূর্তামি করে পার পাবে না ব্রাদার। বিশেষ করে আমার এক পুরনো বন্ধু মেজর সাহেবের পাওয়া ফলক চুরি করে আমার সঙ্গে তঞ্চকতা করেছ—তোমার শাস্তি পাওনা হয়েছে। বোঙা! এদিকে আয় তো!

কয়েকটা জ্বলন্ত টর্চের আড়াল থেকে হিংস্র চেহারার একটা লোক সামনে এসে দাঁড়াল।

—এই শয়তানটাকে পুবের পাহাড়ের ওপর থেকে নিচের খাড়িতে ছুড়ে ফেলে দিবি। এই বদমাশ আমাকে হাজার কাজ পণ্ড করে নৃসিংহ দেখাবে বলে, গরিলা দেখিয়ে আমার মাথা খারাপ করেছে। যা—নিয়ে যা!

আমরা চারজনে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছি একপাশে অন্যপাশে টংকু আরেগোনা। সামনে কিছুটা তফাতে বনবিহারী। আর যে সুড়ঙ্গপথে এসেছি, সেখানে চারজোড়া টর্চ জ্বলে দাঁড়িয়ে আছে আরেগোনার সশস্ত্র লোকেরা।

বোঙা যেই বনবিহারীর দিকে এগিয়েছে, অমনি বনবিহারী বিদঘুটে হেসে বলে উঠল—ওরে খ্যাঁদা শয়তান! আমায় শাস্তি দিবি—এত বুকের পাটা তোর?

তারপর এক ধুন্ধুমার ঘটে গেল আচম্বিতে।

প্রচণ্ড আওয়াজে গর্তের মধ্যে যেন বোমা ফাটল। তারপরই জন্তুটার ভয়ঙ্কর গর্জন শোনা গেল। কটু বারুদের গন্ধে নিঃশ্বাস আটকে গেল। জানলুম, বনবিহারী গ্রেনেড ছুড়ছে বারবার।

তারপর কর্নেলের চিৎকার শুনলাম—এদিকে! এদিকে!

মনে হল কর্নেল আমাদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নিয়ে এলেন।

আবার কর্নেলের গলা শুনলুম—এই পথে এস! আমাকে ছুঁয়ে থাক সবাই!

একটু পরে বুঝলুম, দুপুরের সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে আমরা দৌড়ে যাচ্ছি। কর্নেল পিছন থেকে আমাদের ঠেলে নিয়ে চলেছেন।

পিছনে সেই গর্তের মধ্যে মুহুর্মুহু বোমা ফাটার আওয়াজ আর গরিলাটার হুংকার শোনা যাচ্ছে।

*　　　　　*

নারকেল বনের শেষে বালির বিচে গিয়ে কর্নেল বললেন—সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। সন্ধ্যায় আমরা আলো জ্বেলে সাংকেতিক চিহ্ন দেখালে শার্ক থেকে বোট আসবে। ততক্ষণ ওপাশে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থাকি।

রহস্যময় টোরাদ্বীপের মাথার দিকে ঘন জঙ্গল শেষবেলার রোদে ম্লান দেখাচ্ছে। ধোঁয়া উড়তেও দেখলুম। কী পোড়াচ্ছে ওরা? বনবিহারী, না আরোগানার মড়া? নাকি গরিলাটার?

আমি মনে মনে কামনা করলুম—ওই বদমাশগুলো মারা পড়ুক। কিন্তু গরিলাটা যেন বেঁচে থাকে।

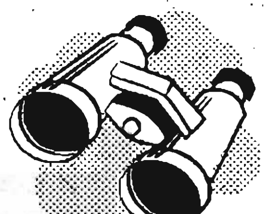

হাট্টিম রহস্য

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার খুব মন দিয়ে একটা চিঠি পড়ছিলেন। পড়া শেষ হলে আমার দিকে ঘুরে মৃদু হেসে এই ছড়াটা খুব ধীরে আওড়ালেন ঃ

হাট্টিমাটিম টিম
তারা মাঠে পাড়ে ডিম
তাদের খাড়া দুটো শিং
তারা হাট্টিমাটিম টিম।।

অবাক হয়ে বললুম, "হঠাৎ ছড়া আওড়াতে শুরু করলেন যে?"

কর্নেল তাঁর সাদা দাড়ি থেকে কী একটা বের করে ফেলে দিলেন। পোকা হওয়াও বিচিত্র নয়। সেই ভোরবেলা থেকে আটটা পর্যন্ত ছাদের বাগানে হরেকজাতের উদ্ভিদের সেবা করেছেন। দাড়িতে পোকা ঢুকে থাকা খুবই সম্ভব। হাসতে হাসতে বললেন, "জয়ন্ত, ঠিক হাট্টিমাটিম টিমের মতোই পৃথিবীতে কিছুকিছু আজব মানুষ আছে। না, না—তাদের সকলেরই শিং আছে বা তারা মাঠে ডিম পাড়ে, সেকথা বলছি নে। কিন্তু তাদের ব্যাপার-স্যাপার দেখে তাজ্জব লাগে। যেমন ধরো, এই ভদ্রলোক—কালোবরণ মুখুয্যে।'

"চিঠিটা বুঝি তাঁরই?"

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। চিঠিটা টেবিলে চাপা দিয়ে পায়চারি করতে করতে বললেন, "না—চিঠিটা তাঁর নয়। তাঁর নাতনি অনামিকার। সে আবার কিনা বিজ্ঞানের ছাত্রী। ঠাকুর্দার রকম-সকম দেখে ভড়কে গেছে। শেষে আমরাই শরণাপন্ন হয়েছে। কিন্তু আমি কি ভূতের ওঝা?"

রহস্যের গন্ধ পেয়ে বললুম, "কালোবরণ মুখুয্যেকে কি ভূতে ধরেছে?"

"তাই তো লিখেছে।" বলে কর্নেল হঠাৎ মাথার টুপি খুলে প্রশস্ত টাক থেকে এবারও সম্ভবত একটা পোকা ঝেঁটিয়ে ফেললেন। "তবে কথাটা হল, মানুষ বুড়ো হলে কিছুটা ভীমরতি ধরতেই পারে। যেমন আমারও মাঝে মাঝে ধরে। সেটা বিলক্ষণ বুঝতেও পারি। কিন্তু তাই বলে কি আমি রাতদুপুরে কোনও উদ্ভুট্টে কাণ্ড করি?"

বিরক্ত হয়ে বললুম, আসল কথাটা বলুন না! এসবের সঙ্গে হাট্টিমাটিমের কী সম্পর্ক?"

কর্নেল কিছুক্ষণ চুপচাপ পায়চারি করার পর আমার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "তোমার কি সময় আছে হাতে? চলো না একবার ঘুঘুডাঙা থেকে বেড়িয়ে আসি। কলকাতা থেকে কাছেই।"

এদিন আমার ছুটি। তবে বলা যায় না কিছু। কাগজের আপিসে সাংবাদিকের চাকরি পুলিশের চাকরির মতোই। বিশেষ করে দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার কর্তৃপক্ষের বড় বেশি সুনজর তাঁদের এই স্পেশাল রিপোর্টারটির ওপর। ছুটির দিনেও তলব পাঠিয়ে হুকুম দিতে পারেন, "ধাদ্ধাড়া-গোবিন্দপুরে সাংঘাতিক খুনোখুনি হয়েছে। এক্ষুনি গিয়ে সরজমিন খোঁজখবর নিয়ে এস।" তার মানে ওটাই পরদিন সকালে পাবলিককে খাওয়াতে হবে। পাবলিকও এমন হয়েছে আজকাল যে রোজ সক্কালবেলা রক্ত-গরমকরা খবর ছাড়া আর কিছু মুখে রোচে না।

আমার মুখে নিশ্চয় এইসব দোনামনার ছাপ ফুটে উঠেছিল। কর্নেল একটু হেসে বললেন ফের, "ডার্লিং! চিন্তা কোরো না। ঘুঘুডাঙার হাট্টিমরহস্য ফাঁস হলে তোমার কাগজের প্রচারসংখ্যা দশগুণ বেড়ে যাবে। কর্তৃপক্ষকে বরং ফোনে এখনই তার ইশারা দিয়ে রাখো।"

এরপর আর না করা চলে না। ষষ্ঠীচরণ কফি রেখে গেল। কফি খেয়েই আমরা বেরিয়ে পড়লুম। আমার ফিয়াট গাড়িটা মাঝে মাঝে একটু গণ্ডগোল বাধায়। কিন্তু এদিন দিব্যি খুশমেজাজে ছুটে যেতে আপত্তি করছিল না।

হাট্টিম রহস্যটা কী, রাস্তায় বারতিনেক জিগ্যেস করেও জবাব পেলুম না। কর্নেল চোখবুজে ধ্যানস্থ হয়েছেন তো হয়েছেনই। আশ্চর্য ব্যাপার, অভ্যাসমতো গাড়ির জানালা দিয়ে পাখি দেখার কথাও যেন ভুলে গেছেন। অথচ বুকের ওপর দিব্যি বাইনোকুলারটি ঝুলছে।

চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে ঘন্টাখানেকের মধ্যে আমরা ঘুঘুডাঙা পৌঁছে গেলুম। শহর ও গ্রামে জটপাকানো মাঝারি সাইজের একটা জনপদ। কালোবরণ মুখুয্যের বাড়িটা একেবারে শেষদিকে মাঠের ধারে। একে-ওকে জিগ্যেস করে পৌঁছুতে অসুবিধে হল না।

পরিবেশটা কেমন নির্জীব, খাঁ খাঁ। এদিকে ওদিকে কিছু ভিটে, ভাঙাচোরা দালানকোঠা, কদাচিৎ দু-একটা নতুন বাড়ি, আর ঝোপঝাড় গাছপালায় ভর্তি। কালোবাবুর বাড়ির গেটে মান্ধাতা আমলের ফলকে লেখা আছে ঃ "স্বর্গপুরী।"

স্বর্গপুরীর দশা বড় করুণ। প্রকাণ্ড সেকেলে দোতলা বাড়িটার গায়ে ছালচামড়া খুব কমই আছে। গেটের কাছে গাড়ি থামতে থামতে একটি ফুটফুটে ফর্সা তরুণী দৌড়ে এল। বছর কুড়ি-একুশের মধ্যে তার বয়স। বেশ স্মার্ট বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। চোখে চশমা আছে। কর্নেল পরিচয় করিয়ে দেওয়ার আগেই বুঝতে পেরেছিলুম, এই সেই নাতনি—শ্রীমতী অনামিকা।

কর্নেল বললেন,"তোমার দাদুর খবর কী, অনি?"

অনামিকা তক্ষুনি গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, "দাদু এখন ঘুমুচ্ছেন। কাল রাতে সে কী কাণ্ড, কল্পনা করতে পারবেন না। সবে একটু চোখের পাতা টেনে ধরেছে, আমার দরজায় ধাক্কা। দাদুর গলা শুনে দরজা খুলে দিলুম। দাদু ভেতরে ঢুকে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, তারা এসেছে! আমাকে লুকিয়ে রাখ শিগগির! আমি টর্চ নিয়ে বেরুলুম। তখন লোডশেডিং চলছিল। কানাইদা নিচে থেকে ব্যস্তভাবে লণ্ঠন নিয়ে এল। দাদুকে ঘরে রেখে আমরা প্রথমে গেলুম দাদুর ঘরে। তন্নতন্ন খুঁজে কাউকে দেখতে পেলুম না শুধু মেঝেয় এই চিরকুটটা পড়ে থাকতে দেখলুম। এই দেখুন। আবার সেই ছড়াটা লেখা রয়েছে।"

কর্নেল ভাঁজ করা কাগজটা মেলে ধরলেন। পাশ থেকে উঁকি মেরে দেখি, কর্নেলের মুখে শোনা সেই হাট্টিমাটিম ছড়াটা লেখা আছে গোটাগোটা সুন্দর হরফে। আর পাশে আঁকা আছে একটা ছবি। ছোটদের ছড়ার বইয়ে হাট্টিমাটিম নামে আজব প্রাণীর যে ছবি দেখা যায়, সেই ছবি, পেঁচার মতো মুখ, মানুষের মতো দু'পায়ে দাঁড়ানো, বড়-বড় চোখওয়ালা পাখি এবং তাদের মাথায় দুটো খোঁচাখোঁচা শিংও আছে। গা ভর্তি পালক।

কর্নেল কাগজটা পকেটে রেখে বললেন, "এই নিয়ে তাহলে চারবার ছড়াটা পাওয়া গেল?"

অনামিকা মাথা নাড়ল। তারপর পা বাড়িয়ে বলল, "ভেতরে আসুন।"

সে সিঁড়ি বেয়ে আমাদের ওপরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ঘরে নিয়ে গেল। এই ঘরে সে থাকে। সে সোফায় আমাদের বসিয়ে বেরিয়ে গেল। বললুম, "এই তাহলে হাট্টিমরহস্য?"

কর্নেল হাসলেন। "শুধু এটুকু হলেও কথা ছিল জয়ন্ত। আরও কিছু ব্যাপার আছে। কিছুক্ষণের মধ্যে তুমি সেগুলো জানতে পারবে।"

অনামিকা ফিরে এল চায়ের ট্রে আর দু' প্লেট সন্দেশ নিয়ে। তারপর একপাশে বসে আগের জের টেনে বলল, "তারপর কানাইদা আর আমি বাড়ির চারপাশে ঘুরে খোঁজাখুঁজি করলুম। কাউকে দেখতে পেলুম না। আমরা ফিরে আসছি, হঠাৎ দেখি কখন দাদু ওপর থেকে নেমে এসেছেন। কিছু বলার আগেই দৌড়ুতে শুরু করলেন। পেছন-পেছন কানাইদা দৌড়ুল। কিন্তু দাদু যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কানাইদা ফিরে এসে বলল, ছেড়ে দাও। ফিরে আসবেন'খন। এ তো আজ প্রথম নয়।"

কর্নেল বললেন, "কখন ফিরলেন উনি?"

"প্রায় ঘন্টাখানেক পরে। বাগানের দিক থেকে এলেন। আমরা এত জিগ্যেস করলুম, জবাবই দিলেন না। সোজা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।"

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন, "সাড়ে দশটা বাজে। এখনও উনি ঘুমুচ্ছেন?"

"না। সকাল সাতটায় দরজা খুলে চা খেয়েছিলেন। চা দিতেই ফের দরজা আটকে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে কানাইদা জানালার খড়খড়ি ফাঁক করে দেখে এসে বলল, ঘুমুচ্ছেন।"

"ব্রেকফাস্ট করেননি তাহলে?"

"না।" অনামিকা দুঃখিতভাবে বলল। "একটু আগে আমি দরজা নক করলুম। সাড়া পেলুম না।"

"তুমি আরেকবার গিয়ে জোরে দরজায় ধাক্কা দাও তো!"

অনামিকা অনিচ্ছুকভাবে বেরিয়ে গেল। বুঝতে পারছিলুম, দাদুর ব্যাপার-স্যাপার দেখে সে যত দুঃখিত, তার চেয়ে বেশি বিরক্ত।

কর্নেলকে জিগ্যেস করলুম, "বাড়িতে কে কে থাকে?"

কর্নেল বললেন, "কালোবরণবাবু, অনামিকা, আর কানাই নামে একজন চাকর। কানাই ছেলেবেলা থেকে এ বাড়িতে আছে। তাকে বাড়ির লোকই বলা নয়। অবশ্য তাকে আমরা এখনও দেখিনি। অনামিকার মুখে আমি যেটুকু শুনেছি, তা হল, কালোবাবু রেলে স্টেশনমাস্টার ছিলেন। রিটায়ার করে পৈতৃক এই বাড়িতে ফিরে আসেন বছর পনেরো আগে। এখন ওঁর বয়স প্রায় পঁচাত্তর। তবু শক্তসমর্থ মানুষ। ওঁর একমাত্র ছেলে দেবনাথ ছিলেন কাস্টম্‌স্‌ অফিসার। বছর দুই আগে খিদিরপুর ডক এলাকার স্মাগলাররা তাঁকে খুন করে। তাঁর স্ত্রী শ্বশুরের কাছে চলে আসেন মেয়েকে নিয়ে। স্বামীর শোকে এবং নানা অসুখে ভুগে মাস ছ'সাত আগে তিনি মারা গেছেন।"

"হুঁ—মেয়েটা বড় দুর্ভাগা! তা এই হাট্টিমরহস্যের শুরু কবে থেকে?"

"মাসখানেক হয়ে এল প্রায়। অনামিকা আমার কাছে দিয়েছিল ১৫ই সেপ্টেম্বর। আজ ১৪ই অক্টোবর। হ্যাঁ—মাসখানেক হল। এর মধ্যে সে আমাকে নিয়মিত চিঠি লিখে যা যা ঘটেছে, সব জানিয়েছে। আজ যে চিঠিটা পেলুম, তাতে গত সপ্তাহের ঘটনার বিবরণ ছিল। মোটামুটি কাল রাতে যা হয়েছে শুনলে, প্রায় তাই। শুধু একটা বাড়তি ঘটনা ছিল, তা হল : অনামিকা সে-রাতে নিচের বাগানে সত্যি একটা বিদঘুটে প্রাণীকে এক ঝলক টর্চের আলোয় দেখেছে—সেটা নাকি অবিকল হাট্টিমাটিমের যে ছবি দেখলে সেটারই মতো।"

ভড়কে গিয়ে বললুম, "বলেন কী!"

কর্নেল একটু হাসলেন। "তবে তার চেয়ে অদ্ভুত কথা, সকালে বাগানে গিয়ে অনামিকা কয়েকটা পালক কুড়িয়ে পেয়েছিল। পালকগুলো নাকি প্রকাণ্ড। ভেবে দেখো জয়ন্ত, অনামিকা জীববিজ্ঞানের ছাত্রী—বিশেষ করে ওরিন্থোলজি বা পক্ষিতত্ত্ব নিয়ে গবেষণাও করছে। কিন্তু ওই পালকগুলো দেখে সেও ভীষণ অবাক হয়েছে। এমন পালক যার, সে কোন প্রজাপতি পাখি বা প্রাণী, বিজ্ঞানে তার হদিস নেই।"

এইসময় অনামিকা ব্যস্তভাবে ফিরে এসে বলল, "দাদু সাড়া দিচ্ছেন না।"

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, " কৈ, চলো তো দেখি।"

অনামিকার দাদুর ঘর দোতলার উত্তর প্রান্তে। কর্নেল দরজার কাছে গিয়ে আমাদের ভীষণ অবাক করে দিয়ে সুর ধরে আওড়ালেন :

'হাট্টিমাটিম টিম
তারা মাঠে পাড়ে ডিম
তাদের খাড়া দুটো শিং
তারা হাট্টিমাটিম টিম।।

অমনি ঘরের ভেতর মচমচ ধুপধুপ হল এবং দরজা খুলে গেল। শ্যামবর্ণ, কিন্তু ঘাসচাপা পাতার মতো ফ্যাকাসে গায়ের রং, ঢ্যাঙা গড়নের এক বৃদ্ধ পর্দা তুলেই থমকে দাঁড়ালেন। তারপর কর্নেল ও আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে রাগী গলায় বললেন, "কে মশাই আপনারা আমার সঙ্গে রসিকতা করতে এসেছেন।"

অনামিকা খিলখিল করে হেসে উঠল। কালোবাবু তার দিকে তেড়ে গিয়ে বললেন, "সব তোরই চক্রান্ত অনি! তুই-ই এই লোকদুটোর সাহায্যে আমাকে ভয় দেখাস। এতদিনে সব ফাঁস হয়ে গেল।"

কর্নেল বললেন, "না, মুখুয্যেমশাই! কিছুই ফাঁস হয়নি।"

কালোবাবু বললেন, "কে আপনি?"

অনামিকা কর্নেল ও আমার পরিচয় দিল। তবু সন্দিগ্ধ দৃষ্টে আমাদের দেখতে দেখতে কালোবাবু বললেন, "ঠিক আছে। আমার খিদে পেয়েছে। অনি, আগে আমাকে খেতে দে। তারপর কথাবার্তা হবে।"

দুই

কালোবাবুর হাবভাবে মোটেও তাঁকে অপ্রকৃতিস্থ বলে মনে হচ্ছিল না। রীতিমতো রাশভারি প্রকৃতির মানুষ উনি। নিজের ঘরে আমাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কর্নেলের প্রশ্নের উত্তরে যা বলেন, তা হল এই—

মাস দেড়েক হবে, এক রাত্রে হঠাৎ কিসের শব্দে ওঁর ঘুম ভেঙে যায়। বাগানের দিকের জানালা দুটো খোলা ছিল। একটা জানালার দিকে চোখ পড়তেই চমকে ওঠেন। কারা যেন উঁকি দিচ্ছে। লোডশেডিংয়ের যুগ বলে রাতে বিছানার পাশে টর্চ রেখে শোন। ঝটপট টর্চ জ্বালতেই দেখেন, দুটো বিদঘুটে মুখ। পেঁচার মতো অবিকল। কিন্তু মানুষের মুখের সাইজ মুখটা। মাথায় দুটো ছোট্ট শিং আছে। ভূতুড়ে গলায় ওরা বলে, "ডিঁম কৈঁ? ডিঁম দেঁ।"

আতঙ্কে টর্চের সুইচ থেকে আঙুল সরে গিয়েছিল। ফের সুইচ টিপে দেখেন, বিদঘুটে মুখটি আর নেই। সাহস করে জানালায় দিয়ে টর্চের আলো ফেলে দেখেন। কিন্তু তাদের কোনও পাত্তা পাননি। শেষে ব্যাপারটা স্বপ্ন ভেবে আর বিশেষ গা করেননি। কিন্তু সকালে ঘরের মেঝেয় ওই ছড়ালেখা একটুকরো কাগজ কুড়িয়ে পান।

তারপর থেকে কিছুদিন অন্তর-অন্তর ওই বিদঘুটে জীবদুটি দুপুররাতে ঘরের জানালায় আবির্ভূত হচ্ছে। ভূতুড়ে গলায় ডিম চাইছে। অনামিকা ভয় পাবে ভেবে তাকে সবটা খুলে বলেননি। শুধু এটুকুই বুঝতে পেরেছেন যে, জীবদুটির ডানা আছে। তা না হলে দোতলায় জানালায় কীভাবে তারা উঁকি দিতে পারে?

এইসময় অনামিকা বলল, "গত সপ্তাহে ওদের আমি বাগানে দেখেছি, দাদু। তুমি আরও ভয় পাবে বলে বলিনি। তিনটে পালকও কুড়িয়ে পেয়েছি বাগানে।"

কালোবাবু আঁতকে উঠে বললেন, "অ্যাঁ! বলিস কী রে?"

বুঝলুম দাদু ভেবেছেন নাতনিকে সব খুলে বললে ভয় পাবে এবং নাতনিও ভেবেছে, দাদুকে সব খুলে বললে দাদু ভয় পাবেন।

কর্নেল বললেন, "কিন্তু আপনি বাগানের দিকে দৌড়ে যান কেন বলুন তো মুখুয্যেমশাই? কোথায় যান?"

কালোবাবু বিকৃত মুখে বললেন, "যাব না কেন? ব্যাটারা আমাকে ভয় দেখাবে, আর আমি তাদের ছেড়ে দেব? প্রথমে ভয় পাই বটে, কিন্তু তারপর মাথায় খুন চেপে যায়। তাই লাঠি নিয়ে খুঁজতে যাই ওদের। পেলে একেবারে হাড় গুঁড়ো করে দেব না বুঝি?"

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে একটু হেসে বললেন, "তাহলে বললে চাইছেন, অত্যন্ত মরিয়া হয়েই বেরিয়ে পড়েন। তাই না?"

"আলবাত। মরিয়া হব না? রোজ অমনি করে জ্বালাতে আসবে, আর মুখ বুজে সয়ে যাব?"

"কিন্তু প্রথমে ভীষণ আতঙ্কে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন তো?"

কালোবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "তা পড়ি। আপনি হলে আপনিও পড়তেন।"

কালোবাবুর চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল। তারপর নিজেকে শান্ত করে বললেন, "হঠাৎ ওকথা আসছে কেন? আপনার মশাই দেখছি, খালি লোকের মনে খোঁচা দেওয়ার অভ্যেস!"

কর্নেল বললেন "সরি। কিছু মনে করবেন না মুখুয্যেমশাই। আচ্ছা, আমরা উঠি।"

কালোবাবু গম্ভীর মুখে বসে রইলেন। কোনও কথা বললেন না। আমরা বেরিয়ে এলুম ঘর থেকে। সিঁড়ির কাছে এসে কর্নেল অনামিকাকে বললেন, "অনি, সেই পালকগুলো কাগজে মুড়ে আমাকে এনে দাও। পরীক্ষা করা দরকার।"

অনামিকা তার ঘর থেকে একটা মোড়ক এনে কর্নেলকে দিল। আমরা ওর কাছে বিদায় নিয়ে কলকাতা ফিরে চললুম। কর্নেল ওকে প্রচুর আশ্বাস দিতে ভুললেন না অবশ্য।

পথে কর্নেল পালকগুলো বের করে দেখতে দেখতে বললেন, "পাখিটাখি নিয়ে আমিও বিস্তর ঘাঁটি। কিন্তু এ পালক যে কোন পাখির হতে পারে, মাথায় আসছে না।"

বললুম, "আবার কোন পাখির? হাট্টিম পাখির। আপনি দেখেননি বলে কি হাট্টিম পাখি থাকতে পারে না? পৃথিবীতে বিস্তর আজগুবি জীব থাকতে পারে।"

কর্নেল হাসলেন। "পারে। কিন্তু লিখতেও পারে কি? কিংবা নিজের ছবি আঁকতে? নিজের নামে ছড়া বানাতে?"

হ্যাঁ-সেও একটা কথা। অর্থাৎ পেছনে মানুষ আছে। ধরুন, মানুষটা হাট্টিম দুটোর মালিক।"

"বেশ তো। কিন্তু কালোবাবুকে সে ভয় দেখাবে কেন?"

"ভয় কোথায় দেখাল? রসিকতা করছে। আর কালোবাবু রসিকতায় ভয় পাচ্ছেন।"

"কিন্তু কেন রসিকতা করছে?"

"এমনি। মানুষের স্বভাব রসিকতা করা। বুড়ো মানুষ—তাতে হয়তো বদরাগী। তাই—"

আমার কথায় বাধা পড়ল। পাশ দিয়ে হঠাৎ একটা কালোরঙের মোটর গাড়ি এগিয়ে সামনে চলে এল এবং আমি দুর্ঘটনার আতঙ্কে ব্রেক কষে গাড়ি থামালুম। সামনের গাড়িটাও থেমে গেল। তারপর দু'দিক থেকে দু'জন মুখোশপরা লোক বেরিয়ে একজন আমার পাশে এবং অন্যজন কর্নেলের পাশে এসে দাঁড়াল। তাদের দুজনের হাতেই রিভলভার। কর্নেলের দিকের লোকটা হিসহিস করে বলল, "এই বুড়ো ঘুঘু! শিগগির মোড়কটা দে। নইলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।"

কর্নেল নিরীহ মুখ করে বললেন, "কিসের মোড়ক চাইছ বাবা?"

মুখোশপরা লোকটা গাড়ির জানালা দিয়ে কর্নেলের কানে রিভলভারের নল ঠেকিয়ে বলল, "ন্যাকা!" তখনও কর্নেলের হাতে হাট্টিম পাখির পালকের মোড়কটা রয়েছে। সে সেটা খপ করে অন্য হাত বাড়িয়ে তুলে নিল। তারপর শাসিয়ে বলল, "ফের যদি স্বর্গপুরীতে নাক গলাতে গেছ তো দেখবে কী হয়!"

মোড়কটা হাতিয়ে লোকটা করল কী, আমার গাড়ির সামনের টায়ারে রিভলভারের গুলি ছুড়ল। হিস করে শব্দ হল। বুঝলুম, রিভলভারে সাইলেন্সার লাগানো আছে। আমার পাশের লোকটাও আরেকটা টায়ার ফাঁসিয়ে দিল গুলি ছুড়ে। তারপর কালো গাড়িটাতে চেপে চলে গেল। রাগে দুঃখে অস্থির হয়ে ওই গাড়ির নম্বর টুকতে যাচ্ছি, কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, "ডার্লিং! ওটা আসল নম্বর নয়। গাড়িতে আসল নম্বর ঝুলিয়ে কেউ এসব কাজ করতে আসে না!"

গনগনে রোদে রাস্তার মধ্যে গাড়িটা নিয়ে বিপদে পড়লুম দেখছি। দুধারে ফাঁকা মাঠ। বেরিয়ে টায়ারের অবস্থা দেখতে দেখতে বললুম, "কর্নেল! হাট্টিমাটিম টিমের পাল্লায় পড়ে দুটো নতুন টায়ার গচ্চা যাবে জানতুম না। ওঃ! হাত নিসপিস করছে—সঙ্গে আমারও রিভলভার আছে। অথচ টায়ার দুটো ফেঁসে গেল!"

"যাবে না।" কর্নেল বললেন। "তোমার দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার কর্তৃপক্ষ কিনে দেবে। কারণ এই হাট্টিমরহস্য কাগজের প্রচার আরও বিশহাজার বাড়িয়ে দেবে। কলম বাগিয়ে তৈরি হও বৎস!"

বিরক্ত হয়ে বললুম, "আপনার কাছেও তো রিভলভার আছে নিশ্চয়। আমি না হয় হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলুম। আপনি কেন রিভলভার বের করলেন না? ওরা গুলি ছোড়ার আগেই......"

কর্নেল গাড়ির ভেতর ঝুঁকে কী একটা কুড়িয়ে নিয়ে বললেন, "তাতে আমাদের প্রাণ যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। তবে যাই হোক, একটা পালক সময়মতো সরিয়ে ফেলেছিলুম। ওদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। এই দেখো।"

কর্নেলের হাতে একটা পালক দেখতে পেলুম। বললুম, "কিন্তু ওরা পালকগুলো হাতাতে এসেছিল কেন বলুন তো? এগুলো কী এমন জরুরি ওদের কাছে?"

কর্নেল হাসলেন। "ওরা আমাকে চেনে। শুনলে না আদর করে বুড়ো ঘুঘু বলে সম্ভাষণ করল?" এই পালকেই সম্ভবত কোনও সূত্র লুকিয়ে আছে।".....

ঘুঘুডাঙার মাঠ থেকে দু'মাইল দূরের একটা গ্যারাজে খবর দিয়ে ব্রেকভ্যানে করে গাড়ি টেনে এনে এবং ফাঁসা টায়ার কোনওরকমে মেরামত করে কলকাতা ফিরতে সেদিন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল।

পরদিন সকালে কর্নেলের বাড়ি গিয়ে দেখি, উনি একগাদা পুরনো বিলিতি খবরের কাগজ ঘাঁটাঘাঁটি করছেন। আমাকে দেখে বললেন, "বোসো ডার্লিং! খবর আছে।"

বললুম, "সে তো দেখতেই পাচ্ছি। লন্ডনের ইভনিং স্টার পত্রিকা ঘাঁটছেন!"

কর্নেল একটু হেসে বললেন, "হ্যাঁ, ১৮৫৭ সালে ভারতের সিপাহি বিদ্রেহের খবর পড়ছিলুম।"

"কিন্তু হাট্টিমরহস্যের কী হল?"

কর্নেল আরও জোরে হেসে বললেন, "বুঝতে পারছি, টায়ার ফাঁসিয়ে দেওয়াতে তুমি ওদের ওপর ভীষণ রেগে গেছ। তবে তোমার টায়ার ফাঁসানোর ঘটনার সঙ্গে সিপাহী বিদ্রোহের সম্পর্ক আছে, জয়ন্ত?"

সোজা হয়ে বসে বললুম, "তার মানে?"

কর্নেল জরাজীর্ণ ইভনিং স্টারের পাতায় লাল চিহ্ন দেওয়া একটা খবর দেখিয়ে বললেন, "পড়ে দেখো। এই কাগজগুলো আমি সেবার লন্ডনে গিয়ে সংগ্রহ করেছিলুম একটা নিলামের দোকানে।"

খবরটা হল এই : বারাকপুর সেনানিবাসের ক্যাপ্টেন বার্ট জনসনের প্রিয় পাখি দুটি গতকাল লন্ডনে পৌঁছেই মারা পড়েছে। বারাকপুরে সিপাহিরা বিদ্রোহ করায় নিরাপত্তার জন্য ক্যাপ্টেন বার্ট পাখি দুটিকে স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে লন্ডনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পাখিদুটি অত্যন্ত দুর্লভ প্রজাতির। জানা গেছে, ক্যাপ্টেন বার্ট এদের সংগ্রহ করেছিলেন আফ্রিকা থেকে। প্যাঁচার মতো মুখের গড়ন, মাথায় শিং আছে এবং দু'পায়ে দাঁড়ানো মতো লাগে। এরা প্রায় তিনফুট উঁচু। পিয়ানোর শব্দের মতো টিং টিং করে এরা নাকি ডাকে। পাখি দুটিকে মর্যাদার সঙ্গে ক্লিভল্যান্ড কবরখানায় কবর দেওয়া হয়েছে।....

কর্নেলের মুখের দিকে তাকালে উনি আরেকটা কাগজ এগিয়ে দিলেন। লাল চিহ্ন দেওয়া আরেকটা খবরে চোখ দেল। এবার খুব অবাক হয়ে গেলুম।

"...গতরাতে ক্লিভল্যান্ড কবরখানায় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। কে বা কারা ক্যাপ্টেন বার্টের দুটি পাখির কবর খুঁড়েছিল। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে দেখে, দুটি পাখিরই পেট ধারালো অস্ত্রে চিরে রেখে গেছে তারা। মৃত পাখির পেট চেরার কারণ নিয়ে পুলিশ হিমশিম খাচ্ছে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দাদের খবর দেওয়া হয়েছে।"...

কর্নেল আরও একটা 'ইভনিং স্টার' এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এবার আশা করি রহস্য অনেক স্পষ্ট হবে।"

"..স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, ক্যাপ্টেন বার্ট পাখিদুটিকে দুটি বহুমূল্য রত্ন গিলিয়েছিলেন। চোরেরা যেভাবেই হোক সেই খবর জানত। ক্যাপ্টেন বার্টের কাছে এ সম্পর্কে তথ্য জানার জন্য কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দাদের পাঠানো হয়েছিল। তিনি কবুল করেছেন। বিদ্রোহের সময় রত্নদুটি লুঠ হওয়ার ভয়ে তিনি একাজ করেছিলেন। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড এখন সেই রত্নদুটি উদ্ধারের জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। আরও জানা গেছে, রত্নদুটি অযোধ্যার নবাবের কাছ থেকে ক্যাপ্টেন বার্ট উপহার পেয়েছিলেন।"...

পড়ার পর বললুম, "এতকাল পরে ওইসব ঘটনার সঙ্গে হাট্টিম রহস্যের কী সম্পর্ক আছে, আমার মাথায় আসছে না।"

কর্নেল হাসলেন। "কালোবাবুর জানালায় রাতবিরেতে সেই পাখিদুটোরই ভূত এসে ভয় দেখাচ্ছে, জয়ন্ত।"

"কেন?"

"সেই নবাবি রত্নদুটো তারা ফেরত চায়।"

আমি নড়ে বসলুম। "অ্যাঁ! বলেন কী? কালোবাবুর কাছে ও জিনিস কীভাবে এল? সে তো সেই লন্ডনের কবরখানা থেকে চোরেরা হাতিয়ে নিয়েছিল। একশো পঁচিশ বছর পরে ঘুঘুডাঙার কালোবরণ মুখুয্যের কাছে.... ধ্যাৎ! আমি এর একবর্ণ বিশ্বাস করি না।"

"কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে একটা যোগসূত্র আছেই।"

"হ্যাঁ—সেটা ওই বিদঘুটে আফ্রিকান পাখি দুটোর ব্যাপারে।"

কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, "আজ সন্ধ্যায় আমরা আবার ঘুঘুডাঙা যাব, জয়ন্ত। তৈরি থেকো। তবে না—গাড়ি করে নয়। বাসে যাব এবং অন্ধকারে মাঠ ঘুরে স্বর্গপুরীতে ঢুকব।"

তিন

দিনটা খুব উত্তেজনার মধ্যে কেটে গেল। পাঁচটায় খবরের কাগজের অফিস থেকে বেরিয়ে গিয়ে কর্নেলের কথামতো লালবাজারের পুলিশ দপ্তরের সামনের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে রইলুম। একটু পরে গেট দিয়ে বেরুতে দেখলুম কর্নেলকে। কাছে এলে বললুম, "পুলিশের দফতরে ঢুকেছিলেন দেখছি। আমি ভেবেছিলুম এখান থেকে বুঝি ঘুঘুডাঙার বাস ধরা যায়।"

কর্নেল বললেন, "বাস ধরব এসপ্ল্যানেডে। এল-২০ নম্বরে বারাকপুর যাব। সেখান থেকে ঘুঘুডাঙার বাস পাব।"

"লালবাজারে কি কোনও সূত্র পেলেন?"

কর্নেল হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, "রোখকে! রোখকে!" তারপর আমাকে হ্যাঁচকা টানে সঙ্গে নিয়ে একটা মিনিবাসের দিকে দৌড়ুলেন। পরে বুঝলুম, এই মিনিবাসটা বারাকপুর যাচ্ছে। ভিড়ে ঠাসাঠাসি অবস্থা।

বারাকপুরে একটা বাসস্ট্যান্ডে নামলুম যখন, তখন সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে। সেখানে ঘুঘুডাঙার বাস পাওয়া গেল। ঘুঘুডাঙার স্টপে নেমে দেখি ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। লোডশেডিং। কর্নেল বললেন, "পেছনে চর লেগেছিল, ডার্লিং! লালবাজারের উল্টোদিকে একটা লোক দাঁড়িয়েছিল। যাই হোক, মনে হচ্ছে তাকে ফাঁকি দিতে পেরেছি।"

আমরা মাঠ ঘুরে স্বর্গপুরীর পেছনে গেলুম। দুজনের সঙ্গেই টর্চ আছে। কর্নেল গতকাল এসেই বাড়ির চৌহদ্দি মুখস্থ করে ফেলেছেন দেখছি। অবশ্য বরাবর তাঁর এসব ব্যাপারে খুব দক্ষতা দেখে আসছি। এবার আর টর্চ জ্বালতে নিষেধ করলেন। আমাকে ইশারা করলেন পেছনে আসতে। এদিকে নিচু পাঁচিল আছে। দোতলায় অনামিকার ঘরে লণ্ঠনের আলো দেখা যাচ্ছে। ওর দাদুর ঘরেও আলোর আভাস পেলুম বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে।

উত্তর পূর্ব কোণে গিয়ে কর্নেল ফিসফিস করে বললেন, "এখানে একটা মন্দির আছে। এস আমরা মন্দিরের কাছে যাই।"

অন্ধকারে ততক্ষণে দৃষ্টি পরিষ্কার হয়েছে। মন্দিরটা পুরনো মনে হল। সামনের চত্বরে একটা আটচালার ওদিকে একটা ঝোপের আড়ালে দু'জনে বসে রইলুম।

বসে আছি তো আছি। বাতাস বইছে। কিন্তু মশার উৎপাত প্রচণ্ড। একসময় ফিসফিস করে বললুম,"এখানে আমরা বসে আছি কেন? মশার কামড়ে যে ঢোল হয়ে গেলুম ফুলে!"

কর্নেল বললেন, "চুপ!"

অমনি দেখলুম, স্বর্গপুরীর দিক থেকে মাটির ওপর টর্চের আলো ফেলে কেউ এগিয়ে আসছে। সে মন্দির চত্বরে এসে একটু দাঁড়াল। এদিক ওদিক তাকাল। তারপর সটান গিয়ে মন্দিরে ঢুকল।

কর্নেল আমাকে খোঁচা মেরে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর পা টিপে টিপে এগিয়ে মন্দিরের দরজায় গিয়েই টর্চ জ্বেলে বললেন, "ডিমদুটো আছে তো মুখুয্যে মশাই?"

দেখলুম, বোঁ-ও করে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন অনামিকার দাদু। মুখ একেবারে সাদা হয়ে গেছে। আর ওঁর একটা হাতে একটা কালো চোঙ যেন।

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, "এই শিবলিঙ্গের নকলটা চমৎকার বানিয়েছেন কিন্তু। এবার দয়া করে ঘর থেকে আসল পাথরের শিবলিঙ্গটা এনে যথাস্থানে বসিয়ে দেবেন। আর এক কাজ করুন, হাট্টিম পাখির ডিম দুটো আমাকে দিন। তাহলে আর আপনাকে উদ্বেগ পোয়াতে হবে না। কেউ ভয় দেখাতেও আসবে না। ডিম দুটো সরকারের শুল্ক দফতরের প্রাপ্য নয় কি মুখুয্যে মশাই? হ্যাঁ—দিন, দিন। ও দুটো কাস্টমসকে ফেরত দিতে হবে।"

নকল শিবলিঙ্গটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও এগিয়ে দিলেন কালোবাবু। একেবারে হতবাক দশা ওঁর। পা দুটো কাঁপছে।

কর্নেল নকল কাঠের তৈরি শিবলিঙ্গ থেকে একটা কাগজের মোড়ক বের করে বললেন, "আপাতত এই নকল শিবলিঙ্গ আগের মতো বসানো থাক। পরে আসলটা এনে বসিয়ে দেবেন। আসুন। আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়।"

কালোবাবু গলার ভেতর থেকে বললেন, "চলুন।"

খিড়কি দিয়ে বাগানে ঢুকে আমরা সোজা বাড়ির দোতলায় ওঁর ঘরে গেলুম। অনামিকা সাড়া পেয়ে বেরিয়েছিল। প্রথমে অবাক হয়ে পরে একটু হেসে ফেলল। ওর দাদুর অবস্থা দেখেই।

কতক্ষণ চুপচাপ থাকার পর কালোবাবু বললেন, "অনি! আমাদের চা এনে দে! গলা শুকিয়ে গেছে।" তারপর কর্নেলের দিকে ঘুরে বললেন, "আপনি কেমন করে জানলেন কে জানে! ব্যাপারটা জানতাম শুধু অনির মা আর আমি। আপনার তো জানার কথা নয়!"

কর্নেল বললেন, "তা ঠিক। তবে ব্যাপারটা অনুমান করতে আমাকে বিশেষ মাথা ঘামাতে হয়নি। ওই ছড়ার ভেতর ডিমের কথা আছে এবং আপনার ছেলে কাস্টমস অফিসার ছিলেন।

তাঁকে স্মাগলাররা খুন করেছিল। দামি রত্নকে সাংকেতিক ভাষায় স্মাগলাররা ডিম বলে। কাজেই...”

বাধা দিয়ে কালোবাবু বললেন, “হ্যাঁ—দেবুর কাছে শুনেছি কথাটা। দেবুকে ওর নিউ আলিপুরের বসায় ফলো করে এসে গুলি করে পালায় ওরা। দেবুর বুকে গুলি লেগেছিল। বউমাকে সে মৃত্যুর আগে শুধু বলতে পেরেছিল, পকেটে দুটো জিনিস আছে। সামলে রাখো। আর কোনও কথা বলতে পারেনি। স্মাগলিং ঘাঁটি থেকে এই রত্ন দুটো উদ্ধার করে বাসায় আসছিল। তখন রাত প্রায় বারোটা।”

“তাহলে আপনার বউমা আপনাকে এ দুটো রাখতে দিয়েছিলেন?”

“হ্যাঁ। কিন্তু আমার মাথায় আসেনি, এ জিনিস সরকারের ঘরে জমা দেওয়া উচিত।”

“আজ রাতে যদি ওরা আপনাকে ভয় দেখাতে না আসে, আর কোনওদিনই আসবে না। কারণ কাল সকালেই জয়ন্তদের কাগজে খবর বেরুবে। ওরা দেখবে পাচার করা রত্ন দুটো সরকারের ঘরে জমা পড়েছে। আর ফিরে পাওয়ার আশা নেই।”

অনামিকা চা নিয়ে এল ট্রেতে, সবাইকে চা দিয়ে একপাশে বসল সে। তারপর বলল, “পালকগুলো পরীক্ষা করেছেন কর্নেল?”

কর্নেল বললেন, “হ্যাঁ। ওগুলো সিন্থেটিক ফাইবার দিয়ে তৈরি নকল পালক।”

“তাহলে ওই বিদঘুটে পাখিদুটোও নকল পাখি?”

“তা আর বলতে? ওরা ভেবেছিল, বুড়োমানুষ—তাঁকে এভাবে ভূতের ভয় দেখালে ডিম দুটো ফেরত পেতে অসুবিধে হবে না।”

কালোবাবু রাগ দেখিয়ে বললেন, “আমি ন্যাকা, না বুদ্ধু? এদুটো দামি জিনিসকে সত্যি সত্যি হাট্টিমাটিমের ডিম ভেবে ফেরত দিতে চাইব?”

“ওরা তাই ভেবেছিল। রিটায়ার্ড স্টেশনমাস্টার। ৭৫ বছর বয়স। তিনি কি আর রত্ন চিনতে পারবেন? তাছাড়া রত্ন দুটো দেখুন, অবিকল সাদা ডিম যেন।”

আমি বললুম, “সব বুঝলুম। কিন্তু দোতলার ওই জানালায় অত উঁচুতে নকল পাখি নিয়ে কীভাবে উঠত ব্যাটাচ্ছেলেরা?”

কর্নেল চাপা গলায় বললেন, “আমার নাক গলানোতে ওরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে—আজ তার যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছে। আমার ধারণা, ওরা মরিয়া হয়ে সম্ভবত আজ রাতেই শেষ চেষ্টা করবে।”

কালোবাবু লাঠি ঠুকে বললেন, “আসুক না! ছাতু করে দেব। দেবুর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব।”

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। “জয়ন্ত তুমি থাকো। আমি একবার চুপিচুপি থানা থেকে আসছি। দেখি, লালবাজারের ওঁরা থানায় এসে গেছেন নাকি। আমি খিড়কি দিয়ে বেরুব। অনি, তুমি তোমাদের কানাইকে বলো, খিড়কির দরজাটা আটকে দিয়ে আসবে।”...

চার

ঢং ঢং করে দেয়ালঘড়িতে রাত বারোটা বাজল। কালোবাবুর ঘরে আলো নিভিয়ে আমরা বসে আছি। কর্নেল থানা থেকে ফিরে এসেছেন। আমরা ওত পেতে আছি হাট্টিমাটিমের অপেক্ষায়।

হঠাৎ পুবের সেই জানালার খুটখাট শব্দ হল। তারপর ভুতড়ে গলায় হিঁ হিঁ শব্দ করে কেউ বলে উঠল, “আঁমাদের ডিঁমদুটো দেঁ! এঁক্ষুনি দেঁ! কী? দিঁবিনে? ঠুঁকরে চোঁখ উঁপড়ে নেব।”

বারণ ছিল কথা বলতে! কিন্তু কালোবাবু টর্চ জ্বেলে লাঠি উঁচিয়ে গর্জে উঠলেন, “তবে রে হারামজাদার দল! দিচ্ছি তোদের ডিম!”

টর্চের আলোয় দেখলুম, জানালায় দুটো প্রকাণ্ড পেঁচার মতো মুখ, মাথায় দুটো শিং, ভয়ংকর বিদঘুটে হাট্টিমাটিম টিম। চোখ দুটো যেন জ্বলছে!

আর তারপরই ওপাশে নিচের বাগানে যেন হুলস্থূল শুরু হয়েছে। গুলির শব্দ। পাকড়ো পাকড়ো চিৎকার। হাট্টিম দুটোও সাঁৎ করে সরে গেল জানালা থেকে। কর্নেল বললেন, "জয়ন্ত! শিগগির!"

নিচে নেমে বাড়ি ঘুরে পেছনের বাগানে গিয়ে দেখি, একদঙ্গল পুলিশ, দুটো লোককে পাকড়াও করে ফেলেছে। ঘাসের ওপর পড়ে আছে হাট্টিমদুটো। তাদের পায়ের সঙ্গে দুটো লম্বা বাঁশ বাঁধা। বুঝলুম ওই বাঁশের সাহায্যেই ওদের দোতলার জানালায় তুলে ধরত এরা।

আরও মজা আবিষ্কৃত হল। একটির মুখের ভেতর ছোট্ট মাইক বাসানো। একটা তার পালকের ভেতর দিয়ে জড়িয়ে-মড়িয়ে নেমে এসেছে। ঘাসের ওপর পড়ে আছে একটা স্পিকার। স্পিকারের সঙ্গে ব্যাটারি ফিট করা আছে। খুব ফন্দি তো এদের! স্পিকারে ভূতুড়ে স্বরে ডিম ফেরত চাওয়া হচ্ছিল তাহলে।

এখন মুখোশ পরে না থাকলেও লোকদুটোর গড়ন দেখেই চিনতে পারছিলুম, এরাই কাল আমার গাড়ির টায়ার ফাঁসিয়েছিল।

লালবাজারের গোয়েন্দা অফিসার সাবির আমেদ হাসতে হাসতে বললেন, "যাক। বহুদিন ফেরারি হয়ে বেড়াচ্ছিল দুই কুখ্যাত ডাকু। কর্নেল, এরাই সেই জগু আর হায়দার। পোর্ট এলাকায় এদের অত্যাচারে আমরা অতিষ্ঠ হয়েছিলুম তিনটে বছর। বিদেশ থেকে জাহাজে দামি মাল এলেই এদের দলবল সেগুলো সরিয়ে ফেলত।"

কালোবাবু ডাকু দু'জনের সামনে মুখ খিঁচিয়ে বললেন, "ডিঁম চাঁই? অ্যাঁ?" তারপর ভেংচি কেটে সুর করে ছড়া আওড়ালেন :

"হাট্টিমাটিম টিম
তারা মাঠে পাড়ে ডিম
তাদের খাড়া দুটো শিং
তারা হাট্টিমাটিম টিম।"

অনামিকা দাদুর কাণ্ড দেখে খিল খিল করে হেসে উঠল।...

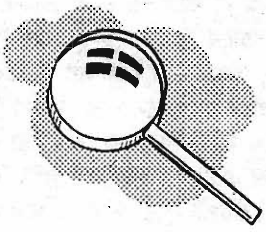

কালো কুকুর

সেবার শরৎকালে একদিন গোয়েন্দাপ্রবর কর্নেল নীলাদ্রি সরকার একথা-ওকথার পর হঠাৎ বললেন, "ডার্লিং! তোমার কি ছিপে মাছধরার নেশা আছে?"

শুনে একটু মনমরা হয়ে বললুম, "হুঁ, ছিল। ভীষণ ছিল। কিন্তু দৈনিক সত্যসেবকে ঢোকার পর সারাক্ষণ খবরের পেছনে দৌড়ুব, নাকি ছিপ ফেলে জলের ধারে বসে থাকব?"

"থাকবে—যদি ছিপ ফেলে জলের ধারে বসে থেকেও তোমার কাগজের জন্য তোফা কোনও খবর জোটে।" বলে ধুরন্ধর বৃদ্ধ মুচকি হেসে সাদা দাড়িতে আঙুলের চিরুনি টানতে থাকলেন।

অবাক হয়ে বললুম, "ব্যাপারটা কী বলুন তো?"

কর্নেল বললেন, "মুর্শিদাবাদে রোশনিবাগ নামে একটা জায়গা আছে। সেখানে একটা প্রকাণ্ড ঝিলে নাকি পুরনো আমলের বিশাল সব মাছের আড্ডা। কিন্তু সম্প্রতি ওই ঝিলে নাকি পিশাচের উপদ্রব হয়েছে। যে ছিপ ফেলতে একলা যায়, সে আর বাড়ি ফেরে না।"

"বলেন কী?"

"একটা ব্যাপার বোঝা যায়! ছিপ ফেলে মাছ ধরতে বড় একাগ্রতার দরকার। ফাতনার দিকে চোখ রেখে বসে থাকতে হয়। আর সেই সুযোগে পিশাচ পেছন থেকে পা টিপে-টিপে এসে তাকে ধরে।"

"আপনি বিশ্বাস করেন এ-কথা?" হাসতে হাসতে বললুম, "পিশাচ বলে সত্যি কিছু আছে নাকি?"

কর্নেল গম্ভীর হয়ে বললেন, "জানি না। তবে ওখানকার লোকে নাকি পিশাচটাকে দেখেছে।"

"কেমন চেহারা তার?"

"কুকুরের মতো। কালো একটা কুকুরের বেশে সে আসে। তারপর আচমকা পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা কামড়ে ধরে! টানতে টানতে নিয়ে যায়।"

জেদ চড়ে গেল মাথায়। বললুম, "ঠিক আছে। তাহলে কালই আমাকে নিয়ে চলুন সেখানে। যতসব আজগুবি গল্প!"

পরদিন ভোরে জিপে রওনা হয়ে দুপুরের মধ্যে আমরা রোশনিবাগ পৌঁছে গেলুম। নবাবি আমলের সমৃদ্ধ আধাশহুরে গ্রাম। আমরা উঠলুম সেচ দফতরের বাংলোয়। ঝিলটা বাংলো থেকে দু-কিলোমিটার দূরে জঙ্গুলে পরিবেশে রয়েছে। আসলে এটা গঙ্গারই পুরনো একটা খাত। ঝটপট খাওয়া সেরে ছিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। আসার সময় চৌকিদার পইপই করে বারণ করল, যেন দু'জনে সবসময় কাছাকাছি থাকি। নইলে পিশাচের পাল্লায় পড়ব।

কিন্তু একলা না হলে পিশাচটা আসবে না। তাই হাসতে হাসতে কর্নেলকে বললুম, "আপনি বরং পাখি-প্রজাপতির খোঁজে ঘুরতে থাকুন। আমি পিশাচটার প্রতীক্ষা করি।"

কর্নেলও হেসে বললেন, "তুমি না বললেও আমি জলের ধারে বসে থাকতে রাজি হতুম না জয়ন্ত!" তারপর বাইনোকুলারটা চোখে রেখে গাছপালায় পাখি খুঁজতে থাকলেন। যখন চার এবং ছিপ ফেলে জলের ধারে বসেছি, তখন উনি জঙ্গলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেছেন। এবার কিন্তু একটু গা-ছমছম করতে থাকল। বারবার পিছনে ঘুরে দেখে নিচ্ছি। বুদ্ধি করে সঙ্গে একটা লোহার রড এনেছিলুম। সেটা পাশে রেখে ফাতনার দিকে চোখ রেখে বসে আছি। বুজকুড়ি উঠতে শুরু করেছে। চারে মাছ আসার লক্ষণ এটা। ফাতনা নড়লেই খ্যাঁচ মারব। কিন্তু তারপরই পেছনে গরগর গর্জন শুনে চমকে উঠলুম। ঝটপট ঘুরে দেখি, সত্যি একটা কালো কুকুর—বীভৎস হাঁ করে

চাপা গর্জন করছে সে। তার লাল মুখের দাঁতগুলো ঝকমক করছে হিংস্রতায়। ক্রূর কুতকুতে চোখে হিংসা ঠিকরে পড়ছে। লকলকে জিভ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় কি রক্ত ঝরছে? একলাফে রডটা বাগিয়ে ছুটে গেলুম মরিয়া হয়ে।

কুকুরটা পিছিয়ে গেল। তারপর পালাতে থাকল। কিন্তু রাগে আমার তখন মাথার ঠিক নেই। ওর মাথাটা রডের বাড়ি মেরে দু ফাঁক না করে ফিরছি না—যা থাকে বরাতে। উঁচু-নিচু গাছপালা, কাঁটাঝোপ, তারপর চষা খেত, ঘাসে ঢাকা খোলামেলা পোড়ো জমি পেরিয়ে প্রাণীটা ছুটে চলেছে। আমিও ছুটে যাচ্ছি। মাঝে-মাঝে সে পেছনে ঘুরে যেন আমাকে দেখে নিচ্ছে ক্রূর এবং মুখভঙ্গি করে গর্জাচ্ছে। কাঁটায় আমার প্যান্টশার্ট ততক্ষণে ফর্দাফাঁই অবস্থা। জুতোয় জলকাদা লেগেছে প্রচুর। একখানে শুকনো লতাপাতায় জড়িয়ে আছাড়ও খেলুম। তারপর মনে হল, কে আমার নাম ধরে ডাকছে, "জয়ন্ত! জয়ন্ত!" সম্ভবত কর্নেল ব্যাপারটা দেখতে পেয়েছেন। আমি কান করলুম না। কালো কুকুরটা মিটার-পঁচিশেক দূরত্বে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে আছে। তেমনি রক্তমাখা মুখ। কুতকুতে জ্বলন্ত চোখ। জিভ থেকে ফোঁটা-ফোঁটা যেন রক্ত ঝরছে। আবার হুংকার দিয়ে দৌড়লুম। পিশাচ হোক, আর যাই হোক, আজ ওর একদিন কি আমার একদিন।

গাছপালার ফাঁক দিয়ে রেললাইন দেখা যাচ্ছিল। সামনে ভাঙাচোরা একটা বাড়িও দেখতে পেলুম। তাহলে বোধ করি রোশনিবাগ স্টেশন-বাজারের পেছনদিকটায় এসে পড়েছি।

কালো কুকুরটা বাড়িটার কাছে গিয়ে অদৃশ্য হল। বাড়িটার কাছে যেই এসেছি, এক অদ্ভুত কাণ্ড শুরু হল। আচমকা চারদিক থেকে কারা আমাকে খুদে হাতে যাচ্ছেতাই চিমটি কাটতে থাকল। চোখ বুজে কুঁজো হয়েছিলুম, তারপর রডটা তুলে বাঁইবাঁই করে ঘোরাতে-ঘোরাতে চোখ খুলে দেখি, একঝাঁক চামচিকের পাল্লায় পড়েছি। চামচিকে যে এমন চিমটি কাটতে জানে, কে জানত! দ্বিগুণ জোরে রডটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চামচিকেগুলো ভাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলুম। কিন্তু খুদে জীবগুলো সমানে হামলা চালিয়ে যেতে থাকল। তখন হার মেনে দৌড়ে গিয়ে সামনের ভাঙা ঘরটার ভেতর ঢুকে পড়লুম।

চামচিকের ঝাঁকটা সেখানেও ঢুকে হামলা করল। বাড়িটার কোনও ঘরে দরজা-জানলা বলতে কিছু নেই। সব কারা হয়তো খুলে নিয়ে গেছে। এঘর থেকে ওঘর, তারপর আরেকটা ঘর—কোনও ঘরের ভেতর জঙ্গল গজিয়েছে এবং ছাদ ভাঙা, কড়িকাঠ ঝুলে রয়েছে। শেষে যে ঘরটার সামনে গেলুম, তার দরজা আস্ত আছে। দরজাটা খোলা। ভেতরে আসবাবপত্র দেখা যাচ্ছিল। হাঁফাতে হাঁফাতে সে-ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিলুম।

তারপর ঘুরে দেখি, ঢ্যাঙা-শুঁটকো চেহারার এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন খাটের পাশে এবং আমার দিকে কেমন চোখে তাকিয়ে আছেন, ঠোঁটের কোনায় হাসিটাও যেন অস্বস্তিকর। ভদ্রলোকের পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, হাতের আঙুলে কয়েকটা পলাবসানো আংটি। একমাথা সাদা চুল।

কিন্তু তার চেয়ে অস্বস্তিকর, ওঁর হাতে একটা চকচকে ছুরি।

আমি কিছু বলার আগেই উনি ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন "রডটা দেখি।" তারপর আমার কাছে এসে হাত থেকে রডটা প্রায় ছিনিয়ে নিলেন। পাগল নয় তো? আমি একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেলুম। উনি রডটা জানলা গলিয়ে ছুড়ে ফেললেন। কিন্তু ঠোঁটের কোনায় সেই হাসিটা লেগে আছে। চেহারায় কেমন ঠাণ্ডা হিংসার ছাপ। ভয়ে-ভয়ে এবং অপ্রস্তুত মুখে বললুম, "আপনার ঘরে ঢুকে পড়ার জন্য ক্ষমা করবেন। চামচিকের পাল্লায় পড়ে..."

কথা কেড়ে ভদ্রলোক খিকখিক করে হেসে বললেন, "খুব জ্বালিয়েছে বুঝি? তা ওদের পাল্লায় পড়লেন কীভাবে?"

"একটা কালো কুকুর তাড়া করে আনছিলুম। ঝিলে ছিপ ফেলে বসে ছিলুম। কোত্থেকে ওই কুকুরটা গিয়ে ঝামেলা করছিল।"

ভদ্রলোক ওপাশে ঘুরে বললেন, "দেখুন তো এই কুকুরটা নাকি।"

দেখেই চমকে উঠলুম। এতক্ষণে চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার হয়েছে। ঘরটা বেশ বড়। কোনার দিকে একটা বেদির-মতো উঁচু জায়গায় সেই সাংঘাতিক চেহারার কালো কুকুরটা দাঁড়িয়ে আছে চারপায়ে। সেই হিংস্র মুখভঙ্গি। রক্তলাল হাঁ-করা মুখ। ধারালো দাঁত আর লকলকে জিভ।

কিন্তু আশ্চর্য, কুকুরটা মমির মতো স্থির। শুধু তার হিংসুটে চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। যেন এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার ওপর।

ভদ্রলোক হাসলেন আবার। চোখ নাচিয়ে বললেন, "কী মনে হচ্ছে? সেই কুকুরটা না!"

গলা শুকিয়ে গেছে আতঙ্কে। বললুম, "কিন্তু ওটা তো মনে হচ্ছে স্টাফ-করা একটা কুকুর!'

"হ্যাঁ। আমার প্রিয় কুকুর জনি। মৃত্যুর পর ওর চামড়া ছাড়িয়ে নিয়েছিলুম। তারপর কাঠের গুঁড়ো, তুলো, স্পঞ্জ এসব জিনিস স্টাফ করে ওর চেহারাটা ফিরিয়ে এনেছি। দারুণ জ্যান্ত দেখাচ্ছে, না?"

সায় দিয়ে বললুম, "দেখাচ্ছে। কিন্তু ..."

"কিন্তু কিসের এতে?" ভদ্রলোক এগিয়ে গিয়ে কুকুরটার পিঠে হাত রাখলেন। "আমি ট্যাক্সিডার্মি অর্থৎ চামড়াবিদ্যায় দক্ষতা অর্জন করেছি। এ তার যৎকিঞ্চিৎ নমুনা। আপনি চামচিকের কথা বলছিলেন। দেখুন তো, ওই চামচিকেগুলো নাকি?"

দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আবার আমায় চমক জাগল। সাদা দেয়ালের গায়ে একঝাঁক চামচিকে সেঁটে রয়েছে। জ্বলজ্বলে নীল চোখ তাদের। দেখতে দেতে শরীর হিম হয়ে গেল।

ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে একটা চামচিকে তুলে হাতের তালুতে রেখে বললেন, "ভীষণ জ্যান্ত দেখাচ্ছে, তাই না? যদি ছুরি দিয়ে কাটি, রক্ত বেরুতেও পারে, বলা যায় না।"

বললুম, 'ট্যাক্সিডার্মিতে সত্যি আপনার অসাধারণ দক্ষতা। কিন্তু ওরা তো মৃত!"

"হ্যাঁ—আপাতদৃষ্টে মৃত।" বৃদ্ধ আবার মুচকি হেসে চোখ নাচিয়ে বললেন, "কিন্তু ওরা জীবিত হতে পারে। সেটাই আমার ট্যাক্সিডার্মির নতুন দিক। আশা করি, তার পরিচয় চমৎকারভাবে পেয়েছেন। এবার আসুন, আপনাকে আরেকটা জিনিস দেখাই।"

কালো কুকুরটার পাশ দিয়ে ভয়ে-ভয়ে এগিয়ে ওঁকে অনুসরণ করলুম। পাশের ঘরে ঢুকলে উনি দরজাটা এঁটে দিলেন। অস্বস্তিটা বেড়ে গেল। বৃদ্ধ এ-ঘরের জানালা দুটো খুলে দিয়ে বললেন, "এবার একে দেখুন।"

যা দেখলুম, আতঙ্কে আমার মাথা ঘুরে উঠল। তেমনি বেদির ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক—পরনে প্যান্ট-শার্ট, পায়ে জাঙ্গলবুট আমারই মতো, হাতে একটা মাছধরা ছিপ এবং কাঁধে কিটব্যাগ। একেবারে জ্যান্ত দেখাচ্ছে তাকে। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে, ঠোঁটে একটু হাসি। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "সর্বনাশ!"

"সর্বনাশ কিসের?" বৃদ্ধ চোখ কটমট করে বললেন। "মানুষ মরণশীল। তার শরীর একদিন গলে পচে নষ্ট হয়ে যায় প্রাকৃতিক নিয়মে। হিন্দুরা অবশ্য চিতার আগুনে পুড়িয়ে ফেলে। এই লোকটার শরীরও ধ্বংস হয়ে যেত। অথচ ওকে আমি অমরত্ব দিয়েছি। কখনও-সখনও ওর ছিপ ফেলা নেশার কথা বিবেচনা করে ওকে ঝিলে ছিপ ফেলতে যেতেও অনুমতি দিই। যাই ভাবো আমাকে, আমি কিন্তু এসব ব্যাপারে খুব উদার।"

ভয়ে-ভয়ে সায় দিলুম। "আজ্ঞে হ্যাঁ। তা তো বটেই।"

বৃদ্ধ হঠাৎ হাত বাড়িয়ে খপ করে আমার হাত ধরে চাপা গলায় বললেন,"তুমি অমরত্ব চাও না?"

আঁতকে উঠে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে বললুম, "না, না! হাত ছাড়ুন আপনি।"

বৃদ্ধের গায়ে প্রচণ্ড জোর। আর হাতটাও কী ভীষণ ঠাণ্ডাহিম! রক্ত জমে যাচ্ছিল। খিকখিক করে হাসতে হাসতে বললেন, "তেমন কিছু যন্ত্রণা হবে না। জাস্ট একটু মাথা ঘুরবে। গয়ে মলম

মাখিয়ে দিয়ে চামড়াটা ছাড়িয়ে নেব। তারপর তোমার চামড়ার ভেতরে কাঠের গুঁড়ো, তুলো, স্পঞ্জ ঠেসে দেব। ব্যস! অমর হয়ে যাবে।"

বলে কী! আমার জ্যান্ত শরীরের চামড়া ছাড়িয়ে নেবে আর তেমন কিছু যন্ত্রণা হবে না! প্রচণ্ড আপত্তি জানিয়ে বললুম, "আমি অমর হতে চাইনে। হাত ছেড়ে দিন।"

বৃদ্ধের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। "দেখো বাপু, তোমার এমন সুন্দর চামড়ায় খুঁত হবে বলে ছুরির খোঁচা মারছিনে। এর আগে এমনি করে গোটাতিনেক চামড়া নষ্ট করেছি। বরবাদ হয়ে গেছে এক্সপেরিমেণ্ট। জনার্দন বক্সির এক কথা। নড়লেই খোঁচা খাবে। যাও, টেবিলে শুয়ে পড়ো লক্ষ্মী ছেলের মতো।"

তাহলে এই পাগলা ট্যাক্সিডার্মিস্টের নাম জনার্দন বক্সি? কাকুতি-মিনতি করে বললুম, "প্লিজ জনার্দনবাবু! আমাকে ছেড়ে দিন। আপনার এক্সপেরিমেন্ট তো সফল হয়েছে। আর কেন?"

জনার্দন বক্সি খিকখিক করে হেসে বললেন, "আহা ভয় নেই। ভয় নেই। টেরই পাবে না।" তারপর সম্ভবত মলমের বোতল আনতে যেই ঘুরেছেন এবং হাতটা একটু আলগাও হয়েছে, এক ধাক্কায় ছাড়িয়ে নিয়ে দরজা খুলে একলাফে পাশের ঘরে গিয়ে পড়লুম। তারপর একেবারে বাইরে।

ভূতুড়ে চামচিকেগুলো হামলা করল আবার। পেছনে সেই কালো কুকুরটাও গর্জে তেড়ে এল কোত্থেকে। আমি চোখ বুজে নাক-বরাবর দৌড় দিলুম। কিছুটা এগিয়ে একটা গাছের শেকড়ে ঠোক্কর খেয়ে পড়তেই কুকুরটা আমাকে বাগে পেল। বিকট গর্জন করে ঝাঁপ দিল সে। সেই সঙ্গে যেন আকাশ ফাটানো একটা শব্দও কানে এল।

ভয়ের চোটে অজ্ঞান হয়ে গেলুম সেই মুহূর্তে!...

যখন জ্ঞান হল, তাকিয়ে দেখি বাংলোয় শুয়ে আছি। আলো জ্বলছে। বিছানার পাশে বসে আছেন আমার বৃদ্ধ বন্ধু। একটু হেসে বললেন, "আশা করি সুস্থ হয়েছ ডার্লিং! না—না, অমন করে চারপাশে তাকিয়ে দেখার কিছু নেই। জনার্দন বক্সির কালো অ্যালসেশিয়ানটাকে বাধ্য হয়ে গুলি করে মেরেছি।"

অবাক হয়ে বললুম, "কিন্তু ওটা তো সত্যিসত্যি ভূত অথবা পিশাচ! কারণ বক্সিবাবু ওর মরা দেহটা স্টাফ করে রেখেছেন দেখেছি।"

"বক্সির দুটো কুকুর ছিল। দেখতে একই রকম। কোনও কারণে একটা কুকুর মারা পড়লে তাকে সে স্টাফ করে রেখেছিল। আর দ্বিতীয় কুকুরটাকে সে মানুষের মাংস খাওয়ানো শিখিয়েছিল। চামড়া ছাড়িয়ে মাংসগুলো খেতে দিত।"

"কিন্তু চামচিকেগুলো?"

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, "কিছু চামচিকে মেরে বক্সিবাবু স্টাফ করে রেখেছিল বটে। তবে তোমার ওপর হামলা করেছিল যারা, তারা ভূত নয়। জ্যান্ত চামচিকে। তাদেরও সে মানুষের মাংস খাওয়ানো শেখাত। যাই হোক, তোমার মাংস খুবলে নিতে পারেনি ওরা । খুব লাফালাফি করেছিলে কি না।"

"ওই পাগলা খুনিটাকে ধরিয়ে দিন এবার পুলিশের হাতে!"

"দিয়েছি। এতক্ষণ সে থানার লক-আপে।" বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। টেবিল থেকে এক গ্লাস গরম দুধ এনে বললেন, "খেয়ে নাও ডার্লিং! গায়ে জোর পাবে। কাল সকালে আবার গিয়ে ঝিলে ছিপ ফেলতে আশা করি আর ভয় পাবে না। আমার ধারণা, ঝিলের মাছগুলো বেশ বড়োই।"

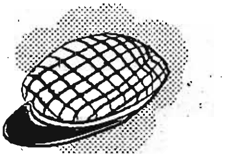

ঘটোৎকচের জাগরণ

সেহরাগড় ফরেস্ট বাংলোয় ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। নাম ডক্টর আর পি গুন্টা। তিনি এক বিস্ময়কর মানুষ!

প্রথমে চোখে পড়েছিল ওঁর অস্বাভাবিক দৈর্ঘ্য! অত লম্বা মানুষ গিনেস রেকর্ড বইতেও উল্লিখিত হননি বলে আমার বৃদ্ধ বন্ধু আক্ষেপ করেছিলেন। তাই শুনে ডাঃ গুন্টা হাসতে হাসতে বলেন, "কী দরকার? আসলে কী জানেন, নিজের এই লম্বা হওয়া নিয়ে আমার নিজেরই ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে। রাস্তাঘাটে বেরুলে সাড়া পড়ে যায়। যেখানে যাই, পেছনে ভিড়। তার ওপর সমস্যা হল, দরজার মাপ। কোনও বাড়িতে ঢুকতে হলে প্রতি মুহূর্তে আমাকে নিজের উচ্চতা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হচ্ছে। আবার অনেক সময় মনেও থাকে না কথাটা এবং মাথায় ঠোক্কর খাই। এই দেখুন না, কী অবস্থা হয়েছে।"

কপালে অনেক কালো ছোপ দেখে সমস্যাটা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম। বললাম, "আপনার এই দৈর্ঘ্যের সঙ্গে প্রস্থটাও যদি বাড়ত, তাহলে লোকেরা আপনাকে ভয়ও পেত।"

ডঃ গুন্টা বললেন, "রক্ষে করুন মশাই। তাহলে লোকেরা আমাকে ঘটোৎকচ বলতে শুরু করত। কী বলে কর্নেল?"

কর্নেল চোখ বুজে সাদা দাড়ি টানাটানি করছিলেন। বললেন, "আচ্ছা ডঃ গুন্টা, কবে থেকে আপনি লম্বা হতে শুরু করেছেন?"

ডঃ গুন্টা কর্নেলের কথায় অবাক হলেন যেন। "তা তো লক্ষ্য করিনি। তবে যতদূর মনে পড়ছে, মাস তিনেক আগে একদিন ভোরবেলা বাথরুমে ঢুকতে গিয়ে চৌকাঠে ঠোক্কর লাগল মাথায়। তখন...মাই গুডনেস!"

উনি আরামকেদারা থেকে সোজা হলেন হঠাৎ। কর্নেল বললেন, "কী ব্যাপার?"

"আমার মতো বোকা দেখছি পৃথিবীতে নেই।" ডঃ গুন্টা মুখে হতাশার ভাব ফুটিয়ে বললেন, "কী আশ্চর্য! সত্যি তো ব্যাপারটা ভেবে দেখা উচিত ছিল আমার। ওই প্রথম মাথায় ঠোক্কর খাওয়ার আগের দিন সম্ভবত আমার উচ্চতা প্রায় স্বাভাবিক ছিল। ...হ্যাঁ, স্বাভাবিক ছিল কারণ তার আগে তো বাথরুম কেন, কোনও ঘরের দরজার সামনে আমাকে মাথা হেঁট করতে হয়নি। কর্নেল, এই ব্যাপারটা আমার লক্ষ্য করতে ভুল হয়ে গেছে দেখছি।"

কর্নেল ওঁকে যেন আশ্বাস্ত করতে চেয়েই বললে, "পৃথিবীর অধিকাংশ বিজ্ঞ মানুষই নিজের সম্পর্কে অসচেতন। ও নিয়ে দুঃখ করার কিছু নেই। পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের একটা হেরফের ঘটলে মানুষ বামন কিংবা দৈত্য হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, তাদের গায়ে প্রচণ্ড শক্তিও এসে যায়।"

ডঃ গুন্টা আস্তে বললেন, "তা ঠিক। কিন্তু আমার বয়স প্রায় পঞ্চান্ন হয়ে এল। এই বয়সে হঠাৎ আমার পিটুইটারি গ্ল্যান্ড কেন এ খেল দেখাল বোঝা যাচ্ছে না। অবশ্য আমি অনেকের তুলনায় একটু লম্বা ছিলাম ছেলেবেলা থেকেই। হঠাৎ একটা যেন দুর্ঘটনা ঘটল। আমি রাতারাতি শত ফুট উঁচু হলাম। অথচ খেয়াল পর্যন্ত করলাম না। কর্নেল, ব্যাপারটা ভারি গোলমেলে মনে হচ্ছে। আমি যাই।"

উনি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। তারপর দরজা দিয়ে মাথা যতদূর সম্ভব নিচু করে বেরিয়ে গেলেন! কর্নেল তাকিয়ে রইলেন অবাক চোখে। আমিও।

ডঃ গুন্টা উঠেছিলেন পাশের ঘরে। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে সে ঘরের দরজায় তালাবন্ধ দেখলাম। বললাম, "কর্নেল, ডঃ গুন্টা কি বাংলো ছেড়ে চলে গেলেন নাকি!"

এই বাংলোটা একেবারে সংরক্ষিত জঙ্গলের ভেতর একটা টিলার গায়ে! নিচে ছোট্ট এক নদী। কাঠের সাঁকো পেরিয়ে বন-জঙ্গল শুরু। দুর্গে পৌঁছুতে ঘন্টাখানেক লাগল।

কিন্তু যা ভেবেছিলাম, তাই ঘটল। প্রকৃতিবিদ দুর্গের ওপর থেকে বাইনোকুলারে কী পাখি দেখতে পেয়ে আমার অস্তিত্ব ভুলে গেলেন এবং ধ্বংসাবশেষের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। দেয়ালের ওপর বসে আমি নিচের জঙ্গলের শোভা দেখতে থাকলাম।

কতক্ষণ পরে পেছনে কী একটা শব্দে চমকে উঠে দেখি, ডঃ গুন্টা একটা প্রকাণ্ড পাথর ধরে টানাটানি করছেন। আমি ভীষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

ডঃ গুন্টা চাপা হুঙ্কার দিয়ে এক ঝটকায় বিশাল পাথরটা দু'হাতে শূন্যে তুললেন। তারপর সেটা নিচে ছুড়ে ফেললেন। নিচে বিকটা শব্দ করে পাথরটা পড়ল এবং গড়াতে গড়াতে চলল। ডঃ গুন্টা হাত নাড়তে নাড়তে হাসিমুখে তাকালেন আমার দিকে। মুখের চেহারায় কেমন অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করে আমার অস্বস্তি হল। বললাম, "ডঃ গুন্টা। আপনি দেখছি সুপারম্যানও বটে!"

ডঃ গুন্টা আমার কাছে এগিয়ে এসে সহাস্যে বললেন, "মিঃ চৌধুরি, আমার ইচ্ছে করছে আপনাকে তুলে দূরে ছুড়ে ফেলি!"

আঁতকে উঠে বললাম, "সে কী। না—না। দয়া করে ইচ্ছেটা একটু সামলে রাখুন মশাই!"

"আমাকে ঘটোৎকচই মনে হচ্ছে না আপনার?"

"হচ্ছে। খুব হচ্ছে। আপনি ঘটোৎকচই বটে।"

ডঃ গুন্টা ফিকফিক করে হাসতে হাসতে বললেন, "খুব ভয় পেয়েছেন মনে হচ্ছে?"

"পেয়েছি বৈকি! আপনি অমন প্রকাণ্ড পাথরটা যেভাবে ছুড়ে ফেললেন!"

"আরও শক্তি দেখবেন নাকি?" বলে ডঃ গুন্টা দুর্গের উঁচু পাঁচিলটার দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর দু'হাতে ঠেলতে শুরু করলেন। প্রকাণ্ড পাঁচিলটা সশব্দে ভেঙে পড়ল।

আমি এত ভয় পেয়ে গেছি যে পালিয়ে যাওয়ার জন্য এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিরাপদ পথ খুঁজছি। ডঃ গুন্টা ফটকের পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন— আগের মতো দুহাতের ধুলো ময়লা ঝাড়তে ব্যস্ত। মুখে তৃপ্তির হাসি—কিন্তু কেমন অস্বাভাবিকতাও ফুটে আছে।

হঠাৎ উনি ফের চাপা হুঙ্কার দিয়ে লাফ মারলেন এবং ওই লাফে অন্তত ফুট বিশেক উঁচু ফটকের মাথায় পৌঁছে গেলেন।

অমনি আমি নিচু পাঁচিলের ভাঙা অংশটা পেরিয়ে নামতে শুরু করলাম। এদিকটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে। অজস্র পাথর আর ঝোপজঙ্গলে ভর্তি। ভাগ্যিস নিচের গভীর গড়খাইটা শুকনো ছিল। হাঁচড়-পাঁচড় করে ওপারে উঠতেই প্রকৃতিবিদের দেখা পেলাম। রুদ্ধশ্বাসে বললাম, "ডঃ গুন্টা সুপারম্যান হয়ে গেছেন! কী সব সাংঘাতিক কাণ্ড শুরু করেছেন, দেখলে বুদ্ধিসুদ্ধি ঘুলিয়ে যাবে!"

কর্নেল কিন্তু হাসছিলেন। বললেন, "এখান থেকে বাইনোকুলারে আগাগোড়া সবটাই আমি দেখেছি ডার্লিং! তবে ডঃ গুন্টাকে তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই!"

"নেই মানে? আমাকে ছুড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে বলেছিলেন!"

কর্নেল পা বাড়িয়ে বললেন, "সেই গল্পটা জানো তো? এক এক পাগল যাচ্ছেতাই পাগলামি শুরু করেছে। একটা লোক যেই বলেছে, ওরে! দেখিস যেন ঢিল ছোড়ে না— অমনি পাগল বলে উঠল, বাঃ! মনে পড়িয়ে দিয়েছে রে! বলে সে তখন ঢিল ছুড়তে লাগল। ডঃ গুন্টাকে আমরা হয়তো ওইরকম মনে পড়িয়ে দিয়েছি। যাই হোক, এস—বাংলোয় ফেরা যাক।"...

বিকেলে লনে বসে আছি কর্নেলের সঙ্গে, সেই সময় ডঃ গুন্টাকে ফিরতে দেখলাম। হাসিমুখে সম্ভাষণ করে বললেন, 'সেহরাগড় ফরেস্টকে জব্দ করে এলাম, কর্নেল! শ'খানেক শালগাছ

উপড়েছি। একটা বাঘকে ছাতু করে দিয়েছি। একটা দাঁতাল হাতিকে আধমরা করে দিয়েছি। ঠ্যাং ভেঙে পড়ে আছে। আর ফোর্টের অবস্থাটাও দেখে আসুন গিয়ে। একখানা দেওয়ালও আস্ত নেই!"

কর্নেল বললেন, "কিন্তু আপনার খাওয়া-দাওয়া? চৌকিদারকে আপনার খাবার টেবিলে রাখতে বলেছিলাম। দেখুন তো।"

ডঃ গুন্টা বললেন, "আরে তাই তো! আমার খিদে পেয়েছে যে! আমি খাব—প্রচুর।"

তারপর ধুপধাপ শব্দে মাটি কাঁপিয়ে দৌড়ুলেন। কর্নেল চেঁচিয়ে বললে, "মাথায় ঠোক্কর লাগবে ডঃ গুন্টা!"

ডঃ গুন্টা তক্ষুণি নিচু হয়ে বারান্দায় উঠলেন এবং দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। তারপর মিনিট দুই হয়েছে, পর্দা তুলে চৌকিদারকে ডাকতে থাকলেন। চৌকিদার এসে বলল, "হুজুর"।

"এটুকু খানা তুমি আমার জন্য রেখেছ? আমি কি মাছি, না পিঁপড়ে?"

চৌকিদার বেজার মুখে বলল, "আর তো কিছু নেই হুজুর।"

"চলো দেখি, তোমার কিচেনে কী আছে।"

ডঃ গুন্টা কিচেনের দিকে গেলেন। চৌকিদারও গুটিসুটি পেছনে পেছনে গেল। কিন্তু একটু পরে সে দৌড়ে এল আমাদের কাছে।

"হুজুর! হুজুর! উনি আদমি না রাক্ষস? বাপরে বাপ! চাল ময়দা সবজি যা ছিল—সব আস্ত গিলে খাচ্ছেন! একটা ব্যবস্থা আপনারা করুন হুজুর!"

ডঃ গুন্টার হাঁক শোনা গেল, "চৌকিদার! চৌকিদার!"

চৌকিদার চাপা গলায় বলল, "দোষ-গলতি মাফ করবেন হুজুর। আমি এখনি ওপরয়ালার কাছে রিপোর্ট করতে চললুম।"

বেচারা চৌকিদার প্রায় লেজ তুলে দৌড়ুনোর মতো গেট দিয়ে উধাও হয়ে গেল। তারপর কিচেনের দিক থেকে ডঃ গুন্টা বেরিয়ে এলেন। মুখে একরাশ ময়দা লেগে আছে। বললেন, "এ কী বিচ্ছিরি খিদে বলুন তো কর্নেল! ইচ্ছে করছে, আপনাদেরও খেয়ে ফেলি!"

কর্নেল সহাস্যে বললেন, "জঙ্গলে গিয়ে হরিণ-টরিণ ধরে খান ডঃ গুন্টা। কী আর করবেন!"

ডঃ গুন্টা সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়ালেন। "আরে তাই তো বটে!" বলে মাটি কাঁপিয়ে বাংলোর প্রাঙ্গণের ধারে উঁচু বেড়া মড়মড় করে ভেঙে বেরিয়ে গেলেন।

উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম, "কর্নেল! ব্যাপারটা বড্ড ঘোরালো হয়ে যাচ্ছে! চলুন এখান থেকে চলে যাই আমরা। এ যে সত্যি ঘটোৎকচের কাণ্ড বেধে গেল।"

কর্নেল শুধু হাসলেন। আমার কথার কোনও জবাব দিলেন না।

ঘণ্টা দুই পরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। বাংলোয় বিদ্যুতের আলোর ব্যবস্থা আছে। কিন্তু মশার বড্ড জ্বালাতন। তাই আমরা ঘরে বসে আছি। ডঃ গুন্টার আর পাত্তা নেই। বলছিলাম, "এতক্ষণে হয়তো জঙ্গলের সব হরিণ ওঁর পেটে চলে গেল।" এমন সময় জিপের শব্দ হল বাইরে।

দু'জন ফরেস্ট অফিসার আর একদল গার্ড হন্তদন্ত এসে গেলেন। রেঞ্জার সায়েব আমার চেনা। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "কর্নেল। এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে। আপনার পাশের ঘরের সেই লম্বা ভদ্রলোক...."

কর্নেল কথা কেড়ে বললেন, "বুঝেছি। জঙ্গলে হরিণের পাল সাবাড় করে বেড়াচ্ছেন।"

রেঞ্জার বললেন, "দুঃখের কথা, আমরা ওঁকে গুলি করে মারতে বাধ্য হয়েছি।"

"সে কি!"

"গুলি না করে উপায় ছিল না। উনি একজন ফরেস্ট গার্ডকে আছাড় মেরে খুন করেছেন। সে এক বীভৎস দৃশ্য কর্নেল! লোকটা একেবারে নরদানব কিংকং বললেই চলে।"

কর্নেল আস্তে বললেন "ঠিকই করেছেন! তা না হলে এবার ভদ্রলোককে আটকানো কঠিন হত। ক্রমশ ওঁর ভেতর একটা ভয়ঙ্কর শক্তি জেগে উঠছিল। এরপর জঙ্গল ছেড়ে হয়তো উনি বসতি এলাকায় গিয়ে ঢুকতেন। তারপর আরও বীভৎস ঘটনা ঘটত।"

কথা থামিয়ে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। "চলুন তো, ওঁর ডেডবডিটাকে দেখে আসি।"

জিপে চেপে আমরা জঙ্গলের রাস্তা ধরলুম। মাইল দুই এগিয়ে বাঁদিক একখানে আগুন জ্বলতে দেখা গেল। রেঞ্জার বললেন, "ওই যে ওখানে। ডেডবডির পাহারায় দু'জনকে বসিয়ে রেখে এসেছি।"

কাঠকুটো জ্বেলে লোক দুটো আসলে ভয় তাড়ানোর চেষ্টা করছিল। আমাদের দেখে সাহস ফিরে পেল। তারা বন দফতরেরই কর্মী। একজনের হাতে একটা বন্দুক, অন্যজনের হাতে নিছক বল্লম। মুখে প্রচণ্ড আতঙ্কের ছাপ লেগে আছে। একটু তফাতে দলাপাকানো রক্তাক্ত একটা লাশ পড়ে ছিল। রেঞ্জার টর্চের আলোয় সেটা দেখিয়ে বললে, "এটা ফরেস্টগার্ড মনি সিংয়ের ডেডবডি। কী অবস্থা হয়েছে দেখুন।"

কর্নেল বললেন, "ডঃ গুন্টার ডেডবডি কোথায়?"

রেঞ্জার পা বাড়িয়ে বললেন, "আসুন, দেখাচ্ছি।"

জায়গাটা খোলামেলা। একটু এগিয়ে টর্চের আলোয় একটা ছোট্ট নদী দেখা গেল। বালি আর পাথরে ভর্তি। রেঞ্জার অবাক হয়ে বলেন, "সর্বনাশ! ডেডবডিটা কোথায় গেল? জানোয়ারে নিয়ে গেল না তো?"

বালির ওপর একটু রক্তের ছাপ চোখে পড়ল। কর্নেল টর্চের আলোয় খুঁটিয়ে জায়গাটা দেখে বলেন, "নাঃ! টেনে নিয়ে যাওয়ার কোনও চিহ্ন নেই। কিন্তু....আশ্চর্য তো।"

"কী কর্নেল?"

"মনে হচ্ছে, ডঃ গুন্টা মারা যাননি। দিব্যি পায়ে হেঁটে চলে গেছেন।"

"অসম্ভব! গুলি করার পর আমরা ওঁকে পরীক্ষা করে দেখেছিলুম। দেহে প্রাণ ছিল না। দুটো গুলিই হার্টে লেগেছিল।"

যে দুটি লোক পাহারায় ছিল, তাদের একজন বলল, "কী একটা শব্দ শুনেছিলুম কিছুক্ষণ আগে। টর্চ জ্বেলে কিন্তু কিছু দেখতে পাইনি।"

অন্য লোকটি বলল, "আমি ভেবেছিলুম কোনও জানোয়ার।"

রেঞ্জার তাদের খুব বকাবকি করলেন। তারা আমতা-আমতা করছিল। বুঝতে পারছিলুম, ওদের বকাবকি করা বৃথা। বেচারারা ভয়ে আধমরা হয়ে বসে ছিল। যদি দেখত, ডঃ গুন্টার মড়া হেঁটে যাচ্ছে, তাদের ভিরমি খেয়ে পড়ে থাকতে হত।

কর্নেল পায়ের ছাপ অনুসরণ করে নদীর ওপার পর্যন্ত গেলেন। আমরাও ওঁর সঙ্গে গেলুম। কিন্তু তারপর কঠিন পাথুরে মাটিতে আর কোনও ছাপ দেখা গেল না। কর্নেল উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, "সেহরাগড় টাউনশিপের লোকেদের ভাগ্যে কী আছে কে জানে! আমার মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা অনেকদূর গড়াবে।"...

ফরেস্ট বংলোয় ফিরে এ রাতে আর অন্ধকার বনভূমির সৌন্দর্য দেখার মন ছিল না। তাছাড়া মশার খুব উৎপাত সে কথা আগেই বলেছি।

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে কাটাচ্ছিলুম। কর্নেলের নাক ডাকছিল যথারীতি! এক সময় হঠাৎ বাইরে কী একটা ধাক্কার শব্দ হল। অমনি কর্নেলের নাক ডাকাও থেমে গেল। ওঁর ঘুম বরাবর

এমনি পাতলা। ওদিকে পাশের ঘরে কেউ যেন চুপিচুপি তালা খুলছে। তারপর টেবিল বাতিটা জ্বলে উঠল। ফিসফিস করে বললুম, "কর্নেল! পাশের ঘরে কে যেন ঢুকল।"

কর্নেলও ফিসফিস করে বললেন, "চুপ!"

উনি বারান্দার দিকের জানালার পর্দা তুলে উঁকি দিলেন। আমিও ওঁর কাছে গিয়ে উঁকি দিলুম। বারান্দায় আলো আছে। একটু পরে শিউরে উঠে দেখি, পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন স্বয়ং ডঃ আর পি গুন্টা। হাতে একটা প্রকাণ্ড সুটকেস। পোশাকে ধুলো-ময়লা আর চাপচাপ রক্ত লেগে আছে। বারান্দা থেকে নেমে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে চলে গেলেন।

কর্নেল বললেন, "যাক গে। এবার নিশ্চিতে ঘুমোনো যাবে।"

বললুম, "রহস্যটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত রহস্যই থেকে গেল, কর্নেল!"

কর্নেল একটু হাসলেন। 'তা ঠিক। তবে যা আশঙ্কা করেছিলুম, সম্ভবত তত কিছু ঘটবে না। কারণ ফ্রাংকেনস্টাইনের সেই দানব শেষ পর্যন্ত দানবই থেকে গিয়েছিল। কিন্তু ডঃ গুন্টাকে দেখলুম, দিব্যি ভদ্রলোকের মতো নিজের জিনিসপত্র নিতে এসেছিলেন। তার মানে, সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে ওঁর এবং ঘরের ছেলে ঘরে ফেরাই সাব্যস্ত করেছেন।"...

পরদিন আমরা জঙ্গল থেকে সেহরাগড় টাউনশিপে ফিরে গেলুম। তারপর সেখান থেকে বাসে চেপে ফৈজাবাদ। কলকাতা ফেরার ট্রেন রাত বারোটা নাগাদ। একটা হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে কর্নেল হঠাৎ বললেন, "চলো জয়ন্ত, ডঃ গুন্টার খোঁজখবর নিয়ে আসি!" অবাক হয়ে বললুম, "সর্বনাশ! উনি কি ফৈজাবাদের লোক নাকি?"

"বাংলোর খাতায় সেই ঠিকানাই তো জেনেছি।"

"কিন্তু..."

কর্নেল আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, আমার ধারণা, ডঃ গুন্টা এখন আর নরদানব বা ঘটোৎকচ হয়ে নেই। কাজেই ওঁকে ভয় পাওয়ারও কিছু নেই। হয়তো ভুলটা আমারই। আমি ওঁকে সচেতন করে দেওয়াতে ওইসব বীভৎস ঘটনা ঘটেছে। তোমাকে সেই পাগলের গল্পটা বলেছিলুম, আশাকরি মনে আছে। কোনও কারণে মানুষের মধ্যে অস্বাভবিকতা এলে তাকে উত্যক্ত করা উচিত নয়।

রাত তখন প্রায় ন'টা। কিন্তু ফৈজাবাদ ছোট্ট শহর! ডঃ গুন্টাকে সবাই চেনে—সেটা উনি লম্বা মানুষ বলেই! শেষদিকে একটা টিলার গায়ে একটা পুরনো গড়নের বাড়ি। টাঙ্গাওয়ালা গেটের কাছে নামিয়ে দিল আমাদের। লন পেরিয়ে যাওয়ার সময় মনে হচ্ছিল, বাড়িতে যেন জনমানুষ নেই। অস্বাভাবিক স্তব্ধ পরিবেশ। তবে আলো দেখা যাচ্ছিল একটা ঘরে।

দরজার বোতাম টেপার বেশ কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলল। সেই অস্বাভাবিক ঢ্যাঙা মানুষ, চেনা মুখ, অমায়িক হেসে বললেন, "কোত্থেকে আসছেন আপনারা?"

আমি তো অবাক। কর্নেল নমস্কার করে বললেন, "আপাতত আসছি সেহরাগড় থেকে। আপনার সঙ্গে কিছু জরুরি কথা আছে, ডঃ গুন্টা।"

ডঃ গুন্টা ভুরু কুঁচকে কী স্মরণ করার চেষ্টা করে বললেন, "সেহরাগড়? সেখানে তো একটা জঙ্গল আছে শুনেছি। যাক্ গে, ভেতরে আসুন।"

ভেতরে ঢুকে আমরা বসলুম! ডঃ গুন্টাও বসলেন। ওঁর মুখে বিস্ময় লক্ষ্য করছিলুম! কর্নেল বললেন, "ডঃ গুন্টা, আপনার প্রোজেক্ট যে সাকসেসফুল সেই কথাটা বলতে এসেছি—যদিও দেশের আইনে আপনি অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছেন!"

ডঃ গুন্টা চমকে উঠলেন। "কী বলছেন, ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"হ্যাঁ। এক ডজন হরিণ, একটা বাঘ আর একজন ফরেস্ট গার্ডকে আপনার ফ্যান্টম প্রতিমূর্তি খুন করে ফেলেছে। অসংখ্য গাছ উপড়ে ফেলেছে! সেহরাগড় কেল্লাটা ভাঙচুর করেছে। এমনকী, একটা দাঁতাল হাতিকেও মারাত্মক জখম করেছে।"

ডঃ গুন্টা দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর ভাঙা গলায় বললেন, "কিন্তু আমার তো কিছু মনে পড়ছে না।"

"কিন্তু আপনি একজন বায়ো-ফিজিসিস্ট। আপনি জানতেন আপনার ফ্যান্টমপ্রোজেক্টের পরিণতি সাংঘাতিক হতে পারে।"

ডঃ গুন্টা উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে বললেন, "বিশ্বাস করুন, মাসতিনেক আগে হঠাৎ আমার উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার পর কী কী ঘটেছে, এখন একটুও মনে নেই।"

"আইন কিন্তু আপনাকে ছেড়ে দেবে না ডঃ গুন্টা।"

ডঃ গুন্টা হঠাৎ সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তারপর ঝনঝন দুমদাম প্রচণ্ড শব্দ শোনা গেল। উদ্বিগ্ন হয়ে বললুম, "কী ব্যাপার কর্নেল?"

কর্নেল হাসলেন, "ল্যাবরেটরি ভাঙছেন! প্রমাণ লোপের চেষ্টা। যাই হোক, আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়, জয়ন্ত। চলো, আমরা কেটে পড়ি।"

স্টেশনে পৌঁছে বললুম, "ফ্যান্টম প্রতিমূর্তি ব্যাপারটা কী, খুলে বলুন তো?"

কর্নেল বললেন, "প্রতিবস্তুর কথা নিশ্চয় শুনেছ, মানুষের ব্যক্তিসত্তার তেমনি কোনও প্রতিরূপ আছে কি না, এ নিয়ে বায়োফিজিসিস্ট গবেষণা করেছেন। কতকটা ডঃ জেকিল এবং মিঃ হাইডের ব্যাপারটা যেমন। তবে ওই প্রতিরূপ ফ্যান্টম অস্তিত্ব কোনও মানুষের স্বাভাবিক চরিত্রে একেবারে উল্টো না হতেও পারে। আমাদের মধ্যে একটা করে প্রতি-মানুষ আছে। সে অসম্ভব শক্তিমান। তাকে দিয়ে যেমন ভাল কাজ করানো যায়, তেমনি খারাপ কাজও করানো যায়। কাজেই ওই ফ্যান্টম প্রতিমূর্তিকে তুমি ঘটোৎকচ বলতেও পারো। ভুলে যেও না মহাভারতের ঘটোৎকচ একজন মানুষ ছাড়া কিছু নয়। তবে অতিমানুষ। তাকে জাগালে ভাল বা মন্দ, দুই-ই ঘটতে পারে।"

ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকছিল না! তাই বললুম, "নিকুচি করেছে ফ্যান্টম ব্যাটার। তাকে জাগিয়ে কাজ নেই।"...

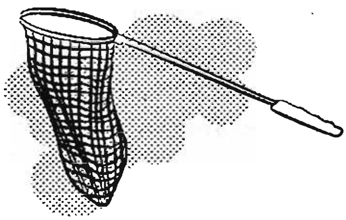

দুঃস্বপ্নের দ্বীপ

আমার কুকুর জিমকে নিয়ে জ্বালায় পড়েছি দেখছি। এমন নয় যে তাকে কখনও বনজঙ্গল পাহাড় পর্বতে আনিনি। এই তো মাস তিনেক আগে তাকে নিয়ে কাশ্মীরের বরফে ঢাকা পাহাড়ি মুল্লুকে ঘুরেছি। কিন্তু জিমের এমন পালাই-পালাই ভাবভঙ্গি তো কখনও দেখি না।

প্রথমে ভেবেছিলাম, একেবারে বিদেশ-বিভুঁই জায়গায় এসে ওর বুঝি অসুখ-বিসুখ করেছে। আমাদের সঙ্গে আছেন ভাগ্যক্রমে প্রাণীবিজ্ঞানী ডক্টর মুরলীধর প্রসাদ। নৈনিতালের লোক। তিনি জিমকে ভালভাবে পরীক্ষা করে বলেছেন, জিম ইজ অলরাইট। ওর কিস্যু হয়নি। তবে কী জানেন জয়ন্তবাবু? মানুষের যেমন, তেমনি সব প্রাণীরই এই একটা ব্যাপার আছে। সব জায়গায় মন টেকে না।

ভেবে পাইনি, এমন সুন্দর জায়গায় মন না টেকার কারণ কী থাকতে পারে? চারদিকে নীল সাগরে ঘেরা এই দ্বীপের প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। আমাদের ক্যাম্পের সামনে সবুজ ঘাসে ঢাকা একটা সমতল মাঠ। সেখানে নির্ভয়ে হরিণের পাল চরে বেড়ায়। কখনও লুকোচুরি খেলতে আসে সাদা রঙের দু'-একটা খরগোশ। পাখিও কম নেই। ঝাঁক বেঁধে মাঠে নেমে তারা পোকামাকড় খুঁজে খায়। কিন্তু আশ্চর্য, জিমকে ছেড়ে দিয়ে দেখেছি, সে অভ্যাসমতো পশুপাখিদের মিছেমিছি ভয় দেখিয়ে বা তাড়া করে মজা লুটতে ছোটে না।

এমন কী, তার প্রায় নাকের ডগায় কোন পাখি বা খরগোশ বেয়াদপি করতে গেলেও জিম মুখেও ধমকায় না। খালি মুখ তুলে বোবার মতো তাকিয়ে থাকে। তার শরীর কেমন যেন থরথর করে কাঁপে।

সবচেয়ে অদ্ভুত লাগে তার আচরণ, সন্ধের দিকে। ক্যাম্পের সামনে খোলামেলায় আগুন জ্বেলে আমরা যখন বসে গল্পসল্প করি, জিম আমার কোলে বসে মুখের ভেতর কী একটা অস্পষ্ট শব্দ করে। মাঝে মাঝে যেন সে ভীষণ চমকে ওঠে।

সারারাত যতবার ঘুম ভাঙে, শুনতে পাই জিমের ওই বোবার মতো চাপা অদ্ভুত আওয়াজ। রাতের দিকে বেশ ঠাণ্ডা বলে তার গায়ে একটুকরো কম্বল জড়ানো থাকে। দেখেছি, জিম কম্বলের ভেতর মুখটাও ঢুকিয়ে তালগোল পাকানো শরীরে পুঁটিলির মতো গুটিয়ে রয়েছে। ভয়েই কি? কিসের ভয়? এখানে ভয় পাওয়ার মতো কিছু দেখছি না তো!

আজ তিন দিন হল আমরা এই দ্বীপে এসেছি। আমরা মানে, ওই ডঃ মুরলীধর প্রসাদ, আমি এবং আমাদের প্রখ্যাত 'বুড়ো ঘুঘু' কর্নেল নীলাদ্রি সরকার মহোদয়। আর একজন সঙ্গীও অবশ্য আছে। সে কর্নেলের 'পুরাতন ভৃত্য' শ্রীযুক্ত ষষ্ঠীচরণ। তাকে না আনলে এ অখাদ্য দ্বীপে না খেয়ে মরতে হত। তবে শুধু রান্নাবান্না নয়, ষষ্ঠীচরণ প্রহরী হিসেবেও বড় কড়া লোক। খুব চালাকচতুর এবং এই প্রৌঢ় বয়সে তার গায়ের জোরের পরিচয় অনেকবার পেয়েছি।

আজও কর্নেল ভোরবেলা ডঃ প্রসাদকে নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। সামনের মাঠের ওপারে উঁচু পাঁচিলের মতো বিশাল পাহাড় দ্বীপের একদিক থেকে অন্যদিক পর্যন্ত চলে গেছে। দ্বীপটাকে নাকি দু'ভাগে ভাগ করেছে পাহাড়টা। কর্নেলেরা যান ওই পাহাড়ে।

এ দ্বীপের নাম ভেগা আইল্যান্ড। আর ওই পাহাড়টার নাম ওয়াকিমো মাউন্টেন। ওয়াকিমো কথাটার মানে নাকি 'বদরাগী'। পাহাড়টার এমন বিশ্রী নাম কেন? শুনেছি এ সমুদ্রে যারা মাছ

ধরতে আসে, তাদের বিশ্বাস; ওখানে একটা বেজায় বদরাগী দানো বাস করে। তাই মাছধরা জাহাজ এই দ্বীপের ছায়া মাড়ায় না।

কর্নেল কি দানোটাকে জব্দ করতে এসেছেন তাহলে? মোটেও না। কর্নেল যা বলেছেন, শুনে তাক লেগে যায়। ওয়াকিমো পাহাড়ে এক বিচিত্র প্রাণীর বাস। প্রাণীটা নেকড়ে এবং কুকুরের মাঝামাঝি। পনেরো হাজার বছর আগে গুহাবাসী আদিম মানুষেরা জন্তু শিকার করে এনে গুহার ভেতর বসে মহানন্দে খেত। আর হাড়গোড় ফেলে দিত বাইরে। নেকড়েরা সেই লোভে গুহার কাছে জড়ো হত। কালক্রমে এই উচ্ছিষ্ট খাদ্য খেতে খেতে তারা শিকার করাই ভুলে গেল। মানুষ-ঘেঁষা হয়ে পড়ল। তারপর মানুষ তাদের বশ করে ফেলল। তারাই গৃহপালিত কুকুরের পূর্বপুরুষ।

কিন্তু মানুষের ভেতর যেমন, তেমনি জন্তুদের ভেতরও কিছু বেয়াড়া জীব থাকে। তেমন কিছু বেয়াড়া নেকড়ে মানুষের পোষ মানল না, অথচ শিকারের ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে। তারা কী করল তখন? তারা অগত্যা পেটের জ্বালায় বাঁদর-হনুমানদের মতো উদ্ভিদভোজী—যাকে ইংরেজিতে বলে 'ভেজেটারিয়্যান' হয়ে গেল। গাছের পাতা, ফলমূল—এসব খেয়েই বেঁচে রইল।

প্রাণীবিজ্ঞানীদের ধারণা, এইসব জাত-খোয়ানো নেকড়ের বংশধর এখনও কোথাও টিকে থাকতে পারে। কর্নেল কোন সূত্রে খবর পেয়েছেন, ভেগা দ্বীপের পাহাড়ে নাকি সেই আজব নেকড়ে-কুকুর এখনও আছে। তাই প্রাণীবিজ্ঞানী ডঃ প্রসাদকে নিয়ে এখানে হাজির হয়েছেন।

আর আমি তো কর্নেল বুড়োর ছায়াসঙ্গী। যাকে বলে ন্যাওটা। তাই আমাকেও আসতে হয়েছে। পোর্টব্লেয়ার থেকে হেলিকপ্টারে আসতে ঘন্টা পাঁচেক লেগেছে। কিন্তু একটুও ক্লান্তি বা বিরক্তি জাগেনি। জিমকে সঙ্গে আনার কারণ, সেই আজব নেকড়ে-কুকুর বা কর্নেলের ভাষায় 'নেকুর' যদি একটা পাকড়াও করতে পারেন, পোষা কুকুরের সামনে তার আচরণ কেমনধারা হবে, পরীক্ষা করে দেখবেন। তাছাড়া জিমের জন্য একটা জরুরি কাজও আছে। জিমকে দেখিয়ে নেকুরদের ফাঁদে ফেলার মতলব ছিল কর্নেলের। পোষা ঘুঘু পাখির সাহায্যে ব্যাধরা যেভাবে বুনো ঘুঘু পাখি ডেকে এনে ফাঁদে ফেলে, ঠিক সেইভাবে।

কিন্তু দ্বীপে এসে জিমের হাবভাব দেখে কর্নেল আপাতত সে মতলব কাজে লাগাচ্ছেন না। লাগাতে চাইলে আমিও আপত্তি করতুম।

আজ তিন দিনের দিন একটা সন্দেহ জেগেছে। জিম কি তাহলে 'নেকুরের' ভয়ে এমন অস্থির?

কর্নেলের কাছে কথাটা তুলতে হবে। তবে জিম শক্তিমান অ্যালসেশিয়ান। তার গায়ের রং কুচকুচে কালো। দশাসই গতর। একবার একজন খুনে গুণ্ডাকে প্রায় মেরে ফেলার উপক্রম করেছিল। জিমের মতো সাহসী দুর্দান্ত কুকুর শাকপাতা খেকো নেকুরকে ভয় পাবে বলে মনে তো হয় না।

কিন্তু কিছু বলাও যায় না। গরিলাও তো মাংসাশী প্রাণী নয়। অথচ গরিলাকে সিংহও ভয় পায়।

দুই

এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে সকালে ক্যাম্পের সামনে চেয়ার পেতে বসে কফি খাচ্ছি। ষষ্ঠীচরণ তার কিচেন-তাঁবুর সামনে খোলামেলায় পিকনিকের উনুনের মতো উনুন বানাতে ব্যস্ত রয়েছে, কারণ কেরোসিন তত বেশি সঙ্গে আনা হয়নি এবং কতদিন এখানে থাকতে হবে তার ঠিক নেই। জিম আমার চেয়ারের পায়া ঘেঁষে বসে আছে—মুখটা বেজায় বিষণ্ণ। হঠাৎ ষষ্ঠীচরণ কাজ ফেলে আমার কাছে এসে কাঁচুমাচু মুখে একটু হেসে বলল, ছোট সাহেব যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা বলি।

বললুম, অত বিনয়ের অবতার তো তোমায় কোনওদিন দেখিনি ষষ্ঠী। ব্যাপারটা কী?

ষষ্ঠীচরণের হাসিটুকু মিলিয়ে গেল। সে গম্ভীর হয়ে চাপা গলায় বলল, আজ্ঞে, আমার বড্ড গা বাজছে।

অবাক হয়ে বললুম, সে কী হে ষষ্ঠী! তুমি অমন ডানপিটে সাহসী মানুষ। তোমার গা বাজছে মানে?

ষষ্ঠীচরণ আরও গলা চেপে বলল, এ দ্বীপটায় অমানুষ থাকে আজ্ঞে।

অমানুষ মানে? হাসতে হাসতে বললুম। । ও ষষ্ঠী। তুমি কি ভূতের ভয় পেয়েছ?

ষষ্ঠীচরণ এবার বসল। চারদিকটা দেখে নিয়ে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, এইমাত্তর আমার ওপর টুপটুপ করে ঢিল পড়ছিল। আপনার দিব্যি ছোটসাহেব। মিথ্যে কথা আমায় কখনও বলতে শুনেছেন?

মার্চ মাসের উজ্জ্বল সকালবেলা। আকাশে মেঘের কুটোটিও নেই। তাঁবুর পেছনে অবশ্য একটু তফাতে ঝোপঝাড় আর গাছপালা আছে। কিন্তু সামনেটা ফাঁকা। সবুজ ঘাসের মাঠ ওয়াকিমো পাহাড় পর্যন্ত ছড়ানো। এই ফাঁকা জায়গায় দিনদুপুরে ষষ্ঠীকে ভূতেরা ঢিল ছুড়ে নাকাল করেছে, ভাবতেই হাসি পায়। আমি হো-হো করে হেসে বললুম, কই, চলো তো দেখি—ভূতের কেমন সাহস!

ষষ্ঠীচরণ বলল, বন্দুকটাও সঙ্গে নিন স্যার।

পা বাড়িয়ে বললুম, ভূতের গায়ে বন্দুকের গুলি বেঁধে না। কই, চলো দেখি। আয় জিম!

জিম যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওই আমার সঙ্গে এগোল। মাত্র তিরিশ হাত তফাতে ষষ্ঠীচরণের কিচেন তাঁবু। ঠিক মাঝামাঝি পৌঁছেছি, হঠাৎ আমার গায়ে টুপটুপ করে কী যেন পড়ল কয়েকবার। ঠাহর করে দেখি, সেগুলো খুদে মার্বেলের মতো গড়নের গোল ঢিল। চারদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলুম না। দৌড়ে ওই তাঁবুর পেছনে গেলুম। কেউ কোথাও নেই। ওদিকটা প্রায় পঁচিশ গজ অব্দি ফাঁকা। তারপর জঙ্গল। জঙ্গল থেকে ঢিল ছুড়েছে কি? তারা কারা?

জিম আমার পেছন-পেছন এসে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে আছে। জঙ্গলের দিকে আঙুল তুলে তাকে ইশারা করলুম। কিন্তু জিম কথা মানল না। শুধু লেজটা গুটিয়ে কেমন চাপা শব্দ করতে লাগল।

ষষ্ঠীচরণ এগিয়ে এসে বলল, ঢিলটা পরখ করে দেখুন তো স্যার! এ তো ঢিল বলে মনে হচ্ছে না।

হাতের তালুতে রেখে দেখলুম, খুব হালকা ধূসর রঙের ঘুটি। ঘুটিটা শুকনো ঘাস দিয়ে তৈরি। সাধুবাবারা গাঁজা খাওয়ার জন্য নারকোল ছোবড়ার যেমন খুদে ঘুলতি বানায়, ঠিক তেমনি। কিন্তু এগুলো আরও ছোট। ওজনে হালকা হলেও দৈবাৎ চোখে লাগলে বিপদ হতে পারে।

ততক্ষণে ষষ্ঠীচরণ আরও কয়েকটা ভূতের ঢিল খুঁজে পেয়েছে। সেগুলো সে একটা কাগজের মোড়কে রেখে বলল, বড় সাহেবকে দেখাতে হবে। কী বলেন স্যার?

ভূত-পেরেতে আমার বিশ্বাস নেই। নিশ্চয় এভাবে ভূতুড়ে ঢিল ছুড়ে কারা আমাদের ভয় দেখাচ্ছে কোনও উদ্দেশ্যে। ব্যাপারটা দেখতে হয়।

দৌড়ে আমার তাঁবু থেকে রাইফেল নিয়ে বেরলুম। জিম অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে অনুসরণ করল। ষষ্ঠীচরণ ব্যাপার দেখে আরও ভয় পেয়ে বলল, ওরে বাবা! আমার কী হবে?

কিছু হবে না। ভুতেরা ছুঁড়লে, তুমিও ঢিল ছুঁড়বে। বলে যেদিক থেকে ঢিলগুলো এসেছিল সেইদিকে এগিয়ে গেলুম।

কিন্তু আর ঢিল ছুড়ল না কেউ। ঝোপজঙ্গল দুর্ভেদ্য বললেই হয়। ভেতরে ঢোকার কোনও উপায় নেই! চোখে পড়ল, বড় বড় পাথরও রয়েছে জঙ্গল জুড়ে। প্রকাণ্ড একটা পাথর জঙ্গলের

বাইরে অব্দি ছড়িয়ে রয়েছে দেখে সেখানে গেলুম। প্রথমে জিমকে তুলে দিলুম পাথরটার ওপর। তারপর আমি উঠলুম।

জঙ্গলের মাটিটা ক্রমশ ওদিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে বোঝা যাচ্ছিল। হঠাৎ মনে একটা অদ্ভুত অস্বস্তির সৃষ্টি হল। ওই ঘন সবুজ জঙ্গলের ভেতর থেকে কে বা কারা যেন আমাকে দেখছে। তাদের দেখতে পাচ্ছি না, অথচ তারা আমাকে দেখছে—অস্বস্তিটার কারণ এই।

কিন্তু ভাল করে খুঁটিয়ে দেখেও কিছু সন্দেহজনক চোখে পড়ছিল না।

তবু হলফ করে বলতে পারি, একদল অদৃশ্য আজব প্রাণী যেন আড়াল থেকে আমার ওপর লক্ষ্য রেখেছে। কিছুতেই এ অনুভূতি মন থেকে তাড়াতে পারলুম না।

তারপর জিম একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল। আমাকে ফেলে রেখে লাফ দিয়ে পাথর থেকে নামল। তারপর লেজ গুটিয়ে গলার ভেতর অদ্ভুত আওয়াজ করতে করতে খোলা ঘাসজমির উপর দিয়ে তাঁবুর দিকে দৌড়ল। আমি রেগেমেগে চিৎকার করে ডাকলুম, জিম! জিম! কী হচ্ছে!

জিম কান করল না। কিচেন-তাঁবুর পাশে ষষ্ঠীচরণ দাঁড়িয়ে আছে দেখলুম। তার হাতে একটা বল্লম কিংবা লাঠি। এতদূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না। জিম সটান গিয়ে আমার তাঁবুতে ঢুকে পড়ল।

পেছনে ঘুরেছিলুম জিমের জন্য। এবার জঙ্গলের দিকে ঘুরেই চমকে উঠলুম। আন্দাজ গজ বিশেক দূরে নিচে এমনি একটা পাথরের পাশে তিনটে বিদঘুটে প্রাণী দাঁড়িয়ে আছে। তাদের ওপর রোদ্দুর পড়েছে বলে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

তারা মানুষের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। গায়ের রং কালো কুচকুচে। গলা কাঠির মতো। মাথা তেকোনা এবং প্রকাণ্ড। নিচের ধড়টা ঝোপের ভেতর বলে বোঝা যাচ্ছে না কেমন। সবচেয়ে অদ্ভুত ওদের চোখ। তেকোনা মাথায় দুটো গোল রঙিন কাচের মতো মস্ত চোখের রং কখনও লাল, কখনও নীল, কখনও হলুদ হয়ে উঠছে।

আমার মাথায় পলকে ভেসে এল, ওরা যেন অতিকায় পিঁপড়ে। কিন্তু পিঁপড়েরা কি অমন খাড়া দাঁড়াতে পারে মানুষের মতো?

ভয় হল, ওরা আমাকে আক্রমণ করবে না তো? তাই রাইফেল তাক করলুম।

অমনি প্রাণীগুলো গা ঢাকা দিল পাথরের আড়ালে। বুঝলুম, জিম কেন ভয় পেয়েছে এও বুঝলুম, ঘাসের গুলতিগুলোও কারা ছুড়ছিল।

তিন

বেলা দুটোয় কর্নেল এবং ডঃ প্রসাদ ঘেমে-তেতে ফিরলেন। নেকুরের লেজের ডগাটুকুও দেখতে পাননি। তবে ওয়াকিমো পাহাড়ের অনেকটা চিনে ফেলেছেন। পাহাড়টা যত দুর্গম দেখায়, তত কিছু নয়। সহজে ওঠা যায়, এবং যতদূর খুশি ঘোরাঘুরি করা যায়।

ঘাসের গুলতি আর পিঁপড়ে-মানুষের কথা শুনে প্রাণীবিজ্ঞানী ডঃ প্রসাদ তো ভীষণ উত্তেজিত। কর্নেল বললেন, বোঝা গেল, কেন ভেগা দ্বীপ ভূতুড়ে দ্বীপ বলে বিখ্যাত অথবা কুখ্যাত হয়েছে। ক'বছর আগে এক জাহাজের কাপ্তেন আমাকে এখানকার পিঁপড়ে-মানুষের কথা বলেছিলেন, বিশ্বাস করিনি। এখন দেখা যাচ্ছে কথাটা সত্যি।

ডঃ প্রসাদ বললেন, কর্নেল! নেকুর থাক। বরং আমরা পিঁপড়ে-মানুষের দিকে মন দিই।

আমি বললুম, একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না। এই ঘাসের গুলতির রহস্যটা কী?

কর্নেল বললেন, এগুলো পিঁপড়ে- মানুষদের অস্ত্র। পোকামাকড় ওদের খাদ্য। এই গুলতি ছুঁড়ে ওরা পোকামাকড়কে কাবু করে। বুঝলে?

হাসতে হাসতে বললুম, ব্যাটারা আমাদেরও গুলতি ছুঁড়ে কাবু করবে ভেবেছে। একটা মানুষের মাংসে ওদের বছর চলে যাবে কি না!

ষষ্ঠীচরণ্ একটু তফাতে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে কথা শুনছিল। আতঙ্কে সে বলে উঠল, ওরে বাবা!

কর্নেল সকৌতুকে বললেন, ষষ্ঠী! তোমার গা-গতর দেখে ওদের বেজায় লোভ হয়েছে মনে হচ্ছে। নইলে প্রথম তোমার ওপর গুলতি ছুড়ল কেন ওরা?

ষষ্ঠীচরণ আরও ভয় পেয়ে করুণ স্বরে শুধু বলল, ওরে বাবা।

কিছুক্ষণ পরে কর্নেল আর ডঃ প্রসাদ একটা ফাঁদ নিয়ে বেরুলেন। যেখানে আমি পিঁপড়ে-মানুষদের দেখেছি, সেখানে কোথাও ফাঁদটা পেতে রাখবেন। সঙ্গে ষষ্ঠীচরণকেও নিয়ে গেলেন। সে দা দিয়ে কুপিয়ে জঙ্গল সাফ করে চলার রাস্তা বানাবে। যা দুর্গম জঙ্গল!

আমি রইলুম তাঁবুর পাহারায়। জিম সেই যে তাঁবুর ভেতর খাটের তলায় ঢুকেছে, আর বেরুনোর নাম করে না। তার ওপর রাগ হচ্ছিল। খুব বকাবকি করলুম তাকে ভীতু বলে। শাসালুম, কলকাতায় ফিরে বেচে দেব ব্যাটাচ্ছেলেকে। জিম গ্রাহ্য করল না। শুধু গলার ভেতর সেই চাপা কান্নার মতো আওয়াজ করল।

বিকেল নেমেছে। গুলিভরা রাইফেল কাঁধে রেখে সতর্ক দৃষ্টে চারপাশে লক্ষ্য রেখে সান্ত্রীর মতো পায়চারি করছিলুম।

দূরে একপাল হরিণ চরছিল! মাথার ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে সামুদ্রিক পাখি উড়ে যাচ্ছিল। একসময় উত্তরদিকে জঙ্গলের মাথার ওপর একটা প্রকাণ্ড বেলুন দেখতে পেলুম। হলুদ রঙের বেলুনটা নিঃশব্দে ওদিকে কোথাও আস্তে আস্তে নামছে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম। বেলুনটা গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হলে ব্যস্ত হয়ে উঠলুম। এই নির্জন আজব দ্বীপে বেলুন নামাটা বড় রহস্যময়।

তাঁবুর দরজায় পর্দা শক্ত করে বেঁধে তক্ষুণি বেরিয়ে পড়লুম ব্যাপারটা দেখতে। যেদিকে পিঁপড়ে-মানুষ দেখেছিলুম, এটা তার উল্টো দিক। ওদিক দিয়েই আমরা এ দ্বীপে ঢুকেছি। আমাদের হেলিকপ্টার ওদিকে সমুদ্রতীরে বালির বিচে নেমেছিল। যখন আমাদের দ্বীপ ছেড়ে যাওয়ার সময় হবে, তাঁবুর ভেতর রাখা বেতার যন্ত্রে খবর পাঠাবেন কর্নেল। তাহলে ওঁর বন্ধু এক সামরিক অফিসার হেলিকপ্টারটা নিয়ে আসবেন দ্বীপে।

জিমকে নাড়ানো যাবে না। তা না হলে ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতুম।

জঙ্গলের ভেতর দৌড়ে চললুম। একটু পরেই জঙ্গলের ওধারে ঢালু পাহাড়ি জমি নিচে সমুদ্রের বিচে গিয়ে মিশেছে। সেখানে দাঁড়িয়ে দেখি, বেলুনটা চুপসে বালির ওপর পড়ে রয়েছে। বেলুনের তলায় দড়িদড়া থেকে ঝুলন্ত প্রকাণ্ড বাস্কেটের মতো আসন। একটা বেঁটে গাব্দা মোটা লোক সবে বেরুচ্ছে। তার চেহারা চিনাদের মতো। কোমরে বাঁধা একটা লম্বাটে রিভলভার। লোকটাকে দেখে পছন্দ হল না। কেমন খুনেমার্কা চেহারা।

বেলুন সেভাবেই পড়ে রইল। লোকটা এদিকে ঘুরে ঢালু জমিটা বেয়ে উঠতে থাকল। তখন আমি ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়লুম।

সে জঙ্গলে ঢুকে পশ্চিমে এসে গেল। তাকে অনুসরণ করতে থাকলুম। ফাঁকা মাঠের দিকে না গিয়ে সে সমুদ্রের সমান্তরালে জঙ্গলের ভেতরে চলেছে। কিছুক্ষণ পরে সে দাঁড়াল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে পাথরের ওপর উঠল। তারপর তিনবার হাততালি দিল।

জঙ্গলের ভেতর ছায়া ততক্ষণে আরও ঘন হয়েছে। তবু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ওর ক্রিয়াকলাপ। মিনিটখানেক পরে যা দেখলুম, আমার তো চক্ষু চড়কগাছ। এ কি স্বপ্ন না সত্যি সত্যি ঘটছে!

পাথরের ওপাশ থেকে একদঙ্গল পিঁপড়ে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে।

লোকটা প্যান্টের পকেট থেকে মুঠো মুঠো কী সব জিনিস ছড়িয়ে দিল। আর পিঁপড়ে-মানুষগুলো কাড়াকাড়ি করে তা কুড়িয়ে খেতে থাকল। একটু পরে লোকটাকে দেখলুম ওদের সঙ্গে চলেছে। আমি আড়ালে-আড়ালে কিছুটা এগিয়ে গেলুম। কিন্তু পাথরের কাছে এসে ওদের হারিয়ে ফেললুম। ওরা যেন বেমালুম উবে গেছে।

এদিক-ওদিক সাবধানে খোঁজাখুঁজি করেও ওদের পাত্তা পেলুম না। ততক্ষণে পশ্চিমে ওয়াকিমো পাহাড়ের আড়ালে চলে গেছে সূর্য। জঙ্গল থেকে দক্ষিণে এগিয়ে ফাঁকা মাঠটায় পৌঁছলুম। তাঁবুর দিকে প্রায় দৌড়ে চললুম। জিমের জন্য ভাবনা হচ্ছিল।

আমার তাঁবুর সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হল। দরজার পর্দা ছেঁড়া। শুধু ছেঁড়া নয়, কুটিকুটি করে কেটে কেউ বা কারা ছড়িয়ে রেখেছে।

ভেতরে ঢুকে চেঁচিয়ে ডাকলুম, জিম! জিম!

জিমের সাড়া নেই। ক্যাম্প-খাটের তলা ফাঁকা; টর্চ জ্বেলে তাঁবুর ভেতরটা ভাল করে দেখে নিলুম। জিম নেই।

রাগে দুঃখে বাইরে বেরিয়েছি। কর্নেলদের সাড়া পাওয়া গেল। সন্ধ্যার আবছা আলোয় ওঁদের দেখা যাচ্ছিল। কথা বলতে বলতে হেঁটে আসছেন তাঁবুর দিকে।

চার

কর্নেল তাঁর ধুরন্ধর গোয়েন্দাবুদ্ধি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্তে এসেছেন, পিঁপড়ে-মানুষরাই জিমকে চুরি করে নিয়ে গেছে। তাকে উদ্ধার করতে হলে পিঁপড়ে-মানুষদের ডেরা খুঁজে বের করতে হবে। কর্নেলের ধারণা, জিমকে মেরে ফেলা ওদের উদ্দেশ্য নয়। অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে। আপাতত সেটা বোঝা যাচ্ছে না।

এ রাতেও জ্যোৎস্না ছিল। আমরা চুপিচুপি একটা কাজ সেরে ফেললুম। সমুদ্রতীরের সেই বেলুনটা গুটিয়ে ধরাধরি করে নিয়ে এলুম তাঁবুতে। তারপর পালাক্রমে রাইফেল হাতে পাহারা দিলুম। কিন্তু রাতে কোনো ঘটনা ঘটল না।

ভোরবেলা কর্নেল একা বেরিয়েছিলেন। ফিরে এসে জানালেন, ব্যাটাচ্ছেলেরা ফাঁদটাকে কুটিকুটি করে কেটেছে। তবে লুকিয়ে রাখা ক্যামেরায় ছবিগুলো উঠেছে। কর্নেলের ক্যামেরার কীর্তিকলাপ আমার জানা। অন্ধকারেও ছবি তুলতে ওস্তাদ।

ছবিগুলো প্রিন্ট করে দেখালেন। পিঁপড়ে-মানুষেরা ফাঁদ কীভাবে দাঁত দিয়ে কাটছে, তার পরিষ্কার ছবি উঠেছে।

ব্রেকফাস্ট সেরে আমি, কর্নেল ও ডঃ প্রসাদ বেরিয়ে পড়লুম উত্তরদিকের জঙ্গলে—যেখানে কাল সন্ধ্যায় বেলুনের লোকটাকে অদৃশ্য হতে দেখেছি।

সেই পাথরের কাছে গিয়ে দিনের আলোয় একটা ব্যাপার দেখতে পেলুম। পাথরের গায়ে সাদা আঁকিবুকি রয়েছে। পিঁপড়ে-মানুষদের ছবি আঁকার শখ? নাকি ওতে কিছু লেখা রয়েছে? তাহলে স্বীকার করতে হয়, ওরা মানুষের মতো লেখাপড়াও করে।

প্রাণীবিজ্ঞানী ডঃ প্রসাদ হেসে উড়িয়ে দিলেন। কর্নেল হাঁটু গেড়ে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে মাটিতে ও ঘাসে কিছু খুঁজছিলেন। ওই অবস্থায় বাঁ দিকে এগিয়ে আরও একটা বড় পাথরের কাছে গিয়ে চাপা গলায় বলে উঠলেন, পেয়েছি! পেয়েছি!

ডঃ প্রসাদ বললেন, কী পেয়েছেন কর্নেল?

কর্নেল কোনও জবাব না দিয়ে পাথরটার ওপর উঠতে শুরু করলেন। তারপর দেখি, উনি হঠাৎ উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ কী দেখার পর ইশারায় আমাদের ডাকলেন, ডঃ প্রসাদ আর আমি পাথরে উঠে ওঁর মতো উপুড় হতেই এক বিচিত্র দৃশ্য দেখতে পেলুম।

পাথরের ওদিকে ঢালু হয়ে মাটিটা নেমে গেছে এবং একটা বিশাল গর্তের মতো সমতল জায়গায় অসংখ্য প্রকাণ্ড উইঢিবির মতো রয়েছে। ঢিবির দরজা আছে এবং জানালায় মতো ফোকরও আছে কয়েকটা, একখানে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে একদল পিঁপড়ে-মানুষ। মধ্যিখানে একটা বেদিমতো উঁচু জায়গা। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা লাল পিঁপড়ে-মানুষ। ওর মাথায় ঘাসের মুকুট। মুকুটে রঙিন পালক গোঁজা এবং একটা উজ্জ্বল মণির মতো কী জিনিস—তা থেকে সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ে চোখে ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

তার চেয়েও আশ্চর্য ব্যাপার, বেদির নীচে ঘাসের মোটা দাঁড়িতে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে বেলুনের লোকটা।

আমরা দম আটকানো ভঙ্গিতে উপুড় হয়ে শুয়ে ওই আজব দৃশ্য দেখতে থাকলুম। তারপর কানে এল, পিঁপড়ে-মানুষেরা পোকামাকড়ের ডাকের মতো চাপা ক্ষীণ শব্দে কথাবার্তা বলছে। সে শব্দ এত চাপা যে মনে হচ্ছে, অনেক দূরে কোথাও হাজার হাজার পোকামাকড় ডাকছে।

তারপর যা দেখলুম, আমি লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিলুম আর কী—কর্নেল টেনে ধরে ফের শুইয়ে দিলেন।

সামনেকার একটা ঢিবিঘর বেশ বড়ো—প্রায় ফুট ছয়েক উঁচু এবং ফুট তিনেক চওড়া। সেটার রং [illegible] কলে। সেটা নিশ্চয় রাজার বাড়ি। সেখান থেকে চ্যাংদোলা করে পিঁপড়ে-রক্ষীরা আমার জিমকে বের করে আনছিল।

পেছনে আরেকটা লাল পিঁপড়ে-মানুষ। নিশ্চয় রানি। কিন্তু জিম যেন মরা। টুকটুক করে তাকাচ্ছে। নির্জীব অবস্থা।

রানি বেদিতে উঠে রাজার পাশে দাঁড়াল। জিমকে পিঁপড়ে রক্ষীরা তাদের পায়ের কাছে বেদির ওপর শুইয়ে দিল। কিন্তু আশ্চর্য, জিম ছাড়া পেয়েও তেমনি নির্জীব হয়ে পড়ে রইল।

এবার রানিকে দেখলুম দু'হাত তুলে জোরে নাড়ছে। তারপর ঢিবি রাজ-বাড়ির দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল একটা অদ্ভুত প্রাণী। ধূসর-রঙের হায়েনার মতো দেখতে। কিন্তু অত কুৎসিত নয়। বরং নেকড়ে বলে মনে হল। পিঁপড়ে রানির মাথাতেও মুকুট আছে। মুকুটে ফুল গোঁজা। রানি একটা ফুল মুকুট থেকে নিয়ে একটু ঝুঁকে দাঁড়াল। প্রাণীটা বেদিতে উঠে খপ করে ফুলটা মুখে পুরল। চিবুতে থাকল। তারপর জিমের গা শুঁকতে শুরু করল।

ডঃ প্রসাদ উত্তেজিতভাবে ফিসফিস করে বললেন, নেকুর! নেকুর!

নেকুর তাহলে পিঁপড়ে-মানুষদের কাছে পোষ মেনেছে! আবাক হয়ে নেকুর দেখতে থাকলুম। জন্তুটা জিমকে যেন আদর করছে। জিম তেমনি নিঃসাড়।

জিমের চারপাশে ঘুরে নেকুরটা খেলা করতে থাকল। সবাই এবার ভিড় করে খেলা দেখছিল। ঢিবিঘরগুলো থেকে ছোটবড় সব পিঁপড়ে-মানুষ ভিড় জমিয়েছে ততক্ষণে। এইসময় কর্নেল ফিসফিস করে বললেন, সাবধানে নেমে এস তোমরা। ঢিবিঘরগুলোর পেছনে গিয়ে লুকিয়ে থাকো। তারপর কী করতে হবে, বলে দেব'খন।

সাবধানে তিনজনে পাথরের টুকরো আর খাঁজের অড়ালে নিচে নেমে গেলুম। বুঝলাম এই সমতল বিশাল গর্তমতো জায়গাটা কোনও যুগের আগ্নেয়গিরির ক্রেটার। ঢিবিঘরের পেছনে ঝোপের আড়ালে তিনজনে বসে পড়লুম।

তারপর দেখি, কখন ওদের অজান্তে বেলুনের লোকটা দড়ির বাঁধন খুলে ফেলেছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাক করে বেমক্কা রিভলভার থেকে গুলি ছুড়ল পরপর দু'বার।

পলকের মধ্যে হুলস্থূল পড়ে গেল। পিঁপড়ে মানুষেরা পিলপিল করে এদিকে ওদিকে ক্রেটারের কিনারায় ঢালু পাড়া বেয়ে উঠল এবং পালিয়ে গেল। রাজা ও রানি যেন হতভম্ব! স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছে। লোকটা বেদির ওপর লাফ দিয়ে উঠল এবং রাজার মুকুট ধরে টানাটানি শুরু করল।

নেকুরটা জিমকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল। এবার আকমকা গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার ওপর। রিভলভার ছিটকে পড়ল নীচে। নেকুরটা ওর গলা কামড়ে ধরেছে! লোকটা বিকট আর্তনাদ করে হাত-পা ছুড়ছে।

কর্নেল বলে উঠলেন—চলে এস সবাই!

আমরা যেই দৌড়ে গেছি, রাজা-রানি তীরের মতো ছুটল উল্টোদিকে। বেদির কাছাকাছি পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে নেকুরটাও দৌড়ে পালিয়ে গেল। কর্নেল বেলুনের লোকটার কাছে হাঁটু দুমড়ে বসলেন। ওর গলাটা ফাঁক হয়ে গেছে। গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। ওকে বাঁচানোর উপায় ছিল না। এক মিনিটের মধ্যে হাত-পা খিঁচিয়ে ওর দেহটা শক্ত হয়ে গেল। সেই বীভৎস দৃশ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলুম।

জিম আমাকে দেখে এতক্ষণে ওঠার চেষ্টা করল। পারল না। ওকে দু'হাতে বুকের কাছে তুলে নিলুম। ওর শরীর থরথর করে কাঁপছিল।

কর্নেল লোকটার পকেট হাতড়ে একটা নোটবই পেলেন। চিনা ভাষায় কী সব লেখা আছে। নোটবইটা নিজের পকেটে ঢুকিয়ে কর্নেল বললেন, আসুন ডঃ প্রসাদ, আমরা এখান থেকে কেটে পড়ি। বেচারি পিঁপড়ে-মানুষদের বিব্রত করে লাভ কী? ওদের কচি বাচ্চারা নিশ্চয় ঘরে আছে। ওরা না ফিরলে না খেয়ে মারা পড়বে।

ঠিক তাই। ঢিবিঘরের দরজায় খুদে পিঁপড়ে-মানুষেরা উঁকি দিচ্ছিল। দেখে মায়া হয়। আমরা চলে এলে ওদের মা-বাবা ফিরে এসে খেতে দেবে। এ-বেলা হয়তো বেলুনের লোকটার মাংস দিয়েই পিঁপড়েপুরীতে বড়রকমের একটা ভোজ হবে।

পাঁচ

তাঁবুতে ফিরে দেখি আরেক কাণ্ড। ষষ্ঠীচরণ বন্দী। কিচেন-তাঁবুর ভেতর তার ক্যাম্পখাটে ওকে কারা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। যা দিয়ে বেঁধেছে, তা শক্ত ঘাসের দড়ি। ও ফ্যালফ্যাল করে তাকচ্ছে। মুখে কথা নেই।

কর্নেল একটা ছুরি দিয়ে বাঁধন কেটে ওকে মুক্ত করলেন। তখন ষষ্ঠীচরণ উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল এবং জব্বর একটা হাই তুলল।

বললুম, ব্যাপার কী ষষ্ঠী?

ষষ্ঠীচরণ বলল, খুব ঘুম পেয়েছিল স্যার!

তার জবাব শুনে অবাক হয়ে বললুম, কিন্তু তোমায় এমন করে বেঁধেছিল কারা?

এতক্ষণে ষষ্ঠীচরণের যেন খেয়াল হল। কাটা দড়িগুলো দেখে নিয়ে বলল, তাহলে আমাকে সত্যি সত্যি বেঁধেছিল ব্যাটাচ্ছেলেরা? আমি ভাবছি, স্বপ্ন দেখছিলুন। ওরে বাবা! এ কী বিদঘুটে জায়গায় এসে পড়েছি।

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, তুমি নিশ্চয় আরাম করে খাটে শুয়েছিলে?

ষষ্ঠীচরণ জিভ কেটে বলল, অন্যায় হয়ে গেছে স্যার। মাফ করে দিন। আপনারা যাওয়ার পর ঢুলুনি পেয়েছিল। ভাবলুম একটু শুয়ে নিই। রাত্তিরে তরাসে ঘুম হয় না কিনা!

কর্নেল বললেন, ভাগ্যিস, তোমাকে পিঁপড়ে-মানুষেরা ধরাধরি করে জিমের মতো বয়ে নিয়ে যায়নি! তাহলে আজ দুপুরের খাওয়া-দাওয়া আর জুটত না আমাদের।

ষষ্ঠীচরণ ভয় পেয়ে বলল, ওরে বাবা! তারপর সে ব্যস্তভাবে উনুন ধরাতে গেল।

আমরা কর্নেলের তাঁবুতে গেলুম। ডঃ প্রসাদ বললেন, লোকটার নোটবইয়ে নিশ্চয় সব কথা লেখা আছে। চিনা ভাষা জানলে ভাল হত। কিন্তু ......

কথা কেড়ে কর্নেল বললেন, আমি অল্পস্বল্প জানি চিনাভাষা। দেখি, কী লেখা আছে।

কর্নেল মিনিট দশেক ধরে নোটবইটা নিয়ে মেতে রইলেন। আমরা দু'জনে চুপচাপ কৌতূহল নিয়ে বসে রইলুম। তারপর কর্নেল বললেন, লোকটার নাম সান ওয়ানসু। হংকং-এ বাড়ি। কীভাবে ভেগা দ্বীপের পিঁপড়ে-মানুষদের কথা জেনেছিল, লেখা নেই। তবে এটুকু লেখা আছে, মোট তিনবার এসেছে এর আগে। পিঁপড়ে-মানুষদের রাজার মুকুটে যে বহুমূল্য মণি দেখেছি, আমরা, সান ওয়ান-সু ওটা হাতাতে চেয়েছিল।

ডঃ প্রসাদ বললেন, ওদের সঙ্গে ভাব করল কীভাবে, লেখা নেই?

কর্নেল বললেন, আছে। প্রথমবার এসে ওদের গতিবিধি জেনে গিয়েছিল আড়াল থেকে। দ্বিতীয়বার সঙ্গে এনেছিল একটা প্রকাণ্ড কেক।

বললুম, কেক দিয়ে পিঁপড়ে-মানুষদের সঙ্গে ভাব করেছিল? ভারি বুদ্ধিমান তো।

কর্নেল বললেন, হ্যাঁ। তৃতীয়বার সঙ্গে এনেছিল এক বস্তা চিনি।

বললুম, কিন্তু এবার তার সঙ্গে কিছু ছিল না। আমি দেখছি!

কর্নেল হাসলেন। বললেন, এই চতুর্থবার সে যা এনেছিল, তা বেলুনের বাস্কেটে এখন আছে। ওই যে দেখছ প্যাকেট বাঁধা জিনিসটা, ওটা লজেঞ্চুস।

আমরা সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলুম। কর্নেল ফের বললেন, প্যাকেটটা সঙ্গে নিয়ে কেন যায়নি, একটু ভাবলেই বোঝা যায়। আমার মনে হচ্ছে, পিঁপড়ে-মানুষদের রাজাকে সে সমুদ্রের ধারে তার বেলুনের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। হয়তো বলেছিল, ওখানে গেলেই রাজাকে উপহারটা দেবে। তার মতলব ছিল, ওইভাবে ডেকে নিয়ে গিয়ে মণিটা কেড়ে নিয়ে বেলুনে চড়ে পালাবে। কিন্তু পিঁপড়ে-মানুষেরা বুদ্ধিমান। ওর মতলব টের পেয়েছিল।

আমার বুদ্ধি খেলল এবার। বললুম, উঁহু। তা নয়। বেলুনটা আমরা নিয়ে এসেছিলুম বলে সমুদ্রের ধারে গিয়ে যখন পিঁপড়ে-মানুষরা কিছু পায়নি, তখন রেগে গিয়ে ওকে বন্দি করেছিল।

কর্নেল সায় দিলে বললেন, মন্দ বলোনি জয়ন্ত। সম্ভবত ...

কর্নেলের কথা হঠাৎ বন্ধ হল। উনি কোণের দিকে গুটিয়ে রাখা বেলুনটার দিকে হঠাৎ এগিয়ে গেলেন। তারপর বলে উঠলেন, সর্বনাশ! বেলুনের অবস্থাটা কী করেছে! কুটিকুটি করে রেখে গেছে যে!

আমি ও ডঃ প্রসাদ হুমড়ি খেয়ে দেখতে লাগলুম। বেলুনের ভাঁজকরা রবারটা আর আস্ত নেই। ঝাঁঝরা হয়ে রয়েছে। তার মানে বেলুনটা আর ওড়ানো যাবে না। দোলনার মতো বাস্কেটটা টিকে আছে। তার মধ্যে বসার আসন, লজেন্সের প্যাকেট, অল্পস্বল্প কলকব্জা রয়েছে। পিঁপড়ে-মানুষেরা সে সব ছোঁয়নি। লজেন্সের প্যাকেটটা অন্তত নিয়ে পালানো উচিত ছিল। কেন নেয়নি?

ডঃ প্রসাদ একটু হেসে বললেন, আমরা লজেন্সগুলো দিয়ে ওদের সঙ্গে ভাব করব। কী বলেন কর্নেল?

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, ওই লজেন্সে তীব্র বিষ মেশানো আছে, ডঃ প্রসাদ।

আমরা দু'জনে আঁতকে উঠলুম, সে কী! কীভাবে বুঝলেন?

কর্নেল বললেন, ওই দেখ, কত খুদে পিঁপড়ে আর পোকামাকড় মরে পড়ে রয়েছে। তাই দেখে পিঁপড়ে-মানুষেরা প্যাকেটটা ছোঁয়নি। এবার আশা করি বুঝতে পারছ, লোকটাকে কেন ওরা অমন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে শাস্তি দিচ্ছিল।

ডঃ প্রসাদ বললেন, সর্বনাশ! পিঁপড়ে-মানুষেরা দেখছি ভারি ধূর্ত। আমরা বেরিয়ে গেছি, আর ওরা সেই ফাঁকে এতসব কাণ্ড করেছে। তার মানে, ওরা সারাক্ষণ আমাদের চোখে-চোখে রেখেছে। কিন্তু ওদের আস্তানা থেকে আমরা এতদূরে রয়েছি। আমরা ওদের অস্তানায় পৌঁছনোর আগেই অত তাড়াতাড়ি কীভাবে ওরা এখানে এল এবং ফিরে গেল?

কর্নেল বললেন, সেটা একটা রহস্য বটে। আমার মনে হচ্ছে এখানে কোথাও একটা সিধে পথ আছে, মাটির তলায়-তলায়। অর্থাৎ পিঁপড়ে-মানুষদের বসতি এখান থেকে উত্তর-পশ্চিম কোণে মাইলটাক দূরে। ওদিকটা জঙ্গল আর পাহাড়ে বড় দুর্গম দেখাচ্ছে।

এই সময় হঠাৎ জিম একটা চাপা-গরগর আওয়াজ করল। আগের আতঙ্ক মেশানো আওয়াজ। তারপর এক বিচিত্র দৃশ্য দেখলুম।

আমাদের সামনে খোলামেলা ঘাসের মাঠে আচম্বিতে পিলপিল করে কালো রঙের পিঁপড়ে-মানুষ যেন মাটি ফুঁড়ে বেরুল। অসংখ্য জায়গা থেকে অসংখ্য পিঁপড়ে মানুষ আর তাদের সঙ্গে সেই নেকুরের পাল।

বুঝলুম অজস্র গর্ত ছিল। ঘাসের আড়ালে। ওগুলো সুড়ঙ্গপথ। সেখান দিয়ে বেরিয়ে গোটা মাঠ জুড়ে একটা মোটা কালো রেখার মতো দাঁড়িয়ে আছে ওরা সামনে একটা করে নেকুর নিয়ে একজন করে পিঁপড়ে-মানুষ। নিশ্চয় ওরা সেনাবাহিনী।

তারপর দীর্ঘ সেই কালো রেখা অর্ধবৃত্তাকার হয়ে এগিয়ে আসতে থাকল আমাদের দিকে। কতক্ষণ হতবাক হয়েছিলুম কে জানে! হঠাৎ কর্নেল চেঁচিয়ে উঠলেন, সমুদ্রের কাছে চলো সবাই! সমুদ্রের কাছে! তারপর দৌড়ে তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলেন।

কখন ষষ্ঠীচরণ রান্না ফেলে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সে বলে উঠল, ওরে বাবা!

আমি রুদ্ধশ্বাসে বললুম, রাইফেল এনে গুলি ছুড়ি কর্নেল!

কর্নেল তাঁবুর ভেতর থেকে শুনতে পেয়ে বললেন, না জয়ন্ত; গুলি করে ওদের শেষ করে যাবে না। সারা দ্বীপের মাটির তলায়-তলায় দুর্গের মতো কোটি কোটি পিঁপড়ে-মানুষ রয়েছে মনে হচ্ছে; এস, সবাই সমুদ্রের দিকে পালাই।

আমরা চারজনে সব কিছু ফেলে পুবে সমুদ্রের দিকে দৌড়ে চললুম। কর্নেল শুধু বেতার যন্ত্রটা সঙ্গে নিয়েছেন দেখা গেল।

যখন বিচে পৌঁছলুম, তখন আমাদের দম আটকানো অবস্থা। বুঝতে পারছিলুম না, এখানে কীভাবে ওদের হাত থেকে বাঁচব। এদিকে সমুদ্র অনেকটা শান্ত! কর্নেল সোজা জলে নেমে গিয়ে ডাকলেন, এস জয়ন্ত। আসুন ডঃ প্রসাদ। আমরা এখন নিরাপদ।

ষষ্ঠীচরণ কর্নেলের দিকেই জলে নেমেছে। ঢেউয়ের ঝাপটায় কোমর অব্দি ভিজে যাচ্ছে ওদের। আমি ডঃ প্রসাদও ওদের কাছে গেলুম। বললুম, কর্নেল! আমরা এখানে কীভাবে নিরাপদ? ওই তো ওরা এগিয়ে আসছে!

কর্নেল বেতার যন্ত্রের চাবি ঘুরিয়ে কোন বেতার ধরে রেখেছিলেন। বললেন, ওরা জলকে বড় ভয় পায়।

জিমকে আমি দু'হাতে বুকের কাছে ধরে রেখেছি। সে থরথর করে কাঁপছে। বিচের ওধারে উঁচু ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে নেমে আসছে পালে পালে নেকুর। বীভৎস তাদের মুখভঙ্গি। জিভ

লকলক করছে। পিঁপড়ে-মানুষেরা তিড়িং-বিড়িং করে নাচতে নাচতে আসছে ওদের পেছন-পেছন!

বিচের বালিতে এসে ওরা থমকে দাঁড়াল।

কর্নেল বেতার যন্ত্রে কার সঙ্গে কথা বলছিলেন। শুনলুম উনি বললেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ, ভেগা আইল্যান্ড। শীগগির হেলিকপ্টার নিয়ে আসুন। আমরা বিপন্ন।

ষষ্ঠীচরণ চোখ বুজে ঠকঠক করে কাঁপছে একহাঁটু জলে। জিম আমার বুকে মুখ লুকিয়েছে। ডঃ প্রসাদ বিড়বিড় করে বলেছেন, আহা! ক্যামেরাটা আনলে কত ভাল হত! কেউ কি বিশ্বাস করবে আমাদের কথা?

কথাটা কানে যেতেই কর্নেল প্রায় আর্তনাদ করে বললেন, ওই যাঃ! আমার ক্যামেরাটা আর কি ফিরে পাবো? কী ভুলো মন আমার!

উজ্জ্বল রোদে সোনালি বিচের ওপর পালে পালে জিভ বের করা নেকুর আর অসংখ্য পিঁপড়ে-মানুষ একইভাবে দাঁড়িয়ে।

ঘরের ছেলে বেঁচে-বর্তে ভেগা আইল্যান্ড থেকে ঘরে ফিরতে পেরেছিলুম, এই যথেষ্ট! দিন সাতেক পরে পোর্টব্লেয়ার থেকে কর্নেল তাঁর বন্ধু, বিমানবাহিনীর সেই জাঁদরেল অফিসারের সাহায্যে হেলিকপ্টারে চেপে ভেগা দ্বীপে তাঁর অত্যদ্ভুত ক্যামেরা আর আমার রাইফেলের খোঁজে পাড়ি জমিয়েছিলেন। কিন্তু কোথায় ভেগা দ্বীপ? দ্বীপটা যেন বেমালুম তলিয়ে গেছে ভারত মহাসাগরে। অনেক ওড়াউড়ি করে তাঁরা ফিরে আসেন।

এখন কর্নেল বলেন, তাহলে কি আমরা চারজনেই একইরকম বিদঘুটে স্বপ্ন দেখেছিলুম?

ষষ্ঠীচরণ বলে, তা আর বলতে?

আমিও সায় দিয়ে বলি, ঠিক ঠিক। স্বপ্নই বটে। তবে যদি ক্যামেরা বা রাইফেল হারায়, তাহলে তো বড় রহস্যের ব্যাপার। ও কর্নেল, জীবনে এত রহস্যের সমাধান করেছেন, এটা করবেন না?

কর্নেল উদাসভাবে শুধু বলেন, তাই তো।

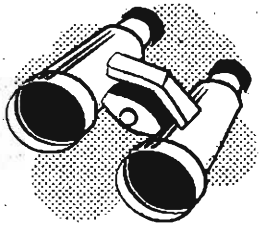

চিরামবুরুর গুপ্তধন

জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফাঁপরে পড়েছি। হঠাৎ দেখি, ইয়া এক বড় কেঁদো বাঘ হালুম করে সামনে দাঁড়াল। পা দুটো মাটিতে সেঁটে গেছে ভয়ের চোটে। তারপর দেখি, বাঘটা আদতে বাঘই নয়, কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। তিনি কেন বাঘ হয়ে গেছেন বুঝলুম না। খুশি হয়ে বললুম, "বললুম, মাই ডিয়ার ওল্ড ম্যান। হাউ ডু ইউ ডু?" কর্নেল হাউমাউ করে কেঁদে বললেন, "ভাল না ডার্লিং। আমার লেজ হারিয়ে গেছে।" এ বয়সে লেজ হারানোর চেয়ে অপমানজনক কিছু নেই। কর্নেলের লেজ হারানোর কথা শুনে আমিও দুঃখে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললুম।.....

তারপরই টের পেলুম আমি মশারির ভেতরে শুয়ে আছে আছি। আশ্চর্য, আমার চোখ দুটো যেন ভিজে স্যাঁতসেতে। ধড়মড় করে তক্ষুণি উঠে বসলুম এবং খিক-খিক করে হাসতে থাকলুম। কী বিদঘুটে স্বপ্ন রে বাবা!

টেবিলের সামনে ঝুঁকে বসে কী-সব নাড়াচাড়া করছিলেন যিনি, তাঁর মাথায় তখনও প্রাতঃভ্রমণের নীলচে টুপি। সেই টুপি ও তাঁর সাদা গোঁফ দাড়িতে তখনও জঙ্গলের শুকনো পাতার কুচি, কাঠকুটো, পাখির বিষ্ঠা, মাকড়সার জালের ছেঁড়া অংশ, এমনকী দু-একটা পোকামাকড়ও খুঁজে পাওয়া সম্ভব। না ঘুরেই সম্ভাষণ করলেন, "গুড মর্নিং জয়ন্ত! আশা করি সুনিদ্রা হয়েছে।"

মশারি থেকে বেরিয়ে বললুম, "হাসছি কেন, জিজ্ঞেস করলেন না?"

"হাসছিলে নাকি? তুমি তো খুঃ খুঃ করে কাঁদছিলে মনে হল।"

"কাঁদছিলুম আপনার দুঃখে।" একটু চটে গিয়ে বললুম। "আপনার লেজ হারানোর কান্না দেখে আমারও কান্না পেয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য, আপনি আমায় জাগিয়ে দেননি। লেজটা আপনারই ছিল।"

"আমার লেজ!" বলে কর্নেল নিজের পশ্চাদ্দেশে হাত বুলিয়ে নিলেন। তারপর হাসতে হাসতে বলনে, "ডার্লিং। সত্যি যদি মানুষের লেজ থাকত, ব্যাপারটা কত সুখের হত বল তো! লেজ দিয়ে পিঠ চুলকানো, মাছি তাড়ানো, আবার দরকার হলে কাউকে লেজের বাড়ি মারা-কত কাজ হত! তাছাড়া, কারও ওপর রাগ হলে মুখে সেটা প্রকাশ না করলেও চলত। লেজ খাড়া হলেই টের পেত আমি রেগেছি। ব্যাপারটা কি সভ্য মানুষের পক্ষে ভদ্রতাসম্মত হত না ডার্লিং? আরও ভেবে দ্যাখো, লেজ থাকলেও তারও পোশাক দরকার হত। নিত্যনতুন ডিজাইনের লেজ-ঢাকা তৈরি করত টেলাররা। নাম দিত টেলেক্স। আর মহিলাদের বেলায় টেলেক্সি। ম্যাক্সির মতো।"

আমার এই বৃদ্ধ বন্ধু একবার মুখ খুললে সহজে বন্ধ করেন না। বাথরুমে ঢুকে পড়লুম। আধ ঘণ্টা পরে বেরিয়ে দেখি, তখনও তেমনি বসে আছেন। পাশে অবশ্য ব্রেকফাস্টের ট্রে রেখে গেছে বাংলোর চৌকিদার। বললুম, "লেজ সম্পর্কে আরও কথা থাকলে এবার বলতে পারেন। এখন আমি ফ্রি।"

কর্নেল কতকগুলো ছবি দেখছিলেন। ছবিগুলো সদ্য প্রিন্ট করা। এখনও ভিজে রয়েছে। বললেন, "লেজ মুখের শ্রম কমিয়ে দিত, জয়ন্ত! তোমাদের দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার সম্পাদক মশাইয়ের সামনে গিয়ে লেজ নাড়তে শুরু করলেই তিনি খুশি হতেন। রিপোর্টিংয়ে ভুল বেরুলে লেজটা শিথিল করে মেঝেয় ফেলে রাখতে। তারপর লেজটা গুটিয়ে সম্পাদকের চেম্বার থেকে বেরুতে। সাতখুন মাফ!"

"হ্যাঁ লেজ। আমার জাদু-ক্যামেরার রাতের ফসল, জয়ন্ত!" কর্নেল মুচকি হেসে বললেন।

"অবিশ্বাস্য! মানুষের কখনও লেজ হয়?" ছবিটা ভাল করে দেখে আমার বিস্ময় বেড়ে গেল। "কর্নেল! এ নিশ্চয় কোনও প্রাণী, মানুষের মতো দেখতে এই যা।"

কর্নেল ব্রেকফাস্টের ট্রে টেনে নিয়ে আওড়ালেন, "বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি! জয়ন্ত, পাশের ঘরের ভদ্রলোক—নৃবিজ্ঞানী ডঃ দীননাথ মহাপাত্র আমায় এরকম একটা আভাস দিয়েছিলেন। কিন্তু কানে নিইনি। কাল সন্ধ্যায় গোপনে একখানা ক্যামেরা পেতে এসেছিলুম। উদ্দেশ্য তো জানো। জন্তুদের জল খাওয়ার সময় ছবি তোলা। ভোরে ক্যামেরা আনতে গিয়ে জলার ধারে বালির ওপর মানুষের পায়ের ছাপ দেখতে পেলুম। অবাক লাগল। খুব বদনাম আছে জলাটার। বাগাদা আদিবাসীদের ওটা তীর্থক্ষেত্র ছিল প্রাচীন যুগে। কিন্তু গত পঞ্চাশ-ষাট বছরে ওখানে তার যায় না। অভিশাপ লেগেছে নাকি। তো পায়ের ছাপ কাদের তা দেখতেই পাচ্ছ।"

এই সময় দরজার বাইরে ডঃ মহাপাত্রের সাড়া পাওয়া গেল। "আসতে পারি কর্নেল?"

কর্নেল ঘুরে বললেন, "আসুন, আসুন!" তারপর ট্রেটা তুলে ছবিগুলোর ওপর রাখলেন। বুঝলুম, কোনও কারণে ব্যাপারটা নৃবিজ্ঞানী ভদ্রলোককে জানাতে চান না কর্নেল। কাজেই আমাকেও মুখ বুজে থাকতে হবে।.....

বিবর্তনবাদ ও কার্টুন

ডঃ মহাপাত্র কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললেন, "কাল আপনাকে বাগাদা ট্রাইবের কথা বলছিলুম। বাংলার বাগদি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে চেহারা ও পেশায় কী আশ্চর্য মিল! এরাও মাছ ধরে। আবার একসময় এরাও সেকালের বাঙালি বাগদি গোষ্ঠীর মতো লাঠিয়ালি, ডাকাতিতেও পটু। এখনও তারা শক্ত গাছের ডাল থেকে তৈরি লাঠি ব্যবহার করে। ধাতুর ব্যবহার এদের মধ্যে অচল। কাজেই একই ট্রাইবের দুটি গোষ্ঠী দু জায়গায় বাস করছে। আরও মজার কথা এই, মধ্যপ্রদেশ এবং মহরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলে বাউরি ট্রাইব রয়েছে। মোটামুটি ফর্সা বা তামাটে গায়ের রং। আশা করি, বাঙালি বাউরি সম্প্রদায়ের কথা আপনি জানেন কর্নেল। তো কথা হল—এরা ভারতের আদিম বাসিন্দা। অস্ট্রিক জাতির একটা শাখা।"

বনজঙ্গল বেড়াতে এসে এসব কচকচি কার বা ভাল লাগে? রাগ হল দেখে যে, গোয়েন্দাপ্রবর দাড়ি নেড়ে সায় দিচ্ছেন এবং প্রশংসাসূচক উক্তিও করছেন। 'এক্সকিউজ মি' বলে সোজা বাইরে চলে গেলুম। এপ্রিলে চিরামবুরু পাহাড় ও জঙ্গলের সৌন্দর্য তুলনাহীন। যতদূর চোখ যায়, অসংখ্য টিলা ও পাহাড়। সবুজ, খয়েরি, লাল, সাদা কত রঙের বাহার! একটি টিলার গায়ে এই বাংলো। লনের ঘাসে কিছুক্ষণ পায়চারি করার পর দেখি, কথা বলতে বলতে দুই পণ্ডিত বেরুচ্ছেন।

"হ্যাঁ, মার্কো পোলো বঙ্গোপসাগরের একটি দ্বীপে লেজওয়ালা মানুষ দেখার কথা বলেছেন। পনেরো শতকের কথা। তো লেজ নিয়ে অবাক হওয়ার কিছু নেই, কর্নেল! আমাদের শিরদাঁড়ার শেষপ্রান্ত যেটা ককসিক্স বা পিকচঞ্চু বলা হয়— কোকিলের ঠোঁট আর কী—সেটাই লেজের প্রমাণ। বিবর্তনের একটা পর্যায়ে লেজ খসে গিয়েছিল। কারণ হল ভাষা। মানুষের ভাষাই যখন ভাবপ্রকাশে সমর্থ তখন লেজের দরকারটা কী?"

কর্নেল বললেন,"ঠিক, ঠিক। তবে ধরুন, হাতের নিয়মিত ব্যবহারে হাতের ক্ষমতাও বেড়েছিল! লেজের কাজ হাতে আরও ভালভাবে করা যায়। কাজেই ..."

হঠাৎ কথা থামিয়ে কর্নেল কান খাড়া করে কী শুনলেন। তারপর দৌড়ে ঘরে ঢুকলেন। ডঃ মহাপাত্র হকচকিয়ে গেছেন দেখলুম। একটা পরে কর্নেল বাইনোকুলার নিয়ে বেরিয়ে এলেন। তারপর দৌড়ে বাংলোর গেট পেরিয়ে ঢালুতে বন বড় পাথর আর ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হলেন। কোথায় একটা পাখি ডাকছিল টু টু টুইক!

ডঃ মহাপাত্রর কাছে গিয়ে বললুম, "ওঁর ওই বাতিক। পাখি প্রজাপতি ঘাসফড়িং পোকামাকড় নিয়ে থাকেন।"

"ও! উনি একজন ন্যাচারালিস্ট তাহলে! আমি ভেবেছিলুম শিকারি।"

একটু হেসে বললুম, "প্রকৃতিবিজ্ঞানী। তো ডঃ মহাপাত্র, কর্নেলের কাছে কি লেজওয়ালা মানুষের ছবিটা দেখলেন?"

ডঃ মহাপাত্র চোখ বড় করে বললেন, "অ্যাঁ! ছবি! কোথায় ছবি! কিসের ছবি?"

অমনি বুঝলুম, ভুল করেছি। ঝটপট বললুম, "মানে একটা কার্টুন আর কী! বিলিতি পাঞ্চ পত্রিকার।"

ডঃ মহাপাত্র একটু হেসে বলনে, "তাই বলুন। তবে কর্নেল কার্টুন দেখাননি আমায়। প্লিজ, আপনি নিয়ে আসুন না ওটা, দেখি। পাঞ্চের কার্টুনের কোনও তুলনা হয় না। নিশ্চয় ডারউইন-শতবার্ষিকী উপলক্ষে বেরিয়েছে।"

বেগতিক দেখে বললুম, "দুঃখিত ডঃ মহাপাত্র। কর্নেলের জিনিসপত্রে আমাদের হাত দেওয়াটা ঠিক হবে না।"

"তাও ঠিক।" বলে ডঃ মহাপাত্র মুখ গোমড়া করে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। কিন্তু ওঁকে কর্নেল ওই অদ্ভুত ছবিটা কেন দেখাতে চাইছেন না কে জানে! নাকি কর্নেল নিজেই মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে লেজওয়ালা মানুষ আবিষ্কারের গৌরব পেতে চান?....

জঙ্গলের বিপদ আপদ

কর্নেল সেই যে পাখির পেছনে দৌড়ুলেন, তো আর ফেরার নাম নেই। দুপুর পর্যন্ত বনজঙ্গলে একটু ঘোরাঘুরির ইচ্ছে ছিল। একা যেতে সাহস পাচ্ছিলুম না। ভাবলুম নৃবিজ্ঞানী ভদ্রলোককে ডাকব নাকি?

কিন্তু উনি নিশ্চয় চটে আছেন আমার ওপর। অগত্যা একা বেরিয়ে পড়লুম। জঙ্গলে রাস্তা না-হারানোর সহজ উপায় হয়, চলার সময় কিছু চিহ্ন ছড়িয়ে রাখা। আমি অবশ্য রাস্তা ধরে যাচ্ছিলুম না। কখনও পাথুরে জমির ওপর দিয়ে, কখনও ঝোপঝাড়ের ভেতর ফাঁকা জায়গা দিয়ে, কখনও বা উঁচু গাছপালার ভেতর দিয়ে। খেয়ালখুশি মতো হেঁটে যাওয়া। একটা করে গাছের ডাল ভেঙে চিহ্ন রাখছিলুম। ফেরার সময় চিহ্নগুলো কাজে লাগবে।

একসময় থমকে দাঁড়ালুম। হাতি-বাঘ-ভালুকের কথা মনে পড়ে গেল। সঙ্গে কেন যে রাইফেলটা নিতে ভুলে গেলুম! এখন আর আফসোস করে লাভ নেই। অনেকটা দূরে চলে এসেছি। একখানা বেশ উঁচু জায়গা। ঘন ঘাস আর বেঁটে চ্যাপ্টা পাতাওয়ালা একরকম গাছ গজিয়ে রয়েছে। তারপর ঢালু হয়ে মাটিটা নেমে গিয়ে একটা গভীর শালবনে ঢুকেছে। ডাইনে একটু দূরে একটা প্রকাণ্ড কালো পাথর, তার কিনারা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল একটা রুনিগাছ। পাথরটা ঢেকে লতার ঝালর। ঝালরে চোখ ঝলসানো ফুলের সাজ। ফুলগুলো কাছে থেকে দেখার জন্য এগিয়ে গেলুম। রুনিগাছটার তলায় গিয়ে সেই দাঁড়িয়েছি, কালো পাথরটা থেকে কালো কুচকুচে একটা প্রাণী ঝুপ করে গড়িয়ে হাত-দশেক তফাতে মানুষের মতো দু'ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর কানে তালা-ধরানো এক ডাক ছাড়ল "আঁ-আঁ-ক্!"

সর্বনাশ! এ তো দেখছি একটা ভালুক। ইংরেজিতে এদের বলা হয় শ্লথ বিয়ার। মারাত্মক হিংস্র জানোয়ার। দিশেহারা হয়ে দৌড়াতে থাকলুম। প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছিল, এই বুঝি ভালুকটার তীক্ষ্ণ নখে আমার পিঠ ফালাফালা হয়ে যাবে।

শালবনের ভেতর দিয়ে বহু দূর দৌড়ে যাওয়ার পর ফাঁকা ঘাসজমিতে পৌঁছলুম। জমিটাতে অসংখ্য পাথর ছড়ানো। কতবার যে আছাড় খেলুম, প্যান্টশার্ট ছিঁড়ে গেল কাঁটাঝোপে, তারপর সামনে পড়ল নলখাগড়ার জঙ্গল। জঙ্গল ফুঁড়ে গিয়ে হুড়মুড় করে জলে পড়লুম। ভালুকটাকে এতক্ষণ একবারও ঘুরে দেখার সাহস পাইনি। এবার জলাটার মাঝ-অবধি একবুক জলে এগিয়ে ঘুরে দাঁড়ালুম। কোথায় ভালুক?

ভালুকটার সঙ্গে নিশ্চয় রেসে জিতে গেছি। জলাটা তত বেশি বড় নয়। ওপারে বালিয়াড়ি দেখা যাচ্ছিল। খুব সাবধানে জলের ভিতর পা ফেলে এগোতে হচ্ছিল। কাদার মধ্যে পাথর রয়েছে প্রচুর। জল কোথাও এককোমর, কোথাও একবুক। বালির তটে পৌঁছে দু-পা ছড়িয়ে বসে রইলুম কিছুক্ষণ। নিজের বোকামির জন্য রাগ হচ্ছিল খুব। তেষ্টাও পেয়েছিল। কিন্তু জলটা খাওয়া উচিত হবে কি না বুঝতে পারছিলুম না।

কিছুক্ষণের মধ্যে ক্লান্তি চলে গেল। তখন উঠে দাঁড়ালুম। তারপর চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে চমকে উঠলুম। কর্নেল কি এই জলার ধারেই কোথাও ক্যামেরা পেতে রেখেছিলেন? সেই লেজওয়ালা মানুষের ছবিটা এখানকার বলেই তো মনে হচ্ছে। ভালুকের চেয়ে লেজওয়ালা মানুষ কতটা বিপজ্জনক কে জানে! এখান থেকে ঝটপট কেটে পড়াই ভাল।

বালিয়াড়ির পর প্রকাণ্ড পাথরের স্তূপ সার-সার দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফাঁক গলিয়ে যাব কি না ভাবছি, হঠাৎ বাঁ দিকের স্তূপটার আড়াল থেকে একটা বিদঘুটে চেহারার লোক বেরিয়ে এল। তার গায়ের রং কুচকুচে কালো। কোমরে এক টুকরো লাল ন্যাকড়া জড়ানো। গলায় একগুচ্ছের লাল পাথরের মালা। দু'হাতে ওই রকম লাল পাথরের মালা জড়ানো। মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ। থ্যাবড়া নাক। কপালে লাল রঙের কয়েকটা আঁকিবুকি। তার মাথায় একরাশ জটাচুল। তার হাতে বেঁটে কাঠের লাঠি। লাঠিটায় বিকট সব মুখ খোদাই করা আছে। সে ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে চেঁচিয়ে উঠল, "কে তুমি? এখানে কেন এসেছ? মরার সাধ হয়েছে তোমার?"

এবার আরও চমকে উঠলুম তার লেজ দেখে। হ্যাঁ, লেজ। ছবিতে ঠিক যেমনটি দেখেছি—কতকটা হনুমানের লেজের মতো দেখতে, কিন্তু বেশ মোটা। তত লম্বা নয় অবশ্য। তাছাড়া ঠিক এই লোকটাকেই তো ছবিতে দেখেছি।

সেই ভোরবেলা থেকে টানা দুঃস্বপ্ন দেখছি না তো? চোখ রগড়ে নিয়ে তাকালুম। তারপর দেখলুম, ওর লেজটা খাড়া হচ্ছে। তারপর সেই লেজওয়ালা লোকটা আচমকা কাঠের লাঠিটা তুলে আমার মাথায় মারল। টের পেলুম, ভূমিকম্প হচ্ছে এবং আমি পড়ে যাচ্ছি। আমার চোখের সামনে অন্ধকার।

ডঃ মহাপাত্রের দুরবস্থা

চোখ মেলে দেখি, আলো জ্বলছে এবং আমি বাংলোর খাটে শুয়ে আছি। তাহলে আগাগোড়া সবটাই লেজঘটিত দুঃস্বপ্ন। ওঠার চেষ্টা করতেই পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনলাম, "উঁহু, নোড়ো না, নোড়ো না!"

একটু তফাতে বসে আছেন কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। একটা কিছু করছেন। মাথাটা চিনচিন করছিল। হাত দিয়ে টের পেলুম ব্যান্ডেজ রয়েছে। কর্নেল একটু হেসে পাশে এসে বসলেন। বললেন, "বনেজঙ্গলে গোঁয়ার্তুমি ভাল না ডার্লিং! তোমার কতবার পইপই করে বলেছি। ভাগ্যিস, আজ একটু সকাল-সকাল জলাটার ধারে ক্যামেরা পাততে গিয়েছিলুম। ধরেই নিয়েছিলুম তুমি ডঃ মহাপাত্রর সঙ্গে বরমডির আদিবাসী মেলায় গেছ। চৌকিদার সঠিক কিছু বলতে পারল না। তাকে তুমি বা ডঃ মহাপাত্র কিছু বলে যাওনি।"

আমার শরীর অস্বাভাবিক দুর্বল। কর্নেল বেরিয়ে গেলেন। তারপর গরম দুধ নিয়ে ফিরলেন। বললেন, "দুধটা খেয়ে নাও। রাত মোটে সাড়ে-আটটা। সাতটার সময় একবার জ্ঞান হয়েছিল তোমার। তখন ব্রান্ডি খাইয়ে দিয়েছি। কী-সব ভুল বকছিলে—লেজওয়ালা মানুষের কথা বলছিলে।" কর্নেল হাসতে লাগলেন।

জোর করে উঠে বসলুম। "ভুল বকিনি। আমি ঠিক আছি। জলার ধারে একটা লেজওয়ালা বিদুঘুটে মানুষ আমার মাথায় লাঠির বাড়ি মেরেছিল। আপনার ছবির কিম্ভূত প্রাণীটাই।"

"বলো কী! আমি ভেবেছিলুম পাথরের স্তূপে উঠে পা হড়কে গেছে এবং মাথায় চোট লেগেছে।

"না।" বলে আগাগোড়া যা ঘটেছিল, সব বললুম কর্নেলকে।

কর্নেল ভুরু কুঁচকে একবার টাকে একবার দাড়িতে অভ্যাসমতো হাত বুলিয়ে বললেন, "হুম! কিন্তু আমাদের নৃবিজ্ঞানী গেলেন কোথায়? বড় ভাবনায় পড়া গেল দেখছি।"

এ-রাতে ঘুমটা স্বভাবত গভীর হয়েছিল। দুঃস্বপ্ন দেখিনি। দেখিনি লেজ-ঘটিত কোনও দৃশ্যও। মশারির ভেতর থেকে আমার বৃদ্ধ বন্ধুটিকে কালকের মতোই আপন কাজে মগ্ন দেখলুম। কৃতজ্ঞতায় মন নুয়ে রইল। কাল ওই বিপদসঙ্কুল জলার ধার থেকে এই শক্তিমান বুড়োমানুষটি আমায় কাঁধে করে অতটা পথ বয়ে এনেছেন। ছেঁড়া নোংরা পোশাক বদলে দিয়েছেন। স্নেহশীল পিতার মতো আচরণ করেছেন। আস্তে বললুম, "গুড মর্নিং মাই ডিয়ার ওল্ড ম্যান!"

কর্নেল 'মর্নিং' বলে উঠে এসে মশারি তুলতে থাকলেন। তড়াক করে উঠে বসে বললুম "থাক্ আর শোবার দরকার নেই। আপনার রাতের ক্যামেরায় কী ফসল তুললেন দেখি।"

টেবিলের একটা ছবি তুলে দেখে হকচকিয়ে গেলুম। জলার ধারে সেই পাথরের স্তূপ বলেই মনে হচ্ছে। একটা স্তূপের কাছে হাঁটু দুমড়ে বসে আছেন নৃবিজ্ঞানী ডঃ দীননাথ মহাপাত্র। হাতে শাবলজাতীয় কিছু।

"কী কাণ্ড!" অবাক হয়ে বললুম। নৃবিজ্ঞানী দেখছি প্রত্নবিজ্ঞানীর মতো খননকার্যে লিপ্ত হয়েছেন। কর্নেল, ওখানে কি প্রাচীন সভ্যতা লুকিয়ে আছে নাকি?"

কর্নেল একটু হেসে বললেন, "প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে রাতদুপুরে লুকিয়ে কেউ করে না, ডার্লিং—যদি না তুতান-খামেনের মতো কোনও সম্রাটের গুপ্তধন পোঁতা থাকে।"

"মাই গুডনেস! ডঃ মহাপাত্র কি গুপ্তধন খুঁজছেন ওখানে?"

"জানি না।" বলে কর্নেল ব্রেকফাস্টের ট্রে টেনে নিলেন। বললেন, "শিগগির বাথরুম সেরে এসো। বেরুব।"

বাথরুম থেকে ফিরে জিজ্ঞেস করলুম, "ডঃ মহাপাত্র রাতের খাটুনির পর নিশ্চয় এখনও বিশ্রাম নিচ্ছেন? গুপ্তধন পেলেন কি না ওঁকে জিজ্ঞেস করার জন্য মন ছটফট করছে।"

"উনি ফেরেননি।"

"সে কী!"

কর্নেল কোনও কথা না বলে ব্রেকফাস্ট সেরে নিলেন। আমি কফিটুকু ঝটপট গিলে নিলুম। এই সময় বাইরে মোটর-গাড়ির গর গঁর শব্দ শোনা গেল। দু'জনে বেরিয়ে দেখি, বন দফতরের অফিসার সূর্যপ্রসাদ রাও জিপ থেকে গেটের কাছে নামছেন। হন্তদন্ত এসে বললেন, "কর্নেল! সাংঘাতিক ব্যাপার। বাগদা আদিবাসীরা ডঃ মহাপাত্রকে প্রচণ্ড মারধর করেছে। ভ্যাগ্যিস ফরেস্ট গার্ডরা ভোরবেলা ওদের বস্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। ওঁকে উদ্ধার করে আমাকে খবর দেয়। আমি গিয়ে ওঁকে বরমডি হাসপাতালে রেখে এলুম। বাঁচবেন কি না বলা কঠিন।"

কর্নেল বললেন, "বাগাদা বস্তিতে কেন গিয়েছিলেন ডঃ মহাপাত্র?" মিঃ রাও বললেন, "ওদের দেবতার থান আছে জঙ্গলের ভেতর একটি ছোট্ট লেকের ধারে। ওখানে বাইরের কোনও লোকের

যাওয়া বারণ। ওরা বলল, এই লোকটা তাদের পবিত্র থানের অপমান করেছে। ওদের বোঝানো বৃথা। তাছাড়া গভর্নমেন্ট এখন ট্রাইবালদের ব্যাপারে খুব সতর্ক। বস্তার এলাকার বিদ্রোহের কথা তো জানেন।"

"হুম। তাহলে ডঃ মহাপাত্রকে ওরা দেবতার থান থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল বলুন!"

"ঠিক বলেছেন।" বলে মিঃ রাও ডঃ মহাপাত্রের ঘরের তালা খুললেন। বললেন, "ওঁর পকেটে চাবিটা ছিল। ওঁর জিনিসপত্র কী-সব আছে, হাসপাতালে পৌঁছে দিতে হবে।

লেজ তুলে পলায়ন

মিঃ রাও চলে গেলে কর্নেল বললেন, "জয়ন্ত, সঙ্গে রাইফেল নাও তোমার। সেই ভালুকটার মুখোমুখি হলে আত্মরক্ষা করতে পারবে। কিংবা ধরো, দৈবাৎ সেই লেজওয়ালা মানুষটা এসে পড়ল ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করে তাকে ভয় দেখাবে।"

কর্নেল হাসছিলেন। রাইফেল কাঁধে নিয়ে পা বাড়িয়ে বললুম,"আমরা যাচ্ছি কোথায়?"

"গুপ্তধন খুঁজতে।"

সারা পথ আর মুখ খুললেন না গোয়েন্দপ্রবর। সতর্কভাবে সেই জলার ধারে পৌঁছে স্তূপগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "খোঁড়ার জায়গাটা বাগাদারা বুজিয়ে ঠিকঠাক করে দিয়েছে আগের মতো। যাই হোক, তুমি চারিদিকে লক্ষ্য রাখো। বাগাদারা যে-কোনো সময় এসে হামলা করতে পারে। আমি এমন কিছু অনুমানই করিনি। নইলে কোন সাহসে এখানে ক্যামেরা পাততে আসব?"

একটা পাথরের স্তূপের গায়ে খাঁজে কী একটা তোলা রয়েছে। কর্নেল সেটা তুলে নিয়ে বললেন, "আরে! এটা দেখছি ডঃ মহাপাত্রর নোটবই। এখানে রেখে গুপ্তধন খুঁজছিলেন নাকি?"

নোটবইটা ছোট। প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন। স্তূপগুলোর গায়ে অদ্ভুত সব আঁকিবুকি চোখে পড়ছিল। কর্নেল সেগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। এইসময় হঠাৎ আমার পিছনে চাপা শব্দ হল। ঘুরে দেখি, কালকের সেই লেজওয়ালা। লাঠিটা যেই তুলেছে, আমিও রাইফেল তাক করেছি। ধমক দিয়ে বললুম, "ফ্যাল হতচ্ছাড়া হনুমান! ফেলে দে লাঠিটা! নইলে গুলি করে মারব।"

লাঠিটা ফেলে সে পিঠটান দেওয়ার জন্য ঘোরা মাত্র কর্নেল তীরের মতো এসে ওর লেজ ধরে হ্যাঁচকা টান মারলেন। লেজটা খুলে এল। সে অজানা ভাষায় চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে পড়ি-কি মরি করে পালিয়ে গেল।

কর্নেল লেজটা দেখতে দেখতে বললেন, "একটা চমৎকার ট্রাইবাল আর্টের নিদর্শন। যাই হোক জয়ন্ত! আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়। চলো জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কেটে পড়ি। বাংলোতে পৌঁছেই ঝটপট সব গুছিয়ে নিয়ে বেরুতে হবে।"

কর্নেল হন্তদন্ত হয়ে এগোলেন। আমি পা বাড়াতে গিয়ে ঘুরে বললুম, "আমিই বা ট্রাইবাল আর্টের এ-নিদর্শন হাতছাড়া করব কেন? বিশেষ করে এটা আমার একটা স্মারকচিহ্ন হয়ে থাকবে—মার খাওয়ার!"

বিদঘুটে বেঁটে লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে কর্নেলের সঙ্গ ধরলুম।...

বাদশাহি সোনাদানা

চিরামবুরু-বরমডি রোডে একটা কাঠ বোঝাই ট্রাক পেয়ে গিয়েছিলুম। বরমডিতে কর্নেলের সামরিক জীবনের বন্ধু মেজর অর্জুন সিংয়ের বাড়ি। ওখান থেকেই আমরা চিরামবুরু জঙ্গলে গিয়েছিলুম। মেজর অর্জুন সিং আমাদের দেখে হকচকিয়ে গেলেন, "কী ব্যাপার? এত শিগগির চলে এলেন যে জঙ্গল থেকে।"

কর্নেল বললেন, "পরে বলছি সব! এখন ভীষণ খিদে-তেষ্টায় ভুগছি।"

মেজর অর্জুন সিং হো-হো করে হেসে উঠলেন। তারপর ভেতরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে প্রচুর খাদ্য এল টেবিলে। খেতে-খেতে কর্নেল চিরামবুরুর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন।

মেজরসাহেব বললেন, "আপনাকে তো বলেইছিলুম মশাই, বাগাদা ট্রাইবের ওঝা সবসময় লেজ পরে থাকে। ওদের বিশ্বাস, রামায়ণের হনুমানজির অবতার ওদের ওঝা।"

কর্নেল বললেন, "হ্যাঁ। কিন্তু আসার সময় ট্রাকে বসে ডঃ মহাপাত্রের নোটবইটা পড়ে ফেলেছি। ওতে মোগল আমলের এক ঐতিহাসিক মির্জা মেহেদি খানের বই থেকে একটা উদ্ধৃতি আছে। পড়ে শোনাচ্ছি।"

নোটবইটা বের করে কর্নেল পড়তে যা বলেন।...দাক্ষিণাত্য থেকে বাদশাহ আলমগিরের পুত্র শাহজাদা মুহম্মদ বিদ্রোহ দমন করে ফিরে আসার সময় বিস্তর ধনরত্ন নিয়ে যান। পথিমধ্যে সিরামবোরাত নামক ভীষণ অরণ্যে শাহজাদার পশ্চাদ্‌বর্তী দলটি জংলিদের কবলে পড়ে। জংলিরা রাতের অন্ধকারে তাদের অনেক ধনরত্ন লুণ্ঠন করে। পরে অগ্রবর্তী দলের নায়ক মর্দান খাঁ জংলিদের ওপর প্রতিশোধ নেন। আমি মর্দান খাঁয়ের জামাতা সেহাবুদ্দিনের কাছে শুনেছি, জংলিদের অস্ত্র বলতে শুধু কাঠের লাঠি ছিল। তাদের দলপতির নাকি বানরের মতো লেজ ছিল। মর্দান খাঁ জংলিদের বন্দি করেন। কিন্তু লুণ্ঠিত ধনরত্নের সন্ধান পাননি। জংলিরা বলে, সব জিনিস তাদের লেজওয়ালা দলপতি কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। মর্দান খাঁ জঙ্গল তল্লাশ করে তার সন্ধান পাননি। ফলে ক্রোধের বশে তিনি জংলিদের হত্যা করেন।"

কর্নেল বললেন, "এর তলায় ডঃ মহাপাত্রের নোট রয়েছে। লিখেছেন, বাগাদাদের নিয়ে গবেষণার সময় ওদের একটি লোক-কথায় মির্জা মেহেদি খানের বর্ণিত ঘটনার সূত্র রয়েছে। বাগাদা ওঝারা নাকি বংশপরম্পরায় সেই ধনরত্নের সন্ধান জানে। ওই ওঝাদের কিন্তু কৃত্রিম লেজ থাকে।"

ডঃ অর্জুন সিং অভ্যাসমতো হো হো করে হেসে বললে, "লোক-কথা? লোক-কথা মানেই গালগল্প!"

কিংবদন্তির শঙ্খচূড়

শেয়ালের ফাঁদ

জয়রামবাবু বললেন, 'মানুষের মতো মানুষের মুখের ভাষাকেও রোগে ধরে। ষট্‌গর্ভ কথাটা রোগে ভুগে দাঁড়িয়েছে সাতগড়ায়। এ যেন সুকুমার রায়ের গল্পের মতো ছিল রুমাল, হয়ে গেল বেড়াল! ছিল ষট্‌গর্ভ হয়ে গেল সাতগড়া।'

খিকখিক করে হাসতে হাসতে লাগলেন আমাদের গৃহস্বামী জয়রাম সিঙ্গিমশাই। এখন আমরা অবশ্য ওঁর গৃহে নেই। ওঁর ফার্ম চক্কর দিয়ে অধিক ফলনশীল ভুট্টাক্ষেতের পাশে একটা নালার ধারে প্রকাণ্ড পাথরে বসে আছি। ডাইনে টিলার মাথায় সূর্য কাত হয়ে গড়াচ্ছে। শেষবেলার নরম রোদে সবুজ শস্য এবং গাছগাছালি ঘুম ঘুম চোখে দাঁড়িয়ে আছে! বাতাস বইছে না। কিন্তু গরমটা কমে গেছে। বাপ্‌স! এখানে জুনমাসে কী প্রচণ্ড গরম, কল্পনা করা যায় না। এই গরমে কর্নেলের মাথায় বিদঘুটে বাতিক গজিয়ে উঠল। সাতগড়া নিয়ে এলেন টানতে টানতে। এসে থেকে মনটা খালি পালাই পালাই করছে।

সিঙ্গি মশাইয়ের বয়স বোধ করি বাহান্ন-পঞ্চান্নর মাঝামাঝি হবে। চেহারায় পোড় খাওয়া ভাব আছে। স্বাস্থ্যও চমৎকার। গায়ে ছাইরঙা স্পোর্টস গেঞ্জি, পায়ে গামবুট, মাথায় নীলচে রোদ-টুপি। একটা গাঁট্টা মারকুটে চেহারার কালো অ্যালসেশিয়ানের চেন ওর ডান হাতের মুঠোয়। বাঁহাতে একটা ছড়ি। কুকুরটা মাঝে মাঝে মুখ তুলে কী যেন দেখছে আর ছুটে যেতে চেষ্টা করছে। আতঙ্কে তার দিকে নজর রেখেছি। কুকুরটা আমার দু'চক্ষের বিষ। হতচ্ছাড়া প্রাণীটা যেন তা টের পেয়েছে এবং দু'-একবার মনিবের পায়ের কাছ থেকে ঘাড় বেঁকিয়ে লাল চোখে আমাকে গরগর করে শাসাচ্ছে।

আশ্চর্য, কুকুরটা কর্নেলের হাঁটুর কাছটা শুঁকছে। বুড়োকে কেন ওর অত পছন্দ হয়ে গেল ভেবেই পাচ্ছি না। সে কি ওঁর সায়েবি চামড়া আর সাদা দাড়ির জন্য? শালুক চিনেছে গোপালঠাকুর!

জয়রামবাবু ষট্‌গর্ভের কাহিনী বলছেন। আমার চোখ-কান-মন কুকুরটার দিকে। একটু পরে কী ভাবে কুকুরটা ছাড়া পেয়ে গেল কে জানে! চেনসুদ্ধু দৌড়ে গেল বেঁটে চওড়া পাতাওয়ালা গাছগুলোর দিকে। জায়গাটা ঘন ঘাস, ঝোপঝাড় আর শুকনো পাতায় ঢাকা। জয়রামবাবু একবার ধমক দিলেন, 'জনি! কাম ব্যাক'। তারপর একটু হেসে বললেন, 'দেখুন না মজাটা! চেন কোথাও আটকে গিয়ে জব্দ হবে।'

কুকুরটা ততক্ষণে গতি কমিয়ে একখানে গিয়ে থেমেছে এবং জিভ বের করে সামনে তাকিয়ে। জয়রামবাবু, বললেন, 'হ্যাঁ—যা বলছিলুম। ষটগর্ভ। তার মানে ছ'টা গুহা। ওই যে প্রায় ন্যাড়া পাহাড়টা দেখছেন দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, ওখানেই আছে পাশাপাশি ছটা গুহা। পাঁচটা গুহাই ভেতরে ধস ছেড়ে বন্ধ হয়ে গেছে কোন যুগে। একটা অক্ষত আছে।'

জিজ্ঞেস করলুম। 'ভেতরে ঢুকেছেন নাকি?'

সিঙ্গিমশাই বললেন, 'যতবার ঢোকার চেষ্টা কেউ করেছে, ততবারই সাপের তাড়া খেয়ে পালিয়েছে। আমাকে তো তাড়া করে আমার ফার্ম অবধি এসেছিল। সে কে মারাত্মক অভিজ্ঞতা।

'কী সাপ?'

'শঙ্খচূড়।' জয়রামবাবু একটু হাসলেন। বললেন, গুলি করে মেরে ফেলিনি কেন? আপনারা তো দেখেছেন, বিষধর সাপ আমি মারি না, ধরি। এক্সপেরিমেন্ট করি। বিশেষ করে ওই শঙ্খচূড় সাপটাকে ধরার জন্য কত যে চেষ্টা করেছি, ব্যর্থ হয়েছি। সাপটা মশাই মানুষের চেয়ে ধূর্ত। কর্নেল সায়েবি এবার যদি কিছু করতে পারেন।'

বলে উনি কর্নেলের দিকে ঘুরলেন। আমিও ঘুরে কর্নেলের দিকে তাকালাম। ওহে ধুরন্ধর ঘুঘু বুড়ো, তাই তোমার এই ভয়ঙ্কর জুন মাসে সাতগড়া আগমন। চোখে চোখ পড়লে প্রকৃতিবিদ বৃদ্ধ কাঁচুমাচু হাসলেন। তারপর একটু কেশে বললেন, 'ইয়ে—মিঃ সিংহ, আপনারা গল্প করুন। আমি নালার ধারটা ঘুরে আসি।'

পাথরটা থেকে লাফ দিয়ে নেমে সোজা নালার ধারে কর্নেল কিছুটা এগোলেন। তারপর হাঁটু দুমড়ে বসলেন। তারপর ওঁর চিরাচরিত খেলা শুরু হয়ে গেল। একবার এদিকে একবার ওদিকে গুড়ি মেরে এগোচ্ছেন, কখনও কাত হয়ে প্রায় শুয়ে পড়েছেন ঘাসের ভেতর—এবং চোখে বাইনোকুলার। অ্যালসেশিয়ানটা হকচকিয়ে গেছে যেন বুড়োর কাণ্ড দেখে। গরগর করে দু'ঠ্যাঙে বসে দু'ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে কুকুরী পদ্ধতিতে।

সিঙ্গিমশাই অবাক হয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো জয়ন্তবাবু?'

মুচকি হেসে বললুম 'আবার কী? কোনও বিরল প্রজাতির পাখি-টাখি দেখেছেন।'

'তাই বলুন।' বলে জয়রামবাবু প্যান্টের পকেট থেকে পাইপ বের করলেন।

আমার চোখ কর্নেলের দিকে যতটা না, ততটা কুকুরটার দিকে। একটু পরে দেখি, কর্নেল বেঁটে গাছগুলোর দিকে দৌড়ুচ্ছেন। ফাঁকা ঘাসজমিটায় গিয়েই কর্নেল আচমকা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি দারুণ চমকে উঠলুম। এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার! চারদিকে অনেকটা ফাঁকা ওখানে। জলজ্যান্ত একটা মানুষকে জাদুকর যেমন স্টেজে অদৃশ্য করে দেয়, এও যেন তেমনি।

জয়রামবাবুও পাইপ সাফ করতে করতে দেখেছিলেন ব্যাপারটা। ওঁর চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে উঠতে দেখলুম। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'সর্বনাশ!'

অ্যালসেশিয়ান ততক্ষণে কর্নেলের শূন্যে মিলিয়ে যাওয়ার জায়গায় পৌঁছে গেছে এবং গরগর করে ঘাস শুঁকছে। জয়রামবাবু পাথর থেকে লাফ দিয়ে দৌড়তে শুরু করলেন। আমিও ভ্যাবাচাকা খেয়ে ওঁকে অনুসরণ করলাম।

ঘাসজমিটায় প্রচুর শুকনো পাতা পড়ে রয়েছে। দুপুরের গরম হাওয়াই গাছগুলো থেকে শুকনো পাতা ঝেঁটিয়ে এনে জড়ো করে সম্ভবত! একখানা দেখি, পাতার স্তূপ বেজায় নড়ছে। জয়রামবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কর্নেল! কর্নেল!'

সেই স্তূপের ভেতর থেকে নাকিস্বরে আওয়াজ এল, 'এই যে এখানে'।

জয়রামবাবু ছড়ির ডগা দিয়ে পাতাগুলো সরালে নিচে একটা টাকওয়ালা মাথা দেখা গেল—নিঃসন্দেহে সেই প্রখ্যাত গোয়েন্দাপ্রবর এবং অধুনা যিনি প্রকৃতিবিদ, তাঁরই বহুমূল্য ঘিলু ওই মাথার ভেতরই রয়েছে। একটা গভীর গর্ত থেকে যখন ওকে টেনে তুললুম, তখন ওর রূপ বদলে গেছে। আপাদমস্তক কাদার সঙ্গে শুকনো পাতা আর ঘাসের কুটো মেখে সে এক আজব মূর্তি।

কুকুরটাও গরগর করে হেসে উঠল। আমিও হাসি চাপতে পারলুম না কিন্তু জয়রামবাবু দুঃখিত মুখে বলতে থাকলেন, 'আমারই ভুল হয়ে গেছে! ছি ছি! আপনাকে সাবধান করে দেওয়া উচিত ছিল—ওখানে শেয়ালের ফাঁদ পেতে রেখেছি। শেয়ালগুলো বড্ড জ্বালাতন করে কিনা। কচি আখ নষ্ট করে। ভুট্টার ক্ষেতে ঢুকে খামোকা ভুট্টাগুলো দাঁতে কেটে পয়মাল করে দেয়।'

কর্নেল দাড়ি থেকে শুকনো পাতা সাফ করতে করতে গোমড়ামুখে বললেন, 'চলুন ফেরা যাক।' তারপর কয়েক পা এগিয়ে বাচ্চা ছেলের মতো হি হি করে হেসে উঠলেন। হাসিটা ক্রমশ বদলাতে থাকল। হা হা হা হা ......তারপর হো হো হো হো......সে কী বিকট হাসি। এমন হাসি কস্মিনকালে এই রাশভারি লোকটিকে হাসতে দেখিনি। দমফাটানো হাসিটা বেড়ে চলেছে। জয়রামবাবু এবং আমি এবার একটু চমকে গেছি। কর্নেলের কি সেই বিদঘুটে হাসিরোগে ধরল? শেয়ালের ফাঁদে পড়ে কি সেই মারাত্মক অসুখের জীবাণু ঢুকে গেছে কর্নেলের শরীরে? কিছুক্ষণ পরে আমাদের উৎকণ্ঠা দূর করে কর্নেল হাসি থামালেন। তারপর বললেন 'স্নান করব।'...

সাপের মাথার মণি

রাতে খাওয়ার টেবিলে জয়রামবাবু কর্নেলের সঙ্গে পাহাড়ের গুহার সেই শঙ্খচূড় সাপটাকে ধরার ফন্দিফিকির নিয়ে আলোচনা করছিলেন। কর্নেলের মতে, সাপটাকে আহত না করে ধরার একমাত্র উপায় হচ্ছে আঠা ব্যবহার। গুহার কাছাকাছি কোথাও অনেকটা আঠা ছড়িয়ে রাখলে কাজ হতে পারে। মানুষের পায়ের শব্দে সাপটি যদি বেরিয়ে আসে, আঠায় আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তখন একটা দড়ির ফাঁস পরাতে পারলে আর অসুবিধে হবে না।

জয়রামবাবুর মনে ধরল কথাটা। বললেন, 'তাহলে কাল সকালেই সম্বলপুর গিয়ে আঠা আনব। ওখানে আঠা তৈরির কারখানা আছে।'

কর্নেল বললেন, 'আমিও বরং সঙ্গে যাব। সম্বলপুরে আমার এক বন্ধু আছেন দেখা করে আসা যাবে।' তারপর আমার দিকে ঘুরে বললেন, 'জয়ন্ত ততক্ষণ নদীর ধারে গিয়ে সিনারি দেখবে। মহানদীর বুকে অনেক আশ্চর্য গড়নের পাথর দেখতে পাবে ডার্লিং। ওড়িশার বহু ভাস্কর্য সেইসব পাথর দিয়ে গড়া।'

মনে মনে খাপ্পা আমি। একা এই ফার্মহাউসে সময় কাটানোর কথা ভাবা যায় না। মহানদীর ধারে যাব কী! আটটা বাজতে না বাজতে রোদ একেবারে আগুন হয়ে উঠবে। গায়ে ফোস্কা পড়ে যাবে।

বললুম, 'আচ্ছা জয়রামবাবু, শঙ্খচূড় সাপটা নিয়ে কী এক্সপেরিমেন্ট করবেন বলুন তো?'

জয়রামবাবু মুচকি হেসে বললেন, 'প্রমাণ করব যে, সাপের মাথায় সত্যি মণি জন্মায়। লোকে বলে, অজগরের মাথায় নাকি মণি জ্বলে। বিলকুল মিথ্যে। অজগর হল পাইথনই। নির্বিষ পাইথনের মাথায় মণি হবে কোন দুঃখে? কয়লা থেকে যেমন হীরের জন্ম, তেমনি প্রচণ্ড বিষ থেকে মণির জন্ম। যে-সে মণি নয়, নীলকান্ত মণি। হীরের মতোই মণি দারুণ বিষাক্ত।'

'কিন্তু কী করে বুঝলেন শঙ্খচূড়টার মাথায় মণি আছে?'

রহস্যময় ভঙ্গিতে কর্নেলের দিকে চেয়ে চাপা হেসে জয়রাম সিঙ্গি বললেন, 'দেখেছি। ইচ্ছে করলে আপনিও দেখতে পারেন, যদি রাতবিরেতে ফার্মের শেষ দিকটায় গিয়ে ওত পাতেন। পাহাড়ের গায়ে নীল ছটা ঝিকমিক করছে দেখতে পাবেন। মশাই, ঝিনুকের পেটে মুক্তো হয়। হাতির মাথার ভেতরে গজমোতি হয়। সাপের মাথাতেও মণি হয়। সবই প্রকৃতির সৃষ্টি। এতে অবাক হওয়ার কী আছে?'....

অনেক রাতে কর্নেলের ডাকে ঘুমের আমেজ কেটে গেল। ফ্যানের হাওয়া ভ্যাপসা গরম ছড়াচ্ছে ঘরে। সাড়া দিয়ে বললুম, 'কী ব্যাপার?'

কর্নেল চাপা গলায় বললেন, 'সাপের মাথার মণি দেখবে কি ডার্লিং? তাহলে আমার সঙ্গে চুপচাপ বেরিয়ে এস।'

দরজাটা ভেজিয়ে রেখে আমরা বেরোলুম। এদিকটায় ফার্মহাউসের ফুল-ফলের বাগান। একেবারে অন্ধকার। কর্নেলের এত লুকোচুরির কারণ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। বাগানে ঢোকার পর

বাড়ির ভেতর অ্যালসেশিয়ানটার গজরানি শোনা যাচ্ছিল। একটু পরে থেমে গেল। ততক্ষণে অন্ধকারে দৃষ্টি পরিষ্কার হয়েছে। দেখলুম আমরা একটা পুকুরের ধারে এসে গেছি। দিনে পুকুরপাড়ে কলা আর পেঁপের গাছ দেখেছিলাম। তার ভেতর ঢুকে কর্নেল ফিস ফিস করে বললেন, 'আমাকে ছুঁয়ে এস পেছনে। সাবধান, শুকনো পাতা আছে। আস্তে পা ফেলবে।'

ভয়ে ভয়ে বললুম, 'শেয়ালের ফাঁদ নেই তো?'

কর্নেল নিশ্চয় হাসছিলেন নিঃশব্দে। কিছুটা চলার পর ফাঁকায় পৌঁছে দেখি, একটু তফাতে আলো জ্বলছে কোনও বাড়িতে। সর্বনাশ! ওটাই তো সিঙ্গিমশাইয়ের সাপ-ঘর। সকালে কিছুক্ষণ সর্পদর্শন করে শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল আমার। অসংখ্য সাপ কাচের বড়-বড় কফিনের মতো বাক্সে কিলবিল করছে। ওখানেই কি সাপের মণি দেখতে নিয়ে যাচ্ছেন কর্নেল?

আলোটা আসছিল জানালার ফাঁক দিয়ে। কর্নেল সেই ফাঁকে চোখ রেখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। উত্তেজনায় আমার বুক কাঁপছে। তারপর কর্নেল সরে এসে কানে কনে বললেন, 'যাও, দেখে এসো!' পা টিপে টিপে এগিয়ে ফাঁকটায় চোখ রেখে দেখি, জয়রামবাবু একটা টেবিলের সামনে বসে আছেন। তাঁর গলায় একটা সাপ জড়ানো। সাপটা ফণা তুলছে মাঝে মাঝে এবং কাঁধ ঘুরে পিঠে, আবার পিঠ থেকে বুকের দিকে নেমে আসছে। দেখে গা শিরশির করছিল আতঙ্কে। টেবিলের অন্যদিকে বসে আছে একটা রোগা এবং একটা বেঁটে মোটাসোটা লোক। তাদের দেখে মোটেও ভালমানুষ মনে হল না। চাপাগলায় জয়রামবাবু কী সব বলছেন বুঝতে পারলুম না। লোকদুটো চুপ করে আছে। টেবিলের ওপর দুটো প্যাকেট রয়েছে। একটা প্যাকেট থেকে জয়রামবাবু কয়েকটা ক্যাপসুল বের করলেন। সেই সময় কর্নেল এসে আমাকে সরিয়ে ফাঁকটা দখল করলেন। আমি ওঁর পাশে দাঁড়িয়ে রইলুম। মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছিলুম না ব্যাপারটা।

জয়রামবাবু কি নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্যের চোরাকারবার করেন? মনে এই সন্দেহ দানা বাঁধছিল। তাছাড়া রাত দুপুরে এভাবে দুটো লোকের সঙ্গে ক্যাপসুলের প্যাকেট নিয়ে কথা বলার কী কারণ থাকতে পারে?

সাতপাঁচ ভাবছি এবং ততক্ষণে উত্তেজনার ফলে ক্লান্তিও বোধ করছি, এমন কময় কর্নেল সরে এসে আমার কাঁধে হাত রাখলেন। তারপর কানে কানে বললেন, 'পেছন-পেছন এস।'

এবার পুকুরপাড়ে না গিয়ে সোজা বাঁহাতি এগিয়ে একফালি সরু রাস্তায় পৌঁছুলুম। রাস্তাটা নক্ষত্রের আলোয় সাদা দেখাচ্ছিল। রাস্তার ওপাশে গাছ-পালা ঝোপঝাড় কালো হয়ে আছে। একটুও বাতাস বইছে না। রাস্তাটা ফার্ম এলাকার দক্ষিণ প্রান্তে ঘুরে পশ্চিমে চলেছে। কতক্ষণ পর সেই নালার কাঠের সাঁকোয় গিয়ে কর্নেল বললেন, 'কিছু বুঝলে?'

'ভদ্রলোক নিষিদ্ধ ড্রাগের চোরাকারবার করেন মনে হচ্ছে।'

'ওগুলো মাদক নয়।' কর্নেল আস্তে বললেন। 'ওই ক্যাপসুলের মধ্যে আছে ভয়ঙ্কর ভাইরাস। সাপের বিষের সঙ্গে শেয়ালের ক্ষত থেকে একরকম জীবাণু নিয়ে মিশিয়ে জয়রাম সিঙ্গি ওই মারাত্মক ভাইরাস বা জীবাণু সৃষ্টি করতে পেরেছে। লোকটার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা আছে সন্দেহ নেই। কেসময় বিদেশের একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে আণবিক জীববিজ্ঞানের গবেষণা করত শুনেছি।'

অবাক হয়ে বললুম, 'ওই ভাইরাস দিয়ে কী করবেন সিঙ্গি মশাই?'

'কোনও দেশের ফসলের মাঠে কয়েকটা ক্যাপসুল ভেঙে ছড়িয়ে দিলে সব ফসলে রোগ ধরে যাবে। ইচ্ছে করলে দেশে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করা যাবে। মাঠের পর মাঠ যদি ফসলে রোগ ধরে যায়, তাহলে কী সাংঘাতিক অবস্থা হবে বুঝতে পারছ? তাছাড়া জল সংক্রামিত হয়ে মহামারীও হওয়া বিচিত্র নয়। বুঝতেই পারছ, কোনও শত্রুদেশের সরকার এমন সাংঘাতিক অস্ত্রের জন্য প্রচুর টাকা দিতে রাজি হবে।'

সর্বনাশ! এর কোনও প্রতিষেধক নেই?'

'জানি না। থাকলে জয়রাম সিঙ্গির কাছেই তার ফরমুলা থাকতে পারে।'

আপনি কেমন করে জানলেন?'

'বিশ্বস্তসূত্রে।' বলে কর্নেল হঠাৎ ঘুরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে হাত তুললেন। 'ওই দেখো, জয়ন্ত। সাপের মাথার মণি জ্বলছে ষট্‌গর্ভ পাহাড়ের গায়ে।'

তাকিয়ে দেখি, দূরে উঁচুতে একটা নীল আলোর বিন্দু ঝিকমিক করছে। ওটা নক্ষত্র নয়, তা ঠিকই। কিন্তু ওটা সত্যি যে শঙ্খচূড় সাপের মাথার মণি, তার প্রমাণ কী?

আমাদের মনের কথাটা বুঝি টের পেলেন ধুরন্ধর গোয়েন্দপ্রবর। কাঁধে হাত রেখে মৃদুস্বরে বললেন, 'ডার্লিং। এই পৃথিবীতেই বহু রহস্যময় জিনিস আছে, যা হঠাৎ চোখে পড়লে মানুষের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়। যাক্‌গে, এস। এবার গিয়ে ঘুমোনো যাক।.....

হায়েনার কান্না

সকালে কর্নেল জয়রামবাবুর সঙ্গে সম্বলপুর গেলেন জিপে চড়ে। মাইল ছ'য়েক দূরত্ব। আমি বেরোলুম না। রাতে ভাল ঘুম হয়নি। ভাবলুম সকালটা ঘুমিয়ে কাটানো যাবে। কিন্তু মনের ভেতর অস্বস্তি। এই ভয়ঙ্কর লোকের আতিথ্যে আর এক মুহূর্ত কাটাতে ইচ্ছা করছে না। উঠে গিয়ে বারান্দায় বসলুম। সামনে ফার্মের সবুজ শস্যক্ষেত। হঠাৎ দেখি, ভুট্টাক্ষেত থেকে রাতে দেখা সেই বেঁটে মোটা লোকটা বেরিয়ে আসছে। তার হাতে অ্যালসেশিয়ানের চেন। কুকুরটা লাল জিভ বের করে পেছনে-পেছন আসছে। তাহলে রাত সাপঘরে দেখা দুটো লোকই সিঙ্গিমশাইয়ের কর্মচারী। রোগা লোটাকে একপলক দেখেছিলুম সকালে। পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁত ব্রাশ করছিল।

ডোরাকাটা গেঞ্জি আর জিনসের প্যান্টপরা বেঁটে লোকটা আসতে আসতে থমকে দাঁড়াল। অ্যালসেশিয়ানটা লাফ দিয়ে ঘুরল। লোকটাও ঘুরে কান খাড়া করে কী শুনল। কুকুরটা এবার তাকে টানতে টানতে ফের ভুট্টাক্ষেতের ভেতর নিয়ে গেল। জয়রামবাবু বলেছিলেন, ফার্মের ফসলে মাঝেমাঝে দিনদুপুরে বুনো, শুয়োর, কখনও হরিণের পাল, এমনকী সংরক্ষিত বনজঙ্গল থেকে হাতির দলও এসে হানা দেয়। শেয়ালের ভুট্টা নষ্ট করার কথাও বলছিলেন তাই ভুট্টাক্ষেতের শেষ দিকটায় উঁচু মাচানে পাহারার ব্যবস্থা আছে। মাচানটা গাছের আড়ালে দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু এবার কানে এল ঢং ঢং ঢং করে ক্যানেস্তারা পেটানোর শব্দ হচ্ছে। ফার্মহাউস থেকে কয়েকজন লোককে দৌড়ে যেতে দেখলুম। তারা চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে ভুট্টাক্ষেতে গিয়ে ঢুকল। প্রত্যেকের হাতে লাঠি বল্লম টাঙ্গি। খুব উত্তেজনার ব্যাপার, আমি বারান্দা থেকে নেমে গাছতলায় দাঁড়ালুম। হাতির পাল নিশ্চয় নয়, হরিণ কি শুয়োর হতে পারে।

এমন সময় সেই রোগা লোকটা এল। রাতে লোকটাকে কেমন বদমাশ দেখাচ্ছিল। এখন দেখি, ভারি অমায়িক চেহারা। মুখে বিনয়ের হাসি। বলল, 'শেয়ালের ফাঁদে কোনও জন্তু পড়েছে। দেখতে যাবেন নাকি স্যার?'

ব্যাপারটা দেখতেই হয়। ওর সঙ্গে যেতে যেতে জিগ্যেস করলুম, 'আপনি কি ফার্মের কর্মচারী?'

সে বলল, 'হ্যাঁ স্যার। আমার নাম রতনকুমার পাত্র। আমি সিঙ্গি সায়েবের ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট।'

রতনকুমার আমাকে ভুট্টাক্ষেতে ঢোকাল না। পাশ দিয়ে এগিয়ে নালার ধারে নিয়ে গেল। এখানেও একটা কাঠের সাঁকো আছে। সাঁকোতে একটু থেমে সে চাপা গলায় বলল, 'আমাকে কর্নেল সায়েব অনেকদিন থেকে চেনেন। তবে এ কথাটা দয়া করে এখানে কাউকে যেন মুখ ফসকে বলবেন না।'

খুব অবাক হয়ে গেলুম। তাহলে কি সেই ভয়ঙ্কর ভাইরাস রহস্যের বিশ্বস্ত সূত্র এই লোকটিই?

কাল যেখানে কর্নেল ফাঁদে পড়েছিলেন, সেখান গোল হয়ে লোকগুলো দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কেউ বল্লম দিয়ে কোনও প্রাণীকে ফাঁদের গর্তে খোঁচাচ্ছে এবং হতভাগ্য প্রাণীটা কোঁ-কোঁ করে আর্তনাদ করে উঠছে। দৃশ্যটা বীভৎস। অ্যালসেশিয়ানটা গর্তের দিকে ঝুঁকে ক্রমাগত গর্জন করছে। বেঁটে লোকটা তাকে আটকে রেখেছে কোনওরকমে। বললুম, 'থাক'। আর যাব না। জন্তুটা কী দেখে আসুন তো রতনবাবু।'

রতনকুমার দৌড়ে গিয়ে দেখে এসে বলল, 'হায়েনা। সিঙ্গিসায়েব এবার হায়েনা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করার সুযোগ পাবেন?'

'হায়েনাটা ওরা মেরে ফেললে কী করে সুযোগ পাবেন?'

রতনকুমার হাসল। 'মারবে না। তবে হায়েনাটার গায়ে দগদগে ঘা করে দেওয়া হবে। তাই এমন করে বল্লম দিয়ে খোঁচাচ্ছে দেখছেন না?'

'ওই বেঁটে ভদ্রলোক কে বলুন তো?

'ওর নাম জগদীশ। এলাকায় সবাই জগাগুণ্ডা বলে। এখন সিঙ্গিসায়েবের ডান হাত।'

কথা বলতে বলতে আমরা ফিরে এলুম ফার্মহাউসে। রতনকুমার সাপ ঘরটার দিকে চলে গেল। ওকে ষণ্ঠগর্ভ পাহাড়ের সাপ আর আলোটার কথা জিগ্যেস করব ভাবছিলুম। ও এমন হঠাৎ করে চলে গেল যে সে সুযোগই পেলুম না। সাপঘরের দিকে প্রাণ গেলেও যাব না। সাপ দেখলেই আমার গা গুলোয়।

দুর্ভাগা হায়েনাটার জন্য মন খারাপ হয়ে গেল। হায়েনাকে নিরীহ প্রাণী বলা যায়, যদিও তার নামে শিশুচুরির বদনাম রটে। বনে জঙ্গলে বহুবার হায়েনার ডাক শুনেছি। মানুষের পৈশাচিক হাসির মতো কতকটা। কিন্তু এবার হায়েনার কান্না শুনতে পেলুম!.....

শঙ্খচূড়ের আবির্ভাব

দুপুরের আগেই কর্নেল ও জয়রামবাবু ফিরে এলেন। প্রচুর আঠা এনেছেন। খাওয়া-দাওয়ার পর কর্নেল, জয়রামবাবু জগদীশ আর রতন সেই পাহাড়ের দিকে রওনা হল। আমিও সঙ্গ ধরলুম। প্রচণ্ড রোদ তখনও। তবে গাছপালার ভেতর দিয়ে যেতে তত কষ্ট হচ্ছিল না। দুটো টিনভর্তি তরল আঠা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল জগদীশ আর রতন।

পাহাড়টা দূর থেকে যত ন্যাড়া ভেবেছিলুম, ততটা নয়। বেঁটে চ্যাপ্টা পাতাওয়ালা কিছু গাছও আছে। তবে পাহাড়ের গায়ে নানা আকারের সব পাথর। তার আড়ালে শঙ্খচূড় থাকা খুবই সম্ভব। জয়রামবাবু সবার আগে। বারবার সাবধান করে দিচ্ছিলেন। আমি পেছনে। সবসময় মাটিতে এপাশ-ওপাশে নজর রেখে উঠছি।

কিছুটা নিচে দাঁড়িয়ে কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রেখে অনেকক্ষণ গুহার মুখটা দেখলেন। তারপর বললেন, 'আমার সঙ্গে বরং এই ভদ্রলোক আসুন টিন নিয়ে।' রতনকে দেখালেন কর্নেল।

জয়রামবাবু কেমন হেসে বললেন, 'রতন কেন, জগদীশকে নিন আপনি। জগদীশ খুব সাহসী লোক। রতন ভীতু। আর আমিও বারবার শঙ্খচূড়টার তাড়া খেয়েছি, আমার বুক ঢিপঢিপ করছে। ও জয়ন্তবাবু, আপনি বরং এখানেই থাকুন। কাজ নেই মশাই গুহার কাছে গিয়ে।

কর্নেল জগদীশকে সঙ্গে নিয়ে উঠে গেলেন গুহার দিকে। আমার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল। জয়রামবাবু ডাকলেন, 'এস রতন, আমরা বরং গুহার ওপাশটায় আঠাটা ছড়িয়ে আসি।'

একটা উঁচু পাথরে ঝটপট উঠে দাঁড়ালুম। রতন ও জয়রামবাবু বাঁ-পাশ দিয়ে উঠে বড় বড় পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হলেন। কিন্তু কর্নেল ও জগদীশকে দেখতে পাচ্ছিলুম। জগদীশ আঠার

টিনটি নামিয়ে রেখেই প্রায় দৌড়ে আমার কাছে চলে এল। কর্নেল আঠাটা ছড়াচ্ছেন না। বাঁ দিকে তাকিয়ে আছেন কেন বুঝতে পারলুম না। একটু পরে হঠাৎ জয়রামবাবুর বিকট চিৎকার শোনা গেল, 'সাপ! সাপ!' তাপরই কর্নেলকে দেখলুম পকেট থেকে রিভলভার বের করে বাঁদিকে ছুটে গেলেন। পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আমি ঠকঠক করে কাঁপতে থাকলুম।

জগদীশ এক লাফে নিচে নামল। তারপর প্রায় গড়াতে গড়াতে পাহাড় বেয়ে নামতে থাকল।

এবার যা দেখলুম, চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না। গুহার ভেতর থেকে একদঙ্গল পুলিশ বেরিয়ে এল। তারা বন্দুক পিস্তল উঁচিয়ে বাঁদিকে দৌড়ে গেল।

এতো দেখছি 'ছিল রুমাল, হয়ে গেল বেড়ালের' মতো ব্যপার। ছিল শঙ্খচূড় সাপ, হয়ে গেল পুলিশ।

আর দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব। ভয় পাওয়াও চলে না। হাঁপাতে হাঁপাতে গুহার কাছে উঠে গেলুম। ডাইনে ঘুরে দেখি তাজ্জব ব্যাপার। জয়রাম সিঙ্গির হাতে হাতকড়া পরিয়ে পুলিশের দল নেমে যাচ্ছে পাহাড় থেকে।

কর্নেল আমাকেই খুঁজছিলেন সম্ভবত। দেখতে পেয়ে ইশারায় ডাকলেন।

কাছে গিয়ে বললুম, 'এ কি ভেলকির খেলা কর্নেল!'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'আর একটু দেরি হলে রতন বেচারাকে বাঁচাতে পারতুম না! সিঙ্গি ওর গায়ে সাপের বিষের ইন্‌জেকশান দিতে যাচ্ছিল।'

কর্নেল নামতে থাকলেন পাহাড় থেকে। বললুম, 'কী সাংঘাতিক লোক!'

কর্নেল বললেন, 'সিঙ্গি টের পেয়েছিল রতন আমাকে চিঠি লিখে সব জানিয়েছে। অতি-চালাক এবং শয়তান কি না! তাই শঙ্খচূড় ফাঁদ পেতেছিল। আমার উপস্থিতিতেই রতনকে খুন করত এবং আমাকে বোকা বানাত। ওর সিরিঞ্জে জোড়া সুচ আছে। বিষাক্ত সাপের দাঁতের চিহ্ন এবং পোস্টমর্টেমে রক্তে সাপের বিষও পাওয়া যেত। আসলে নৃশংস ক্রূর জয়রাম সিঙ্গি এভাবে আমার ওপরও প্রতিশোধ নিতে মতলব করেছিল। তাই আমাকে একটা মিথ্যা শঙ্খচূড় সাপ ধরার অনুরোধ করে এসেছিল কলকাতা গিয়ে। হ্যাঁ, সাপের মাথার মণিটা আসলে একটা নীল ক্ষুদে বাল্‌ব্‌। কাল সকালে পাখি দেখতে বেরিয়ে ওটা আবিষ্কার করেছিলুম।'

ফার্মহাউসে ফিরে দেখি, পুলিশে ছয়লাপ। সাপঘরে তল্লাশি করে সেই ক্যাপসুলগুলো উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সুপার আর্যশংকর শর্মার জিপে আমরা সম্বলপুর রওনা হলুম। পথে হঠাৎ শেয়ালের ফাঁদটার কথা মনে পড়ল। জিগ্যেস করলুম,'শেয়ালের ফাঁদে পড়ার পর আপনার অত হাসির কারণ কী কর্নেল?'

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, 'কেউ কেউ আমাকে আড়ালে বুড়োঘুঘু বলে ডাকে। শেয়ালের ফাঁদে পড়ার পর মনে হয়েছিল এবার কি তাহলে পুরনো খেতাব বাদ দিয়ে বুড়ো শিয়াল বলে ডাকবে? তবে শেয়াল খেতাব মন্দ না। শেয়াল অতিশয় ধূর্ত প্রাণী। এই ভেবেই হাসি এসে গিয়েছিল।' বলে কর্নেল কালকের মতো আবার হাসিতে ফেটে পড়লেন।

হাসি সংক্রামক। সুতরাং আমরা জিপসুদ্ধ লোক হো হো করে হাসছিলুম। অবশ্য ড্রাইভার বাদে।

গাড়ি চালানোর সময় তার হাসতে মানা। তাছাড়া তার চেহারাও ছিল বেজায় বদরাগী।....

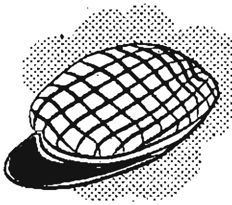

তিব্বতী গুপ্তবিদ্যা

মাদাম ব্লাভাৎস্কির গুপ্তবিদ্যা

‘গুম্ফার ভেতর গা ছমছম করা অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু একটু পরেই টের পেলুম, বাইরের উজ্জ্বল রোদ থেকে এসেছি বলেই এমন মনে হচ্ছে। অন্ধকারটা ক্রমশ ফিকে হয়ে গেল। তারপর চোখের দৃষ্টি যত পরিষ্কার হচ্ছিল, তত ভয় পাচ্ছিলুম। চৌকো বিশাল ঘরের ভেতর দু'ধারে দাঁড়িয়ে আছে যত সব ভয়ঙ্কর চেহারার মূর্তি।...

‘বিদঘুটে মূর্তিগুলো চোখ কটমট করে এমন ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, যেন আর এক পা বাড়ালেই ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার ওপর। চোখের দৃষ্টি যখন একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল, তখন মূর্তিগুলোকে জীবন্ত মনে হল। এমনকী, যেন তাদের ঘনঘন শ্বাস-প্রশ্বাসের চাপা শব্দও কানে শুনতে পেলুম।....

‘এই নির্জন পাহাড়ি গুম্ফায় খেয়ালবশে একা ঢুকে পড়াটা ঠিক হয়নি। সত্যের খাতিরে বলব, আমি ভীতু লোক নই। ভূতপ্রেত বিশ্বাস করি না। জীবনে কত সাংঘাতিক অবস্থায় পড়েছি, কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে ফেলিনি। আজ ওই গুম্ফার ভেতর আমার জ্ঞানবুদ্ধি যেন গুলিয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল একটা নিষিদ্ধ জায়গায় ঢুকে পড়েছি এবং একদল সাংঘাতিক জীবের পাল্লায় পড়ে গেছি। শুধু সাংঘাতিক হলেও কথা ছিল, এরা বুঝি বাস্তব পৃথিবীর কেউ নয়—রূপকথার এক ভূতুড়ে এলাকার বাসিন্দা। হয়তো মানুষ দেখলেই এদের জিব লকলক করে ওঠে।.....

‘কয়েক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলুম। না, ভয়ে পেয়ে পালিয়ে যাওয়ার পাত্র আমি নই। আমার কোমরে রীতিমতো একটা অটোমেটিক রিভলভার আছে। কিম্ভূত প্রাণীগুলো যদি আমার ওপর হামলা করে, যা থাকে বরাতে, গুলি আমি ছুঁড়বই। তাতে এদের গায়ে গুলি বিঁধবে কিংবা এরা ভড়কে যাবে কি না সেটা কোনও কথা নয়, কথা হল যে অন্তত আমার সাহস বাড়বে গুলির শব্দে।

‘হুঁ ভয়ের সময় শব্দ একটা শক্তিশালী ব্যাপার। রাতবিরেতে একা কোথাও ভয় পেলে নিজের কাশির শব্দ কিংবা চেঁচিয়ে কথা বলা, অথবা গান করা মোক্ষম কাজ দেয়। সাহস ফিরে আসে। তাই না?'

মেজর হরগোবিন্দ সিংহ আমাদের দু'জনের কাছে সায় চেয়ে একটু হাসলেন। আমি সায় দিয়ে বললুম, ‘ঠিকই বলেছেন। তা আপনি কি সত্যি সত্যি রিভলভার করে গুলি ছুড়লেন?'

মেজর বললেন, ‘আপানার মাথা খারাপ? ব্যাপারটা আসলে যাকে বলে হ্যালুসিনেশন—মনের ভুল থেকেই চোখের ভুল আর কানের ভুল। তিব্বতের বৌদ্ধ গুম্ফাগুলোর নতুন লোককে এভাবে ভড়কে দেয়। ওসব গুম্ফা মহাযানী সম্প্রদায়ের বৌদ্ধদের প্রার্থনাঘর। মহাযানীরা তন্ত্রমন্ত্র, গুপ্তাবিদ্যা বা অকাল্টের চর্চা করে। এসবের সাহায্যে নাকি তার অলৌকিক শক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। কর্নেল সরকার, আপনি নিশ্চয় মাদাম ব্লাভাৎস্কির কাণ্ডকারখানা জানেন?

আমার ‘ফ্রেন্ড ফিলসফার অ্যান্ড গাইড' স্বনামধন্য বুড়ো ঘুঘুমশাই চোখ বুজে ইজিচেয়ারে আরামে বসে চুরুট টানছেন। গলার ভেতর শুধু একটা অস্পষ্ট শব্দ করলেন।

মেজর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মাদাম ব্লাভাৎস্কি উনিশ শতকে সারা পৃথিবীতে হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়েছিলেন। মাদ্রাজের কাছে তিনি প্রেত-চর্চার একটা আখড়াও বানিয়েছিলেন। মাদাম বলতেন, তিব্বতের রহস্যময় সাধুরা তাঁর গুরু। এক গুরুর নাম ছিল কুট হুর্মি। অদ্ভুত নাম। এই গুরু দিব্যশরীরে চোখের পলকে তাঁর কাছে নাকি হাজির হতেন। কখনও মাদামের প্রেত-চর্চার আসরে শূন্য থেকে ছিটকে পড়ত গুরুদেবের চিঠি। এসব চিঠিকে উনি বলতেন মাস্টার লেটারস। তবে ভারতে স্বাধীনতাবোধক, স্বদেশপ্রীতি এবং আত্মমর্যাদার জ্ঞান সঞ্চার মাদামের প্রেরণা অনেক। সেজন্যেই তিনি ভারতে ছিলেন পরম শ্রদ্ধেয়া। এই রুশ মহিলার কাছে সত্যি আমরা ঋণী।

এবার ঘুঘুমশায় শ্রীযুক্ত কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের কথা শোনা গেল। চোখ বন্ধ। ঠোঁটের ফাঁকে চুরুট। সাদা দাড়ি চুলকে বললেন, হুঁম! মাদাম ব্লাভাৎস্কি রাশিয়া থেকে ভাগ্যের খোঁজে মার্কিনমুলুকে পাড়ি জামান। যখন নিউইয়র্কে গুছিয়ে বসেন, তখন বয়স ছিল বিয়াল্লিশ। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর তাঁর বাড়িতে এক ভদ্রলোক মিশরের মমিভূত হাজির করেন। তখনই থিওজফিক্যাল সোসাইটি নামে সর্বপ্রথম একটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। সেই সন্ধ্যাতেই। তবে যাই রটুক, মাদাম কদাচ তিব্বতে যাননি।

মেজর বললেন, বলেন কী! আপনি তাহলে এসব মানেন?

কী সব?

অলৌকিক শক্তি—ভূতপ্রেত?

মানি বৈকি।

এবার আমার অবাক হওয়ার পালা। জানি সর্ববিষয়ে, প্রাজ্ঞ এবং সবকিছুতে নাক গলানো এই ধুরন্ধর গোয়েন্দা ভদ্রলোকের জুড়ি নেই কোথাও। কিন্তু উনি নিজেও ভূত-প্রেত-ট্রেত বিশ্বাস করেন, জানা ছিল না তো! বললুম, কর্নেল নিশ্চয় রসিকতা করছেন?

আমার বৃদ্ধ বন্ধু গম্ভীর মুখে বললেন, ডার্লিং। তুমি নিশ্চয় শেক্সপিয়র পড়েছ। শেক্সপিয়রের মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই : এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন অনেক ব্যাপার আছে যাতে মানুষের অক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে। জয়ন্ত, রবি ঠাকুরও বলেছেন, বিপুলা এ পৃথিবীতে কতটুকু জানি।

মেজরসায়েব হতাশ ও বিরক্ত হয়ে বাঁকা মুখে বললেন, আপানাকে আমি যুক্তিবাদী মানুষ ভেবেছিলুম। বোঝা যাচ্ছে মাদাম ব্লাভাৎস্কির কাণ্ডকারখানা আপনি সত্যি বলে মানেন। অথচ দেখুন, লন্ডনের আত্মা-সংক্রান্ত গবেষণা সমিতির পক্ষ থেকে মাদামের ক্রিয়াকলাপের তদন্ত করে বলা রয়েছিল সব জোচ্চুরি। ইতিহাসে এই মহিলার মতো ধূর্ত ঠগ আর দেখা যায়নি।

কর্নেল মৃদুহাস্যে বললেন, হুঁম। লন্ডনের এই সমিতির সদস্য ছিলেন ববি টেনিসন, উইলিয়াম জেমস প্রমুখ প্রখ্যাত ব্যক্তি। আর ওঁদের পক্ষ থেকে যিনি তদন্ত করেন, তাঁর নাম রিচার্ড হজসন। মাদ্রাজের কাছে বঙ্গোপসাগরের তীরে আডিয়ারে মাদারের আখড়ায় তিনি এসেছিলেন। এটা ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের কথা।

মেজর হরগোবিন্দ বললেন, এত জেনেও আপনি অকাল্টে বিশ্বাস করেন? আশ্চর্য!

তারপর যেন ক্রুদ্ধ হয়েই উঠে দাঁড়ালেন। টুপিটি মাথায় চাপিয়ে এবং ছড়িটি তুলে নিয়ে ভদ্রতাসূচক বিদায় সম্ভাষণ না করেই ঘর থেকে গটগট করে বেরিয়ে গেলেন।

কর্নেল বললেন, জয়ন্ত! দরজাটা বন্ধ করে এস। শুয়ে পড়া যাক।

আদেশ পালন করে এসে বললুম, লোকটা ভারি অভদ্র তো!

হুঁম। সেজন্যে হরগোবিন্দের বদলে ওঁকে বলা যায় মেজর গোঁয়ারগোবিন্দ। বলে কর্নেল হাসতে হাসতে বিছানার দিকে পা বাড়ালেন।

বাথরুম থেকে ফিরে পোশাক বদলানোর সময় লক্ষ্য করলুম, কর্নেল নাক ডাকছেন।

গ্যাংটক থেকে প্রয় একশো মাইল দূরে তিব্বত-সীমান্তে হিমালয়ের বুকে এই বাংলোটা সড়ক দফতরের। পেছনে খাড়া পাহাড় নেমে গেছে লাচেন চু নদীতে। তার ওপারে ঢালু হয়ে উঠে গেছে আরও পাহাড়। চিরতুষারের এলাকা ওদিকে।

বিকেলে নদীর ওপারের পাহাড়ে একটা গুম্ফা দেখছিলুম। সেই নিয়ে কথা শুরু। মেজর হরগোবিন্দ আমাদের সঙ্গী নন। তিনি আগেই এসেছেন। যেচে পড়ে আলাপ করেছেন। কর্নেল এবং উনি দু'জনেই সমরবিভাগের লোক। দু'জনেই রিটায়ার করেছেন। অতএব দু'জনের মধ্যে ভাব হতে দেরি হয়নি।

কিন্তু যেভাবে চটমটে চলে গেলেন, আমার বিশ্বাস, কাল সকাল থেকে উনি আর কর্নেলের মুখদর্শনও করবেন না। কাল সকালে তিনজনে মিলে নদী পেরিয়ে ওই গুম্ফা দেখতে যাওয়ার কথা। মনে হচ্ছে, মেজর যদি যান, অন্যসময় একা একা যাবেন।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। তারপর দেখি, এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। একটা রাক্ষুসে চেহারার প্রাণী, কতকটা মানুষের মতো দেখতে, হাঁ করে আমার দিকে তেড়ে আসছে। ভয় পেয়ে চেঁচাবার চেষ্টা করলুম। গলা থেকে আওয়াজ বেরোল না। প্রাণীটা অদ্ভুত গর্জন করতে লাগল। কোথাও ঘণ্টা বেজে উঠল।...

তারপর ঘুম ভেঙে গেল। বুঝলুম, দুঃস্বপ্ন নিছক। কিন্তু বাইরে কিছু ঘটছে। একটা হুলস্থূল কাণ্ড বেধে গেছে যেন। হুঁ, ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য। সত্যি সত্যি কোথায় একটা ঘণ্টা বেজে চলেছে ঢং ঢং করে। ঘণ্টার শব্দটা বাড়ছে এবং কমছে। কখনও মনে হচ্ছে, বাইরে নয়, আমার মাথার ভেতরই বাজছে ঘণ্টাটা।

অতিষ্ঠ হয়ে ডাকলুম, কর্নেল! কর্নেল!

কর্নেলের সাড়া এল ওপাশের বিছানা থেকে। ....কী জয়ন্ত? ভয় পেলে নাকি?

ভয় পাওয়ার কী আছে? ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে শুনছেন না?

হুঁম, শুনছি।

ঘন্টা বাজছে কোথায় বলুন তো?

নদীর ওপারে সেই গুম্ফায়।

কিন্তু ওখানে তো শুনেছি কেউ থাকে না।

ঠিকই শুনেছ, ডার্লিং।

তাহলে ওখানে এ দুর্যোগে ঘণ্টা বাজাচ্ছে কে? কেনই বা বাজাচ্ছে?

জয়ন্ত, তখন বলছিলুম, পৃথিবীতে এখনও অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে এবং আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়।

বিরক্ত হয়ে বললুম, তাহলে ভূতে ঘণ্টা বাজাচ্ছে বলতে চান?

কর্নেল যেন আপন মনে বললেন, ঝড়বৃষ্টি দুর্যোগের রাতেই ওরা জেগে ওঠে। যত অশরীরী অতৃপ্ত আত্মারা এই গুম্ফায় গিয়ে প্রার্থনা করে। ওরা মুক্তি চায়। নিছক মুক্তি নয়, বৌদ্ধধর্ম যাকে বলে মহাপরিনির্বাণ। তারপর তার জন্ম নেই, জরা ব্যাধি নেই, মৃত্যু নেই। আহা! সে কী খাসা অবস্থা।

তারপর আচমকা ওঁর নাকডাকা শুরু হল ফের। আমার আর ঘুম হল না। ঝড়ের দাপটে বাংলোটা কেঁপে উঠছিল। ভয় হচ্ছিল, উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে হাজার ফুট গভীর নদীতে ফেলে দেবে।

আর সেই অদ্ভুত ঘণ্টার শব্দ একটানা শোনা যাচ্ছিল। কখনও মৃদু কখনও তীব্র। এমন অস্বস্তিকর রাত জীবনে আসেনি।

মেজরের অন্তর্ধান রহস্য

সকালে ঘুম ভেঙে দেখি, গোয়েন্দাপ্রবর যথারীতি প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন। বাইরে আকাশ মোটামুটি পরিষ্কার। বিশ্বাস হয় না, রাতে অমন ঝড়জল হয়েছে। তবে গাছপালা ঝোপঝাড়ের রং খুলে গেছে। একটু পরেই কর্নেল ফিরলেন। বললেন, দুঃসংবাদ ডার্লিং! লাচেন চু নদীতে রাতারাতি জল বেড়ে গেছে। জল না কমলে ওপারের গুম্ফা দেখতে পাওয়া যাবে না। তবে তার চেয়েও দুঃসংবাদ, আমাদের মেজরসায়েবের পাত্তা নেই। চৌকিদার যা বলল, তা ভারি অদ্ভুত। বেড-টি দিতে গিয়ে দেখে, ওঁর ঘরের দরজা খোলা। বিছানা লণ্ডভণ্ড। মেঝেয় একপাটি আর দরজার কাছে একপাটি স্লিপার পড়ে আছে। কেউ বা কারা তাঁকে জবরদস্তি ধরে নিয়ে গেছে।

সে কী! বলে হন্তদন্ত হয়ে পা বাড়ালুম।

কর্নেল আমার হতে ধরে বাধা দিয়ে বললেন, ঝুটঝামেলায় গিয়ে লাভ কী জয়ন্ত? চৌকিদার থানায় গেছে। পুলিশে এসে ও নিয়ে মাথা ঘামাক। বরং চলো, বাজারের দিকে গিয়ে কোথাও ব্রেকফাস্ট করা যাক। খিদে পেয়েছে।

পুলিশ তো আমাদেরও জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করবে!

যখন করবে, যা জানি বলব। এখন চলো, খালি পেটে কেবল ভাবনা বাড়ে।

পা বাড়িয়ে বললুম, কিন্তু আমরা তো কিছু জানি নে এ ব্যাপারে।

কর্নেল দরজায় তালা এঁটে বললেন, নদীর ধারে এক জায়গায় দেখলুম পাথরের গা বেয়ে অজস্র অর্কিড গজিয়েছে। এসব অর্কিডের এখন ফুল ফোটে। অবিশ্বাস্য সে দৃশ্য ডার্লিং! ফলের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে প্রজাপতি উড়ছে। নীল পাখনায় কালো ফুটকিওলা একজাতের প্রজাপতি দেখলুম। আমার সংগ্রহে এ প্রজাপতি নেই। আঁতকে উঠে বললুম, সর্বনাশ! আমি আপনার পেছন পেছন ছুটোছুটি করে বেড়াতে পারব না বলে দিচ্ছি।

মেজরের ঘরটা বাংলোর পেছন দিকে। গেট থেকে দেখা যায় না। খুব কৌতূহল ছিল। কিন্তু কর্নেল যেন তা টের পেয়েই আমার কাঁধ ধরে একরকম ঠেলে নিয়ে চললেন। ঘোরালো পথ ধীরে ধীরে নেমেছে উপত্যকার সমতলে। পিচের রাস্তায় কিছুটা হেঁটে বাজারে পৌঁছলুম। ছোট বাজার ভিড়ভাট্টা নেই। একটা চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে খেয়ে নিলুম আমরা। তারপর ডাইনে একটা সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ পেরিয়ে যেখানে পৌঁছলুম, সেখানে অজস্র পাথর এলোমেলো পড়ে আছে। যেন কোনও ঐতিহাসিক প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ।

পাথরগুলোর ভেতর দিয়ে সঙ্কীর্ণ পায়েচলা পথ। নদীর ধারে পৌঁছে কর্নেল এদিক ওদিক দেখে নিয়ে হঠাৎ চাপাগলায় বললেন, বসে পড়ো, বসে পড়ো!

একটা পাথরের আড়ালে আমাকে টেনে বসিয়ে দিয়ে উনি গলায় ঝুলন্ত বাইনোকুলারটা চোখে রেখে নদীর ওপারে কিছু দেখতে থাকলেন। জিজ্ঞেস করলুম, ব্যাপারটা কী?

কর্নেল মুচকি হেসে বাইনোকুলারটা আমাকে দিলেন। চোখে রেখে যা দেখলুম, তাতে আমি হতভম্ব। নদীর ওপারে পাহাড়ের গায়ে একটা চওড়া চাতালে দাঁড়িয়ে আছে দুটো লোক। তাদের একজন স্বয়ং মেজর হরগোবিন্দ। মুখের চেহারা অস্পষ্ট বলে দ্বিতীয় লোকটিকে চিনতে পারলুম না। দু'জনে কী যেন পরামর্শ চলেছে।

কর্নেল বললেন, মেজরসায়েব কার সঙ্গে কথা বলছেন, চিনতে পারছ তো জয়ন্ত?

বললুম, না তো। কে ও? একে কি কোথাও দেখেছি?

দেখেছ ডার্লিং! আশাকরি, গ্যাংটকের সেই ম্যাজিশিয়ানটিকে তোমার মনে আছে। আশ্চর্য কিছু ম্যাজিক দেখেছিলুম। চারধারে লোকের চোখের পাহারা। তার মধ্যে সেই জাদুকর তাক লাগানো খেলা দেখাচ্ছিল। খেলা ভাঙলে কর্নেল তার সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। বুড়ো মাঝে মাঝে যেন

কেমন শিশু হয়ে ওঠেন। ম্যাজিক দেখে সে কী খুশি! ম্যাজিশিয়ানকে দশ টাকা বখশিস পর্যন্ত দিয়ে বসলেন।

লোকটা এখন মেজর হরগোবিন্দ সিংয়ের সঙ্গে কথা বলছে নদীর ওপারে এক দুর্গম জায়গায়। আর মেজর ভদ্রলোক নাকি নিখোঁজ হয়েছেন। ঘরের বিছানা লণ্ডভণ্ড। পায়ের চটি ছিটকে পড়েছে। কারা জবরদস্তি ধরে নিয়ে গেছে।

মাথামুণ্ডু কিছু বোঝা যায় না। গুম হয়ে আছি দেখে কর্নেল বললেন, কিছু বুঝলে জয়ন্ত?

একটুও না। আপনি বুঝেছেন কি?

নাঃ, অতএব ব্যাপারটা বোঝা দরকার। চলো জয়ন্ত, ওপারে যাই।

যাবেন কীভাবে? নদীতে এখন বান যে।

কর্নেল বললেন, মাইলটাক উজানে একটা দড়ির সাঁকো আছে এস। কিন্তু সাবধান! পাথরের আড়ালে আড়ালে আমাদের যেতে হবে।

যেতে যেতে লক্ষ্য করলাম, খালি চোখেও দেখা যাচ্ছে ওপাশের পাহাড়ের চাতালে দুটি ছোট্ট আবছা মূর্তি।

গুম্ফায় 'মারে'র আবির্ভাব

আমার বৃদ্ধ বন্ধুটির শারীরিক দক্ষতা দেখলে তাক লেগে যাবে। ভাগ্যিস ছাত্রজীবনে মাউন্টেনিয়ারিংয়ের ভাল ট্রেনিং নিয়েছিলুম এবং বার দুই পর্বত অভিযানে দৈনিক সত্যসেবকের পক্ষ থেকে সাংবাদিক হিসেবে যোগ দিয়েছিলুম। প্রাণান্তকর রজ্জুসেতু পেরিয়ে বিস্তর পাহাড়ি গোলক-ধাঁধায় ঘুরে ঘুরে যখন চাতালের কাছে পৌঁছলুম, তখন অবস্থা শোচনীয়।

মেজর এবং ম্যজিশিয়ান আমাদের অপেক্ষায় বসে থাকার পাত্র নন। বেমালুম নিপাত্তা হয়ে গেছেন ততক্ষণে। হবেন, এ তো জানা কথা। কর্নেলও কম গোঁয়ার নন দেখা যাচ্ছে।

আমার মনের কথা আঁচ করে গোয়েন্দপ্রবর বললেন, ডার্লিং! এ বৃদ্ধের প্রতি রুষ্ট হয়ো না। আমরা খুব পবিত্র জায়গায় এসে পৌঁছেছি। হেরোর বৎস, ওই সেই রহস্যময় গুম্ফা—যেখানে ঝড়ের রাতে ঘণ্টা বাজে।

ঘুরে দেখি, আরে তাই তো! ডাইনে একফালি রাস্তার মাথায় গুম্ফা দেখা যাচ্ছে। আমরা উত্তর ঘুরে পূর্বে এসেছি। ওপারে পশ্চিমে আমাদের বাংলোটাও দেখা যাচ্ছে।

কর্নেল চাতাল মতো জায়গাটায় চোখ বুলিয়ে বললেন, চলো। আমরা গুম্ফার দিকে যাই। এবেলা আমরা গুম্ফার লামা মহোদয়ের আতিথ্য নেব। ভেবো না, ওঁরা খুব অতিথিবৎসল।

এদিকটায় গাছপালা নেই বললেই হয়। কিছু ঝোপঝাড় আছে। গুম্ফার সামনে প্রকাণ্ড একটা রঙিন প্রার্থনাচক্র। মন্ত্র খোদাই করা আছে। দেখে মনে হল, হাজার বছরের পুরনো। কাঠের বারান্দায় উঠতেই এক প্রৌঢ় লামা হাসিমুখে হিন্দিতে বললেন, আইয়ে! আইয়ে! কাঁহাসে আতে হ্যায় আপলোক?

আলাপ-পরিচয়ের পর ভেতরে নিয়ে গেলেন। চৌকো প্রশস্ত ঘর। সামনে বেদির ওপর বিশাল বুদ্ধমূর্তি। কিন্তু দু'ধারে দেয়াল-ঘেঁষে দাঁড় করানো মূর্তিগুলো দেখে চমকে উঠলুম। মেজরসায়েব ঠিক এমনি বর্ণনা দিয়েছিলেন মনে পড়ল। বিকট সব মূর্তি সারবেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। ছাদের ওপর দিক থেকে সূর্যের আলো এসে পড়েছে ঘরে। নইলে অন্ধকার জমে থাকত।

পাশের একটা ঘরে নিয়ে গেলেন লামা। আমরা মেঝেয় বসলুম। উনি কাঠের আসনে বসে বললেন, আমি সকালে আসি। সন্ধ্যার আগে চলে যাই। ওপর দিকে নতুন গুম্ফায় আমরা অনেকে মিলে থাকি। এই গুম্ফাটা দেখাশোনার দায়িত্ব আমার ওপর। তাই রোজ আসতে হয়।

কর্নেল বললেন, শুনেছি, এ গুম্ফায় রাতে থাকলে বিপদ ঘটে। তা কি সত্যি?

লামা একটু হেসে, বললেন, এমনকী দিনেও 'মার' কখনও কখনও দেখা দেয় এ গুম্ফায়। খুব সাহসী না হলে এখানে দিনেও থাকা কঠিন। এই তো, আজ সকালে যখন দরজা খুলে ঢুকলুম, স্পষ্ট দেখলুম 'মার' দাঁড়িয়ে আছে। বিকট তার মূর্তি। জোরে মন্ত্র পড়তে শুরু করলুম, তখন অদৃশ্য হয়ে গেল। আসলে গুম্ফার ছাদের মাথায় ওই যে দেখলাম সূর্যের আলো ঢোকার ব্যবস্থা, ওটাই 'মার' কে দিনে দুর্বল করে রাখে। মার অন্ধকারের শক্তি কিনা! যাক্‌গে, আপনারা ক্ষুধার্ত। আপনাদের সেবার অনুমতি দিন।

লামা একটা বেতের ঝুড়ি থেকে চাপাটি, দুধ আর ফল বের করলেন। ক্ষিদে পেয়েছিল প্রচণ্ড। গোগ্রাসে খেলুম। কোনার দিকে ফায়ারপ্লেসও রয়েছে। সেখানে আগুনের কুণ্ড জ্বেলে চা তৈরি করলেন লামা। চা খেয়ে ক্লান্তিটা চলে গেল। কর্নেল বললেন, আমরা প্রার্থনাঘরটা এবার দেখতে চাই।

লামা বললেন, নিশ্চয়। চলুন। আমি এখন ওঘরে প্রর্থনায় বসব।

প্রার্থনাঘরে ঢুকেই লামা হঠাৎ চমকে উঠলেন। তারপর কাঁপা কাঁপা গলায় মন্ত্র পড়তে থাকলেন। কর্নেল আমার কানের কাছে ফিসফিস করে বললেন, দেখতে পাচ্ছ জয়ন্ত?

সূর্য নিশ্চয়ই পশ্চিমে একটু ঢলেছে। ছাদের সেই জায়গাটা দিয়ে রোদ সোজাসুজি ঢুকছে না। তার ফলে ঘরের ভেতরটা এখন অস্পষ্ট। আবছায়ার মতো কী একটা দাঁড়িয়ে আছে বেদির তলার দিকে। অবিকল মানুষের মতো একটা কালো মূর্তি। দেখামাত্র আমার হৃদপিণ্ডে রক্ত চলকে উঠল। যা দেখছি তা কি সত্যি? কারণ মূর্তিটা আসলে মেঝে থেকে দু'ফুট উঁচুতে শূন্যে ভাসছে এবং দুলছে।

তারপরই বাইরে একটা শনশন শব্দ উঠল প্রার্থনাঘরের দরজাগুলো মচমচ করে উঠল এবং বাইরে থেকে ঝড়ো হাওয়া এসে ঢুকল ঘরে। ছাদের ঘুলঘুলিতে যেটুকু আলো আসছিল, হঠাৎ তাও বন্ধ হয়ে গেল। অন্ধকার ঘরটা ভরে গেল। তারপর কড় কড় কড়াৎ করে বাজ পড়ল কোথায়। মেঘ ডাকতে থাকল। দরজা দিয়ে বিদ্যুতের ঝিলিক ঢুকল ঘরে মুহুর্মুহু। তাই দেখলুম, শূন্যে দাঁড়ানো মূর্তিটা ভীষণ দুলছে। তারপর শুরু হয়ে গেল বুক হিম করা সেই ঘন্টাধ্বনি—কাল রাতের মতো। ঢং ঢং ঢং ঢং......কখনও তীব্র, কখনও মৃদু। তার তালে তালে রহস্যময় ছায়ামূর্তি দুলতে থাকল।

লামার চিৎকার শুনলুম, পালিয়ে আসুন!

কর্নেল আমার কাঁধ আঁকড়ে বলে উঠলেন, নোড়ো না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো।

লামাকে ছিটকে বড় দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখলুম। সেই সঙ্গে চোখে পড়ল, বাইরে তুমুল ঝড়বৃষ্টি চলেছে। কাঠের তৈরি প্রাচীন গুম্ফা মচমচ করে কাঁপছে।

বেদির ওখানে 'মার'কে আর দেখতে পেলুম না। সে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এদিকে ঘনঘন বাজ হাঁকড়াচ্ছে। কানে তালা ধরে যাচ্ছে মেঘের গর্জনে। বিদ্যুতের তীব্র ছটা এসে ঢুকছে ঘরের ভেতরে। ভয়ে চোখ বুজে ফেলছি। বিকট মূর্তিগুলো যেন এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।

কতক্ষণ মারের সেই উপদ্রব চলল বলা কঠিন। যখন সব শান্ত হল, তখন কর্নেল ফিসফিস করে বললেন, এস জয়ন্ত! লামার ঘরে একটা হ্যারিকেন দেখেছি। সেটা জ্বেলে নিয়ে আসি।

হ্যারিকেনটা জ্বেলে দু'জনে প্রার্থনাঘরে ফিরে এলুম। বিকট মূর্তিগুলোকে সেই আলোয় বড় ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। কর্নেল কী করতে চান, বুঝতে পারছিলুম না। বুদ্ধমূর্তির কাছে গিয়ে উনি হঠাৎ অস্ফুটস্বরে বলে উঠলেন, সর্বনাশ! মার বেচারা এখানে পড়ে আছে দেখছি!

বেদির নিচে বাঁদিকে একটা মূর্তির পায়ের কাছে উপুড় হয়ে কেউ পড়ে আছে। কর্নেল গুম হয়ে বললেন, বেচারা মারা পড়েছেন জয়ন্ত।

তাহলে যাকে দেখে মার ভেবে লামা ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলেন এবং আমারও হৃৎকম্প হচ্ছিল, তিনি আসলে মেজরসাহেব! কিন্তু আশ্চর্য, ওঁকে শূন্যে দাঁড়ানো দেখছিলুম কেন?

কর্নেল হ্যারিকেন তুলে ছাদের দিকটা দেখছিলেন। বললেন, হুঁম। এই দেখ জয়ন্ত। কড়িকাঠের আঁটা আংটা থেকে একটা ছেঁড়া দড়ি ঝুলছে। আমরা যখন ওপাশের ঘরে লামার কাছে ছিলুম, তখনই ওঁকে কেউ বা কারা খুন করে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছিল এখানে। দড়িটা ছিঁড়ে মেজরসায়েবের মড়া পড়ে গেছে। আমরা যাতে ভয় পেয়ে গুম্ফা থেকে পালিয়ে যাই, তার জন্যে এই কাণ্ড করা হয়েছিল।

কর্নেল বিশাল বেদির ওপর উঠে গেলেন। তারপর উত্তেজিতভাবে ডাকলেন, দেখে যাও জয়ন্ত।

গিয়ে দেখি, বুদ্ধমূর্তির পিঠের দিকটা ভাঙা এবং মূর্তির খোলের মধ্যে কতকালের পুরনো একগাদা পুঁথি তছনছ অবস্থায় রয়েছে। কেউ বা কারা মরিয়া হয়ে কিছু হাতড়েছে। গুপ্তধন ছিল নাকি?

বললুম, কর্নেল, মেজরকে খুন করে সেই ম্যাজিশিয়ান ব্যাটা গুপ্তধন হাতিয়ে পালিয়েছে। তাছাড়া আর কোনও ব্যাখ্যা হয় না। আমার মনে হচ্ছে.....

বুটের শব্দ তুলে একদঙ্গল পুলিশ ঢুকছিল গুম্ফায়। কর্নেল ভারী গলায় বললেন, আমাদের দুর্ভাগ্য মিস্টার শর্মা! যা ঘটবার ঘটে গেছে।

শেষ চমক

পরদিন সকালে বাংলোর বারান্দায় বসে কর্নেলের কাছে রহস্যকথা শুনছি, পুলিশ অফিসার মিঃ প্রভুদয়াল শর্মা এলেন। বললেন, এইমাত্র মর্গ থেকে আসছি। আশ্চর্য ব্যাপার কর্নেল, ডেডবডির মুখে.....

কথা কেড়ে কর্নেল বললেন, নকল দাড়ি। অর্থাৎ মরাটা মেজরের নয়। ম্যাজিশিয়ান তোতিরামের।

মিঃ শর্মা আবাক হয়ে বললেন, জানতেন নাকি? তখন তো বলেননি!

বললে পুশিমহলে রটত। হরগোবিন্দ সাবধান হয়ে যেত। তাকে ধরতে পারতেন না সহজে। বলে কর্নেল চুরুট ধরাতে মন দিলেন,।

শর্মা বললেন, হরগোবিন্দ ধরা পড়েছে গ্যাংটকে। সে মোটেই মিলিটারির লোক নয়। খুব পুরনো দাগি। তোতিরামের কাছে তিব্বতী গুপ্তবিদ্যার পুঁথি ছিল একটা। তাতে এই গুম্ফার বুদ্ধমূর্তির ভেতরে একটি পদ্মরাগ মণির হদিশ ছিল। তোতিরামের একা সাহস হয়নি। তাই হরগোবিন্দের সাহায্যে নিয়েছিল। তবে হরগোবিন্দ চালটা চেলেছিল ভাল। তাকে কেউ ধরে নিয়ে গিয়ে খুন করেছে, এই ব্যাপারটা তাকে আত্মগোপনের সময় দিত অনেকখানি। ভাগ্যিস, আপনি টের পেয়েছিলেন!

কর্নেল বলেন, পরশু রাতে ঝড়ের আগে বাইরে পায়ের শব্দ শুনে উঁকি মেরে দেখি, 'মেজরসায়েব' এবং তোতিরাম বাংলো থেকে নেমে যাচ্ছে। বারান্দার আলো পড়েছিল লনে। তা না হলে কিছু টের পেতুম না।

বললুম, কিন্তু ঝড়ের সময় ঘণ্টা কোথায় বাজে?

কর্নেল বললে, গুম্ফার ভেতর ছাদে ঝুলন্ত ঘণ্টাটা ঝড়ের ধাক্কায় দোলে।...

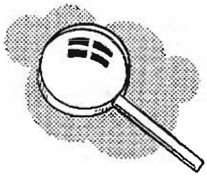

লোহাগড়ার দুর্বাসা মুনি

এপ্রিলের এক রবিবারের সকালে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখি আবহাওয়া বেজায় গুরুগম্ভীর। ওঁর ভৃত্য ষষ্ঠীচরণ কাঁচুমাচু মুখে মেঝে থেকে কাচের টুকরো কুড়োচ্ছে। কর্নেলের মুখে বিরক্তি ও চাপা রাগ থমথমে করছে। আমি ঢুকলেও দু'মিনিট কথা বললেন না যখন, তখন আমার একটু রাগ হল। ঘুরে দরজার দিকে পা বাড়ালুম।

সেই সময় কর্নেল গলায় ভেতর গমগম করে বললেন, জয়ন্ত, আমার এ সর্বনাশ দেখেও তুমি চলে যাচ্ছ? আশ্চর্য, আশ্চর্য! আজ দেখছি পৃথিবী শুদ্ধ আমার শত্রু হয়ে উঠেছে।

অগত্যা ফিরে এসে সোফায় বসলুম। বললুম সর্বনাশটা কী আর এমন করেছে? ষষ্ঠীচরণ একটা গেলাস-টেলাস ভেঙে ফেলেছে। এই তো? সব বাড়িতেই ঝি -চাকরেরা এমন ভাঙে। তার জন্যে—

কথা কেড়ে কর্নেল বললেন, গেলাস নয়, জয়ন্ত। সেদিন লোহাগড়া থেকে যে আশ্চর্য সুন্দর ঘাসফড়িংটা এনেছিলাম, জার ভেঙে, সেটা উড়ে গেছে। আর জারটা ভেঙেছে কে জানো? ওই গবেট, বুদ্ধু হাঁদারাম, হতচ্ছাড়া ষষ্ঠীচরণটা।

ষষ্ঠীচরণ কাচ কুড়িয়ে চুপচাপ ঘর থেকে চলে গেল। আমি বললুম, একটা ঘাসফড়িং, নিয়ে এত উত্তেজনার কী আছে?

কর্নেল চটে গিয়ে বললেন, ওটা সেই সিস্টোসার্কা গ্রেগারিয়া। অর্থোপ্টেরা প্রজাতির ঘাসফড়িং, যাকে বলা হয় পঙ্গপাল। এসব ঘাসফড়িং মরুভূমিতে বাস করে।

হাসতে হাসতে বললুম, লোহাগড়া নিশ্চয় মরুভূমি নয়। শুনেছি জায়গাটা জঙ্গল। সেখানেও মরুভূমির পঙ্গপাল পেয়ে গেলেন? আপনার বাহাদুরি আছে।

কর্নেল বিরক্ত হয়ে বললেন জয়ন্ত! সিস্টোসার্কা গ্রেগারিয়া হল মাইগ্রেটরি পতঙ্গ। অর্থাৎ সাইবেরিয়ার হাঁসের মতো এক দেশ থেকে আরেক দেশে ঝাঁক বেঁধে যাতায়াত করে। অনেক সময় হয় কী, দু'চারটে পঙ্গপাল বা ঘাসফড়িং কেন কে জানে, ঝাঁকের সঙ্গে মরুভূমিতে ফিরে যায় না। দলছুট হয়ে থেকে যায়। হাঁসের বেলাতেও তাই। এখন কথা হল, এরকম দলছুট ঘাসফড়িং দস্তুরমতো গবেষণার বিষয়। কেন তারা দলের সঙ্গে ফেরে না? তারা কি ইচ্ছে করেই আলাদা হয়ে থেকে যায় দলের চোখ এড়িয়ে? কেন থাকে? কী তাদের উদ্দেশ্য?

কর্নেল মাঝে মাঝে কান ঝালাপালা করে দেন। বললুম বুঝেছি, বুঝেছি! তাহলে ষষ্ঠীচরণ সত্যি বড্ড দোষ করে ফেলেছে। কিন্তু ঘাসফড়িংটা যাবে কোথায়? দাঁড়ান—খুঁজে দেখি।

কর্নেল দুঃখিত মুখে বললেন, খুঁজলেও আর পাবে না জয়ন্ত! ষষ্ঠীচরণকে কি শুধু জার ভাঙার জন্যে বকাবকি করছিলুম ভাবছ? করছিলুম ওর বেড়াল পোষার জন্য।

বেড়াল? অবাক হয়ে বললুম। বেড়াল পুষলে দোষ কী? ইঁদুর হবে না ঘরে। ভালই তো।

কর্নেল চটে গিয়ে বললেন, আহা ওর বেড়ালটাই যে ঘাসফড়িংটাকে গপ করে গিলে ফেলল। তুমি আসল কথাটা শুনবে না, খালি স্তব্ধ করবে। জারটা ষষ্ঠীচরণের কনুইয়ের গুঁতো লেগে যেই পড়ে গিয়ে ভেঙেছে, ঘাসফড়িংটা উড়ছে। এদিকে ষষ্ঠীচরণের পায়ে পায়ে ঘোরে নচ্ছার কালোকুচ্ছিত বেড়ালটা। চোখের পলকে গপ করে গিলে ফেলল ফড়িংটা। উঃ! কী সাংঘাতিক দৃশ্য! বেড়ালটাকে আমি গুলি করে মারতে যাচ্ছিলুম। পালিয়ে গেল।

জানালা দিয়ে পাশেই একটা প্রকাণ্ড নিমগাছ দেখা যায়। সেই গাছে কাকের চেঁচামেচি শুনে উঁকি মেরে দেখলুম, কালো একটা বেড়াল নিমগাছের ডাকে কুঁকড়ে বসে আছে এবং কাকগুলো

মহা খাপ্পা হয়ে তাকে তাড়ানোর চেষ্টা করছে। পঙ্গপাল ফড়িং খেয়ে কি বেড়ালটার বদহজম হয়েছে যে কাকদের সঙ্গে লড়াই করতে গেছে? বললুম, কর্নেল! কর্নেল! ওই দেখুন নচ্ছার খুনি ওখানে বসে আছে।

কর্নেল হন্তদন্ত হয়ে উঠে এসে দেখতে দেখতে বললেন, রিভলভারের রেঞ্জের বাইরে। ঠিক আছে। দেখি, কতক্ষণ পালিয়ে বেড়ায়।

আমার ইদানীং বড্ড অবাক লাগে এই কর্নেলবুড়োর আচরণ। একসময় মানুষ খুন বা রহস্যময় চুরি ডাকাতি নিয়ে মাথা ঘামাতেন! পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোর অফিসাররা গণ্ডগোলে পড়লেই তাঁর সাহায্য চাইতে ছুটে আসতেন। এখনও আদর করে কর্নেলকে ওরা বলেন বুড়ো ঘুঘু। ওঁর এই ফ্ল্যাটটার নাম দেওয়া হয়েছিল 'বুড়োঘুঘুর বাসা।' সেই ঘুঘু অর্থাৎ গোয়েন্দাপ্রবর এখন প্রকৃতিবিদ হয়ে উঠেছেন দিনে দিনে। দেশবিদেশের প্রকৃতিবিষয়ক পত্রিকায় পাখি প্রজাপতি-ফড়িং কিংবা অর্কিড-ক্যাকটাস ইত্যাদি নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেছেন। মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে প্রকৃতি-টকৃতি নিয়ে মাথা ঘামানোর কারণ কী? এ কি বার্ধক্যজনিত বৈরাগ্যেরই রকমফের? অথচ জানি, এখনও গায়ে অসুরের শক্তি। পাহাড় বনজঙ্গল চষে বেড়ানোর সময় আমার মতো যুবকও ওঁর সঙ্গে হাঁটতে হাঁপিয়ে উঠি।

কিছুক্ষণ পরে কফি খেতে খেতে বললুম, হতভাগ্য বিড়ালকে ক্ষমা করে দিয়ে বরং ফের লোহাগড়া গিয়ে ওই পতঙ্গটিকে খুঁজে আনুন।

কর্নেল হতাশ ভঙ্গিতে বললেন, আর কি পাওয়া যাবে?

বললুম, আহা! খুঁজে দেখতে দোষ কী? আমিও না হয় যাব আপনার সঙ্গে।

এবার কর্নেল একটু হাসলেন। তুমি বুঝি ছুটিতে আছ?

আছি। এই বসন্তকালে কলকাতায় পচে মরার মানে হয় না তাই ভাবছিলুম, কোথাও বেড়াতে যাওয়া যায় কি না। আসল কথাটা এতক্ষণে খুলে বললুম। এবং সেই উদ্দেশ্যেই সাতসকালে আপনার কাছে হাজির হয়েছি।

কর্নেল ফোনের কাছে গেলেন। একমিনিট জয়ন্ত, রেলদফতরে আমার বন্ধু মিঃ রামস্বামীকে ফোন করে দেখি দুটো বার্থ আজ রাতে পাওয়া যায় নাকি।...

লোহাগড়া মধ্যপ্রদেশের পাহাড়ি এলাকার একটি সংরক্ষিত জঙ্গল। জঙ্গলের ভেতর একটা সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক দুর্গ আছে। এখন ভাঙাচোরা অবস্থা। খয়েরি রঙের পাথরে তৈরি এই দুর্গকে লোহার পুরী বলে মনে হত বলেই এর নাম ছিল লৌহগড়। তাই থেকে লোহাগড়া হয়েছে।

ফরেস্ট বাংলো জঙ্গলে ঢোকার মুখে। সেই বাংলোর চৌকিদার বলল, সাবধানে থাকবেন স্যার। ইদানীং ওখানে একটা মানুষখেকো বাঘের উপদ্রব হয়েছে। সরকার থেকে দু'জন শিকারি পাঠানো হয়েছিল। তাদেরও বাঘটা খেয়ে ফেলেছে, তাই কোনও শিকারি আর আসতে সাহস পাচ্ছে না। গ্রামে দিনের বেলাতেও বাইরে বেরুচ্ছে না লোকে। ঢোকা তা দূরের কথা।

কর্নেল ওর কথা গ্রাহ্য করেছেন বলে মনে হল না। আমার শিকারের শখ আছে এবং বনে-জঙ্গলে এলে তাই রাইফেলটা আনতে ভুলি না। তাই কথা শুনেও তত দমে গেলুম না।

কর্নেল একটা ছোট্ট জাল, বাইনোকুলার আর ক্যামেরা নিয়ে বেরুলেন। আমি রাইফেলটায় গুলি ভরে সঙ্গে নিলুম। তারপর পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়লুম লোহাগড়া দুর্গের দিকে।

পাহাড়ি ঢালের নিচে একটা নদী আছে। নদী পেরিয়ে যেতেই অবাক হয়ে দেখি, এক সাধু, হনহন করে এগিয়ে আসছে। আমাদের সামনে এসে সে চোখ কটমটিয়ে হিন্দিতে বলল, কোথায় যাচ্ছ তোমরা? মরার সাধ যদি না থাকে, আর এক পাও এগিও না। আমার বাহনকে ছেড়ে দিয়েছি। তোমাদের মুণ্ডু কড়মড়িয়ে খাবে, ওই শোনো!

সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলের ভেতর কোথাও বাঘের গর্জন শোনা গেল পরপর দু'বার। কর্নেল সাধুকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছিলেন। আমি রাইফেলটা শক্ত করে ধরলুম। কর্নেল একটু হেসে বললেন, সাধুজি! আপনার বাহনকে দয়া করে একটু সামলে রাখুন। আমরা লোহাগড়ায় গিয়ে মাত্র দুটো ঘাসফড়িং ধরব। ধয়া করে তার অনুমতি দিন। আর যদি অনুমতি না দেন, আমরা বিনা অনুমতিতেই দুর্গে যাব।

কর্নেল তামাশা করছেন কি না বুঝতে পারলুম না। সাধু তাঁর কথায় প্রচণ্ড ক্ষেপে গেল কেন কে জানে। তিড়িংবিড়িং করে কতকটা নাচের ভঙ্গিতে লাফালাফি করে বলল, অভিশাপ দেব বলে দিচ্ছি, সাবধান। আমি কে জানো? ঋষি দুর্বাসা!

কর্নেল বললেন, দুর্বাসার বাহন মানুষখেকো বাঘ—এমন কথা তো শুনিনি সাধুজি।

সাধু লম্ফঝম্ফ করে বলল, আবার তামাশা হচ্ছে আমার সঙ্গে? রোসো, দেখাচ্ছি মজা!

বলে সে তিনবার হাততালি দিল। অমনি বাঘের ডাক শোনা গেল আবার! এবার মনে হল ডাকটা আরও কাছে। তারপর আন্দাজ পঞ্চাশ গজ তফাতে একটা ঝোপের ভেতর আবছা ডোরাকাটা প্রাণীটাকে নড়াচড়া করতে দেখতে পেলুম। আমি গুলি করতে যাচ্ছি, কর্নেল বাধা দিয়ে বললেন, আহা! করো কী জয়ন্ত! ঋষি দুর্বাসার বাহনকে মেরে কাজ নেই। চলো আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে যাই।

সাধু দাঁত কড়মড় করে বলল, মরবে। প্রাণে মারা পড়বে বলে দিচ্ছি।

কর্নেল গ্রাহ্য করলেন না। হাসতে হাসতে পা বাড়ালেন। আমি তো হতভম্ব হয়ে গেছি। ঝোপের আড়ালে বাঘটাকে আর দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু যে কোনও মুহূর্তে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তো! বারবার সে গর্জন করছে।

সাধু চোখ কটমট করে আমাদের যাওয়া দেখছিল। যতদূর গেলুম পিছু ফিরে দেখলুম; সে একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। বললুম, বাঘটা যদি হামলা করে?

কর্নেল বললেন, জয়ন্ত! বাঘটা হামলা করবে না, তুমি নিশ্চিন্তে চলো।

অবাক হয়ে বললুম, কী বলছেন! মানুষখেকো, বাঘ বড় ভয়ংকর প্রাণী!

কর্নেল বললেন, আমার ধারণা, তার চেয়ে সাংঘাতিক প্রাণী ওই সাধু।

বলেই আমার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে পাশের ঝোপে ঢুকে পড়লেন। তারপর গুঁড়ি মেরে হাঁটতে শুরু করলেন। দেখাদেখি আমিও সেই ভঙ্গিতে ওতে অনুসরণ করলুম। কর্নেলের এমন বিদঘুটে আচরণ আমার অজানা নয়। এসব সময় কোনও প্রশ্ন করে জবাবও পাব না, তাও জানি।

কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর কর্নেল ফিস ফিস করে বললেন, ওই দেখো জয়ন্ত। বাঘটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে, সেইখানেই।

আমি রাইফেল বাগিয়ে ধরতেই ফের বাধা দিলেন। তারপর গুঁড়ি মেরে দৌড়ে গেলেন। বাঘটাকে দেখতে পাচ্ছিলুম। ঝোপের ভেতর দাঁড়িয়ে উল্টোদিকে তাকিয়ে আছে। অথচ আশ্চর্য, বাঘের কান খুব প্রখর। মৃদুতম শব্দ বা নড়াচড়া টের পাওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা আছে বাঘের। বিশেষ করে এটা যদি সত্যি মানুখেকো বাঘ হয়, তাহলে এখনও ঘুরে দেখে আমাদের আক্রমণ করতে আসছে না কেন?

এরপর কর্নেল যা করলেন, দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। কাছে গিয়ে বাঘটার কান ধরে মাথায় দুই চাঁটি মারলেন। বাঘটা একটুও নড়ল না।

কাছে গিয়ে সব বুঝতে পারলুম। এটা আদতে বাঘের চামড়া পরানো একটা খড়ের বাঘ। কিন্তু তারপর আরেক কাণ্ড করলেন কর্নেল। ঝোপের ওপরে একটা ঝাঁকড়া গাছ রয়েছে। গাছের দিকে মুখ তুলে চাপা গলায় কাকে বললেন, ওহে! এবার সুড়সুড় করে নেমে এস তো! উঁহু উঁহু! পালানোর চেষ্টা কোরো না। গুলি খেয়ে প্রাণটি যাবে।

গাছের ডাল থেকে কৌপিনপরা কমবয়েসী আরেক সাধু ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ল। কর্নেল তার জটা ধরে ফেললেন। জটা উপড়ে এল। ন্যাড়া মাথা নিয়ে নকল সাধু গুলতির বেগে পালিয়ে গেল ঝোপঝাড় ভেঙে। কর্নেল হো হো করে হেসে ফেললেন।

বললুম, ব্যাপারটা কী?

কর্নেল বললেন, নকলবাঘের পিঠে এই যে দড়িটা বাঁধা রয়েছে দেখছ, এইটা হাতে নিয়ে লোকটা চড়ে বসে ছিল। এ একরকমের পুতুলনাচ বলতে পারো। তুমি গুলি করলেও এ বাঘকে আর খুঁজে পেতে না।

কিন্তু কেন?

আমাদের জঙ্গলে ঢুকতে দেওয়ার ইচ্ছে নয় দুর্বাসা মুনির।

কেন তাই বলুন না?

সেটা বোঝা যাচ্ছে না। কর্নেল টুপি খুলে টাকে হাত বুলিয়ে যেন মগজকে চাঙ্গা করতে থাকলেন। তারপর সাদা দাড়ি থেকে একটা পোকা বের করে পোকাটা পরখ করে দেখে ফেলে দিলেন।

বললুম, কিন্তু বাঘের গর্জন?

কর্নেল বললেন, গর্জনটাও নকল। অভ্যাস করলে মানুষ বাঘের ডাক অবিকল নকল করতে পারে। তুমি কি জিম করবেটের শিকার কাহিনী পড়োনি? করবেট বাঘের ডাক ডেকে বাঘকে কাছে এনে গুলি করতেন। আরও অনেক শিকারির বইতেও এ ঘটনা পাওয়া যায়। শিকারি কেনেথ অ্যানডারসনও এভাবে অনেক বাঘ মেরেছিলেন। কিন্তু অবাক লাগছে জয়ন্ত, তুমি গর্জন শুনে বুঝতে পারলে না যে ওটা নকল বাঘের গর্জন? তুমি শিকার-টিকার তো অনেক করেছ!

একটু হেসে বললুম, তাই বলে কি কখনও বাঘ শিকার করেছি? বড় জোর পাখি কিংবা দু-একটা খরগোশ! অবশ্য একবার একটা শম্বর মেরেছিলাম ওড়িশার জঙ্গলে।

কর্নেল বললেন, যাক্‌গে। চলো, আমরা দুর্গের ওখানে যাই...

দুর্গের ভেতরকার চত্বরে ঘন ঘাসের জঙ্গল। কর্নেল বললেন, এখানেই সেই ঘাসফড়িং দেখতে পেয়েছিলাম। জয়ন্ত, তুমিও খুঁজে দেখ। ফড়িংয়ের ডাক শুনতে পাচ্ছি যখন, তখন দু-একটা নিশ্চয় খুঁজে পাব।

যে ফড়িং ধরি, দেখে কর্নেল বলেন, নয়। সিস্টোসার্কা গ্রেগারিয়া এত সবুজ নয়! ধূসর রং। আরও মোটা। এদিকে মাথার ভেতর চৌকিদারের কাছে শোনা মানুষখেকো বাঘের কথাটা আছে। তাই বারবার চঞ্চল চোখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। বলা যায় না, দুর্গের এইসব ভাঙাচোরা ঘরে সত্যিকারের বাঘটা হয়তো এখন ঘুমোচ্ছিল। সাড়া পেয়ে জিভ চাটছে ওত পেতে। হালুম করে এখুনি ঝাঁপ দেবে।

কর্নেল টের পেয়ে বললেন, মানুষখেকো বাঘের ভয় কোরো না জয়ন্ত। বরং তার চেয়ে সাংঘাতিক প্রাণী সম্ভবত সেই সাধু—দুর্বাসা মুনি!

বলেই একলাফে সরে গেলেন। আঁতকে উঠে দেখলুম, সাঁই করে একটা তীর এসে কর্নেল যেখানে হাঁটু দুমুড়ে ঘাসে বসেছিলেন, সেখানে বিঁধে গেল। কর্নেল একটা পাথরের আড়ালে সরে গেছেন। আমিও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আরেকটা পাথরের আড়ালে লুকিয়েছি।

শোঁ শোঁ করে কয়েকটা তীর এসে বিঁধে গেল-এপাশ-ওপাশে। তারপর দৃষ্টি গেল বাঁদিকে একটা ভাঙা ঘরের দেওয়ালে ওপর। একটা লোক তীর-ধনুক নিয়ে দেওয়ালের ওপর গুঁড়ি মেরে বসে আছে। আরে! এ তো দেখছি, ফরেস্টবাংলোর সেই চৌকিদার! আমি হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম কয়েক মিনিট। তারপর মরিয়া হয়ে উঠলুম। দুর্গের প্রাঙ্গণে ধ্বংসস্তূপের আড়ালে প্রায় বুকে হেঁটে সেই ভাঙা ঘরের বারান্দায় গিয়ে উঠলুম। কর্নেলকে কোথাও পেলুম না। পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকে দেখি ছাদ ভেঙে পড়েছে। দেয়ালের মাথায় চৌকিদার ধনুকে তীর জুড়ে উঁকি মেরে

আমাদের খুঁজছে। তার পশ্চাদ্দেশে রাইফেলের নল ঠেকাতেই চমকে উঠে ঘুরল। চাপা গর্জন করে বললুম, তীর-ধনুক ফেলে দাও। নইলে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যাবে গুলিতে!

চৌকিদার তীরধনুক ফেলে দিল। তারপর কাকুতি-মিনতি করে বলল, দোহাই হুজুর। গুলি করবেন না। নামছি।

সে নেমে এল! তার পিঠে রাইফেলের নল ঠেকিয়ে ডাকলুম, কর্নেল! কর্নেল! বদমাশটাকে ধরেছি। ওদিকের ঘর থেকে কর্নেলের সাড়া এল।

....এখানে নিয়ে এস ওকে!

চত্বর পেরিয়ে গিয়ে দেখি, বারান্দায় সেই সাধুর সামনে রিভলভার হাতে কর্নেল দাঁড়িয়ে আছেন। সাধু কাকুতি মিনতি করছে। .... হুজুর! গরিব মানুষ পেটের দায়ে এ কাজ করছি। ছেড়ে দিন পুলিশে দিলে জেল হয়ে যাবে।

কর্নেল তার জটা আর দাড়ি উপড়ে নিলেন। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, দেখেছ জয়ন্ত, এ দুর্বাসা বাবাজিও তার চেলার মতো নকল সাধু।

বললুম, কিন্তু ব্যাপারটা কী?

কর্নেল বললেন, ব্যাপার খুব সামান্য। ওই ঘরে চোলাই মদের পিপে বোঝাই করে রেখেছে। এরা মনে হচ্ছে, এ কারবারের মালিক নয়, নিতান্ত পাহারাদার। এখানে রাখা পিপেগুলো সম্ভবত আজকালের মধ্যে চালান যাবে। আমরা এসে পড়ায় এবং লোহাগড়া দুর্গে যাব বলায় এরা বেগতিক দেখেছিল। তাই মানুষখেকো বাঘের ভয় দেখিয়েছিল। শেষে যখন দেখল, তাতেও ভয় পেলুম না এবং ওদের চালাকি ধরে পেলুম, তখন তীর ছুড়ে প্রাণে মারতে চেয়েছিল। তবে জয়ন্ত, মাঝখান থেকে লাভটা তোমারই হল! তোমার কাগজ দৈনিক সত্যসেবকে বড় করে খবর ছাপা হবে।

'মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে চোলাই মদের গুদাম আবিষ্কার!'

বললুম, সম্প্রতি প্রায়ই বিষাক্ত চোলাই খেয়ে অসংখ্য মানুষ মারা যাচ্ছে এই এলাকায়। কর্নেল, আমার ধারণা, এসব সেই বিষাক্ত চোলাই মদ!

কর্নেল বললেন, পরীক্ষা করলে বোঝা যাবে। তবে চলো, আসামিদের পুলিশের জিম্মায় দিয়ে আসি। ওবেলা বরং এসে সিস্টোসার্কা গ্রেগারিয়া খুঁজে বের করব। আমার বিশ্বাস, ওই ঘাসফড়িংগুলো এখনও দু'চারটে ঘাসে লুকিয়ে আছে।

চৌকিদার ও দুর্বাসা মুনিকে নিয়ে আমরা ফিরে চললুম জঙ্গলের পথে। যেতে যেতে কর্নেল ফের বললেন, চোলাই মদের তিন নম্বর পাহারাদারটাকেও ধরতে পারলে ভাল হত। লোকটা কিন্তু চমৎকার বাঘের ডাক ডাকতে পারে। কর্নেলের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দূরে আবার বাঘের ডাক শোনা গেল

—আউংঘ্। আউংঘ্। বললুম, ওই শুনুন তিন নম্বর আসামি এখন ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছে।

কর্নেল আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়ে বললেন, না জয়ন্ত! এ ডাক সত্যিকার বাঘের। এখন বাঘের সঙ্গী খোঁজার ঋতু। লোহারগড়ার জঙ্গলে এতক্ষণে একটা সত্যিকারের বাঘ সঙ্গী খুঁজতে বেরিয়েছে। এসময় ওদের মেজাজ বড্ড চড়া থাকে। ওবেলা সাবধানে জঙ্গলে ঢুকতে হবে।....

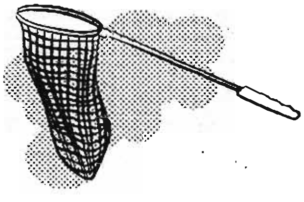

তুরুপের তাস

এক

কাগজের খবর

অক্টোবর মাসের এক অত্যুজ্জ্বল রবিবারের সকালে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারে ফ্ল্যাটে আড্ডা দিতে গিয়ে দেখি, বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ একপ্রকার কিম্ভূত আকৃতির ক্যাকটাসের সামনে চোখ বুজে ধ্যানস্থ রয়েছেন এবং তাঁর কানে হেডফোন চাপানো। হেডফোনের তার গিয়ে ক্যাকটাসটার গায়ে বেঁধানো একটা আলপিনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকেছিলুম, বুড়োকে একটু চমকে দেওয়ার আশায়। কিন্তু উল্টে আমাকেই ভীষণ চমকে উঠতে হল, যখন উনি হঠাৎ ঠকঠক করে কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে কাঁপতে শুরু করলেন।

আমি ভাবলুম, ইলেকট্রিক শক খেয়েছেন কর্নেল। তাই শশব্যস্তে কাছে গিয়ে প্রথমে দেয়ালের সুইচবোর্ডের সঙ্গে হেডফোনের সংযোগ খুঁজলুম। না দেখতে পেয়ে ধারণা হল, হয়তো ওই উদ্ভুট্টে উদ্ভিদটা থেকেই কোনও মারাত্মক বিদ্যুৎশক্তি নির্গত হয়ে ওঁকে মুহুর্মুহু শকে জর্জরিত করছে।

অতএব তক্ষুণি ক্যাকটাসের গা থেকে পিনটা উপড়ে ফেললুম।

অমনি কর্নেল 'আহা হা' করে বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন এবং আমাকে দেখতে পেয়ে করুণ স্বরে বললেন, করলে কী জয়ন্ত! আমার বাইশ ঘণ্টার রক্ত জল করা পরিশ্রম বরবাদ করে ফেললে?

আমি তো অপ্রস্তুত। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বললুম, আমি ভেবেছি আপনার ইলেকট্রিক শক লেগেছে।

কর্নেল হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর হেডফোনের মতো যন্ত্রটা মাথা থেকে খুলে বললেন, তুমি কী ক্ষতি যে করলে জয়ন্ত, তোমায় বোঝাতে পারব না। এই যে যন্ত্রটা দেখছ, এটা উদ্ভিদবিজ্ঞানী স্যার জগদীশ বসুর গবেষণার ওপর ভিত্তি করে এক রুশবিজ্ঞানী সম্প্রতি তৈরি করেছেন। উদ্ভিদের যে ভাষা আছে, তা এই যন্ত্রের মাধ্যমে বোঝা যায় এবং সে যা বলছে, তার জবাবও তার ভাষায় দেওযা যায়।

অবাক হয়ে বললুম, আপনি ম্যালেরিয়ায় পাওয়া লোকের মতো ঠকঠক করে কাঁপছিলেন—তা কি ওই হতচ্ছাড়া ক্যাকটাসটার সঙ্গে বাতচিত?

ঠিকই ধরেছ। বলে ঘুঘুমশাই কোণের দিকে আরামকেদারায় গিয়ে বসলেন। তারপর চুরুট ধরালেন।

পাশের ডিভানে বলে বললুম, না জেনে দোষ করার জন্য ক্ষমা চাইছি।

কর্নেল সন্দেহে হাসলেন। জয়ন্ত! তোমায় একটা বই দেব। 'দি সিক্রেটস অফ প্ল্যান্ট লাইফ।' পড়লে বুঝতে পারবে, উদ্ভিদ কীভাবে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়। যাক্ গে, বসো। কফি-টফি খাও। ষষ্ঠীকে বলি।

বলে তিনি ষষ্ঠীচরণকে হাঁক দেওয়ার জন্যে ঠোঁট ফাঁক করার সঙ্গে সঙ্গে ষষ্ঠীচরণ ট্রে হাতে ঘরে ঢুকল। একগাল হেসে বলল, কাগজের দাদাবাবু! প্রতাপগড়ের পেত্নীর খবরটা কি সত্যি গো?

ষষ্ঠী ইদানিং আমায় কাগজের দাদাবাবু বলে সম্ভাষণ করে। তবে দুঃখের বিষয় কাগজের লোক বলেই কাগজের খবরে আমার রুচি নেই। ময়রা কি সন্দেশ খেতে ভালবাসে? তাই বললুম, ষষ্ঠী!

পেত্নীর খবরের চেয়ে তোমার কর্তামশাইয়ের যে কীর্তি এইমাত্রার দেখলুম, সেটাই আজকের বড় খবর।

ষষ্ঠীচরণ বেজার মুখে চলে গেল। কর্নেল কফির পেয়ালা তুলে চুমুক দিয়ে বললে, হুম! ষষ্ঠীকে অবহেলা কোরো না ডার্লিং। আজকাল আমি বিবিধ বিষয়ে ওর পরামর্শ নিই। জয়ন্ত, ইনটুইশান বলে একটা ব্যাপার আছে—যা প্রকৃতি অনেক মানুষকে দিয়েছেন এবং এতে শিক্ষিত অশিক্ষিত ভেদাভেদ রাখেননি। তাছাড়া তুমি তো জানো, প্রখ্যাত নাট্যকার ইবসেন নাটক লিখে আগে তাঁর পরিচারিকাকে শোনাতেন।

বললুম, আপনার ভাষণের লক্ষ্য কী কর্নেল? প্রতাপগড়ের পেত্নী?

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, ষষ্ঠীর মধ্যে প্রকৃতিদত্ত সেই সূক্ষ্মবোধ আছে জয়ন্ত। আজ ওই খবরটার দিকে সে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছে বারবার। আমি ক্যাকটাস নিয়ে ব্যস্ত থাকায় মন দিতে পারিনি। তবে আমার ধারণা, খবরটা নিশ্চয় সামান্য খবর নয়।

পাশে টেবিলের ওপর সেদিনের কয়েকটা কাগজ ছিল। আমাদের কাগজ দৈনিক সত্যসেবককে আমি তত গুরুত্ব দিই না। তাই অন্য একটি বাংলা দৈনিক তুলে নিলুম। প্রথম পাতার নিচের দিকে খবরটা দেখতে পেলুম।

ডাকুরানি লছমীর প্রেতাত্মা?

প্রতাপগড়, ১২ অক্টোবর—সম্প্রতি এ অঞ্চলে অদ্ভুত ধরনের কয়েকটি ডাকাতির খবর পাওয়া গেছে। শেষ ডাকাতি ঘটেছে একটি পেট্রল পাম্পে। গতকাল এই পাহাড়ী শহরের প্রান্তে রাত নটার সময় ডাকুরানি লছমী আচমকা হাজির হয়। তাকে দেখামাত্র পাম্পের কর্মচারীরা হতবাক হয়ে যায়। কারণ লছমী গতমাসে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছে এবং অসংখ্য মানুষ তার মৃতদেহ দেখেছে। অবিকল সেই রক্তাক্ত মৃতদেহ জীবিত মানুষের মতো পেট্রল পাম্পে উপস্থিত হয়েছে এবং তার হাতে যথারীতি রিভলভারও রয়েছে দেখে কর্মচারীরা আতঙ্কে কেউ মূর্ছিত হয়ে পড়ে, কেউ দিশেহারা হয়ে পালিয়ে যায়। পাম্পের মালিক পুলিশকে জানিয়েছেন, তাঁর ক্যাশে তখন সতেরো হাজার টাকা ছিল। সে টাকা আর পাওয়া যায়নি। পুলিশের ধারণা, কেউ লছমী সেজে একাজ করে বেড়াচ্ছে। ইতিপূর্বে ঠিক এমনি ঘটনা আরও কয়েকটি ঘটেছে।

উল্লেখ করা যায়, এই পেট্রল পাম্পের মালিকের বাড়িতেও ক'দিন আগে মৃতা লছমী একইভাবে হানা দেয়। তখন তিনি তাঁর রাইফেল থেকে গুলি চালান। আশ্চর্য, লছমীর গায়ে একটা গুলিও লাগেনি। পুলিশ অবশ্য এ ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছে যে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল।

কাগজটা মুড়ে রেখে দিলুম। কর্নেল বললেন, তোমার ইনটুইশন কি জয়ন্ত?

পুলিশ যা বলেছে।

অর্থাৎ লছমী সেজে ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে?

হ্যাঁ, আবার কী?

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, ষষ্ঠীর ইনটুইশন অন্য কথা বলেছে। লছমীর পেত্নী ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে?

না। ওই খবরের কিছু গোলমেলে ব্যাপার সে ধরিয়ে দিয়েছে।

কর্নেল মুখে সেই হাসি রেখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। মুখে রহস্যের ভঙ্গি—যা দেখে আমি বরাবর উত্তেজনা অনুভব করি। বললুম সংস্কৃত শ্লোকে আছে—সংসর্গজা দেশগুণাঃ ভবন্তি। তা ষষ্ঠীচরণ আপনার মতো ধুরন্ধর গোয়েন্দার সংসর্গে থেকে বুঝি পাতিগোয়েন্দা হয়ে উঠেছে? দেখুন কর্নেল, খবরের কাগজের প্রত্যেকটা খবরে গোলমাল থাকবেই থাকবে। সেটাই নিয়ম। কারণ খবর যিনি পাঠান এবং যিনি তা অনুবাদ করেন...

বাধা দিয়ে কর্নেল বললেন, জয়ন্ত, জয়ন্ত! আমার কথাটা আগে শোনো।

বলুন।

বরং এক কাজ করা যাক, ষষ্ঠীচরণের মুখেই তার ধারণার কথা শোনা ভাল।

বলে কর্নেল ডাকলেন, ষষ্ঠী! ও ষষ্ঠী এদিকে একবার আসবে কি?

ষষ্ঠীচরণ যেন ওৎ পেতেই ছিল। পর্দা তুলে গম্ভীর মুখে বললল, বলুন স্যার!

কর্নেল বললেন, পেত্নীর খবরের কী যে খটকা আছে বলছিলে তখন?

অভিমান দেখিয়ে ষষ্ঠী বলল, আছে। শুনলেন না তো!

এবার বলো, শুনব। তোমার কাগজের দাদাবাবুও শুনবেন। ষষ্ঠী ফিক করে হাসল সঙ্গে সঙ্গে। বলল, মজাটা দেখুন। প্রতাপগড় তো স্যারের সঙ্গে কতবার আমি গেছি। কাগজের দাদাবাবুও গেছেন। টাউনের শেষে বড় রাস্তার ধারে পেট্রল পাম্প। কেমন তো? রাত ন'টায় সেই পাম্পে সতেরো হাজার নগদ টাকা মজুত রেখেছে মালিক! বিশ্বাস হয় বলুন?

বললুম, চুরি-ডাকাতির পর লোকে পুলিশকে বাড়িয়েই বলে।

বলুক না! কিন্তু একই লোকের ওপর পেত্নী দু'বার হামলা করল? সতেরো হাজার টাকা এবং গুলি গায়ে লাগেনি—দুটোতে খটকা বাধছে কাগজের দাদাবাবু!

কিসের খটকা বুঝলুম না ষষ্ঠী?

ষষ্ঠী ক্ষুব্ধভাবে বলল, বেশি লেখাপড়া জানিনে কাগজের দাদাবাবু! কিন্তু আমার মনে খটকা বেধেছে। মনে হচ্ছে, বড় কিছু ঘটবে, এগুলো তারই গোড়াপত্তন। তাছাড়া ডাকাতি শুধু একজনই করল? দলবল সঙ্গে নেই, একা? আর তার চেয়ে বড় কথা, পেত্নী-ডাকাত? দেখবেন, নির্ঘাৎ বড় কিছু ঘটবেই।

ষষ্ঠীর হাবভাবে হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু বেচারাকে দুঃখ দেওয়া ঠিক নয় ভেবে মুখে চিন্তার ভাব ফুটিয়ে বলুলম তুমি যা আঁচ করছ, সত্যি হতে পারে বৈকি।

আমার কথা শুনে সে কর্নেলের দিকে খুব আশা নিয়ে তাকাল। কর্নেল সেটা টের পেয়ে বললেন, ক্যাকটাসটা নিয়ে ব্যস্ত না থাকলে ব্যাপারটা দেখে আসা যেত। তাছাড়া এ শরৎকালে প্রতাপগড়ের তুলনা হয় না। প্রকৃতি তাকে এ সময়টা দারুণ সাজিয়ে তোলে, না? হুম্ জয়ন্ত, রথদেখা কলা-বেচার সম্পূর্ণ সুযোগ ছিল! ষষ্ঠী হতাশভাবে ঘর থেকে পেয়ালা দুটো নিয়ে বেরিয়ে গেল।

আমি ষষ্ঠীর কথাটা তখনও ভাবছিলুম। লোকটার কপালে দুর্ভোগ আছে বোঝা যাচ্ছে। ওকে গোয়েন্দারোগে ধরেছে এবং সব তাতেই ওর খটকা লাগতে শুরু করেছে। প্রতাপগড়ের কে ভদ্রলোকের পেট্রল পাম্পে ও বাড়িতে দু'বার ভূত সেজে কেউ ডাকাতি করেছে, তাই নিয়ে ও রীতিমতো একটা গোয়েন্দা-থিসিস খাড়া করে ফেলেছে।

বললুম, কর্নেল! আপনার এই অনুচরটিকে সামলান! এর ভবিষ্যৎ ভেবে শিউরে উঠছি।

কিন্তু কর্নেল আমার কথার জবাব দিলেন না। চেয়ারে তখনকার মতো বসে হেডফোন জাতীয় যন্ত্রটা পরতে ব্যস্ত রয়েছেন।

গতিক দেখে আমি উঠে দাঁড়ালুম। বললুম, আসি কর্নেল।

তবু কর্নেলের কোনও সাড়া না পেয়ে বেরিয়ে গেলুম। ওঁর এমন অদ্ভুত আচরণ এতদিনে গা সওয়া হয়ে গেছে। আজকাল আর একটুও গায়ে মাখিনে।

সেদিন কাগজের অফিসে আমার বিরতির দিন। দুপুরে ঘুমিয়ে গেছি খেয়েদেয়ে, একসময় ফোন বাজল। কানে তুলতেই চেনা কণ্ঠস্বর ভেসে এল।—ডার্লিং জয়ন্ত! তুমি কি ঘুমোচ্ছিলে? দিনদুপুরে ঘুমই বাঙালির পতনের কারণ। তো শোন কাল ভোরে সাড়ে পাঁচটায় আমরা প্রতাপগড় রওনা হচ্ছি। তৈরি থেকো!

চমকে উঠেছিলুম। ডাক এসেছে নাকি সেখান থেকে?

হুম্‌। ঠিকই ধরেছ।

পুলিশের ডাক বুঝি?

কখনও না, কখনো না। মোহনপ্রসাদ সিং—মানে যাঁর পাম্পে লছমীরানির ভূত হামলা করেছিল, তিনিই আমাকে ডেকেছেন।

বলেন কী! যে কেউ ডাকলেই আজকাল বুঝি আপনি চাকরের মতো...

না, না। মোহনজি আমার সুপরিচিত জয়ন্ত। একবার ওঁর আতিথ্যে কাটিয়ে এসেছিলুম। অমায়িক সজ্জন মানুষ। সকালে তুমি চলে যাওয়ার পর উনি ট্রাঙ্ককল করেছিলেন।

তাহলে ষষ্ঠীচরণের গোয়েন্দাগিরি আর ঠেকানো গেল না।

না। হাসতে হাসতে কর্নেল বললেন, ঠিক আছে। তৈরি থেকো...

দুই

রক্তাক্ত মৃতদেহ

মোহনপ্রসাদ সিং প্রতাপগড়ে সেসময়ে নাকি দামি মানুষ ছিলেন। কারণ, তখন উনি রাজনীতি করতেন। পরে রাজনীতি ছেড়ে বাণিজ্যে মন দেন। খুব একটা বড় ব্যবসায়ী হতে পারেননি। একটা পেট্রল পাম্প, একটা ট্রাক এবং একটা জিপগাড়ি, আর একটা কাঠগোলার মালিক হয়েছেন। মাইল পাঁচেক দূরে প্রতাপগড় রিজার্ভ ফরেস্ট। মরসুমে সেখানে সরকার বন এলাকায় গাছ বিক্রি করে। টেন্ডার ডাকা হয়। মোহনজি তদ্বির করে টেন্ডার জোগাড় করেন। তবে চোরাই কাঠ চালানকারীরাও কম নেই তল্লাটে। যারা কাঠগোলার ব্যবসা করে, তার তাদের মা-বাবা।

মোহনজির বাড়িতে থাকাটা ঠিক মনে করেনি কর্নেল। আমরা উঠেছি সেচ-দফতরের বাংলোয়। মোহনজি তাঁর জিপটা আমাদের সেবায় দিয়েছেন। ড্রাইভারের নাম মহাবীর। গাঁট্টাগোট্টা চেহারা। লছমী ডাকুরানির অসংখ্য গল্প সে জানে। কীভাবে লছমী নদীর ধারে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে মারা পড়েছিল, তা সে স্বচক্ষে দেখেছে। লছমীর রক্তাক্ত লাশের একটা ভয়ংকর বিবরণ তার কাছে শুনেছি আমরা। তাছাড়া মোহনজির পাম্পে ডাকাতির সময় সে ওখানে উপস্থিত ছিল। সেই রক্তাক্ত লাশকে জীবিত মানুষের মতো হানা দিতে দেখে আঁতকে সে পালিয়ে গিয়েছিল!

শুধু তাই নয়, যে রাতে মোহনজির বাড়িতে লছমীর ভূত হামলা করে, সে রাতেও সে খাটিয়া পেতে বারান্দায় শুয়েছিল। ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টির মধ্যে লছমীর আবির্ভাব হয়। মহাবীর কিরে কেটে বলেছে, সেই রক্তাক্ত মড়া হয়ে মছমী বাড়ি ঢুকেছিল। মোহনজির রাইফেল আছে। মাঝে মাঝে কাঠ আনতে জঙ্গলে যান বলে রাইফেল কিনেছেন। তো লছমীর দিকে পরপর চারটে গুলি ছোঁড়েন তবু লছমীর গায়ে আঁচড় লাগেনি। কিন্তু বাড়িসুদ্ধু লোক জেগে গেছে। হইহল্লা করেছে। তাই শেষপর্যন্ত অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

পরদিন সকালে আমরা ব্রেকফাস্ট করতে বসেছি, কর্নেল সবে প্রাতঃভ্রমণ সেরে এসেছেন, এমন সময় আমাদের পরিচিত পুলিশ অফিসার শর্মাজি এসে হাজির হলেন।

শর্মাজি হাসতে হাসতে বললেন, মোহনপ্রসাদ আমাদের ওপর আস্থা রাখতে পারেননি। তাই আপনাকে টেনে এনে এনেছেন। তাতে অবশ্য আমি খুশিই।

কর্নেল যেন অপ্রস্তুত হওয়ার ভান করে বললেন, না, না মিঃ শর্মা! আপনি তো বিলক্ষণ জানেন, প্রতাপগড় আমার কত প্রিয় জায়গা!

শর্মা চোখ নামিয়ে বললেন, লুকিয়ে লাভ নেই কর্নেল। স্বয়ং মোহনজি কথাটা আমাকে জানিয়ে এসেছেন। ওঁকে তো জানেন বড্ড খামখেয়ালী মানুষ, তবে একথা ঠিক, ইদানীং পরপর পাঁচটা এ ধরনের ডাকাতি হয়েছে প্রতাপগড়ে। পাঁচটাই লছমীর ভূতের কীর্তি বলে ভিকটিমরা স্টেটমেন্ট

দিয়েছে। সময় রাত ন'টা থেকে দশটা, শুধু—একটি কেসে সন্ধেবেলা। আমার ধরণা, কেউ লছমী সেজে এসব করছে। কিন্তু কোনও সূত্র আমরা খুঁজে পাচ্ছিনে।

কর্নেল বললেন, দুটো কেস তো মোহনজির। বাকি তিনটে কোথায়—কোথায়, কীভাবে ঘটল, বলবেন কি মিঃ শর্মা?

শর্মাজি বললেন, তিনটেই নেহাত পেটি কেস। একটি স্লাম এরিয়ায়। এক বুড়ির ওপর হামলা করে তার অল্পসল্প টাকাকড়ি ছিনিয়ে নেয়। বুড়ি-বাড়ি ঝিয়ের কাজ করে পয়সা জমিয়েছিল। আর একটা এই রাস্তার ধারে চায়ের দোকানে! লোকজন বিশেষ ছিল না তখন! রাত প্রায় দশটা। চা-ওলা ঝাঁপ ফেলতে যাচ্ছে, লছমীর ভূত হাজির।... বাকি কেসটা রাহাজানির মতো। এক দেহাতী ছোট ব্যবসায়ী সাইকেলে চেপে সন্ধেবেলা ফিরে যাচ্ছিল। হাইওয়েতে হঠাৎ তার সামনে লছমীর ভূত এসে দাঁড়ায়। মজার কথা, দেহাতী লোকটির যে গ্রামে বাড়ি, লছমী সে-গাঁয়েরই মেয়ে। লোকটি ভয়ে ভির্মি খায়। জ্ঞান হলে দেখে টাকাকড়ি সব খোয়া গেছে।

আরও কিছুক্ষণ একথা নিয়ে আলোচনার পর শর্মাজি চলে গেলেন। যাওয়ার সময় বলে গেলেন, আপনাকে মোহনজি এনেছেন বলে অবশ্যই আমি এতটুকু ক্ষুব্ধ হইনি কর্নেল। বরং আপনার সাহায্য আমিও চাই। প্রতাপগড়ে কয়েকটা কেসে আপনার সাহয্যের জন্য পুলিশ এখনও কৃতজ্ঞ। নতুন অফিসাররা আপনার কথা জানেন না। আমি জানিয়ে দেব বরং।

শর্মাজি চলে গেলে কর্নেল বললেন, মোহনপ্রসাদ পুলিশের কানে আমার আসার খবর তুলতে গেলেন কেন? অদ্ভুত লোক তো!

বললুম, আপনার প্রতি মোহনজির প্রবল আস্থা। তাই আপনাকে নিয়ে পুলিশের কাছে বাজি ধরেছেন।

অর্থাৎ আমি ওঁর তুরুপের তাস। বলে কর্নেল কী যেন ভাবতে থাকলেন।

বারান্দায় গিয়ে বসলুম। নিচে নদী। তার ওপারে একটা টিলার মাথায় লাল রঙের একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। বাড়িটা আগে এসেও দেখেছি এবং কেন কে জানে, কেমন রহস্যের গন্ধ টের পেয়েছি। বাড়ির একতলাটা দেখতে কতকটা দুর্গের মতো। বহুকালের পুরনো দেওয়ালের ফাটলে আগাছা গজিয়ে রয়েছে। বাড়িটা নিশ্চয় হানাবাড়ি।

মহাবীর লনের ওপাশে মালির সঙ্গে কথা বলছিল। তাকে ডেকে জিগ্যেস করলুম, ওই বাড়িটায় কে থাকে? কার বাড়ি বলতে পারো?

মহাবীর বলল, বাড়িটা স্যার প্রতাপগড়ের এমএলএ রঘুনন্দনজির। ওঁর বাবা এক সায়েবের কাছে কিনেছিলেন শুনেছি। তাই কেউ কাছে যেতেও ভয় পায়।

মহবীরের সঙ্গে প্রতাপগড়ের হালচাল নিয়ে কথা বলছি, কর্নেল বেরিয়ে এসে বললেন, জয়ন্ত! আমি একটু বেরুচ্ছি। তুমি বরং মহাবীরকে নিয়ে জিপে করে ঘুরে এস কোথাও।

মহাবীর বলল, আপনাকে পৌঁছে দিই স্যার, যেখানে যাবেন। তারপর ছোট সায়েবকে নিয়ে বেরুব।

কর্নেল বললেন, না না। দরকার হবে না। আমি বেশিদূর যাব না।

কর্নেল আমাকে ফেলে যাওয়ার মনে অভিমান জেগেছিল। কিন্তু ওঁর সঙ্গে বেরুনোর ঝক্কি কী, মনে পড়ায় শেষ পর্যন্ত খুশিই হলুম। কোথায় কোথায় টো টো ঘুরবেন কে জানে! তার চেয়ে চুপচাপ প্রকৃতি দেখা আনন্দজনক।

মহাবীর বলল, যাবেন নাকি স্যার কোথাও ঘুরতে?

বললুম, বরং এক কাজ করা যাক। চলো, এই পোড়োবাড়িটা দেখে আসি। আঁতকে উঠল মহাবীর। না স্যার। ভুলেও ওখানে পা বাড়াবেন না। তাছাড়া জিপ যাওয়ার রাস্তা নেই ওদিকে। বরং চলুন, ওয়াটার ড্যাম দেখিয়ে আনি।

দেখেছি তোমাদের ওয়াটার ড্যাম। তুমি যাও মহাবীর, গল্প করো গে মালীর সঙ্গে। আমি পায়দল ঘুরে আসি।

আমার কথা শুনে মহাবীর টের পেল আমি রাগ করেছি। সে কাঁচুমাচু মুখে বলল, আমার কথা বিশ্বাস করুন স্যার। ওখানে শঙ্খচূড় সাপের আড্ডা। মালীকে জিগ্যেস করুন!

মালি শুনছিল। সায় দিয়ে বলল, হ্যাঁ স্যার। বড্ড সাপ ওখানে।

এরপর আর ওই হানাবাড়িতে যাওয়ার সাহস হল না। অগত্যা ঘরে গিয়ে জানলার ধারে একটা বই নিয়ে বসলুম।

একটু পরে খোলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, হানাবাড়িটা নদীর ওপারে দেখা যাচ্ছে। আর তার ছাদে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির ছাদের ওপর একটা প্রকাণ্ড গাছ ঝুঁকে পড়ায় তার ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তিটা ভাল করে ঠাহর হচ্ছিল না। কর্নেলের বাইনোকুলারটা খুঁজলুম। সঙ্গে নিয়ে গেছেন যথারীতি। অগত্যা বারান্দায় গিয়ে ভাল করে দেখার চেষ্টা করলুম।

এবার অবাক হয়ে গেলুম। মূর্তিটা স্ত্রীলোকের।

ওই পোড়ো বাড়িতে সাপের ভয় তুচ্ছ করে কোনও স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, এটা বেশ অস্বাভাবিক ব্যাপার। মহাবীরকে ডাকলুম। মহাবীর আমার কথা শুনে ওদিকে তাকাল। তারপর দু'হাতে চোখ ঢেকে ভয় পাওয়া গলায় বলে উঠল, স্যার, স্যার! ওই সেই লছমী ডাকুনী!

শোনামাত্র আমার মাথায় জেদ চাপল। দ্রুত ঘরে ঢুকে ব্যাগ থেকে আমার পয়েন্ট ৩৮ ক্ষুদে রিভলভারটায় গুলি ভরে বেরিয়ে এলুম। কিন্তু তখন আর মূর্তিটা নেই।

মহাবীর বলল, কোথায় যাচ্ছেন স্যার?

আসছি। বলে গেট পেরিয়ে রাস্তা থেকে বাঁদিকে নেমে বড় বড় পাথর আর ঝোপঝাড় পেরিয়ে সেই টিলার কাছে পৌঁছলুম। এবার ভয় জাগল। সাপের ভয়। সাবধানে নজর রেখে টিলায় উঠতে শুরু করলুম।

বাড়িটা কোনওক্রমে টিকে আছে। আগাছার জঙ্গলে ঘিরে ফেলেছে তাকে। ফাঁকা জায়গা দিয়ে এগিয়ে প্রাঙ্গণে ঢুকলুম। তারপর মনে হল, বাড়িতে যেন মানুষ থাকার গন্ধ পাচ্ছি। এটা বুঝিয়ে বলা কঠিন, ষষ্ঠীর মতো একটা ইনটুইশন হতে পারে—কোনও স্পষ্ট চিহ্ন না থাকলেও মনে হচ্ছিল, এখানে মানুষ বাস করে।

ঘরগুলোর কপাটে মরচেধরা তালা আটকানো রয়েছে। বারান্দার শেষেপ্রান্তে সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে ছাদে চলে গেলুম। কেউ কোথাও নেই।

হঠাৎ চোখে পড়ল একটা কালো ক্লিপ। চুল আঁটার মেয়েলি ক্লিপ। ক্লিপে চুল লেগে রয়েছে। শুঁকে সস্তা গন্ধতেলও টের পেলুম।

বাড়িটার আনাচে কানাচে তন্নতন্ন খুঁজেও সেই স্ত্রীলোকটিকে দেখতে পেলুম না। উঠানে দাঁড়িয়ে ভাবছি, দরজার তালা ভেঙে দেখব নাকি ভেতরে কী আছে, হঠাৎ আমার বাঁ-দিকে কয়েক গজ তফাতে আগাছার মধ্যে কী পড়ে আছে দেখতে পেলুম।

ঘাসে পা ফেলতে ভয় করছিল। শঙ্খচূড় থাকলে অবশ্য পায়ের শব্দে অনেক আগে ফণা তুলবে। লড়াই করার সময় পাব, অন্য বিষাক্ত সাপ থাকলে মুশকিল। গায়ে পা না পড়া পর্যন্ত অনেক বিষাক্ত সাপও ফোঁস করে না।

যা দেখলুম, আমার শরীরে রক্ত চলাচল থেমে গেল যেন।

একটি দেহাতী যুবতী চিত হয়ে পড়ে রয়েছে। তার গলা, কপাল ও বুকের ক্ষতচিহ্নে টাটকা রক্ত দলা বেঁধে রয়েছে। কাপড় রক্তে মাখামাখি। নিস্পন্দ মৃতদেহ ছাড়া কিছু নয়। মুখটা অবশ্য তত বিকৃত নয়।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড দেখে আর তাকাতে পারছিলুম না। এমন খুন-খারাপি দেখিনি, এমন নয়। কিন্তু একটু আগে এ বাড়ির ছাদে যাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি, সেই যে এইমাত্র খুন হয়েছে—আমি হয়তো যখন নদীর ব্রিজে ছিলুম তখনই—একথা ভেবেই আমার কষ্ট হচ্ছিল। তার আর্তনাদ কেন শুনতে পাইনি, সেটাই আশ্চর্য!

এখন দরকার খবর দেওয়া। সাপের কথা ভুলে হনহন করে এগিয়ে গেলুম। ভাঙা ফটক পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাচ্ছি, কর্নেলের টুপি দেখলুম ঝোপের আড়ালে। বুড়ো হাসিমুখে চাপা গলায় বললেন, জয়ন্ত যে!

রুদ্ধশ্বাসে বললাম, শিগগির আসুন! ওখানে একটা খুন হয়েছে।

বুড়ো একটুও চমকালেন না। বললেন, তাই নাকি? চলো তো দেখি।

ভেতরে যেতে যেতে ব্যাপারটা বললুম। কর্নেল কোনও মন্তব্য করলেন না। কিন্তু প্রাঙ্গণে সেই ঝোপের মধ্যে গিয়েই আমি আবার থ। লাশটা নেই।

বললুম, সর্বনাশ! এখানেই তো ছিল! গেল কোথায়?

কর্নেল হাঁটু দুমড়ে ঘাসের ভেতর থেকে কী একটা তুলে নিলেন। চমকে উঠে দেখি, রক্তের দলা ঘাঁটছেন আঙুলে। ছ্যা ছ্যা। ঘেন্না হচ্ছে না একটুও?

তিন

সম্ভাব্য ছয় নম্বর

না বলে পারলুম না আর। কর্নেল! করছেন কী! ওই নোংরা রক্ত ঘাঁটছেন কেন?

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে আঙুল দুটো আগাছার পাতায় মুছতে মুছতে বললেন, জিনিসটা ততকিছু নোংরা নয়, ডার্লিং!

তারপর এগিয়ে গেলেন বারান্দর কোনায় সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে গেলেন। পেছন পেছন গেলুম। কর্নেল বাইনোকুলার চোখে রেখে এদিকে-ওদিকে কী খুঁজছিলেন। একটু পরে একদিকে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন! ডাকলেন, জয়ন্ত! ওই দেখো তোমার শ্রীমতী মৃতদেহ স্নান করছেন। অর্থাৎ তেল-সিঁদুর ধুয়ে ফেলছেন।

বাইনোকুলারটা নিয়ে চোখে রেখে দেখি, হ্যাঁ—সেই দেহাতী যুবতীই বটে! নদীর বাঁকে মস্ত পাথরের আড়ালে ডোবামতো জায়গায় রগড়ে রং ধুচ্ছে।

বললুম, ব্যাপারটা কী বলুন তো?

কর্নেল একটু হেসে বললেন, ব্যাপারটা যৎকিঞ্চিৎ। ওখানে একজন পুরুষ মানুষও রয়েছে, যদি তুমি খুঁজে তাকে বের করতে পারো। সে আছে গাছের তলায় বসে।

দেখতে পেয়েছি কর্নেল! উত্তেজিতভাবে বললুম।

চিনতে পারছ তাকে?

আশ্চর্য! ওকে মহাবীর ড্রাইভার বলে মনে হচ্ছে।

দ্যাটস রাইট, ডার্লিং! এবারে চলে এস। কেটে পড়া যাক। সাবধান, আমরা এবার উল্টো দিকে বড় ব্রিজ পেরিয়ে বাংলোয় ফিরব।

কিছুক্ষণ পরে দুর্গম জায়গায় অশেষ কষ্ট করে হেঁটে হাইওয়ের বড় ব্রিজে পৌঁছলুম দু'জনে। তারপর বললুম, আপনি ওখানে জুটলেন কীভাবে?

কর্নেল চুরুট জ্বেলে ধোঁয়া ছেড়ে হাসতে হাসতে বললেন, আজ সকাল থেকে টোপ খেলানো হচ্ছে। অর্থাৎ বাংলোর উল্টোদিকে নদীর পারে রঘুনন্দনজির ওই পোড়ো বাড়ির ছাদে আমাদের লছমীর প্রেতাত্মা দর্শনের ব্যবস্থা করে দিচ্ছিল কেউ। প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েই আমার নজরে

পড়েছিল! কিন্তু আমল দিইনি। তখন সঙ্গে দূরদর্শন যন্ত্রটা ছিল না। ফিরে এসে, তখনও তুমি ঘুমিয়ে আছ, বস্তুটা চোখে রেখে দেখলুম—হ্যাঁ, যা ভেবেছি তাই। তখন ঘুরপথে বেরিয়ে পড়লুম। এগোতে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি, তুমি আসছ। বুঝতে পারলুম কেন আসছ অমন হন্তদন্ত হয়ে। তবে তুমি আমার সঙ্গী এবং কলকাতার লোক। ভূত বিশ্বাস করবে না এবং অনর্থ ঘটাবে জেনে মহাবীরের বউ...

অবাক হয়ে বললুম, মহাবীরের বউ? বলেন কী!

হ্যাঁ জয়ন্ত!

কাল মোহনজির বাড়িতে মেয়েটাকে দেখছি আমরা।

তাই বলুন! কিন্তু হঠাৎ অমন লাশ হয়ে পড়েছিল কেন?

তোমাকে ধোঁকা দিতে। মুখোমুখি হতে যাচ্ছিলে প্রায়। হঠাৎ বুদ্ধি খাটিয়ে ও লাশ হয়ে পড়ে রইল। তুমি ধাঁধায় পড়ে গেলে। পুলিশকে খবর দিতে ছুটবে, এ তো জানা কথা! সেই ফাঁকে নিরাপদে পালানোর সুযোগ করে নিল।

তাহলে মহাবীরের বউ লছমীর ভূত সেজে ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে?

হুম্। বলে কর্নেল একরাশ ধোঁয়া ছাড়লেন। তারপর ফের বললেন, তখন বললুম না? আমায় মোহনজি তুরুপের তাস করতে ডেকে এনেছেন!

ঠিক বুঝলুম না।

বুঝবে সময়মতো। এস আপাতত আমরা কিছুক্ষণ প্রকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করি।...

দুপুরে আজ মোহনজির বাড়ি খাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল। বাংলো থেকে নিয়ে যেতে এলেন মোহনজি নিজে। মহাবীরকে আর দেখতে পাইনি ত্রিসীমানায়! মোহনজিকে সকালের ঘটনা জানাতে নিষেধ করেছিলেন কর্নেল। বলেছিলেন, যা বলার আমি বলব। তাই চুপ করে থাকলুম।

মোহনজি বললেন, দেরি হয়ে গেল কর্নেল সাব! অনুগ্রহ করে এবার আসুন!

কিন্তু কর্নেল গোমড়ামুখে বললেন, ক্ষমা চাচ্ছি মোহনজি! রাত থেকে প্রচণ্ড পেটের অসুখে ভুগছি। কিছু মুখে দেওয়ার উপায় নেই! জয়ন্তকে নিয়ে যান!

মোহনজি অবাক হয়ে বললেন, সে কী! এতসব আয়োজন করেছি!

কর্নেল আরও গম্ভীর হয়ে বললেন, উপায় নেই মোহনজি! আমি মহাবীরকে বলে পাঠাব ভেবেছিলাম, খুঁজে পেলাম না।

মেহনজি ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, এটা কেমন কথা! আমি কত আশা করে...

বাধা দিয়ে কর্নেল একটু হেসে বললেন, আপনার আশা না মেটাতে পারায় আমি দুঃখিত। আর মোহনজি, আমার এই এক বেয়াড়া স্বভাব—আমায় কেউ প্রতারণা করছে জানতে পারলে তার ছায়া আমি মাড়াইনে।

মোহনপ্রসাদ চমকে উঠলেন। আমি আপনাকে প্রতারণা করেছি! কী বলছেন?

হ্যাঁ। কর্নেল দৃঢ় স্বরে বললেন। আপনার ড্রাইভার মহাবীরের বউকে আপনি লছমীর ভূত সাজিয়ে এত কাণ্ড করেছেন। আবার সেই রহস্য ফাঁস করতে আমাকে ডেকে এসেছেন। উদ্দেশ্যটা কী?

মোহনপ্রসাদ চেঁচিয়ে উঠলেন, ঝুট। বিলকুল ঝুট! এ আপনি কী বলছেন?

কর্নেল অন্যদিকে ঘুরে বললেন, যা বলার আমি বলেছি। এখন আপনি আসতে পারেন।

মোহনপ্রসাদ রাঙা মুখে গটগট করে বেরিয়ে গেলেন। বাইরে ওঁর জিপের অওয়াজ শোনা গেল। তারপর আমি বললুম, ওঁকে খামোকা রাগিয়ে দিলেন কেন কর্নেল?

কর্নেল বললেন, সাবধান করার জন্য। জানিয়ে দিলুম, ওঁর চালাকি ধরে ফেলেছি। আশাকরি তুমি আগাথা ক্রিস্টির এ বি সি মার্ডার পড়েছে। খুনির উদ্দেশ্য সি-কে খুন করা। পুলিশকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করার জন্য সে এ এবং বি-কে খুন করেছিল।

কিন্তু এক্ষেত্রে পাঁচটি কেস তো ডাকাতি। খুন নয়!

কর্নেল হাসলেন।... প্রথম দুটো কেস মোহনপ্রসাদের পাম্প এবং বাড়িতে হামলার। ওটা ওঁর সাজানো গল্প। বাকি তিনটে ঠিক। কিন্তু দুটোর উদ্দেশ্য লছমীর ভূতের কথা প্রচার করা। বাকি তিনটে সেই প্রচারের ভিত্তি মজবুত করতে। আমার ধারণা এবার ছ'নম্বর কেস আমার উপস্থিতিতে করার প্ল্যান ছিল মোহনজির। যেহেতু উনি আমাকে এনেছেন এই রহস্যের পর্দা তুলতে এবং সে কথা পুলিশকে জানিয়েও দিয়েছেন, সেইহেতু এই পরিকল্পিত এবং সম্ভাব্য ছ'নম্বর কেসেও তার প্রতি এতটুকু নজর পড়ার কথা নয় পুলিশের।

সেজন্য আপনি তুরুপের তাস কথাটা বারবার বলছিলেন?

ঠিক ধরেছ ডার্লিং।

ছ'নম্বর কেসে কী ঘটতে পারে ভেবেছিলেন?

একটা বড় কিছু। কর্নেল চিন্তিতমুখে বললেন। ষষ্ঠীর ইনটুইশন খুব খাঁটি। কিন্তু সেই বড়টা কী মাথায় আসছে না। তবে সেটা থেকে মোহনপ্রসাদ যাতে নিবৃত্ত হন, তাই মুখের ওপর জানিয়ে দিলুম সব কথা। আশাকরি আর উনি এগোবেন না।

বলে কর্নেল পায়চারি শুরু করলেন। বিড়বিড় করে বলতে শুনলুম, কী হতে পারত ছনম্বর ঘটনাটা? কী সেটা?

তারপর ঘুরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, জয়ন্ত! মনে হচ্ছে, এ বি সি মার্ডারের অন্তিম লক্ষ্যের মতো ওঁর যে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওঁর জীবনে। পূর্বপ্রতিহিংসা চরিতার্থ করা—নাকি কোনও আর্থিক লাভালাভের ব্যাপার?

হাসতে হাসতে বললুম, যা ঘটেনি এবং আশা করি আর ঘটবে না—আপনি যেহেতু ওঁর কীর্তিকলাপ জেনে গেছেন, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী? এদিকে আমদের খিদেও পেয়ে গিয়েছে। চলুন, কোনও হোটেলের দিকে পা বাড়াই।

কর্নেল বললেন, হুঁ, ছ'নম্বর ঘটনা আমি আটকে দিয়েছি। কিন্তু জানতে ইচ্ছে করছে, কী ঘটতে যাচ্ছিল! সম্ভবত সেটা শুধু ডাকাতি নয়, খুন-খারাপি। হ্যাঁ, লছমীর ভূতের হাতে একটি মৃত্যু।

করুণ মুখে বললুম, কর্নেল! আপনার সত্যি খিদে পেয়েছে।

বৃদ্ধ গোয়েন্দাপ্রবর বিচলিত হয়ে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে। হ্যাঁ, চলো, চলো।...

প্রতাপগড় থেকে ফেরার দিন পনেরো পরে কর্নেল একদিন ফোন করলেন। জয়ন্ত, প্রতাপগড়ের এমএলএ রঘুনন্দন সিংয়ের ডেডবডি পাওয়া গেছে নদীর ধারে। লছমীর ভূতের হাতেই খুন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা হয়নি, স্রেফ খুন। শর্মাজি ট্রাংককলে জানালেন এইমাত্র। রঘুনন্দনের কাছে টিট হয়ে মোহনজি রাজনীতি ছেড়েছিলেন। অবশ্য আমি শর্মাজিকে লছমীর ভূত রহস্য ফাঁস করে না এলে মোহনজিকে সন্দেহ করতেন না ওঁরা। যাই হোক, মোহনজিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। লছমী আর মহাবীর তো আমরা চলে আসার পরই গা-ঢাকা দিয়েছিল। এখনও পুলিশ তাদের খুঁজছে। তাহলে দেখলে তো? ছ'নম্বর শিকার কে ছিল? ষষ্ঠীচরণের মাইনে বাড়িয়ে দিলুম, জয়ন্ত। সময় করে চলে এসো।...

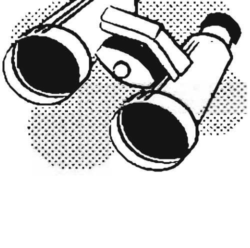

ভূত্রাক্ষস

কিরিবুরু পাহাড়ি উপত্যকায় একসময় ঘন জঙ্গল ছিল। সেই জঙ্গলে শিকার করার জন্য রামগড়ের রাজা একটা টিলার মাথায় 'হান্টিং লজ' বা শিকার ভবন তৈরি করেছিলেন। মাঝে-মাঝে শিকারে গিয়ে সেখানে তিনি থাকতেন। বাড়িটা কাঠের এবং ওপরে টালির চাল। তার লাগোয়া একটা উঁচু মঞ্চও তৈরি করেছিলেন। মঞ্চে উঠে দূরবীনে চোখ রেখে জন্তুজানোয়ার দেখতেন।

গতবছর কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের সঙ্গে কিরিবুরু গিয়ে দেখি, কোথায় জঙ্গল? সারা উপত্যকা জুড়ে চাষবাস হয়েছে। চারিদিকে পাহাড়গুলো পর্যন্ত ন্যাড়া হয়ে গেছে। এখানে-ওখানে আদিবাসীদের কয়েকটা ছোট্ট বসতি ছড়িয়ে রয়েছে। উপত্যকা দুভাগ করে যে নদীটা বয়ে যাচ্ছে, তার ওধারে টিলার মাথায় রামগড়ের রাজার হান্টিং লজ আর মঞ্চটা অবশ্য আছে। কিন্তু দেখলে মনে হবে যেন হানা বাড়ি।

নদীর এপারে সেচ দফতরের ডাকবাংলোয় আমরা উঠলুম আগের ব্যবস্থা মতো। তারপর চারদিকে দেখে নিয়ে কর্নেলকে বললুম, 'এ কোথায় এলুম আমরা? জঙ্গলের টিকিটিও তো দেখা যাচ্ছে না। মিছিমিছি রাইফেল বয়ে এনেই বা কী লাভ হল?' কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, 'একটু ধৈর্য ধরো জয়ন্ত। তোমার রাইফেলের শক্তিপরীক্ষার সুযোগ অবশ্যই পাবে।'

সেচ দফতরের জিপে আমরা এসেছি। জিপের ড্রাইভারের নাম বদ্রীপ্রসাদ। সে লাল কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল আর বাংলোর চৌকিদারের সঙ্গে কথা বলছিল। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'কর্নিল সাহাব। কর্নিল সাহাব। তুরন্ত্ আইয়ে, ঢুণ্ডু নিক্‌লা!'

কর্নেল তখুনি বেরিয়ে গেলেন। আমি কিছু বুঝতে না পেরে হতচকিতভাবে তাকে অনুসরণ করলুম। এপ্রিলের বিকেল পড়ে এসেছে। ফিকে লালচে রোদ্দুর ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। কর্নেল চোখে বাইনোকুলার রেখে নদীর উপরে কিছু দেখতে থাকলেন। বদ্রীপ্রসাদ এবং চৌকিদারের মুখ উত্তেজনায় থমথমে। তারাও ওদিকে তাকিয়ে আছে। আমি কিন্তু কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না। তারপরই শুনলুম নদীর এপারে ওপারে ছোট্ট বসতিগুলো থেকে হইহই করে লোকেরা বেরুচ্ছে। ঢোল আর ক্যানাস্তারা পেটাতে পেটাতে তারা শোরগোল তুলেছে। কিন্তু কাউকে বসতি ছেড়ে নড়তে দেখছি না। মনে হচ্ছে ওরা কোন সাংঘাতিক জন্তু দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

একটু পরে সব উত্তেজনা থিতিয়ে গেল। কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন, 'হুম! কিছু বোঝা যাচ্ছে না।'

জিগ্যেস করলুম, 'ব্যাপারটা কী?'

'হয়তো কোনও জন্তু—কিংবা জন্তু নয়।'

'তার মানে?'

কর্নেল পা বাড়িয়ে বললেন, 'এদের ভাষায় ঢুণ্ডুর মানে হল ভূত-রাক্ষস। সন্ধি করে তুমি ভূত্রাক্ষস বলতে পারো।'

অবাক হয়ে বললুম, 'ভূত আবার রাক্ষস হয় কী করে? রাক্ষসই বা ভূত হয় কি ভাবে?'

কর্নেল বাংলোয় ঢুকে তাঁর অত্যদ্ভুত সেই ক্যামেরা নিয়ে এলেন। এই ইলেকট্রনিক ক্যামেরা অন্ধকারেও ছবি তুলতে ওস্তাদ। তারপর বললেন, 'রাক্ষস মানুষ খায় এবং ভূতের ক্ষমতা কিংবা স্বভাব-চরিত্র তো তুমি বিলক্ষণ জানো। ঢুণ্ডুর দু'রকম ব্যাপারটা আছে। কিরিবুরু উপত্যকা থেকে

গত তিনমাসে সাতজন লোক নিখোঁজ হয়ে গেছে। তাদের প্রত্যেকের কঙ্কাল খুঁজে পাওয়া গেছে নদীর চড়ায়। আশ্চর্য ব্যাপার, কঙ্কালে একবিন্দু মাংস নেই—ঢুণ্ডু মাংস চেটেপুটে সাফ করে ফেলেছে। শুধু হাড়গুলো নিখুঁত রয়েছে।

এতক্ষণে বুঝলুম, আমার ধুরন্দর বৃদ্ধ বন্ধু কেন কিরিবুরু উপত্যকায় এসেছেন। এ তো দস্তুরমতো অ্যাডভেঞ্চার। আমার গা শিউরে উঠল অজানা আতঙ্কে। বললুম, 'একটু আগে ঢুণ্ডুকে কি সত্যি দেখলেন আপনি?'

'এক পলকের জন্যে দেখলুম।' কর্নেল গম্ভীরভাবে বললেন। 'রাজাবাহাদুরের হান্টিং লজের নিচে একটা লোক ঘাস কাটছিল। তার দিকেই লক্ষ্য ছিল ওর। লোকটা কীভাবে টের পেয়ে পালিয়ে আসছিল চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে। আমি দেখলুম কাঠের বাড়িটার কাছে একটা পাথরের আড়ালে কালো কি একটা অদৃশ্য হল। মানুষের মতো দেখতে কতকটা। যাই হোক, ডার্লিং, এবার তোমার রাইফেলের শক্তি পরীক্ষা হবে। চলে এস।...'

টিলাটা ঘন ঘাসে ও ঝোপঝাড়ে ঢাকা। কার মধ্যে ছোট বন নানা সাইজের পাথর মাথা উঁচিয়ে রয়েছে। হান্টিং লজের অবস্থা জরাজীর্ণ। তবে দরজায় মরচে ধরা তালা ঝুলছে। সূর্য পাহাড়ের নিচে চলে গেছে। ধূসর আলোয় নীচের সবুজ শস্যে ঢাকা উপত্যকা যেন উত্তেজনায় শিউরে উঠছে মনে হচ্ছিল। কর্নেল কাঠের মঞ্চের পেছনে একটা গাছের ডালে ক্যামেরাটাকে যতক্ষণ মজবুত করে বেঁধে আটকে দিলেন, ততক্ষণে আমি গুলিভরা রাইফেল তাক করে চারদিকে সতর্ক নজর রাখলুম। ক্যামেরার শাটার থেকে একটা কালো সুতো টেনে এনে কর্নেল সামনে ঘাসভরা মাটির ওপর টানটান করে অন্যপাশে একটা ঝোপের গোড়ায় আটকে দিলেন। এই সুতোয় যার পা লাগবে, তার অজান্তে ক্যামেরায় তারই ছবি উঠবে।

এরপর আমরা লজের বারান্দায় উঠলুম। কর্নেল টর্চ আর রিভলভার বের করে দরজার তলায় টান দিতেই খুলে গেল। কর্নেল বললেন, 'আশ্চর্য তো তালাটা যেন খোলাই ছিল।'

জংধরা দরজা ঠেলতে বিশ্রি ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে খুলে গেল। ভেতরে টর্চের আলো ফেলে দেখা গেল, একধারে শুধু একটা লোহার খাট-ছাড়া আর কিছুই নেই। মেঝেয় ধুলো জমেছে। পেছনে একটা জানালা খোলা এবং গরাদ ভেঙে রয়েছে। নিশ্চয় চোরের কীর্তি। আসবাবপত্র বা অন্যান্য জিনিস করে চুরি করে নিয়ে গেছে।

দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে কর্নেল চাপা গলায় বললেন, 'ডার্লিং আজ রাতে এটাই আমাদের আস্তানা। কিটব্যাগে কিছু শুকনো খাবার আছে। আর এই ফ্ল্যাস্কে কফি আছে। হুম্। রোসো। মোমবাতিগুলো বের করি।'

এই হানাবাড়িতে রাত কাটানোর কথা শুনে আমার বুক কেঁপে উঠল। কর্নেল একটা মোম জ্বেলে লোহার খাটের কোনায় বসিয়ে দিলেন। ঘরের ভেতর কেমন একটা চিমসে গন্ধ। তার মধ্যে কফি খেতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু কর্নেলের তাগিদে খেতেই হল। উনি চুরুট ধরিয়ে খোলা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমি মোমের আলোয় ঘরের ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলুম।

পাশের ঘরের দরজাটা ভেঙে পড়েছে। টর্চ জ্বেলে উঁকি মেরে দেখলুম, মেঝে জুড়ে ইঁদুরের গর্ত, কাঁকুরে মাটির স্তূপ। একখানি সাপের খোলস দেখে চমকে উঠলুম। সর্বনাশ! সাপ বেরিয়ে যদি এ ঘরে হানা দেয়?

কর্নেল আমার কাছে এসে উঁকি মেরে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, 'হুম,! সাপের আড্ডা মনে হচ্ছে। তবে আমাদের পায়ে হান্টিং বুট আছে। একটু লক্ষ্য রাখতে হবে।' বলে আর একটা মোম জ্বেলে এনে এ ঘরের দরজার মাঝামাঝি রাখলেন। 'ব্যস্! আর চিন্তার কারণ নেই। সাপ এই আলো পেরিয়ে এ ঘরে ঢুকবে না। কারণ, আলোর সামনে সাপ নিজেকে অসহায় বোধ করে। বড় জোর ফণা তুলে আলোকে হিস হিস শব্দে ধমক দেবে।

আমরা লোহার খাটে বসে পড়লুম। বাইরে এতক্ষণে একটা জোরালো বাতাস বইতে শুরু করেছে। কাঠের বাড়িটা অদ্ভুত শব্দ করছে। বারবার চমকে উঠছি। একবার খোলা জানালা, একবার মেঝের দিকে, আর একবার পাশের ঘরের দরজার জ্বলন্ত মোমের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকাচ্ছি। কর্নেলের সঙ্গে অনেক ভয়ঙ্কর রাত কাটিয়েছি, কিন্তু এমন সাংঘাতিক রাত কখনও বুঝি কাটাইনি। কিছুক্ষণ পরে বাইরের দরজার দিকে তাকাতে বললেন। তাকিয়ে দেখি, দরজাটা একটু একটু কাঁপছে। কেউ যেন নিঃশব্দে চাপ দিচ্ছে।

আমার পিলে চমকে উঠল তাই দেখে। নির্ঘাৎ সেই আজব ভূত্রাক্ষস ঢুণ্ডু ব্যাটাচ্ছেলে! রাইফেল বাগিয়ে ধরলুম। কর্নেল একহাতে টর্চ অন্যহাতে রিভলভার নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

দরজার চাপটা বাড়ছে ক্রমশ। মচমচ করছে জীর্ণ কাঠের কপাট। এবার আমিও উঠে দাঁড়ালুম। দরজাটা আমাদের ফুট দশেক দূরে। হঠাৎ কপাট দড়াম করে ভেঙে পড়ল। পরমুহূর্তে টর্চের আলোয় দেখলুম...

কিন্তু ওকি মানুষ, না ভয়ঙ্কর জন্তু? শরীরের গড়ন অবিকল মানুষের। কিন্তু একটুও লোম নেই—মাথাটাও ন্যাড়া। কালচে রঙের ভৌতিক প্রাণী যেন। তার নাক মুখ-চোখ সবই মানুষের। কিন্তু কিন্তু চোখদুটো জ্বলন্ত নীল টুনি বাল্ব যেন। তার মুখ থেকে অদ্ভুত চাপা একটা গরগর আওয়াজ বেরুচ্ছে তাও শুনলুম।

মাত্র কয়েকটা সেকেন্ড। আমি রাইফেলের ট্রিগারে চাপ দিলুম। প্রচণ্ড গর্জন করে গুলি বেরল। অটোমেটিক রাইফেল। ছটা গুলি শেষ করে ফেললুম। তারপর দেখি, আজব প্রাণীটা অদৃশ্য। কর্নেল দরজায় উঁকি মেরে টর্চের আলো ফেলে বললেন, 'পালিয়েছে! যাগ কে, আপাতত আমাদের কাজ শেষ। চলো, বাংলোয় ফেরা যাক। ঢুণ্ডুবাবাজিকে স্বচক্ষে দর্শনের ইচ্ছা ছিল। দেখলুম, আবার কী?'

সকালে ঘুম ভেঙে দেখি, কর্নেল অভ্যাসমতো প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন—এখন টেবিলে ওঁর ছোট্ট ট্রেতে কয়েকটা ভেজা ফোটো। সদ্য প্রিন্ট করেছেন। আমাকে উঠতে দেখে বললেন, 'ঢুণ্ডুবাবাজিকে দেখে যাও ডার্লিং! আমাদের চোখ অনেক সময় ভুল করে। কিন্তু ক্যামেরার চোখ নির্ভুল।'

ছবিগুলো দেখে বললুম, 'রাতে যাকে দেখেছি, সেই বেটা।'

'কোনও তফাত চোখে ঠেকছে না?'

'না তো।'

'ভাল করে দেখে বলো, জয়ন্ত।' কর্নেল আরেকটা ছবি দিলেন।

দেখে বললুম, 'টাওয়ারের পাশে একটা পাথরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে একটা উলঙ্গ পাগল—মাথাটা ন্যাড়া।... হুঁ, পাথরের গায়ে কালোমতো একটা চিহ্ন।'

ঘণ্টাখানেক পরে দিনের উজ্জ্বল আলোয় আমরা হান্টিং লজে পৌঁছলুম। রাতের সেই আতঙ্ক আর টের পাচ্ছি না। টাওয়ারের কাছে খুঁজে খুঁজে সেই পাথরটা আবিষ্কার করলেন কর্নেল। তারপর দেখি, পাথরটার মাথায় কালো গোলাকার একটা ইঞ্চিখানেক উঁচু কী একটা জিনিস। কর্নেল সেটা নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ পাথরটা নড়ে উঠল একটু কাত হয়ে গেল। অবাক হয়ে দেখলুম, হাতচারেক চওড়া একটা কুয়োর মতো সুড়ঙ্গ ধাপে-ধাপে নেমে গেছে।

একমুহূর্ত ইতস্তত করে কর্নেল বললেন, 'এস জয়ন্ত, ঢুণ্ডুর ডেরায় ঢুকি।'

কর্নেল সবে প্রথম ধাপে পা রেখেছেন, হাতে টর্চ—কারণ ভেতরটা অন্ধকার বলে মনে হচ্ছে, আচমকা ভেতরে চাপা গরগর শব্দ শোনা গেল। তারপর বিদ্যুৎবেগে সেই ঢুণ্ডুর আবির্ভাব ঘটল এবং কর্নেলের গলা দু'হাতে চেপে ধড়ল। কর্নেল জড়ানো গলায় বলে উঠলেন, 'মাথা! মাথা'!

কর্নেলকে নিয়ে ঢুণ্ডু তখন সিঁড়ির ধাপে পড়েছে এবং ধস্তাধস্তি শুরু হয়েছে। 'মাথা' বলতে কী বোঝাচ্ছেন কর্নেল। বুঝতে দেরি হল একটু। তারপর লক্ষ্য করলুম কর্নেল একটা হাত বাড়িয়ে ঢুণ্ডুর মাথা ধরার চেষ্টা করছেন। আমি রাইফেল বাগিয়ে ধরতে দেরি করিনি। কিন্তু গুলি করে লাভ নেই, তা দেখেছি। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে রাইফেলের বাঁট দিয়ে ঢুণ্ডু ব্যাটার মাথায় প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলুম।

ঠঙাস করে শব্দ হল। ব্যাটার মাথা না লোহার পিণ্ড! ফের ওর মাথার পেছনে এক ঘা দিতেই রাইফেলের বাঁট ভেঙে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত কাণ্ডও ঘটল।

ঢুণ্ডুর মাথাটা ছিটকে গিয়ে দমাস করে নিচে কোথাও পড়ল এবং ধাপে ধাপে ঢঙ ঢঙ শব্দ করতে করতে পাতালে গড়াতে থাকল। তারপর, দেখলুম, ওটা মাথা নয় আদতে—একটা নিছক হেলমেটের মতো জিনিস। ঢুণ্ডুর মুণ্ডু ঠিকই আছে এবং তা একটা জলজ্যান্ত মানুষেরই। কারণ তাতে চুল আছে।

ভাঙা রাইফেল দিয়ে দু'হাতে ওর চুল খামচে ধরতেই ঢুণ্ডুবাবাজি বেকায়দায় পড়ে মানুষের গলায় আর্তনাদ করল, 'উঃ! উহু-হু! গেছিরে! গেছিরে! ছাড়, ছাড়! মরে গেলুম রে!'

কর্নেলের সাদা দাড়ি এবং টাক ধুলোয় ধূসর। টুপি আর টর্চ কুড়িয়ে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে বললেন, 'ঢুণ্ডু বাবাজিকে নিয়ে এস ডার্লিং! মহা ত্যাঁদোড় ব্যাটাচ্ছেলে।'

ঢুণ্ডু লক্ষ্মীছেলের মতো বলল, 'আহা টানে না এত। চলো না, যাচ্ছি। আমার চুল টানলে বেজায় লাগে যে!'

ভূত্রাক্ষস বা ঢুণ্ডুর পরিচয় পাওয়া গেল রামগড় থানায়। কর্নেল বললেন, 'কলকাতার বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী ভবরঞ্জন বক্সীর অন্তর্ধান রহস্য তাহলে ফাঁস হল। কিরিবুরু হান্টিং লজে রামগড়ের রাজা একটা পাতাল-কক্ষ বানিয়েছিলেন শুনেছিলুম। বক্সী তার খোঁজ পেয়ে সেখানে গুপ্ত ল্যাবরেটরি করেছিলেন বোঝা যাচ্ছে। মানুষের মাংস থেকে উন্নতজাতের মানুষ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। পাগল আর কাকে বলে? মাঝখান থেকে সাতটা লোকের প্রাণ গেল। ইস্পাতের পোশাক পরে মানুষ চুরি করতেন। গুলি বিঁধবে কেমন করে? তবে ওই চেহারা দেখেই হতভাগা লোকগুলো ভিরমি খেত।'

বিকেলে কর্নেল পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে কিরিবুরু গেলেন পাতাল-ল্যাবরেটরি দেখতে। বক্সীমশাই আইনের চোখে খুনি। তাঁর বিচার হবে। সে যাই হোক, আমি সার্কিট হাউসেই থেকে গেলুম। মানুষের পচা-গলা মাংস দেখতে যাওয়ার ইচ্ছে আমার ছিল না।...

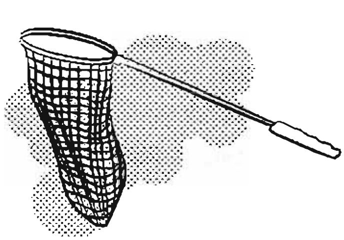

যেখানে কর্নেল

হরিচরণ এবং হরদয়ালের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল মাদ্রাজ মেলের ফার্স্টক্লাস কম্পার্টমেন্টে। আমার বৃদ্ধ বন্ধু কর্নেল নীলাদ্রি সরকার গায়ে পড়ে লোকের সঙ্গে আলাপ জমাতে পারেন বটে! সারাটা রাত্তির গল্প করতে করতেই কাটিয়ে দিলেন।

ট্রেন জার্নিতে ঘুমনো আমার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। তার ওপর ওই বকবকানি আর মাঝে-মাঝে কর্নেলের হা-হা-হা-হা- বিকট অট্টহাসি। কেন হাসছেন, গল্পটাই বা কী, ওপরের বার্থে শুয়ে একটুও ঠাহর হচ্ছিল না আমার। তার চেয়ে বিকট হাসি হরদয়াল নামে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা লোকটির! বিকটই বলছি। কারণ, নাদুসনুদুস গড়নের মধ্যবয়সী এবং প্রচণ্ড গুঁফো কোনও লোকের কণ্ঠস্বর যে অমন মেয়েলি আর ভূতুড়ে হতে পারে, কস্মিনকালে শুনিনি। ভূতুড়ে বলারও কারণ আছে। ভূত-পেরেত নাকি খোনা গলায় কথাবর্তা বলে। হরদয়ালবাবু যদি আড়াল থেকে কথাবার্তা বলেন, দিন-দুপুরে রীতিমতো সাহসী লোককেও আঁতকে উঠতে হবে।

হরিচরণবাবু দেখছিলুম একেবারে উলটো। কথাবার্তা বলছিলেন কম। গড়ন বা চেহারায়, তা ছাড়া পোশাকেও তাঁর সঙ্গীর একেবারে উলটো। লম্বাটে শক্তসমর্থ গড়নের লোক। চিবুকে কুচকুচে কালো দাড়ি এবং দু'পাশে জাঁকালো জুলপি। পরনে প্যান্ট শার্ট। তাঁর কণ্ঠস্বরটিও বেশ গম্ভীর।

প্রথম আলাপেই জানতে পেরেছিলুম আমাদের মতো ওঁদেরও গন্তব্য গোপালপুর অন-সি। কলকাতার চৌরঙ্গি এলাকার 'হরিহর এন্টারপ্রাইজেস প্রাইভেট লিমিটেড' নামে দু'জনে মিলে একটি কোম্পানি গড়েছেন। আমদানি-রপ্তানি কারবার করেন। কারবারি জীবনের একঘেয়েমি কাটাতে মাঝে-মাঝে কয়েক দিনের জন্য বেরিয়ে পড়েন। মাদ্রাজ মেল চিল্কা স্টেশনে পৌঁছতে সূর্য উঠিয়ে ছাড়ল। তখন কর্নেলের তাড়ায় আপার বার্থ থেকে নেমে এলুম। হরিচরণবাবুও ওপাশের আপার বার্থ থেকে নামলেন। একটু পরে চা খেতে-খেতে হরিচরণবাবু কর্নেলকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা উঠছেন কোথায়?"

কর্নেল একটু হেসে বললেন, "কিছু ঠিক করে আসিনি। শুনেছি গোপালপুর-অন-সি'তে ট্যুরিস্টদের চেয়ে নাকি হোটেল বা লজের সংখ্যা বেশি। এও শুনেছি, ওখানে সমুদ্রতীরও নাকি বেশ নির্জন আর খোলামেলা।"

হরদয়ালবাবু তাঁর ভূতুড়ে গলায় হিঁ হিঁ করে হেসে বললেন, "অপূর্ব। অপূর্ব! আমরা তো মশাই প্রতি বছর পুজোর ঠিক পরেই ওখানে যাই। বুঝলেন না? কারবারি মগজ ঠাণ্ডা করার জন্য এমন সি-বিচ আর পাব কোথায়?

হরিচরণবাবু বললেন, "সি-ভিউ হোটেলে উঠতে পারেন। আমাদের সঙ্গে মালিকের খুব চেনাজানা আছে। তা ছাড়া এখন নভেম্বরে সব হোটেল তো খালিই পড়ে থাকে। ট্যুরিস্ট সিজন শুরু হবে ডিসেম্বর থেকে।"

হরদয়ালবাবু মাথা দোলালেন। "হ্যাঁ, সি-ভিউ নতুন হোটেল। একেবার মডার্ন ব্যবস্থা। সায়েব-টুরিস্টরা এলে দেখেছি ওখানেই ওঠেন।"

বহরমপুর স্টেশনে পৌঁছতে আটটা বেজে গেল। ট্রেন বেশ খানিকটা লেট করেছে। চারজনে মিলে একটা প্রাইভেট কার ভাড়া করে গোপালপুর-অন-সি'তে পৌঁছতে মাত্র আধঘণ্টা লাগল। মাইল পঁয়ত্রিশেক দূরত্ব। সি-ভিউ হোটেলটি সত্যিই সুন্দর। ম্যানেজার ভদ্রলোক অত্যন্ত অমায়িক

আর হরদয়ালবাবুর সঙ্গে ওঁর ভালরকম চেনা-জানা। চারতলা হোটেলের চারতলাতেই একটি স্যুইট পেয়ে গেলুম আমরা। দক্ষিণ-পূর্ব কোণের স্যুইটটির নম্বর চার। তারই উল্টো দিকে উত্তর-পূর্ব কোণে তিন নম্বর স্যুইটটি হরিচরণবাবু তদ্বিরেই আমাদের ভাগ্যে জুটল। এক মন্ত্রীমশাই নাকি হঠাৎ এসে পড়ার আভাস পাওয়া গেছে। তাই ম্যানেজার একটু ইতস্তত করছিলেন শেষে হরিচরণবাবু রফা করে দিলেন, যদি সত্যিই মন্ত্রীমশাই এসে পড়েন, আমরা অন্য একটি স্যুইটে চলে যাব। হোটেল তো এখন প্রায় ফাঁকা। চারতলার মোট বারোটা স্যুইটের মধ্যে গোটা পাঁচেক স্যুইট ভর্তি আছে।

চারতলার চার নম্বর স্যুইটটি হরিচরণ-হরদয়ালের কলকাতা থেকে বুক করা ছিল। দুই বন্ধু মিলে সেটিতে ঢুকলেন। তিন নম্বরে ঢুকলাম আমরা। ব্যালকনিতে গিয়ে অভ্যাসমতো কর্নেল চোখে বাইনোকুলার রেখে সম্ভবত সামুদ্রিক পাখপাখালি খুঁজতে থাকলেন। আমি দেখতে থাকলুম সমুদ্র। সমুদ্রের বুকে প্রকাণ্ড সব কালো-কালো পাথর মাথা তুলে আছে। সেইসব পাথরের সঙ্গে সমুদ্র যেন খেলা করছে। মাঝে-মাঝে সেগুলোর ওপর এসে আছড়ে পড়ছে। ডুবিয়ে দিচ্ছে। আবার সরে যাচ্ছে। কর্নেলের মতোই হা-হা করে সমুদ্র হেসে উঠছে আর ফেনাগুলো যেন কর্নেলেরই সাদা দাড়ি।

ভাবলুম, এই লাগসই উপমাটি ওঁকে শুনিয়ে দিই। কিন্তু উনি বাইনোকুলার নামিয়ে রেখে গম্ভীর মুখে বললে, "জয়ন্ত, তুমি তো একজন সাংবাদিক। ওদের সম্পর্কে তোমার কাগজে কিছু লেখা উচিত।"

অবাক হয়ে বললুম, "কাদের সম্পর্কে?"

"এখানকার মৎস্যজীবীদের", কর্নেল দুঃখিত মুখে বললেন, "দূরের সমুদ্রে জলটা তত অশান্ত নয়। সেখানে মাছও প্রচুর। কিন্তু লক্ষ্য করো, বিচের কাছাকাছি অনেকটা দূর পর্যন্ত সমুদ্রের কী সাংঘাতিক অবস্থা! ভেবে দ্যাখো, জয়ন্ত, ছোট্ট সব নৌকো নিয়ে এই অংশটা পেরোতে বেচারাদের কী লড়াই না করতে হয়! প্রতিদিন ওরা এই লড়াই করে তবে সামান্য কিছু মাছ ধরতে পারে। ফেরার সময় আবার সেই লড়াই। তাছাড়া দেখতেই পাচ্ছ, সমুদ্রে কতসব পাথরও মাথা উঁচিয়ে আছে। দৈবাৎ ধাক্কা লাগলে নৌকো ভেঙে গুঁড়িয়ে তো যাবেই, ওরাও বাঁচবে না! ওদের এই প্রচণ্ড জীবনসংগ্রামের কথা তোমার লেখা উচিত ডার্লিং। আমরা ডাইনিং টেবিলে বসে যখন বিশেষ-বিশেষ সামুদ্রিক মাছের সুস্বাদ নিয়ে প্রশংসা করি, তখন কি চিন্তা করে দেখি যে..."

আমার বৃদ্ধ বন্ধুর সারগর্ভ ভাষণে বাধা পড়ল দরজার কলিং-বেলের বাজনায়। গিয়ে দরজা খুলে দেখি, হরিচরণবাবু, একেবারে সমুদ্রস্নানের জন্য তৈরি হয়ে আমাদের ডাকতে এসেছেন। বললেন, "আসুন কর্নেল, সমুদ্রস্নান করে খিদে চাঙ্গা করা দরকার, নইলে ব্রেকফাস্ট জমবে না। জয়ন্তবাবু দেরি করবেন না! পোশাক বদলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। বাই দা বাই আপনারা বাথ-স্যুট সঙ্গে এনেছেন তো? এখানে সমুদ্র কিন্তু বিপজ্জনক।"

কর্নেল একটু হাসলেন, "বাথ-স্যুটের দরকার হবে না হরিচরণবাবু! কারণ, এ-বেলা আমি সমুদ্রে নামছি না। তবে জয়ন্তের কথা আলাদা। ইয়াংম্যানরা সমুদ্রের সঙ্গে লড়তে ভয় পায় না। কী বলো ডার্লিং?"

ঝটপট বললুম, "আমার একটুতেই ঠাণ্ডা লেগে যায়।"

হরিচরণ হাসতে হাসতে বললেন, "সমুদ্রের জলে ঠাণ্ডা লাগার ভয় নেই। আসুন না, নুলিয়া পাওয়া যাবে। পুরীর সমুদ্রে কি কখনও স্নান করেননি?"

আমাকে টেনে ঘর থেকে বের করলেন হরিচরণবাবু। টের পেলুম, ভদ্রলোকের গায়ের জোর আছে বটে! কর্নেলও বেরোলেন। করিডোরে দাঁড়িয়ে বললেন, "হরদয়ালবাবু স্নান করতে যাবেন না? নাকি আমার মতোই জলকাতুরে মানুষ?"

হরিচরণবাবু বললেন, "যা বলছেন! ওকে টেনে ওঠাতে পারলুম না বিছানা থেকে। দাঁড়ান, আবার চেষ্টা করে দেখি।"

উল্টোদিকে চার নম্বর স্যুইটের দরজা উনি ফাঁক করে ডাকলেন, "হর, ও হর, স্নান না-ই বা করলে। অন্তত বিচে বসে আমাদের স্নান করা দেখবে। সমুদ্র দেখলে খিদে বাড়বে হে, রাক্ষসের মতো খেতে পারবে!"

দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলুম, খাটে হরদয়ালবাবু চিত হয়ে শুয়ে আছেন। মাথার ওপর একটা হাত। এই অবস্থায় শুয়ে থেকেই সেই ভূতুড়ে কণ্ঠস্বরে বললেন, "আরে ট্রেন-জার্নির ধকল সামলে নিতে দাও আগে। বরং দুপুরের দিকে দেখব।"

হরিচরণ সহাস্যে বললেন, "তুমি তো বরাবর এখানে এসে আগে স্নান না করে ব্রেকফাস্ট করতে না! এবার হলটা কী?" বলে কর্নেলের দিকে ঘুরলেন। "আমার ফ্রেন্ড, বুঝলেন তো, বড্ড খামখেয়ালি! গত বছর ও আমাকেই টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে ছেড়েছিল। সত্যি বলতে কী, এখানকার সমুদ্রকে আমারও বড্ড ভয় করত। ওর পাল্লায় পড়েই সে-ভয়টা কেটে যায়।"

কর্নেল ডাকলেন, "হরদয়ালবাবু কি অসুস্থ বোধ করছেন? ও হরদয়ালবাবু!"

হরদয়াল সেইরকম মেয়েলি এবং খোনা গলায় জবাব দিলেন, "আরে না, না, আপনারা যান না, আমি দুপুরে স্নান করব'খন।"

হরিচরণ রাগ করে দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে বললেন, "ছেড়ে দিন। ও বরাবর ওইরকম একগুঁয়ে!"

হোটেল থেকে বেরিয়ে সি-বিচে নামার সময় কর্নেল বললেন, "হরদয়ালবাবুর টনসিলের গণ্ডগোল আছে। কাল রাত্রে সে নিয়ে আলোচনা করছিলুম। উনি বললেন, দু'বার অপারেশন করিয়েও কিছু হয়নি।"

হরিচরণ বললেন, "আসল গণ্ডগোল থাইরয়েড গ্ল্যান্ডে। ডাক্তারদের মতে, ওই গ্ল্যান্ডে অপারেশন না করলে গলার স্বর বদলাবে না, তাছাড়া ক্রমশ বডিটাও আরও মোটা হয়ে যাবে। কিন্তু সার্জারিতে হর-র বড্ড আতঙ্ক। দুবার যে টনসিল অপারেশন করিয়েছিল, সে একরকম আমারই চেষ্টায়। বড্ড জেদি ও।"

সমুদ্রের বিচ ভাটার সময়ও তত কিছু চওড়া নয়। খানিকটা ঢালুও। আমাকে টানাটানি করে হরিচরণ সমুদ্রে নামাতে পারলেন না। কর্নেল বিচে বসে বাইনোকুলারে লাইটহাউস কিংবা অন্য কিছু দেখতে থাকলেন। হরিচরণ ভাল সাঁতারু নিঃসন্দেহে। একদল কাচ্চাবাচ্চাও ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাঁতার কাটতে থাকল। ছোট্ট ছেলেমেয়েগুলো মৎস্যজীবী বস্তির। এখন থেকেই ওরা এমনি করে এই সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই শুরু করে। ভবিষ্যতের বড় লড়াইয়ের জন্য তৈরি হয়। কর্নেল ঠিকই বলেছেন, এদের কথা 'দৈনিক সত্যসেবক' পত্রিকায় আমার লেখা উচিত।

কিছুক্ষণ পরে কর্নেল সবে উঠে দাঁড়িয়েছেন, বিচের ওপরদিকের বালিয়াড়ি থেকে প্রায় আছাড় খেতে নেমে এলেন সি-ভিউ হোটেলের সেই ম্যানেজার ভদ্রলোক। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, সর্বনাশ হয়েছে স্যার! হরদয়ালবাবু খুন হয়েছেন।" বলে সাঁতারু হরিচরণের উদ্দেশে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতো হাত ছোড়াছুড়ি এবং লম্ফঝম্ফ করে ডাকাডাকি করতে লাগলেন।

কর্নেল তৎক্ষণাৎ হন্তদন্ত হয়ে বালিয়াড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। বালিয়াড়ি দিয়ে ওঠার সময় তাঁর টুপি খসে পড়ল। প্রশস্ত টাকটি ঝকঝক করে উঠল। কিন্তু টুপির দিকে মনই দিলেন না। অদৃশ্য হয়ে গেলেন বালিয়াড়ির ওধারে।

এতক্ষণে আমায় ঘিলু চাঙ্গা হল এবং আমিও দৌড়ে চললুম। বালিয়াড়ির খাঁজ থেকে কর্নেলের টুপিটি কুড়িয়ে নিয়ে গেলুম।

হরদয়ালবাবুর মাথার পেছনে গুলি করা হয়েছিল। হোটেলের পরিচারক গোবিন্দরাম আমরা বেরিয়ে আসার আন্দাজ মিনিট পনেরো পরে জিজ্ঞেস করতে যায়, ব্রেকফাস্টে কী কী খাবেন বাবুরা। দরজায় তালা দেওয়া ছিল না। প্রথমে সে কলিং বেলের বোতাম টেপে। তারপর সাড়া না পেয়ে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে। সে হরিচরণকে বেরোতে দেখেছিল। কাজেই সে জানত, হরদয়ালবাবু ভেতরে আছেন। বাথরুমে আছেন ভেবেই সে অপেক্ষা করেছিল। শেষে অধৈর্য হয়ে দরজা খোলে এবং হরদয়ালবাবুকে চিত হয়ে শুতে থাকতে দ্যাখে। বাবুর সাড়াশব্দ না পেয়ে তার সন্দেহ হয়। তখন সে ওঁর দিকে ঝুঁকে কপালে হাত রাখে। কপাল ভীষণ ঠাণ্ডা ছিল। তারপর তার চোখে পড়ে বালিশের ওপর রক্তের ছোপ। মাথার পেছন দিকটা থেকে সামান্য একটু রক্ত গড়িয়ে এসে বালিশে ছোপ ফেলেছিল।

পুলিশ এসে যথারীতি মৃতদেহ বহরমপুর শহরের মর্গে নিয়ে গেল। সবাইকে তন্নতন্ন জেরা করে বিবৃতিও লিখে নিয়ে গেল। হরিচরণ বন্ধুর শোকে কাঁদতে-কাঁদতে পুলিশের গাড়িতে বহরমপুর চলে গেলেন। সেখান থেকে ট্রাংকল করে হরদয়ালের আত্মীয়স্বজনকে খবর দেবেন।

হরিচরণের মুখেই আমরা জানতে পেরেছিলুম, হরদয়ালের অ্যাটাচিকেসে প্রচুর টাকা ছিল। সেটা উধাও হয়ে গেছে।

পুলিশের গাড়িতে উনি চলে যাওয়ার পর আমাদের স্যুইটে ফিরে কর্নেলকে বললুম, "আপনার সঙ্গে আর কোথাও যাচ্ছি না। যেখানে আপনি, সেখানেই খুনখারাপি। ব্যাপারটা কী?"

কর্নেল একটা চাপা শ্বাস ছেড়ে বললেন, "ব্যাপার তত কিছু গুরুতর নয়।"

অবাক হয়ে বললুম, "গুরুতর নয়? কী বলছেন! যে-হোটেলে এভাবে খুনে চোর-ডাকাত ঢোকে, সেই হোটেলে আমার আর একটুও থাকতে ইচ্ছে করছে না!"

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন, "সাড়ে-এগারোটা বাজে। ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়নি। চলো, দেখি, ক্যান্টিনে একটু সকাল-সকাল লাঞ্চ পাওয়া যায় কি না।"

সূর্যাস্তের পরও কর্নেল ও আমি সি-বিচে গিয়ে বসে আছি, সেই সময় পিছনের বালিয়াড়িতে কয়েকটি ছায়ামূর্তি ভেসে উঠল। ডান দিকে বিচের মাথায় কতকগুলো পাথরের ভাঙাচোরা বাড়ি। খুব পুরনো আমলের বাড়ি। ছায়ামূর্তিগুলো বালিয়াড়ি থেকে সোজা না নেমে সেই ভাঙা বাড়িগুলোর ভেতর ঢুকে পড়ল। অমনি ভয় পেয়ে চাপাস্বরে বলে উঠলুম, "কর্নেল, নির্ঘাত চোর ডাকাতের দল!"

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, "আমরা তো ব্যবসায়ী নই। টাকাকড়ি-ওয়ালাও নই। চোর-ডাকাত লোক চেনে ডার্লিং!

"তাহলে ওরা কারা?"

"যারাই হোক, আমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই।"

একটু পরে সমুদ্রের ভেতর থেকে লাফ দিয়ে উঠল ঝলমলে এক বিশাল লাল-হলুদ রঙের গোলা। ওটা যে চাঁদ, বুঝতে সময় লাগল। তারপর পিছন থেকে কে গম্ভীর স্বরে বলে উঠল, "কর্নেলসায়েব নাকি?"

কর্নেল ঘুরে বললেন, "হরিচরণবাবু? আসুন, আসুন। কখন ফিরলেন বহরমপুর থেকে?"

"এইমাত্র," বলে হরিচরণ এসে আমাদের পাশে বসলেন।

কয়েক মিনিট চুপচাপ থাকার পর ফোঁস ফোঁস করে নাক ঝেড়ে ভাঙাগলায় বললেন,

"আপনি কী বলবেন বলছিলেন, তাই চলে যাওয়ার আগে দেখা করতে এলুম।"

কর্নেল আমাকে ভীষণ চমকে দিয়ে বললেন, "আচ্ছা হরিচরণবাবু, আপনি কি প্রেতাত্মা বিশ্বাস করেন?"

হরিচরণও চমক-খাওয়া গলায় বললেন, "কেন বলুন তো?"

কর্নেল বললেন, "আমি অনেকদিন যাবৎ তন্ত্রসাধনা করেছি। প্রেতাত্মাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। আপনার বন্ধু হরদয়ালবাবুর আত্মার সঙ্গে যদি আপনি বাক্যালাপ করতে চান করতে পারেন। ডাকব তাঁকে?"

হরিচরণ বললেন, "এ-কথা বলতেই ডেকেছিলেন কি?"

কর্নেল জবাব না দিয়ে ডাকলেন, "হরদয়ালবাবু, আপনার বন্ধু এখানে উপস্থিত আছেন। কিছু বলার থাকলে বলুন ওঁকে।"

সামনে সমুদ্রের প্রচণ্ড আলোড়ন এবং সেই আলোড়নের মধ্যে ফিকে জ্যোৎস্নার রং দুলছে। ঝকমক করছে। যেন এক বিশাল অলৌকিক দৃশ্যের সামনে বসে আছি। আর সেই অলৌকিকতাকেও তুচ্ছ করে দিয়ে ভেসে এল হরদয়ালবাবুর ভূতুড়ে কণ্ঠস্বর, "কী হরি, এখনও কী করছ এখানে? শিগগির কলকাতা চলে যাও। আমার তো ছেলেপুলে নেই। এখন তোমারই সব। হরিহর এন্টারপ্রাইজের একচ্ছত্র মালিক হতে অসুবিধেও নেই।"

হরিচরণ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "এই চালাকির অর্থ কী?"

কথাটা বললেন কর্নেলকে। জবাব এল হরদয়ালের প্রেতাত্মার কাছ থেকে। "চালাকি তুমিও কম জানো না হরি, ও কী পালাচ্ছ কেন? আরে শোনো, শোনো।"

হরিচরণ সত্যি পালাচ্ছিলেন। আমি তো হতভম্ব হয়ে বসে আছি। হঠাৎ ডান দিকের সেই ভাঙা পাথুরে বাড়িগুলো থেকে একঝাঁক টর্চের আলো এসে পড়ল এবং একদল ছায়ামূর্তি ঘিরে ধরল হরিচরণকে। তখন বুঝতে পারলুম, সেই ছায়ামূর্তিগুলো পুলিশ। হরিচরণকে গ্রেফতার করছে।

কর্নেল বললেন, "কী ডার্লিং, বোবা হয়ে গেলে যে?"

বললম, "কিচ্ছু মাথায় ঢুকছে না।"

কর্নেল হাসলেন, "স্রেফ ভেন্ট্রিলোকুইজিম! আমি এই স্বর-জাদু বিদ্যাটি সম্প্রতি শিখেছি। যাই হোক, হরদয়ালের মাথার পিছনে সাইলেন্সার-লাগানো পিস্তল দিয়ে গুলি করে মেরে হরিচরণ ওঁকে বিছানায় শুইয়ে রেখেছিল। আমরা ওঁদের স্যুইটের দরজার ফাঁক দিয়ে ওঁকে দেখেছিলুম ঠিকই। তখন আসলে উনি মৃত। কিন্তু এই হরিচরণ ভেন্ট্রিলোকুইজিমে খুব পাকা। বিশেষ করে হরদয়ালবাবুর টলসিলের ত্রুটি থাকায় হরিচরণের সুবিধে হয়েছিল। আমাদের সাক্ষী রাখতে চেয়েছিল যে, হোটেল থেকে বিচে আসার সময় আমরা হরদয়ালকে জীবিত দেখেছি, কারণ, ওঁর কথাবার্তা শুনেছি।"

সবকিছু আমি দেরিতে বুঝি। ঝটপট বললুম "বুঝেছি, বুঝেছি।"

কর্নেল বললেন, "এখনও সবটা বোঝোনি। গতরাত্রে ট্রেনে হরদয়ালবাবুর সঙ্গে কথাবার্তার সময় জানতে পেরেছিলুম হরিচরণ একসময় ম্যাজিসিয়ান ছিল। আর আজ সকালে সমুদ্রস্নানে সে এসেছিল পিস্তলটা সমুদ্রে ফেলতে।"

সবুজ বনের ভয়ংকর

কথা বলা বন

মার্চের এক রবিবারের সকালে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের ফ্ল্যাটে অভ্যাসমতো আড্ডা দিতে গিয়ে দেখি, বৃদ্ধ ঘুঘুমশাই অফিসের বড়কর্তার মতো একটা ফাইল খুলে গোমড়ামুখে বসে আছেন। কাছাকাছি বসে ফাইলের বিষয়বস্তু আন্দাজ করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছু ঠাহর করা গেল না। আমার উপস্থিতিও যেন উনি টের পেলেন না।

একটু পরে ওঁর মুখ দিয়ে কী একটা কথা বেরুল। মনে হল 'বঙ্গভঙ্গ' কিংবা এরকম কিছু। কথাটা উনি বিড়বিড় করে আওড়াতে শুরু করলে আর চুপ করে থাকা গেল না। বললাম, 'বঙ্গভঙ্গ তো ১৯৪৭ সালে হয়ে গেছে। এতকাল বাদে ও নিয়ে দুঃখ করার কী আছে?'

কর্নেল আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন এবার। 'ও তুমি এসে গেছ দেখছি ডার্লিং। তোমার কথাই ভাবছিলাম। একটু অপেক্ষা করো। কিছুক্ষণের মধ্যে এক ভদ্রলোক আসবেন এবং তোমার দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার জন্য কিছু মালমশলা তাঁর কাছে পেয়ে যাবে।'

একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, 'আজ আমার ছুটির দিন। খবরের কাগজের জন্য আজ আমার এতটুকু মাথাব্যথা নেই। কিন্তু আপনি হঠাৎ বঙ্গভঙ্গ নিয়ে বিড়বিড় করে মরাকান্নার মতো শোকপ্রকাশ করছিলেন কেন?'

'বঙ্গভঙ্গ?' কর্নেল ভুরু কুঁচকে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েক সেকেন্ড। তারপর জোরে হেসে বললেন, 'না জয়ন্ত। রঙ্গো রঙ্গো। কোহাও রঙ্গো রঙ্গো।'

'তার মানে?'

'স্পিকিং উডস। কথা বলা বন। প্রশান্ত মহাসাগরের পলিনেশীয় এলাকার ছোট্ট দ্বীপ ইস্টার আইল্যান্ডের লুপ্ত ভাষায় কোহাও রঙ্গো রঙ্গো মানে যে বন কথা বলতে পারত।'

এই সময় ষষ্ঠীচরণ এসে খবর দিল, এক সায়েব এসেছেন। তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলেন কর্নেল। তারপর পরিচয় করিয়ে দিলেন আমার সঙ্গে। সায়েবের নাম কাপ্তেন জর্জ ব্যুগেনভিলি। সওদাগরী জাহাজে সারা পৃথিবী চক্কর মেরেছেন। নামটা শুনে বললাম, 'আপনার নামের সঙ্গে কি বুগানভিলিয়া ফুলের কোনও সম্পর্ক আছে?'

সায়েব আমুদে স্বভাবের মানুষ। গড়ন প্রকাণ্ড কুমড়োর মতো। ভুঁড়ি দুলিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'আলবৎ আছে। বুগানভিলিয়া ফুল আসলে পলিনেশীয়। ১৭৬৮ সালে আমার মতো এক কাপ্তেন আঁতোয়াঁ দ্য বুগ্যেঁভিলি ওই এলাকার একটা দ্বীপে এ ফুল আবিষ্কার করেন। ইউরোপে নিয়ে যান। তাঁর নামেই ফুলের নাম চালু হয়।'

কর্নেল যোগান দিলেন, 'উষ্ণ নিরক্ষরেখা অঞ্চলের উদ্ভিদ। নিস্টাজিনিসিয়া গোত্রের প্রজাতি।'

মুচকি হেসে বললাম, 'কর্নেল, আপনার কোহাও রঙ্গো রঙ্গোর সঙ্গে বুগানভিলিয়া ফুল এবং মাননীয় অতিথি কাপ্তেন সায়েবের নামের এই যোগাযোগ সম্ভবত আকস্মিক নয়। তাই না?'

কর্নেল সেই ফাইলটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। কাপ্তেন ব্যুগেনভিলি সেটার দিকে চোখ বুলিয়ে বললেন, 'রাতারাতি জেরক্স কপি তৈরি দেখছি! কর্নেল, আপনার এই উৎসাহ দেখে আমার আশা হচ্ছে, এতদিনে কিওটা দ্বীপের বৃক্ষরহস্য ফাঁস করাটা আর কঠিন হবে না।'

ষষ্ঠীচরণ ট্রেতে কফি রেখে গেল। ওঁরা কফি খেতে খেতে কথা বলছিলেন। আমি ফাইলে চোখ রাখলাম। তারপর যত পাতা ওল্টাই, তত চমক জাগে। একি সত্যি, না নিছক গালগল্প?

"...তিন বছর আগে তাহিতি থেকে অস্ট্রেলিয়া হয়ে ফেরার সময় ইচ্ছা ছিল কিওটা দ্বীপ সম্পর্কে খোঁজখবর নেব। কিন্তু কোকোস দ্বীপপুঞ্জ এলাকা যেন গোলকধাঁধা। তার ওপর উল্টো বাতাস। এগোনো অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। এ দ্বীপপুঞ্জের অবস্থান ভারত মহাসাগরে। অক্ষাংশ ২০ ডিগ্রি, দ্রাঘিমাংশ ৮০ ডিগ্রি। পঞ্চাশ নটিকাল মাইল দূরত্বে পৌঁছতেই হঠাৎ প্রবল দক্ষিণগামী বাতাস আমার জাহাজ 'এনডেভার' কে ঠেলে দিল বিপরীত পথে। চাগোস দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখান থেকে মরিশাস হয়ে কেপটাউন। তারপর ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলাম। লন্ডনে পৌঁছে কিছুকাল মিউজিয়াম এবং লাইব্রেরি টুঁড়ে কিওটা দ্বীপের রহস্য নিয়ে মাথা ঘামালাম...

"সিঙ্গি ট্রিজ! সঙ্গীতকারী বৃক্ষ! কী অদ্ভুত কথা! অসংখ্য নাবিক এই উদ্ভট গল্পে বিশ্বাস করে। নিশ্চয় কানের ভুল। গাছপালার ফাঁক দিয়ে বাতাস বইলে অনেক সময় গানের সুর বলে ভুল হতে পারে। কিন্তু ঐতিহাসিক দলিলপত্রে দেখলাম, কিওটার গাছগুলো নাকি কথাও বলতে পারে।

"আমার এবারকার অভিযান আন্টার্কটিকায়। নাবিকদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও চাগোস থেকে দক্ষিণে না এগিয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে কোকোসের দিকে এগিয়েছিলাম। কাল সন্ধ্যায় কিওটার এক মাইল দূরে নোঙ্গর বেঁধেছি আমার 'রেজিলিউশান' জাহাজকে। ২৪ নভেম্বর কেপটাউন ছেড়েছি। আজ ১২ ডিসেম্বর। আবহাওয়া চমৎকার নাতিশীতোষ্ণ এখানে। সকালে একটা বোট নিয়ে তিনজন দ্বীপের দিকে এগিয়ে গেলাম। চমৎকার বেলাভূমি। ডাঙায় পৌঁছেই আমার যা অভ্যাস—বন্দুক ছুড়লাম একবার। তারপর ইউনিয়ন জ্যাক পুঁতে দিলাম। সমুদ্রপাখিরা কলরব করে উড়ে গেল। নিশ্চয় দ্বীপটাতে মানুষ বাস করে না। তাহলে বন্দুকের শব্দ শুনে তারা ছুটে এসে ভিড় করত। ডাক্তার স্মিথকে বললাম, 'চলুন তা হলে।' ডাঃ স্মিথ কান খাড়া করে কী শুনছিলেন। বললেন, 'কে যেন চিৎকার করে কিছু বলল।' হাসতে হাসতে উঁচু জায়গাটাতে উঠে গেলাম। আমার পেছনে ডাঃ স্মিথ আর দু'জন সশস্ত্র নাবিক। সামনে ঘন জঙ্গল। বিশাল উঁচু সব অপরিচিত গাছ। স্বীকার করছি, গাছগুলো দেখে কেমন গা ছমছম করছিল। যেন তারা প্রাণীর মতো সচেতন এবং আমাদের নিঃশব্দে লক্ষ্য করছে। সেই গাছপালার ভেতর দিয়ে কয়েক পা এগিয়েছি, ঠিক যেন বাতাসের শব্দে শনশন করে কোথায় একদল মানুষ ইংরেজি ভাষায় গর্জন করে উঠল 'স্টপ ইট।... স্টপ ইট।'

"নিশ্চয় কানের ভুল। তারপর আর কোনও ভূতুড়ে আওয়াজ আমি শুনিনি। কিন্তু নাবিকরা আর এক পা বাড়াতে রাজি নয়। তারা আমাকে অগ্রাহ্য করে বোটে গিয়ে বসে রইল। ডাঃ স্মিথ আর আমি সতর্কভাবে ছোট্ট দ্বীপটা দুপুর পর্যন্ত ঘুরলাম। জনপ্রাণীটি নেই। ফেরার সময় ডাঃ স্মিথ বললেন, একবার যেন কাদের অস্পষ্ট ফিসফিস কথাবার্তা শুনেছেন। ভদ্রলোক বড় কল্পনাপ্রবণ।...

"এখন রাত দশটা। রেজিলিউশন দক্ষিণ মহসাগরে ভেসে চলেছে আন্টার্কটিকার দিকে। কিওটা দ্বীপের ব্যাপারটা গাছপালার মর্মরধ্বনি ছাড়া আর কিছু নয়। আমার ধারণা, 'স্টপ ইট' কথাটা কানের ভুল, সম্ভবত কাঠঠোকরা জাতীয় পাখি শুকনো কাঠে ঠোকরাচ্ছিল এবং তা থেকেই ওই আওয়াজ। বিদ্রোহী নাবিক দু'জনকে শাস্তি দিয়েছি। পাঁচ ঘা বেত এবং ২৪ ঘন্টা অনাহারের শাস্তি। ডাঃ স্মিথ একটু আগে বলে গেলেন, ওদের গায়ে নাকি সবুজ রঙের অদ্ভুত অ্যালার্জি বেরিয়েছে। সবকাজেই ওঁর বাড়াবাড়ি।—" —ক্যাপ্টেন টমাস কুকের লগবুক। 12. 12. 1772

* * *

"কীলিং (Keeling) দ্বীপপুঞ্জে প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর ফসিল খুঁজতে যাওয়ার সময় দ্বীপের এক বৃদ্ধ আমাকে কিওটা নামে অদ্ভুত একটা দ্বীপের কথা বলে। সেটা নাকি মাইল ষাটেক দক্ষিণে। সেই দ্বীপের গাছগুলো নাকি কথা বলে। অবান্তর ব্যাপার। সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু 'বিগল' জাহাজের ক্যাপ্টেন রবার্ট ফিট্জরয় বদরাগী মানুষ। এমনিতেই আমার কাণ্ডকারখানা দেখে ক্রুদ্ধ

হয়ে আছেন। তাঁকে যদি বা রাজি করাতে পারি, নাবিকদের পারব না। কিওটার কথা শুনেই তারা বলেছে, ওই ভূতের দ্বীপ অসম্ভব!' শেষ পর্যন্ত তাই কিওটা যাওয়া হল না। মনে ক্ষোভ রয়ে গেল।"

—চার্লস ডারউইন, এইচ এম এস বিগল 23. 2. 1835

* * *

"উদ্ধারপ্রাপ্ত নাবিকের নাম জন হিক্স। তাকে মানসিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সে ভারত মহাসাগরে জাহাজ ডুবি হয়ে একটা দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানে গাছপালা কথা বলে। তাকে খাদ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল একটা গাছ। হিক্সের বিবৃতির সময় প্রখ্যাত বিজ্ঞানী রিচার্ড হোম উপস্থিত ছিলেন। তিনি কোনও মন্তব্য করেননি। হিক্স আরও একটা অদ্ভুত কথা বলে। একটা গাছের সঙ্গে তার নাকি বিয়েও হয়েছিল। ডাক্তারদের মতে লোকটি উন্মাদ রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। তবে ব্রিটিশ জাদুঘরের কিউরেটারে ডঃ ফক্স বলেছেন, খ্রিস্টপূর্ব একহাজার অব্দে ফিনিসীয় নাবিকদের প্যাপিরাসে লেখা যে লগবুক আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে গর্জনকারী গাছের কথা আছে। কোনও সমুদ্রে একটি দ্বীপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তারা সেই ভৌতিক গর্জন শুনতে পেত। তাই দ্বীপে নামার সাহস পেত না। ডঃ ফক্স আরও বলেছেন, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে লেখা গ্রিক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস সঙ্গীতকারী বৃক্ষের কথা বলেছেন। চৌদ্দ শতকে বিখ্যাত পর্যটক মার্কো পোলো লিখেছেন, ভারত মহাসাগরের একটি দ্বীপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গভীর রাত্রে তাঁরা সেখানে কোলাহল শুনতে পান। জাহাজ দ্বীপের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সারারাত আশ্চর্য সব শব্দ শোনেন। সকালে পোলো বোটে করে দ্বীপটিতে পৌঁছন। কিন্তু আর একপা এগোতে পারেননি। প্রচণ্ড ঝড় শুরু হয় এবং হাজার হাজার মানুষ যেন তাঁকে গর্জন করে এগোতে নিষেধ করে। পোলো লিখেছেন, গাছগুলো থেকেই ওই গর্জন ভেসে আসছিল। বোটে ফিরে গেলে, আশ্চর্য ব্যাপার ঝড়টা তক্ষুনি থেমে যায়।..."

—দি ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড, লন্ডন 7. 9. 1981

* * *

"...কোহাও রঙ্গো রঙ্গো। কথা বলা বন। প্রশান্ত মহাসাগরের পলিনেশীয় এলাকার ছোট্ট দ্বীপ ইস্টার আইল্যান্ডে বিশপ জোসেন নামে এক খ্রিস্টীয় যাজক গত শতকে একটি পুঁথি আবিষ্কার করেন। তাঁর লিপির সঙ্গে সিন্ধুসভ্যতার লিপির আশ্চর্য মিল। মেতোরো নামে তাঁর স্থানীয় এক ভৃত্য পুঁথিটি পড়ে অনুবাদ করে দেয়। এই পুঁথির নাম 'কোহাও রঙ্গো রঙ্গো'। এটি ইস্টার দ্বীপের আদিম অধিবাসীদের ধর্মীয় পুরাণ। এতে আছে এক অদ্ভুত বনের কাহিনী—যার গাছগুলো কথা বলতে পারত। তাদের উপাস্য দেবতার নাম ছিল রাঙ্গেতিয়া। তিনি আকাশের দেবতা। তাঁর আশীর্বাদে গাছপালা কথা বলত মানুষের ভাষায়। বিশপ জোসেনের ধারণা, সেই কথা বলা বন বহু বছর আগে নির্মূল হয়ে গেছে কোনো কারণে।"

—ইস্টার আইল্যান্ডের রহস্য : ই ডলফার, পৃষ্ঠা 5

"প্যারিস ২০ জানুয়ারি—সম্প্রতি প্রখ্যাত অভিযাত্রী ক্যাপ্টেন জর্জ ব্যুগেনভিলি তাঁর সপ্তদশ নৌ অভিযানে আন্টার্কটিকা যাওয়ার সময় ঝড়ের মুখে পড়েন। জাহাজ ডুবে যায়। লাইফবোটের সাহায্যে ভাসতে ভাসতে সাত দিন পরে কোকোস দ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপে ওঠেন। ক্যাপ্টেন ব্যুগেনভিলি জনহীন দ্বীপ থেকে গাছ কেটে ভেলা তৈরি করে সমুদ্র পাড়ি দেন। একমাস পরে কীলার দ্বীপে পৌঁছন। তিনি সেই নির্জন দ্বীপ সম্পর্কে এক অদ্ভুত বিবরণ দিয়েছেন। সেখানে নাকি গাছপালা মানুষের মতো কথা বলতে পারে।..."

—রয়টার

ফাইল থেকে মুখ তুলে জর্জ ব্যুগেনভিলির দিকে তাকালাম। সায়েব মিটিমিটি হাসছিলেন।

উদ্ভিদের গোপনকথা

আমার বৃদ্ধ বন্ধুকে ইদানীং ক্যাকটাস এবং অর্কিড-জাতীয় উদ্ভিদ নিয়ে কী সব বিদঘুটে ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে দেখতাম। একদিন গিয়ে দেখি, হেড-ফোন মাথায় এঁটে বসে আছেন এবং একটা অ্যামপ্লিফায়ার যন্ত্রের নব ঘোরাচ্ছেন। একটা অদ্ভুত আকৃতির নধর ক্যাকটাসের গায়ে পিন ফুটিয়ে রেখেছেন। পিনের মাথায় সূক্ষ্ম তামার তার বাঁধা। তারটা আরও একটা ক্ষুদে যন্ত্রের ভেতর দিয়ে এসে অ্যামপ্লিফায়ারে পৌঁছেছে। ক্ষুদে যন্ত্রটা জারে তরলপদার্থের ওপর ভাসছে। তারপর অবাক হয়ে দেখি, উনি চোখ বুজে থিরথির করে কাঁপতে লাগলেন। অমনি ভাবলাম, এই রে! বুড়ো নির্ঘাৎ তড়িতাহত হয়ে পড়েছেন।

যেই না মনে হওয়া, দৌড়ে গিয়ে মেন সুইচ অফ করে দিলাম। হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরে এসে রুদ্ধশ্বাসে বললাম, 'কর্নেল! কর্নেল! আপনি সুস্থ তো?'

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার গর্জন করে উঠলেন, 'শাট আপ ইউ ফুল!'

কস্মিনকালে ওঁর কাছে এমন ধমক খাইনি। আমি তো থ! একটু পরে অভিমান দেখিয়ে বললাম, 'বা! এই আপনার কৃতজ্ঞতাবোধের নমুনা! ইলেকট্রিক শক খেয়ে থিরথির করে কাঁপছিলেন। এতক্ষণে অক্কা পেয়ে যেতেন। বাঁচিয়ে দেওয়াটা বুঝি অন্যায় হল? ঠিক আছে এবার খাবি খেতে দেখলেও মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব—তবে না আমার নাম জয়ন্ত!'

কর্নেল তখন ফিক করে হেসে ফেললেন। 'উত্তেজিত হয়ো না ডার্লিং! তোমার কোনও দোষ নেই। ষষ্ঠীচরণ! ও ষষ্ঠি!' ভৃত্য ষষ্ঠীচরণ পর্দা তুলে মুখ বের করলে বললেন, 'মেন সুইচটা অন করে দাও। আর শোনো, ঝটপট আমার তরুণ বন্ধুর জন্যে কড়া করে কফি বানাও। আমিও খাব।'

শান্ত হয়ে বসলে বললেন, 'জয়ন্ত! ওই মেক্সিকান ক্যাকটাসের সঙ্গে আমি একটু বাতচিত করছিলাম।'

অবাক হয়ে বললাম, 'বলেন কী!'

'হ্যাঁ ডার্লিং! আচার্য জগদীশ বোসের যুগান্তকারী আবিষ্কারের পর অনেকগুলো দশক কেটে গেল। এখন বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন,—উদ্ভিদের শুধু সুখদুঃখের অনুভূতি নয়, সাড়া দেওয়ার শক্তি আছে। সেই সাড়া দেওয়াটাকেই বলব উদ্ভিদের ভাষা। ভাষাটা কিন্তু শব্দ দিয়ে নয়, কম্পন দিয়ে তৈরি। বিভিন্ন স্তরে সূক্ষ্ম-অতিসূক্ষ্ম কম্পনে তার কথা প্রকাশ পায়। এই ক্যাকটাসটা সবে কথা বলতে শুরু করেছিল এবং আমিও তার ভাষায় জবাব দিচ্ছিলাম—হঠাৎ তুমি এসে সবটাই ভেস্তে দিলে।'

হাসতে হাসতে বললাম, 'আপনাকে হিস্টিরিয়া রোগীর মতো কাঁপতে দেখছিলাম। কী আশ্চর্য! ওভাবেই বুঝি গাছপালার সঙ্গে কথা বলতে হয়?'

কর্নেল জারে ভাসমান ক্ষুদে যন্ত্রটা দেখিয়ে বললেন 'এটা একটা গ্যালভানোমিটার। তুমি লাই-ডিটেক্টর যন্ত্রের কথা জানো—যা অপরাধী সত্য বলছে, না মিথ্যে বলছে, ধরিয়ে দিতে পারে। এটা তারই একটা অংশ। এর ভেতর একটুকরো গ্র্যাফ-পেপার আছে এবং একটা সূক্ষ্ম পেন্সিলের শিস আছে। গত শতকের শেষভাগে ভিয়েনার এক ধর্মযাজক ফাদার ম্যাক্সিলিয়ান হেল এর উদ্ভাবক। পরে ইতালীয় বিজ্ঞানী লুইজি গ্যালভানি প্রাণীজ বিদ্যুৎ আবিষ্কার করে যন্ত্রটা আরও উন্নত করেন। তাঁর নামে যন্ত্রটার নাম দেওয়া হয় গ্যালভানোমিটার। আরও পরে ইংরেজ বিজ্ঞানী স্যার চার্লস হুইটস্টোনের আবিষ্কৃত বিদ্যুৎ সার্কিট হুইটস্টোন ব্রিজ পদ্ধতি কাজে লাগানো হয়েছে। তবে...'

বাধা দিয়ে বললাম, 'কিচ্ছু বুঝব না। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম না।'

'তা হলে গাছের পাতা নিয়ে ব্যাকস্টার নামে এক বিজ্ঞানীর পরীক্ষার কথা শোনো! তিনি অসংখ্য পরীক্ষার পর বলেছিলেন, উদ্ভিদেরা চক্ষু ছাড়াই দেখতে পায়—মানুষ যতটা দেখতে পায়,

তারও বেশি। উদ্ভিদের যেন মন আছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, সে এই বিশাল প্রাণীজগতের অন্যতম শরিক এবং সে সব প্রাণীর মনের কথা টের পায়।'

'সেই ব্যাকস্টার সায়েব বলেছেন এ কথা?' আমি হাঁদারামের মতো তাকিয়ে বললাম। 'সর্বনাশ! যখন আপনার বাসায় আসি, ওইসব বিদঘুটে গড়নের উদ্ভিদগুলোকে দেখে মনে মনে কত হাসি এমনকী, একদিন আপনার পরীক্ষিত ওই অষ্টাবক্র ক্ষুদে উদ্ভিদটিকে দেখিয়ে যেদিন ষষ্ঠীচরণকে বলছিলাম, ব্যাটা যেন সার্কাসের ক্লাউন! ওরে বাবা! তা হলে তো ও বেজায় রাগ করছিল আমায় ওপর।'

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, 'এই যে এখন তুমি এসেছ এবং তার কথাবার্তায় বাধা দিয়েছ, এতে ও কি ক্রুদ্ধ না হয়ে পারে?

'কাছে গেলে প্যাঁক করে কাঁটা ফুটিয়ে দেবে বুঝি?

'তা হয়তো দেবে না। কিন্তু তুমি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রোড থেকে বিকিরণ বেড়ে গিয়েছিল এবং গ্যালভানোমিটার কাঁপছিল। একমিনিট। গ্রাফটা বের করি।'

কর্নেল ক্ষুদে যন্ত্র থেকে একটুকরো কাজ বের করে দেখালেন। অসংখ্য আঁকাবাঁকা রেখা জটিল হয়ে আছে দেখলাম। বললাম, 'এই বুঝি ওর রাগের ভাষা?"

কর্নেল আমার তামাশায় কান না দিয়ে বললেন, 'এই কাগজটার নাম পলিগ্রাফ। বিখ্যাত ব্যাকিস্টার এক্সপেরিমেন্টের সূত্র ধরে আমি এই জটিল রেখাগুলোকে বিশ্লেষণ করতে পারি। এগুলো কোড ল্যাঙ্গেয়েজ অর্থাৎ সাংকেতিক ভাষা। কোডগুলোকে শ্রেণীবদ্ধ করে অর্থোদ্ধার করা সম্ভব। যাই হোক, আপাতত কফি খাও। তারপর দুই বিজ্ঞানী স্যাক্স রোমার এবং বুলওয়ার লিটনের গরীক্ষার গল্প বলব। সে আরও বিচিত্র ঘটনা। তাঁরা আমেরিকার নিউ জার্সিতে একটা কারখানার কাছে খুন হওয়া একটি মেয়ের খুনিকে ধরিয়ে দিতে পেরেছিলেন!'

'আপনার মতো তাঁরা শখের গোয়েন্দাও ছিলেন বুঝি?'

'না, জয়ন্ত। ওঁরা নিছক বিজ্ঞানী। পদার্থ এবং জীববিদ্যার চর্চা করতেন। যেখানে মেয়েটি খুন হয়েছিল সেখানে ছিল একটা বুনো আপেল গাছ। গাছটাই ধরিয়ে দিয়েছিল খুনিকে।'

'চেঁচিয়ে বলেছিল পাকড়ো! পাকড়ো!'

'তামাশা নয়, ডার্লিং! এটা বাস্তব ঘটনা। একটুকরো পলিগ্রাফ আর একটা গ্যালভানোমিটার, একটা ইলেকট্রোড—ব্যস! এ তিনটি জিনিস গাছটার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে লোক জড়ো করা হয়েছিল গাছটার সামনে। একবার করে পাতা ছুঁয়ে যেতে বলা হয়েছিল প্রত্যেককে। তারপর দেখা গেল, একজনের ছোঁয়ার পর পলিগ্রাফে গাছটা তীব্রভাবে সাড়া দিয়েছে। কম্পনরেখা বিশ্লেষণ করে বোঝা গেল, সেই লোকটাই খুনি।'

সেদিন কর্নেল সারাবেলা এইসব উদ্ভুট্টে কথাবর্তা বলেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, 'জয়ন্ত, তুমি ই এস পি কথাটা কি শুনেছ?'

'শুনেছি। এক্সট্রা সেনসরি পার্সেপসন। অর্থাৎ অতিরিন্দ্রিয় অনুভূতি।'

'উদ্ভিদের মধ্যে ই এস পি অধুনা সুপ্রমাণিত। তারা এমন জিনিস দেখতে পায় এবং বুঝতে বা জানতে পারে—যা আমরা দেখতে পাই না ও জানি না। ডার্লিং! আচার্য জগদীশ বসু যেখানে শুরু করেছিলেন, সেখান থেকে একালের সব উদ্ভিদ বিজ্ঞানীর হাতেখড়ি। তোমার এত বেশি অবাক হওয়ার কারণ নেই। তামাশা করাও শোভা পায় না। আচার্য জগদীশচন্দ্র এই কলকাতারই মানুষ ছিলেন। তুমি কি তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা শোনোনি?'

এই সব শোনার পর থেকে কর্নেলের বাসায় যখনই গেছি, ওঁর লালিত-পালিত উদ্ভিদ মশাইদের প্রতি সসম্ভ্রমে দৃষ্টিপাত করেছি। এমনকী একটা ক্যাকটাসকেও বলেছি, 'হ্যাল্লো লিটলবয়! হাউ ডু ইউ ডু!'

কর্নেলের সঙ্গে গল্প করতে করতে হঠাৎ চোখ গেছে ড্রয়িং রুমের কোনায় রাখা কয়েকটা টবের গাছের দিকে। অমনি বুকটা ধড়াস করে উঠেছে, যেন ক্যাটক্যাট করে তাকিয়ে আমাকে দেখছে—

মনের ভেতর কী যেন পেঁচানো মতলব পোষা!

স্বীকার করছি, গাছপালা অর্থাৎ উদ্ভিদ সম্পর্কে বুড়ো ভদ্রলোকটি আমার দৃষ্টিভঙ্গি আমূল বদলে দিয়েছিলেন যেন। রাস্তায় যেতে যেতে গাড়ি থামিয়ে কোনও বিশাল গাছের দিকে তাকিয়ে থেকেছি অবাক চোখে। তারপর মনে মনে বলেছি, 'হ্যাল্লো জেন্টলম্যান! ভাল আছেন তো?' যেন মনে হত, বৃক্ষভদ্রলোক একটু করুণ হেসে বলছেন, 'খুব ভাল নয় মশাই! সি এম ডি এর হালচাল দেখে বড় তটস্থ আছি। কিছু বলা যায় না।'

ঠিক এমনি করে চৌরঙ্গীতে টাটা বিল্ডিংয়ের সামনে একটা সুন্দর নাদুসনুদুস গড়নের বৃক্ষভদ্রলোক আমাকে ফিসফিসিয়ে বলেছিলেন, 'দিনকাল ভাল না। আজ আছি, কাল নেই অবস্থা।'

'সে কী! কেন বলুন তো?'

'ওরা আসছে। পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। হাতে হাতে কুড়ুল। পেছনে পেল্লায় আর্থ এক্সক্যাভেটার গাড়ি!'

'কারা? কারা?'

'আবার কারা? পাতাল রেলের লোকেরা। আপনাদের মানুষ জাতটার ঠেলায় আমরা মশাই চিরকাল অস্থির। কোণঠাসা করতে করতে আমাদের শেষ করে ফেললেন প্রায়। বুঝবেন শেষে ঠ্যালাটা—যখন দেশটা মরুভূমি হয়ে যাবে।'

সেই রবিবার কর্নেলের ঘরে জর্জ ব্যুগেনভিলির সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর এই সব কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। কোকোস দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত কিওটা দ্বীপের উদ্ভিদরহস্য আমাকে প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছিল। 'কোহাও রঙ্গো রঙ্গো'—কথা বলা বন তা হলে সত্যি আছে পৃথিবীতে?

তা হলে সেখানে যেতে এতদিন বাধা কী ছিল বিজ্ঞানীদের? দ্বীপটা যখন সবাই চেনে তখন যায়নি কেন কেউ? আমার এসব প্রশ্ন শুনে ব্যুগেনভিলি বলেছিলেন, 'সমস্যা হল দ্বীপটা ঠিক কোথায় কেউ জানে না। কোকোস দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত দ্বীপ বলা হয় বটে, কিন্তু যতবারই ওখানে অভিযাত্রীদল গেছে, দুই দ্বীপপুঞ্জে তেমন কোনও অদ্ভুত দ্বীপ দেখতে পায়নি।'

'কিন্তু আপনি গিয়েছিলেন!'

'হ্যাঁ। কিন্তু সে তো ভাসতে-ভাসতে দৈবাৎ গিয়ে পড়েছিলাম। উদ্ধার পাওয়ার পর জাহাজ নিয়ে গিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজে সেটাকে আর আবিষ্কার করতে পারিনি। এটাই আসল রহস্য।'

'তা হলে কোকোস দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত বলা হয় কেন?'

'ওখানকার আদিম অধিবাসীরা দাবি করে, কিওটা তাদেরই প্রতিবেশী। প্রাচীন যুগে তাদের রাজার রাজধানী ছিল ওই দ্বীপে। কিন্তু মুশকিল হল, ৮০° দ্রাঘিমাংশ এবং ২০° অক্ষাংশে ছোটবড় দ্বীপের সংখ্যা প্রায় এক হাজারেরও বেশি। বারো হাজার বর্গমাইল জুড়ে ছড়িয়ে আছে তারা। মাত্র দুটো দ্বীপে বসতি আছে—বাকিগুলো জনহীন। কারণ সব দ্বীপই মানুষের বসবাসের অযোগ্য। অস্বাস্থ্যকর এবং মারাত্মক পোকামাকড়ের ডিপো। সে সব দ্বীপে যে যাবে, সাংঘাতিক ভাইরাসে সে সংক্রামিত হয়ে জটিল অসুখে মারা যাবে।'

'আপনি কি কর্নেলকে নিয়ে কিওটা দ্বীপ খুঁজতে বেরুনোর উদ্দেশ্যেই এসেছেন?'

জয়ঢাক সায়েব হাসির মাঝে ঘর কাঁপিয়ে বললেন, 'তা ছাড়া আর কী? কর্নেল সরকার আমার পুরনো বন্ধু! 'উদ্ভিদের গোপন কথা' নামে ওঁর একটা প্রবন্ধ পেয়েই ছুটে এসেছি কলকাতায়।'

কাত্তি ! কাত্তি!

এপ্রিলের এক ঝরঝরে বৃষ্টিধোয়া বিকেলে কোকোসের ৭২নং দ্বীপ রুবি আইল্যান্ডে পৌঁছে মনে হচ্ছিল একি স্বর্গে এলাম? এ দ্বীপ যেন প্রকৃতি নিজের হাতে যত্ন করে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছেন। কত ফুল কত পাখি কত প্রজাপতি!

কর্নেলের আবার প্রজাপতির পেছনে ছুটোছুটির বাতিক আছে। কিন্তু আশ্বস্ত হয়ে লক্ষ্য করলাম, উনি জর্জ ব্যুগেনভিলির সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলতে ব্যস্ত। 'সামোয়া' এই দোতলা হোটেলের নাম। দক্ষিণের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করছিলাম। অদূরে সাদা বালিতে ঢাকা বেলাভূমি। ভারত মহাসাগরের ব্যাকওয়াটার এখানে বেশ শান্ত ও ভদ্র। কারণ মাইলখানেক দূরে দ্বীপটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কোরাল রিফ বা প্রবাল-পাঁচিল। পাঁচিলে জায়গায় জায়গায় ভাঙন আছে। সেই ভাঙন দিয়ে সমুদ্রের জল গর্জন করতে করতে ব্যাকওয়াটারে ঢোকামাত্র শান্ত হয়ে যাচ্ছে।

দীর্ঘ জার্নিতে আমি ক্লান্ত। কলকাতা থেকে বিমানে জাকার্তা। জাকার্তা থেকে সামরিক বাহিনীর ছোট্ট একটা বিমানে এই রুবি দ্বীপে পৌঁছেছি। সরকার কিওটা-রহস্য নিয়ে বরাবর মাথা ঘামান। তাই সবরকম সাহায্য তাঁদের কাছে পাওয়া যাবে।

কফি এবং একজাতীয় সামুদ্রিক মাছের কেক খাওয়ার পর কর্নেল জয়ঢাক সায়েবকে নিয়ে কোথায় যেন বেরুলেন। বলে গেলেন, ঘন্টা দুই পরে ফিরব। তুমি ইচ্ছে করলে বিচে ঘোরাঘুরি করতে পারো—কোনও ভয় নেই। রুবি খুব নিরাপদ জায়গা।'

আমার আঁতে লাগল। আমি বুঝি ভীতু মানুষ? ওঁরা সরকারি স্টেশনওয়াগন গাড়িতে রওনা হয়ে গেলে আমিও বেরিয়ে পড়লাম। উঁচু-নিচু সুন্দর পাহাড়ি রাস্তায় ওঁদের গাড়িটা গাছপালার আড়ালে চলে গেল। একানড়ের মতো নিচে গিয়ে দাঁড়ালাম।

বিচে মানুষজন খুবই কম। নারকেল বীথির পাশে দাঁড়িয়ে আছি। তারপর দেখি, একটা বোর্ডে কয়েকটি ভাষায় লেখা আছে, 'সাবধান! সামনে বিপদ। আর এগোবেন না।'

আমি তো হকচকিয়ে গেছি। বিপদ! কিসের বিপদ? হঠাৎ আমার কয়েক ইঞ্চি তফাতে গদাম করে একটা নারকেল পড়ল। ওমনি বিপদটা টের পেয়ে গেলাম। ওই প্রকাণ্ড ঝুনো নারকেল আমার মাথায় পড়লে এখনই অক্কা পেতে হত!

রাগ হল। কর্নেল যে বলে গেলেন, খুব নিরাপদ জায়গা! নারকেল গাছগুলো থেকে অনেকটা দূরে গিয়ে বিচে বসে পড়লাম। সামনে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। দূরের প্রবাল-পাঁচিলটা ঝলমল করছে। আদিবাসীদের নৌকা কালো হয়ে ভেসে আছে কোথাও। ওরা হয়তো বেলা শেষে মাছ ধরতে বেরিয়েছে!

পায়ের শব্দে ঘুরে দেখি, একজন বুড়োমানুষ। তোবড়ানো গাল, চিনাদের মতো মুখ বেঁটে—কিন্তু কাঠামোটি চওড়া। তার মাথায় নীল টুপি দেখেই বুঝলাম, লোকটা জাহাজি। একটু হেসে সে বলল, 'স্পিক ইংলিশ?'

কিছুক্ষণের মধ্যে আলাপ হয়ে গেল। বুড়ো একজন প্রাক্তন তিমিশিকারি। নাম রাজাকো। বাড়ি ছিল একসময় বান্দুং-এর ওদিকে একটা ছোট্ট শহরে। এখানে এখন সে স্থায়ী বাসিন্দা। বুড়ো হয়ে আর তিমিশিকারে যেতে পারে না। কাছাকাছি সমুদ্রে আজকাল তিমি মেলে না এবং শিকারেও কড়াকড়ি আছে। তিমি শিকারে যেতে হলে সুদূর দক্ষিণে আন্টার্কটিকার তুষার অঞ্চলে পাড়ি জমাতে হবে। অগত্যা সে মাছের কারবারে মন দিয়েছে।

রাজাকো বুড়োকে আমার খুব ভাল লাগছিল। আলাপী মানুষ। তিমিশিকারের মারাত্মক সব গল্প বলল। শেষে বলল, 'তুমি বুঝি বেড়াতে এসেছ এদেশে?'

বললাম, হ্যাঁ। কতকটা তাই তবে...'

আমাকে হঠাৎ থামতে দেখে রাজাকো বলল, 'ব্যবসা-ট্যবসা করারও ইচ্ছে আছে বুঝি? সে তো ভালই। তোমার মতো জোয়ান ছেলের কি শুধু টো টো করে দেশবিদেশ ঘুরে বেড়ালে চলে? এই দেখো না! আমার যদি তোমার মতো একটা ছেলে থাকত, তাকে আমি এক্ষুনি আমার মাছধরা জাহাজে চাপিয়ে দক্ষিণ সাগরে তিমি মারতে পাঠাতাম। একটা ছোটখাটো তিমি মারতে পারলেই রাজা। প্রচুর চর্বি আর হাড় বেচে একদিনেই সে ধনী হয়ে যেত।'

রাজাকোর বেশি কথা বলার বাতিক আছে। বললাম, 'না না। ব্যবসা আমার পোষাবে না। আমি এসেছি সরকারের একটা কাজে।'

রাজাকো ভড়কে গিয়ে বলল, 'ওরে বাবা। তুমি সরকারি লোক? তা হলে তো তোমার সঙ্গে আমার বনবে না। সরকারি লোকেরা বড্ড বাজে।'

বলেই সে উঠে দাঁড়াল। তারপর হনহন করে চলতে শুরু করল! অদ্ভুত বেয়াড়া লোক তো!

সন্ধ্যার ধূসরতা ঘনিয়েছে ততক্ষণে! একটু-একটু করে শীত করছে। প্রবাল-পাঁচিল ঘিরে কুয়াশা জমে উঠেছে। নারকেল বনটার পাশ দিয়ে রাজাকো হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে। আমিও উঠে দাঁড়ালাম। ভাবলাম, ওর ভুলটা ভাঙিয়ে দেওয়া দরকার।

কিন্তু কয়েক পা এগোতেই একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেল। নারকেল বনের ভেতর থেকে দুটো লোক এসে রাজাকোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর দেখলাম রাজাকো পড়ে গেল। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম মাতৃভাষায় 'এই! এই! খবর্দার!'

লোক দুটো আমাকে দেখামাত্র নারকেল গাছের ভেতর দিয়ে পালিয়ে গেল। দৌড়ে রাজাকোর কাছে গিয়ে দেখি, সে মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছে। তাকে চিত করে দিতেই আমার সারা শরীর আতঙ্কে হিম হয়ে গেল। তার পেটে ছোরা মেরেছে আততায়ীরা। রক্তে জামাপ্যান্ট ভেসে যাচ্ছে।

বিচ এখন একেবারে জনহীন। আমার সবচেয়ে আতঙ্ক হল এই ভেবে যে, এখন এ অবস্থায় আমাকে কেউ দেখলে আমাকেই খুনি ঠাওরাবে। পুলিশের হাঙ্গামায় পড়তে হবে। অতএব এখনই কেটে পড়া দরকার। বরং হোটেলে গিয়ে ম্যানেজারকে খবর দেওয়া ভাল যে বিচে একটা রক্তাক্ত লাশ পড়ে থাকতে দেখেছি। তারপর ওরা যা হয় করবে।

উঠে দাঁড়িয়েছি, সেই সময় রাজাকো ঘড়ঘড়ে গলায় অতিকষ্টে উচ্চারণ করল, 'কাত্তি! কাত্তি!' তারপর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ওর শরীরটা স্থির হয়ে গেল।

কী বলল কে জানে! কাত্তি! কী? আমি আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালাম না। এমন হতে পারে, ওর দুই খুনিই এতক্ষণে খবর দিয়েছে যে একজন বিদেশি টাকা ছিনতাইয়ের লোভে রাজাকোকে খুন করেছে!

আমি পা বাড়াতেই শক্ত কিছুতে পা পড়ল। দেখি রাজাকোবুড়োর সেই নীল টুপিটা ছিটকে পড়ে রয়েছে। কিন্তু টুপিটা এত শক্ত ঠেকল কেন? হেঁট হয়ে টুপিটা তুলে নিলাম। তারপর অবাক হয়ে গেলাম। এতটুকু একটা চুপির ওজন এত। নিশ্চয় এর ভেতর কোনও ভারী ধাতব জিনিস আছে।

টুপিটা সঙ্গে সঙ্গে প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে ফেললাম। তারপর অনেকটা ঘুরে বিচ এলাকা পেরিয়ে হোটেলে পৌঁছলাম। রিসেপশনের ইন্দোনেশীয় মেয়েটি মিষ্টি হেসে বলল, 'কেমন লাগল আমাদের মিস রুবিকে?'

সে এই রুবি দ্বীপের প্রশংসা শুনতে চাইছিল। কিন্তু এ অবস্থায় হাসিতামাশা করা অসম্ভব। বললাম, 'দেখুন, এইমাত্র বিচ থেকে আসছি। বিচে একটা লোক পড়ে আছে দেখলাম। ডাকলাম সাড়া দিল না। অন্ধকারে কিছু বোঝা গেল না। মনে হল...'

'নিশ্চয় কোনও মাতাল ট্যুরিস্ট।'

'তবু একটু খোঁজ নেওয়া দরকার নয় কি?'

মেয়েটি হাসতে হাসতে বলল, আপনি ভাববেন না মিস্টার! বিচে এমন মাতাল পড়ে থাকা খুব স্বাভাবিক ঘটনা। আমাদের গা সওয়া। লোকটা যদি ট্যুরিস্ট না হয় তা হলে নিশ্চয় কোনও নাবিক। নাবিক যদি হয়, তা হলে আগামীকাল সূর্য ওঠার আগে ওর নেশা কাটবে না। ওকে ওঠানোও যাবে না।'

আমার বিবেকে বাধছিল। বললাম, 'বরং পুলিশে খবর দিন না মিস...'

'আমার নাম তোতিলাবতী ত্রিসত্যজায়া।'

'এ যে ভারতীয় নাম!'

'ইন্দোনেশিয়া অঞ্চলে আপনাদের সংস্কৃত ভাষার ছড়াছড়ি মিস্টার।...'

'আমার নাম জয়ন্ত চৌধুরি।'

'মিঃ চৌড্রি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

অদ্ভুত ব্যাপার তো! তোতিলাবতী ধরেই নিয়েছে আমি একটা বেহুঁশ মাতালকে দেখেছি। অগত্যা আর না বলে পারলাম না। 'মিস তোতিলাবতী...'

'আমায় তোতি বলে ডাকলে খুশি হব।'

'মিস তোতি! লোকটার গায়ে রক্ত আছে মনে হল। ওকে কেউ ছুরি মেরেছে!'

তোতি এবার চোখ বন্ধ করে বলল, 'তাই বুঝি! তা হলে তো আগে কাউকে দেখতে পাঠাতে হয় ; তা না হলে পুলিশে খবর দিয়ে ঝামেলা হবে।' বলে সে হোটেলের একজন লোককে ডেকে নিজের ভাষায় কিছু বলল। লোকটা আর একজনকে ডেকে নিয়ে টর্চ হাতে বেরিয়ে গেল।

ওপরে আমাদের ঘরে এসে টুপিটা বের করলাম। তারপর একটা ব্লেড দিয়ে চিরতেই বেরিয়ে পড়ল একটুকরো স্যাঁতলাধরা তামার ফলক। ফলকটা চাপরাসের মতো গোলাকার! তার ওপর আঁকাবাঁকা আঁচড় কেটে দুর্বোধ্য অক্ষরে কী সব লেখা রয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে আকৃষ্ট করল ফলকের ঠিক মাঝখানে একটা অদ্ভুত গড়নের গাছ। গাছটার ডালে-ডালে ইংরেজিতে এ বি সি ডি এইসব অক্ষর আঁকা।

মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছিলাম না। কতক্ষণ পরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। তারপর কর্নেল ও ব্যাগেনভিলি ফিরলেন। ঘরে ঢুকে কর্নেল বললেন, 'বিচে একটা রক্তাক্ত লাশ পেয়েছে পুলিশ। জয়ন্তকে আমি বলেছিলাম দ্বীপটা নিরাপদ। কথাটা খাটল না দেখছি।' বলেই কর্নেলের চোখ পড়ল আমার হাতের ফলকটার দিকে। শ্বাসরুদ্ধ গলায় বললেন, 'এ তো দেখছি কাত্তি। কাত্তি তুমি কোথায় পেলে জয়ন্ত?'

ব্যাগেনভিলি লাফিয়ে উঠলেন। 'কী আশ্চর্য! এ যে দেখছি একটা কাত্তি!'

রাজাকোর মেয়ে রোমিলা

কর্নেলের এই স্বভাব বরাবর দেখে আসছি। একসময় ঝানু শখের গোয়েন্দা হিসেবে নামডাক ছিল। খুনি আর অপরাধীর পেছন পেছন ছুটতে পেলে আর কোনওদিকে ফিরে তাকাতেন না। পরিচিত মহলে ওঁকে জনান্তিকে বলা হত 'বুড়ো ঘুঘু।' ইদানীংকালে পোকামাকড়-গাছপালা অর্থাৎ প্রকৃতিচর্চায় মেতে থাকলেও গোয়েন্দাগিরির সুযোগ পেলে ছাড়তে রাজি নন।

রাজাকো-হত্যার রহস্য নিয়ে যে মেতে উঠবেন, জানাই ছিল। আমার কাছে ঘটনাটা জেনে নিয়ে সেই যে বেরিয়ে গেলেন, রাত দশটা বাজতে চলল—ফেরার নাম নেই। বৃষ্টিটা হঠাৎ এসে হঠাৎ চলে গেছে। এ তল্লাটের আবহাওয়াই এরকম।

জর্জ ব্যুগেনভিলির সঙ্গে কথা বলছিলাম। তার কাছে জানা গেল, 'কাত্তি' কথাটার মানে ফলক। পর্তুগিজ ভাষার শব্দ এটা। কিন্তু কাত্তি কথাটার মানে ফলক বোঝায় না। এর পেছনে আছে একটা খুব পুরনো রোমাঞ্চকর ইতিহাস। প্রাচীন যুগে যে-সব পর্তুগিজ জলদস্যুনেতা একশোটা বাণিজ্য জাহাজ লুঠের গৌরব অর্জন করত, তারা এই তামার গোলাকার ফলকে নিজের নাম লিখে ঝুলিয়ে রাখত। কিন্তু তার রোমাঞ্চকর অংশটা হল এই :

দস্যুনেতা লুণ্ঠিত ধনরত্নের যে মোটা ভাগ পেত, তা গোপনে কোথাও লুকিয়ে রাখত। সেই গুপ্তধনের সন্ধান সাংকেতিক চিহ্নে খোদাই করে রাখত ফলকে। মৃত্যুর সময় সে ফলকটা দলের পরবর্তী নেতার হাতে তুলে দিত। কিন্তু সাংকেতিক চিহ্নের অর্থ ফাঁস করত না। তার মানে তুমি যখন নতুন নেতা হচ্ছ, তখন তুমিই ওর অর্থ উদ্ধার করে গুপ্তধনের মালিক হও।

জলদস্যুদের অনেকরকম কুসংস্কার ছিল। ফলকটাকে তারা খুব পরিত্র মনে করত। একশোটি জাহাজ যে লুঠ করতে পারেনি, তার সাহস হত না ওটা গলায় পরতে। তাদের বিশ্বাস ছিল, অনধিকারী ওই পবিত্র ফলক পরলে তার সর্বনাশ হবে।

দেখা যাচ্ছে, রাজাকোবুড়ো কোথাও এই রহস্যময় ফলক পেয়ে গিয়েছিল। তাকে খুন করার পিছনে ফলকঘটিত কোনও উদ্দেশ্য আছে কি না কে জানে। এর মধ্যে নাকি সতেরো শতকের দুর্ধর্ষ এক পর্তুগিজ জলদস্যুনেতা আর্ভেলার নাম রয়েছে। ব্যুগেনভিলি পর্তুগিজ ভাষা জানেন। কিন্তু সাংকেতিক চিহ্নগুলির অর্থ উদ্ধার করতে পারেননি।

ব্যুগেনভিলি বললেন, 'বিবর্তনবাদের প্রবক্তা চার্লস ডারউইন এই কোকোস দ্বীপপুঞ্জের উৎপত্তি সম্পর্কে ভারি অদ্ভুত কথা লিখে গেছেন। এটা নাকি লক্ষ বছর আগে ছিল আগ্নেয়গিরি। কালক্রমে জলের তলায় বসে যায়। তারপর অসংখ্য ক্রেটার বা জ্বালামুখ ঘিরে জলের তলায় জমতে থাকে প্রবালকীট। মরা প্রবালকীট আরও লক্ষ বছরে গড়ে তোলে এই সব দ্বীপ। এগুলো আসলে প্রবালদ্বীপ। যাই হোক, এখন সমস্যা হল আদিবাসীদের কিংবদন্তিখ্যাত সেই কিওটা দ্বীপটা কোথায়? হাজারটা ছোট-বড় দ্বীপের সবই কোনও না কোনও সময় অভিযাত্রীরা খুঁজে হন্যে হয়েছেন। শেষে আমিও দৈবাৎ তার সন্ধান পেয়ে হারিয়ে ফেললাম। এই ফলকটা পেয়ে এখন মনে হচ্ছে, তা হলে রাজাকো কি ওটার খোঁজ রাখত?

ব্যুগেনভিলি তুম্বো মুখে পাইপ ধরালেন। আমার মনটা বেজায় খারাপ। কী চমৎকার একজন আলাপী মানুষের সঙ্গে চেনাজানা হল এবং নিজের বুদ্ধির দোষেই হয়তো তাকে এভাবে চিরকালের মতো হারিয়ে ফেললাম। যদি আমার সঙ্গেই সে থাকত, তা হলে তাকে আততায়ীরা আক্রমণের সাহসই পেত না। তা ছাড়া পকেটে আমার গুলিভরা রিভলভারও ছিল।

ব্যুগেনভিলি পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'কাত্তিটার মাঝখানে একটা গাছ আঁকা আছে। কিওটা দ্বীপে অবিকল এইরকম গাছের জঙ্গল দেখেছিলাম।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'সেই গাছগুলোই কি আপনার সঙ্গে কথা বলেছিল?'

'না, না! আমি কি কখনও বলেছি যে আমার সঙ্গে কিওটা দ্বীপের গাছপালার কোনও কথাবার্তা হয়েছে? আসলে আমি তখন একনাগাড়ে জলের ঝাপটা খেয়ে ভীষণ ক্লান্ত। গাছগুলো কথা বললেও জবাব দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। গলার স্বর ভেঙে গিয়েছিল। সে এক সাংঘাতিক অবস্থা।

'তা হলে কি করে বুঝেছিলেন যে সেটাই কিওটা দ্বীপ?' জর্জ ব্যুগেনভিলি একটু হাসলেন। 'সাতরাত্রি দ্বীপে ছিলাম। বেলাভূমির ওপরে একটা পাহাড়ি গুহায় ছিল আমার ডেরা। অনেক রাত্রে হঠাৎ কানে আসত আশেপাশের জঙ্গলে অদ্ভুত সব শনশন শব্দ হচ্ছে। প্রথমে ভাবতাম ঝড়। পরে টের পেলাম, ঝড় নয়—যেন গাছপালা থেকে বাতাসের গলায় কারা কথা বলছে। গিয়ে পরীক্ষা করার সাহস হত না।'

'আপনার কানের ভুলও তো হতে পারে।'

'ভুল নয়। কেন তা বলি শুনুন।' নিভে যাওয়া পাইপ আবার লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে ব্যাগেনভিলি বললেন, 'কিওটাও এমনি প্রবালপাঁচিলে ঘেরা। তা ছাড়া ওটার মাঝখানে একটা ছোট্ট লেক আছে। লেকটা কিন্তু মিঠে জলের। একদিন ব্রেডফুড বা পিঠে-ফল খেয়েছিলাম পেট ভরে। অনেক রাতে জলতেষ্টা পেল প্রচণ্ড। তখন লেকে জল খেতে গেলাম। জল খেয়ে অন্ধকারে ফিরে আসছি, হঠাৎ কেউ কোত্থেকে ফিসফিস করে বলে উঠল, 'অ্যানজেলো! অ্যানজেলো!' আমি হকচকিয়ে গেলাম। তারপর শুনি একসঙ্গে অনেকগুলো কণ্ঠস্বর! অ্যানজেলো! অ্যানজেলো! অ্যানজেলো!'

'তারপর?'

'সাড়া দিয়ে বললাম, কে তোমরা? অ্যানজেলো বলে কাকে ডাকছ? আমার নাম জর্জ ব্যাগেনভিলি! বেশ চেঁচিয়ে কথাটা বলেছিলাম। অমনি সব চুপ করে গেল, তখন আমার অবস্থা শোচনীয়। এ নিশ্চয় ভূতপ্রেতের কাণ্ড! এই অভিশপ্ত দ্বীপ থেকে পালাতেই হবে। সারা রাত আর ঘুম হল না। পরদিন দ্বীপের প্রায় সবটাই খুঁজলাম যদি কেউ আমার সঙ্গে রসিকতা করে থাকে। কিন্তু কোথাও কোনও জনপ্রাণীটি নেই। পাখি বলতে হাঁস আর সারসজাতীয় পাখি আছে। কিন্তু তারা রাত্রিবেলা অমন শব্দ করবে কেন? করলে তো দিনেও করবে—তাই না?'

'ঠিকই বলেছেন।'

ব্যাগেনভিলি একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, 'প্রবালপাঁচিলে ঘিরে থাকায় সমুদ্রে কোনও জাহাজ গেলেও দেখতে পেতাম না। ধরে নিয়েছিলাম ওখানেই রবিসন ক্রুশোর মতো নির্বাসিত জীবন কাটাতে হবে। লাইফবোটটা ফেঁসে গিয়েছিল। একদিন ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একখানে একটা মরচেধরা কুড়ুল কুড়িয়ে পেলাম। এসব কুড়ুলকে বলে, সেলার্স এক্স। এগুলি নিরাপত্তার জন্য সব জাহাজে থাকে। জাহাজডুবির সময় দৈবাৎ কোনও কামরায় কেউ আটকে পড়লে দরজা বা দেওয়াল কেটে তাকে বের করতে এই কুড়ুল কাজে লাগে। কুড়ুলটা পেয়ে বুঝলাম দ্বীপে কোনও নাবিক আশ্রয় নিয়েছিল কোনওকালে। যাই হোক, কুড়ুল দিয়ে গাছ কেটে ভেলা তৈরি করে পাড়ি দিয়েছিলাম।'

'কিওটার গাছপালার যদি মানুষের মতো চেতনা থাকে, তাহলে কুড়ুল হাতে দেখামাত্র আপত্তি করা উচিত ছিল।'

আমার মন্তব্য শুনে ব্যাগেনভিলি গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'তা করেনি। কিন্তু একটা ব্যাপার সত্যি ঘটেছিল। গাছের গায়ে কোপ দেওয়ামাত্র প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল। কিন্তু আমি তো তখন মরিয়া হয়ে উঠেছি। একটা গাছ কুড়ুলের ঘায়ে ধরাশায়ী হওয়ার পর ঝড়টা থেমে গিয়েছিল। তারপর জানেন? যতক্ষণ ধরে ভেলা তৈরি করলাম, মনে হচ্ছিল—সারা বন যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে এবং যেন মাঝেমাঝে শোকসঙ্গীত গাইছে। অবশ্য ঝিঁঝি পোকাদের ডাকও হতে পারে। একজন মরিয়া মানুষের পক্ষে ও ব্যাপারে কোনও কৌতূহল থাকে কি?'

আমরা কথা বলতে বলতে কর্নেল ফিরে এলেন। রেনকোট খুলে রেখে বললেন, 'এখানকার পুলিশের কাজকর্ম ভারি অদ্ভুত! বলে কী এরকম হয়েই থাকে জুয়াড়িদের মধ্যে। রাজাকো লোকটা ছিল পাকা জুয়াড়ি। তা ছাড়া এ বৃষ্টির মধ্যে খুনির খোঁজে বেরিয়ে পড়তে তারা রাজি নয়। সকালে দেখা যাবে।'

ব্যাগেনভিলি বললেন, 'এতক্ষণ কি থানায় বসেছিলেন আপনি?'

'মোটেই না। ড্রাইভারকে বললাম, চলো তো বাছা, আবার একবার ডক্টর বিকর্ণের বাড়ি।'

নাম শুনে বললাম, 'ভারতীয় নাম মনে হচ্ছে। এখানে তা হলে ভারতের লোকও বাস করে?'

'মোটেই না। উনি ইন্দোনেশীয় উদ্ভিদবিজ্ঞানী। তবে তুমি ঠিকই ধরেছ। নামটা সংস্কৃত ভাষায়। ইন্দোনেশীর উচ্চারণে বিয়েকার্নো। প্রাচীনযুগে হিন্দু-সংস্কৃতি সারা দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে প্রভুত্ব করত। একথা তোমার জানা উচিত ছিল, জয়ন্ত।'

ব্যুগেনভিলি বললেন, 'ডঃ বিকর্ণের বক্তব্য কী?'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'রাজাকোকে উনি চেনেন। কাত্তির কথা শুনে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। এক্ষুনি আসতে চান আমার সঙ্গে। বললাম, 'এই বৃষ্টির মধ্যে কষ্ট করা কেন। সকালে আমরা কাত্তি নিয়ে আপনার কাছে আসছি।'

রাতের খাবার টেবিলে ঢাকা দেওয়া ছিল। তিনজনে খেতে বসলাম। প্রকাণ্ড সামুদ্রিক চিংড়ির খোসা ছাড়িয়ে কর্নেল বললেন, 'বলো তো জয়ন্ত, ভেতরের এই সাদা জিনিসটা কী?'

একটু খেয়ে দেখে বললাম, 'নারকেলের দেশ। ভেতরে নারকেলের পুর ভরে দিয়েছে।'

'হল না ডার্লিং। এগুলো চিংড়িরই মাংস!'

'বাজি রাখছি। এ হচ্ছে খাঁটি নারকেল শাঁস।'

কর্নেল হাসতে লাগলেন। ব্যুগেনভিলি বললেন, 'বিচের ধারে গাছ থেকে নারকেল পড়ে অনেক সময় ভেঙে যায়। জোয়ারে সমুদ্র সেগুলো টেনে নেয়। তখন চিংড়িগুলো নারকেল শাঁস খেয়ে ফেলে। তাই এসব চিংড়ির মাংসে নারকেলের স্বাদ।'

সেই অপূর্ব চিংড়ি-নারকেলের স্বাদের তুলনা নেই। তারিয়ে তারিয়ে খেতে দেখে কর্নেল মুচকি হেসে মন্তব্য করলেন, 'শোওয়ার সময় কিন্তু হজ্‌মি ট্যাবলেট খাওয়া দরকার'...

উপদেশ কানে না নেওয়ার ফলটা এ রাতে ভালই ভুগতে হল। শেষ রাতে ব্যুগেনভিলি একটা জব্বর ফরাসি ট্যাবলেট না খাওয়ালে কী ঘটত বলা কঠিন। সকালে যখন ওঁরা দু'জনে ডঃ বিকর্ণের বাড়ি গেলেন, তখন আমি শয্যাশায়ী। মন খারাপ হয়ে গেল। ন'টা নাগাদ উঠে দেখি, শরীর একেবারে ঘায়েল। এমন সময় নিচে থেকে মিস তোতি ফোন করে জানাল, একটি মেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। খুব অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, 'পাঠিয়ে দিন।'

একটু পরে বছর কুড়ি-বাইশের টুকটুকে ফর্সা একটি মেয়ে এসে ভারতীয় প্রথায় নমস্কার করে বলল, 'আমি রোমিলা। মিঃ রাজাকোর মেয়ে।'...

রাজাকোর ঘরে হানা

রোমিলার পোশাকও একেবারে ভারতীয় মেয়েদের মতো। শাড়ি ও ব্লাউজপরা। শুধু খোঁপাটা মাথার মাঝখানে চুড়ো করে বসানো প্রাচীন যুগের মুনিকন্যাদের মতো। গলায় সেইরকম রুদ্রাক্ষের মালা।

আমি হাঁ করে তাকিয়ে আছি দেখে ইংরাজিতে সে বলল, 'আপনি নিশ্চয় অবাক হয়েছেন। আমার হতভাগ্য বাবার নাম রাজাকো বার্দান, কাল যাঁকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে আপনারই সামনে!'

দুঃখিতভাবে বললাম, 'কথাটা ঠিকই মিস রোমিলা! কিন্তু আমার কিছু করার ছিল না। দু'জনের মধ্যে তখন প্রায় অড়াইশো গজ দূরত্ব। তা ছাড়া সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। আমি দৌড়ে যেতে যেতে খুনিরা পালিয়ে যায়।'

রোমিলা বলল, 'না মিঃ চৌধুরি! আমি কোনও অভিযোগ নিয়ে আপনার কাছে আসিনি। এ সামোয়া হোটেলের রিসেপশনিস্ট তোতিলাবতী আমার বন্ধু। তার কাছেই আপনার কথা কাল রাতে শুনেছি। তোতিও খুব পস্তাচ্ছে। সে প্রথমে নাকি আপনার কথায় গুরুত্ব দেয়নি। আসলে বাবার খুবই বদনাম ছিল এখানে।'

'আগে আপনি বসুন প্লিজ।'

রোমিলা বসে বলল, 'আপনার সঙ্গী ভদ্রলোকেরা নিশ্চয় ডঃ বিকর্ণের বাড়ি গেছেন?

'আপনি কীভাবে জানলেন?'

রোমিলা একটু হাসল। 'ডঃ বিকর্ণ যখন জাকার্তার বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক ছিলেন, তখন আমি তাঁর ছাত্রী ছিলাম। উনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। সত্যি বলতে কী, আমারই তাগিদে উনি কোকোসে এসে স্থায়ীভাবে বাড়ি করে বাস করছেন। ওঁকে বলেছিলাম, আমাদের এসব দ্বীপে উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণার প্রচুর সুযোগ আছে। আমি ওঁকে সাহায্য করতে পারি।'

খুব আগ্রহ জাগল রোমিলা সম্পর্কে। বললাম, 'আপনি এখন কী করেন?'

রোমিলা বলল, 'আমার দুর্ভাগ্য মিঃ চৌধুরি! জাকার্তা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় মা মারা যান। বাবা অসহায় হয়ে পড়েন। তাই বাধ্য হয়ে পড়াশুনো ছেড়ে ফিরে আসি এখানে। বাবার একমাত্র সন্তান আমি। ওঁর মাছের কারবার দেখাশোনা করছি এই একটা বছর। এর মধ্যে ডঃ বিকর্ণ রিটায়ার করে চলে আসেন আমার কথামতো। কিন্তু আমি ওঁর কোনও কাজে লাগবার সময়ই আর পাইনি। বাবা উড়নচণ্ডী মানুষ। খালি টো টো করে ঘুরে বেড়াতেন। তাই আমাকে সব দেখাশুনো করতে হয়েছে।'

রোমিলার কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট এবং আচরণ খুব নম্র। বললাম, 'আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভাল লাগল রোমিলা! বিশ্বাস করুন, আপনার বাবার ব্যাপারটাতে...'

কথা কেড়ে রোমিলা বলল, 'বুঝতে পারছি। কিন্তু কীভাবে বাবাকে ওরা খুন করল, আপনার মুখ থেকে জানার জন্যেই এসেছি মিঃ চৌধুরি। রুবি দ্বীপের পুলিশ মাথা ঘামাবে না জানি। বিশেষ করে আমার বাবার জুয়াড়ি মাতাল বলে ভীষণ বদনাম ছিল। আপনি কি দয়া করে কী ঘটেছিল বলবেন?'

পুরো ঘটনা সবিস্তারে বললাম। শোনার পর রোমিলা চাপা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'হুঁ—কাত্তি শব্দটা বাবার মুখে শুনেছি। ঘুমের ঘোরে উচ্চারণ করতেন। পরে জিজ্ঞেস করলে বলতেন ও কিছু না। তা হলে দেখছি, মৃত্যুর মুহূর্তে বাবা কাত্তি শব্দটা উচ্চারণ করেছিলেন! আচ্ছা মিঃ চৌধুরি, কাত্তি জিনিসটা কী?'

ওকে বলিনি যে, রাজাকোর টুপি আমি কুড়িয়ে এনেছিলাম এবং টুপির ভেতরে সত্যি কাত্তি পেয়েছি। বললাম, 'শুনেছি কাত্তি হল প্রাচীন পর্তুগিজ জলদস্যুনেতার তামার পদক। ফলকও বলতে পারেন। যে দস্যুনেতা একশো জাহাজ লুঠ করতে পারত, সে ওই পদক গলায় ঝুলিয়ে রাখত।'

রোমিলার জন্যে ফোনে নিচের ক্যান্টিনে কফির অর্ডার দিলাম। রোমিলা অন্যমনস্ক রইল কিছুক্ষণ তারপর ফের চাপা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'বাবা মারা গেছেন। তাই আপনাকে জানাতে বাধা নেই। ছোটবেলায় মায়ের কাছে শুনেছি, বাবা জলদস্যুদের দলে ছিলেন একসময়।'

উত্তেজনা চেপে রেখে বললাম, 'তাই বুঝি? আমাকে বলছিলেন, তিমিশিকার করে বেড়াতেন আন্টার্কটিকায়।'

'সে অনেক পরে।' রোমিলা হঠাৎ আমার চোখে চোখ রেখে বলল, 'মিঃ চৌধুরি কি বলবেন আপনাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য নিছক বেড়ানো—নাকি অন্য কিছু?'

'কেন এ প্রশ্ন?'

'আপনার সঙ্গীরা কাল বিকেলে ডঃ বিকর্ণের বাড়ি গিয়েছিলেন মিলিটারি গাড়িতে। সকালেও ফের গেলেন দেখলাম। তাই সন্দেহ জাগছে।'

'কিসের সন্দেহ?'

'আমাদের সরকার ডঃ বিকর্ণকে বহুদিন আগে কিওটা নামে এক ভূতুড়ে দ্বীপের স্পিকিং উডস অর্থাৎ কথা বলা বনের রহস্য উন্মোচনের দায়িত্ব দিয়েছেন। ডঃ বিকর্ণ নিজেই আমাকে বলেছেন একথা। উনি সরকারি অর্থসাহায্যে এ নিয়ে রিসার্চ করছেন। আমাকে ওঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট হওয়ার কথা

দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রথম কথা, আমার যোগ্যতা কম। দ্বিতীয় কথা, বাবার মাছের কারবার নিয়ে আমি ভীষণ জড়িয়ে আছি।'

একটু ইতস্তত করে বললাম, 'আপনি বুদ্ধিমতী শিক্ষিতা মেয়ে রোমিলা। আপনাকে বলতে দ্বিধার কারণ দেখি না, আমরা এসেছি কিওটা দ্বীপের খোঁজে।'

রোমিলা ম্লান হাসল। 'কিওটা রূপকথা বা নিছক কিংবদন্তি হতেও তো পারে। ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি এই ভূতুড়ে দ্বীপের কথা। এখানকার আদিবাসীদের লোককথায় কিওটা দ্বীপের গল্প আছে। ওরা তা বিশ্বাসও করে। দু'দিন পরে শুক্লপক্ষ আসছে। চাঁদ দেখা গেলেই ওরা ফুলের পোশাক পরে বন-দেবতার পূজায় মেতে উঠবে। নিছক ধর্মীয় সংস্কার মিঃ চৌড্রি!'

'কিন্তু আপনাদের সরকার তা হলে কেন ডঃ বিকর্ণকে কিওটার রহস্য উন্মোচনের দায়িত্ব দিয়েছেন—যদি এর মধ্যে কোনও সত্য নাই থাকবে?'

'সত্যটুকু কী, বলি শুনুন। বছর দুই আগে একদল জেলে সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছিল। তারা যখন ফিরে এল, তখন দেখা গেল, তারা এক অদ্ভুত রোগে ভুগছে। গায়ের চামড়ার জায়গায় জায়গায় সবুজ অ্যালার্জির মতো চিহ্ন। অবিকল গাছের পাতা আঁকা যেন। হাসপাতালে তাদের ভর্তি করা হল। কিন্তু একে একে সবাই মারা পড়ল। মৃত্যুর পর দেখা গেল প্রত্যেকটি লাশ ঘন সবুজ হয়ে গেছে। সেই থেকে আমাদের সরকার ব্যাপারটা নিয়ে উদ্বিগ্ন।'

'আশ্চর্য! আঠারো শতকে টমাস কুকের জাহাজি লগবুকে সবুজ অ্যালার্জির কথা আছে।'

পরিচারক ট্রেতে কফি রেখে গেল। দু'জনে কফি খেতে থাকলাম। তারপর রোমিলা বলল, বাবা ওদের দেখতে গিয়েছিলেন। বাবার কাছে শুনেছি, কখনও-কখনও এ অঞ্চলে জেলেদের এই অদ্ভুত অসুখ হয়। কেউ বাঁচে না। বাবাও খুব কুসংস্কারগ্রস্ত মানুষ ছিলেন। বলতেন ওরা নিশ্চয় কিওটা দ্বীপে গিয়ে পড়েছিল।'

'তা হলে আপনার বাবাও বিশ্বাস করতেন একথা?'

'বাবার কথা ছেড়ে দিন। নিরলস মানুষ ছিলেন। চিরজীবন সমুদ্রচর। সমুদ্রে যারা ঘোরে, তারা অসংখ্য আজগুবি ব্যাপার বিশ্বাস করে।'

'আচ্ছা রোমিলা, আপনার বাবা কি কখনও কিওটা দ্বীপ খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন?

'হ্যাঁ। বললাম তো, বাবা ছিলেন বেয়াড়া আর বাতিকগ্রস্ত মানুষ। একবার আমাদের জেলেরা মাছ ধরে আনল ট্রলারে। বাবা সেবার সঙ্গে যাননি। হঠাৎ দেখা গেল, একটা মাছের রং সবুজ। বাবার অমনি বাতিক চাড়া দিল। বেরিয়ে পড়লেন ট্রলার নিয়ে সেই এলাকায়। ক'দিন পরে হন্যে হয়ে ফিরে এলেন। সেই সবুজ মাছটা আমি ডঃ বিকর্ণকে দিয়ে এসেছিলাম। ওটা এখনও ওঁর জারে জিয়ানো আছে।'

রোমিলার সঙ্গে গল্প করতে করতে দশটা বেজে গেল। রোমিলাকে বিদায় দিতে দরজার বাইরে গেছি, হঠাৎ সে বলল, 'সময় থাকলে আসুন না আমার ওখানে। না-না। মাছের আড়তে যেতে বলছি না আপনাকে।' সে একটু হাসল। 'আড়তে মাছের গন্ধে টিকতে পারবেন না এক মুহূর্ত। আমার বাড়িতে আসুন। অবশ্য যদি আপত্তি না থাকে!'

'কোনও আপত্তি নেই।' বলে তাকে নিচে রিসেপশনে অপেক্ষা করতে বলে ঝটপট সেজে নিলাম। পকেটে রিভলভার নিতে ভুললাম না।

রোমিলা হাল্কা নীল রঙের একটা টুসিটার ছোট্ট মোটরগাড়ি এনেছিল। হোটেল এলাকা ছাড়িয়ে সমুদ্রের ধারে ধারে সুন্দর রাস্তা দিয়ে এগোল গাড়িটা। যেদিকে তাকাই, রংবেরঙের ফুল। বড় বড় ব্রেডফুডের গাছে তরমুজের মতো ফল ঝুলছে। পামগাছে বাহারি অর্কিডের ঝালর। সমুদ্র ডাইনে রেখে অনেক সবুজ টিলার গা ঘেঁষে এবং চড়াইউতরাই ভেঙে রোমিলাদের বাড়ি পৌঁছলাম। বাড়ি একটা টিলার মাথায়। রাজাকো যে পয়সাওলা লোক ছিল, বোঝা যাচ্ছিল এবার। বাড়িটা ছোট

হলেও বড় সুন্দর। ফলবাগান আর বিচিত্র সব গাছপালার ভেতর ছবির মতো রঙিন বাড়িটা দেখে মনে হল, এর পেছনে যেন শিল্পীর স্বপ্ন রয়ে গেছে। কে সেই শিল্পী—রাজাকো, না তার মেয়ে?

গেটের কাছে গিয়েই রোমিলা বলে উঠল, 'বাড়িতে অতিথি এসেছেন মনে হচ্ছে!'

দেখি, সেই মিলিটারি স্টেশনওয়াগনটা দাঁড়িয়ে রয়েছে লনের পাশে। ড্রইং রুমে ঢুকে রোমিলা বলল, 'কী সৌভাগ্য, কী সৌভাগ্য! আমার ঘরে এত সব গণ্যমান্য অতিথি। আর আমি কি না বাইরে কাটাচ্ছিলাম!'

কর্নেল, ব্যুগেনভিলি এবং একজন অতিবৃদ্ধ ভদ্রলোক কফির পেয়ালা হাতে বসে রয়েছেন। রোমিলা বলল, 'মিঃ চৌধুরি, ইনিই আমার প্রফেসর ডঃ বিকর্ণ, আর এঁরা নিশ্চয় আপনার সঙ্গী!'

ডঃ বিকর্ণ কর্নেল ও ব্যুগেনভিলির পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরস্পর আনুষ্ঠানিক পরিচয়পর্ব শেষ হলে ডঃ বিকর্ণ বললেন, রোমি! এঁদের তোমার কাছে নিয়ে এলাম একটা জরুরি দরকারে। তা ছাড়া তোমার বাবার শেষকৃত্যে পৌঁছতে পারিনি—একটা কৈফিয়ত দেওয়ারও প্রয়োজন ছিল।'

রোমিলা মৃদু স্বরে বলল, 'আপনাকে আসতে তো নিষেধ করেছিলাম রাত্রে!'

বললাম, 'শেষকৃত্য কি রাতেই হয়ে গেছে?'

ডঃ বিকর্ণ বললেন, 'হ্যাঁ। একানকার পুলিশের ব্যাপার এরকম। মর্গে পর্যন্ত নেয়নি বডি।'

'সে কী!'

কর্নেল বললেন, 'যস্মিন দেশে যদাচার। তো জয়ন্ত, তোমার শরীর নিশ্চয় যথেষ্ট সুস্থ?'

রোমিলা ভেতরে চলে গেল। বললাম, 'সুস্থ না হলে এলাম কী করে? মিস রোমিলা গিয়েছিলেন ওঁর বাবার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জানতে। তারপর ওঁর সঙ্গে চলে এলাম।'

একটু পরে রোমিলা ব্যস্তভাবে এসে বলল, 'একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে। এইমাত্র হঠাৎ চোখে পড়ল—পেছনের একটা ছোট্ট ঘরে পুরনো আমলের কিছু জিনিসপত্র বাবা রাখতেন। সেই ঘরের দরজার সেফটি লক ভাঙা। আমার পরিচারিকা এবং অন্য কর্মচারী দু'জন আছে, তারা কেউ কিছু বলতে পারছে না। তাছাড়া বাইরে থেকে বোঝাও যায় না দরজার লক ভাঙা হয়েছে। আমার কুকুর পাঞ্চো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কপাটে আঁচড় কাটছিল। তাই সন্দেহ হল। তখন ঠেলে দেখি, খুলে গেল দরজা। কিছু হারিয়েছে কি না তাও বুঝতে পারছি না।'

ডঃ বিকর্ণ, কর্নেল এবং ব্যুগেনভিলি উঠে দাঁড়ালেন উত্তেজিতভাবে। কর্নেল বললেন, 'চলুন তো দেখি।'...

শত্রুদলের কবলে

ঘরের ভেতর ঢুকে অবাক হয়ে গেলুম। একটা ছোট্ট মেরিন মিউজিয়াম! রোমিলা সুইচ টিপে বাতি জ্বেলে দিলে মনে হল এই জাদুঘর বহুকাল খোলা হয়নি। ঘরে কেমন একটা ঝাঁঝালো গন্ধ। একটা মোটা জানালা আছে। সেটা জাহাজের পোর্টহোলের মতো গোলাকার। কিন্তু আকারে বড়। মোটাসোটা লোহার গারদ আছে। সমুদ্রের মানুষের জীবনের অনেক স্মৃতি ছড়িয়ে রয়েছে চারপাশে। জংধরা নোঙর, কাছির বান্ডিল, নাবিকদের কুঠার, হালের টুকরো, এইরকম সব জিনিস। দেয়ালে পুরনো আমলের জলদস্যুদের ব্যবহৃত বন্দুক পিস্তল তলোয়ার ছুরি আর তিমিশিকারের হারপুন হুকে আটকানো রয়েছে। আর আছে সমুদ্রপ্রাণীদের অসংখ্য স্টাফকরা নমুনা। কতরকমের শঙ্খ, ঝিনুক, কাছিম, হাঙর, বারাকুদা মাছ, তিমির দাঁত এবং আরও কত প্রাণী। সমুদ্র অঞ্চলের কিছু পাখিও স্টাফ করা হয়েছে। দেখে মনে হয় ওরা জীবিত।

কর্নেল বললেন, 'মিঃ রাজাকো দেখছি ট্যাক্সিডার্মি অর্থাৎ চামড়াবিদ্যায় খুব দক্ষ ছিলেন।'

ডঃ বিকর্ণ বললেন, 'এই অ্যালবাট্রস পাখিটাকে দেখুন। যেন ডানা মেলে এখুনি উড়ে যাবে।'

রোমিলার কুকুর পাঞ্চো দেখতে কতকটা বেড়ালের মতো। গায়ে ঘন সাদা লোম। এমন ক্ষুদে কুকুর কস্মিন্‌কালে দেখিনি। সে হঠাৎ রোমিলার কোল থেকে নেমে হাঙরটার কাছে দৌড়ে গেল। এবার দেখলুম, হাঙরটার মুখে একটুকরো ব্যুমেরাং আকৃতির কাঠ আটকানো আছে। পাঞ্চো গিয়েই সেই বাঁকা ছোট্ট কাঠটা কামড়ে ধরে বের করল। রোমিলা বলল, 'আঃ! কী হচ্ছে পাঞ্চো? দুষ্টুমি করে না এখন।'

তারপর ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা। ব্যুমেরাং কাঠটা পাঞ্চোর মুখ থেকে প্রকাণ্ড পোকার মতো নড়াচড়া করতে করতে ছিটকে চলে গেল। পাঞ্চো ভয় পেয়ে রোমিলার পায়ের কাছে গুটিসুটি বসে পড়ল। কর্নেল এগিয়ে গিয়ে কাঠটা তুলেছেন, আবার ওটা কিলবিল করে নড়ে ছিটকে পড়ল। তারপর লাফাতে লাফাতে হাঙরটার মুখের ভেতর ঢুকে পড়ল। আমরা হাঁ করে দেখছিলুম ব্যাপারটা।

ডঃ বিকর্ণ বললেন, 'সর্বনাশ! এ আবার কী প্রাণী?'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'এ যে দেখছি কেঠো পোকা। দেখতে কাঠ, আসলে পোকা।'

ব্যুগেনভিলি কী যেন ভাবছিলেন। এতক্ষণে ব্যস্তভাবে বললেন, 'কী আশ্চর্য! কিওটা দ্বীপে ঠিক এই আজব পোকাই দেখেছিলুম। ঘাসের মধ্যে পড়েছিল। দেখে মনে হয়েছিল ব্যুমেরাং। কিন্তু যেই কুড়িয়ে নিয়েছি, অমনি হাত থেকে ছিটকে চলে গেল। কর্নেল, ডঃ বিকর্ণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস মিঃ রাজাকো কিওটা দ্বীপের সন্ধান জানতেন।'

কর্নেল কোনও জবাব দিলেন না। র‍্যাক থেকে একটা বাঁধানো মোটা খাতা নামিয়ে পাতা ওল্টালেন। তারপর বললেন, 'জাহাজের লগবুক দেখছি। 1912 সালের লগবুক। সান্টা মারিয়া জাহাজ! হুঁ ক্যাপ্টেনের নাম জিয়োভিল্লো সার্ভেন্টিস! পর্তুগিজ মনে হচ্ছে। রোমিলা, তুমি কি কখনও এ ঘরে ঢুকেছ?'

রোমিলা বলল, 'না কর্নেল, বাবা বেঁচে থাকতে কাউকে এঘরে ঢুকতে দিতেন না।'

র‍্যাকের একটা জায়গা দেখিয়ে কর্নেল বললেন,'এখানে ধুলোময়লা নেই—এই চারকোনা অংশটাতে। অথচ র‍্যাকের সবখানে ধুলোময়লা প্রচুর। তার মানে এখানে চৌকো কোনও জিনিস—সম্ভবত আর একটি লগবুক ছিল। চোর সেটাই নিয়ে গেছে।'

রোমিলা ক্ষুব্ধভাবে বলল, 'কে তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে একটা লগবুক নিয়ে গেল, বুঝতে পারছি না। আমার লোকেরা তো সবাই বিশ্বাসী!'

ডঃ বিকর্ণ বললেন, 'তবু ওদের জিগ্যেস করা দরকার।'

কর্নেল বললেন, 'রোমিলা এই লগবুকটা আমি নিয়ে যেতে চাই। দেখা শেষ হলে ফেরত দেব।'

রোমিলা বলল, 'কোনও আপত্তি নেই কর্নেল। ব্যপারটা আমারও জানা দরকার। কেন বাবাকে খুন করা হল, এ ঘরের তালা ভেঙে কেন চোর ঢুকল—সব রহস্য না জানলে শান্তি পাব না।'

ড্রয়িংরুমে ফিরে গেলুম আমরা। রোমিলা তার পরিচারিকাকে ডেকে জাদুঘরের দিকে লক্ষ্য রাখতে বলল। বুঝলুম, কর্মচারীদের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস।

একজন কর্মচারীর নাম বেনিয়া। সে রোমিলার প্রাইভেট সেক্রেটারি। অন্যজনের নাম পিওবের্দেনে। সম্ভবত প্রিয়বর্ধন। বেনিয়া বলল, সে অনেকগুলি চিঠি টাইপ করতে ব্যস্ত ছিল। কিছু লক্ষ্য করেনি। পিওবের্দেনে বা প্রিয়বর্ধন বলল, সে কিচেনে খাবার তৈরি করছিল। সেও কিছু লক্ষ্য করেনি।

লক্ষ্য করার কথাও নয়। ঘরটা পেছনের দিকে। ওপাশে ফুলবাগান ঝোপঝাড়, গাছপালা। কর্মচারীরা চলে গেলে ডঃ বিকর্ণ বললেন, 'তোমার পরিচারিকাকে ডাকো এবার।'

পরিচারিকাটি রোমিলার বয়সী। সে ছেলেবেলা থেকে রোমিলার সঙ্গিনী। নাম মিত্রামা। দেখতে চিনাদের মতো। সে বলল কিচেনে প্রিয়বর্ধনের সঙ্গে কাজ করছিল। তবে পাঞ্চো একবার বসে

তার পায়ে মুখ ঘষেছিল। এটা পাঞ্চোর ভয় পাওয়ার লক্ষণ। মিত্রামা ভেবেছিল, আজও বুঝি সাপটাপ দেখে ভয়ে পেয়েছে পাঞ্চো। এই টিলায় খুব সাপের উৎপাত আছে। মাঝে মাঝে বাগানে চলে আসে, মারাও পড়ে। মিঃ রাজাকো ছিলেন খেয়ালি মানুষ। না হলে এমন জংলা পাহাড়ে কেউ বাড়ি বানাতে চায়?

কর্নেল লগবুক নিয়ে মগ্ন ছিলেন। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'রোমিলা আমি আরেকবার জাদুঘরে যেতে চাই।'

রোমিলা বলল, 'আসুন'।

কর্নেল হন্তদন্ত হয়ে তার সঙ্গে চলে গেলেন। ডঃ বিকর্ণ মুচকি হেসে বললেন, 'ওঁর যাওয়া দেখে মনে হল যেন শিকারের গন্ধ পেয়েছেন।'

আমার প্রাজ্ঞ বন্ধুর প্রশংসার সূত্র পেলেই আমার মুখ খুলে যায়। বললুম, 'ওঁর পক্ষে কিছু অসম্ভব নয়, ডঃ বিকর্ণ। হয়তো দেখবেন, এখনই এসে বলবেন কিওটা দ্বীপের সন্ধান পেয়ে গেছেন।'

ব্যাগেনভিলি বললেন, 'এবং মিঃ রাজাকোর হত্যারহস্যেরও।'

ডঃ বিকর্ণ গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বললেন, 'রাজাকোর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কিওটা দ্বীপের যোগসূত্র আছে বলে মনে হয় না। অবশ্য ওই কাত্তির ব্যাপারটা একটা গোল বাধাচ্ছে। তা হলেও বলব কাপ্টেন ব্যাগেনভিলি, রাজাকোর অনেক শত্রু ছিল। যেমন ধরুন ওঁর মাছের ব্যবসার প্রতিদ্বন্দ্বী কিয়াং। একসময় দু'জনে একই সঙ্গে কারবার করেছেন। দক্ষিণ সমুদ্রে তিমিশিকারেও গেছেন দু'জনে। পরে কী নিয়ে বিবাদ হয়েছিল যেন। তারপর থেকে দ্বীপে দ্বীপে প্রায়ই দুজনের সাঙ্গপাঙ্গরা খুনোখুনি করত পরস্পর। পুলিশ হিমশিম খেত দাঙ্গা থামাতে।'

ক্যাপ্টেন ব্যাগেনভিলি বললেন, 'কিয়াং এখন কী করেন?'

কিয়াং তো এ তল্লাটের সেরা ডুবুরি। ওর একটা স্কুনার (ছোট জাহাজ) আছে! মুক্তো খুঁজে বেড়ায় সমুদ্রের তলায়। সে এখন কোটিপতি লোক। থাকে পাশের দ্বীপে কারো আইল্যান্ডে।'

এইসব কথাবার্তা বলতে বলতে কর্নেল এসে গেলেন রোমিলার সঙ্গে। খুব প্রত্যাশা নিয়ে ধুরন্ধর বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকালুম। এই বুঝি বলে ইউরেকা!

কিন্তু কোথায় কী! আরও তুম্বো মুখে চুপচাপ বসে বড়লেন। রোমিলা বলল, 'আরেকপ্রস্থ কফি বলে আসি।'

সে চলে গেলে কর্নেল বললেন, কিওটার রহস্যময় স্পিকিং উডদের একটুকরো সেরা নমুনা ছিল ও ঘরে। ক্যাপ্টেন সার্ভেন্টিসের এই লগবুকে তার উল্লেখ আছে। ডঃ বিকর্ণ যে জিনিসটা ওঘর থেকে চোর নিয়ে গেছে, সেটা আরেকটা লগবুক নয়। কাঠের তৈরি একটা চমৎকার ভাস্কর্য। আর সে কাঠ কিওটা দ্বীপের গাছের। এই দেখুন, লগবুকে ক্যাপ্টেন সার্ভেন্টিস সেটা এঁকেও রেখেছেন।'

আমরা হুমড়ি খেয়ে পড়লুম। পর্তুগিজ ক্যাপ্টেন ভদ্রলোক অপূর্ব ছবি আঁকতে পারতেন বটে! তবে ভাস্কর্যটি অসাধারণ! সুন্দর এক দেবীমূর্তি। হাতে বীণা কতকটা আমাদের দেবী সরস্বতীর মতো দেখতে। শুধু বাহন হিসেবে কোনও হাঁস নেই, এই যা তফাত। মূর্তিটা চৌকো একটা বেদিতে বসানো ছিল।

কল্পনা করলুম, জনহীন কিওটা দ্বীপে জ্যোৎস্নার ওই রাতে দেবী আপন মনে বীণা বাজাচ্ছেন। তাঁর পায়ের নিচে সমুদ্র সব উচ্ছ্বাস থামিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে শুনছে।

এই সময় ক্যাপ্টেন ব্যাগেনভিলি বলে উঠলেন, 'আশ্চর্য! আমার যেন মনে পড়ছে! অচ্ছন্নতার ঘোরে কিওটার বেলাভূমিতে শুয়ে মধুর বাজনা শুনেছিলুম। তা হলে কি স্বপ্ন নয়?'

'সঙ্গীতকারী বৃক্ষ!' ডঃ বিকর্ণ বললেন, 'এ এলাকায় লোকেরা বংশপরম্পরায় বিশ্বাস করে আসছে সঙ্গীতকারী বৃক্ষের কথা। কিন্তু কোথায় সেই রহস্যময় দ্বীপ?'...

রোমিলার কাছ থেকে এক সময় বিদায় নিয়ে আমরা হোটেলে ফিরলুম। ডঃ বিকর্ণ আমাদের পৌঁছে দিয়ে চলে গেলেন।

লাঞ্চের পর কর্নেল ব্যালকনিতে গিয়ে সেই লগবুক খুলে বসলেন। আমার বরাবর ভেতো বাঙালি-স্বভাবে খাওয়ার পর ঝিমুনি কেটে গেল ফোনের আওয়াজে। অপারেটর বলল, 'কথা বলুন!'

রোমিলার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর কানে এল। 'কর্নেল? আমি রোমিলা। শুনুন কর্নেল...'

'না, আমি জয়ন্ত বলছি। ডেকে দেব কর্নেলকে?'

'দিন না প্লিজ!'

কর্নেলের কানে গিয়েছিল। এসে ফোন ধরলেন। একটু পরে ফোন রেখে হাসলেন। 'ডার্লিং! রোমিলার পরিচারক-কাম-বাবুর্চি সেই প্রিয়বর্ধন বা পিওবের্দেনে হঠাৎ নিপাত্তা হয়ে গেছে।'

'নিশ্চয় সে-ব্যাটাই চোর!'

'তা আর বলতে?' বলে কর্নেল ব্যালকনিতে ফিরে গেলেন।

আমার ফের ঝিমুনি চাপল। অভ্যাস যাবে কোথায়? কখন ঘুমিয়ে গেছি—অথচ কর্নেল পই পই করে দিনে ঘুমোতে নিষেধ করেন। সামুদ্রিক নোনা আবহাওয়ায় দিনে ঘুমুলে নাকি শরীর ফুলে ঢোল হয়ে যায়।

একটা বিকট দুঃস্বপ্ন দেখছিলুম। যেন অথৈ সমুদ্রে পড়ে গেছি আর হাঙর হাঁ করে গিলতে অসছে। ভাগ্যিস ঘুমটা ভেঙে গেল। বহাল তবিয়তে আছি দেখে আশ্বস্ত হলুম।

কর্নেল বেরিয়েছেন কোথায়। একটু রাগ হল। এক সঙ্গে এসেছি। অথচ এমন করে কোথায় কোথায় চলে যাচ্ছেন, আমি একা মনমরা হয়ে ফুলো মুখে বসে থাকছি। কোনও মানে হয়?

নিচের রেস্তোরাঁয় চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

আজ বন্দর এলাকা দেখতে ইচ্ছে করছিল। বাজার ছাড়িয়ে একটু পুবে এগিয়ে গেলে ডক। অসংখ্য জেটি। তেমনি ছোট বড় জাহাজ। কোনও-কোনও জেটিতে সার সার মোটরবোট, লঞ্চ, স্টিমারও রয়েছে। লোকজন সে-তুলনায় কমই।

আজ বিকেলে আকাশ পরিষ্কার। সমুদ্রের জল রাঙা। নীল টুপিপরা নাবিকরা হল্লা করছে। একটা জেটিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলুম। সেখানে একটা ছোট্ট জাহাজ—যাকে স্কুনার বলা হয়, ভিড়ে রয়েছে। সংকীর্ণ ডেকে চেয়ার পেতে বসে বেশ লম্বা চওড়া একটা লোক বই পড়ছিল। সে হঠাৎ ঘুরে আমাকে দেখতে পেল। একটু হেসে মাথাটা সম্ভাষণ সূচকভঙ্গিতে দোলাল। তখন ভদ্রতা করে আমি বললুম, গুড আফ্‌টারনুন মিস্টার!' লোকটা রাজাকোর মতোই দেখছি গায়ে পড়া। সম্ভাষণের প্রত্যুত্তর দিয়ে সে রেলিংয়ে ভর করে দাঁড়াল। বলল, 'মশাই স্থানীয় লোক নন নিশ্চয়?'

'না। আমি ভারতীয়।'

'নিশ্চয় ব্যবসায়ী?'

'না। পর্যটক।'

'আমার নাম ক্যারিবো। মশায়ের নাম?'

ছোট্ট ডেকে বসে চা খেতে খেতে তার সঙ্গে গল্প করছি, পেছনের কেবিন থেকে কেউ বেরিয়েই আমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। প্রচণ্ড চমকে উঠলুম। আরে! এ তো সেই রোমিলার কর্মচারী প্রিয়বর্ধন!

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, 'আপনি প্রিয়বর্ধন না? রোমিলার বাড়িতে আপনাকে দেখেছি।'

প্রিয়বর্ধন খিকখিক করে হাসল। 'কে প্রিয়বর্ধন? আমার নাম অ্যানথুপা পিদ্রু।'

ক্যারিবো ভুরু কুঁচকে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। বললুম, 'আশ্চর্য তো?'

ক্যারিবো একটু হাসল। 'চেহারার এমন মিল হতেই পারে। একবার চিনে গিয়ে সব চীনাকে আমার একই লোক মনে হত।'

কিন্তু এ ভুল আমার হতেই পারে না। জেদ করে বললুম, 'না মিঃ ক্যারিবো! ইনি তিনিই বটে। কারণ মিঃ রাজাকোর বাড়িতে আজ সকালে এঁকে দেখেছি। একটু আগে শুনলুম, উনি নিপাত্তা হয়েছেন...'

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই প্রিয়বর্ধন আমার ওপর আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি এর জন্য তৈরি ছিলুম না! শক্ত ডেকের ওপর বেকায়দায় পড়ে গেলুম। প্রিয়বর্ধন আমার বুকে বসে চেঁচিয়ে উঠল, 'ক্যারিবো! এ ব্যাটা সরকারি গুপ্তচর। এর মুখ বন্ধ করতে হবে। শিগগির!'

ক্যারিবো চাপা গলায় কাদের ডাকল। আমি যথাসাধ্য লড়ে যাচ্ছি, কিন্তু আরও দু'জন বেঁটে হিংস্র চেহারার লোক কেবিন থেকে বেরিয়ে এল। ক্যারিবো বিকৃত মুখে বলল, 'একে বেঁধে নিচে নিয়ে এস।'

নাইলনের মজবুত দড়িতে আমাকে ওরা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল। তারপর ধরাধরি করে সিঁড়ি বেয়ে জাহাজের খোলে নিয়ে গেল। নিচের কেবিনে পাটাতনের ওপর আমাকে ফেলে ক্যারিবো আমার পেটে জুতোসুদ্ধ একটা পা চাপিয়ে নিষ্ঠুর হেসে বলল, 'তা হলে তুমি সরকারি ঘুঘু? বোসো, দেখাচ্ছি মজা।'

তারপর সে পকেট থেকে কী একটা বের করল। দেখেই আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেলুম। ক্যারিবোর হাতে একটা চকচকে বাঁকা ছুরি।...

অন্ধকার সমুদ্রে

জীবনে ভুলেও ঈশ্বরকে ডাকিনি। এখন মনে হল ঈশ্বরকে ডেকে দেখলে হয়। নইলে আমার মৃত্যুটা ঠেকানোর কোনও উপায় দেখছি না। অবস্থাটাও বড় বেকায়দা যে! ব্যাটারা নাইলনের দড়িতে আমাকে এমন করে বেঁধেছে, একটুও নড়াচড়া করা যাচ্ছে না, এদিকে শয়তান ক্যারিবো বাঁকা চকচকে ছুরিটা বাগিয়ে আমার বুকে তার থ্যাবড়া জুতোসুদ্ধু পা চাপিয়ে কুতকুতে চোখে তাকিয়ে আছে আর শাসাচ্ছে।

কিছুক্ষণ আগে কী ভদ্র আর অমায়িক চেহারা দেখেছিলুম লোকটার! এখন মনে হচ্ছে, বাস্তবিক যদি শয়তান বলে কেউ থাকে, তাহলে এই ব্যাটাই সে। এদিকে পিওবের্দেনে ওরফে অ্যানথুপা পিদ্রু পাশে দাঁড়িয়ে শিগগির আমার শ্বাসনালী কেটে ফেলার প্ররোচনা দিচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছি, এখনই বুঝি ক্যারিবো আমার গলায় ছুরি চালিয়ে দেবে।

মাথা ঠিক রাখার চেষ্টা করে বললুম, "দেখুন মিঃ ক্যারিবো, আপনারা ভুল করছেন। আমি সত্যি সরকারি গুপ্তচর নই। আমার বুক পকেটে একটা কার্ড আছে। ওটা দেখলেই আমার পরিচয় পেয়ে যাবেন।"

ক্যারিবো ক্রূর হেসে বলল, "পিওবের্দেনে যখন বলেছে, তখন তার কথাই ঠিক। তুমি সরকারি ঘুঘু।"

"না মিঃ ক্যারিবো আমি একজন সাংবাদিক মাত্র। আপনি ওর কথায় ভুল করবেন না।"

পিওবের্দেনে বলল, "তাহলে প্রফেসর বিকর্ণ আর ওই দাড়িওয়ালা বুড়ো কর্নেলের সঙ্গে কিসের সম্পর্ক তোমার?"

"কোনও সম্পর্ক নেই। আমি কিওটা দ্বীপে ওঁদের অভিযানের খবর নিতে এসেছি। সেই খবর কলকাতায় আমার কাগজে পাঠাতে হবে। বিশ্বাস না হলে আমা বুকপকেটের কার্ডটা আপনারা দেখুন।"

পিওবের্দেনে আমার বুকপকেট থেকে আইডেনটিটি কার্ডটা বের করে নেড়েচেড়ে দেখল তারপর ক্যারিবোকে কার্ডটা দিল সে। ক্যারিবো পড়ে দেখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল "এটা যে জাল নয় তার প্রমাণ? আমি জানি, সরকারি ঘুঘুদের জাল পরিচয়পত্র থাকে।"

পিওবের্দেনে বলল, "আর দেরি কোরো না ক্যারিবো আমাদের রওনা দেওয়ার সময় হয়ে এল।"

ক্যারিবো কার্ডটা আমার পকেটে ঢুকিয়ে রেখে বলল, "পরিচয়পত্র সঙ্গে নিয়ে সরকারি ঘুঘু জাহান্নামে যাক। তবে পিওবের্দেনে, আমার মনে হয় কাজটা মাঝদরিয়ায় সেরে ফেলাই ভাল। কারণ জল পুলিশ নজর রেখেছে। রক্তমাখা মড়া সমস্যা বাধাবে।"

পিওবের্দেনে ভেবেচিন্তে বলল, "ঠিক বলেছ। মাঝদরিয়ায় পৌঁছে ওর শ্বাসনালী কেটে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেব। আর কেউ খুঁজে পাবে না।"

ক্যারিবো পা তুলে নিয়ে হাসতে হাসতে বলল, "তারপর ওর সদগতির কোনও অসুবিধে হবে না। হাঙরেরা খিদেয় ছটফট করে বেড়াচ্ছে।"

ওরা বেরিয়ে যাচ্ছিল। ডেকে বললুম, "মিঃ ক্যারিবো, মেরেই যখন ফেলবেন, তখন দয়া করে দড়ির ফাঁসগুলো একটু আলগা করে দিন না। বড্ড ব্যথা করছে যে!"

পিওবের্দেনে। মুখ ভেংচে বলল, "ব্যথা করছে! করবেই তো! ঘুঘু দেখেছ বাছাধন, ফাঁদ তো দেখোনি!"

"মিঃ পিওবের্দেনে! রোমিলার বাবার জাদুঘর থেকে যে দেবী মূর্তিটা নিয়ে এসেছেন, ওর ভেতর কিন্তু কিওটা দ্বীপের সন্ধান পাবেন না—যদিও ওটা কিওটা দ্বীপের কাঠ দিয়ে তৈরি।"

আমার এই চালে কাজ কাজ হল। ওদের দুজনের মুখেই চমক জাগল। ক্যারিবো বলল, "হুঁ, তুমি তাহলে দেখছি অনেক খবর রাখো?"

"রাখি বৈকি! আমি সাংবাদিক যে!"

পিওবের্দেনে আমার পাশে এসে হাঁটু মুড়ে বসে বলল, "যদি সত্যি তুমি কিওটা দ্বীপের সন্ধান জানো, তাহলে তোমার শ্বাসনালী কাটা যাবে না।"

ক্যারিবো বলল, "চালাকিতে ভুলো না পিওবের্দেনে। গুপ্তচররা বড় ধূর্ত।"

বললুম, "রাজাকো কিন্তু তার চেয়েও ধূর্ত ছিলেন। তাই কিওটা দ্বীপে যাওয়ার ম্যাপখানা কান্তির গায়ে এঁকে রেখে গেছেন।"

দু'জনে আবার চমকে উঠল। এক গলায় বলল, "কান্তি! কান্তি!"

"হ্যাঁ, কান্তি।"

ক্যারিবো ব্যস্তভাবে বলল, "কোথায় আছে সেই কান্তি?"

"মিঃ কিয়াং তা হাতিয়ে নিয়েছেন রাজাকোকে খুন করে।"

এই কথাটা বলার সময় আমি আদৌ জানতুম না এরা কিয়াং নামে সেই ধনী মৎস্যব্যবসায়ী ও রাজাকোর প্রতিদ্বন্দ্বীর অনুচর কি না। আন্দাজে ঢিলটা লেগে গেল। ক্যারিবো লাফিয়ে উঠে দাঁত কিনমিড় করে বলল, "কিয়াং হাতিয়েছে তাহলে? সর্বনাশ!"

পিওবের্দেনে মুখ চুন করে বলল, "দেখলে তো ক্যারিবো? আমি তোমাকে বলেছিলুম রাজাকোকে খুন করেছে কিয়াংসায়েবের লোক। তুমি বিশ্বাস করোনি! তাছাড়া এও বলেছিলুম, রাজাকোর কাছে একটা কান্তি আছে আমি জানি।"

বললুম, "হ্যাঁ, টুপির মধ্যে লুকোনো ছিল শুনেছি।"

ক্যারিবো কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দুমদুম শব্দে কাঠের সিঁড়ি কাঁপিয়ে একটা বেঁটে লোক এসে দরজায় উঁকি মেরে বলল, "গতিক সুবিধের নয় কর্তা! হাঙরের ঝাঁক এসে পড়েছে।"

ওরা ব্যস্ত হয়ে উঠল। ক্যারিবো বলল, "পিওবের্দেনে, ওর কাছে থাকো! ৭০৩ নম্বরের দিকে রওনা দিচ্ছি।"

সবাই ওপরের ডেকে চলে গেল। পিওবের্দেনে দরজা বন্ধ করে পোর্টহোলে চোখ রেখে কিছু দেখতে লাগল। তারপর নোঙর তোলার ঘড় ঘড় শব্দ শুনতে পেলুম। তারপর স্কুনার দুলতে শুরু করল। যান্ত্রিক গর্জন কানে এল। বুঝলুম স্টার্ট দিয়েছে। আবছা জলের শব্দ, স্কুনারের প্রচণ্ড দুলুনি আর গর্জন মিলে একটা আলোড়ন শুরু হয়ে গেল।

কেবিনের ভেতর ততক্ষণে আলো কমে গেছে। একটু পরে আলো জ্বলে উঠল। পিওবের্দেনে পোর্টহোল থেকে হঠাৎ ছিটকে সরে এল। তারপর দুমদাম্ ফট্ ফট্রাস্ এরকম অদ্ভুত সব শব্দ হতে থাকল। বললুম, "ব্যাপার কী মিঃ পিওবের্দেনে?"

সে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, "চুপ ব্যাটা কলকাত্তাই ভূত!"

গ্রাহ্য না করে বললুম, "কারও সঙ্গে লড়াই বাধল বুঝি?" পিওবের্দেনে আমার কথার জবাব না দিয়ে কোনার দিকে কাঠের দেয়ালের একটা হুকে হ্যাঁচকা টান মারল। দেখি, ওটা একটা প্রকাণ্ড দেরাজ। দেরাজ থেকে সে যা বের করল, তা একটা স্টেনগান আর একটা কার্তুজের বেল্ট। সে পোর্টহোলের কাচটা সরিয়ে স্টেনগানের নল ঢুকিয়ে দিল। তারপর গুলি ছুড়তে শুরু করল।

বুঝলুম কাদের সঙ্গে জোর লড়াই বেধেছে। ছোট্ট জাহাজটা বেজায় দুলছে। মাঝে মাঝে ভীষণভাবে কাত হয়ে যাচ্ছে। আর আমি কাঠের মেঝেয় অসহায়ভাবে একবার এদিক একবার ওদিকে গড়িয়ে যাচ্ছি।

কিন্তু তাতে একটা লাভ হল। বাঁধনগুলো অনেকটা ঢিলে হয়ে গেল। একটু পরে পোর্টহোলের কাচটা ঝনঝন শব্দে ভেঙে গেল। পিওবের্দেনে মুখ বিকৃত করে লাফ দিয়ে সরে এল। তারপর সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিল। কেবিনে ঘরঘুট্টি অন্ধকার এবার। সেই সুযোগে বাঁধন খুলতে থাকলুম। পিওবের্দেনে পোর্টহোলের কাছে আছে তা বুঝতে পারছি। খোলা পোর্টহোল গুলিগোলার আওয়াজ ক্রমশ কমে আসছে। কিন্তু সমুদ্রের গর্জন শুনতে পাচ্ছি। এদিকে কেবিনে জল ঢুকে মেঝে জলময় হয়ে যাচ্ছে। বাঁধন খুলে সাবধানে উঠে বসলুম যখন, তখন কেবিনের ভেতর কয়েক ইঞ্চি জল। যখনই স্কুনার কাত হচ্ছে, তখনই বেশি করে জল ঢুকছে। আমার ভয় হল, এই লোনা জলে শেষ পর্যন্ত ডুবে মরব না তো?

তার আগেই একটা কিছু করা দরকার। পিওবের্দেনের চেহারা আবছা দেখা যাচ্ছিল। সে পোর্টহোলে কী একটা চাপা দেওয়ার চেষ্টায় ব্যস্ত। তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছি, সেইসময় দরজায় ধাক্কা পড়ল। জলের শব্দের মধ্যে কে চেঁচিয়ে ডেকে বলল, "পিওবের্দেনে! বেরিয়ে এস! স্কুনারে জল ঢুকছে।"

পিওবের্দনে ঝটপট দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। ভাগ্যিস আলো জ্বালাল না। বিপদের মুখে তার এটাই স্বাভাবিক। খোলা দরজা দিয়ে এবার জলের প্রবল ছাঁট এসে ঢুকতে লাগল। মেঝেয় এখন প্রায় হাঁটু জল জমে উঠেছে। বুঝতে পারলুম স্কুনার ডুবতে চলেছে। প্রতিপক্ষের গুলিগোলায় নিশ্চয় ঝাঁঝরা হয়ে গেছে স্কুনারটার শরীর।

এতক্ষণে আমার সত্যিকার মৃত্যুভয় জেগে উঠল। ক্যারিবোর ছুরির মুখে তত বেশি ভয় পাই নি, কারণ জীবনে এমন অবস্থায় অনেকবার পড়েছি। কিন্তু এবার সাক্ষাৎ যম স্বয়ং সমুদ্র।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঁকি দিলুম। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো বৃষ্টিও শুরু হয়েছে। অন্ধকার সমুদ্র ভয়ঙ্কর গর্জন করছে। স্কুনারে কোথাও আলো নেই। কোনও সাড়া শব্দ নেই। ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে আছে। স্কুনারটা অসহায়ভাবে মোচার মতো প্রচণ্ড দুলছে। প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছে ছিটকে সমুদ্রে গিয়ে পড়ব। তার ওপর মুহুর্মুহু জলের ঝাপটানি। ভিজে নাকাল হয়ে গেছি। কাঁপুনি শুরু হয়েছে ঠাণ্ডায়।

তাহলে কি এই সমুদ্রসমাধিই বরাতে ছিল আমার? অতিকষ্টে ওপরের ডেকে হাঁটু দুমড়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে এগিয়ে গেলুম। সমুদ্রের গর্জনে কান পাতা দায়। বৃষ্টি ঝাঁকে ঝাঁকে সূচ বেঁধাচ্ছে শরীরে। ওপরের কেবিনের কাছে যেতেই বিদ্যুৎ ঝিলিক দিল। সেই আলোয় দেখলুম, একটা ছায়ামূর্তি কী একটা টানাটানি করছে।

আবার বিদ্যুৎ ঝিলিক দিল। লোকটাকে চিনতে পারলুম। পিওবের্দেনে।

আসন্ন মৃত্যুর মুখে মানুষের মাথার ঠিক থাকে না।

ঝাঁপিয়ে পড়লুম তার ওপর। "তবে রে হতচ্ছাড়া বদমাস। এবার তোর কী হয়?"

পিওবের্দেনে বেকায়দায় পড়ে মাতৃভাষায় কী সব আওড়াতে থাকল। তাকে জাপটে ধরে ভিজে ডেকের ওপর ফেলে হাঁকতে হাঁকতে বললুম, "কীরে ব্যাটা? আমার শ্বাসনলী কাটবি বলেছিলি যে বড়? এবার দ্যাখ, কে কার শ্বাসনালী কাটে!"

পিওবের্দেনে গোঙাতে গোঙাতে বলল, "কিন্তু তুমিও কি রক্ষা পাবে ভাবছ? সমুদ্র তোমাকে গিলে খাবে। বরং তার চেয়ে আমাকে সাহায্য করো। তাহলে দুজনেই প্রাণে বাঁচব।"

"কেবিনের কার্নিশে একটা রবারের নৌকো আটকানো আছে। ওটা টেনে বের করতে পারছি না।"

"তোর বন্ধুরা কোথায় গেল?"

"ওরা আমাকে ফেলে বোটে চেপে কেটে পড়েছে। ওরা আমার বন্ধু নয়, শত্রু!" বলে সে কেঁদে ফেলল। "উঃ! ক্যারিবো এমন করবে আমি ভাবতেও পারিনি!"

ওর কান্না দেখে মনটা নরম হল। সমুদ্রের গ্রাস থেকে বাঁচতে হলে এখন ওর সহযোগিতাও দরকার। বললুম, "তোমার স্টেনগানটা কোথায়, আগে দাও। তারপর কথা হবে।"

"বিশ্বাস করো, ওরা কেড়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু আর দেরি করা উচিত নয়, যদি প্রাণে বাঁচতে হয়। স্কুনারটা আর মিনিট কুড়ি-পঁচিশের মধ্যেই ডুবে যাবে হয়তো। চলো, আমরা রবারের নৌকোটা বের করি।"

ওকে ছেড়ে সতর্কভাবে উঠে দাঁড়ালুম। এতক্ষণে মনে পড়ল আমার পকেটে রিভলভার আছে। জলে ভিজে গেলেও ওটার সাহায্যে পিওবের্দেনেকে শায়েস্তা করতে অসুবিধে হবে না।

রিভলভারটা ওর বুকে ঠেকিয়ে বললাম, "চলো! কোথায় নৌকো আছে দেখি।"

পিওবের্দেনে কাকুতি-মিনতি করে বলল, "বিশ্বাস করো! আমি ক্যারিবোর মতো দুষ্টু লোক নই। ওর প্ররোচনায় পড়ে রোমিলার সঙ্গে নেমকহারামি করেছি। জানতুম না, নচ্ছার ঠগ আসলে মূর্তিটা হাতানোর জন্য আমার সঙ্গে ভাব জমাবে।"

"ঠিক আছে। চলো, নৌকো কোথায় আছে দেখি।"

স্কুনার একপাশে কাত হয়ে গেছে। বৃষ্টিটা ধরে এল। কিন্তু ঝোড়ো বাতাস থামল না। টলতে টলতে অনেক কষ্টে রবারের নৌকোটা টেনে বের করলুম দু'জনে। তারপর পালাক্রমে ফুঁ দিয়ে ওটাকে ফোলাতে শুরু করলুম। ততক্ষণে স্কুনার আরও কাত হয়েছে। দু'জনেরই দম ফুরিয়ে মারা পড়ার দাখিল। নৌকাটা আসলে গোল মোটরের টায়ারের মতো প্রকাণ্ড একটা চাকা এবং মধ্যিখানে আন্দাজ এক বর্গমিটার একটা রবারের বালিশ আটকানো। সেটাও দম দিয়ে ফোলানো হল। তারপর পিওবের্দেনে বলল, "তুমি আগে উঠে বোসো। আমি ঠেলে ভাসিয়ে দিয়ে তারপর উঠব।"

স্কুনারের যেদিকটা কাত হয়ে সমুদ্রের ঢেউ ঢুকছে, সেদিকে ঠেলে দিল পিওবের্দেনে। তারপর নিজে এক লাফে উঠে বসল। সে যেন নাগরদোলায় চড়া। স্কুনারের রেলিং হাত বাড়িয়ে ধরে সে রবারের এই অদ্ভুত ভেলাটাকে শেষ প্রান্তে নিয়ে গেল। লোকটার বুদ্ধি আছে বটে। শেষ দিকটায় না নিয়ে গেলে ঢেউয়ের ঝাপটায় ভেলাসমেত আমরা আবার ডেকে গিয়ে পড়তুম।

সমুদ্র এবার আমাদের লুফে নিল। প্রতিমুহূর্তে আশঙ্কা হচ্ছিল তলিয়ে যাব, কিন্তু এই আশ্চর্য ভেলা দিব্যি ভেসে রইল ঢেউয়ের মাথায় একপার ওপরে একবার নিচে নাগরদোলার মতো।

ঢেউয়ের মাথায় পৌঁছুলে দিগন্তে কয়েক সেকেন্ডের জন্য আলোর ঝাঁক দেখতে পাচ্ছিলুম। আবার হারিয়ে যাচ্ছিল কালো জলের দেয়ালের পেছনে।

চেঁচিয়ে জিগ্যেস করলুম, "পিওবের্দেনে! ওটা কোন্ দ্বীপ?"

জলের গর্জনের ভেতর পিওবের্দেনে কী বলল, শুনতে পেলুম না। যদিও সে আমার মাত্র একহাত দূরে ফুলন্ত টায়ারের মতো ভেলার কিনারা আঁকড়ে বসে আছে।

মাথার ওপর এতক্ষণে নক্ষত্র ঝিকমিক করতে দেখা গেল। বাতাসটাও কমে এল ক্রমশ। কিছুক্ষণ আগে যে লোকটি ছিল আমার জঘন্য শত্রু, সে এখন বন্ধু হয়ে গেছে। কারণ প্রাণের দায় বড় দায়। রবারের ভেলায় দু'জনেই ঠান্ডাহিম শরীরে ভেসে চললুম। কোথায় পৌঁছুব কে জানে!

ও কিসের আলো?

চোখ খুলে কয়েক সেকেন্ড কিছু বুঝতে পারলুম না। তারপর মনে হল, রুবি দ্বীপে আমাদের হোটেলেই শুয়ে আছি। কিন্তু এত আলো কেন? না—আলো নয়, রোদ। ঝলমল করছে উজ্জ্বল রোদ। আমার পিঠের নিচে বালি। মাথার ওপর ঝকঝকে নীল আকাশ। আমি এখানে শুয়ে আছি কেন?

সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম কিছুক্ষণ। আমি কি স্বপ্ন দেখছি? নিশ্চয় একটানা অদ্ভুত ধরনের স্বপ্নের মধ্যে কাটাচ্ছি। বাঁদিকে নারকেল বন আর ঘন আগাছার জঙ্গল। ডানদিকে উঁচু বাঁধের মতো ন্যাড়া টিলা। সামনে ছোট্ট একটা হ্রদ। তারপর পেছনে তাকিয়ে প্রিয়বর্ধনকে দেখামাত্র আগাগোড়া সবটাই মনে পড়ে গেল।

প্রিয়বর্ধন একটা গাছের তলায় আগুন জ্বেলে কী একটা করছিল আমাকে উঠতে দেখে সে মুখ ফেরাল। তার মুখে কেমন একটা মিষ্টি-মিষ্টি হাসি। 'হ্যালো মিস্টার! শরীর ঠিক তো?'

জবাব দিলাম না। এই লোকটা আমার জঘন্য শত্রু। সে ক্যারিবোর স্কুনারে আমাকে খুন করতে চেয়েছিল। অথচ তারই সঙ্গে একই বেলায় অথৈ সমুদ্রে আমাকে ভাসতে হয়েছিল। ভাগ্যের তামাশা আর কাকে বলে? আমি অবাক হয়ে তাকে দেখছিলুম। ভাবছিলুম, ইচ্ছে করলেই সে আমাকে সমুদ্রে ফেলে দিতে পারত। কেন তা করেনি?

প্রিয়বর্ধন আমার হাবভাব দেখে হয়তো অবাক হল। বলল, 'কী হল? চলে এস এখানে। তোমার জন্য কিছু ব্রেকফাস্টের আয়োজন করেছি।'

বলে সে হাসতে হাসতে একটা পোড়া মাছ দেখাল। সঙ্গে সঙ্গে আমার খিদে চনমন করে উঠল। তার সম্পর্কে রাগ আর শত্রুতার ভাবটাও কেটে গেল। তার কাছে গিয়ে বসে পড়লুম। সে একরাশ কাঠকুটো জড়ো করে আগুন জ্বেলেছে। আগুনের কুণ্ডের পাশে কয়েকটা পোড়া আর কয়েকটা তাজা মাছ। মাছগুলো দেখতে বাচ্চা ইলিশের মতো। আমার হাতে একটা পোড়া মাছ গুঁজে দিয়ে প্রিয়বর্ধন নিজেও একটা চিবুতে শুরু করল। চিবোতে চিবোতে বলল, 'তুমি অবাক হচ্ছ না মিস্টার?'

বললুম, 'নিশ্চয় হচ্ছি। কারণ এতক্ষণে আমাদের হাঙরের পেটে থাকার কথা।'

প্রিয়বর্ধন আরও জোরে হেসে বলল, 'বরাত জোরে এ যাত্রা জোর বেঁচে গেছি। আসলে কী জানো? ওই রবারের ভেলাগুলো খুব মজবুত এবং বিশেষ ধরনে তৈরি। যত ঢেউ থাক, কিছুতেই ওল্টাবে না। তাছাড়া আমি হলুম সমুদ্রের বাচ্চা। আজীবন সমুদ্রের মানুষ হয়েছি।'

বাধা দিয়ে বললুম, 'কিন্তু এখানে এলুম কী ভাবে?'

'যেভাবে আসা উচিত।' প্রিয়বর্ধন আগুনে আরেকটা মাছ রেখে বলল। 'সারা রাত আমরা ভেলায় কাটিয়েছি। তুমি তো ভিরমি খেয়ে পড়ে ছিলে ভয়ের চোটে। অগত্যা তুমি যাতে ভেলা থেকে ছিটকে হাঙরের পেটে ঢুকে না যাও, আমি তোমার পেটের ওপর পা চাপিয়ে ঠেসে রেখেছিলুম।'

নচ্ছার লোকটা আমার পেটের ওপর পা চাপিয়েছিল ক্যারিবোর মতো, ভাবতেই গা জ্বালা করে। কিন্তু লোকটাকে যতটা খারাপ মনে করেছিলুম, ততটা খারাপ নয়। বললুম, 'তারপর এখানে কীভাবে এলুম?'

প্রিয়বর্ধন বলল, 'ভোর নাগাদ ভেলামশাই নিজের ইচ্ছে মতো এনে ফেলল এই সৃষ্টিছাড়া দ্বীপে। আমি কি নিজের ইচ্ছেয় এসেছি? ওই যে বাঁধের মতো টিলা পাহাড় দেখছ, তার নিচে সমুদ্র। বাপস! কিনারা জুড়ে ডুবো পাথরে ভর্তি—ভেলাটার সঙ্গে ঠোক্কর লাগলে দু'জনেই গুঁড়ো হয়ে যেতুম। বুঝলে মিস্টার? ভেলাটাকে পুজো করা উচিত। ওই দেখ, ওকে গাছে টাঙিয়ে রেখেছি।"

গাছের গুঁড়ির মাথায় চুপসে যাওয়া প্রকাণ্ড টায়ারের মতো ভেলাটাকে দেখতে পেলুম। বললুম, "আমি তাহলে সারারাত অজ্ঞান ছিলুম?"

"হুঁ, ছিলে। কাজেই তোমার ঠ্যাং দুটো ধরে টানতে টানতে বিচে নামাতে হল। তারপর একবার ভাবলুম, তোমাকে বিচেই ফেলে রাখি। কিন্তু এই জঘন্য দ্বীপে যা শকুনের উপদ্রব! তোমাকে একা ফেলে যে ক্ষিদে মেটাতে আসব, উপায় নেই। তবে তার চেয়ে বড় কথা, আমি নারকোল গাছে চড়তে পারিনে। সমুদ্রের বাচ্চা তো! তাই ভাবলাম, তোমাকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। তুমি নিশ্চয় নারকোল গাছে চড়তে পারো?

'মোটেও পারি না।'

প্রিয়বর্ধন লাফিয়ে উঠল। 'পারো না? তাহলে কেন তোমাকে কাঁধে করে এই নিরাপদ জায়গায় নিয়ে এলুম?'

বুঝতে পারছিলুম, লোকটি খুব আমুদে প্রকৃতির। সে আমাকে বয়ে এনে এখানে শুইয়ে রেখেছে। তারপর হ্রদের জলে পাথর ছুড়ে একগাদা মাছ মেরে এনেছে। কিন্তু আগুন কোথায় পেল? জিগ্যেস করলে তার বুদ্ধির পরিচয়ও পেলুম। দুটো শুকনো কাঠে ঘষাঘষি করে শুকনো পাতা ডলাই করে গুলতি বানিয়ে ফুঁ দিতেই আগুন জ্বলে উঠেছে। ব্যাপারটা ভারি সোজা। প্রথমে কাঠ দুটো জ্বলে উঠবে। তখন গুঁড়ো পাতার গুলতিটা ধরিয়ে নিলেই হল।

রোদে শুয়ে থাকার ফলে আমার ভিজে পোশাক যেমন শুকিয়ে গেছে তেমনি সারা রাতের সমুদ্র জলের হিমটাও গেছে ঘুচে। সূর্য মানুষের শরীরকে শক্তি জোগায়। আমি এখন সম্পূর্ণ ফিট হয়ে গেছি। একটুও দুর্বলতা টের পাচ্ছি না।

হ্রদটা ছোট। সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগ নেই; বৃষ্টিজলের হ্রদ। তাই জলটা পান করা যায়। খুব স্বচ্ছ সেই জলে মাছের ঝাঁক দেখে তাক লেগে গেল।

জল খেয়ে সেই গাছের তলায় ফিরে প্রিয়বর্ধন বলল, 'একেই বলে বরাত। কাল সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত আমরা ছিলুম শত্রু। এখন হয়েছি বন্ধু। যাক্ গে, তোমার নামটা কী বলছিলে যেন কাল?'

'জয়ন্ত চৌধুরি।'

'জয়ন্ত, আমরা কোথায় এসে পড়েছি জানো?' বলে সে ভয়ের চোখে চারদিক দেখে নিল। 'আমার খালি সন্দেহ হচ্ছে, এ যেন সেই ডাইনির দ্বীপ।'

'ডাইনির দ্বীপ মানে?'

'ছেলেবেলা থেকে নাবিকদের কাছে ডাইনির দ্বীপের ভয়ঙ্কর সব গল্প শুনেছি। থাক্‌গে, ওসব বলতে নেই। বললেই বিপদ হবে শুনেছি। আমাদের কাছে অস্ত্রশস্ত্রও নেই। তোমার পকেটে একটা

রিভলভার ছিল। সেটা কাছে রেখেছি। কিন্তু জলে ভিজে অকেজো হয়ে গেছে। গুলিগুলো পর্যন্ত বের করা গেল না।'

'আমার রিভলভার নিয়েছ কেন? ফেরত দাও।'

মুচকি হেসে প্রিয়বর্ধন পকেট থেকে আমার অস্ত্রটা বের করে দিল। পরীক্ষা করে দেখলুম, সত্যি ওটা অকেজো হয়ে গেছে। প্রিয়বর্ধন বলল, 'আমার স্টেনগানটা কখন সমুদ্রে ছিটকে পড়েছে টের পাইনি। যাক দুটো লাঠি ভেঙে নিই গাছের ডাল থেকে। তারপর সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসব—যদি দৈবাৎ কোন জাহাজ চোখে পড়ে। নিদেনপক্ষে ভেলাটা তো রইলই। গায়ে জোর ফিরে পেলেই ভেসে পড়া যাবে।'

সমুদ্রতীরে যাওয়ার সময় নারকোল বনের ভেতর অসংখ্য শুকনো নারকোল পড়ে থাকতে দেখলুম। কিন্তু প্রিয়বর্ধনের শুকনো নারকোল নাকি মুখে রোচে না। গাছের ডগায় ঝুলন্ত নরম নারকোল শাঁসের কথা বলতে তার জিভে জল এসে গেল। আমাকে গাছে চড়ানোর জন্য সাধাসাধি করেও যখন রাজি হলুম না, তখন তার মুখটা বেজার হয়ে উঠল। কিন্তু আমি জানি, এই দ্বীপ থেকে উদ্ধার না পেলে শুকনো নারকোলই খেতে হবে। কাহাঁতক মাছ পোড়া খেতে ভাল লাগবে ওর? আমি পাথরে আছাড় মেরে কয়েকটা নারকোল ভেঙে ফেললুম। তারপর টুকরো শাঁসগুলো জামা ও প্যান্টের পকেটে বোঝাই করলুম। ন্যাড়া পাথরের বাঁটে বসে যখন সেগুলো চিবোচ্ছি, তখন প্রিয়বর্ধন হাত বাড়িয়ে বলল, 'দেখি একটুখানি!'

কিছু চিবিয়েই সে ফেলে দিল। তবে একথাও সত্যি এমন স্বাদ গন্ধহীন নারকোল জীবনে কখনও খাইনি। রুবিদ্বীপের নারকোল খেকো চিংড়িগুলোর কথা মনে পড়ছিল। আহা, সেই সুস্বাদু চিংড়ি সমুদ্র থেকে যদি ধরা যায়। লোভী চোখে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

ডুবো পাথরে বহুদূর পর্যন্ত সমুদ্রের নীল জলে কালো কালো ছোপ পড়ে আছে। যেন অসংখ্য দানবের মাথা। কোনওটা হাতির মতো দেখাচ্ছে। পাথরগুলো ডুবে যাচ্ছে, আবার ভেসে উঠছে। সাদা ফেনার পুঞ্জ জমছে। জলের শব্দও প্রচণ্ড। ওই সব পাথরের ভেতর দিয়ে ঠোক্কর খেতে খেতে রবারের ভেলাটা ভদ্রলোকের মতো আমাদের তীরে পৌঁছে দিয়েছে। সত্যি, ভেলাবাবাজির পুজো দেওয়া উচিত।

দিগন্তে মাঝে মাঝে কালো রেখা ভেসে উঠেছিল। নিশ্চয় আর একটা দ্বীপ। কিন্তু দূরের দিকে কোনো জাহাজ বা নৌকো চোখে পড়ছিল না। প্রিয়বর্ধন ঠোঁট কামড়ে ধরে সমুদ্র দেখছিল। কিছুক্ষণ পরে ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বলল, 'শয়তান ক্যারিবোকে যদি এখন পেতুম! ওর মুণ্ডুটা কচকচ করে খেয়ে খিদে মেটাতুম!'

'ক্যারিবো তোমাকে ফেলে পালিয়ে গেল কেন প্রিয়বর্ধন?'

আমার প্রশ্ন শুনে প্রিয়বর্ধন চুপচাপ পাথরে লাঠিটা দিয়ে আঁচড় কাটবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। তারপর বলল, 'কিয়াংকে ও ভীষণ ভয় পায়। কিয়াং কোটিপতি লোক। ওর দলবল বিরাট। ক্যারিবো তো এক সময় কিয়াংয়েরই ডান হাত ছিল।'

'দু'জনের বিবাদের কারণ কী?'

'রোমিলার বাবা রাজাকোর ঘর থেকে যে দেবীমূর্তিটা চুরি করে এনে ক্যারিবোকে দিয়েছি, বিবাদ ওইটে নিয়ে। জিনিসটার আসল মালিক হল কিয়াং। ক্যারিবো ওটা কিয়াংয়ের বাড়ি থেকে চুরি করে রাজাকোকে বেচেছিল। কিয়াং ক্যারিবোকেই সন্দেহ করেছিল। তাই তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছিল। ক্যারিবো রাজাকোর সেই টাকায় স্কুনার কিনেছিল। তারপর যেভাবেই হোক, সে জানতে পেরেছিল, মূর্তিটার ভেতর কিওটা দ্বীপের সন্ধান লেখা আছে।'

চমকে উঠলুম। 'কিওটা দ্বীপের? মানে—যে দ্বীপে গাছপালা কথা বলে?'

প্রিয়বর্ধন হাসল। আমার ভুল শুধরে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'উহু—গান গায়।'

'বেশ। তারপর?'

'তারপর আর কী? ক্যারিবো আমাকে টাকার লোভ দেখাল। তাছাড়া প্রতিজ্ঞা করে বলল, আমাকে ও কিওটা দ্বীপে নিয়ে যাবে। আমি শয়তানটার কথায় পড়ে রোমিলার মতো ভাল মেয়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ফেললুম। ওঃ! নরকে আমার জায়গা হবে না জয়ন্ত।'

অনুতাপে সে চুল আঁকড়ে ধরল। বললুম, 'যাক গে, যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন আর বলে লাভ নেই। কিন্তু কাল সন্ধ্যায় কিয়াংয়ের দলই কি ক্যারিবোর স্কুনারে হামলা করেছিল? কেন?'

'কিয়াং নিশ্চয় টের পেয়েছে, মূর্তিটা এতদিন রাজাকোর কাছে ছিল এবং আবার সেটা ক্যারিবোর কাছে ফিরে এসেছে। কিয়াংয়ের চারদিকে চর।'

'তাহলে কি রাজাকোকে খুন করেছে কিয়াংয়েরই লোক?'

'তা আর বলতে?'

এসব কথা শুনে মনমরা হয়ে বললুম, 'তাহলে এতক্ষণে ক্যারিবো কিওটা দ্বীপের দিকে রওনা হয়েছে। হয়তো পৌঁছেও গেছে।'

প্রিয়বর্ধন জোরে মাথা নেড়ে বলল, 'অত সহজ নয়। মোটরবোট নিয়ে কিওটা যাবে! আমার মনিব রাজাকো একদিন নেশার ঘোরে আমাকে বলেছিলেন, কিওটা নামে একটা দ্বীপ আছে—তার চারদিকে পাহারা দেয় জলের ডাইনিরা। কাজেই বুঝতে পারছ, এতক্ষণে ক্যারিবোর মাংস ডাইনিরা ছিঁড়ে খাচ্ছে।'

'কিন্তু প্রিয়বর্ধন, গান করে এমন সব গাছ দেখাতেই বা এত আগ্রহ কেন ক্যারিবোর? কেন সেখানে কিয়াংই বা যেতে চায়?'

প্রিয়বর্ধন চাপা গলায় বলল, 'ওই দ্বীপে নাকি প্রাচীন যুগের জলদস্যুদের বিস্তর ধনরত্ন লুকানো আছে।'

হেসে ফেললুম। 'সেই চিরকেলে গল্প! গুপ্তধন আর গুপ্তধন! প্রিয়বর্ধন, গুপ্তধনের গল্প কখনও সত্য হয় না।'

প্রিয়বর্ধন আমার পরিহাসে কান করল না। বলল, 'তুমি জানো না জয়ন্ত, কোকেস আইল্যান্ড কেন, সারা তল্লাটে যেখানে যাবে, তুমি কিওটা দ্বীপের অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনতে পাবে। সেখানকার গাছপালা গান গেয়ে সেই গুপ্তধনের খোঁজ দেয়। গানের সুরে বলে, আয়, তোকে রাজা করে দিই!'

প্রিয়বর্ধন কিওটা দ্বীপের বিচিত্র সব গল্প বলতে থাকল।

আমি ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ছিলুম। এতদিন কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের সঙ্গে কত অ্যাডভেঞ্চারে গিয়ে কত না বিপদে পড়েছি। কিন্তু চরম মুহূর্তে উনি ত্রাণকর্তার মতো আমার উদ্ধারে হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে হাজির হয়ে সহাস্যে সম্ভাষণ করেছেন, 'হ্যাল্লো ডার্লিং!' এই দ্বীপে নির্বাসিত হয়েও তাঁর আশা করতে দোষ কী?...

কিন্তু দিনটাই বৃথা কেটে গেল। উদ্ধার হওয়ার কোনও লক্ষণ দেখলুম না। দুপুরে দু'জনে হ্রদের জলে স্নান করলুম। আবার সেই পোড়ামাছের লাঞ্চ। আবার জাহাজের আশায় সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসে থাকা। তারপর দিন ফুরিয়ে আসছে দেখে রাতের আশ্রয়ের কথা ভাবতে হল দুজনকে। কাল সকালে বরং ভেলায় ভেসে পাড়ি জমানোর কথা ভাবা যাবে।

এই দ্বীপটা খুবই ছোট। উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে সেটা বুঝতে পেরেছিলুম। হ্রদের অন্যদিকটায় জঙ্গলের ভেতর কালো পাথরের কয়েকটা পাহাড় দেখা যাচ্ছিল। ওখানে আমরা আরামে রাত কাটানোর মতো একটা গুহা আবিষ্কার করে ফেললাম।

সারাদিন কোনও জনমানুষ দেখিনি। প্রাণী বলতে কয়েকটা গিরগিটি দেখেছি আর এক দঙ্গল শকুন! তারা কী খেয়ে বেঁচে থাকে কে জানে! গুহার ভেতর ঢুকে আগুন জ্বালিয়ে ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচা গেল। এখানকার শুকনো কাঠগুলোর আশ্চর্য গুণ। একটু ঘষলেই ধোঁয়া উড়তে থাকে। সহজে আগুন ধরে যায়।

গুহার ভেতরটা বেশ মসৃণ। দরজাটা বড়। দরজার কাছে বসে প্রিয়বর্ধন লাঠি হাতে পাহারা দিচ্ছিল। একরাশ কাঁচা পাতা আর ঘাস ছিঁড়ে এনে বিছানা করেছে। ক্লান্তিতে ঘুম এসে গিয়েছিল। আমার ঘড়িটা ভাগ্যিস অক্ষত আছে। প্রিয়বর্ধনের ঘড়িটাও অটুট, দিব্যি সময় দিচ্ছে। পালাক্রমে দুজনে ঘুমোব এবং পাহারা দেব।

সবে চোখ বুজেছি। বাইরে অন্ধকার ঘন হয়েছে। গুহার ভেতর আগুনটা ধিকিধিকি জ্বলছে এবং প্রিয়বর্ধন গুনগুন করে কী গান গাইছে অজানা ভাষায়। হঠাৎ তার গান থেমে গেল। চাপা গলায় সে বলে উঠল 'জয়ন্ত! জয়ন্ত! ঘুমলে নাকি?'

চমক খেয়ে উঠে বসে বললম, 'কী হয়েছে?'

'ঝটপট আগুনটা নিভিয়ে ফেলো। এদিকে একটা আলো এগিয়ে আসছে।'

প্রিয়বর্ধনের গলার স্বর কাঁপছিল। আমি আগুনের কুণ্ডে একরাশ কাঁচা পাতা চাপিয়ে দিয়ে দরজায় উঁকি দিলুম। নিচে হ্রদের ধারে সত্যি একটা আলো। তবে আলোটা এগিয়ে আসছে না। থেমে আছে।

স্টপ ইট! স্টপ ইট!

একটু পরেই বুঝতে পারলুম ওটা এক স্পটলাইট। প্রিয়বর্ধনকে সেকথা বললে সে কিছুতেই বিশ্বাস করল না। ভয় পাওয়া গলায় বলল, 'ডাইনির দ্বীপে এমন আলো দেখা যায় শুনেছি। জয়ন্ত, চলো আমরা এ গুহা থেকে পালিয়ে পাহাড়ের পেছনে কোথাও লুকিয়ে পড়ি। ডাইনিটা ঠিকই আমাদের গন্ধ পেয়ে যাবে। শুনেছি, সে নাকি জলজ্যান্ত মানুষ পুড়িয়ে খায়।'

সে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল। আমার কোনও কথা আমল দিল না। বরং সে পালিয়ে নিরাপদ জায়গায় যাওয়ার জন্য আমার হাত ধরে টানাটানি শুরু করল!

লোকটা এত কুসংস্কারের ডিপো, ভাবা যায় না! আলোটা যখন বৈদ্যুতিক, তখন আলোর মালিক অবশ্যই সভ্য জগতের মানুষ। শত্রুমিত্র যেই হোক, মানুষ তো বটে। তাছাড়া এমনও হতে পারে, কোনও মোটরবোট অথবা জাহাজ এসে এই দ্বীপের কাছে ভিড়েছে। উদ্ধার পাওয়ার এমন সুযোগ ছাড়া নয়।

নিজেকে ওর হাত থেকে জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে থাকলুম। প্রিয়বর্ধন পেছনে চাপা গলায় আমাকে যাচ্ছেতাই গালমন্দ দিতে লাগল। আতঙ্কে লোকটার মাথায় গণ্ডগোল হয়ে গেছে হয়তো।

অন্ধকারে চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ হতে পারত, কিন্তু স্পটলাইটটা চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল। তাই বারবার হোঁচট খাচ্ছিলুম পাথরে। আছাড় খেতেও হল বারকতক। শেষে এমন আছাড় খেলুম যে গড়াতে গড়াতে একেবারে নিচের ঝোপঝাড়ে পড়ে পোশাক ছিঁড়ে ফর্দাফাই হল। কাঁটায় শরীরের অনেক জায়গা ছেড়ে গেল। জ্বালা করছিল ভীষণ।

কিন্তু আমি মরিয়া। ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে দেখি, আলোটা যত কাছে ভেবেছিলুম, তত কাছে নয়। একটা পাথরের ওপর আলোটা রাখা আছে। কিন্তু জনমানুষ নেই। থমকে দাঁড়াতে হল। ওটা কি সত্যি স্পটলাইট?

হ্যাঁ, তাতে তো কোনও ভুল নেই। কারণ আলোর ছটা একটা দিকেই পড়েছে—যেদিক থেকে যাচ্ছি, সেদিকে। আমি এখন কিছুটা বাঁদিকে দাঁড়িয়ে আছি বলে আলোর নাগালে নেই। এবার সাড়া দেওয়া উচিত ভেবে যেই ঠোঁট ফাঁক করেছি, সেই মুহূর্তে হেঁড়ে গলায় কেউ গান গেয়ে উঠল।

তারপর গানটা দুকলি গাওয়া হয়েছে, কেউ তেমনি দুর্বোধ্য ভাষায় তেড়ে ধমক দিল। সঙ্গে সঙ্গে গানটা থেমে গেল। তারপর অনেকগুলো গলায় কারা হেসে উঠল।

তাহলে আলোটার ওপাশে পাথরের পেছনে একদঙ্গল মানুষ আছে। কারা তারা? একটু দোনামোনা হচ্ছিল আমার। ক্যারিবো কিংবা কিয়াংয়ের দলবল নয় তো? গিয়ে ওদের পাল্লায় পড়লে আমার ভাগ্য আবার অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে।

প্রায় বুকে ভর করে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে পাথরটার পেছনে গেলুম। তারপর কান পেতে রইলুম। ওরা চাপা গলায় কথা বলছে। একবর্ণও বুঝতে পারছি না। পাথরের ফাঁক দিয়ে ওদের আবছা মূর্তিগুলো চোখে পড়ল। ওরা ছায়ায় হাত পা ছড়িয়ে কেউ বসে বা শুয়ে আছে। কী করা উচিত ভাবছি, আর দরদর করে ঘামছি উত্তেজনায়।

হঠাৎ পেছনে অস্পষ্ট একটা শব্দ শুনে চমকে উঠলুম। ঝটপট ঘুরে বসতেই প্রিয়বর্ধন ফিসফিস করে বলল, 'চুপ!'

লোকটাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। ভেবেছিলুম ডাইনির ভয়ে লেজ তুলে পালিয়ে গেছে গুহা থেকে। অথচ সে দিব্যি আমার পেছন পেছন চুপিচুপি এসে হাজির। ঘাপটি মেরে বসে কিছুক্ষণ কান পেতে কথাবার্তা শোনার পর আমার কানে কানে ফিসফিস করে বলল, 'শয়তান ক্যারিবো!'

তাহলে ঠিকই অনুমান করেছিলুম। ভাগ্যিস, হুড়মুড় করে ওদের সামনে গিয়ে হাজির হইনি। আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা শোনার পর প্রিয়বর্ধন আমাকে অনেকটা দূরে নিয়ে গেল। হ্রদের ধারে হাঁটতে হাঁটতে চাপা গলায় বলল, শাপে বর হয়েছে, জয়ন্ত! ক্যারিবো মোটরবোট নিয়ে এখানে হাজির হয়েছে! ঠিক বুঝতে পারলুম না কী একটা গণ্ডগোল ঘটেছে। যতদূর মনে হল, ওরা কিওটা দ্বীপের হদিশ করতে পারছে না। তাই হতাশ হয়ে ঢকঢক করে মদ গিলে মাতাল হচ্ছে।'

বললুম, 'কিন্তু আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

প্রিয়বর্ধন বলল, 'স্টেনগানটা থাকলে ক্যারিবো আর তার তিনজন সঙ্গীকে ওখানেই যমের বাড়ি পাঠিয়ে দিতুম। তারপর দেবী মূর্তিটা উদ্ধার করে ওর মোটরবোট নিয়ে কিওটা অভিযানে পাড়ি জমাতুম! যাক্ গে, চুপচাপ এস। কী করি দেখো না।'

হ্রদ ঘুরে পুবদিকে গিয়ে ক্যারিবো তার দলবলকে এড়িয়ে প্রিয়বর্ধন আমাকে সমুদ্রের ধারে নিয়ে গেল। তখনও টের পাইনি ওর উদ্দেশ্য। একটু পরে সেটা জানলুম।

এদিকটায় সমুদ্রের খাড়ি। খাড়ির এককোণে মোটরবোটটা আবিষ্কার করতে দেরি হল না। মোটরবোটে কেউ পাহারা দিচ্ছে না। প্রিয়বর্ধন বলল, 'স্টার্ট দেওয়ার উপায় নেই। ক্যারিবোর পকেটে চাবি। কাজেই এসো, এটাকে আমরা কোথাও লুকিয়ে রেখে আসি। ওটার মধ্যে বৈঠা আছে। অসুবিধে হবে না। শিগগির!'

খাড়ির জলটা অপেক্ষাকৃত শান্ত। দক্ষিণ ঘুরে আমরা মোটরবোটটা সেই গুহাওয়ালা পাহাড়ের পেছন দিকে নিয়ে গেলুম। তারপর সংকীর্ণ আরেকটা খাড়ির ভেতর পাহাড়ের তলার দিকে চওড়া ফাটলের ভেতর লুকিয়ে রাখলুম। প্রিয়বর্ধন মোটরবোটের অন্ধিসন্ধি খুঁজে নিরাশ হয়ে বলল,

'ব্যাটারা বৈঠাগুলো বাদে কিচ্ছু রেখে যায়নি। না অস্ত্রশস্ত্র না খাবার-দাবার! মহাধড়িবাজ লোক ওই ক্যারিবো।'

অন্ধকারে এবার আমার দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়েছে। বাঁদিকে পাহাড় ভাঙা চাঙড়ের ওপর দিয়ে উঠে যেতে অসুবিধা হল না। পাহাড়টা শ'দুয়েক ফুটের বেশি উঁচু নয়। এখানে পেছন দিকটা চমৎকার গড়ানে আবার হ্রদের দিকে পৌঁছে প্রিয়বর্ধন একটা প্ল্যান বাতলে দিল।

প্ল্যানটা মারাত্মক। কিন্তু প্রিয়বর্ধনের বুদ্ধিসুদ্ধির ওপর এখন আমার প্রচুর আস্থা জন্মে গেছে। স্পটলাইটটা তেমনি জ্বলছে। আমি চুপিচুপি তখনকার মতো ওটার কাছে এগিয়ে গেলুম। প্রিয়বর্ধন গেল বাঁদিকে হ্রদের কিনারা দিয়ে ঘুরে।

যে পাথরে আলোটা রাখা আছে, তার আড়ালে বসে রইলুম। ক্যারিবোরা এখন চুপচাপ। তাদের নাক ডাকা শুরু হতে আরও ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করতে হল। তারপর হাত বাড়িয়ে আলোর সুইচ অফ করে দিলুম এবং স্পটলাইটটা বাগিয়ে ফেললুম।

তারপর গুঁড়ি মেরে অন্য পাশে গিয়ে প্রিয়বর্ধনের শিসের অপেক্ষা করতে হল। একটু পরেই সেই শিস কানে এল। পাল্টা শিস দিলুম। তখন প্রিয়বর্ধন এসে হাজির হল। ফিসফিস করে বলল, 'মদের নেশায় কাহিল ব্যাটারা। আগে এই মালপত্রগুলো ধরো। তারপর অন্য কথা।'

জিগ্যেস করলুম, 'চাবি হাতাতে পেরেছ তো?'

'হুঁউ। অনেক কিছুই। আমরা এখন রাজা হতে চলেছি।'......

তখন রাত এগারোটা বেজে চল্লিশ মিনিট। আমাদের মোটরবোট ছুটেছে অকূল সমুদ্রে। প্রিয়বর্ধন যা সব হাতিয়ে এনেছে, তা হল : একটা স্টেনগান, একটা কিটব্যাগ, কিটব্যাগের ভেতর শ'তিনেক প্যাকেট করা কার্তুজ আর সেই চুরি যাওয়া দেবীমূর্তি। হ্যাঁ, আরও একটা জিনিস হাতিয়ে এনেছে প্রিয়বর্ধন। একটা খাদ্যদ্রব্যের প্রকাণ্ড প্যাকেট। তার ভেতর জ্যাম, জেলি, সসেজ, ফ্রায়েড ফিশের টুকরো, পাঁউরুটি পর্যন্ত। প্রিয়বর্ধন তবু পস্তাচ্ছিল। 'কেন যে ছাই ওদের কফির ফ্লাস্কটা নিয়ে এলুম না। আহা, সমুদ্রের বুকে কফি খাওয়ার চেয়ে আনন্দ আর কিছুতে নেই।'

এক সময় জিগ্যেস করলুম, 'কিন্তু এভাবে আমরা যাচ্ছি কোথায়? একসময় জ্বালানি ফুরিয়ে যাবে, তখন মোটরবোট অচল হয়ে যাবে না?'

প্রিয়বর্ধনের আনন্দের ঘোরটা এককথায় যেন কেটে গেল। ঝুঁকে পড়ে মোটরবোটের কম্পাস দেখে নিয়ে বলল, 'সর্বনাশ! উত্তরে যেতে গিয়ে যে দক্ষিণে চলেছি। জ্বালানি যা আছে, আর অন্তত ঘন্টা তিনেক চলবে।'

সে মোটরবোটের মুখ ঘুরিয়ে দিল। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, সমুদ্রের এই এলাকায় তীব্র স্রোত আর ঢেউগুলোও রুখে দাঁড়াচ্ছে। যতবার মোড় নেওয়ার চেষ্টা করে মোটরবোট উল্টে যাওয়ার তালে থাকে। তাই হাল ছেড়ে দিয়ে প্রিয়বর্ধন বলল, 'যেখানে খুশি যাক্। আর কিছু করার নেই।'

আসন্ন বিপদের মুখে আমার বুদ্ধি খুলে গেল। স্পটলাইটটা জ্বেলে দিয়ে বললুম, 'প্রিয়বর্ধন, তুমি বলছিলে মূর্তিটার ভেতর কিওটা দ্বীপে যাওয়ার নক্সা আছে। একবার সেটা দেখলে হত না? যদি জ্বালানি থাকতে-থাকতেই আমরা সেখানে পৌঁছে যেতে পারতুম।'

প্রিয়বর্ধন মুখ বেজার করে বলল, 'দেখতে পারো। তবে ক্যারিবোর মতো ঘুঘু যখন হদিশ করতে পারেনি, তুমি পারবে বলে মনে হয় না।'

মূর্তিটা সত্যি অপরূপ। অবিকল আমাদের দেবী সরস্বতীর মতো। হাতে বীণাও রয়েছে। মূর্তিটা পরীক্ষা করে উলটে পালটে দেখেও বুঝতে পারছিলুম না, ওর ভেতরে কিছু থাকতে পারে কি না। সাবধানে মোচড় দিয়ে দেখলুমও প্যাঁচ থাকলে যদি খোলা যায়। কিন্তু মূর্তিটা নিরেট।

হঠাৎ চোখ পড়ল ওটার মাথার পেছনে। একটা পেরেকের মতো। ওটাতে যেই চাপ দিয়েছি, তলার দিকের একটা জায়গা ঢাকনার মতো খুলে গেল। আর ঠকাস করে কী একটা পড়ল নিচের পাটাতনে। কুড়িয়ে দেখি, একটা কাত্তি!

অবিকল একই কাত্তি—যেমনটি রাজাকোর টুপির ভেতর পেয়েছিলুম। একই নকশা। প্রিয়বর্ধন বাঁ হাত বাড়িয়ে কাত্তিটা নিয়ে উলটেপালটে দেখে ফেরত দিল। বুঝলুম, কাত্তি জিনিসটা কী ও জানে না।

কাত্তিটাকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে আবিষ্কার করলুম, নকশাগুলো একদিকে নেমে গিয়ে যেন হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে বেখাপচাভাবে। মাঝখানে একটা তেমনি গাছ আছে, কিন্তু শেকড়গুলো কিনারায় হঠাৎ শেষ হওয়ায় মনে হল, জায়গার অভাবে পুরোটা আঁকা হয়নি, নাকি এটা আঁকিয়ের খেয়াল? ইংরেজি এ বি সি ডি ই এফের পর জি'য়ের আধখানা কাটা।

তাহলে কি এটা অন্য একটা কাত্তির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার জন্য? অর্থাৎ রাজাকোর টুপির ভেতর পাওয়া কাত্তিটা না পেলে এটার রহস্য উদ্ধার করা যাবে না?

উলটো পিঠটা দেখামাত্র আমার সংশয় ঘুচে গেল। উলটো পিঠে গাছটা নেই শেকড়গুলো আছে। এ বি সি ডি ই এফ নেই, জি এইচ আই জে কে এল আছে। রাজাকোর কাত্তির উলটো পিঠটা ভাল করে লক্ষ্য করিনি। এর মানে দাঁড়াল : দুটো কাত্তি পরপর মিলিয়ে রাখলে দু'পিঠে দুটো শেকড়ওলা গাছ দেখা যাবে এবং বারোটা রোমান হরফ দেখা যাবে চক্রকারে সাজানো।

প্রিয়বর্ধনকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলে সে আরও হতাশ হয়ে পড়ল!...

ভোর চারটেয় আমাদের মোটবোটের জ্বালানি ফুরিয়ে গেল। বৈঠা টানা নিরর্থক। তীব্র সমুদ্রস্রোত আর পেছনের ঢেউয়ের ধাক্কায় বোট গতিহারা হতে পারছে না।

দেখতে দেখতে দিনের আলো ফুটে উঠেছিল। সেই ধূসর আলোয় আমাদের এতক্ষণে চোখে পড়ল সামনে দীর্ঘ একটা কালো রেখা যেন। প্রিয়বর্ধন চেঁচিয়ে উঠল আনন্দে, মাটি। মাটি! আমরা মাটির দিকে চলেছি!'

সমুদ্রের চারদিকে চাপচাপ লাল রং। প্রথম সূর্যের আভা ঝলমলিয়ে উঠেছে। প্রিয়বর্ধন মোটরবোটের সামনের ড্রয়ার খুঁজে একটা বাইনোকুলার পেয়ে গেল। দূরবীক্ষণ যন্ত্রটাতে চোখ রেখে সেই কালো রেখাটা দেখার পর সে গম্ভীর মুখে বলল, 'আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের মৃত্যু হবে জয়ন্ত! ঈশ্বরের নাম জপ করো! ওই মাটি কবরের মাটি।'

ঝটপট ওর হাত থেকে বাইনোকুলারটা নিয়ে চোখে রাখলুম। দীর্ঘ আলো রেখাটা প্রবাল বলয়। খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সমুদ্রের ওপর। ডানদিকে অনেকটা জায়গা ভাঙা। আর ভেতর দিয়ে একটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে। দ্বীপের বুকে ঘন জঙ্গল। প্রথম আলোয় সবুজের জেল্লাও চোখে পড়ছিল।

প্রিয়বর্ধন করুণ মুখে বলল, 'আমদের বোট কোরাল রিফে গিয়ে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে গুঁড়ো হয়ে যাবে। কী তীব্র স্রোত দেখতে পাচ্ছ না জয়ন্ত?'

বললুম, 'ওই ভাঙা জায়গায় বোট নিয়ে গেলে বেঁচে যাব। এস প্রিয়বর্ধন, বৈঠা নাও!'

প্রিয়বর্ধন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বৈঠা নিল। দু'জনে প্রাণপণে বৈঠা টেনে বোটের মুখ প্রবাল পাঁচিলের ভাঙা অংশটার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলুম। যত এগিয়ে যাচ্ছি, তত প্রবাল পাঁচিলটা উঁচু মনে হচ্ছে। আন্দাজ শ'দুই মিটার দূরত্বে পৌঁছে যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল। ছিটকে গিয়ে সমুদ্রে পড়লুম। জলে না পড়লে গুঁড়ো হয়ে যেত এই মরদেহ।

সাঁতার কেটে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলুম ভাঙা অংশটার দিকে। ভেসে থেকে প্রিয়বর্ধনকে খুঁজছিলুম। দেখি, সেও আমার মতো সাঁতার কাটছে। বুঝলুম ডুবো পাথরে ধাক্কা লেগে বোটটা ভেঙে-চুরে গেছে। ওলটপালট খেতে কাঠের বড় বড় ফালি ফেনার ভেতর মাছের মতো ভেসে

চলেছে প্রবাল পাঁচিলের দিকে। ঢেউ ভাঙার গর্জন, ফেনা, জলোচ্ছ্বাস—চারদিকে যেন প্রলয় চলছে।

তারপর পায়ে শক্ত পাথর ঠেকল। সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে প্রিবর্ধনকে আর দেখতে পেলুম না। কিন্তু তার কথা ভাবতে গেলে নিজের প্রাণ বাঁচানো সংশয়—তাছাড়া যাকে দেখতে পাচ্ছি না, তাকে উদ্ধার করব কী ভাবে? জলের ধাক্কায় পিছলে যাচ্ছি বারবার। হাঁচড়-পাঁচড় করে জল ভাঙা অংশটা পেরিয়ে গেলুম। এবার জলটা শান্ত—নিস্তরঙ্গ। সাঁতার কেটে বিচের দিকে এগিয়ে যেতে আর অসুবিধা হল না। মাথা ঘুরছিল। তখন পা ছড়িয়ে চিত হয়ে শুয়ে রইলুম।

আচ্ছন্ন অবস্থায় কতক্ষণ শুয়ে ছিলুম জানি না, এক সময় মনে হল কোথায় যেন অনেক দূরে চাপা গম্ভীর অর্কেস্ট্রা বাজছে। নিশ্চয় এই দ্বীপে কোনও গির্জা আছে। সেখানে এক প্রার্থনা সঙ্গীতের আয়োজন বুঝি। আশ্রয় পাব। খাদ্য পাব। দেশে ফিরে যাব। আনন্দে মন ভরে গেল।

খুব আশা ও উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালুম। বেলাভূমির ওপর দিকে ঘন বনের ভেতর থেকে সেই চাপা গম্ভীর অর্কেস্ট্রাধ্বনি ভেসে আসছে। কিন্তু যেই কয়েক পা এগিয়ে গেছি, কেউ খ্যানখেনে গলায় চেঁচিয়ে বলল, 'স্টপ ইট! স্টপ ইট! আই সে—স্টপ ইট!'

অলীক আর্তনাদ

'স্টপ ইট! স্টপ ইট! আই সে—স্টপ ইট!'

একবার নয়, বারবার কেউ ভূতুড়ে গলায় ধমক দিতে থাকল। সেই কণ্ঠস্বর যে মানুষের নয়, আমি হলফ করে বলতে পারতুম। থমকে দাঁড়িয়ে গেছি এবং ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছি। 'স্টপ ইট! স্টপ ইট! আই সে—স্টপ ইট'—ঝাঁকুনি খেতে খেতে শব্দগুলো ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে প্রতিধ্বনির মতো। তারপর তাদের তীব্রতা ক্ষয়ে যাচ্ছে। হেঁপো রোগীর মতো শ্বাস-প্রশ্বাস জড়ানো গলায় মাথাকুটে নিষেধ করার ভঙ্গিতে কেউ কাউকে কিছু করতে বারণ করছে। তারপর শব্দগুলো শ্বাস-প্রশ্বাসে মিশে যেতে থাকল। 'স্টপ ইট! স্টপ ইট! আই সে—স্টপ ইট!' তারপর যেন বাতাসের সঙ্গে মিলিয়ে গেল।

সেই চাপা গম্ভীর অর্কেস্ট্রার বাজনার দিকে কান গেল এবার। বাজনাটাও ততক্ষণে ক্ষীণ হয়ে এসেছে। মনে হল, যেন আমার মাথার ভেতরই সেই আশ্চর্য সুন্দর সঙ্গীত শুনছি...অসংখ্য ঝিল্লির ডাকের মতো, অতি মৃদু, শ্রুতিপারের সেই ধ্বনি।

তারপর তাও একইভাবে মিলিয়ে গেল। মুহূর্তের জন্য আমার মনে কী এক অনুভূতি ঝিলিক দিল। এ আমি কোথায় এসে পড়েছি তাহলে? আমার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে সকাল-বেলার শান্ত নরম রোদে সবুজ বনভূমি ঝলমল করছে। উঁচু ও নিচু, ছোট এবং বড়, স্থূল এবং শীর্ণ নানা আকৃতির উদ্ভিদ। তাদের অনেকেই থরে থরে ফুলে ফুলে সাজানো। মাটির ঘাসে ফলের গয়না পরে পরীদের মতো পা ছড়িয়ে বসে আছে কেউ কেউ। সুগন্ধে বাতাস মউমউ করছে। চারদিকে এখন যেন শব্দহীন হাসি, যেদিকে তাকাই সেদিকেই বালক-বালিকারা খুশিখুশি মুখে এক বিদেশি অতিথিকে বরণ করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে বলে ভুল হয়। কোথাও দেখি সারবদ্ধ ঋজু বৃক্ষ প্রাজ্ঞ মানুষের গাম্ভীর্য নিয়ে আমাকে নিরীক্ষণ করছে। কোনও-কোনও বৃক্ষ যেন ভ্রূ কুঞ্চিত করেছে—সন্দেহকুটিল সংশয়ান্বিত ভঙ্গি। ফলভারে নুয়ে পড়া এক বৃক্ষ বুঝি জননীর স্নেহে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তরুণ বৃক্ষেরা তাদের বলিষ্ঠ পেশল বাহু বাড়িয়ে হয়তো আমাকে আলিঙ্গন করতে চাইছে। এ আমি কোথায় এলুম? প্রতিটি ঝোপঝাড়, গাছ, ঘাসের শব্দহীন ভাষা যেন আমার বোধের ভেতর স্পষ্ট হয়ে উঠছে। লক্ষ লক্ষ কথা নিঃশব্দে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আমার মস্তিষ্কে—মস্তিষ্ক থেকে মনে সেই সব দুর্জ্ঞেয় কথা স্পন্দনের হ্রস্ব-দীর্ঘ তরঙ্গিত রেখায় বিচিত্র

কোডের মতো জমে উঠছে আমার মস্তিষ্ককোষে। এ বুঝি এক অদৃশ্য বেতার তরঙ্গ। কিন্তু ডি-কোডিং পদ্ধতি আমার জানা নেই বলে অর্থ নিষ্কাশন করতে পারছি না। অসহায় ব্যর্থ বিষণ্ণ এক মানুষ ঘটনাচক্রে এসে পড়েছি এক বিরাট মৌন চেতনার দরজায়। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছি আর তাকিয়ে আছি।

হঠাৎ আমার তন্ময়তা কেটে গেল। স্বপ্নবৎ আচ্ছন্নতা ঘুচে গেল। মুহূর্তের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে উঠল একটা জ্ঞান—যা এতক্ষণ আমার নাগালেই ছিল, অথচ গ্রাহ্য করিনি। আর সেই জ্ঞান আমাকে কিছুক্ষণের জন্য উত্তেজনায় আনন্দে বদ্ধ উন্মাদে পরিণত করে ফেলল। আমি বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের ইউরেকা বলে চিৎকার করে ছোটাছুটি করার ভঙ্গিতে 'কিওটা! কিওটা!' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে এবং দু'হাত তুলে লম্ফঝম্ফ করতে করতে দৌড়ে গেলুম। অপেক্ষাকৃত ফাঁকা অংশ দিয়ে ঢুকে একটা খোলামেলা সবুজ মাঠের ওপর ধপাস করে পড়ে বারকতক গড়াগড়ি খেলুম। তারপর আবার দৌড়ুতে শুরু করলুম। আমি সত্যি সত্যি বদ্ধ পাগলের মতো চিৎকার করছিলুম, 'কিওটা! কিওটা! কিওটা!'

হ্যাঁ, এই সেই আশ্চর্য দ্বীপ কিওটা। কোথাও রঙ্গো-রঙ্গো পুঁথিতে বর্ণিত 'স্পিকিং উডস'—কথা বলা বনের দেশ। এই সেই প্রাচীনযুগের নাবিকদের কিংবদন্তির দ্বীপ 'সঙ্গীতকারী বৃক্ষের বাসস্থান কিওটা!'

ঘাসের ভেতর লুকিয়ে থাকা পাথরে ঠোক্কর খেয়ে ছিটকে পড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে উন্মাদনাটা কেটে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়ালুম। নিজের পাগলামির কথা ভেবে খারাপ লাগল। এবার আমার সবচেয়ে জরুরি জিনিস হল মানসিক সুস্থতা।

ঘাসের মাঠটা বিশাল। এখানে-ওখানে উজ্জ্বল নানা রঙের পাথর ছড়িয়ে আছে। কোথাও একলা কোনও গাছ বা ঝোপ, কোথাও নিবিড় উঁচু ঘাস। একটা নিচু ঝাঁকড়া গাছে আপেলের মতো ফল ধরে আছে দেখে সেদিকেই এগিয়ে গেলুম। ওগুলো ব্রেডফ্রুট বলে মনে হচ্ছিল। কয়েক পা যেতেই এক অবাক কাণ্ড ঘটল। রুবিদ্বীপে রাজাকোর জাদুঘরে ব্যুমেরাং-আকৃতির যে জ্যান্ত জিনিসটা দেখেছিলুম, কর্নেলকথিত সেই 'কাঠকার'-এর একটা ঝাঁক ঘাসের ভেতর থেকে লাফিয়ে উঠল। তারপর দল বেঁধে লাফাতে লাফাতে উঁচু ঘাসবনের ভেতর গিয়ে ঢুকল।

ফলের গাছটার তলায় চওড়া বেদির মতো পাথর। সেটাতে চড়ে একটা ফল ভাঙতে হাত বাড়িয়েছি, একটা হাতে ডাল ধরে নুইয়ে রেখেছি, অমনি ডালটা আমার হাত ছাড়িয়ে সটান সোজা হয়ে গেল। নাগাল পেলুম না। তারপর যে ডালটা ধরতে যাই, একই কাণ্ড। গাছটা প্রাণীর মতো জ্যান্ত এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনে সক্ষম দেখে হতবাক হয়ে গেলুম। একটু পরে গাছটার সবগুলো ডাল সোজা হয়ে গেল। প্রকাণ্ড এবং বেঁটে তালগাছের মতো দেখাল গাছটাকে। আমি তার দিকে চেয়ে কাকুতিমিনতি করে বললুম, 'লক্ষ্মী ভাইটি! বড্ড খিদে পেয়েছে। অমন কোরো না।'

আমার দুর্ভাগ্য, মানুষের ভাষা ওকে কিছুতেই বোঝাতে পারলুম না। ইশারা-ইঙ্গিত করে বোঝাবার চেষ্টা করলুম যে সত্যি আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। কিন্তু হতচ্ছাড়া গাছটা তেমনি সাধুর মতো ঊর্ধ্ববাহু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। লোভনীয় রঙিন ফলগুলি আমার নাগালের বাইরে উঁচুতে দুলতে থাকল।

এতক্ষণে আমার মাথায় এল, এর মধ্যে হয়তো আজগুবি ব্যাপার নেই। লজ্জাবতী লতার মতো কোনও প্রকৃতিক নিয়মেই গাছটার মধ্যে সংকোচন ঘটেছে আমার ছোঁয়ায়। গাছটার গুঁড়িতে খোঁচাখোঁচা কাঁটাও রয়েছে। একটু তফাতে সরে গিয়ে একটুকরো পাথর কুড়িয়ে নিলুম। পাথরটা ছুঁড়তে যাচ্ছি, হাতের তালু ছ্যাক করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে পাথরটা ফেলে দিলুম। তারপর দেখি, ও হরি! ওটা আদতে পাথরই নয়—ধূসর রঙের একটা প্রজাপতি। ডানা গুটিয়ে পড়েছিল ঘাসের ফাঁকে। ভারি অদ্ভুত প্রজাপতি তো!

এবার কালো রঙের সত্যিকার একটা পাথর কুড়িয়ে নিলুম। পাথরটা ফল লক্ষ্য করে ছুড়ে মারলুম। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। ফলগুলোও যেন অসম্ভব ধূর্ত। পাথরের লক্ষ্যপথ থেকে কেমন ঝটপট সরে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ চেষ্টার পর হাল ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেলুম। এতক্ষণে আবিষ্কার করা গেল, এই দ্বীপে নারকোল গাছ নেই। শুধু তাই নয়, এখানকার সব গাছ—সমস্ত উদ্ভিদ যেন অন্যরকমের। কোনওটাই আমি এর আগে দেখিনি কোথাও এমনকী যে ঘাসগুলো আমি মাড়িয়ে এলুম, সেগুলোও আমার অচেনা। যত রকমের ঘাস আজীবন দেখেছি, তার সঙ্গে কোনও মিল নেই এ ঘাসের। ভেলভেটে বোনা পুরু এবং নকশাদার এই ঘাসের সৌন্দর্য বিস্ময়কর। লক্ষ্য করে দেখলাম, কোথাও রুগ্‌ণ, হাড়জিরজিরে কোনও গাছ নেই। প্রত্যেকটি সবল, নিটোল, বর্ণাঢ্য—যেন ছবিতে যত্ন করে আঁকা।

একটা প্রকাণ্ড গাছের গায়ে হাত রেখেই চমকে উঠলুম। কোনো প্রাণীর গায়ে হাত রাখলে যে অনুভূতি অবিকল। বৃক্ষের প্রাণ আছে সে তো জানি! কিন্তু এত প্রাণ! এত তীব্র চেতনা! আমার দিকে তাকিয়ে আছে তীব্র চেতনাসম্পন্ন উদ্ভিদরূপী প্রাণীযূথ যেন।

একটা ঝোপে আঙুরের গুচ্ছ গুচ্ছ ফল দেখে সেদিকে ব্যস্তভাবে ছুটে গেলুম। গোলাপি রঙের সুন্দর ফলগুলি রসে টলটল করছিল। কিন্তু হাত বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ মনে হল, কে যেন নিষেধ করছে।

কোনও কণ্ঠস্বর শুনিনি অস্বাভাবিক নির্জনতা ছমছম করছে চারদিকে। অথচ আমার মনে হল, আমার মাথার ভেতর ঝিঁঝি পোকার মতো শ্রুতিপারে এক অনুভূতিময় সুর একটা নিষেধাজ্ঞা শোনা যাচ্ছে। কে যেন বলছে, ওই সুন্দর ফলগুলো বিষাক্ত।

মন থেকে ধারণাটা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলুম না। একি আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের বোধ? সঠিক বলা কঠিন। যে বোধ মানুষকে অনেক সময় বিপদের পূর্বাভাস দিয়ে সতর্ক করতে চায়, এ কি সেই বোধ? প্রাণীদের মধ্যে এই বোধ এখনও লুপ্ত হয়নি — প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষও হয়তো এই ক্ষমতার অধিকারী ছিল। কিন্তু সেই বোধ আমার মতো একজন সভ্য জগতের আধুনিক মানুষের মধ্যে টিঁকে আছে—নাকি কিওটা দ্বীপে পৌঁছনোর পর কোনও প্রকৃতিক নিয়মে তা ফিরে এসেছে আমার মধ্যে?

ব্যাপারটা যাই হোক, ফলের ঝোপটার সঙ্গে আমার যেন একটা টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ ঘটছিল। আমি সেখান থেকে হতাশ হয়ে সরে গেলুম অন্যখানে।

খাদ্যের সন্ধান আমাকে করতেই হবে। বরং সমুদ্রের ধারে গিয়ে দেখি, যদি মাছ মারতে পারি।

গাছপালার ফাঁক দিয়ে সমুদ্র দেখা যাচ্ছিল। এদিকটায় জঙ্গল খুব ঘন। অসংখ্য গাছ বুড়ো হয়ে ভেঙে পড়েছে কালক্রমে। তার ওপর আবার গাছের চারা গজিয়েছে। এতক্ষণে পাখির ডাক কানে এল। তাহলে কিওটাতে প্রাণীও আছে! মনে হল, দ্বীপের পাখিরা আমার মতো এক আগন্তুককে দেখে যেন ভয় পেয়ে এতক্ষণ আড়ালে সরে গিয়েছিল। ক্রমশ সাহস পেয়ে তারা একে একে বেরিয়ে আসছে এবং মন খুলে গান গাইতে শুরু করেছে। কিন্তু চেষ্টা করেও একটা পাখি আমার চোখে পড়ল না।

তারপর একটা ময়াল জাতীয় প্রকাণ্ড সাপকে একটা গাছের ডালে ঝুলতে দেখলুম! হ্যাঁ—সাপও আছে। কিওটা তাহলে মানুষের পক্ষে একটা নিরাপদ জায়গা নয়। এক দৌড়ে সমুদ্রের ধারে গিয়ে হাজির হলুম। এবার সাপের কথা ভেবে বুক ঢিপঢিপ করছিল।

সূর্যের অবস্থান দেখে বুঝতে পারলুম এদিকটা উত্তর দিক। আমি দ্বীপে এসেছি পূর্বদিক থেকে। সামনে বিস্তীর্ণ জলের পর প্রবাল পাঁচিল কালো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার বাঁদিকে টানা বিচ ক্রমশ ঘুরে গেছে দক্ষিণে। বিচের বাঁকের মুখে পাহাড়ি খাড়ি। এখানে জলটা তত পরিষ্কার নয়।

ঢেউয়ের চোটে বালি ভেসে উঠেছে। চাপচাপ শ্যাওলা জাতীয় গাছ আছে জলের ভেতর। তাই ভাবলুম, খাড়ির জলটা পরিষ্কার হতে পারে। ওখানে পাথরের ফাঁকে নিশ্চয় মাছের ঝাঁক চোখে পড়বে।

যেতে যেতে বাঁদিকে জঙ্গলের ভেতর বেহালার বাজনা শুনে থমকে দাঁড়ালুম। সত্যি বাজছে, নাকি কানের ভুল, ঠিক করতে পারলুম না। কিন্তু বড় করুণ সুর সেই অলীক বেহালার। এ এক আশ্চর্য মায়াজগৎ যেন, যেখানে যখন তখন বেজে ওঠে গম্ভীর অর্কেস্ট্রাধ্বনি কিংবা বেহালা সুর। বিচিত্র অনুভূতি জেগে ওঠে মনে। আবেগে হৃদয় দুলতে থাকে। সুরটা শুনতে শুনতে আমার চোখে জল এসে গেল।

কিন্তু সব মিথ্যা পেট সত্য। বহুকাল আগেই পথের ধারে এক দেহাতী ম্যাজিশিয়ানের মুখে খেলার শেষে শুনেছিলুম এই পরম সত্য কথাটা। খিদে আর তেষ্টার কথা সম্ভবত যত ভাবা যায়, তত বেড়ে ওঠে। ক্যারিবোর রুটি-জ্যাম-সসেজ সেই মধ্যরাতে সমুদ্রের বুকে সাবাড় করেছি। এখন সেকথা ভেবে জিভে জল আসছিল। অদৃশ্য বেহালাবাদক সেটা টের পেয়েই যেন হঠাৎ বাজনা বন্ধ করে দিল।

বাঁকের মুখে খাড়ির ধারে এসেই মন নেচে উঠল। পাহাড়ের মাথায় একখানে সাদা একটা রেখা দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিলুম। না—চোখের ভুল নয়। ওটা একটা ঝরনা। সরু ফিতের মতো নেমে এসে লোনা খাড়ির জলে ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে।

এরপর নিজের তৎপরতায় নিজেরই অবাক লাগছিল। খাড়িতে বড় বড় পাথর পড়ে আছে। তার ফাঁকে অতি স্বচ্ছ জলে ম্যাকারেল জাতীয় মাছের ঝাঁক খেলা করছিল। পাথর মেরে একটাকে বধ করতে দেরি হল না। মাছটার ওজন কমপক্ষে শ'দুই আড়াই গ্রাম না হয়ে যায় না।

প্রিয়বর্ধনের পদ্ধতিতে দু-টুকরো শুকনো কাঠ ঘষে আগুন জ্বেলে মাছটা পুড়িয়ে রাক্ষসের মতো খেলুম বিচে বসে। তারপর পাহাড়ে চড়া শুরু হল। মাউন্টেনিয়ারিং ট্রেনিং নেওয়াটা এভাবে কত জায়গায় কাজে লেগেছে বলার নয়। ঝরনার কাছ ঘেঁষে একটা চাতাল মতো জায়গা দেখতে পেলুম। সেখানে পৌঁছে প্রাণ ভরে জল খেয়ে দ্বীপের দিকে ঘুরে দাঁড়ালুম।

আগের দ্বীপটার চেয়ে এই দ্বীপটা বহুগুণে বড়। উঁচু থেকে ভূ-প্রকৃতি ঠাহর হচ্ছিল। মাঝে মাঝে খোলা মাঠ, আবার বিস্তীর্ণ সবুজ ঘাসের জমি। পাখির ঝাঁক চোখে পড়ছিল। এই তাহলে সেই আশ্চর্য দ্বীপ কিওটা।

এবার একটু ভাবনায় পড়ে গেলুম। আমি হয়তো চেষ্টা করলে জর্জ ব্যুগেনভিলির মতো ভেলা তৈরি করে সমুদ্রে ভাসতে পারি—কোনও জাহাজ দৈবাৎ আমাকে দেখে উদ্ধার করলেও করতে পারে, নয়তো হাঙারের পেটে হজম হয়ে যেতে পারি। এই আশ্চর্য আবিষ্কার আমি লাগাতে পারব না। আমি বিজ্ঞানী নই। কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের মতো সাধারণ বিজ্ঞান সম্পর্কেও আমার তত বোধবুদ্ধি নেই। তাহলে এই অবিষ্কার মানুষের অতীতকালের এক কিংবদন্তিকে পুষ্ট করা ছাড়া আর কী কাজে লাগবে?

হতাশা পেয়ে বসল ক্রমশ। কর্নেলের কথা ভাবতে থাকলুম। ধুরন্ধর প্রাজ্ঞ বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি এখন কোথায়? আমার নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া নিয়ে হয়তো সূত্র চুঁড়ে চুঁড়ে হন্যে হচ্ছেন রুবিদ্বীপে। কিওটা পৌঁছনোর যত চেষ্টা করুন, দ্বিতীয় কাস্তিটার অভাবে পথ খুঁজে পাবেন না—এটা নিশ্চিত।

শুধু একটাই আশা। কর্নেল চিরদিন রহস্যময় অজানার সন্ধানে পাড়ি জমাতে পিছপা হননি। অসাধারণ তাঁর বুদ্ধির চাতুর্য। তাঁর মেধা তুলনাহীন।

ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম কখন সেই চাতালে। ঘুম ভেঙে দেখি, বিকেল হয়ে গেছে। কী লম্বা ঘুম না ঘুমিয়েছি তাহলে। মাছটা দেখছি খিদে মেটাতে অদ্বিতীয়। কী মাছ কে জানে, মনে হচ্ছে খিদে জিনিসটা চিরকালের মতো শেষ হয়ে গেছে। শরীর ঝরঝরে লাগছে। স্ফূর্তিতে পেশি

চনমন করছে। চাতাল বেয়ে সমুদ্রের বিচে নামতে থাকলুম। কেউ আমাকে দেখলে পাগল ভাবতে পারত। ফর্দাফাই পোশাক, খালি পা, রুক্ষ চিটচিটে চুল।

নিচে বড় বড় পাথরের টুকরোর ভেতর গাছপালা আর ঝোপ গজিয়ে রয়েছে। সেখানে যেই পৌঁছেছি, ডান দিকে জঙ্গলের ভেতর কেউ চেরা গলায় আর্তনাদ করে উঠল—'ও ডোন্ট কিল মি!' তারপরই কেউ গর্জন করে বলল, 'মাস্ট কিল ইউ! কিল ইউ...কিল ইউ...এবং আর্তনাদের পর আর্তনাদ—'হেল্প! হেল্প! হেল্প!'

সারা বনভূমি জুড়ে 'কিল' এবং 'হেল্প' কথা দুটো জড়িয়ে যেতে যেতে প্রতিধ্বনিত হতে হতে ছড়িয়ে পড়ছে। উত্তেজনায় আবার সেই উন্মাদনা আমাকে পেয়ে বসল। একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে জঙ্গলের ভেতর দৌড়ুতে শুরু করলুম। লোকটাকে বাঁচানোর জন্য আমি মরিয়া।...

স্বপ্ন কিংবা স্বপ্ন নয়

ফাঁকা মাঠে গিয়ে পড়তেই হত্যাকারীর অমানুষিক গর্জন আর আক্রান্তের আর্তনাদ ক্রমশ মিলিয়ে গেল। অমনি আমার সম্বিৎ ফিরে এল। মনে পড়ে গেল সকালের সেই 'স্টপ ইট' বলে ধমকের কথা। কিওটা দ্বীপে এইসব অদ্ভুত চিৎকার-চেঁচামেচি যে নিছক অতীতের কিছু ঘটনার অলীক প্রতিধ্বনি, তাতে ভুল নেই। হাতের পাথরটা ফেলে দিলাম।

কিন্তু অবাক লাগল নিজের এই উত্তেজনা আর উন্মাদনা দেখে। আমি কি খুব শিগগিরির পাগল হয়ে যাব? এই অত্যাশ্চর্য দ্বীপ আমাকে বদ্ধ পাগলে পরিণত করে ফেলবে, যদি না আমি সচেতন থাকি প্রতিমুহূর্তে। খাড়ির ধারে যেতে যেতে সকালে করুণ বেহালার সুর শুনে আমি তো কেঁদে ফেলেছিলুম! ভাগ্যিস প্রচণ্ড খিদে আমার মানসিক সুস্থতা ফিরিয়ে দিয়েছিল।

শান্তভাবে দাঁড়িয়ে ভাবছিলুম, আমি জয়ন্ত চৌধুরি। কলকাতার দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার সাংবাদিক। ঘটনাচক্রে এই ভুতুড়ে দ্বীপে এসে পৌঁছেছি। আমার মাথাটা ঠিক রাখতেই হবে। এইসব বিচিত্র, প্রাণবন্ত ও সচেতন উদ্ভিদের ব্যাপার-স্যাপার খুঁটিয়ে জানতে এবং বুঝতে হবে। ভড়কে যাওয়া চলবে না।

আমার খুব কাছেই একটা ফুট চারেক উঁচু চওড়া পাতাওয়ালা ঝোপ ছিল। তার ডগায় বেগুনি রঙের থোকা থোকা ফুল। ফুলের ডাঁটিগুলো শুঁড়ের মতো দেখতে। হঠাৎ সুড়সুড়ি খেয়ে চমকে উঠে দেখি, কয়েকটা ফুলওয়ালা শুঁড় আমার ছেঁড়া শার্টের ভেতর দিয়ে পাঁজরে ঘষা খাচ্ছে। একটু সরে গেলুম। শুঁড়গুলোও আমার নাগাল পেতে ঘুরে এল। কী করে দেখার জন্য আমি হাত বাড়িয়ে দিলুম। আমার হাতটা পেঁচিয়ে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে ছাড়িয়ে নিলুম এক ঝটকায়। তারপর দেখি ঝোপটা ভীষণ কাঁপতে কাঁপতে এপাশে ওপাশে লুটোপুটি খাওয়ার তাল করছে।

সঙ্গে সঙ্গে টের পেলুম, ঝোপটা তার নিঃশব্দ ভাষায় খিলখিল করে হাসছে। আমার সঙ্গে দুষ্টুমি করছিল বুঝি—আমার ভয় পাওয়া দেখে এখন হেসে বাঁচে না। আমি ভেংচি কেটে বললুম, 'লজ্জা করে না হাসতে? আমার মতো দুর্ভাগার সঙ্গে রসিকতা করতে একটুও বাধছে না?'

রাগ করে হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা তফাতে চলে গেলুম। এখানে পায়ের তলায় ঘাস যেন ঘাস নয়। মখমলে মোড়া ফোম। কয়েক টুকরো পাথরের ভেতর থেকে একটা লিকলিকে গাছ উঠেছে—আমার মাথার সমান উঁচু। পাতাগুলো দেবদারুর মতো দেখতে। গাছটায় পিচফলের মতো অজস্র ফল ধরে আছে। দেখা যাক, এই গাছটা আমাকে একটা ফল দেয় নাকি।

ভাবা মাত্র গাছটা আমার দিকে ঝুঁকে এল এমনকি একটা ফলে ভর্তি ডাল এগিয়ে এসে আমার ঠোঁট স্পর্শ করল। মুখ সরিয়ে নিতে গিয়ে মনে হল, এই দয়ালু বৃক্ষ মশায় আমাকে যখন তার ফল

খাওয়াতেই চাচ্ছে, তখন প্রত্যাখ্যান করাটা উচিত হবে না। তাকে আরও পরীক্ষা করার জন্য আমি হাঁ করলুম। একটা থোকা এসে আমার মুখের ভেতর ঢুকে গেল।

আহা, কী অপূর্ব স্বাদ ফলগুলোর। কয়েক থোকা ফল সাবাড় করে গাছটাকে সাষ্টাঙ্গে একেবার প্রণিপাত করে ফেললুম। তারপর দারুণ স্ফূর্তি লাগল। খোলা বিরাট মাঠটায় দৌড়তে শুরু করলাম। কখনও ডিগবাজি খেয়ে, কখনও ছুটোছুটি করে একটি ধেড়ে শিশু হয়ে পাখির ঝাঁকের পেছনে তাড়া করে সে এক উদ্দাম স্ফূর্তি।

তারপর গান গাইতে ইচ্ছে করল। তার পরে গান ধরলুম—মাথায় যা এল, সেই কথা দিয়ে অগড়ুম-বাগড়ুম একখানা বিকট গান।

'স্বগ্গে এসে গেছি ভাইরে
স্বগ্গে এসে গেছি হো হো স্বগ্গে এসে গেছি।'

কতক্ষণ পরে আমার সম্বিৎ ফিরল। থমকে দাঁড়ালুম। এ আমি কী করছি। সর্বনাশ পাগলামির লক্ষণ যে ফুটে বেরুচ্ছে আমার আচরণ! ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। কখন বিকেলে গাঢ় পাটকিলে রঙের রোদ ফুরিয়ে ধূসরতা ঘনিয়ে উঠেছে। চারপাশে নীলাভ কুয়াশা জমে উঠেছে। আমার পায়ের কাছে ঠাহর করে দেখি, ব্যুমেরাং গড়নের কাঠপোকাদের দল ঘাসে মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছে। আঁতকে উঠে সরে গেলুম।

তারপর সোজা পুবের বিচের দিকে হনহন করে চলতে থাকলুম। ওদিকটা ফাঁকা। সমুদ্র জুড়ে আবছা লালচে আভা মিলিয়ে গেল। প্রবাল পাঁচিলের ভাঙা অংশটার ওপারে দিগন্ত রেখা আর চেনা যাচ্ছিল না। কিন্তু বাতাসটা কেমন যেন ঈষদুষ্ণ ফুলের সুন্দর গন্ধ সন্ধ্যার মুখে আরও ঝাঁঝালো হয়ে উঠেছে। ওপর দিকটায় পাথরের চওড়া চাতাল মতো একটা জায়গায় বসে পড়লুম।

শুঁড়ের মতো শিসওয়ালা সেই বেগুনি ফুলের আচরণের কথা মনে পড়ছিল। মনে পড়ছিল ফলদাতা শীর্ণ গাছটার কথাও। এর একটা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা থাকা উচিত বৈকি। কোনও লতানে গাছ কোনও জিনিসকে আঁকড়ে ধরে পেঁচিয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করে। এতে তার বহুক্ষণ সময় লাগে। এমন যদি হয়, লতানে গাছটার এই গতিকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তাহলে কী হবে? ওই বেগুনি ফুলের শিসের মতোই আচরণ করবে না কি? তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে নাড়িয়ে দিয়েছিলুম মনে পড়ছে। একটা ব্যাখ্যা এ থেকে মেলে। আমার শরীর থেকে খানিকটা গতিশক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল গাছটার মধ্যে। তার সঙ্গে যদি তার নিজের গতিশক্তি যোগ করা হয়, তাহলে দ্বিগুণ গতির চাপে সে কাঁপবে, কিছুক্ষণ ধরে আন্দোলিত হবে। এ তো স্বাভাবিক ব্যাপার।

আর ওই ফলের গাছটার মধ্যে এমন কোনও উপাদান আছে, আমার শরীরের কোনও উপাদান যাকে আকর্ষণ করতে পারে। হয়তো আমার মুখের ভেতর সেই আকর্ষণ জিনিসটা আছে—চুম্বকের মতো তার টান।

আমার সাধারণ বুদ্ধিতে এইসব ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে ফেললুম। সেই চিৎকার-চেঁচামেচির একটা ব্যাখ্যা আগেই এসেছে। এ বিশ্বের স্পেস বলতে যা বোঝায়, তা কিন্তু আদতে শূন্য নয়। আধুনিক বিজ্ঞানীর মতে, শূন্যস্থান বলে কিছু নেই। আর স্পেসে সব ধ্বনি আসলে স্পন্দনের তরঙ্গরেখা হয়ে অনন্তকাল আঁকা থেকে যায়। তেমনি সব দৃশ্যের চিত্ররূপও হয়তো স্থানকালব্যাপী অক্ষয় হয়ে থাকে। হিরোশিমায় অ্যাটম বোমা পড়ার সময়কার দৃশ্যগুলি পরবর্তী সময়ে বহুরাত্রে ভেসে উঠতে দেখা গেছে। ঠিক তেমনি করে বহু বছর আগের কোনও চিৎকার এই কিওটা দ্বীপের উদ্ভিদের কোষে কোষে তরঙ্গরেখা হয়ে গ্রামোফোন রেকর্ড বা ক্যাসেট টেপের মতো আঁকা হয়ে গেছে। কোনও কোনও সময় প্রাকৃতিক কারণেই রেকর্ডগুলি বেজে ওঠে। প্রকৃতিতে তো সত্যি করে ধ্বংস বলে কিছু নেই। একদিক থেকে যা ধ্বংস, অন্যদিক থেকে তাই সৃষ্টি। কোনও কিছু শূন্যে নিঃশেষিত হওয়ার নয়। সবকিছুর রূপান্তর আছে, ধ্বংস নেই।

কিন্তু কবে কতবছর আগে কে কাকে নিষেধ করেছিল 'স্টপ ইট' বলে? কী করছিল অন্য লোকটি যে; তাকে থামতে বলতে হয়েছিল? আর কেই বা 'আই মাস্ট কিল ইউ' বলে হিংসায় গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কার ওপর? তারা কারা? ভাষা শুনে মনে হয় তারা ইংরেজ। নিশ্চয় দ্বীপের কোথাও তাদের কোনও চিহ্ন এখনও খুঁজে পাওয়া যাবে। প্রিয়বর্ধন বলেছিল, এই দ্বীপে নাকি জলদস্যুদের গুপ্তধন লুকানো আছে। তারা কি একদল জলদস্যু? প্রবাল পাঁচিলে ধাক্কা লেগেই কি জাহাজ ডুবি হয়ে তারা এই দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছিল?

হঠাৎ কোথায় ক্ষীণ সুরে মাউথ অর্গান বেজে উঠল। আমি আর বসে থাকতে পারলুম না। সুর লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলুম আবছা অন্ধকারে। সুরটা আসছে সোজাসুজি দক্ষিণ দিক থেকে। বিচ ধরে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে ডানদিকে তাকালাম। তারপর চেঁচিয়ে বললুম, 'কে তুমি?'

বাজনা থেমে গেল। কয়েকবার অকারণে ডাকাডাকি করে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেলুম। জলের ধারে পৌঁছতেই কালো একটা জিনিস চোখে পড়ল। একটু ঝুঁকে দেখেই চমকে উঠলুম। মানুষই বটে। অমনি মনে হল, প্রিয়বর্ধন নয় তো? প্রিয়বর্ধন হতেও পারে, নাও পারে। কিওটা দ্বীপে সব কিছু উলটোপালটা ব্যাপার।

কিন্তু আজ সারাটা দিন একটা অদ্ভুত মানসিকতা নিয়ে কাটিয়েছি। প্রিয়বর্ধনের কথা যেন ভুলেই গিয়েছিলুম। কদাচিৎ তার কথা মনে পড়লেও আমল দিইনি। আসলে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থেকেছি। ইশ! কী অকৃতজ্ঞ আমি! আমি দিব্যি তীরে পৌঁছুতে পারলুম আর সে-বেচারা কোথায় অসহায় হয়ে ভেসে গেল—তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করা দূরে থাক, তাকে খুঁজে দেখার চেষ্টাও করলুম না।

নিজের ওপর খাপ্পা হতে নিঃসাড় দেহটার গায়ে হাত রাখলুম। বুকে স্পন্দন অনুভব করে বোঝা গেল, যাই হোক, লোকটা মরেনি। কিন্তু এই অন্ধকারে যে প্রিয়বর্ধন কি না বোঝার উপায় নেই। লোকটিকে কিছুক্ষণ উত্তাপ দিতে পারলে তার জ্ঞান ফিরে আসবে। কিন্তু অন্ধকারে শুকনো কাঠ খুঁজে আনাই সমস্যা। পা দুটো জলে এবং শরীর ডাঙায় পড়ে আছে লোকটার। ঢেউ এসে তার পায়ের ওপর আছড়ে পড়ছে। তবে অনুমান, জোয়ার ও ভাঁটার মাছামাঝি সময়ে লোকটা এখানে পৌঁছেছে। কিংবা এমনও হতে পারে ঢেউয়ে ভেসে এসেছে। আবার ভেসে যেতে পারে জোয়ারের টানে।

বালির ওপর তাকে টানতে টানতে উঁচু জায়গায় নিয়ে গেলুম। তারপর কী করা যায় ভাবছি, হঠাৎ লোকটা অস্পষ্ট শব্দ করল।

তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে চেতনা ফেরানোর চেষ্টা করলুম। কিন্তু আর কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

তাকে ফেলে চলে যেতে পারি না—আর যাবই বা কোথায়? একটু তফাতে আমি বালির ওপর চিত হয়ে শুয়ে পড়লুম। অচেতন হোক, কিংবা মরাই হোক, জনমাবনহীন দ্বীপে মাঝে মাঝে ওইসব ভৌতিক চিৎকার আর বাজনার মধ্যে অন্তত একজন মানুষের কাছে শুয়ে থাকাটা অনেক ভাল। মনে জোর পাওয়া যায়।

ঘুম ভাঙল রোদের তাপ লেগে। সঙ্গে সঙ্গে আমার সঙ্গীর কথা মনে পড়ল। ধুড়মুড় করে উঠে দেখি, তার পাত্তা নেই।

এ-তো ভারি ভয়ের কথা! কোনও জন্তুজানোয়ারে তুলে নিয়ে যায়নি তো? এদিকে ওদিকে তাকিয়ে তাকে খুঁজছি, সেই সময় অজানা ভাষায় একটা চেঁচামেচি কানে এল! ঝটপট উঠে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল, ঘাসের মাঠে দু-হাত ওপরে তুলে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে এদিকেই দৌড়ে আসছে আমার মতো ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক পরা এক পাগলাটে মূর্তি এবং সে আর কেউ নয়, শ্রীমান প্রিয়বর্ধন!

আমাকে দেখে সে চেঁচিয়ে উঠল আগেকার মতো ভাঙাভাঙা ইংরেজিতে—'পালাও, পালাও।'

দৌড়ে আমার পাশ কাটিয়ে সে জলে ঝাঁপ দেওয়ার উপক্রম করলে আমি তাকে ধরে ফেললুম। প্রিয়বর্ধন হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'ভূত! ভূত! এ দ্বীপে ভূতের আস্তানা আছে, জয়ন্ত!'

তাকে ধাতস্থ করতে বেগ পেতে হল। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করার পর আগাগোড়া মোটামুটি সব ঘটনা বললাম। সে কানখাড়া করে শুনে একটু হাসল। 'তোমার সঙ্গে আমার ভাগ্য জড়িয়ে গেছে। তবে তুমি ওই যে বললে, সারা রাত আমাকে চিনতে পারনি—এটা তোমার উচিত হয়নি, জয়ন্ত। আমি হলে ঘোর অন্ধকারেও তোমাকে ছুঁয়েই টের পেতুম। সূর্যের তাপ পেয়ে আমার জ্ঞান ফিরে দেখি, পাশে তুমি। আমি তো হতভম্ব একেবারে। ঘুমোচ্ছ দেখে আর জাগালুম না। জলটা যা ঘোলা, একটাও মাছ দেখা গেল না। তখন ওদিকে গেলুম, দেখি কিছু খাদ্য জোগাড় করা যায় নাকি। অন্তত শুকনো নারকোল গোটাকতক। কিন্তু এমন অখাদ্য দ্বীপ কে কবে দেখেছে, সেখানে নারকোল গাছের বালাই নেই। খানিকটা গিয়ে চোখে পড়ল একটা আপেল গাছ! যেই হাত বাড়িয়েছি, বললে বিশ্বাস করবে না, গাছের একটা ছিপছিপে ডাল সাঁই করে চাবুকের মতো আমার ওপর পড়ল। তারপর আবার একটা—আবার! লোক নেই, জন নেই—অথচ আমাকে ছিপটি মারছে... বাপ্‌স!'

হাসতে হাসতে বললুম, 'আপেল গাছটার তোমাকে পছন্দ হয়নি। এস, আমি তোমাকে আমার বন্ধুর বাড়ি নিয়ে যাই। ফল খাইয়ে আনি।'

সন্দিগ্ধ মুখে পা বাড়াল প্রিয়বর্ধন। বলল, 'এ দ্বীপে তোমার বন্ধু জুটেছে বুঝি? কিন্তু ঘর-বাড়ি বা মানুষজন তো চোখে পড়ল না।'

'এসোই না।' বলে কয়েক পা এগিয়ে গেছি, সেই সময় ডান দিকের উঁচু উঁচু গাছগুলোর ভেতর থেকে সেই খ্যান খ্যান চিৎকার জেগে উঠল—'স্টপ ইট! স্টপ্ ইট! আই সে—স্টপ ইট!' প্রিয়বর্ধন দাঁড়িয়ে গেল। বলল, 'ওরে বাবা! ওই শোনো কারা ঝগড়া করছে!'

তাকে তখনও খুলে বলিনি, আমরা কিংবদন্তিখ্যাত কিওটা দ্বীপে আছি। বললে তার প্রতিক্রিয়া কী হবে, বুঝতে পারছিলুম না। কারণ, এ দ্বীপে নাকি গুপ্তধন আছে বলে তার বিশ্বাস আছে। ভেবেছিলুম, গুপ্তধনের প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে আমার সঙ্গে তার বন্ধুতা চটে যেতে পারে।

একটু পরে মাঠের মাঝামাঝি গেলে বাঁ দিকের জঙ্গলের ভেতর আজও সেই চাপা গম্ভীর অর্কেস্ট্রার বাজনা বেজে উঠল। প্রিয়বর্ধন খুশিতে নেচে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। 'গির্জায় প্রার্থনাসঙ্গীত হচ্ছে জয়ন্ত! চলো, চলো—আমরা আগে ওখানে যাই!'

প্রার্থনাসঙ্গীত শুনে প্রিয়বর্ধনের কেমন যেন ঘোর লেগেছে। অস্থির হয়ে বলল, 'আমি একজন খ্রিস্টান, জয়ন্ত। তুমি হিন্দু। ওই প্রার্থনা-সঙ্গীতের মর্ম তুমি বুঝবে না। তুমি আমার সঙ্গে যাবে তো এস, আমি চললুম। প্রার্থনায় যোগ না দিলে আমার পাপ হবে।'

এই বলে সে দৌড়ুতে শুরু করল। আমি ওকে ডাকাডাকি করেও ফেরাতে পারলুম না। দেখতে দেখতে সে বনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

অগত্যা সেই দয়ালু গাছটার উদ্দেশে এগিয়ে গেলুম। এখনই প্রিয়বর্ধন হন্যে হয়ে ফিরে আসবে।

তাই এল—যখন আমি রসালো পিচ জাতীয় ফল খাচ্ছি। খাচ্ছি মানে ঘাসের ওপর বসে হাঁ করছি, আর একটা করে থোকা আমার মুখে ঢুকছে।

প্রিয়বর্ধনকে দেখে বললুম, 'কী? খুঁজে পেলে গির্জা!'

প্রিয়বর্ধন সে কথার জবাব দিল না। আমার কাণ্ডটা তার চোখে পড়েছিল। সে অবাক হয়ে একটুখানি দেখার পর ধুপ করে বসে পড়ল এবং প্রকাণ্ড হাঁ করল।

মনে হচ্ছিল, আমার দাতা ভদ্রলোকের ভাঁড়ার এবেলাতেই সে উজাড় করে ছাড়বে। এক গাদা ফল গিলে পেটটা ঢাকের মতো ফুলিয়ে বিকট এক ঢেকুর ছেড়ে সে ফিক করে হাসল। বলল, 'জয়ন্ত! আমি স্বপ্ন দেখছি। তাই না?'...

আবার শয়তানের কবলে

সেদিন দুপুর অব্দি প্রিয়বর্ধন স্বপ্ন স্বপ্ন করেই কাটাল! তার পাগলামি দেখে হাসি পাচ্ছিল। সে এই উৎকট স্বপ্ন ভাঙিয়ে দেওয়ার জন্য আমাকে তার গায়ে চিমটি কাটতে বলেছিল। নিজেও চেষ্টা করছিল স্বপ্নটা যাতে ভাঙে। নিজের মাথায় চাঁটি মেরে, কখনও ডিগবাজি খেয়ে, কখনও বা গাছের গুঁড়িতে ঢু মেরে সে একসময় বাচ্চা ছেলের মতো ভ্যাঁ করে কেঁদেও ফেলল।

তখন আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। হাসতে হাসতে বললাম, "প্রিয়বর্ধন, তুমি কি এখনও টের পাচ্ছ না যে ব্যাপারটা স্বপ্ন নয় বাস্তব।"

প্রিয়বর্ধন চোখ মুছে নাক ঝেড়ে বলল, "অসম্ভব! জয়ন্ত, আমরা হয়তো আসলে কোনও ডাইনির দ্বীপে এসে পড়েছি। এসবই তার জাদুর খেলা। এরপর মন্ত্রবলে ডাইনিটা হয়তো আমাদের ওইরকম গাছপালা করে ফেলবে। আমাদের আর মানুষ হয়ে দেশে ফেরা হবে না।"

"প্রিয়বর্ধন, তুমি কান করে শোনো তো! বেহালার মতো সুর শুনতে পাচ্ছ না?"

প্রিয়বর্ধন শুনতে শুনতে বলল, "তা তো পাচ্ছি! ওই তো ডাইনির জাদু।"

"সকালে বনের ভেতর অর্কেস্ট্রার সুর শুনে তুমি গির্জা খুঁজতে গিয়েছিলে।" গম্ভীরভাবে বললুম—"বোকা কোথাকার! এখনও কি তুমি বুঝতে পারছো না এটা কোন্ দ্বীপ?"

প্রিয়বর্ধন আমার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর নড়ে বসল। তার মুখটা কেমন যেন জ্বলে উঠল কী আভায়। দম আটকানো গলায় সে বলে উঠল, "জয়ন্ত, জয়ন্ত! তবে কি এই সেই কোহাও রঙ্গো-রঙ্গো? আমরা কি তাহলে সত্যি কিওটা দ্বীপে বসে আছি?"

"হ্যাঁ, প্রিয়বর্ধন।"

প্রিয়বর্ধনের পাগলামি ঘুচে গেল সঙ্গে সঙ্গে। উত্তেজনা দমন করে সে আমার হাত ধরে টানল। চাপা গলায় বলল, "তাহলে আর দেরি না করে এস, আমারা রোজারিওর গুপ্তধন খুঁজে বের করি। চুপচাপ বসে থাকার মানে হয় না, জয়ন্ত। তাছাড়া যা শুনেছি, এই ভূতুড়ে দ্বীপে বেশিদিন মানুষ বাঁচতে পারে না। সবুজ রোগে মারা যায়।"

"সবুজ রোগ কী?"

"সে এক সাংঘাতিক অসুখ। সারা শরীর সবুজ হয়ে যায়।"

অমনি আমার মনে পড়ে গেল, রুবিদ্বীপের জেলেদের গায়ে সবুজ অ্যালার্জি হওয়ার কথা শুনেছিলুম। এবার বুক কেঁপে উঠল। প্রিয়বর্ধন আমাকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল। বললুম, "কোথায় যাচ্ছ এমন করে?"

প্রিয়বর্ধন তেমনি চাপা স্বরে বলল, "এবেলা থেকেই কাজ শুরু করা যাক। প্রথমে সারা দ্বীপের চৌহদ্দি দেখে নিই এস। চারদিক ঘুরে একটা ম্যাপ তৈরি করা দরকার। তারপর..."

বাধা দিয়ে বললুম, "ম্যাপ আঁকবে কিসে? কাগজ কলম তো নেই।"

"মাটির ওপর বা বালিতে আঁকব। সে তুমি ভেবো না।" প্রিয়বর্ধন উৎসাহের সঙ্গে বলল। "তারপর শুরু হবে তন্নতন্ন খোঁজা। এক ইঞ্চি জায়গা বাদ রাখব না।"

আমার অবাক লাগছিল ভেবে, পৃথিবীতে কতরকম মানুষ আছে তাহলে! এই এক আশ্চর্য জনমানুষহীন দ্বীপ, যেখানে গাছপালা গান গায়, যেখানে গাছপালা প্রাণীদের মতো সজাগ, মানুষের

মতোই তার দয়ালু এবং ফল তুলে দেয় ক্ষুধার্তের ঠোঁটে—এমন বিচিত্র এক ভূখণ্ডের বিস্ময়কর ঘটনাবলীর দিকে প্রিয়বর্ধনের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। সে লুকানো সোনাদানার প্রচণ্ড লোভে অস্থির হয়ে উঠেছে। বিড়বিড় করছে, 'রোজারিওর গুপ্তধন! রোজারিওর গুপ্তধন!'

ঝাঁকে ঝাঁকে ব্যুমেরাং গড়নের কাঠপোকা বা কেঠো পোকা সবুজ ঘাসের মাঠে বসে ছিল। আমরা তাদের মধ্যে গিয়ে পড়তেই তারা লাফাতে লাফাতে কে কোথায় লুকিয়ে পড়ল। প্রিয়বর্ধনের চোখ সেদিকে নেই। মুখেচোখে ধূর্ততা ঠিকরে পড়ছে। মাঝে মাঝে বলছে, 'আমরা রাজা হয়ে যাব, জয়ন্ত! রোজারিওর ধনরত্ন পেলে আর পরোয়া নেই।'

রোজারিও কে, সেকথা কয়েকবার জিগ্যেস করেও জবাব পেলুম না। তখন ভাবলুম, নিশ্চয় কোনও প্রাচীন জলদস্যু হবে। রাজাকো, ক্যারিবো, কিয়াং—সবাই তাহলে এই জলদস্যু পুঁতে রাখা গুপ্তধনের জন্য হন্যে হয়ে পরস্পর লড়াই করেছে। রাজাকোর প্রাণ গেছে। ক্যারিবো আর কিয়াং এখনও জীবিত। এখন কোথায় তারা কে জানে? ক্যারিবোর সঙ্গে ডাইনির দ্বীপে আমাদের দেখা হয়েছে। তার মোটরবোট চুরি করে আমরা পালিয়ে এসেছি। ক্যারিবোর দশা কী হয়েছে, তাও বলা কঠিন।

তারপর মনে পড়ল কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের কথা। ডঃ বিকর্ণ, কাপ্তেন ব্যুগেনভিলি, আর রোমিলার কথা। মন অমনি খারাপ হয়ে গেল। নৌবাহিনীর সাহায্যে তাঁরা কি রুবি দ্বীপের চারপাশের সমুদ্রে আমার মৃতদেহ খুঁজে বেড়াচ্ছেন এখনও? আচ্ছা, কাপ্তেন ব্যুগনভিলি তো এ-দ্বীপে এসে পড়েছিলেন। তাঁর কি পথের কথা মনে নেই একটুও?

কিওটো যে ছোট্ট দ্বীপ, সেটা ক্রমশ বুঝতে পারছিলুম। উত্তর থেকে সোজা দক্ষিণে দু'-মাইল গিয়েই আবার সমুদ্র দেখা গেল। তারপর পশ্চিমে এগিয়ে গেলুম আমরা। পশ্চিম এলাকাটা ছোট-বড় পাহাড়ে দুর্গম হয়ে আছে। একেবারে ন্যাড়া পাথুরে পাহাড়। কিন্তু কী বিচিত্র রঙ তাদের। কোনওটা কালো, কোনওটা লাল, হলুদ, নীল। একটা সবুজ রঙের পাহাড়ও দেখতে পেলুম। এদিকে গাছপালা নেই বললেই চলে। একটা লাল টিলার ওপর পৌঁছে দ্বীপটা পুরো চোখে পড়ল।

দ্বীপটার গড়ন তিনকোনা। মধ্যিখানে বিরাট সবুজ ফাঁকা মাঠ। মাঠ জুড়ে টুকরো পাথর পড়ে আছে। উত্তর ও দক্ষিণে ঘন বন। পুবে কিছুটা ফাঁকা। কিন্তু তিনকোনা দ্বীপটাকে ঘিরে রেখেছে প্রায় গোলাকার প্রবাল পাঁচিল। এটাকে বলয় দ্বীপ বলা যায়। প্রবাল পাঁচিলটা শুধু পুবের দিকে এক জায়গায় ভাঙা এবং সেটাই এই দ্বীপে ঢোকার গেট যেন। ওই গেট দিয়ে আমরা আসতে পেরেছি। বাকি সমস্ত বলয় উঁচু হয়ে ঘিরে রেখেছে পাঁচিলের মতো। তার গায়ে ধাক্কা দিচ্ছে মহাসাগরের প্রচণ্ড সব ঢেউ। আছড়ে পড়ে ধুয়ে দিচ্ছে পাঁচিলকে। এতক্ষণে সামুদ্রিক পাখির ওড়াউড়ি চোখে পড়ল প্রবাল বলয়ের কাছে।

প্রিয়বর্ধন বলল, "হুঁ—তাহলে মোটামুটি একটা ম্যাপ পাওয়া গেল। এবার জয়ন্ত, আমরা কিছু সূত্র খুঁজব।"

"কিসের সূত্র?"

প্রিয়বর্ধন হাসল। "রোজারিও যখন এ দ্বীপে ধনরত্ন পুঁততে এসেছিল, তখন নিশ্চয় কিছু চিহ্ন রেখেছিল। ধরো, জাহাজের একটুকরো কাঠ, কিংবা পেরেক। অথবা একটা হাতুড়ি।...... যাই হোক, খুঁজলে নিশ্চয় পেয়ে যাব কিছু। এখান থেকেই খুঁজতে শুরু করি।"

"প্রিয়বর্ধন, এ-দ্বীপে যেই এসেছে, তাকে আসতে হয়েছে পুবের ওই ভাঙা জায়গাটা দিয়ে। কাজেই...."

আমার কথা কেড়ে প্রিয়বর্ধন বলল, "ওহে বোকারাম! যেখান দিয়েই আসুক, গুপ্তধন লুকানোর জন্য দুর্গম জায়গা সে বেছে নেবে কি না?"

"তা ঠিক।"

"দুর্গম জায়গা বলতে দেখছি, এই পাহাড়ি এলাকা আর ওই ঘন জঙ্গল। এখান থেকেই শুরু করি। এস। বলে প্রবল উৎসাহে সে টিলা থেকে নামতে থাকল।

তাকে অনুসরণ করলুম। দুপুর গড়িয়ে গেছে। এত ঘোরাঘুরি করছি, অথচ একটুও ক্লান্তি লাগছে না। নিশ্চয় সেই ফলের গুণ। টিলার নিচে পৌঁছে একটা পাহাড়ি খাদের দিকে পা বাড়াল প্রিয়বর্ধন। ডান দিকে এক ছিপছিপে চেহারার গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই গাছটা হঠাৎ পিয়ানোর বাজনা বাজাতে শুরু করল। কী মনমাতানো সে সুর! আমি দাঁড়িয়ে পড়লুম। "প্রিয়বর্ধন! শোনো, শোনো!" বলে ডাকলুম। কিন্তু সে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, "কী শুনব? আমার এক খুড়ো ওর চেয়ে ভাল পিয়ানো বাজাতে পারে! দেখছ না? বাতাস বইছে বলেই গাছটা এমন বিচ্ছিরি ভূতুড়ে শব্দ করছে। চলে এস।"

বেরসিক প্রিয়বর্ধনের টানে এগিয়ে যেতে হল। খাদটা ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে। খাদের দু'ধারে রঙিন পাহাড় দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক পা এগিয়ে প্রিয়বর্ধন হঠাৎ বসে পড়ল। তারপর উত্তেজিতভাবে বলল, "পাওয়া গেছে! পাওয়া গেছে!"

গিয়ে দেখি, একটা মরচে ধরা লোহার রড মাটির ভেতর কাত হয়ে ঢুকে রয়েছে। সেটা টানাটানি করতেই খানিকটা চাবড়া উঠে গেল মাটির। তারপর যা দেখলুম, ভয়ে বিস্ময়ে শিউরে উঠলুম। ওটা রড নয় আসলে একটা তলোয়ারের বাঁট। আর চাবড়ার তলায় একটা মানুষের কঙ্কাল দেখা যাচ্ছে। তালোয়ারটা কঙ্কালের ভেতর বিঁধে রয়েছে। রুদ্ধশ্বাসে বললুম, "প্রিয়বর্ধন! কেউ এই মানুষটাকে তালোয়ার বিঁধিয়ে খুন করেছিল। সেই অবস্থায় পড়ে ছিল মৃতদেহটা। বছরের পর বছর বৃষ্টিতে মাটি ধুয়ে ঢালু খাদে এসে জমেছে আর ওকে ঢেকে ফেলেছে।"

প্রিয়বর্ধন বলল, "এ তাহলে নিশ্চয় রোজারিওর দলের লোক। এস, এগিয়ে গেলে আমরা আরও সূত্র পাব।"

আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ালুম। খাদে বিকেলের গাঢ় ছায়া জমে আছে। আর এখানে ওখানে পড়ে আছে আরও কয়েকটা নরকঙ্কাল। কোনওটা মুণ্ডুহীন। মুণ্ডটা পড়ে আছে আলাদা হয়ে। কালো ছায়ায় কঙ্কাল আর খুলিগুলো ধপধপে সাদা দেখাচ্ছে। দেখলে আতঙ্কে শরীর হিম হয়ে যায়।

তারপর হঠাৎ আগে শোনা সেই চিৎকার বা গর্জন শুনতে পেলুম। "স্টপ ইট! "স্টপ ইট! আই সে স্টপ ইট!" দু-ধারের পাহাড়ে গম গম করে প্রতিধ্বনি উঠল। কানে তালা ধরে যাচ্ছিল। সেই সময় দেখলুম প্রিয়বর্ধন আতঙ্কে পাগলের মতো যে পথে এসেছি, সেই পথে দৌড়তে শুরু করেছে। আমি তাকে অনুসরণ করলুম।

শব্দগুলো যেন সারা দ্বীপ জুড়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে। তারপর শোনা গেল, "আই মাস্ট কিল ইউ!"..."কিল ইউ... কিল...কিল!" তারপর আর্তনাদ! "হেল্প! হেল্প! হেল্প!" সেই সঙ্গে অন্তিম আর্তনাদের পর আর্তনাদ।

প্রিয়বর্ধন জঙ্গলের ভেতর উদ্‌ভ্রন্তের মতো দৌড়ুচ্ছিল। তার ধরে ফেললুম। বললুম, "ও কিছু নয়, প্রিয়বর্ধন! অতীতের প্রতিধ্বনি মাত্র। অত ভয় পাওয়ার কিছু নেই।"

প্রিয়বর্ধন ধুপ করে ঘাসে বসে পড়ল। তারপর ভয়ার্ত মুখে বলল, 'রোজারিওর ভূত, জয়ন্ত! শুধু একা নয় ওর দলের সবাই ভূত হয়ে গেছে। আমাদের বরাত বড় মন্দ। তুমি বুঝতে পারছ না? ভূত হয়ে গেছে। ওরা ভূত হয়ে গুপ্তধন পাহারা দিচ্ছে।"

ওকে টেনে ওঠালুম। "কাল সকাল থেকে খোঁজা যাবে। আমরা পুব দিকের বিচে যাই। বেলা পড়ে আসছে। অচেনা জায়গার চেয়ে চেনা জায়গায় রাত কাটানোই ভালো।"

দু'জনে বাঁ দিকে ঘুরে ফাঁকা মাঠের দিকে এগিয়ে গেলুম। বনের ভেতর কোথাও ক্ষীণ সুরে বাঁশি বাজছিল। ক্রমশ সেই সুর চাপা দিয়ে গম্ভীর অর্কেস্ট্রা শুরু হল। প্রিয়বর্ধন ভয় পেয়ে লম্বা পায়ে হাঁটতে থাকল।

কিন্তু ফাঁকা মাঠের ধারে পৌঁছতেই এক বিচিত্র দৃশ্য চোখে পড়ল।

ক্যাকটাস জাতীয় একটা অদ্ভুত গড়নের প্রাণী কিংবা নিছক গাছ আস্তেসুস্থে হেঁটে যাচ্ছে। প্রিয়বর্ধন বলে উঠল, "ও কী জয়ন্ত! ওটা গাছ, না কোনও জন্তু?"

অবাক হয়ে বললুম, "আশ্চর্য! ওটা যে দেখছি একটা ক্যাকটাস! চলো, তো দেখি।"

প্রিয়বর্ধন আমার পিছনে কুণ্ঠিতভাবে এগুলো। সেই বিচিত্র চলমান ক্যাকটাসের হাত দশেক দূরে পৌঁছলে সেটা থেমে গেল। তারপর আরও অবাক হয়ে দেখলুম, ওটার নিচের দিক থেকে একরাশ শেকড় কেঁচোর মতো নেমে মাটিতে ঢুকে গেল।

সাহস করে কাছে গেলুম। সত্যি ক্যাকটাসই বটে। এমন বিদ্‌ঘুটে চলমান ক্যাকটাস দেখে আমি হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম কিছুক্ষণ।

প্রিয়বর্ধনের তাড়ায় এগিয়ে যেতে হল। কিছু দূরে গিয়ে একবার পিছু ফিরে দেখলুম, অদ্ভুত ক্যাকটাস জীবটি আবার চলতে শুরু করেছে। বললুম, 'প্রিয়বর্ধন! তাহলে দেখা যাচ্ছে চলমান উদ্ভিদও পৃথিবীতে আছে। কে জানে এই সৃষ্টিছাড়া দ্বীপে আরও কত বিচিত্র উদ্ভিদ দেখতে পাব।"

প্রিয়বর্ধন সে কথায় কান না করে একটু হেসে বলল, "আবার কিন্তু খিদে পেয়েছে!"

মাঠের ভেলভেটের মতো নরম সবুজ ঘাসের ওপর সেই পিচ জাতীয় ফলের গাছ আরও অনেক আছে। একটা গাছের দিকে পা বাড়িয়েছি, সেই সময় প্রিয়বর্ধন বলে উঠল, "জয়ন্ত! জয়ন্ত! ওটা কী দেখ তো?"

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি, শেষ বিকেলের সমুদ্রের প্রবাল পাঁচিলের সেই ভাঙা অংশটার কাছে সাদা কী একটা ঢেউয়ে ভেসে উঠছে আবার যেন তলিয়ে যাচ্ছে। ভাল করে দেখে বুঝলুম, ওটা একটা মোটরবোটই বটে!

আনন্দে চিৎকার করে দৌড়ুতে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ বাঁ পাশে পড়ে থাকা কয়েকটা পাথরের আড়াল থেকে তিনটে মূর্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "হ্যান্ডস্ আপ!"

মূর্তিত্রয় এ-দ্বীপের কোনও আজব গাছ-মানুষ, না আমাদের মতো মানুষ লক্ষ্য করতে গিয়ে চোখে পড়ল, তাদের হাতে রিভলভার আর বন্দুকও আছে। সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে গেলুম।

তারপর প্রিয়বর্ধন দু'হাত তুলে ফিসফিস করে উঠল, "শয়তান ক্যারিবো!"

এবার চিনতে পারলুম ক্যারিবোকে। সে এগিয়ে এসেই প্রিয়বর্ধনের চোয়ালে রিভলভারের বাঁট দিয়ে মারল। প্রিয়বর্ধন পড়ে গেল। তারপর ক্যারিবো আমার দিকে ঘুরে কুৎসিত হেসে বলল, "এই যে কলকাতাওয়ালা বাঙালিবাবু! মোটর বোট চুরির শাস্তি কত ভয়ঙ্কর, একটু-একটু করে টের পাবে এবার। ফুতাং! একে বিচে নিয়ে চল্! আর উংচু, তুই ওই দোআঁশলা বদমাশটাকে তুলে নিয়ে আয়।"

গরিলার মতো চেহারা—সম্ভবত মালয়ের লোক, সেই ফুতাং এসে আমার ঘাড় ধরল। ওর অন্য হাতে বন্দুক। কিছু করার নেই। উংচু নামে বেঁটে হিংস্র চেহারার লোকটার গায়ে যেন দৈত্যের বল। সে প্রিয়বর্ধনকে পুতুলের মতো কাঁধে তুলে নিয়ে চলল পুবের বিচের দিকে। প্রিয়বর্ধন অজ্ঞান হয়ে গেছে। কষায় রক্ত গড়াচ্ছে।

বিচের বালিতে আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল ফুতাং। ক্যারিবো বিকট হেসে বলল, 'তারপর বাঙালিবাবু! প্রথমে বলো তো গুপ্তধনের হদিশ কতটা পেলে? তারপর অন্যকথা।"

ক্যাকটাস-মাকড়সা ও বেতারযন্ত্র

ক্যারিবোর চোখের ভেতর হিংসা যেমন, তেমনি লোভও ঝকমক করতে দেখছিলুম। সে আমাদের মেরে ফেলবে ঠিকই, কিন্তু তার আগে জেনে নিতে চায়, আমারা গুপ্তধনের খোঁজ পেয়েছি কি না। পেয়ে থাকলে ওকে আর কষ্ট করতে হবে না এবং আমরা সেখানে তাকে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত সে আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে।

তাই একটু হেসে বললুম, "ক্যারিবো রোজারিওর গুপ্তধন যেখানে পোঁতা আছে, সেখানে যাওয়ার অনেক বিপদ।"

ক্যারিবো আমার পাশে হাঁটু দুমড়ে বসে হিস হিস করে বলল, "বাজে কথা রাখো। খোঁজ পেয়েছ কি না জানতে চাই। যদি পেয়ে থাকো, তোমার অন্তত বাঁচার আশা আছে। তবে ওই নচ্ছার বিশ্বাসঘাতকটাকে মেরে ফেলব। ডাইনির দ্বীপের একটা গাছে রবারের ভেলা টাঙানো আছে দেখেই বুঝেছিলুম, কে আমাদের মোটরবোট চুরি করে পালিয়েছে। যাই হোক, সে-সব কথায় লাভ নেই। বলো, গুপ্তধনের খবর কী?"

"বললুম তো! সেখানে কোনও মানুষ যেতে পারে না।"

"কেন?"

রোজারিও আর তার স্যাঙাতদের আত্মা সেই ধন পাহারা দিচ্ছে। তুমি কি এই দ্বীপে পৌঁছে তাদের চিৎকার শোনোনি?"

ক্যারিবো একবার ভয়ের চোখে বিচের ওপরদিকটা দেখে নিয়ে বলল, "শুনেছি। কিন্তু ভয় পাইনি। কারণ তখনই দেখতে পেলুম, তোমরা দুজনে দিব্যি আস্তেসুস্থে হেঁটে আসছ। তোমাদের যখন বিপদ হচ্ছে না, তখন আমাদেরও হবে না ভাবলুম।"

"তারপর আমাদের টিট করার জন্য পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রইলে!"

ক্যারিবো ধমক দিয়ে বলল, "ন্যাকামি ছাড়ো। চলো কোথায় আছে রোজারিওর সোনাদানা?"

হাসতে হাসতে বললুম,"কিন্তু এখন তো দিন ফুরিয়ে গেল। রাতে সেখানে যাবে কেমন করে? সকাল হতে দাও, তবে তো।"

ক্যারিবো কথাটা তলিয়ে দেখে বলল, "ঠিক আছে। সকালেই যাব। কিন্তু জায়গাটা কতদূর?"

"পশ্চিম প্রান্তে। পাহাড়ি খাদের ভেতর। সেখানে অজস্র নরকঙ্কাল আর খুলি পড়ে আছে। তারা কিন্তু জীবন্ত মানুষ দেখলেই—"

আমার কথা শেষ হবার আগেই উংচু ভয়ার্ত স্বরে বলে উঠল, "কর্তা! কর্তা! ওই শুনুন কে বাজনা বাজাচ্ছে আবার!"

ক্যারিবো তাকে ধমক দিয়ে বলল, "তুই জানিস না ব্যাটা, কিওটা দ্বীপের গাছপালা গান গায় আর বাজনা বাজায়?"

ফুতাং ফিক করে হেসে বলল, "শুনেছি, ওরা ধেই ধেই করে নাচেও।"

ক্যারিবো আমাকে বলল, "কী হে বাঙালিবাবু? গাছের নাচ দেখতে পাওনি?"

বললুম, "দেখিনি। তবে অসম্ভব নয়। একটা ক্যাকটাসকে তখন হেঁটে বেড়াতে দেখেছিলুম। কাজেই নাচতেও অসুবিধে কিসের? যাই হোক, ক্যারিবো! গুপ্তধনের জায়গায় তোমাকে নিয়ে যাব বলেছি—ঠিকই নিয়ে যাব। কিন্তু তার বদলে এই কি তোমার অতিথি সৎকারের নমুনা? আমাদের অন্তত এককাপ করে কফি খাওয়াও।"

ক্যারিবো অচৈতন্য প্রিয়বর্ধনের দিকে তাকিয়ে বলল, "হতচ্ছাড়াটা তো দেখছি ভিরমি খেয়ে পড়ে রইল। ওহে ফুতাং বেঁচে আছে তো?"

ফুতাং বলল, "আছে কর্তা। পিট পিট করে তাকাচ্ছে!"

ক্যারিবো উঠে দাঁড়াল। "উংচু, ফুতাং! তোরা এবার বোটটা এখানে টেনে নিয়ে আয়। খাবার দাবার, তাঁবু সব কিছু ওতে রয়ে গেছে। এখানে না আনলে মেরামত করব কেমন করে?"

ওরা দু'জনে পোশাক খুলে সাঁতারু সেজে জলে নামল। গোধূলির আলো তখনও ফুরিয়ে যায়নি। প্রবাল পাঁচিলের দিকে ওরা সাঁতার কেটে এগিয়ে গেল।

ক্যারিবো প্রিয়বর্ধনের ঘাড় ধরে টেনে বসিয়ে দিল। প্রিয়বর্ধন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল আমার ও ক্যারিবোর দিকে। ওর কাছে গিয়ে বললুম, "যা হওয়ার হয়ে গেছে। ক্যারিবোর সঙ্গে মিটমাট করে নাও। তোমাকে গুপ্তধনের জায়গায় পৌঁছে দিলে আমাদের ছেড়ে দেবে ক্যারিবো?"

প্রিয়বর্ধনকে চোখের ইশারা করতেই সে বুঝে নিল ব্যাপারটা। বলল, "ঠিক আছে।"

ক্যারিবো খুশির ভাব দেখিয়ে বলল, "হ্যাঁ—পৌঁছে দিলেই তোমাদের ছুটি। শুধু তাই নয়, কিছু ভাগও পাবে। এমনকী, রুবি দ্বীপে পৌঁছেও দেব।"

আমি যেমন জানি, তেমনি প্রিয়বর্ধনও টের পেল, ক্যারিবো আমাদের কী দশা করবে শেষ পর্যন্ত। বুদ্ধিমান প্রিয়বর্ধন মাতৃভাষায় কথা বলতে শুরু করল ক্যারিবোর সঙ্গে। বুঝতে পারছিলুম, সে অনুনয়-বিনয় করে ক্ষমা চাইছে।

অনেক দেরি করে ফিরল ফুতাং ও উংচু। ততক্ষণে এক ফালি চাঁদ উঠেছে। সমুদ্রে ওপর ক্ষীণ জ্যোৎস্না খেলছে। বিচের ওপর সেই বেহালা বাজিয়ে গাছটা মাঝে মাঝে যেন বেহালার ছড়া টেনে করুণ সুর বাজাচ্ছে আবার থেমে যাচ্ছে। মোটরবোটটা টেনে বালিতে তুলল ওরা। ক্যারিবো রিভলভার হাতে নিয়ে আমাদের পাহারা দিচ্ছে। জিনিসপত্র নামিয়ে আনতে হুকুম দিল সে।

একটু পরে বিচের মাথায় উঁচু জায়গায় একটা তাঁবু খাটানো হল। তারপর স্টোভ জ্বেলে কফি বানাল ওরা। ফুতাং রাতের খাবার তৈরি করতে ব্যস্ত হল। বুঝলুম, রীতিমতো তৈরি হয়েই এসেছে। কিন্তু কিওটা দ্বীপের সন্ধান কীভাবে পেল, বুঝতে পারলুম না।

তাই বললুম, "ক্যারিবো, কফির জন্য ধন্যবাদ। এবার বলো, কেমন করে তোমরা এ-দ্বীপের খোঁজ পেলে?"

ক্যারিবো ধূর্তের হাসি হেসে বলল, "তোমরা যেভাবে পেয়েছিলে!"

"আমরা দৈবাৎ এখানে ভেসে এসেছি, ক্যারিবো। বিশ্বাস করো।"

"করছি না। কারণ আমি জানি, তোমরা সেই ছোট্ট মূর্তির ভেতর লুকিয়ে রাখা কাত্তির সংকেত সূত্র উদ্ধার করতে পেরেছ। ওতে কিওটা দ্বীপের অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ লেখা আছে। তোমরা ভেবেছিলে আমি ভীষণ বোকা। জানো না যে আমি আগেই কাত্তিটার সব চিহ্ন কাগজে কপি করে রেখেছিলুম।"

"কিন্তু সংকেত সূত্রগুলো তো অর্ধেক মনে হয়েছিল। অন্য কাত্তিটা না পেলে..."

আমার কথা কেড়ে ক্যারিবো বলল, "না হে বোকারাম! তা নয়। রাজাকো আসল কাত্তিটার একটা নকল বানিয়েছিল। যদি দৈবাৎ একটা খোয়া যায়, অন্যটা থাকবে। ওর টুপির ভেতরকার কাত্তিটা নকল। আসলটা ছিল মূর্তিটার ভেতরে। কাত্তিতে যে চিহ্নগুলো আছে, তার অর্থ কেবলমাত্র জানে অভিজ্ঞ নাবিকরা। কিয়াংয়ের মতো অভিজ্ঞ সমুদ্রচর লোক, কিংবা এই দেখছ আমাকে—আমার মতোও যারা সমুদ্রে ঘোরে এবং অভিজ্ঞ নাবিকদের শাগরেদি করে বড় হয়েছে, তারা সবাই ওইসব চিহ্নের অর্থ বোঝে। কিন্তু বরাত মন্দ, পৌঁছুলুম বটে কিওটায়, মোটরবোটটা কোরাল রিবে (Coral Reeb) ধাক্কা খেয়ে বিগড়ে গেল। দেখা যাক, সারাতে পারি নাকি। তবে তার আগে রোজারিওর গুপ্তধন তো আগে হাতাই। তারপর দেখা যাবে।..."

রোজারিওর গুপ্তধনের লোভে ক্যারিবো আমাদের এ-রাতে এত খাতির করছিল কহতব্য নয়। খাবারের ভাগ দিয়ে তো বটেই, আরও খিদে আছে কি না জিগ্যেস করে আতিথেয়তার চূড়ান্ত করল।

আমাকে ও প্রিয়বর্ধনকে দক্ষিণী মহাসাগর এলাকার নাবিকদের প্রিয় কড়া সিগারেটের প্যাকেট পর্যন্ত উপহার দিল। কিন্তু আমরা দু'জনেই জানি, শয়তানটার মনে কী ক্রূর মতলব খেলা করছে।

প্রবাল বলয়ের দিকটা জ্যোৎস্নায় কালো পাঁচিলের মতো দেখাচ্ছিল। দূর থেকে আছড়ে পড়া জলের চাপা গর্জন কানে আসছিল। আমাদের পেছনে কোথায় সেই বেহালা বাজিয়ে গাছটা ঘুমঘুম সুরে বেহালা বাজাচ্ছিল। ক্যারিবো আমাদের দু'জনকে ফুতাং ও উংচুর কড়া পাহারায় রেখে ছোট্ট তাঁবুর ভেতর ক্যাম্পখাটে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। আমার চোখে ঘুম নেই। প্রিয়বর্ধনেরও নেই। দুজনে পাশাপাশি চিত হয়ে তাঁবুটার সামনে বালির ওপর শুয়েছিলুম। আমাদের দু'পাশে দুই প্রহরী বসে সেই বিচ্ছিরি কড়া সিগারেট টানছিল আর চাপা গলায় নিজেদের মাতৃভাষায় কথা বলছিল।

এমন সময় কী একটা শব্দ হল। খসখস শব্দ। মুখটা সাবধানে ঘুরিয়ে দেখি, ক্যারিবোর তাঁবুর পাশে কালো ঝোপ মতো—কোনও জন্তু নয় তো? কিওটায় এ পর্যন্ত ময়াল সাপ ছাড়া কোনও জন্তু দেখিনি। নাকি সত্যি একটা ঝোপ?

কিন্তু কাছাকাছি কোথাও ঝোপও তো দেখিনি। জায়গাটা অনেকটা খোলামেলা। তাহলে ওটা কী হতে পারে! নিশ্চয় কোনও জন্তু। প্রহরীরা আপন কথায় ডুবে আছে। একটু পরে দেখলুম, কালো জিনিসটা নড়ে উঠল এবং এগিয়ে আসতে থাকল। জ্যোৎস্না এতক্ষণে পরিষ্কার হয়েছে। এবার স্পষ্ট দেখতে পেলুম, দিনে যে ক্যাকটাসকে হেঁটে বেড়াতে দেখেছি, এটা সেই চলমান উদ্ভিদই বটে। খসখস শব্দে প্রহরীদের চমক জাগল। তারা যেই ঘুরেছে, অমনি সেই ক্যাকটাস-জন্তু (!) অক্টোপাসের অথবা মাকড়সার মতো একগুচ্ছের শুঁড় বাড়িয়ে উঁচু ও ফুতাংকে জড়িয়ে ধরল। দু'জনেই বিকট শব্দে চেঁচিয়ে উঠল। ক্যারিবোর ঘুম ভেঙে গেল। সে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল। তার হাতে টর্চ ছিল। টর্চের আলোয় দেখল, অদ্ভুত ক্যাকটাস-মাকড়সা উংচু ও ফুতাংকে নিয়ে খসখস আওয়াজ করতে করতে এগিয়ে চলেছে। ক্যারিবো বিস্ময়ে আতঙ্কে এমন হকচকিয়ে গেল যে টর্চ জ্বেলে দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই।

আমি ও প্রিয়বর্ধন উঠে বসেছিলুম। প্রিয়বর্ধন কী বলে চেঁচিয়ে উঠল। নিশ্চয় গুলি ছুড়তে বলল ক্যারিবোকে। কারণ তারপরই ক্যারিবো রিভলভার উঁচিয়ে গুলি ছুড়তে ছুড়তে তাড়া করল।

কিন্তু আশ্চর্য, ক্যাকটাস-মাকড়সার গায়ে যেন গুলি বিঁধছে না। ক্যারিবোর টর্চটা উত্তেজনার ফলে হাত থেকে পড়ে গিয়ে নিবে গেছে। প্রিয়বর্ধন দৌড়ে গিয়ে টর্চটা তুলে নিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে কোথা থেকে আরও কয়েকটা ক্যাকটাস-মাকড়সা খসখস শব্দ করতে করতে ক্যারিবোকে ঘিরে ফেলল। তারপর আর ক্যারিবোকে দেখতে পেলুম না। বিচিত্র উদ্ভিদ-প্রাণীর দল ব্যূহের ভেতর ঘিরে ওকে নিয়ে চলেছে। সেই দৃশ্য দেখে প্রিয়বর্ধনের হাতে টর্চ নিভে গেল এবং সে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "জয়ন্ত! জয়ন্ত! ডাইনিরা ওদের ধরে নিয়ে গেল।"

বললুম, "তাহলে এবার আশা করি, তুমি বুঝতে পেরেছ, গুপ্তধনের লোভের শাস্তি পেল ওরা।"

প্রিয়বর্ধন দিব্যি কেটে বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ জয়ন্ত! আমার আর গুপ্তধনের লোভ করা উচিত নয়।"

তাঁবুর কাছে ফিরে এসে বললুম, 'যাক গে। কিওটা থেকে ফেরার আর চিন্তা রইল না। মোটরবোটটা যদি তুমি মেরামত করতে পারো, আমরা সমুদ্র পাড়ি দেব।'

তাঁবুর সামনে স্টোভ জ্বেলে আমরা আবার কফি তৈরি করলুম। কফি খেতে খেতে জ্যোৎস্নাভরা বনভূমির দিকে তাকিয়ে দেখলুম, একটু আগের সেই বিভীষিকার কোনও আভাস নেই। বেহালা বাজিয়ে গাছটা একলা দাঁড়িয়ে কোথায় আপন মনে বেহালা বাজাচ্ছে। চারদিকে ঘুমঘুম আচ্ছন্নতা। কফি খেয়ে প্রিয়বর্ধন ভয়মাখানো গলায় বলল, 'জয়ন্ত, আমরা বরং পালা করে পাহারা দিই। যদি ওই ভূতুড়ে ক্যাকটাসগুলো আমাদেরও বন্দি করে নিয়ে যায়?'

ওকে অশ্বাস দিয়ে বললুম, "প্রিয়বর্ধন, কিওটার উদ্ভিদেরা মানুষের মনের কথা যেন টের পায়। আমাদের মস্তিষ্কের চিন্তাতরঙ্গ হয়তো ওদের স্নায়ুতে প্রতিধ্বনি তোলে। আমরা যদি এ-দ্বীপে কোনও খারাপ মতলব না আঁটি, ওরা আমাদের ক্ষতি করবে না। এস, আমরা আরাম করে ঘুমোই।...

এরাতে কোনও বিপদ ঘটল না। কখন একবার কিছুক্ষণের জন্য ঘুম ভেঙে কানে এসেছিল, কারা যেন দূরে মধুর সুরে গান গাইছে। এমন অপার্থিব সঙ্গীত পৃথিবীর মানুষের কণ্ঠে শোনা অসম্ভব। জ্যোৎস্নরাতে কিওটার বনভূমিতে বিশ্বপ্রকৃতি নিজের হৃদয় খুলে দিয়েছে যেন।

শেষ রাতে একবার যেন শুনলুম, কে কোথায় খিলখিল করে হেসে উঠল—যেন মেয়েদেরই হাসি। স্বপ্নও হতে পারে। বাস্তবও হতে পারে। পুরুষ উদ্ভিদের মতো মেয়ে উদ্ভিদও তো আছে।

সকালে ক্যারিবোরা প্রচুর খাদ্যদ্রব্য, দড়িদড়া, শাবল, হাতুড়ি, এমনকী একটা বেতার ট্রান্সমিশন সেট পর্যন্ত নিয়ে এসেছে দেখে খুব আনন্দ হচ্ছিল। প্রিয়বর্ধন যতক্ষণ ব্রেকফাস্ট তৈরি করছিল, ততক্ষণ আমি ওই বেতার যন্ত্রটাকে চালু করার চেষ্টা করছিলুম। চালু হতেই রিসিভিং কেন্দ্রে অস্পষ্টভাবে দুর্বোধ্য ভাষায় কোন কেন্দ্রের ব্রডকাস্টিং ভেসে এল। প্রিয়বর্ধন নেচে উঠল তার মাতৃভাষা শুনে। বলল, "সিঙ্গাপুর কেন্দ্রে খবর হচ্ছে।" নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটা করে কেন্দ্রের সাড়া পায় আর সে চেঁচিয়ে ওঠে উত্তেজনায়। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া বা দক্ষিণ এশিয়ার বহু ভাষা সে জানে। কিছুক্ষণ পরে সে কোন্ কেন্দ্র থেকে কান করে কিছু শোনার পর দম আটকানো গলায় বলে উঠল, "জয়ন্ত জয়ন্ত! তোমার খবর হচ্ছে। রুবি আইল্যান্ডের নৌবাহিনীর ব্রডকাস্টিং সেন্টার থেকে জাহাজগুলোকে জানিয়ে দিচ্ছে তোমার নিরুদ্দেশের খবর। কিন্তু আমার কথা তো কেউ বলছে না!"

এই বলে সে ফ্যাঁচ করে নাক ঝেড়ে কেঁদে ফেলল। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, "ভেবো না প্রিয়বর্ধন। আমার উদ্ধার হলে তোমারও হবে। তাছাড়া মোটরবোটটা তো আছেই। বরং এবারে ট্রান্সমিশন চালু করে আমরা খবর পাঠাই বিভিন্ন ওয়েভলেন্থে। কোনও-না-কোনও কেন্দ্রে তা ধরা পড়বেই।"

এদিন দুপুর পর্যন্ত ওই নিয়ে ব্যস্ত থাকলুম দু'জনে। কখনও আমি ইংরেজিতে, কখনও প্রিয়বর্ধন বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ওয়েভলেন্থে জানাতে থাকলুম, "আমরা জয়ন্ত চৌধুরি আর পিওবের্দেনে এই দু'জন লোক কিওটা দ্বীপে আছি। অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ জানা নেই। তবে ডাইনির দ্বীপ থেকে আন্দাজ সাতশো নটিক্যাল মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এটা একটা বলয়দ্বীপ। আমাদের উদ্ধার করো।"

কোনও জবাব পাচ্ছিলুম না। মাত্র একবার সম্ভবত কোনও এমেচার বা শৌখিন বেতার ট্রান্সমিশন যন্ত্রের মালিক বলে উঠল, "কিওটা? ফক্কুরি করা হচ্ছে? শোনো, ওই রসিকতা আমিও করে ভীষণ বিপদে পড়েছিলুম। নৌবাহিনীর গোয়েন্দারা এসে আমাকে ধরে বেদম ঠেঙিয়েছিল। সাবধান!"

তাকে ব্যাকুলভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলেও কাজ হল না। সরকারি কেন্দ্রের ওয়েভলেন্থে আমরা ধরতে পারছিলুম না। কিন্তু ধরতে পারলে তারাও হয়তো মস্করা ভেবে উড়িয়ে দেবে। শেষে হতাশ হয়ে বললুম, "যাক গে। চলো প্রিয়বর্ধন, ক্যারিবো বেচারাদের খোঁজে বেরোই। হাজার হোক, ওরা মানুষ তো!"

এনজেলো! এনজেলো!

প্রিয়বর্ধন আমার সঙ্গে এল না। বলল, 'শয়তান ক্যারিবো আর ওই দুই ওরাংওটাংকে উদ্ধারের একটুও ইচ্ছা আমার নেই জয়ন্ত! ওরা উচিত শাস্তি পেয়েছে। বরং ততক্ষণ আমি মোটরবোটটা মেরামত করতে থাকি।'

আমার মন বলছিল, এ দ্বীপে আমি নিরাপদ। এই বিচিত্র সুন্দর বনভূমি আমার অসংখ্য বন্ধুতে ভরা। তারা মানুষের মতো করে কথা না বলতে পারলেও নিজেদের মতো করে কথা বলে। আমার চেতনায় অনুরণিত হচ্ছে তাদের মনের কথা। প্রতি মুহূর্তে টের পাচ্ছি, ওরা বলতে চাইছে, 'তুমি আমাদের বন্ধু, তুমি আমাদের প্রিয় অতিথি।'

এক বিশাল গাছের সামনে দাঁড়িয়ে তার পায়ে হাত রাখলুম। আবার চমকে উঠলুম। যেন কোনও প্রাণীর শরীর। মনে মনে বললুম, 'আমি কোনও ক্ষতি করতে আসিনি তোমাদের। আমার মনে রোজারিওর গুপ্তধনের বিন্দুমাত্র লোভ নেই।'

আশ্চর্য, আমার চেতনায় কী একটা বোধ সঞ্চারিত হল তখনই। যেন এই বৃদ্ধ প্রপিতামহ বৃক্ষের সস্নেহ কিছু আশীর্বাদ বাক্য অস্পষ্টভাবে অনুভব করলুম। তারপর গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চললুম বনের ভেতর দিয়ে। আমার সাহস চতুর্গুণ বেড়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে কেউ সামনের দিক থেকে হঠাৎ খুব চাপা গলায় ফিসফিস করে বলে উঠল, 'এনজেলো! এনজেলো' অমনি থমকে দাঁড়ালুম। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলুম না।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল, ক্যাপ্টেন জর্জ ব্যুগেনভিলিও ঠিক এই ডাক শুনেছিলেন কিওটা দ্বীপে। তাহলে এও প্রাচীন যুগের সম্ভবত কোনও নাবিকেরই কণ্ঠস্বরের ভূতুড়ে প্রতিধ্বনি। একটু হাসিও পেল। এক রাজার কান দুটো দেবতার অভিশাপে গাধার কানে পরিণত হয়েছিল। নাপিত ব্যাপারটা টের পেয়েছিল। কিন্তু কাউকে বললেই তো গর্দান যাবে। শেষে মাঠের মধ্যে গর্ত খুঁড়ে ফিসফিস করে বলেছিল, 'রাজার কান দুটো গাধার!' কিছুকাল পরে সেখানে গজালো একটা নলখাগড়ার ঝোপ। আর বাতাস বইলেই সেই ঝোপ থেকে ফিসফিস করে উচ্চারিত হত, 'রাজার কান দুটো গাধার!' প্রাচীন এশিয়া মাইনরের হিটাইট দেশের মিতান্নি গোষ্ঠীর রাজা মিদাসের গল্প এটা। 'কিং মিদাস হ্যাজ অ্যাসেস ইয়ারস!' নলখাগড়ার ঝোপটা ফিসফিস করে বাতাসের সুরে ঘোষণা করত।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে, উদ্ভিদের এই বেয়াড়া স্বভাবের কথা যেন প্রাচীন যুগের মানুষরাও অন্তত আঁচ করতে পেরেছিল।

কিন্তু আরও কিছুটা এগিয়ে আবার সামনে থেকে কেউ ফিসফিসিয়ে উঠল, 'এনজেলো! এনজেলো। কাম অন! কাম অন!'

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'কে তুমি ডাকছ এনজেলো বলে? আমি এনজেলো নই।'

'এনজেলো! ফলো মি।'

কেউ এনজেলোকে বলছে, 'আমাকে অনুসরণ করো।' আমি অবাক হয়ে হাঁটতে থাকলুম। কথাগুলো ক্রমশ আমার আগে-আগে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে কিছুক্ষণ অন্তর-অন্তর। মন্ত্রমুগ্ধের মতো চলেছি। একটু পরে টিলা পাহাড়ের কাছে পৌঁছলুম। সামনে একটা ফাটল। ফাটলের দু'ধারে কেয়াগাছের মতো দেখতে একরকম গাছ সারবেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হল, ওই গাছগুলোর ভেতর থেকে 'এনজেলো' বলে ডাক ভেসে আসছে। এবার গা ছমছম করতে থাকল। এ যেন শেষ পর্যন্ত ভৌতিক ঘটনা হয়ে যাচ্ছে। কোনও অশরীরী মানুষ যেন আমাকে এনজেলো ভেবে কোথায় ডেকে নিয়ে চলেছে।

আবার ইংরেজিতে সেই অশরীরী ফিসফিসিয়ে বলে উঠল : 'এনজেলো, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। চলে এসো।'

পেছন ফিরে বনভূমির দিকে তাকালুম। মনে বললুম, 'খাব কী?' আগের মতোই আমার চেতনার ভেতর সূক্ষ্ম তরঙ্গের মতো এক বোধ সঞ্চারিত হল। ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না,

শুধু বুঝলুম, আমাকে যেতে হবে! তখন হনহন করে সেই ফাটলের ভেতর দিয়ে চলতে শুরু করলুম।

আন্দাজ কুড়ি-পঁচিশ মিটার পরে দেখি একটা গুহার মুখ। মুখের ওপর ঘন লাতাপাতার ঝালর পর্দার মতো ঝুলছে। অসংখ্য ফুল ফুটে রয়েছে নানা রঙের। সুগন্ধে মউ মউ করছে। এ জায়গাটা বেশ চওড়া। একটা ঝাঁকড়া গাছ যেন ভ্রূকুটি-কুটিল অজস্র চোখ দিয়ে আমাকে দেখছে। সাবধানে

এগিয়ে ঝালরগুলো দু'হাতে সারালুম। গুহার ভেতর ঘন অন্ধকার থমথম করছে। ভূতগ্রস্তের মতো আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'আমি এসেছি—আমি এনজেলো দস সান্তোস!'

পরক্ষণে চমকে উঠলুম। এ আমি কী বলছি? আমার মুখ দিয়ে কার হয়তো পুরো নাম বেরিয়ে গেল—যাকে আমি চিনি না। জানি না। তার সঙ্গে আমার যুগের ব্যবধানও বিরাট। অথচ এনজেলো দস সান্তোস নামে সম্ভবত কোনও পর্তুগিজ নাবিকের নাম আমি উচ্চারণ করে ফেলেছি। কিন্তু এও বুঝতে পারছি যে এনজেলোকে ডেকে এখানে আনতে চাইছিল, সে ইংরেজ। কে সে?

এরপর আমার চেতনা যেন দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেল। একই শরীরে জয়ন্ত এবং এনজেলো কী করছে। ঠিক এভাবেই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যায়।

হলফ করে বলতে পারি। ওই অন্ধকার গুহায় আমি কিছুতেই ঢুকতে পারতুম না। কিন্তু আমার আত্মায় এনজেলোর আত্মা ভর করেছে। আমি ঢুকে গেলুম ভেতরে। একটু পরে দৃষ্টি পরিষ্কার হল। ওদিকে কোনও ফাটল দিয়ে আলো আসছিল। প্রথমেই চোখে পড়ল দুটো গাছের ডাল আড়াআড়ি বেঁধে ক্রস গড়া হয়েছে এবং সেটা পোঁতা আছে গুহার মেঝেতে। নিশ্চয় একটা কবর। কবরের ওপর আবছা আলো এসে পড়েছে সরু ফাটল থেকে। তাই এক টুকরো তক্তা নজরে পড়ছিল। সেটা কবরে ক্রসের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড় কারানো আছে। তাতে খোদাই করা আছে বড় বড় আঁকাবাঁকা হরফে :

'ক্যাপ্টেন রোজারিও এনড্রুস স্মিথ'
মৃত্যু ১৬ জুন, ১৫৯১

ফলকটা তুলে ধরে পড়ছিলুম। সেই সময়, গুহায় যে দিক থেকে ঢুকেছি, তার উল্টোদিকে ফাটল থেকে আসা আলোয় একঝাঁক ব্যুমেরাং গড়নের সেই কাঠপোকাগুলোকে লাফিয়ে-লাফিয়ে আসতে দেখলুম। আমার পায়ের কাছ দিয়ে ওরা লাফাতে লাফাতে গুহার দরজার দিকে চলে গেল। তারপর টের পেলুম ওদের পালিয়ে আসার কারণ। সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেলুম।

হনহন করে এগিয়ে আসছিল কেউ। ফাটলের আলোর কাছে সেও দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু ও কি মানুষ?

হ্যাঁ, মানুষই বটে। কারণ, আমার মতোই তার একটা মাথা, দুটো হাত, দুটো পা আছে। কিন্তু পরনে মাছের প্রকাণ্ড আঁশের মতো পাতার পোশাক যেন—পাতাবাহারের লাল-হলুদ চকরাবকরা রং ওই পাতাগুলোর। গলার কাছ থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত এই বিচিত্র পোশাক। দুটো বাহু এবং পা খালি। সবচেয়ে অদ্ভুত ওর গায়ের রং। খসখসে সবুজ।

মুখটাও সবুজ। ভুরু ও চোখের পাতা খয়েরি রঙের। চোখের তারা লালচে, বাকি অংশ ছাই রঙের। তার মাথার ঝাঁকড়া চুলগুলো অবিকল উদ্ভিদের গুচ্ছ মূল যেন,—চুলের রং মেটে।

সেই অদ্ভুত মানুষটা নিষ্পলক তাকিয়ে আমাকে দেখছে।

আমি হতবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলুম। তারপর মুখে হাসি ফুটিয়ে সম্ভাষণের ভঙ্গিতে একটু হাসলুম। তখন তার মুখেও হাসি ফুটে উঠল। সেও মাথাটা একটু দোলাল।

এবার আমি আমার জানা কয়েকটা ভাষায় তাকে জিগ্যেস করলুম, 'কে তুমি?' কিন্তু মনে হল, আমার কথা সে বুঝতে পারছে না। অথবা সে বোবা।

তারপর সে আমাকে হাতের ইশারায় তার সঙ্গে যেতে বলে যেদিক থেকে এসেছে, সেইদিকে পা বাড়াল। মনে অস্বস্তি নিয়ে তাকে অনুসরণ করলুম। একটু এগিয়ে গুহার অন্য মুখে পৌঁছলুম। এ মুখটা বেশ বড়। দেখলুম, মুখের ওপর যে লতার ঝালর ছিল, তা দু'পাশে সরিয়ে আটকে রাখা

হয়েছে! হয়তো এই সবুজ মানুষটাই এ কাজ করেছে। বাইরে বেরিয়ে জায়গাটা চিনতে পারলুম। কাল আমি ও প্রিয়বর্ধন এই পাহাড়ি-খাতেই এসেছিলুম। অনেক নরকঙ্কাল পড়ে আছে এখানে-ওখানে। কিন্তু কালকের মতো কোনও চেঁচামেচি প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল না। ভীষণ স্তব্ধ হয়ে আছে পরিবেশ। সবুজ মানুষ আমাকে ইশারা করল ডাইনে খুব সংকীর্ণ একটা খাতের ভেতর যেতে।

সেই খাতের ভেতর কিছুটা যাওয়ার পর এক অভাবিত দৃশ্য চোখে পড়ল।

আমাদের সামনে নিচে চওড়া অর্ধবৃত্তাকার একটা বেলাভূমি। সেখানে একদল এমনি রঙিন পাতার পোশাকপরা সবুজ মানুষ কী যেন করছে। তাদের হাতে গাছের ডাল। একটা প্রকাণ্ড পাতাশূন্য ডাল মাঝখানে পোঁতা আছে।

তারপরেই চোখে পড়ল জলের ধারে চার-পাঁচখানা ছিপ নৌকা।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথা পরিষ্কার হয়ে গেল। বুঝতে পারলুম, এই সবুজ মানুষরা আসলে আমার মতোই মানুষ। তারা গায়ে রং মেখে চোখ-ভুরু এঁকে এই দ্বীপে এসেছে কোনও উৎসব বা পুজোআচ্চা করতে। এরা কোনও দ্বীপের অধিবাসী তাতে সন্দেহ নেই। ওই নৌকায় চেপেই ওরা এসেছে।

এটা কিওটার উত্তর-পশ্চিম দিক। দূরে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে প্রবাল পাঁচিল। তাহলে এরা ঢুকল কোন্ পথে? পুবদিকের প্রবাল বলয়ের ভাঙা জায়গাটা ছাড়া এ-দ্বীপে আসার পথ তো নেই।

আমার প্রশ্নের জবাব তখনই মিলে গেল। ঢোলের শব্দ ভেসে এল এবং তারপর আতঙ্কে চেয়ে দেখলুম, ডানদিকের পাহাড়ে সেই ঝরনার পাশ দিয়ে ধাপে ধাপে আরও একদল সবুজ রং মাখা মানুষ কাকে বেঁধে কাঁধে বয়ে আনছে। বিচে নামার সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলুম বেচারা প্রিয়বর্ধনকে।

আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া হল পালিয়ে যাওয়ার। কিন্তু আমার সঙ্গী সেটা আঁচ করেই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লোকটার গায়ে অসম্ভব শক্তি। কিন্তু উৎকট দুর্গন্ধেই কাবু হয়ে গেলুম। ওর গায়ের দুর্গন্ধটা নিশ্চয় রঙের কড়া ঝাঁঝ। সে আমাকে মাটিতে পেড়ে দুর্বোধ্য ভাষায় চেঁচিয়ে উঠল। অমনি নিচের বিচ থেকে কয়েকজন ছুটে এল। অসহায় হয়ে ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিলুম।

প্রিয়বর্ধন চোখ বুজে পড়েছিল পোঁতা ডালটার সামনে। লতা দিয়ে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে ততক্ষণে বেঁধে ফেলেছে এরা। সে চোখ খুলে আমাকেও একই দশায় দেখে ভীষণ বিপদের মধ্যে করুণ হাসল। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'অন্যদিকে ঘুরে বোট সারাচ্ছি, ব্যাটাচ্ছেলেরা কখন পেছন থেকে এসে...'

একটা লোকের মাথায় ফুলের মুকুট। তার হাতে একটা চওড়া কাস্তের মতো বাঁকানো চকচকে অস্ত্র। সে হুমহাম করে গর্জন করে অস্ত্রটা নাড়তেই প্রিয়বর্ধন চুপ করে গেল।

বালির ওপর অসংখ্য ফুল ছড়ানো আছে। সবুজ রং মাখা লোকগুলো বিকট নাচতে লাগল তার ওপর। ঢোল বাজছিল। সেটা দ্বিগুণ জোরে বাজতে লাগল। তারপর ওরা দুর্বোধ্য ভাষায় গান গাইতে শুরু করল।

মাথার ওপর সূর্য। বালি তেতে উঠছিল ক্রমশ। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল—লতা দিয়ে এমন শক্ত করে আমাদের বেঁধেছে যে রক্তস্রোত বন্ধ হয়ে গেছে যেন।

তাদের নাচগানবাজনা ক্রমশ চরমে পৌঁছল। মাঝেমাঝে জ্ঞান হারিয়ে ফেলছিলুম। এইভাবে কতক্ষণ কাটল জানি না, একসময় দেখি, ওরা আমাকে আর প্রিয়বর্ধনকে বয়ে নিয়ে চলেছে। ঠাহর করে বুঝলুম, সেই পাহাড়ি খাতের ভেতর দিয়ে আমাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

সেই গুহার প্রকাণ্ড মুখের সামনে ওরা আমাদের নামিয়ে দিল। তারপর দু'জনকেই উপুড় করে শোওয়াল। বেশ বুঝলুম, এবার আমাদের মাথাটা কাটা হবে। আমরা কিওটা দ্বীপের বৃক্ষদেবতার বলি হব। ভাবলুম, প্রিয়বর্ধনকে মৃত্যুর মুহূর্তে শেষ বিদায় জানাই। কিন্তু কথা বেরুল না। তালু শুকিয়ে গেছে। কথা বলার শক্তিটুকুও আর নেই। তখন চিন্তা করলুম,

ওই কাস্তের মতো বাঁকা অস্ত্রটা দিয়ে নিশ্চয় পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে গলাটা কাটবে ওরা, যন্ত্রণাটা কতখানি হতে পারে।

এখন কিন্তু ঢাক বাজছে না। কেউ কথা বলছে না। আড়চোখে যতটা দেখা যায়, লোকগুলোর হাবভাবে চঞ্চলতা আঁচ করা যাচ্ছিল। একজন আমার এবং আরেকজন প্রিয়বর্ধনের পাশে বসে পড়ল।

হঠাৎ আমার মস্তিষ্কে বিদ্যুতের গতিতে একটা বোধ দেখা দিল। এ-দ্বীপের কৃষকবন্ধুদের এ বিপদে ডাকছি না কেন? সেই মুহূর্তে তখনকার মতোই আমার আচ্ছন্ন চেতনা থেকেই যেন সাড়া এল। অনেক কষ্টে ফিসফিস করে বলে উঠলুম, 'আমি এনজেলো দস সান্তোস! আমাকে বাঁচাও!'

অমনি গুহার দিক থেকে ঝড়বাতাসের শব্দের মতো শব্দে উচ্চারিত হল : 'এনজেলো! এনজেলো! এনজেলো!'

আমাদের পাশে বসে থাকা লোকদুটো তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে। 'এনজেলো' শব্দটা ক্রমশ বাড়ছিল। মনে হচ্ছিল ঝড় বইতে শুরু করেছে 'এনজেলো' শব্দের।

তারপর শোনা গেল সেই প্রতিধ্বনি : 'স্টপ ইট! স্টপ ইট! আই সে স্টপ ইট!' উঁচু পাহাড়ের দেওয়ালে সেই ভীষণ চিৎকার বিকট প্রতিধ্বনি তুলল। 'আই কিল ইউ। কিল...কিল...কিল!' তারপর হেল্প! হেল্প! হেল্প!'

দড়বড় দড়বড় শব্দ করে সবুজ রং মাখা পাতার পোশাক-পরা আদিম লোকগুলো ততক্ষণে উধাও। চেঁচামেচি থামলে মুখ অতিকষ্টে ঘুরিয়ে দেখি, জনপ্রাণীটি নেই। আর সামান্য তফাতে সেই কাস্তের মতো বাঁকা অস্ত্রটা পড়ে আছে। বুঝলুম, দেবতা বলি খেতে চায়নি বলে কিংবা ঘাতকের চোটে ব্যাটাচ্ছেলেরা অস্ত্রটা ফেলেই পালিয়ে গেছে। আমার গলায় এতক্ষণে জোর ফিরে এল। শরীরেও।

কিন্তু প্রিয়বর্ধনকে ডেকে সাড়া পেলুম না। গড়াতে গড়াতে অস্ত্রটার কাছে গেলাম। তারপর ওটার বাঁট কামড়ে চিত করে দুটো পাথরের মাঝখানে বসালুম। ঠোঁট কেটে গেল একটু। এবার কাত হয়ে অস্ত্রটার ডগায় হাতের বাঁধনটা ঘষতে থাকলুম। বাঁধন কেটে গেল। এবার আর অসুবিধে হল না।

একটু পরে প্রিয়বর্ধনের বাঁধন কেটে তাকে চিত করে দিলুম। সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলল, 'আমি বেঁচে আছি, না মরে গেছি?'

'বেঁচে আছো। ওঠো।'

প্রিয়বর্ধন তবু সন্দিগ্ধভাবে বলল, 'আমার ধড়টা কোথায়?'

'যথাস্থানে আছে। উঠে পড়ো। আমার খিদে পেয়েছে।'

ওকে টেনে ওঠালুম। ও কিছুক্ষণ হাত-পা ছোড়াছুড়ি করে এবং লাফালাফি করে রক্ত চলাচল ঠিক করে নিল। তারপর একটু হেসে বলল, 'তুমি তো জয়ন্ত। কেন বলছিলে আই অ্যাম এনজেলো দস সান্তোস? এনজেলো শুনেছি কাপ্তেন রোজারিওর ছেলের নাম ছিল। ওর বউ ছিল পর্তুগিজ।'

বললুম, 'ওসব পরে শুনব। এখন চলো, খিদে পেয়েছে।'

কিয়াংয়ের আবির্ভাব

অচল মোটরবোটটা হয়ে উঠেছে আমাদের উদ্ধারের আশায় প্রতীক। অথচ বুঝতে পারছিলুম, প্রিয়বর্ধন যত পাকা মিস্তিরির ভান করুক, ওটা সচল করার মতো জ্ঞানবুদ্ধি ওর নেই। তবু সময়টা বেশ কেটে যায় আশায় আশায়। প্রিয়বর্ধন নানা ভঙ্গিতে চিত-উপুড়-কাত হয়ে কিংবা হাঁটু দুমড়ে গম্ভীরমুখে খুটখাট করে এবং কোনও এক জলদস্যু কাপ্তেন রোজারিও, তার পর্তুগিজ বউ আর ছেলে এনজেলোর গল্প শোনায়। রোজারিও নাকি তার বউ আর ছেলেকে নিয়ে এই দ্বীপে বাস করতে এসেছিল। সঙ্গে ছিল সারাজীবনের লুণ্ঠিত ধনরত্ন। কিন্তু ওর চেলারা কীভাবে খোঁজ পেয়ে সারারাত এখানে হানা দেয়। ওদের হত্যা করে। তারপর নিজেদের মধ্যে মারামারি করে নিজেরাও খুন হয়ে যায়।

এই কাহিনী শুনে আমার মনে হচ্ছিল, কিওটা দ্বীপের উদ্ভিদ রহস্যের কিছুটা যেন আঁচ করতে পেরেছি। খুব উত্তেজনার সময় মানুষের স্নায়ুতন্ত্রে যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেয়, দ্বীপের গাছপালার কোষে কোষে যেন তা সাড়া তুলতে সমর্থ। সেই উত্তেজনার সময়কার সব কথাবার্তা তাই রেকর্ড হয়ে যায় কোষগুলিতে। তারপর সম্ভবত আবহাওয়ার তাপমাত্রার হেরফের ঘটলে সেটাই হয়ে ওঠে রেকর্ডগুলি বেজে ওঠার কারণ। লক্ষ্য করেছি, 'স্টপ ইট' চিৎকার নির্দিষ্ট সময় অন্তর বেজে ওঠে না। বেজে ওঠে হঠাৎই। কাজেই আবহাওয়ার হেরফেরের মধ্যেই রহস্যটা লুকিয়ে আছে।

মানুষের চিন্তাতরঙ্গের চাপ যে উদ্ভিদের ভেতরও সাড়া জাগায়, তা আধুনিক বিজ্ঞানীরা তো প্রমাণ করেছেনই। কর্নেলের কাছে মার্কিন বিজ্ঞানী ক্লি ব্যাকস্টারের গবেষণার কথা শুনেছিলুম। ব্যাকস্টার প্রথমে ছিলেন অপরাধ-বিজ্ঞানী এবং লাই-ডিটেকটর পরীক্ষক। 1966 সালে একটি হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করতে গিয়ে গাছের সাহায্যে হত্যাকারীকে ধরে ফেলেন। ব্যাকস্টার গ্যালভানোমিটার যন্ত্র সেই গাছের সঙ্গে যুক্ত করে সন্দেহযোগ্য লোকদের একে একে যন্ত্রটার সামনে দাঁড় করান। তারপর একটা লোক সামনে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকস্টার দেখলেন, গ্যালভানো মিটারের সংকেত কাঁটা প্রচণ্ডভাবে কাঁপতে শুরু করেছে। অর্থাৎ সেই গাছটা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। সেই লোকটাকেই এই গাছটা খুন করতে দেখেছিল। পরে সে সব স্বীকার করে। তারপর জগতে সাড়া পড়ে যায়।

প্রিয়বর্ধনকে কিওটা দ্বীপের গাছপালার রহস্য বোঝানোর চেষ্টা বৃথা। প্রাণের বিবর্তনের একটা স্তরে যখন উদ্ভিদ আর প্রাণী পৃথক হয়ে গিয়েছিল, সম্ভবত তখনই প্রকৃতির কী খেয়ালে এই দ্বীপে মাঝামাঝি একটা প্রজাতির উদ্ভব ঘটেছিল, যারা প্রাণী এবং উদ্ভিদ দুই-ই! তাই তারা স্বাভাবিক উদ্ভিদের চেয়ে বেশিমাত্রায় চেতনাসম্পন্ন। তাদের বোধশক্তি প্রাণীদের মতোই, অথচ তাদের দেহ উদ্ভিদের মতো। আবার কোনও কোনও উদ্ভিদ প্রাণীদের মতোই চলাফেরা করতেও সমর্থ। যেমন ওই অদ্ভুত ক্যাকটাসগুলো—যারা ক্যারিবো, উংচু আর ফুতাংকে ধরে নিয়ে গেছে।

তিনদিন ধরে আমরা সারা দ্বীপ তন্নতন্ন খুঁজেও হতভাগ্য লোক তিনটিকে দেখতে পাইনি। কখনও মাকড়সা ক্যাকটাসগুলোকে একলা বা দলবেঁধে ঘুরতে দেখেছি। কিন্তু সাহস করে কাছে গেলেই তারা ঝটপট একগুচ্ছের শিকড় মাটিতে ঢুকিয়ে বকধার্মিক সেজে দাঁড়িয়ে থেকেছে—যেন কিছু জানে না। ক্যাকটাস না ক্যাকটাস। প্রিয়বর্ধন দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলেছে, 'ন্যাকা! কোথায় গুম করেছ বদমাশগুলোকে, বলো শিগ্‌গির! নইলে ঘ্যাচাং করে গোড়াটা কেটে ফেলব।'

মাকড়সা-ক্যাকটাস নিশ্চয় বুঝতে পারে, প্রিয়বর্ধনের যত তড়পানি শুধু মুখেই। তাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। তবে আজ সকালে ভারি মজা হয়েছিল। যেই প্রিবর্ধন বকাবকি করতে গেছে, একটা মাকড়সা ক্যাকটাস আচমকা একটা শুঁড় বের করে ওকে জড়িয়ে ধরেছে। আর বেচারার সে কী ত্রাহি চিৎকার! শেষে আমি অনেক তোষামোদ অনেক কাকুতিমিনতি করলুম। তখন শুঁড়টা খসে গিয়ে ছোট হতে হতে স্প্রিংয়ের মতো গুটিয়ে মাকড়সা-ক্যাকটাসটার ভেতর লুকিয়ে পড়ল। প্রিয়বর্ধন ল্যাজ তুলে

দৌড়ে ক্যাম্পে চলে গেল। সেই থেকে আর নড়তেও চায় না। আবার মোটরবোটটা নিয়ে খুটখাট করে যাচ্ছে।

এদিকে ক্যারিবোদের আনা খাবারদাবার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমরা একবেলা গাছের ফলে বা বলয়সাগরের মাছ ধরে খিদে মেটাচ্ছি। অবশ্য খিদেয় মারা পড়ার আশঙ্কা নেই। দ্বীপে অসংখ্য ফলের গাছ আছে এবং অনেক গাছই দয়ালুদাতা।

আরেকটা কাজ দু'জনে নিয়মিত করে যাচ্ছি। তা হল রেডিও ট্রান্সমিশন যন্ত্রের নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিভিন্ন ওয়েভলেন্থে মেসেজ পাঠানো। কোনও কোনও কেন্দ্রে মেসেজ গণ্ডগোল ঘটাচ্ছে। দু পক্ষের কথাবার্তা জড়িয়ে-মড়িয়ে যাচ্ছে। যন্ত্রটা বিকট ঘড়ঘড় শব্দ তুলছে। বিগড়ে যাওয়ার ভয়ে বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। কখনও দৈবাৎ কোনও কেন্দ্রে যদি আমাদের মেসেজ ধরা পড়ছে, কড়া ধমক অথবা ঠাট্টাতামাশা করা হচ্ছে। কিওটা নামে দ্বীপটা সরকারি মতে রূপকথা। এটাই হয়েছে সমস্যা। রুবি আইল্যান্ডে নৌবাহিনীর বেতারকেন্দ্র যদি দৈবাৎ ধরতে পারি, আমাদের আশা আছে তারা আমাদের মেসেজকে উড়িয়ে দিতে পারবে না। কিন্তু কিছুতেই ওই কেন্দ্র ধরতে পারি না।

একদিন দুপুরে বহুদূরে একটা হেলিকপ্টারকে উড়তে দেখলুম। দুজনে আনন্দ নেচে উঠলুম। নিচে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলুম ওটার দিকে। কিন্তু নচ্ছার হেলিকপ্টারটা দূর দিয়েই চলে গেল। প্রিয়বর্ধন রেগে গাল দিতে শুরু করল। ওকে বুঝিয়ে বললুম, 'ভেবে দেখ প্রিবর্ধন, কোকোস দ্বীপপুঞ্জ এলাকায় হাজার-হাজার এমন দ্বীপ আছে। কোন দ্বীপটা যে কিওটা, সেটা খুঁজে বের করা আর খড়ের গাদায় সূঁচ খোঁজা একই কথা। ধৈর্য ধরো। ওই হেলিকপ্টার আবার হয়তো আসবে এবং এই দ্বীপের ওপর দিয়েও উড়ে যাবে। তখন আমাদের দেখতে পাবে।'

এরপর আমরা ঠিক করলুম, হেলিকপ্টারের শব্দ পেলেই আমরা শুকনো পাতা কুড়িয়ে আগুন জ্বালাব। ধোঁয়ায় আকৃষ্ট হয়ে এদিকে ওদের চোখ পড়বেই।

কিন্তু আরও দুদিন কেটে গেল বৃথা। হেলিকপ্টারটা আর এমুখো হল না।

তিনদিনের দিন দক্ষিণের বনভূমি পেরিয়ে খাড়ির মাথায় আমি একা দাঁড়িয়ে আছি, প্রিয়বর্ধন ক্যাম্পে আছে, সেই সময় নিচের একটা চাতালমতো জায়গায় চোখ পড়তেই চমকে উঠলুম। তিনটি সবুজ রঙের মানুষের মতো কারা পড়ে আছে। একেবারে উলঙ্গ তারা। ঝুঁকে ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখি, হতভাগ্য ক্যারিবো, ফুতাং আর উংচু!

দ্রুত তাদের কাছে নেমে গেলুম। উপুড় হয়ে পড়ে আছে তারা। সারা গায়ে সবুজ দাগড়া-দাগড়া ছোপ। তাদের দেহে প্রাণ নেই। তিনটি লোভী মানুষের এই ভয়ঙ্কর পরিণতি দেখে শিউরে উঠেছিলুম। সেই মারাত্মক ক্যাকটাস-প্রাণীর পাল্লায় পড়ে শ্বাসরোধ হয়ে সম্ভবত এরা মারা পড়েছে। কিন্তু ওই বিকটা সবুজ ক্ষতচিহ্নগুলি কি রুবিদ্বীপে শোনা সেই সবুজ এলার্জি রোগের চিহ্ন?

হতভাগ্য মানুষ তিনটির জন্য দুঃখ হচ্ছিল। ক্যাকটাস-প্রাণীরা তাদের এখানে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এরা মানুষ এদের মরা পড়ে থাকবে, এটা খারাপ লাগল। তক্ষুনি দৌড়ে গিয়ে প্রিয়বর্ধনকে ডেকে আনলুম।

প্রিয়বর্ধন সব দেখে বলল, 'কীভাবে এদের সদগতি করবে ভাবছ? এখান থেকে ওঠানো অসম্ভব। ক্যারিবো খ্রিস্টান, ফুতাং আর উংচু বৌদ্ধ। বরং এক কাজ করা যাক। এদের ঠেলে নিচের জলে ফেলে দিই। জয়ন্ত, সব শাস্ত্রেই বলেছে জল জিনিসটা শুদ্ধ। এদের আত্মার মুক্তি হবে। তাছাড়া নাবিকদের মৃত্যু হলে সমুদ্রের জলেই তাদের ফেলে দেওয়া চিরকাল সবদেশেরই রীতি।'

দু'জনে মৃতদেহ তিনটি ঠেলে নিচে খাড়ির জলে ফেলে দিলাম।

কিন্তু তারপর যা ঘটল তাতে আমরা আতঙ্কে হতবুদ্ধি হয়ে হাঁচড়-পাঁচড় করে ওপরে পালিয়ে আসতে বাধ্য হলুম। বলয়-সাগরের জল থেকে ভোঁস করে একটা লম্বাটে বিরাট মাথা বেরিয়ে এল। মুখটা কতকটা উটের মতো, কিন্তু সুচালো। লম্বা গলা। ছোট মাথা। কিন্তু শরীরটা তিমির মতো বিশাল। স্বচ্ছ জলে তার চারটে পাখনার মতো পা দেখা যাচ্ছিল। সেই বিকটাকৃতি সামুদ্রিক প্রাণীটি মহানন্দে মরা তিনটিকে পাখনা-পায়ে আটকে নিয়ে ভোঁস করে তলিয়ে গেল।

ওমনি আমার মনে পড়ে গেল ব্রিটেনের লক নেস (Loch Ness) হ্রদের কিংবদন্তিখ্যাত জলচর প্রাণী নেসি (Nessie) এর কথা। এই রহস্যময় প্রাগৈতিহাসিক জলচর প্রাণীটির ছবি পর্যন্ত ক্যামেরায় তুলেছিলেন কেউ কেউ। কিন্তু বহু খোঁজ করেও তার পাত্তা পাওয়া যায়নি আজও। বিজ্ঞানীদের ধারণা, ওই হ্রদের ভেতর কোনও গভীর সুড়ঙ্গে তার বসবাস।

এ কি তাহলে সেই নেসি?

বিকটাকার প্রাণীটির গলা এত লম্বা যে সে ইচ্ছে করলে অনায়াসে খাড়ির ওপর থেকে আমাদেরও টুপ করে মুখে তুলে নিতে পারে।

হয়তো সেই ভয়েই প্রিয়বর্ধন জঙ্গলের আড়ালে লুকোতে গেল। তারপর তাকে 'মাই গড' বলে ছিটকে সরে আসতে দেখলুম। সরে এসে আবার চেঁচিয়ে উঠল সে। বললুম, 'কী হল প্রিয়বর্ধন?'

প্রিয়বর্ধন একটা ঝোপের দিকে দেখিয়ে বলল, 'সাবধান জয়ন্ত, এই বিচ্ছু গাছগুলোকে চিনে রাখো। ব্যাটারা ইলেক্‌ট্রিক শক দিচ্ছে সামুদ্রিক ঈল মাছের মতো। জোর বেঁচে গেছি।'

ঝোপগুলোকে এড়িয়ে আমরা খোলা মাঠ ধরে ক্যাম্পে ফিরে গেলুম।...

সেদিন রাতে পূর্ণিমা। কিওটা বনভূমি যেন পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় মাতাল হয়ে উঠেছে। যেদিকে কান পাতি, সঙ্গীত শুনতে পাই। অপার্থিব যেন সেই সঙ্গীত। হু-হু করে হাওয়া দিচ্ছে আর মনে হচ্ছে, আকাশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে যেন পরীরা নেমে এসে নাচ-গানে জমিয়ে তুলেছে দ্বীপটাকে। প্রিয়বর্ধনের ওদিকে লক্ষ্য নেই। সে ক্যাম্পখাটে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। আমার পাহারা দেওয়ার পালা। কিন্তু কিসের জন্য এই সতর্ক পাহারা কে জানে? তবু মন মানে না বলেই ক্যারিবোদের ফেলে-যাওয়া একটা রাইফেল হাতে রেখেছি।

একসময় রাইফেলটা রেখে উঠে দাঁড়ালুম। পূর্ণিমারাতের বনভূমির মধুর অর্কেস্ট্রা প্রাণভরে উপভোগ করার জন্য কিছুটা এগিয়ে গেলুম।

তাহলে এমনি সব রাতেই প্রাচীন যুগে নাবিকরা কিওটা দ্বীপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সঙ্গীত শুনতে পেত। সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরের ইস্টার দ্বীপে আদিম অদিবাসীরা এই দ্বীপের কথা শুনে হয়তো 'কোহাও রঙ্গো রঙ্গো' পুঁথি রচনা করেছিল। কিন্তু এ-দ্বীপ এখনও সবাই খুঁজে পায় না—শুধু আমাদের মতো দৈবাৎ কেউ এখানে এসে পড়ে। তল্লাটের কোনও-কোনও দ্বীপে আদিম অধিবাসীরা অবশ্য এ-দ্বীপ কোথায়, তা ভালই জানে। তারা এখানে পুজো দিতে আসে। কিন্তু সভ্য মানুষের কাছে এর খোঁজ দিতে চায় না। আমরা সেদিন তাদের পাল্লায় পড়েছিলুম। আমার খোঁজে বেরিয়ে কর্নেল যদি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, তবেই এখান থেকে উদ্ধার হওয়ার আশা। নইলে বাকি জীবন এখানেই কাটাতে হবে।

আজ রাতে মনে হচ্ছিল, তা যদি হয়, তো হোক। কিওটার বৃক্ষরা আমার পরম বন্ধু হয়ে উঠেছে। তাদের মধ্যেই আমি আমৃত্যু বরং থেকে যেতে রাজি।

জ্যোৎস্নায় খোলা মাঠ ঝলমল করছে। আবছাকালো দু'ধারের অরণ্যে অর্কেস্ট্রা বাজছে আর বাজছে। কত বিচিত্র সুর। গম্ভীর, সূক্ষ্ম। চড়া বা খাদে। ডাইনে এগিয়ে উঁচু উঁচু গাছগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে রইলুম। এলোমেলো হওয়া বইছে আর ডালপালা নড়ছে—ওই বুঝি তাদের নাচ। বৃক্ষমর্মরধ্বনির কথা কবিতায় পড়েছি। কিন্তু এতো তা নয়—এ এক আশ্চর্য মধুর ঐকতান। কে শেখাল এই সঙ্গীতের ভাষা। তা কানের ভেতর দিয়ে মর্মে গিয়ে আমাকে আবেগে আচ্ছন্ন করে ফেলছে।

কতক্ষণ তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলুম জানি না, একসময় প্রিয়বর্ধনের চিৎকারে আচ্ছন্নতা কেটে গেল। সে উত্তেজিতভাবে ডাকডাকি করছিল, 'জয়ন্ত! জয়ন্ত! তুমি কোথায়?'

কোনও বিপদ ঘটেছে ভেবে দৌড়ে ক্যাম্পে ফিরে গেলুম। প্রিয়বর্ধন পুবের দিকে হাত তুলে বলল, 'একটা আলো দেখতে পাচ্ছ, জয়ন্ত? নিশ্চয় কোনও জাহাজ নোঙর করেছে। আলোটা একজায়গায় রয়েছে তখন থেকে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে তোমাকে ডাকলুম। সাড়া না পেয়ে বেরিয়ে আসতেই চোখে পড়ছিল আলোটা'।

আলোটা এক জায়গায় আছে। তবে মাঝে মাঝে ঢেউয়ে আড়াল হচ্ছে, আবার ভেসে উঠছে। প্রবাল-পাঁচিলের ভাঙা অংশটা দিয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বহুদূরের ওই আলো। আমরা তাকিয়ে রইলুম সেদিকে।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে অবাক হচ্ছিলুম। হাওয়াটা ক্রমশ বাড়ছে। অথচ আকাশ পরিষ্কার। এদিকে সারা দ্বীপ জুড়ে অর্কেস্ট্রার বাজনাও ক্রমশ বেড়ে চলেছে। কিওটার বনভূমি যেন উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে। একসময় হওয়ার ঝাপটানি এমন প্রবল হল যে ক্যাম্পের দড়ি ছিঁড়ে খুঁটি উপড়ে কোথায় উড়ে গেল। আমরা বালির ওপর উপুড় হয়ে পড়লুম ঝড়ের ধাক্কায়। দু'হাতে কানও ঢাকতে হল। প্রচণ্ড ঝড়ের শব্দ আর অর্কেস্ট্রার শব্দ মিলে কানে তালা ধরে যাচ্ছিল। বলয়সাগরের জল উপচে এসে আমাদের ভিজিয়ে দিচ্ছিল। একসময় ওই প্রলয় আলোড়ন যখন ধীরে ধীরে কমে গেল, তখন চাঁদ পশ্চিমে ঢলে পড়েছে।

শেষ রাতে সব শান্ত হয়ে গেল। তখন ক্ষীণ সুরে শুধু বেহালার বাজনা কানে আসছিল। বড় করুণ সেই সুর। এ যেন শোকসঙ্গীত শুনতে পাচ্ছি। কার হৃদয়ের গভীর শোক কান্নার সুরে ছড়িয়ে যাচ্ছে চারিদিকে। দূরে থমথম করছে আবছাকালো বনভূমি। মৃত্যুশোকের স্তব্ধতা রূপ নিয়েছে বুঝি।

তখনও জানতুম না, জানার উপায় ছিল না, একই শোকসঙ্গীত কেন। কেনই বা এত আলোড়ন।

একটু বেলা হলে দূরের সমুদ্র থেকে কুয়াশা কেটে গেল। তখন জাহাজটা দেখতে পেলুম। আমরা শুকনো পাতা ডালপালা জড়ো করে আগুন জ্বেলে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলুম। কিন্তু ততক্ষণে তিনটে মোটর বোট প্রাবাল পাঁচিলের কাছে এসে পৌঁছে গেছে। তিনটে বোটেই একদল করে মানুষ। বোটগুলো যেভাবে ওরা ভাঙন পার করল, তাতে বুঝলুম ওরা এর আগেও দ্বীপে সম্ভবত এসেছে। ওরা তাহলে কারা?

প্রিয়বর্ধন নিষ্পলক চোখে তাকিয়েছিল। এতক্ষণে ফিসফিস করে বলল, 'কিয়াং এসে গেছে! জয়ন্ত, একশোটা ক্যারিবো একটা কিয়াংয়ের সমান। তবে মাকড়সা-ক্যাকটাসের পাল্লায় পড়ে ওদেরও কী হয় দেখে নিও। আর একটা কথা। কিয়াংয়ের সঙ্গে আমরা ভাব জমাবো। ওরা যখন মারা পড়বে মাকড়সা-ক্যাকটাসের হাতে, তখন আমরা ওদের বোট নিয়ে ওদের জাহাজে চলে যাব।'

কিয়াংয়ের চেহারা বেঁটে হলেও প্রকাণ্ড। সে নিচে লাফিয়ে পড়ে হা-হা করে হেসে বলল, 'আরে? রাজবংশের প্রাইভেট সেক্রেটারিমশাই যে! আর এই ছোকরা বুঝি সেই টেকো দাড়িয়ালা ঘুঘু বুড়োর শাগরেদ? কী? রোজারিওর গুপ্তধন হাতাতে পেরেছো তোমরা?

প্রিয়বর্ধন একগাল হেসে বলল, 'না স্যার! তবে গুহার ভেতর রোজারিওর কবর দেখতে পেয়েছি।'

মহাশ্মশানের বেহালাবাদক

কিয়াং প্রিয়বর্ধনের কথা শুনে আরও হেসে বলল, 'রোজারিওর কবর আবিষ্কার করেছে, আর তার গুপ্তধন আবিষ্কার করতে পারোনি? আমি জানি, ওর কবরের তলায় সব ধনরত্ন পোঁতা আছে। চলো, সেই গুহাটা দেখিয়ে দাও।'

প্রিয়বর্ধন আমাকে চোখের ইশারায় কী যেন বলে খুব উৎসাহ দেখিয়ে পা বাড়াল। কিন্তু ব্যাপারটা আমার ভাল মনে হল না। মাকড়সা ক্যাকটাসের হাতে খামোকা আবার এতগুলো লোকের মৃত্যু হওয়াটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলুম না। তাই বললুম, 'মিঃ কিয়াং, শুনুন। ক্যারিবো আর তার দুই সঙ্গী এই দ্বীপে এসেছিল। তারা...'

কথা কেড়ে কিয়াং বলল, 'সর্বনাশ! তাহলে তারাই সব হাতিয়ে কেটে পড়েছে।'

বললুম, 'না। তারা এই দ্বীপের সাংঘাতিক মাকড়সা-ক্যাকটাসের পাল্লায় পড়ে মারা গেছে।'

কিয়াং হাসল। 'জানি, জানি। সেবার ওদের পাল্লায় পড়ে আমার দলেরও পাঁচটা লোকের প্রাণ গেছে। তাই এবার আমি তৈরি হয়েই এসেছি।'

'মিঃ কিয়াং! ওদের গায়ে গুলি বেঁধে না!'

কিয়াং তার কাঁধের ব্যাগ খুলে রিভলভারের মতো একটা জিনিস বের করে বলল, 'এটা কি জিনিস বুঝেছ? লেসার অস্ত্র। যে-কোনও সজীব পদার্থকে এক সেকেন্ডে ছাই করে ফেলবে। শুধু তাই নয়; পাথরের মতো নির্জীব পদার্থকেও গুঁড়ো করে দেবে। এর নল থেকে সাংঘাতিক লেসার রশ্মি বেরোয়। শুধু তাই নয়, ওই যে কামানের মতো জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ, ওটা আরও শক্তিশালী লেসার বিম ছুড়ে মারে। কি, চলো প্রিয়বর্ধন! রুবি আইল্যান্ডের ঘুঘুগুলো হেলিকপ্টার নিয়ে সবসময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার জাহাজ দেখে তাদের সন্দেহ হতে পারে। ঝটপট কাজ সেরে ফিরে যাব। তার আগে অবশ্য ভূতুড়ে গাছপালাগুলোকে জ্বালিয়ে খতম করে দিয়ে যাব।'

আমি দম আটকানো গলায় বলে উঠলুম, 'দোহাই মিঃ কিয়াং! কথা শুনুন—এই দ্বীপ বিজ্ঞানের এক ল্যাবরেটরি!'

'রাখো তোমার ল্যাবরেটরি!' কিয়াং বিকট হাসল। 'আমি এবার এসেছি কিওটার ভূতগুলোকে খতম করতে। ওরা আমাকে খুব ভুগিয়েছে। আমার অনেক লোক মারা পড়েছে ওদের হাতে। আমি প্রতিশোধ নেবই।'

বলে সে তার দলবল নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। প্রিয়বর্ধনকে ঠেলে নিয়ে চলল সে। কিন্তু আমার দিকে ঘুরেও তাকাল না।

একটু পরে শুরু হল কিয়াংয়ের পৈশাচিক কীর্তিকলাপ। যথারীতি 'স্টপ ইট! স্টপ্ ইট' চিৎকার প্রতিধ্বনিত হতেই দেখলুম, তার এক সঙ্গী যেদিক থেকে চিৎকারটা আসছিল, সেইদিক লক্ষ্য করে লেসার কামান বসাল। তারপর দেখলুম, ডানদিকের জঙ্গল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে। আমি দৌড়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বললুম, 'স্টপ ইট!' 'স্টপ্ ইট!' ওর এক অনুচর আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল।

কিয়াংয়ের মুখে পৈশাচিক হাসি। সে হুকুম দিল, 'এক চিলতে ঘাস পর্যন্ত আস্ত রাখবে না। ডাইনে-বাঁয়ে সব দিকের ওই ভূতুড়ে গাছপালাগুলোকে খতম করে দাও।

অসহায় চোখে দেখতে থাকলুম সে হত্যাকাণ্ড। লেসার কামানের মারাত্মক রশ্মিপুঞ্জ দেখতে পাচ্ছি না—শুধু হিস হিস শব্দ হচ্ছে কামানটা থেকে আর ক্রমাগত আগুন ধরে যাচ্ছে গাছপালায়, ঝোপঝাড়ে। প্রকৃতির লক্ষ লক্ষ বছরের সাজানো সুন্দর উদ্যান জ্বলে ছাই হয়ে যাচ্ছে। খোলা মাঠের সামনের দিকে সেই প্রাণী ক্যাকটাসের ঝাঁক পাঁচিলের মতো এগিয়ে আসছিল। তারাও দাউদাউ জ্বলে কালো ছাই হয়ে ঘাসে মিশে গেল। ঘাসেও আগুন ধরে গেল। কালো চাপ-চাপ ধোঁয়ায় আকাশ কালো হয়ে গেল। বাতাসে কটু গন্ধ ছড়াল। সভ্যতার ভয়ঙ্কর মারণশক্তি চারপাশে তাজা সুন্দর সবুজ জীবনকে ধ্বংস করে চলল। লেসারকামান ঘুরে-ঘুরে হিস হিস শব্দে বিষের আগুন ওগরাচ্ছে। আর চোখের পলকে উজ্জ্বল আগুনের চোখ ধাঁধানো শিখা ছড়িয়ে পড়ছে।

আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। চোখের সামনে এই বিরাট ধ্বংসলীলা দেখেও আমার কিছু করার নেই। পাশে একটা ছিপছিপে তরুণ গাছ বুঝি দুঃখে কাতর হয়ে করুণ সুর বাজাতে শুরু করেছিল, নিষ্ঠুর কিয়াং তাকে লক্ষ্য করে লেসার পিস্তলের ট্রিগার টিপল। চোখের পলকে গাছটা কালো হয়ে গুঁড়িয়ে পড়ল এবং বাতাসে কয়েক মুঠো ছাই উড়ে যেতে দেখলুম। ধ্বংসের নেশায় কিয়াং মাতাল হয়ে উঠেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে যেদিকে তাকাই, সেদিকেই শুধু কালো ছাই। ছোট্ট দ্বীপের সব সবুজ, কালো ভস্মস্তূপে পরিণত। এক বিশাল শ্মশানভূমিতে একদল নিষ্ঠুর পিশাচের কাছে দাঁড়িয়ে আছি।

এতক্ষণে প্রিয়বর্ধন ধরা গলায় বলে উঠল, 'কাজটা কি ঠিক হল স্যার?'

কিয়াং তার মাথায় গাঁট্টা মেরে বলল, 'চল ব্যাটা ছুঁচো, কোথায় রোজারিওর কবর, দেখি।'

প্রিয়বর্ধন কাঁদোকাঁদো মুখে বলল, 'ছাইগুলোতে পা পুড়ে যাচ্ছে স্যার!'

'তোর পায়ে জুতো নেই দেখছি। ওহে রিংপো, ওকে তোমার জুতোজোড়া দাও বরং। আর তুমি বোটের কাছে গিয়ে পাহারা দাও।'

প্রিয়বর্ধনের পায়ে জুতো দুটো ফিট করছিল না। বেঢপ রকমের প্রকাণ্ড জুতো পরে বেচারা থপ থপ করে এগিয়ে গেল ওদের সঙ্গে। রিংপো নামে লোকটা মুচকি হেসে বলল, 'এখানে একলা কান্নাকাটি করে কী হবে স্যাঙাত? এস—আমরা বরং বিচে গিয়ে গপ্পসপ্প করি।'

বিচের ধারে একলা সেই বেহালা বাজিয়ে গাছটা করুণ চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে তাকিয়ে দেখে বুঝলুম, শুধু এই ছোট গাছটাই বেঁচে আছে। পেছনদিকে পাথরের আড়ালে বিচের মাথায় আছে বলেই তার দিক চোখ পড়েনি কিয়াংয়ের। কিন্তু কেন সে বেহালা বাজাচ্ছে না? শোকে মূক হয়ে গেছে কি?

কাল রাতে তাহলে কিয়াংয়ের জাহাজ এসে পৌঁছনোর পর কিওটার উদ্ভিদ চেতনায় ওই উত্তেজনার সঞ্চার ঘটেছিল। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় তাহলে আমি শোকসঙ্গীতই শুনেছিলুম।

রিংপো লোকটির মেজাজ ভাল। সে আমাকে ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢেলে দিয়ে বলল, 'নাও, খেয়ে ফেলো। দুঃখ করে কী হবে? গাছপালা বৈ তো নয়! তবে কি জানো। আমাদের কর্তাটি একেবারে শয়তানের অবতার। রোখ চাপলে আর ভালমন্দ জ্ঞানগম্যি থাকে না।'

কফি খেতে ইচ্ছে করছিল না। তবু খেতে হল। ওর সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা করলুম। রিংপো রুবি দ্বীপেরই লোক। বউ ছেলেপুলে আছে। কিয়াংয়ের মাছের আর শুঁটকির মস্ত কারবার আছে। রিংপো অবশ্য মাছ ধরার কাজেই থাকে। তবে সে জানে, কর্তা বহুদিন আগে থেকে কিওটা দ্বীপের খোঁজ রাখে। রাজাকোর সঙ্গে একসময় তার খুব বন্ধুতা ছিল। রাজাকোও জানত সব। কিন্তু যতবারই ওরা কিওটা এসেছে, ভয়ঙ্কর কী বিপদ ঘটেছে। কোনওক্রমে প্রাণ নিয়ে ফিরে গেছে। তাই এবার সেজেগুজে মারাত্মক অস্ত্র সংগ্রহ করে এ-দ্বীপে পাড়ি জমিয়েছে।

কথায়-কথায় রিংপো বলল, 'এবার তোমার আর প্রিয়বর্ধনের ব্যাপারটা বলো, শুনি। কীভাবে তোমরা এ-দ্বীপের খোঁজ পেয়েছিলে?

একে সংক্ষেপে সব কাহিনী শোনালুম। তারপর বললুম, 'রোমিলার খবর কিছু জানো?

রিংপো বলল, 'জানি না। তবে শুনেছি, তুমি যাদের সঙ্গে রুবি দ্বীপে এসেছিলে, তারা তোমার মরা খুঁজে বেড়াচ্ছে সমুদ্রে।'

বলে সে উঠে দাঁড়িয়ে চারদিক দেখে নিল। তারপর চাপা গলায় ফের বলল, 'তোমার কথাবার্তা শুনে ভাল লোক বলে মনে হচ্ছে। তাই বলছি শোনো। বাইরের কেউ রোজারিওর গুপ্তধনের সাক্ষী থাক, সেটা সম্ভবত পছন্দ করবেন না কর্তামশাই। কাজেই তোমাকেও বাঁচিয়ে রাখবেন বলে মনে হয় না। অবশ্য প্রিয়বর্ধনের কথা আলাদা। সে রুবি দ্বীপেরই বাসিন্দা। তাকে দলে ভিড়িয়ে নিতেও পারেন। কিন্তু তোমার বাঁচোয়া নেই।'

তার কথা শুনে শিউরে উঠে বললুম, 'তাহলে কী করতে বলছ আমাকে?'

রিংপো একটু ভেবে বলল, 'জঙ্গলগুলো থাকলে লুকিয়ে থাকতে। কিন্তু কর্তামশাই তো সব ছাই করে ফেলেছেন। তুমি বরং এই সুযোগে সাঁতার কেটে দক্ষিণের প্রবাল পাঁচিলের কাছে চলে যাও। ওই পাঁচিলে অনেক গুহা আছে। লুকিয়ে থাকো গে। রুবি দ্বীপে ফিরে গিয়ে গোপনে আমি রোমিলাকে তোমার খবর দেব। সে তোমাকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করবে।'

'দক্ষিণের প্রবল পাঁচিলে পৌঁছনো অসম্ভব রিংপো।'

'কেন? সাঁতার কাটতে পারো না?'

'পারি। কিন্তু স্বচক্ষে দেখেছি, ওদিকে বলয়সাগরের জলে ভয়ঙ্কর একটা জন্তু আছে।'

'তাহলে উত্তরের পাঁচিলে চলে যাও।'

'তার চেয়ে এ-দ্বীপের পশ্চিমে ওই পাহাড়গুলোর ভেতর গিয়ে লুকিয়ে পড়ছি বরং।'

রিংপো লাফিয়ে উঠে বলল, 'কখনো না। কর্তার নজরে পড়ে যাবে। রোজারিওর কবরের তলায় যদি গুপ্তধন সত্যি সত্যি না থাকে, কর্তা সব জায়গা ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে খুঁজবে। কী দরকার ঝুঁকি নিয়ে? আমার ধারণা, উত্তরের দিকটায় জল কম। আমি সারা জীবন জলে ঘুরছি। জল দেখে তার গভীরতা বলে দিতে পারি। তুমি কেটে পড়ো।'

'আমার জন্য তোমার ক্ষতি হবে না তো রিংপো?'

রিংপো চটে গিয়ে বলল, 'নিজে বাঁচলে বাপের নাম। সাধুগিরি ফলিও না তো বাপু। কর্তা কি আমাকে বলে গেছে তোমাকে পাহারা দিতে? সোজা বলে দেব, কেটে পড়েছে। কিংবা জঙ্গলদানবের পেটে গেছে।'

একটু ইতস্তত করে বললুম, 'উপকার যদি করতে চাও, একটু বেশি করেই না হয় করলে ভাই রিংপো। তিনটে মোটরবোট এনেছ। একটায় চাপিয়ে আমাকে ওখানে পৌঁছে দিয়ে এস।'

রিংপো পশ্চিম দিকটা ভাল করে দেখে নিয়ে বলল,'পারতুম। কিন্তু যে কোনও মুহূর্তে কর্তা এসে পড়বে। তখন আমার প্রাণটাও যাবে।'

অগত্যা জলে গিয়ে নামলুম। পুবের ভাঙন দিয়ে মহাসাগরের ঢেউ এসে ঢুকছে। তাই এদিকটায় ঢেউ আছে। কিন্তু উত্তরদিকটায় তত ঢেউ নেই। বাতাস বইছে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে। পোড়া দ্বীপের ছাই এসে পড়ছে জলে। কটু গন্ধ ঝাপটা মারছে নাকে। কোনাকুনি মাইলটাক সাঁতার কেটে কখনও ডুবো পাথরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলুম। প্রতি মুহূর্তে ভয় হচ্ছিল, এখনই জলদানব ভোঁস করে মাথা তুলে আমাকে তেড়ে আসবে। কিন্তু প্রবাল পাঁচিলে পৌঁছনো পর্যন্ত নিরাপদ রইলুম।

একটা চাতালে উঠে আবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলুম। তারপর অনেক কষ্টে পাঁচিলের মাথা পেরিয়ে ওপাশে গিয়ে আরেকটা চাতাল পাওয়া গেল। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি এখানে বসে আছে। উড়ে বেড়াচ্ছে। আমাকে দেখে ওরা গ্রাহ্য করল না। চাতালের একপাশে একটা ছোট্ট গুহাও পাওয়া গেল। এতক্ষণে ভাবনা হল, কবে ওদের জাহাজ ফিরে যাবে রুবি দ্বীপে, তারপর রিংপো খবর দেবে রোমিলাকে। ততদিন আমি বেঁচে থাকব তো? কী খেয়ে বাঁচব?

হ্যাঁ, এখানে পাখির ডিম প্রচুর। সমুদ্রের স্বচ্ছ জলে মাছও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কাঁচা খাব কেমন করে? একটু পরে ভাবলুম, বরং ওদের জাহাজ চলে গেল আবার সাঁতার কেটে দ্বীপে ফিরে যাব। ক্যারিবোদের জিনিসপত্র কাল রাতের ঝড়ে উড়ে কোথাও পড়ে আছে। ওর ভেতর যদি একটা সিগারেট লাইটার পেয়ে যাই, তাহলে অন্তত মাছের রোস্ট খেয়েও বেঁচে থাকতে পারব।

কিন্তু দ্বীপে তো সব পুড়ে ছাই। আগুন জ্বালাব কিসে? আমার মনটা দমে গেল। এদিকে খিদেও পেয়েছে। একটা ডিম ভেঙে চোখ বুজে চোঁ-চোঁ করে গিলে ফেললুম। খিদের মুখে অমৃত লাগল। আরও গোটা তিনেক ডিম গিলে খিদেটা যদি বা দূর হল জলের তেষ্টা মেটাব কেমন করে? ঝরনা আছে কিওটা দ্বীপের পাহাড়ে। এখানে প্রবাল বলয়ের দু'ধারে নোনা জল।

চাতালের ওপর ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ মনে হল, কোনও গর্তে বৃষ্টির জল কি জমে নেই? মাউন্টেনিয়ারিং-এ ট্রেনিং নেওয়াটা এতকাল পরে দারুণ কাজে লাগল। অনেক খুঁজে একখানে গর্তের ভেতর জল পাওয়া গেল। জলটা চেখে একটু ঝাঁঝালো স্বাদ পেলুম। বিষাক্ত নয় তো? ভয় পেয়ে মুখে দিলুম না। প্রবাল অশোধিত অবস্থায় বিষাক্ত বলে শুনেছি। তবে এই পাঁচিল প্রবালকীট জমে তৈরি হলেও এর বয়স হাজার-হাজার বছর। এখন পাথরে পরিণত হয়েছে। কাজেই এখানে প্রবালের বিষ না থাকাই সম্ভব। তবু মনে সন্দেহ এসেছে যখন না খাওয়াই ভাল। অগত্যা বৃষ্টি-মেঘের আশায় তাকিয়ে রইলুম।

বৃষ্টি এল বিকেল নাগাদ। তুমুল বৃষ্টি। ছেঁড়া জামা নিংড়ে জল খেলুম। সেই গুহার ভেতর কাটিয়ে দিলুম একটা রাত। পরদিন সকালে পাঁচিলের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, দ্বীপের বিচে মোটরবোটগুলো নেই। দূরের সমুদ্রে কিয়াংয়ের জাহাজটাকেও দেখতে পেলুম না। ওরা তাহলে গুপ্তধন উদ্ধার করে কখন ফিরে গেছে।

সাঁতার কেটে দ্বীপে ফিরে এলুম আবার।

দ্বীপ নয়, শ্মশান। ক্লান্ত, দুঃখিতভাবে দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় বেহালা বেজে উঠল। সেই একলা বেহালা-বাজিয়ে গাছটা বেঁচে আছে শুধু। করুণ সুরে একলা বেহালা বাজাচ্ছে। তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। কিওটার শ্মশানে দাঁড়িয়ে সে শোকসঙ্গীত বাজিয়ে চলেছে একা। তার কাছে বসে রইলুম।

আরও দুটো দিন কেটে গেল এই শ্মশানভূমিতে। ক্যারিবোর কোনও জিনিস খুঁজে পাইনি। হয় ওরা কুড়িয়ে নিয়ে গেছে, নয়তো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ছাই হাতড়ে আমার চেহারা হয়েছিল ভূতের মতো। নোনা জলে ছাইগুলো ধুয়ে যাওয়া দূরের কথা, আরও চটচটে হয়ে এঁটে গিয়েছিল। পাথর ছুড়ে মাছ মেরেছি আর কাঁচা চিবিয়ে খেয়েছি। তৃতীয় দিনে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলুম। একেবার চলচ্ছক্তিহীন অবস্থা। অতি কষ্টে সেই বেহালাবাদকের কাছে গিয়ে শুয়ে পড়লুম, বুঝতে পারছিলুম, মৃত্যুর দেরি নেই। আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে পরম বন্ধুর মতো বেহালাবাদক গাছটি করুণ সুরে বেহালা বাজাচ্ছিল। তারপর আর বিশেষ কিছু মনে নেই। শুধু এটুকু মনে আছে, আমার চেতনার সঙ্গে ওই সুর একাকার হয়ে যখন গভীর অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছিল, তখন কে যেন ডাকছিল, 'এনজেলো! এনজেলো! মাই সন!' আমার সাড়া দিতে ইচ্ছে করছিল, 'এই তো আমি'।...

চোখ মেলে কিছুক্ষণ বুঝতে পারলুম না কিছু। তারপর ভেসে উঠল পরিচিত একটা মুখ। সেই মুখে একরাশ সাদা দাড়ি আর স্নেহ। 'জয়ন্ত! ডার্লিং!'

'কর্নেল!' আমি চমকে উঠে সাড়া দিলুম। 'আমি কোথায়?' কর্নেল নীলাদ্রি সরকার আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'রুবি আইল্যান্ডের মেরিন হসপিটালে। আশা করি, শিগ্‌গির শরীর সেরে যাবে। ভেবো না।'

রোমিলাকে দেখতে পেলুম এতক্ষণে। সে একটু হেসে বলল, রিংপোর কাছে সব খবর পেয়ে কর্নেলকে জানিয়েছিলুম। আমরা ধরেই নিয়েছিলুম তোমাকে ওরা মেরে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে। যাই হোক, কর্নেল তক্ষুণি মিলিটারি হেলিকপ্টারে রওনা দিলেন। ওদিকে কিয়াংয়ের জাহাজকেও নেভির লোকেরা আটক করল। কিয়াং এখন জেলে।'

কর্নেল বললে, 'কিওটার কালো রং দেখে আর চিনতে অসুবিধে হয়নি। কিন্তু বেহালার সুর শুনে যদি না ওদিকে এগিয়ে যেতাম, তোমাকে দেখতেই পেতুম না। যাই হোক, অন্তত একটা গাছ বেঁচে আচে ওখানে। ডঃ বিকর্ণ আর ক্যাপ্টেন ব্যুগেনভিলি ওখানে ক্যাম্প করে আছেন। ডঃ বিকর্ণের গবেষণার সুবিধে হবে।'...

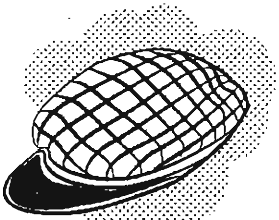

কালো বাকসের রহস্য

ছেঁড়া ঘুড়ির পেছনে

আচায্যিপাড়ার স্বপন কবে তার জ্যাঠামশায়ের শ্রাদ্ধে ন্যাড়া হয়েছিল সেই থেকে ওর নাম ন্যাড়া হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম ন্যাড়া বললে ভারি রেগে যেত। আজকাল সয়ে গেছে। বাড়িতেও সবাই তাকে ন্যাড়া বলে।

তা ন্যাড়াই ব্যাপারটা দেখেছিল।

এই মহকুমা শহরের পাশ ঘেঁষে গেছে রেললাইন। স্টেশনের ওধারে রেলইয়ার্ড হবে বলে প্রায় এক বর্গকিলোমিটার জায়গা রেলদফতর দখল করে রেখেছেন। সেখানে আগাছার জঙ্গল, হাজামজা একটা ঝিল আর ঘাসেভরা মাঠ আছে। সেই মাঠে অনেক ছেলে গিয়ে ঘুড়ি ওড়ায় কিংবা খেলাধুলো করে। ন্যাড়া গিয়েছিল ঘুড়ি ওড়াতে।

শীতের বিকেল। কনকনে উত্তুরে হাওয়া বইছিল। ন্যাড়ার ঘুড়ি একটা গোত্তা খেয়ে গাছের ডগায় সুতো জড়িয়ে গণ্ডগোল বাধিয়েছিল। ন্যাড়া গাছে চড়তে তত পটু নয়। আর গাছটাও মস্তো ঝাঁকড়া বট। অগুনতি ঝুরি। তলাটা ততক্ষণে বেশ আঁধার দেখাচ্ছিল।

ন্যাড়া এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখেছিল, কেউ কোথাও নেই। যেসব ছেলে তার মতো ঘুড়ি ওড়াতে এসেছিল বা ক্রিকেট খেলছিল, কখন একে একে চলে গেছে।

ন্যাড়ার মনে শুধু ভূতের ভয়। এমন নিরিবিলি জায়গা, তার ওপর আসন্ন সন্ধ্যা আর এমন বটগাছের মতো আশ্রয়। ভূতেরা কি এমন জায়গা ছেড়ে থাকতে চায়?

কিন্তু অমন সুন্দর ঘুড়িটাও এখন একটুও ফেঁসে যায়নি। শান্তভাবে আটকে আছে। অনেকখানি সুতোও রয়েছে। ন্যাড়া শেষ পর্যন্ত সাহস করে বটগাছে উঠেছিল। মোটা ছড়ানো একটা ডালে কয়েক-পা এগোলেই মাথার ওপর হাত বাড়িয়ে ঘুড়িটা ছাড়ানো যায়।

সে সবে ঘুড়িটা ছাড়িয়েছে, হঠাৎ নিচে কোথাও শুকনো পাতায় মচমচ শব্দ হল। ডালপালার ফাঁক দিয়ে সে দেখল, দুজন লোক সবে এসে দাঁড়িয়েছে এবং চাপা গলায় কী বলাবলি করছে। একজনের চেহারা একেবারে জল্লাদের মতো। গোঁফ, গালপাট্টা তো আছেই। চোখ দুটো যেন জ্বলছে। পরনে কালো পাতলুন আর কালো গেঞ্জি। একজনের হাতে বন্দুক, অন্যজনের হাতে পিস্তল। তার পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। গায়ে চাদর। তাদের পায়ের কাছে একটা কালো রঙের ছোট্ট বাকসো রয়েছে। বাকসোটা তারা বয়ে এনেছে বোঝাই যায়। কিন্তু লোক দুটোকে যেন এর আগে কোথাও দেখেছে। পিস্তলধারী মুখটা চাদরে ঢেকে রেখেছে বলে চেনা যাচ্ছে না।

ন্যাড়া বিশেষ করে বন্দুক-পিস্তল দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। লোকদুটো নিশ্চয় ডাকাত-গুন্ডা না হয়ে যায় না। পাছে ন্যাড়াকে তারা মেরে ফেলে, ন্যাড়া টুঁ শব্দটি করেনি। সে চুপচাপ গিরগিটির মতো ডালের সঙ্গে নিজেকে আটকে রেখে ব্যাপারটি দেখছিল।

আলো ক্রমে মরে যাচ্ছিল। আবছা আঁধারে লোক দুটো তারপর অদ্ভুত কাণ্ড শুরু করেছিল। তারা বটতলায় জুতোর ঠোক্কর মেরে যেন একটা অদৃশ্য ফুটবল নিয়ে খেলা করছিল। খানিক পরে একজন বলে উঠেছিল—'এসো, হাত লাগাও।'

তারপর দুজনে হাঁটু দুমড়ে বসে মস্তো দুটো ছোরা বের করেছিল। সেই ছোরা দিয়ে মাটি খুঁড়ে একটা আংটা বেরুতেই সেটা দুজনে মিলে জোর টানাটানি করেছিল। ততক্ষণে বটতলায় আঁধার

ঘন হয়েছে। ন্যাড়া স্পষ্ট কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। শুধু টের পেয়েছিল। কালো বাকসোটা দুজনে বয়ে এনে তারপর কিছুক্ষণ যেন বেমালুম নিপাত্তা হয়ে গেল। আর কোনও সাড়া-শব্দই নেই।

সেই শীতে ন্যাড়া তো জমে হিম হয়ে গেছে। অথচ সাহস করে নেমে আসতে পারছে না। ঘুড়ির মায়া আর নেই তখন। প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে আসাটাই বড় কথা। কিন্তু নামলেই যদি গুন্ডা দুটোর সামনে পড়ে?

অথচ ওরা গেল কোথায়? বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেল নাকি?

না। একটু পরে টর্চের আলো জ্বলল নিচে। সেই আলোয় ন্যাড়া যা দেখল, তাতে হতবাক হয়ে বসে রইল। একটা চৌকো গর্তের ধারে একজন বসে গর্তের ভেতর আলো ফেলেছে। আরেকজন সেই গর্তে নেমে কী একটা টানাটানি করছে। কালো বাকসোটা তার পায়ের কাছে গর্তের মধ্যেই রয়েছে। গর্তটা কিন্তু নিছক গর্ত নয়, চৌকো পাথরে বাঁধানো চৌবাচ্চা যেন।

গর্তের লোকটা হঠাৎ বলে উঠল—'পাওয়া গেছে।'

ওপরকার লোকটা বলল—'খুলে ফ্যালো।'

'ফের বিষাক্ত গ্যাস বেরুতে পারে আগের মতো।'

'পরীক্ষা করে দ্যাখো তাহলে। আগের বার নিশ্চয় সব বেরিয়ে গেছে।'

ফের কিছুক্ষণ চুপচাপ। গর্তের লোকটা কী একটা যন্ত্র বের করে নাড়াচাড়া করল কিছুক্ষণ। তারপর বলল—'নেই।'

'তাহলে ভেতরে ঢুকে যাও। আমি টর্চ নেভাচ্ছি। কেউ দেখে ফেলতে পারে।'

'ঠিক আছে! আমার কাছে টর্চ আছে।'

গর্তের ওপরকার টর্চ নিভে গেল। গর্তের ভেতর টর্চ জ্বলল। লোকটা সেই কালো বাকসোটা নিয়ে হুমড়ি খেয়ে বসল। তারপর আর তাকে দেখা গেল না।

বটতলার নিচে তখন ঘন অন্ধকার। এত শীতেও ন্যাড়ার গায়ে যেন ঘাম জমছিল। সে বুঝতে পারছিল না, এটা একটা স্বপ্ন না বাস্তব ঘটনা। কে ওরা? ওই বাকসোতে কী আছে? আর এই পোড়ো জঙ্গুলে জায়গায় কি তাহলে মাটির নিচে কোনও গোপন ঘর আছে—যেখানে লোকটা বাকসোটা লুকোতে নিয়ে গেল।

সময় কাটতে চায় না। ঝিলের ওদিকে শেয়াল ডাকছিল। মাথার ওপর প্যাঁচা ডেকে উঠছিল। ভাগ্যিস নিচের লোকটা প্যাঁচাটা দেখার জন্য টর্চ জ্বালেনি। তাহলেই ন্যাড়াকে দেখতে পেত এবং নিশ্চয় গুলি করে মারত। কিন্তু সেই সময় হঠাৎ ন্যাড়ার মনে হল, ওদের গলার স্বর যেন চেনা।

কতক্ষণ পরে নিচে ফের আলোর ঝলক। তারপর দুজনের কথাবার্তা শোনা গিয়েছিল।

'সব ঠিক আছে।'

'হুম। উঠে এসো ঝটপট। সব ঢাকাঢুকি দেওয়া যাক।'

'অলো জ্বালার দরকার নেই। এসো, হাত লাগাও।'

নিচে অস্পষ্ট একটা ভারী শব্দ হল। তারপর অনেক রকম বিদঘুটে খসখস, ধুপধাপ শব্দ হতে থাকল। তারপর ন্যাড়া টের পেল, ওরা চলে গেল। বটতলায় তখন ঘন আঁধার আর নীরবতা। আর হিম।

একটু পরে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে ঘুড়ির মায়া ছেড়ে ন্যাড়া গাছ থেকে নেমে এসেছিল। তারপর এক দৌড়ে স্টেশন। স্টেশন থেকে সটান বাড়ি।

সে-রাতে ভালো ঘুম হয়নি তার। কিন্তু ঘটনাটা বাবা-মা কিংবা আর কাউকে বলেনি—পাছে ওঁরা ওকে গাছে ওঠার জন্য বকাবকি করেন। তাছাড়া এই বিদঘুটে ব্যাপারটা তাঁরা যে বিশ্বাস করবেন না, ন্যাড়া তা জানত। উলটে মিথ্যে বলার জন্য তাকে মার খেতে হবে বরং।

রহস্যময় কালো বাকসো

ন্যাড়া স্বভাবে যাকে বলে আপনভোলা ছেলে। খানিকটা খেয়ালিও বটে। তারপর কতদিন স্টেশনের ওপারে সেই মাঠে ঘুড়ি ওড়াতে বা বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল খেলতেও গেছে। কিন্তু বটতলার সেই রহস্যময় ঘটনার কথা নিয়ে আর গা করেনি। বন্ধুরাও হয়তো তাকে মিথ্যুক বলে বসবে।

তাছাড়া বটগাছটার এমন ভূতুড়ে চেহারা যে দিনদুপুরে ওখানে যেতেই বুক কাঁপে।

ঘুড়িটা কয়েকদিনের মধ্যেই বাতাসের চোটে ফাটাফুটি হয়ে শুধু কঙ্কালটুকু আটকে রয়েছে।

কিছুদিন পরে কলকাতা থেকে ন্যাড়ার ছোটমামা শংকরবাবু এলেন বেড়াতে। বড়দিনের ছুটি কাটাতে ফি বছর তিনি লিটনগঞ্জে দিদির বাড়িই আসেন। এ শহরটা ভারি ছিমছাম আর সুন্দর। একটা নদীও বয়ে গেছে পাশ দিয়ে। জলবায়ু মোটামুটি স্বাস্থ্যকর।

শংকরবাবু নানা দেশ ঘুরেছেন। চমৎকার গল্প করতে পারেন। ছোটমামা এলে ন্যাড়া তো আহ্লাদে আটখানা হয়। সব সময় ছায়ার মতো ওঁর সঙ্গে ঘোরে।

বিকেলে শংকরবাবু বেড়াতে বেরিয়েছেন, সঙ্গে শ্রীমান ন্যাড়া।

শংকরবাবু সম্প্রতি আফ্রিকার চাঁদ রাজ্যে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে একটা বিশাল হ্রদ আছে। তার ওপর আছে ভাসমান দ্বীপ। সেইসব দ্বীপে একটা করে বসতি রয়েছে। মজার কথা, দ্বীপগুলো সারাদিন হ্রদে একখান থেকে আরেকখানে ভেসে বেড়ায়। আর বসতিগুলো যেন জাহাজ। সেইসব গল্প বলছিলেন শংকরবাবু।

শেষে কথায়-কথায় বললেন—'তবে সব দেশের চেহারাই দিনে-দিনে বদলে যাচ্ছে। খালি তোদের লিটনগঞ্জ দেখছি, বরাবর একইরকম রয়ে গেল!'

ন্যাড়া বলল—'আচ্ছা ছোটমামা, সেবার কোথায় যেন গিয়েছিলে—সেই যে সুড়ঙ্গের মধ্যে লোকেরা বাস করে। বাইরে বেরুবার দরকার হয় না! সেটা কী দেশ ছোটমামা?'

'ও। সে তো দক্ষিণ মেরুতে। আন্টার্কটিকায়।' বলে শংকরবাবু একচোট হাসলেন। 'কিন্তু তাঁরা তো বিজ্ঞানী। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে গিয়ে আন্টার্কটিকায় বরফ খুঁড়ে পাতালনগরী বানিয়ে বাস করছেন। কতরকম পরীক্ষা করছেন। সে আসলে তাঁদের গবেষণাকেন্দ্র। বুঝলি?'

ন্যাড়া লাজুক হেসে বলল—'আমার বড্ড ভুলো মন, ছোটমামা। তুমি তাই বলেছিলে বটে। এই দ্যাখো না, সুড়ঙ্গ বলতেই মনে পড়ে গেল ....'

বলে হঠাৎ চুপ করে গেল সে। শংকরবাবু বললেন—'কী রে? থামলি যে?'

ন্যাড়া ওঁর একটা হাত চেপে ধরে বলল—'ছোটমামা, আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবে?'

শংকরবাবু অবাক হয়ে বললেন—'কোথায় রে?'

'আহা। এসো না! তোমাকে আমি সুড়ঙ্গ দেখাব।'

বলে ন্যাড়া শংকরবাবুকে টানতে টানতে নিয়ে চলল। শংকরবাবু জানেন, তাঁর এই ভাগনেবাবাজি বরাবর বড্ড খামখেয়ালি ছেলে। অদ্ভুত স্বভাবচরিত্র। মাঝে মাঝে যা সব করে, পাগলামি বলেই মনে হয়। তার ওপর বড্ড জেদিও বটে।

তাই চুপচাপ হাসিমুখে ওর সঙ্গে চললেন। চলা তো নয়, যেন গাড়িতে যাওয়া। ন্যাড়া তাঁকে প্রায় দৌড় করিয়ে নিয়ে চলেছে। স্টেশনে গিয়েও থামল না! ওভারব্রিজ পেরিয়ে একেবারে সেই পোড়ো মাঠে হাজির করল। সেখান থেকে জঙ্গলের মধ্যে বটতলায়।

বটতলায় ন্যাড়া হাত ছেড়ে দিয়ে কী যেন খুঁজছে দেখে শংকরবাবু বললেন—'ব্যাপারটা কী বলবি তো বাঁদর ছেলে। এতখানি পথ আমায় দৌড় করালি। বাপ্‌স। এবয়সে এত ধকল বরদাস্ত হয়? দম বেরিয়ে গেছে একেবারে।'

ন্যাড়া একবার ওপর দিকে বটগাছের ডালপালার দিকে তাকাল। তারপর নিচের দিকে তাকাল। দৌড়ে গিয়ে শুকনো পাতা সরাতে আরম্ভ করল।

শংকরবাবু বললেন—'ও কী রে! ও কী করছিস?'

ন্যাড়া ব্যস্তভাবে বলল—'সুড়ঙ্গের কথা বললুম না। সেই সুড়ঙ্গটা এখানেই আছে।'

'অ্যাঁ। বলিস কী!' বলে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন শংকরবাবু।

শুকনো পাতার তলায় মাটির চাঙড় সরাচ্ছিল ন্যাড়া। একটু পরেই সে চেঁচিয়ে উঠল—'ছোটমামা! ছোটমামা! কাম অন! পেয়ে গেছি।'

শংকরবাবু হেঁট হয়ে দেখলেন, একটা চৌকো পাথর রয়েছে এবং তার মধ্যিখানে একটা লোহার মজবুত আংটা। বললেন—'তাজ্জব ব্যাপার! এ কী রে ন্যাড়া!'

'সুড়ঙ্গের দরজা ছোটমামা।'

'তুই টের পেলি কীভাবে?'

'পরে বলব। আগে এটা ওঠাও না!'

দুজনে আংটা ধরে পাথরটা তুলে একপাশে রাখল। নিচে কবরের মতো একটা গর্ত দেখা গেল। এখনও দিনের আলো প্রচুর। শংকরবাবু গর্তে লাফ দিয়ে নামলেন। তারপর অস্ফুট কণ্ঠে বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন—'এ কী!'

ন্যাড়া হাঁটু গেড়ে গর্তের মাথার দিকে বসে রয়েছে। বলল—'সুড়ঙ্গের ভেতরে একটা কালো বাকসো দেখতে পাবে। ওর মধ্যে গুপ্তধন আছে।'

'বলিস কী!' বলে শংকরবাবু সুড়ঙ্গের দরজাটা টেনে খুললেন। ভেতরে ঘন অন্ধকার। পকেট থেকে সিগারেট-লাইটার বের করে জ্বাললেন। তারপর ভেতরে ঢুকে গেলেন। কয়েক পা এগিয়ে টের পেলেন, এটা একটা ছোট ঘর। মাটির নিচে পাথরের দেয়াল ও ওপরে ছাদ রয়েছে। আর ঘরের মধ্যিখানে একটা কালো পাথরের ছোট্ট কবর। কবরের গায়ে ফারসি ভাষায় লেখা একটা ফলক আছে। এটা সম্ভবত কোনো শিশুর কবর। শংকরবাবুর মনে পড়ল, কয়েকশো বছর আগে এখানে বাংলার তুর্কি সুলতানদের রাজধানী ছিল। এই মাটির তলায় গোপন কবর নিশ্চয় কোনা সুলতানবংশীয় শিশুর। পাছে শত্রুপক্ষ সুলতানবংশীয় শিশুর মৃতদেহের অসম্মান করে, তাই হয়তো গোপনে এভাবে ভূগর্ভে কবর দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু তার চেয়ে অবাক কাণ্ড, কবরের ওপর সত্যি একটা কালো বাকসো রয়েছে। বাকসোটা ছোট্ট। শংকরবাবু সেটা তুলে নিলেন। বিশেষ ভারী নয়।

ওপর থেকে ন্যাড়ার চাপা গলার আওয়াজ ভেসে এল—'শিগগির ছোটমামা! শিগগির! বাকসো নিয়ে চলে এসো। কারা যেন আসছে!'

শংকরবাবু বাকসোটা নিয়ে বেরিয়ে বললেন—'ন্যাড়া, ধর এটা। আমি দরজা এঁটে দিই।'

ন্যাড়া কালো বাকসোটা নিয়ে বলল—'মনে হচ্ছে, সেই লোকদুটো আসছে ছোটমামা! শিগগির!'

শংকরবাবু ঝটপট গর্ত থেকে উঠলেন। তারপর আংটা লাগানো পাথরটা আগের মতো চাপা দিয়ে তার ওপর মাটির চাঙড়গুলো বসিয়ে দিলেন। শুকনো পাতা ছড়ালেন। একেবারে আগের মতো স্বাভাবিক দেখাল জায়গাটা।

ন্যাড়া আঙুল তুলে ওপাশের মাঠে দুজন লোককে দেখিয়ে বলল—'ওরা আসছে। কেটে পড়া যাক ছোটমামা! ওদের কাছে বন্দুক আছে কিন্তু।'

লোকদুটো ওদের দেখতে পাচ্ছিল না। কারণ বটগাছটার ঝুরি আছে অজস্র। তা ছাড়া ওপাশে ঝোপঝাড়ও রয়েছে। শংকরবাবু বাকসোটা বগলদাবা করে বললেন—'চলে আয় ন্যাড়া।'

দুজনে উলটো দিকের জঙ্গলে ঢুকে গেলেন।

তারপর অনেকখানি জঙ্গলের আড়ালে এগিয়ে ঘুরপথে নদীর ব্রিজে পৌঁছোলেন। সেখান থেকে রেললাইন ডিঙিয়ে একেবারে সোজা বাড়ির পথে।...

শ্রীমান ন্যাড়ার অন্তর্ধান

কলকাতার ইলিয়ট রোডে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের ফ্ল্যাটটি 'বুড়ো ঘুঘুর বাসা' বলে পরিচিত। বুড়ো ঘুঘু বলতে কর্নেলকেই বোঝায়। ধুরন্ধর লোককেই ঘুঘু বলা হয়। তবে কদর্থে। কিন্তু কর্নেলের বেলায় এই ঘুঘু-নাম সদর্থে। এই বুড়োর মতো বিচক্ষণ ও ক্ষুরধার বুদ্ধির গোয়েন্দা কদাচিৎ দেখা যায়। লোকে বলে, তাঁর টাক পড়ার কারণ বুদ্ধির তেজে চুল উঠে গেছে। আর সেইসব চুলই নাকি সাদা দাড়ি হয়ে গজিয়েছে।

যাই হোক, সেদিন শীতের সকালে কর্নেল তাঁর ড্রইং রুমে বসে খুব মনোযোগ দিয়ে এক ভদ্রলোকের কথা শুনছিলেন।

এই ভদ্রলোক আর কেউ নন, শংকরবাবু। লিটনগঞ্জের শ্রীমান ন্যাড়ার সেই ছোটমামা।

কর্নেল চোখ বুজে শুনছিলেন। সেই অবস্থায় বললেন—'হুম। তারপর কী হল বলুন।'

শংকরবাবু বললেন—'বাকসোটা খোলার বহু চেষ্টা করেও খুলতে পারলুম না, বাকসোটা ইস্পাতের পাতে তৈরি মনে হল। তাই পরদিন ওটা গোপনে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা চলে এলুম। আমার এক বন্ধুর ছোট্ট মেশিনটুলসের কারখানা আছে। তার ওখানেই খোলার ব্যবস্থা করব ভেবেছিলুম। কিন্তু বন্ধুও হার মানলেন। বললেন, এটা কোনওভাবে খোলা সম্ভব নয়। বিদেশে একরকম ইলেকট্রনিক করাত আছে, তা দিয়ে কাটা যেতে পারে। শুনে তো ভারি দমে গেলুম। বাকসোটা ফেরত নিয়ে সবে বাড়ি ফিরেছি, দেখি লিটনগঞ্জ থেকে আমার জামাইবাবু অর্থাৎ শ্রীমান ন্যাড়ার বাবা অসীমবাবু হাজির। ব্যাপার কী? না—ন্যাড়ার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আমার কাছে আসেনি শুনে তো উনি ভেঙে পড়লেন। তখন ...

কর্নেল বাধা দিয়ে বললেন—'অসীমবাবু বাকসোর ব্যাপার জানেন?'

'না। কাকেও বলিনি। আমার বন্ধু জগন্ময়কেও বলিনি, কীভাবে কোথায় ওটা পাওয়া গেছে।'

'হুম। তারপর?'

'তারপর বুঝিয়ে-সুঝিয়ে জামাইবাবুকে তো লিটনগঞ্জ পাঠালুম। লালবাজার মিসিং স্কোয়াডে ন্যাড়ার ছবি দিয়ে নিখোঁজের খবরও দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে যা আঁচ করেছিলুম, তাই ঘটেছে। আমার কাছে কাল হঠাৎ একটা বেনামী চিঠি এসে হাজির। তাতে লেখা আছে : তোমার ভাগনেবাবাজি শ্রীমান ন্যাড়া আমাদের হাতে। যদি ওকে ফেরত চাও, তাহলে পত্রপাঠ আমাদের বাকসোটি এই ঠিকানায় রেখে এসো। মনে রেখো, দু-দিনের বেশি অপেক্ষা করতে রাজি নই।'...

'কোনও নাম নেই চিঠিতে?'

'আজ্ঞে না।'

'চিঠিটা সঙ্গে এনেছেন?'

'হ্যাঁ। এই যে।' শংকরবাবু একটা খাম বার করে এগিয়ে দিলেন।

কর্নেল চিঠিটা খুলে পড়ার পর বললেন—'হুম! বি টি রোডের ধারে জায়গাটা। একটা বাগানবাড়ি আছে ওখানে। পেছনে গঙ্গার ধারে সায়েবি আমলের কবরখানা। বাকসোটা ওখানে পৌঁছে দিতে হবে! আচ্ছা শংকরবাবু, বাকসোটা এখন কোথায় রেখেছেন?'

শংকরবাবু চাপা গলায় বললেন—'আমার বেডরুমে। তবে এমনভাবে রেখেছি, কেউ টের পাবে না।'

'কীভাবে, শুনি?'

'আমরা বনেদি পরিবার কলকাতার। আমার ঠাকুরদা স্বর্গত ঈশানচন্দ্র ঘোষের নাম শুনে থাকবেন। উনি প্রখ্যাত শিকারি ছিলেন। আমার বাবা বারীন্দ্রনাথ নামকরা শিকারি ছিলেন। তিনি কবছর আগে মারা গেছেন। আমাদের বাড়িটা পুরোনো আমলের। দেয়ালে অনেক জায়গায় গুপ্ত আলমারি রয়েছে। বাইরে থেকে এতটুকু ধরা যাবে না। আমার বেডরুমে একপাশের দেয়ালে ওইরকম একটা গুপ্ত আলমারি আছে। তার মধ্যে রেখেছি বাকসোটা।'

কর্নেল চিঠিটা মুড়ে খামে ঢুকিয়ে বললেন—'এটা আমার কাছে রইল। আপত্তি নেই তো?'

শংকরবাবু ব্যস্তভাবে বললেন—'মোটেও না, মোটেও না। এমনকি, বাকসোটাও আপনার জিম্মায় রাখবার কথা ভেবেছি, কর্নেল! এতকাল ধরে আপনার কত সব কীর্তির কথা কাগজে পড়েছি। মনে মনে কতবার ভেবেছি, আপনার সঙ্গে আলাপ করে আসব। সময় হয় না। বিশেষ করে শুনেছি, একসময় আপনারও আমার মতো দেশ-বিদেশে অ্যাডভেঞ্চারের নেশা ছিল!'

'এখনও আছে।' বলে কর্নেল হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালেন। 'যাকগে চলুন শংকরবাবু, আগে সেই বাকসোটা দেখে আসি। তারপর শ্রীমান ন্যাড়ার উদ্ধারের কথা ভাবা যাবে।'

একটু পরে শংকরবাবুর নীল রঙের মোটরগাড়িটি ছুটে চলল উত্তর কলকাতার দিকে। শ্যামবাজার ছাড়িয়ে গিয়ে বি টি রোডে পৌঁছে শংকরবাবু বললেন—'এটাই আশ্চর্য লাগছে। যেখানে ওরা বাকসোটা ফেরত দিতে বলেছে, সে জায়গাটা আমাদের বাড়ি থেকে সামান্য দূরে।'

কর্নেল চোখ বুজে কী ভাবছিলেন। শুধু বললেন—'হুম!'

ডানলপ ব্রিজ ছাড়িয়ে আরও দু-কিলোমিটার এগিয়ে বাঁদিকে একটা ছোট রাস্তায় গাড়ি মোড় নিল। তারপর সামনে একটা গেট দেখা গেল। ওটা শংকরবাবুর পৈতৃক বাড়ি, 'অমর নিকেতন।'

গঙ্গার ধারে বিশাল এলাকা জুড়ে এই বাড়ি। বাগান রয়েছে। ফুল বাগিচা আছে। আগের আমলে বনেদি বড়লোকের বাড়ি যেমন ছিল তেমনি। গাড়ি গেটের সামনে দাঁড়াল।

রহস্য আরও ঘনীভূত

শংকরবাবুর বেডরুম দোতলার পুব-দক্ষিণ কোণে। অবিবাহিত মানুষ। বাড়িতে লোক বলতে উনি, ওঁর দূর সম্পর্কের এক পিসিমা যোগমায়াদেবী, আর রাঁধুনি সিধু ঠাকুর, বাজার সরকার মদনবাবু, চাকর হারাধন। হারাধন বুড়ো হয়ে গেছে। শংকরবাবুকে একরকম কোলেপিঠে করে সেই মানুষ করেছে। বাইরের কেউ দেখলে বুঝতেই পারবে না ওঁদের মধ্যে মনিব-চাকর সম্পর্ক।

কর্নেল ঘরের ভেতরটায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন—'আপনিও কি শিকারি?'

শংকরবাবু হেসে জবাব দিলেন—'হ্যাঁ। ওটা তিন-পুরুষের নেশা বলতে পারেন। তবে আজকাল তো দেশ থেকে বনজঙ্গল প্রায় উজাড়! জন্তুজানোয়ারও বিশেষ নেই-টেই। যা কিছু আছে, তা সরকারি অভয়ারণ্যে বাস করছে। কাজেই আজকাল শিকারে যাওয়া হয় না।'

কর্নেল বললেন—'যাক্ গে। এবার সেই বাকসোটা বের করুন।'

শংকরবাবু ঘরের দরজা-জানলাগুলো বন্ধ করে দিলেন আগে। তারপর সুইচ টিপে বাতি জ্বাললেন। একপাশের দেয়ালে লম্বা-চওড়া একটা ছবি টাঙানো আছে। বিলিতি চিত্রকরের আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি। ছবিটা একটু ঠেলে একটা খুদে বোতাম টিপলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালের প্রায় দু-ফুট লম্বা এক ফুট চওড়া একটা অংশ ছোট্ট কপাটের পাল্লার মতো খুলে গেল। তখন ভেতরে হাত ভরে কালো একটা বাকসো বের করে আনলেন।

ফের বোতাম টিপে দেওয়ালের গুপ্ত খোঁদলটা আগের মতো ছবিচাপা দিলেন। বাকসোটা টেবিলে এনে রাখতেই কর্নেল ঝুঁকে পড়লেন সেটার দিকে। বললেন—'এই সেই বাকসো?'

'হ্যাঁ কর্নেল। এই সেই আজগুবি বাকসো।'

কর্নেল টেবিলল্যাম্পের সুইচ টিপে বাকসোটা দেখতে দেখতে তাঁর মুখে প্রচণ্ড বিস্ময় ফুটে উঠল। অস্ফুট স্বরে বলে উঠলেন—'আশ্চর্য! আশ্চর্য!'

শংকরবাবু বললেন—'কী আশ্চর্য কর্নেল?'

'শংকরবাবু, মনে হচ্ছে এটা একটা ঐতিহাসিক বাকসো। এর গায়ে খুব ছোট হরফে ফারসিভাষায় কী সব লেখা আছে। আমি ফারসিভাষাটা মোটামুটি জানি। একসময়ে ইরানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিদ্রোহী একদল কুর্দ উপজাতির হাতে বন্দি হয়েছিলাম। কুর্দদের মাতৃভাষা ফারসির অপভ্রংশ কুর্দিস্তানি। কিন্তু তারা ফারসিও ভালো জানে। যাই হোক, পরে ব্রিটিশ সেনারা আমাকে উদ্ধার করেছিল। কিন্তু মাঝখান থেকে কুর্দিস্তানি আর ইরানি অর্থাৎ ফারসি আমার শেখা হয়ে যায়। প্রসঙ্গত বলছি শংকরবাবু, সংস্কৃত ও ফারসি কিন্তু আর্যজাতির ভাষার গোষ্ঠীতে যমজ ভাই-বোন বলতে পারেন। এ দু-ভাষায় বিস্তর শব্দ একরকম। তাদের মানেও এক।'

কর্নেলের এই বকবক করা বদ অভ্যাস। শংকরবাবু শুনেছিলেন, এ বুড়ো না জানে এমন কোনো বিষয় নেই। যাই হোক, শংকরবাবু উৎসাহ দেখিয়ে বললেন—'তাহলে ওতে কী লেখা আছে, বলুন তো কর্নেল?'

কর্নেল আতস কাচের সাহায্যে বাকসের লেখাগুলো পড়তে পড়তে বললেন—'আমি অনুবাদ করে যাচ্ছি বাংলায়। আপনি লিখে নিন।'

শংকরবাবু একটা প্যাডে লিখতে শুরু করলেন।

"১০০০ হিজরি সনে পরম প্রতাপশালী জায়গিরদার মইনুদ্দিন শাহ আল-তামাসের একমাত্র পুত্র আজিমুদ্দিন করুণাময় ঈশ্বরের আহ্বানে মাত্র দ্বাদশ বর্ষ বয়সে স্বর্গধামে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার শোকগ্রস্ত বৃদ্ধ পিতা মিশর হইতে এক সাধকের আশীর্বাদস্বরূপ যে অগণিত রত্ন পাইয়াছিলেন, তাহা এই কৃষ্ণবর্ণ ধাতুনির্মিত পেটিকায় রাখিয়া স্বর্গীয় বালকের সমাধিতে স্থাপন করিলেন।

"কিন্তু এই পেটিকা এক মহাতপস্বী অলৌকিক শক্তিধর ফকিরের মন্ত্রপূত। যে ইহা হরণ করিবে, তাহারই সর্বনাশ ঘটিবে। অতএব হে ঘৃণ্য তস্করবৃন্দ! হুঁশিয়ার। ইহা স্পর্শ করিও না।...

"সুকৌশলে নির্মিত এই পেটিকা এমন এক ধাতুতে নির্মিত যে ইহা কোনোভাবেই খোলা যাইবে না। ইহা ভাঙাও অসম্ভব। অতএব, হে লোভী মানুষ! বৃথা সে-চেষ্টা করিও না।...

"এই পেটিকার একস্থলে প্রায় অদৃশ্যে ছুঁচের ন্যায় একটি ছিদ্র আছে। সেই ছিদ্রপথে ইহার চাবি প্রবেশ করাইলে তবেই ইহা খোলা সম্ভব। চাবিটি স্বর্গীয় বালকের কেশের মধ্যে লুকোনো রহিল।

"কিন্তু হুঁশিয়ার! পুণ্যাত্মা বালকের মৃতদেহ স্পর্শ করিও না। ফকিরের অভিশাপ হইতে রক্ষা পাইবে না।"..

লেখা শেষ করে শংকরবাবু কর্নেলের মুখের দিকে তাকালেন। কর্নেল তখনও বাকসের দিকে তাকিয়ে আছেন। শংকরবাবু বললেন—'১০০০ হিজরি সন কত খ্রিস্টাব্দ কর্নেল?'

কর্নেল আনমনে জবাব দিলেন—'১৫৮০ খ্রিস্টাব্দ। বাংলায় তখন তুর্কি সুলতানের রাজত্ব।'

'কিন্তু লিটনগঞ্জের ওই পোড়ো মাঠে জঙ্গলের মধ্যে মাটির তলায় কবরের হদিস পেল কে? কীভাবে পেল?'

'হুম! সেটাই ভাববার কথা। শুধু তাই নয়, আজিমুদ্দিনের কবরে যে এমন গুপ্তধন আছে, তার খবরই বা সে কেমন করে জোগাড় করল?'

'ন্যাড়া বলছিল, একা নয়—দুজন ছিল।'

'হুম' বলে কর্নেল কী যেন ভাবতে থাকলেন। তারপর হঠাৎ নড়ে উঠলেন। বললেন—'আচ্ছা শংকরবাবু, লিটনগঞ্জ তো আপনার চেনা জায়গা। ওখানে কি কোনও ঐতিহাসিক সংগ্রহশালা আছে?'

শংকরবাবু ব্যস্তভাবে বললেন—'আছে, আছে। তবে সেটা তো বেসরকারি সংগ্রহশালা। কমলাক্ষ বাঁড়ুয্যে নামে এক ভদ্রলোকের বেজায় ঐতিহাসিক বাতিক আছে। বলতে গেলে সংগ্রহশালাটা ওঁর চেষ্টাতেই হয়েছে। এলাকা খুঁজে নানারকম প্রাচীন মূর্তি, দলিল-দস্তাবেজ জোগাড় করেন উনি।'

কর্নেল বললেন—'হুম! চলুন, আজই আমরা লিটনগঞ্জ রওনা দিই। কমলাক্ষবাবুর সঙ্গে আলাপ করা খুব দরকার।'

শংকরবাবু অবাক হয়ে বললেন—'কিন্তু ন্যাড়ার উদ্ধারের কী হবে? ওরা যে আজ আর আগামীকাল পর্যন্ত সময় দিয়েছে।'

কর্নেল একটু হেসে বললেন—'ভাববেন না। ওদের একমাত্র উদ্দেশ্য বাকসো পাওয়া। ন্যাড়াবাবাজিকে মেরে ফেলাটা তো উদ্দেশ্য নয়। ওরা ভালোই জানে, ছেলেটাকে মেরে ফেললে আপনারা বাকসোটা সোজা পুলিশের হাতে দেবেন। আমি অপরাধীদের চরিত্র নিয়ে বহুকাল ঘাঁটাঘাঁটি করছি, শংকরবাবু। ওরা যদি নিছক টাকা দাবি করত, তাহলে ভাবনার কথা ছিল। আসল কথা, ওরা চায় বাকসোটা। কাজেই নিশ্চিন্ত থাকুন। তাছাড়া আগামীকাল বিকেলের মধ্যে আমরা ফিরে আসছি।'

কথা বলতে বলতে কর্নেল এগিয়ে পশ্চিমের একটা জানলা একটু খুলে উঁকি দিলেন। তারপর চোখে বাইনোকুলার রেখে বললেন—'হুম! ওরা আপনার বাড়ির দিকে নজর রেখেছে।'

'সে কী!' বলে শংকরবাবু কাছে গেলেন। কর্নেল তাঁকে বাইনোকুলারটা দিলে তাতে চোখ রেখে শংকরবাবু বললেন—'গঙ্গার ঘাটে যে লোকটা ছিপ ফেলে বসে আছে, সেই কি?'

'ঠিক ধরেছেন!' কর্নেল সরে এলেন। তারপর বললেন—'বাকসোটা যথাস্থানে লুকিয়ে ফেলুন। তারপর চলুন, এখনই বেরিয়ে পড়া যাক!'

বাকসোটা আগের জায়গায় রেখে ছবিটা ঠিকঠাক করে আলো নিভিয়ে শংকরবাবু জানালাগুলো খুলে দিলেন। পশ্চিমে একবার উঁকি মেরে বললেন— 'ছিপ নিয়ে লোকটা চলে যাচ্ছে, কর্নেল।'

'যাক গে। আপনি রেডি হয়ে নিন শিগগির। আর হ্যাঁ, অনুবাদের কাগজটা আমাকে দিন। ওটা পুড়িয়ে ফেলা দরকার।'

শংকরবাবু বেরিয়ে গেলেন কাগজটা দিয়ে। হারাধনকে খাওয়ার আয়োজন করতে বলবেন। এদিকে কর্নেল কাগজটা পুড়িয়ে ছাইদানিতে গুঁজে দিলেন।

একটু পরে হারাধন ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল। শংকরবাবু এসে বললেন— 'পৌঁছোতে দুপুর গড়িয়ে যাবে। কাজেই পেটপুরে খেয়ে নিন কর্নেল!'

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন—'আমি তত ভোজনবিলাসী নই। আপনার হারাধন দেখছি দশজন পালোয়ানের খাবার এনেছে!'

হারাধন একগাল হেসে বলল—'তা আজ্ঞে, আপনার যা পালোয়ানি চেহারা, ওটুকুন আপনার এক গেরাস মাত্তর।'

কর্নেল দাড়িতে হাত বুলিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন ...

কমলাক্ষের শয়তানি

ন্যাড়া মোটামুটি বুদ্ধিমান ছেলে। কিন্তু সে ভারি সরল। সেটাই তার বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরদিন সকালে ছোটমামু শংকরবাবু বাকসোটা নিয়ে কলকাতা চলে গিয়েছিলেন। ন্যাড়া স্টেশনে তাঁকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসছে, পথে কমলাক্ষবাবুর সঙ্গে দেখা। উনি হন হন করে আসছিলেন। পাড়াসম্পর্কে কাকা বলে ন্যাড়া। তাই বলেছিল—'ও কাকু। ট্রেন যে এইমাত্তর ছেড়ে গেল।'

কমলাক্ষ থমকে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—'যাঃ! তাহলে আর কী হবে? ওবেলা যাব'খন। আয় বাবা নেড়ু তোর সঙ্গে গল্প করতে করতে যাই।'

সেই সময় হঠাৎ ন্যাড়ার মনে চমক খেলেছিল। সেদিন সন্ধ্যায় যে দুটো লোক মাটির তলার ওই কবর খুঁড়তে গিয়েছিল তাদের একজনের গলার স্বর অবিকল কমলাক্ষের মতো না? ন্যাড়া বলেছিল—'হ্যাঁ কাকু, তোমার জাদুঘরে যেসব জিনিস রেখেছ, সেসব কোথায় পেয়েছ গো?'

কমলাক্ষ বলেছিলেন—'ওসব খুঁজে বের করতে হয় রে। অনেক মেহনতের কাজ। ধর্, অনেক সময় মাটির তলাতেও পাওয়া যায়।'

ন্যাড়া বলে উঠেছিল—'ও কাকু, তাহলে সেদিন সন্ধেবেলা স্টেশনের ওপারে বটতলায়...'

অমনি কমলাক্ষ তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলেছিলেন—'চুপ, চুপ। কাকেও বলিস নে। তা হ্যাঁ রে, তুই কীভাবে জানলি?'

ন্যাড়া ফিক করে হেসে বলেছিল—'বা রে! তখন আমি গাছের ডালে আটকানো ঘুড়ি পাড়ছিলুম না? তোমাদের কাছে বন্দুক ছিল। তাছাড়া চিনতেও পারিনি। তাই সাড়া দিইনি।'

'সর্বনাশ!' কমলাক্ষ বলেছিলেন। 'তা এখন চিনলি কী করে?'

'তোমার গলার স্বরে।'

'তুই ভারি বুদ্ধিমান ছেলে, নেড়ু। তা হ্যাঁ রে, কাকেও বলেছিলি নাকি কথাটা?'

'হুঁউ। ছোটমামাকে।'

'তারপর, তারপর?'

সরলমনা খামখেয়ালি ছেলে ন্যাড়া ছোটমামার নিষেধ ভুলে সব কথা বলে ফেলল।

কিন্তু ধূর্ত কমলাক্ষের এটা নিতান্ত ছল। আগের দিন সন্ধেবেলা জঙ্গলে বাকসো নিয়ে পালানোর সময় আবছা একপলক তিনি দেখেছিলেন, দুটো লোক জঙ্গলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে এবং তাদের একজন বয়সে বাচ্চা। কিন্তু সে যে ন্যাড়া হতে পারে, ভাবেননি তখন। পরে, ওই মাঠে যেসব ছেলে খেলা করতে যায়, তাদের প্রত্যেকের কাছে খোঁজ নিয়েছিলেন, একটা বয়স্ক লোক আর একটা কমবয়সি ছেলেকে কাল সন্ধ্যার আগে ওখানে কেউ দেখেছিল নাকি। হরিহর উকিলের ছেলে সতু বলেছিল, ন্যাড়া হতে পারে। ন্যাড়ার ঘুড়ি প্রায় আটকে যায় বটগাছটায়। আর হ্যাঁ, কাল তার সঙ্গে কে একজন অচেনা লোকও ছিল।

কমলাক্ষের সঙ্গীর নাম মাধব। লিটনগঞ্জে লোকে তাকে বলে মেধোগুন্ডা। কমলাক্ষ তাঁর সংগ্রহশালা বা জাদুঘরের অছিলায় প্রাচীনকালের ঐতিহাসিক বা পুরাতাত্ত্বিক মূর্তি সংগ্রহ করেন এবং মাধবের সাহায্যে তা বিদেশে বিক্রি করেন। আজকাল ওসব পুরনো মূর্তি বা জিনিসের চোরাচালানি কারবার চলছে দেশ বিদেশে। কাজটা বেআইনি। হংকং শহরে এক ব্যবসায়ী এই কারবার করে। তার এজেন্ট আছে কলকাতায়। মাধবের সঙ্গে সেই এজেন্টের যোগাযোগ আছে। এভাবে কমলাক্ষ কত প্রত্নদ্রব্য যে মাধবের সাহায্যে পাচার করেছেন, ইয়ত্তা নেই। কমলাক্ষ ও মাধব সেই টাকা আধাআধি ভাগ করে নেন। পুলিশ টের পায় না। কারণ ওই সংগ্রহশালা! সারা দেশের পণ্ডিতরা কমলাক্ষের ব্যক্তিগত চেষ্টায় গড়ে তোলা জাদুঘরের কত প্রশংসা করেন। মন্ত্রীরাও কতবার দেখে যান। কিন্তু তাঁর জাদুঘরে নেহাত মামুলি কিছু পুরোনো দলিলপত্তর, কিছু

পোড়ামাটির মূর্তি বা মুদ্রা ছাড়া তত দামি কিছু নেই। যা দামি, তা তো পাচার হয়ে যায়। আসলে কমলাক্ষের চোরাচালানি কারবারের একটা অজুহাত হল ওই জাদুঘর।

যাই হোক, কমলাক্ষ ও মাধব আগের দিন সন্ধ্যায় মাটির তলার কবরে কালো বাকসোটা আর দেখতে পাননি। এখন ন্যাড়ার মুখে সব জেনে তিনি তো মনে মনে রেগে আগুন। কিন্তু সেটা প্রকাশ করলেন না।

ন্যাড়া বলেছিল—'হ্যাঁ কাকু, কালো বাকসোটা তোমরা ওখানে লুকিয়ে রেখেছিলে কেন গো?'

কমলাক্ষ চেপে গেলেন। আসলে ব্যাপারটা হয়েছিল এই : লিটনগঞ্জে পিরের দরবারে ফকিরের কাছে কিছু টাকার বিনিময়ে এমন ঘটনার আভাস পেয়েছিলেন কমলাক্ষ। সেই সূত্র ধরে আজিমুদ্দিনের কবর খুঁজে বের করেছিলেন। বাকসোটাও পেয়েছিলেন, কিন্তু বাকসোটা কিছুতেই খুলতে বা ভাঙতে পারেননি। মাধবও অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল। শেষে দুজনে ঠিক করেছিলেন, আপাতত যেখানে বাকসোটা ছিল সেখানে থাক। ইতিমধ্যে বিদেশি কোনও ধাতুবিদ্যা বিশারদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাক। তারপর একদিন বাকসোটা তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া যাবে।

কিন্তু হঠাৎ ন্যাড়ার ছোটমামার পাল্লায় পড়ে সেটা বেহাত হয়ে গেল।

সেদিন ন্যাড়া তাদের বাড়ি ঢুকলে কমলাক্ষ গেলেন মাধবের কাছে। মাধব সব শুনে খেপে গেল। সে বলল—'এক কাজ করা যাক্ কমলদা। ওই ক্ষুদে বজ্জাতটাকে আমরা চুরি করে লুকিয়ে রাখি। তারপর বেনামী চিঠি দিই হারামজাদা শংকরচন্দ্রটাকে।'

বাধা দিয়ে কমলাক্ষ বলেছিলেন—'উঁহু ন্যাড়ার বাবাকেই উড়ো চিঠি দিতে হবে। ছেলের জন্য মমতা বাবারই বেশি হবে। বুঝলে না?'

এরপর দুজনে চক্রান্ত করে ন্যাড়াকে চুরির ফিকিরে বেরিয়েছিল।

আপনভোলা ছেলে ন্যাড়া সন্ধ্যার আগে ঘুড়ি উড়িয়ে ফিরে আসছে, তার সামনে একটা জিপগাড়ি দাঁড়াল। মাধবের চোখে কালো চশমা। শীতের সময় বলে টুপিতে মুখের ও মাথার অনেকটা ঢাকা। সে ড্রাইভ করছিল। কমলাক্ষ ডাকলেন—'নেড়ু! বাড়ি চললি বুঝি? আয়, জিপে করে পৌঁছে দিই।'

ন্যাড়া জিপে উঠতেই কমলাক্ষ তার নাকের সামনে রুমাল চেপে ধরল। উগ্র কী এক ঝাঁঝালো গন্ধ টের পেল ন্যাড়া। তারপর তার আর কিছু মনে নেই।

যখন তার জ্ঞান ফিরল, সে দেখল একটা অচেনা ঘরে শুয়ে আছে। পাশে বসে আছেন কমলাক্ষ। মুখে অমায়িক হাসি।

ন্যাড়া ওঠার চেষ্টা করতেই বললেন—'উঁহু, উঠো না! উঠো না!'

ন্যাড়া বলল—'কেন? আমার কী হয়েছে?'

'অ্যাকসিডেন্ট!' কমলাক্ষ বললেন। 'তোমাকে জিপে করে বাড়ি পৌঁছে দিতে যাচ্ছিলুম, মনে পড়ছে?'

ন্যাড়া বলল—'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'পথে আমাদের জিপ উলটে যায়। ভাগ্যিস, আমি ছিটকে পড়েছিলুম। বেঁচে গেছি। তুমিও বেঁচে গেছ। তবে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে!'

'আমি তো ভালো আছি। আমার কিছু হয়নি!'

'হয়েছে। চুপ করে শুয়ে থাকো।'

ন্যাড়া উঠে বসে বলল—'না। আমি বাড়ি যাব।'

অমনি কমলাক্ষ আচমকা একটা ছুরি বের করে বললেন—'চুপ্! টুঁ শব্দ করলে মুণ্ডু কেটে ফেলব। চুপ করে শুয়ে থাকো।'

কমলাক্ষের হিংস্র চেহারা দেখে ন্যাড়া ভয়ে অবশ হয়ে গেল। এই সময় মাধব ঘরে ঢুকে বলল—'কথা না শুনলে ওর হাত-পা বেঁধে রাখতে হবে কমলদা।'

কমলাক্ষ নিষ্ঠুর হেসে বললেন—'দরকার হবে না। নেড়ু বড় ভালো ছেলে। আর নড়াচড়া করলে ওকে শ্রীমান ডালকুত্তার জিম্মায় রেখে দেব। কই হে মাধব, তোমার প্রিয় ডালকুত্তা জনকে একবার নিয়ে এস।'

ন্যাড়া আতঙ্কে তাকিয়ে দেখল, মাধব কোনার দিক থেকে একটা ভয়ংকর চেহারার ডালকুত্তাকে এনে তার বিছানার খাটের একটা পায়ার সঙ্গে বেঁধে রাখল। ডালকুত্তাটা কুৎসিত জিভ বের করে কুতকুতে হিংস্র চোখে ন্যাড়ার দিকে তাকিয়ে রইল।

মাধব বলল—'একটু নড়তে চেষ্টা করলে জন তোমার গলায় দাঁত বসাবে। সাবধান।'

কমলাক্ষ বললেন—'ঠিক আছে। এবার আমরা নিজের কাজে বেরিয়ে পড়ি, চলো মাধব!'

দুজনে বেরিয়ে গেল। বাইরে দরজায় তালা আটকানোর শব্দ শুনল ন্যাড়া। সে নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে রইল। পায়ের দিকে রাক্ষুসে প্রাণীটা নিষ্পলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। যেন একটু নড়লেই গর্জন করে টুঁটি কামড়ে ধরবে।

কমলাক্ষকাকু যে এমন শয়তান, ন্যাড়া কোনওদিন কল্পনাও করেনি।...

ফকিরের বুজরুকি

লিটনগঞ্জে পৌঁছে কর্নেল কিন্তু শংকরবাবুর সঙ্গে ন্যাড়াদের বাড়ি গেলেন না। বললেন—'এখানকার পুলিশ সুপার অজিতেশ আমার পরিচিত। আমি ওঁর সাহায্যে সরকারি ডাকবাংলোতেই থাকার জায়গা করে নেব। আপনি ভাববেন না শংকরবাবু।'

সরকারি আপিস এলাকায় পুলিশ সুপারের বাংলো। শংকরবাবুর গাড়ি তার গেটে দাঁড়াল। কর্নেল গেট খুলে ভেতরে গেলেন।

একটু পরে শংকরবাবু দেখলেন, পুলিশ সুপার আর কর্নেল কথা বলতে বলতে আসছেন গেটের দিকে।

কর্নেল পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই পুলিশ সুপার অজিতেশ বলে উঠলেন—'আরে তুমি শংকর না?'

শংকরবাবুও লাফিয়ে উঠলেন—'অজু! তুমি! কী আশ্চর্য! তুমি যে আমার জামাইবাবুর এলাকায় পুলিশের বড়কর্তা সেজে বসে আছ, স্বপ্নেও ভাবিনি! তুমি সেই বালুরঘাটে না কোথায় ছিলে না। এখানে বদলি হলে কবে?'

অজিতেশ বললেন—'সবে দু সপ্তাহ। যাক্ গে চলে এস। এ বেলা আর জামাইবাবুর বাড়ি গিয়ে কাজ নেই। কী বলেন কর্নেল?'

কর্নেল এতক্ষণ হাঁ করে চেয়েছিলেন। এবার বললেন—'ডার্লিং অজিতেশ। শংকরবাবু—থুড়ি, শ্রীমান শংকর নিশ্চয় তোমার সহপাঠী ছিল ছাত্রজীবনে?'

অজিতেশ বললেন—'হ্যাঁ কর্নেল। আমরা দুজনে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তুম।'

'যাক্ গে। তাহলে শংকরকে তুমি বললে, দোষ হবে না।' কর্নেল সকৌতুকে বললেন। তারপর অভ্যাসবশে দাড়িতে ও টাকে একবার করে হাত বুলিয়ে নিলেন।

গাড়ি বাংলোর গেটের পাশে রেখে তিনজনে সুরকি-বিছানো লন পেরিয়ে বাংলোর বারান্দায় উঠলেন। সেখানে বসে কর্নেল ও শংকর মোটামুটি ঘটনাটা পুলিশ সুপার অজিতেশের কাছে বর্ণনা করলেন।

সবটা শুনে অজিতেশ বললেন—'আমার ধারণা, শংকরের ভাগনেকে চুরি করে ওরা কলকাতাতেই কোথাও রেখেছে। কাজেই ওকে উদ্ধার করার ব্যাপারে সেখানকার পুলিশ দফতরেই যোগাযোগ করা দরকার। আর কর্নেল সাহেব তো এ ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত। লালবাজারের পুলিশকর্তাদের সঙ্গে ওঁর প্রচণ্ড খাতির। তাছাড়া ওঁর নিজের ক্ষমতা ও বুদ্ধিও সামান্য নয়। তবে স্টেশনের ওপারে পোড়ো মাঠের জঙ্গলে মাটির তলায় যে কবরের কথা শুনলাম, তা পাহারার দায়িত্ব আমার রইল।

'একদল সাদা পোশাকের সশস্ত্র পুলিশ ওখানে আনাচে-কানাচে চব্বিশঘণ্টা ওত পেতে থাকবে। কাকেও বটতলায় গিয়ে কিছু করতে দেখলেই পাকড়াও করবে।'

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন—'কিন্তু আমি আর শংকর যে ওখানে গিয়ে হানা দিতে চাই। আমাদের ওপর তোমার লোকেরা, হামলা করলেই তো মুশকিল।'

অজিতেশ বললেন—'সে ব্যবস্থা করে রাখব। কর্নেল, আপনার চেহারা তো একেবারে সাহেবের মতো। আর শংকর আপনার সঙ্গে থাকবে। আমার লোকেদের সেটা বলে রাখব। কর্নেলকে চিনতে তাদের ভুল হবে না। তার উপর মাথায় টাক, মুখে দাড়ি।'

আবার তিনজনে হেসে উঠলেন। ততক্ষণে ট্রে ভর্তি খাবার ও কফি এল। দুপুরে খাওয়া পথেই সেরে নিয়েছিলেন। কথা বলতে-বলতে বিকেল হয়েছে। শীতও বেড়েছে। কফি খেয়ে চাঙ্গা হবার পর শংকর বিদায় নিলেন। উনি জামাইবাবুর বাড়ি থাকবেন। ইতিমধ্যে ফোন করে অজিতেশ কর্নেলের জন্য নদীর ধারে সুদৃশ্য বাংলোর ব্যবস্থা করে ফেললেন।

কিছুক্ষণ পরে অজিতেশ তাঁর জিপে করে কর্নেলকে সেই বাংলোয় পৌঁছে দিয়ে এলেন।

বাংলোয় দুটো ঘর। পাশের ঘরে এক সরকারি অফিসার এসেছেন। কর্নেলের ঘরটা দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। নিচে নদী। নদীর ওপারে ঘন বাঁশবনে ঢাকা একটা গ্রাম। রেললাইনটা বাংলোর পূর্বে। পুবের বারান্দায় দাঁড়ালে স্টেশনের ওধারে সেই পোড়ো মাঠের শেষে জঙ্গল ও বটগাছটা দেখা যায়।

শীতের দিন শিগগির ফুরিয়ে এল। কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রেখে সেই দূরের বটগাছটা দেখছিলেন। কুয়াশা ও আঁধারে সেটা ঢাকা পড়লে বাইনোকুলার রেখে এলেন ঘরে। শংকরের এখনই এসে পড়ার কথা।

আনমনে লনে পায়চারি করতে করতে গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন কর্নেল। মাথায় টুপি, পরনে ওভারকোট এবং হাতে ছড়ি নিয়েছেন। লিটনগঞ্জে শীতটা বড্ড বেশি পড়েছে এবার।

শংকর আসতে দেরি করছেন কেন? কর্নেল উদ্‌বিগ্ন হয়ে ঘড়ি দেখলেন। সওয়া ছটা বেজে গেল। ছটায় আসার কথা।

গেট খুলে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালেন। সেই সময় একটু তফাতে কে চিৎকার উঠল—'ইয়া পির মুশকিল আসান। যাঁহা মুশকিল তাঁহা আসান।' তারপরই এক ঝলক আলো জ্বলে উঠল।

কর্নেল চমকে উঠেছিলেন। পকেটে টর্চ আছে। কিন্তু জ্বাললেন না। দ্রুত আলো লক্ষ করে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু আলোটা রাস্তার ধারে জ্বলছে না। রাস্তার পাশে ঘন ঝোপঝাড়। তার ভেতর দেখা যাচ্ছে। তখন পায়ের কাছে টর্চের আলো ফেলে সাবধানে এগিয়ে গেলেন।

যেখানে আলোটা জ্বলছে, সেখানটা একটা পিরের মাজার বলেই মনে হল। উঁচু চৌকানো পাথরে বাঁধানো বেদির মতো একটা চত্বর রয়েছে। তার পাশে একটা প্রকাণ্ড কাঠমল্লিকা গাছ। গাছের তলায় আগুনের কুণ্ড জ্বেলে বসে আছে এক ফকির।

ফকিরের পরনে কালো আলখেল্লা। গলায় অজস্র পাথরের মালা। মাথায় কালো পাগড়ি। তার কোলে একটা প্রকাণ্ড লোহার চিমটে রয়েছে। ফকির চোখ বুজে বসে বিড়বিড় করে কী মন্তর আওড়াচ্ছে আর আগুনে ধুনো ছড়াচ্ছে। তখন আগুনটা হু হু করে জ্বলে উঠছে।

কর্নেল গিয়ে সামনে দাঁড়ালে ফকির চোখ খুলল। তারপর নিষ্পলক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তখন কর্নেল বললেন—'সেলাম ফকিরসায়েব।'

ফকির এবার মৃদু হেসে সামনে বসতে ইশারা করল।

কর্নেল বললেন—'ফকিরসায়েব কি এই পিরের মাজারের (সমাধির) সেবক?'

ফকির জবাব দিল, 'হ্যাঁ বেটা। লেকিন তুম কাঁহাসে আয়া? চেহারা দেখে মালুম হচ্ছে কি, তুমলোক আংরেজ সাহাব আছ। লেকিন বাংলায় বাত ভি বলছ। তাজ্জব।'

'আমি ইংরেজ পুরো নই, ফকিরসাহেব। অর্থেক ইংরেজ, অর্ধেক বাঙালি।'

'তাজ্জব! ক্যায়সে?'

'আমার বাবা বাঙালি ছিলেন। মা ইংরেজ ছিলেন।'

ফকির হেসে উঠল। 'তব্ বেটা, তুম অ্যাংলো-ইন্ডিয়েন আছে, তো ঠিক হ্যায়! বোলো, ক্যা মাংতা মেরা পাস? হামার কাছে কী চাও?'

কর্নেল পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে ফকিরের পায়ের কাছে রাখলেন। ফকির অমনি খপ করে সেটা তুলে নিয়ে আলখাল্লার ভেতর ঢুকিয়ে ফেলল। তার চোখে লোভের আনন্দ চকচক করছিল। ফিসফিস করে বলল—'বোলো বেটা, ক্যা মাংতা তুম?'

কর্নেল একটু ভেবে নিয়ে বললেন—'ফকিরসায়েব, আপনি তো সিদ্ধপুরুষ। বলুন তো জায়গিরদার মুইনুদ্দিন শাহ-আল-তামাসের ছেলে আজিমুদ্দিনের কবর কোথায় আছে।'

অমনি ফকির নড়ে উঠল। তার চোখে আগুন ঠিকরে বেরুতে থাকল যেন। সেই দশ টাকার নোটটা বের করে বলল—'ইয়ে লো তুমহারা রূপেয়া! নিকাল যাও হিঁয়াসে! আভি নিকাল যাও!'

কর্নেল ব্যস্তভাবে বললেন, 'সে কী ফকিরসায়েব! চটে যাচ্ছেন কেন?'

ফকির ক্রুদ্ধস্বরে বলল—'দেখো, ইয়ে টাউনকা কমলাখ্‌বাবুনে বহত দফে হামার কাছে এসেছে ঔর এহি বাত পুছেছে। হামি বোলে নাই। কিসিকো হাম ইয়ে ছুপা বাত (গুপ্ত) বলবে না। কমলাখ্‌বাবু হামাকে খুন করতে ভি এসেছিল। তো হামি এইসা জাদুকা খেল জানে, কমলাখ্ জান লিয়ে ভেগে গিয়েছিল।' বলে ফকির হিংস্র মুখে ক্রূর হাসি হাসল।

কর্নেল বললেন, 'কিন্তু কমলাক্ষবাবু তো আজিমুদ্দিনের কবরের খোঁজ পেয়ে গেছে। তা জানেন?'

ফকির চমকে উঠে বলল—'সাচ্ বাত?'

'হাঁ ফকিরসায়েব। এমনকী সে আজিমুদ্দিনের কবরের সেই কালো বাকসোটাও হাতিয়ে নিয়েছে।'

ফকির ফের ক্রূর হেসে বলল—'ফয়েদা হবে না। ও বাকসের চাবি কাঁহা সে মিলেগা?'

'কেন? আজিমুদ্দিনের মমিকরা লাশে—মানে তার চুলের মধ্যে লুকোনো আছে।'

ফকির জোরে মাথা নেড়ে বলল—'কবর ঢুঁড়ে আমি দেখেছে। আজিমুদ্দিনের লাশের মাথা নেই। কৌন ডাকু কাট লিয়া।'

কর্নেল চমকে উঠলেন। 'বলেন কী ফকিরসায়েব!'

ফকির এবার শান্তভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—'আজিমুদ্দিনকা শির যিসকা পাস হ্যায়, চাবিভি উসকা পাস হ্যায়।'

বলে ফকির ফের চোখ বুজল। তার ঠোঁট কাঁপতে থাকল। তারপর সে আলখেল্লার ভেতর থেকে একমুঠো ধুনো বের করে আগুনে ছড়ালে। আগুনটা দপকে উঠল। তখন ফকির হঠাৎ গর্জে বলে উঠল—'চলা যাও হিঁয়াসে! আভি নিকাল যাও!'

কর্নেল সবে উঠে দাঁড়িয়েছেন, ফকির ফের আরেক মুঠো ধুনোর মতো কী জিনিস আগুনে ফেলল। কিন্তু এবার এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে গেল।

আগুনের কুণ্ড থেকে মুহূর্তে হু হু করে সাদা ঘন একরাশ ধোঁয়া উঠতে শুরু করল। তার উৎকট গন্ধে কর্নেল তক্ষুনি পিছিয়ে এলেন। ওদিকে সেই ধোঁয়া বেশ কিছুক্ষণ হু-হু করে আকাশে ওঠার পর আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। আগুনটাও নিভে গেছে ইতিমধ্যে। কর্নেল টর্চ জ্বেলে দেখলেন, ফকির অদৃশ্য।

এখানে ওখানে টর্চ জ্বেলে সমাধি এলাকা তন্নতন্ন করে খুঁজে আর ফকিরকে দেখতে পেলেন না কর্নেল। তখন বিস্মিত মনে ফিরে এলেন রাস্তায়।

বাংলোয় ফিরে দেখলেন, গেটে শংকরবাবুর গাড়ি রয়েছে। শংকর তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কর্নেলকে দেখে শংকর একটু অবাক হয়ে বললেন— 'আপনাকে অমন দেখাচ্ছে কেন? কী হয়েছে কর্নেল?'

কর্নেল বললেন—'বলছি। আগে চৌকিদারকে কফি করতে বলো, শংকর।' বলে ঘরের দরজা খুলে আরামকেদারায় এলিয়ে পড়লেন। তাঁকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল।...

মুণ্ডহীন মমি

কিছুক্ষণ পরে কফি খেয়ে চাঙ্গা হয়ে কর্নেল চুরুট ধরালেন। তখন শংকর বললেন—'কী হয়েছিল, বলবেন কর্নেল?'

কর্নেল বললেন—'বিষাক্ত গ্যাসের ঝাঁঝে মাথা ঘুরছিল।'

শংকর অবাক হয়ে বললেন—'বিষাক্ত গ্যাস। কোথায় ছিল?'

তখন কর্নেল এক ফকিরের সঙ্গে আচমকা দেখা হওয়া এবং যা যা ঘটেছে, সব বললেন। শেষে বললেন—'বলতে পারো, ফকিরের সঙ্গে আজিমুদ্দিনের কবরের সম্পর্ক আছে, জানলুম কী করে? ওটা নেহাত আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার মতো। কারণ কী জানো শংকর? আমি বরাবর দেখেছি, পিরের দরগার ফকিররা বংশানুক্রমেই ফকির এবং এলাকার প্রাচীন মুসলমান শাসকদের ইতিহাস তাঁদের মুখস্থ থাকে। তাই ওখানে জঙ্গলের মধ্যে পিরের দরগায় ওই ফকিরকে দেখে আমি আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার মতো আজিমুদ্দিনের কবরের কথা জিগ্যেস করলুম। ফলও পেলুম হাতে নাতে। তবে এই ফকিরবাবাজি দেখছি সাংঘাতিক লোক। ওর কাছে একরকম পাউডার আছে। তা আগুনে ছুঁড়লে মারাত্মক গ্যাস সৃষ্টি হয়। প্রাচীন হেকিমি শাস্ত্রে এই অদ্ভুত জিনিসটার কথা পড়েছিলুম! এবার স্বচক্ষে দেখলুম।'

শংকর বললেন—'একটা কথা বুঝতে পারছি না। আজিমুদ্দিনের মৃতদেহ যে মমি করা, তা জানলেন কী ভাবে?'

'অতি সাধারণ বুদ্ধিতে।' কর্নেল একটু হাসলেন। দ্যাখো শংকর, মানুষের মৃত্যুর পর কয়েকদিনের মধ্যে চুল খসে যায়। কাজেই চুলের মধ্যে চাবি লুকিয়ে রাখার প্রশ্ন ওঠে তখন, যখন কি না চুল খসে পড়ার উপায় থাকে না। অর্থাৎ চুলসুদ্ধ মৃতদেহ মমি করা হলে, তবেই চুলের মধ্যে চিরকালের জন্যে চাবি লুকিয়ে রাখা যায়।'

শংকর বিস্মিতভাবে বললেন—'কিন্তু মমি করার প্রথা তো সেই মিশরের লোকেরা তিন-চার হাজার বছর আগে জানত! ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে এদেশে মমি করার কথা তো শুনিনি!'

কর্নেল বললেন—'না শংকর। ওই প্রচলিত ধারণা একেবারে ভুল। আমাদের দেশে হিন্দুরা মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলে। কিন্তু মুসলমান ও খ্রিস্টানরা কবরে রাখে। প্রাচীন আমল থেকেই অনেক অভিজাতবংশীয় মুসলমান কিংবা রাজাবাদশাদের মৃতদেহ কবরে দেওয়ার আগে একরকম মশলা মাখানো হত। এক শ্রেণির লোক এই বিদ্যা জানত। তবে মিশরের মমির মতো এসব মমি হাজার

হাজার বছর টিকত না। সচরাচর দুই থেকে পাঁচশো বছর অন্তত অক্ষত থাকত। কাজেই আজিমুদ্দিনের মৃতদেহ যে মমি করা হয়েছিল, তা স্বাভাবিক।'

শংকর বললেন—'পুলিশ সুপার অজিতেশের সাহায্যে আমরা প্রকাশ্যে ওই কবর খুঁড়ে দেখতে পারি, ফকিরের কথা সত্যি কি না। কর্নেল, কালই ব্যাপারটা দেখা যাক্।'

কর্নেল জোরে মাথা দুলিয়ে বললেন—'না শংকর। কবর প্রকাশ্যে খুঁড়তে গেলে এলাকার মুসলমানরা তাতে প্রবল আপত্তি করবেন। স্বধর্মীয়ের মৃতদেহ তাঁরা অন্যধর্মের লোকেদের হাত ছোঁয়াতে দেবেন না। কাজেই ব্যাপারটা আজ রাতেই গোপনে সেরে ফেলতে হবে।'

বাংলোয় ফোন রয়েছে। কর্নেল পুলিশ সুপারকে ফোনে কথাটা জানালেন। তারপর ফোন রেখে শংকরকে বললেন—'অজিতেশ ঘণ্টাখানেক পরেই এসে পড়বে। তা শংকর, শ্রীমান ন্যাড়ার বাবা-মা নিশ্চয় ভীষণ দুশ্চিন্তায় রয়েছেন।'

শংকর বললেন—'তা আর বলতে!'

'তুমি কি ওদের সব কথা বলেছ?'

'না। তাহলে তো দিদি-জামাইবাবুকে সামলানো কঠিন হবে। কেউ ন্যাড়াকে আটকে রেখেছে কিংবা আমি সেই উড়ো চিঠি পেয়েছি—এসব কোনও কথা ঘুণাক্ষরে ওঁদের বলিনি। বলেছি—নিশ্চয় কলকাতা বেড়াতে গেছে একা। ও যা খেয়ালি ছেলে। একবার কিন্তু একা কলকাতা পালিয়েছিল, জানেন?'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ তবে বড় বুদ্ধিমান ছেলে। খুঁজে খুঁজে আমাদের বাড়িতে হাজির হয়েছিল। অথচ কবে সেই দু বছরের বাচ্চা যখন, তখন মায়ের কোলে চেপে এসেছিল।'

কর্নেলের কান ছিল শংকরের কথায়, কিন্তু দৃষ্টি ছিল সামনে ফুলবাগিচার দিকে। হঠাৎ তিনি এক ধাক্কায় শংকরকে চেয়ার থেকে ফেলে দিলেন এবং নিজেও শুয়ে পড়লেন। পরক্ষণে প্রচণ্ড শব্দ শোনা গেল গুলি ছোঁড়ার। ঘরের দেয়ালে প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবির কাচ ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়ল। বারুদের কটু গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। বাইরে চৌকিদার চিৎকার করে উঠল—'ডাকাত পড়েছে! ডাকাত পড়েছে!'

এক লাফে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন এবং জানালার পাশে নিজেকে আড়াল করে টর্চ জ্বাললেন। তাঁর অন্য হাতে গুলিভরা রিভলভার দেখা গেল।

কিন্তু তখনই ফের স্তব্ধতা ঘনিয়ে এসেছে। ফুলবাগিচার ওদিকে কেউ নেই। চৌকিদার বোধ করি চেঁচিয়ে ওঠার পরই আতঙ্কে চুপ করে গেছে।

শংকর মেঝে থেকে উঠে বললেন—'আমি কৃতজ্ঞ, কর্নেল। আপনি আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে না দিলে গুলিটা আমার মাথায় লাগত। পেছনের ছবিটা চূর্ণ হওয়া দেখেই তা টের পাচ্ছি। কিন্তু ওদের এত সাহস হল কীভাবে?'

কর্নেল একটু হেসে বললেন—'দুর্বৃত্তদের পক্ষে এমনটা স্বাভাবিক শংকর। কিন্তু আমি একটা কথা ভেবে অবাক হচ্ছি। আততায়ীর গুলির লক্ষ্য ছিলে তুমি। অথচ ন্যাড়াকে যারা চুরি করেছে, তারা তোমাকে খুন করতে চাইবে কেন? তোমাকে মেরে ফেললে তো বাকসোটা পাবার আশাই আর থাকবে না। কাজেই মনে হচ্ছে, এই বাকসো-রহস্যের পেছনে আরও একটা দল রয়েছে।'

শংকর অবাক হয়ে বললেন—'তারা আবার কারা।'

'শিগগির সেটা খুঁজে বের করব। এখন বরং ওই খোলা জানলাটা বন্ধ করে দিই। এই শীতে ওটা খুলে রেখেছিলুম, বাইরের দিকটায় লক্ষ রাখার জন্য। এখন বুঝতে পারছি, কাজটা ঠিক করিনি। তাছাড়া এখন থেকে আমাদের পদে পদে আরও সতর্ক থাকতে হবে।'

বলে জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে কর্নেল আরাম কেদারায় বসলেন। শংকর বারবার ভয়ে ভয়ে খোলা দরজার পর্দার দিকে তাকাচ্ছিলেন। তা দেখে কর্নেল একটু হেসে বললেন—'না শংকর। আততায়ী যেই হোক, দরজা দিয়ে হামলা করার সাহস তার নেই। থাকলে সে দূর থেকে গুলি না ছুঁড়ে সোজা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকেই হামলা করত।'

কিছুক্ষণ পরে পুলিশ সুপার অজিতেশ তাঁর দলবল নিয়ে এসে পড়লেন। সব শুনে বললেন—'আমারই ভুল হয়েছে। বাংলোটা পাহারার ব্যবস্থা করা জরুরি ছিল। যাই হোক, সে-ব্যবস্থা করছি। এখন চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক।'

রাতের অন্ধকারে সবাই মিলে চুপিচুপি বেরিয়ে পড়লেন। সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশদল সতর্কভাবে চলল।

রেললাইন পেরিয়ে সেই পোড়ো মাঠে কিছুটা এগিয়ে ওঁরা জঙ্গলে ঢুকলেন। তখনও কেউ টর্চ জ্বালেননি। কৃষ্ণপক্ষের রাত। তাতে প্রচণ্ড শীত। কুয়াশার মধ্যে আকাশের নক্ষত্র মিটমিট করে জ্বলছে। স্টেশনের দিকটা ঘন কুয়াশায় ঢাকা। বাতিগুলো আবছা জ্বলছে।

বটতলার কাছে গিয়ে কর্নেল থমকে দাঁড়ালেন। দেখাদেখি সবাই দাঁড়িয়ে গেলেন। কর্নেল ফিসফিস করে বললেন—'কী একটা শব্দ হচ্ছে যেন।'

শংকর ও অজিতেশ কান পেতে শুনে বললেন—'হ্যাঁ।'

কর্নেল কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে তেমনি চাপা গলায় বললেন—একসঙ্গে সবগুলো টর্চ জ্বালতে হবে। রেডি। ওয়ান—টু—থ্রি।'

একসঙ্গে প্রায় একডজন টর্চের আলো জ্বলে উঠল। সামনে দেখা গেল তিনটি মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে একমুহূর্ত হতচকিত হয়ে গিয়েছিল তারা। তারপর দৌড়ে অন্ধকার জঙ্গলের দিকে পালিয়ে গেল।

গুপ্ত কবরের পাথরের ঢাকনা সরানো হয়েছে। এবার গর্তের ভিতর থেকে এক লাফে একটা লোক প্রায় ডিগবাজি খেয়ে অন্ধকার জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল।

অজিতেশের নির্দেশে সেপাইরা সেই মুহূর্তেই তাদের পিছনে ধাওয়া করেছে।

ওদিকে জঙ্গলে বারবার টর্চের ঝলক, বন্দুকের আওয়াজ কয়েকবার, তারপর পাকড়ো পাকড়ো চেঁচামেচি শোনা গেল।

কর্নেলরা কবরের কাছে দৌড়ে এলেন। এসে টর্চের আলোয় দেখলেন, গর্তের মধ্যে মৃতদেহের কফিনটা টেনে এনে রেখেছে। কফিনের ঢাকনা খোলা! তার ভেতরে একটা পোশাকপরা মৃতদেহ রয়েছে। বালকেরই মৃতদেহ। কিন্তু তার মুণ্ড নেই। কবন্ধ মৃতদেহটা মমি করা।

কর্নেল, শংকর আর অজিতেশ তিনজনেই কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পর একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'তাই তো।'

তারপর কর্নেল গর্তে নামলেন। বহুক্ষণ ধরে মমিটা পরীক্ষা করতে থাকলেন। তারপর বললেন—'ফকির ঠিকই বলেছিল দেখছি। কে বা কারা মুণ্ডু কেটে নিয়ে গেছে, কিন্তু একথা ঠিক যে মুণ্ডুটা কাটা হয়েছে গত কয়েকদিনের মধ্যেই।'

অজিতেশ বললেন—'কীভাবে বুঝলেন?'

কর্নেল হাসলেন। বললেন—'খুব সোজা যুক্তি। শংকরবাবু বাকসোটা নিয়ে যাবার আগে মুণ্ডু কাটা হয়নি। তাহলে যে মুণ্ডু কেটেছে, সে কি বাকসোটা ফেলে রেখে যেত? কাজেই শংকরবাবু বাকসো নিয়ে যাবার পরই কাজটা করা হয়েছে।'

অজিতেশ ও শংকর সায় দিয়ে বললেন—'ঠিক, ঠিক।'

কর্নেল বললেন—'মুণ্ডু যে কেটেছে সে জানে বাকসো যেই হাতাক্, চাবি এই মুণ্ডের চুলের মধ্যে আছে। কাজেই তার উদ্দেশ্য হল, কাটা মুণ্ডুর চুল খুঁজে চাবি বের করা এবং বাকসোটা উদ্ধার করা।'

শংকর বললেন—তাহলে একাজ কমলাক্ষেরই।'

কর্নেল আনমনে বললেন—'বলা কঠিন। দেখা যাক। তবে এস, মৃতদেহটা আমরা যথাস্থানে রেখে আগের মতো সমাধিস্থ করি। আর অজিতেশ, তুমি তোমার কথামতো আপাতত কিছুদিন এখানে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করো।'

অজিতেশ বললেন—'তা আর বলতে। তবে আমারই ভুল। ভেবেছিলুম, কাল সকাল থেকে পাহারার ব্যবস্থা করব। বুঝতে পারিনি, আজ রাতেই কেউ কবরে হামলা করবে।'

গুপ্ত কবর আগের মতো ঢেকে দেওয়ার একটু পরে সেপাইরা ফিরে এসে জানাল—'ওদের পাকড়াও করা যায়নি। হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে যেন।...'

ন্যাড়ার কারসাজি

নেহাত খিদে সইতে পারে না বলে ন্যাড়া ওদের দেওয়া খাবার খেয়েছে। খাবার সময় অবশ্য হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিয়েছিল মাধব। তবে খুনে ডালকুত্তাটা সারাক্ষণ ঘরের মধ্যে রয়েছে। কুতকুতে চোখে ন্যাড়াকে দেখছে তো দেখছেই।

এভাবে একটা দিন একটা রাত কেটে গেল। পরদিন সকালে কমলাক্ষ ঘরে ঢুকে একগাল হেসে বললেন—'বাবা নেড়ু, আজ সন্ধ্যার মধ্যেই তুমি ছাড়া পাবে। তবে সেটা নির্ভর করছে তোমার ছোটমামার ওপর। সে যদি জায়গামতো বাকসোটা রেখে যায়, তবেই। নৈলে ....'

ন্যাড়া ভয়ে-ভয়ে জিগ্যেস করল—'নৈলে কী হবে?'

কমলাক্ষ তার প্যান্টের পকেট থেকে সেই ছুরিটা বের করে বললেন—'স্রেফ জবাই হয়ে যাবে। বুঝলে তো?'

ন্যাড়া আঁতকে উঠে কাঁদো কাঁদো মুখে বলল—'কেন কমলকাকু? আমার কী দোষ?'

কমলাক্ষ নিষ্ঠুর হেসে বলল—'তুমিই তো যত নষ্টের গোড়া। তুমি না বললে তো শংকর ব্যাটা বাকসোর হদিশ পেত না।'

ন্যাড়া মনে-মনে বুদ্ধি এঁটে বলল—'আচ্ছা কমলকাকু, আমি যদি নিজের হাতে ছোটমামাকে চিঠি লিখে দিই যে বাকসোটা ফেরত দাও, নৈলে এরা আমাকে মেরে ফেলবে?'

কমলাক্ষ খুশি হয়ে বলল—'খুব ভালো কথা। এই তো চাই।'

বলে সে একটুকরো কাগজ আর ডটপেন এনে দিল। ন্যাড়ার হাতের বাঁধনও খুলে দিয়ে বলল—'হুঁ, ঝটপট লিখে ফেল দিকি তাহলে!'

এই সময় মাধব ঘরে ঢুকে ব্যস্তভাবে বলল—'সর্বনাশ হয়েছে কমলদা!'

কমলাক্ষ চমকে উঠে বলল—'কী? কী হয়েছে মাধব?'

'এইমাত্র লিটনগঞ্জ থেকে আমার লোক ট্রাঙ্ককল করে খবর দিল।' মাধব ব্যস্তভাবে বলতে থাকল। 'বটতলার কবরে কড়া পাহারা বসিয়েছে পুলিশ। আর তার চেয়েও সাংঘাতিক কথা, আজিমুদ্দিনের মমিকরা মড়ার মুণ্ডুটা নাকি কে কেটে নিয়ে গেছে। আমার লোকেরা কবর খুঁড়ে সেটা আবিষ্কার করেছে, হঠাৎ পুলিশ হাজির।'

কমলাক্ষ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বলল—'বলো কী মাধব! এই তো সেদিনই কফিন খুলে দেখলুম, মুণ্ডু রয়েছে। হঠাৎ মুণ্ডুটা কাটল কে? কেনই বা কেটে নিয়ে গেল?'

মাধব চাপা গলায় বলল— 'এ নিশ্চয় ব্যাটা হাসান ফকিরের কীর্তি। শেষবার ব্যাটা বলেছিল না? কালো বাকসোর চাবি মমিকরা লাশের মধ্যেই কোথাও আছে!'

'হ্যাঁ। বলেছিল বটে। কিন্তু আমরা তো হাতড়ে দেখেছিলুম। পাইনি!'

'এখন মনে হচ্ছে চাবিটা মুণ্ডুর মধ্যেই ছিল।'

'হুম্! কিন্তু কে তাহলে মুণ্ডু কেটে নিয়ে গেল?'

মাধব একটু ভেবে বলল— 'সেটা জানতে হলে ব্যাটা হাসান ফকিরকে ধরে আনা দরকার। ওর পাগলামির নিকুচি করেছে। আমি এখনই আমার লোককে ট্রাঙ্ককল করে হুকুম দিচ্ছি, ফকিরকে যেভাবে হোক এখানে নিয়ে আসতে হবে।'

চিন্তিতমুখে কমলাক্ষ বললেন—'যা করার শিগগির করো!'

মাধব বেরিয়ে গেল। তখন ন্যাড়া বলল—'তাহলে চিঠি লিখি কমলকাকু?'

'হ্যাঁ, লেখো।' বলে কমলাক্ষ কাগজ-কলম এগিয়ে দিলেন। তারপর বললেন—'যা বলি, লেখো।'

ন্যাড়া গোটাগোটা হরফে লিখতে থাকল :

'ছোটমামা, আজ রাত বারোটায় গঙ্গার ধারে খ্রিস্টান কবরখানায় অর্জুন গাছের তলায় কালো বাকসোটা রেখে যাবে। তাহলে আধঘণ্টা পরে এরা আমাকে তোমার বাড়ির গেটে পৌঁছে দেবে। যদি একথা না শোনো, তাহলে এরা আমার মুণ্ডু কেটে ফেলবে। ইতি ন্যাড়া।'

চিঠিটা কমলাক্ষ কয়েকবার পড়ার পর ভাঁজ করে পকেটে পুরলেন। তারপর আগের মতো ন্যাড়ার হাত দুটো খাটের দুপাশে পায়ার সঙ্গে বেঁধে রেখে বেরিয়ে গেলেন। ভয়ংকর ডালকুত্তাটা পাহারায় রইল।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ ন্যাড়ার চোখে পড়ল খাটে তার মাথার পাশে বালিশের একধারে যেখানে কমলাক্ষ বসেছিলেন, সেখানে কমলাক্ষের সেই ছুরিটা পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে ন্যাড়ার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কমলাক্ষ তখন ন্যাড়াকে ভয় দেখাতে ছুরিটা বের করেছিলেন। কিন্তু ন্যাড়া নিজের হাতে শংকরবাবুকে চিঠি লিখতে চাইলে খুশির চোটে ছুরিটা পকেটে না ঢুকিয়ে ওখানেই রেখে কাগজ কলম আনতে গিয়েছিলেন টেবিলে। তারপর ভুলেই গেছেন ছুরিটার কথা।

ন্যাড়া ছুরিটার দিকে তাকিয়ে ফন্দি আঁটতে থাকল।

ভয় শুধু ডালকুত্তাটাকে। নড়লেই সে নাকি ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর।

শীত বলে দয়া করে ওরা ন্যাড়াকে একটা কম্বল দিয়ে গেছে। ন্যাড়া ভাবল, কম্বলটা হয়তো কাজে লাগানো যায়। সে খুব আস্তে কাত হয়ে শোবার ভান করল। ওইটুকু নড়াচড়াতেই ডালকুত্তাটা গরগর করে উঠল। কিন্তু সে ন্যাড়ার পায়ের কাছে খাটের পায়ার সঙ্গে শেকলে বাঁধা রয়েছে। চেনটা অবশ্য যথেষ্ট লম্বা। ন্যাড়া কম্বলমুড়ি দিল এবার। কিন্তু এতে ডালকুত্তাটা আপত্তি করল না।

এবার সে কম্বলের খানিকটা অংশ কৌশলে বালিশের পাশে রাখা ছুরির ওপর চাপাল। তারপর মুখটা বাড়িয়ে কম্বলের ভেতর ছুরির বাঁটটা কামড়ে ধরল। এখন আর অসুবিধে হল না। ছুরিটা খুব ধারালো। দাঁতে বাঁট কামড়ে ডান হাতের দড়ির বাঁধনে ফলাটা সাবধানে কয়েকবার ঘষতেই বাঁধন কেটে গেল।

ডালকুত্তাটা মাঝে মাঝে গরগর করছে বটে, তবে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতলব নেই বলেই মনে হচ্ছে।

বাঁ হাতের বাঁধন কাটতে দেরি হল না ন্যাড়ার। এবার সে কম্বলের ফাঁক দিয়ে ডালকুত্তাটার দিকে তাকাল। ডালকুত্তাটা তার দিকে তাকিয়েছিল। এই সময় হঠাৎ ঘুলঘুলি থেকে একটা চামচিকে উড়ে এসে ডালকুত্তাটার কাছে পড়ল। অমনি সে গরগর করে ঝাঁপিয়ে গেল চামচিকেটার দিকে।

এই মোক্ষম সুযোগ। ন্যাড়ার দু হাত খোলা। শুধু পা দুটো তখনও বাঁধা। ডালকুত্তাটা চামচিকের দিকে ঝাঁপ দেওয়া মাত্র সে কম্বলটা তার ওপর ফেলে দিল। কম্বলে জড়িয়ে-মড়িয়ে ডালকুত্তার তখন ভীষণ রাগ হয়েছে। সে গরগর গোঁ গোঁ গর্জন করতে করতে যত লাফালাফি করে কম্বল তত জড়িয়ে যায়।

সেই সুযোগে ন্যাড়া ঝটপট দু পায়ের বাঁধন কেটে ফেলেছে। তারপর এক লাফে খাট থেকে নেমে নিরাপদ দূরত্বে সরে গেছে।

বেচারা ডালকুত্তা তখন কম্বল জড়ানো অবস্থায় গড়াতে গড়াতে কেন কে জানে—হয়তো জীবনে এমন বিদঘুটে ব্যাপার কখনও ঘটেনি তার; সেই আতঙ্কে খাটের তলায় ঢুকে পড়ল।

ন্যাড়া এতক্ষণে নিশ্চিন্তে ঘরের ভেতরটা দেখতে থাকল।

ঘরটায় আলো খুব কম। ঘুলঘুলি থেকে একটুখানি রোদের ছটা এসে ঢুকেছে মাত্র। সে একটা জানলা খুলে দিল। একতলাতেই রয়েছে। জানালার ওপাশে জঙ্গুলে জায়গা। তার ওদিকে গঙ্গা দেখা যাচ্ছে। ডাইনে-বাঁয়ে একটু তফাতে কলকারখানা রয়েছে।

এদিকে ঘরের ভেতরে কতকালের পুরোনো আসবাবপত্র আর ছেঁড়া তোষক, নারকেল ছোবড়ার গদি আর একদঙ্গল বালিশ পড়ে রয়েছে! মনে হল, এটা কোনও পোড়ো বাগানবাড়ির পেছনের দিক।

ন্যাড়া দরজা টেনে দেখল বাইরে থেকে আটকানো আছে। অমনি সে নিরাশ হয়ে গেল। জানালার রড খুব পুরু আর শক্ত। সে বেরুবে কেমন করে?

সে ভাবতে থাকল। একটু পরে তার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। কোনা থেকে কয়েকটা ছেঁড়া বালিশ এনে সে বিছানায় লম্বালম্বি রাখল। এখন একটা কম্বল দরকার। ডালকুত্তাটা কম্বল মুড়ি দিয়ে খাটের তলায় ঢুকে রয়েছে এবং মাঝে মাঝে অদ্ভুত চাপা শব্দ করছে! অন্যসময় হলে ন্যাড়া হেসে কুটিকুটি হত।

কোনা খুঁজতে গিয়ে ন্যাড়া একটা ছেঁড়া তুলো বেরকরা লেপ পেয়ে গেল। সে সেটা এনে বালিশের ওপর ঢাকা দিল। দেখলে মনে হবে, শ্রীমান ন্যাড়াই যেন আগের মতো শুয়ে আছে। মাথাঅবদি ঢেকে রেখেছে। জানালা বন্ধ করেছে বলে হঠাৎ বাইরে থেকে ঢুকে ওরা ব্যাপারটা টের পাবে না সম্ভবত। অন্তত টের পেতে একটু দেরি তো হবেই। ততক্ষণে ন্যাড়া ...

হ্যাঁ, এবার তাকে লুকিয়ে থাকতে হবে।

কোনার দিকে তোশক আর গদির আড়ালে ন্যাড়া গিয়ে লুকিয়ে বসে রইল।

তারপরে বসে আছে তো আছেই। কেউ আসে না। না কমলাক্ষ, না মাধব—কিংবা ওদের সেই কুৎসিত চেহারার লোকটা—যে ন্যাড়াকে খাবার দিতে আসে।

ডালকুত্তাটা কি আরামে ঘুমোচ্ছে এবার?

ঠিক তাই। কম্বলের মজাটা টের পেয়ে গেছে সে। তাই আর সাড়াশব্দ নেই।

কতক্ষণ কেটে গেল তারপর তালা খোলার শব্দ হল। ন্যাড়া সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হল।

দরজা খুলে সেই কুৎসিত চেহারার লোকটা ঢুকল। তার হাতে যথারীতি একটা থালা। তাতে ভাত-তরকারি রয়েছে। ন্যাড়াকে খাওয়াতে এসেছে।

সে খাটের কাছে এসে ডাকল—কই খোকাবাবু, ওঠ। খেয়ে নাও।'

অমনি ন্যাড়া ঠিক খরগোশের মতো একলাফে উঠেই দরজা দিয়ে বাইরে চলে গেল। লোকটার হাত থেকে ভাতের থালা পড়ে গেল। সে চেঁচিয়ে উঠল চাপা গলায়—'পালাচ্ছে! পালাচ্ছে! ধর্, ধর্!'

ন্যাড়া পাশের ঘর থেকে ততক্ষণে বারান্দায়, বারান্দা থেকে একটা উঠোনে—তারপর উঠোনের ওপাশে ভাঙা পাঁচিল গলিয়ে ছোট্ট একটা গলিতে পৌঁছে গেছে।

সেখান থেকে সে সোজা দৌড় লাগাল। তারপর একেবারে গঙ্গার ধারে গিয়ে পড়ল। ঘন আগাছার জঙ্গল ওখানটা। তার নিচে অথৈ জল। ন্যাড়া বুঝতে পারল না, কোনদিকে যাবে।

জঙ্গলটার শেষে একটা কারখানার পাঁচিল দেখা যাচ্ছিল। সে মরিয়া হয়ে সেদিকেই দৌড়ুল। এইসময় তার কানে এল, পেছনে কোথাও গরগর গর্জন করছে বুঝি সেই হিংস্র ডালকুত্তাটাই।

সে ঝোপের আড়ালে উঁকি মেরে যা দেখল, তাতে তার আতঙ্ক বেড়ে গেল। সেই কুৎসিত চেহারার লোকটা ডালকুত্তাটা নিয়ে জঙ্গলে তাকে ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছে।

ন্যাড়া কারখানার পাঁচিলের কাছে এসে বাঁদিকে তাকাল। একটা বটগাছের তলায় নৌকা বাঁধা রয়েছে।

সে দৌড়ে গিয়ে নৌকোয় উঠল। দুজন লোক—বুড়ো জেলে ও তার ছেলে সব খাওয়াদাওয়া সেরে বিড়ি টানছিল। অবাক হয়ে ন্যাড়ার দিকে তাকিয়ে রইল।

ন্যাড়া ব্যাকুলভাবে বলল—'আমাকে বাঁচাও। ডালকুত্তা নিয়ে ওরা আমাকে ধরতে আসছে। ওরা আমাকে মেরে ফেলবে!'

বুড়ো জেলে তীরের আগাছার জঙ্গলটা দেখে নিয়ে ব্যস্তভাবে বলল—'খোকাবাবু, তুমি ছইয়ের ভেতর লুকিয়ে পড়ো। আমি দেখছি।'

ন্যাড়া ছইয়ের ভেতর গিয়ে লুকিয়ে রইল।

একটু পরে তীরের দিকে আওয়াজ এল—'ও বুড়ো! এদিকে একটা ছেলেকে দেখেছ?'

বুড়ো মাথা নেড়ে বলল—'না কর্তা! দেখিনি তো!' তারপর সে তার ছেলেকে ইশারা করল নৌকোর কাছি খুলতে।

নৌকোটা মাঝগাঙের দিকে এগিয়ে চলল। বুড়োর ছেলেটা একটু হেসে ন্যাড়াকে জিগ্যেস করল—'কী হয়েছে বলো তো খোকাবাবু?'

ন্যাড়া বলল—'বলব। আগে আমাকে দূরে কোনও ঘাটে পৌঁছে দাও।'

বুড়ো জেলে হাল ধরে বসেছিল। বলল—'বুঝেছি। ছেলেধরার পাল্লায় পড়েছিলে। আজকাল ছেলেধরার উৎপাত হয়েছে।'

ন্যাড়া ছইয়ের ভেতর নিরাপদে বসে দেখতে পাচ্ছিল, কমলাক্ষর লোকটা তখনও আগাছার জঙ্গল ঢুঁড়ে হন্যে হচ্ছে।...

ফকিরের পুনরাবির্ভাব

লিটনগঞ্জের ডাকবাংলোয় তখন কর্নেল, শংকর, অজিতেশ গম্ভীর মুখে আলোচনা করছিলেন। ন্যাড়াকে বাঁচাতে হলে আজই রাতে বি. টি. রোডের ধারে খ্রিস্টান কবরখানার কাছে কালো বাকসোটা রেখে আসতে হবে। একটু আগে শংকরের কাছে কলকাতা থেকে হারাধন ট্রাঙ্ককল করেছে। শংকর তাকে জানিয়েছিলেন, কোনও নতুন ঘটনা ঘটলে যেন তক্ষুনি লিটনগঞ্জের ডাকবাংলোয় ফোন করে। হারাধন জানিয়েছে, কিছুক্ষণ আগে একটা উড়ো চিঠি কেউ গেটের লেটারবক্সে রেখে গেছে। চিঠিটা শ্রীমান ন্যাড়াই লিখেছে।

অজিতেশ পরামর্শ দিলেন, লালবাজার থেকে পুলিশ বাহিনী নিয়ে কবরখানাটা ঘিরে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে। উনি ফোন করে লালবাজার গোয়েন্দা বিভাগে সে কথা জানাবেন। তাছাড়া কর্নেলেরও প্রভাব আছে পুলিশ মহলে।

কিন্তু শংকরের তাতে ঘোর আপত্তি। কারণ ওরা অতি ধূর্ত। পুলিশ ওত পেতেছে টের পেলে ন্যাড়াকে খুন করে ফেলতে পারে।

কর্নেল গুম হয়ে বসে কী ভাবছিলেন। কতক্ষণ পরে বললেন—'হুম্! এক কাজ করা যাক্। শংকর, তুমি এখনই কলকাতা ফিরে যাও।'

শংকর বললেন—'আর আপনি?'

'আমি বরং বিকেলের ট্রেনে ফিরব। ততক্ষণে একটা কাজ সেরে নিতে চাই এখানে।'

'কিন্তু ...'

কর্নেল বাধা দিয়ে একটা হাত তুলে শংকরকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বললেন—'আশঙ্কার কারণ নেই। আমার এখনও ধারণা, ন্যাড়াবাবাজিকে ওরা প্রাণে মারবে না। কারণ তাহলে বাকসো পাবার কোনও আশাই থাকবে না। তাই বলছি, তুমি ফিরে গিয়ে তোমার শোবার ঘরে ওই রহস্যময় জিনিসটি পাহারা দাও। আমি ঠিক সময়ে ফিরব এবং তোমাকে দর্শন দেব।'

শংকর একটু চমকে উঠে বললেন—'তাহলে আপনি কি সন্দেহ করছেন, আমার বেডরুমে ওরা হানা দিতে পারে?'

'বিচিত্র নয়।'

শংকর একটু হেসে বললেন—'ওই গুপ্তস্থানের হদিশ আমি ছাড়া কেউ জানে না।'

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন—'তবু সাবধানের মার নেই। ওরা ক্রমশ মরিয়া হয়ে উঠবে। তোমার লোকেদের হাত করার চেষ্টা করবে হয়তো।'

'কর্নেল! আমার লোকেরা খুবই বিশ্বাসী।'

'শংকর! টাকা এমন জিনিস অসম্ভবকে সম্ভব করে। তাছাড়া আজকাল মানুষের নৈতিক চরিত্র ঠুনকো হয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। লোভ মানুষের আত্মাকে গ্রাস করছে। তাই বলছি, তোমার এখনই বাড়ি ফেরা উচিত।'

অজিতেশ সায় দিয়ে বললেন—'কর্নেল ঠিকই বলেছেন শংকর। বরং তুমি চাইলে কলকাতায় লালবাজার গোয়েন্দা বিভাগকে তোমার বাড়ির দিকে নজর রাখতেও অনুরোধ করতে পারি।'

শংকর কিছু বলার আগেই কর্নেল বললেন—'ঠিক, ঠিক। অজিতেশ, তুমি এখনই সে ব্যবস্থা করো বরং। শংকর পৌঁছোবার আগেই গোয়েন্দা পুলিশ ছদ্মবেশে শংকরের বাড়ি পাহারা দিক। তুমি ওদের বলে দাও, সন্দেহজনক কোনও জিনিস বাড়ি থেকে কেউ নিয়ে বেরুলেই যেন তাকে পাকড়াও করা হয়।'

শংকর তক্ষুনি বেরিয়ে গেলেন। ন্যাড়াদের বাড়ি গিয়ে তাঁদের আশ্বাস দিয়ে কলকাতা রওনা হবেন। মোটর গাড়িতে পৌঁছোতে ঘণ্টা চারেক লাগবে বড়জোর।

একটু পরে অজিতেশও চলে গেলেন।

কর্নেল বারান্দায় এসে বসলেন একা। আজিমুদ্দিনের মমির কথা ভাবছিলেন তিনি। হতভাগ্য বালক! তার নির্বোধ জায়গিরদার পিতা ভদ্রলোক যদি না অত্যাশ্চর্য বহুমূল্য রত্ন তার কবরে রাখতেন, তার মৃতদেহের এই অসম্মান ঘটত না! না জানি কত স্নেহে লালিত হয়েছিল ওই বালক! জীবিত অবস্থায় তার গায়ে এতটুকু আঘাত করার ক্ষমতা কারও ছিল না। মৃত্যুর পর তার মাথাটাই কাটা গেল! মানুষের লোভ এত পৈশাচিক হতে পারে যে মৃতদেহেও আঘাতে তার হাত কাঁপে না।

কর্নেল মনশ্চক্ষে বালক আজিমুদ্দিনকে দেখছিলেন। মন মমতায় কোমল হয়ে উঠছিল। কে জানে, কোন দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগে পাঁচশো বছর আগে ছেলেটি অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল। বয়স কত হতে পারে তার? কর্নেল মমিটা দেখে অনুমান করেছেন, দশ থেকে বারো বছরের বেশি নয়। বাকসোর গায়ে সে কথা লেখাও আছে বটে।

হ্যাঁ, ঠিক এমনি এক বালকের মমিকরা মৃতদেহ নিয়ে গত শতাব্দীতে বিশ্বজুড়ে হইচই উঠেছিল। মিশরের কিশোর ফারাও তুতেনখামেনের মমি। আশ্চর্য, তুতেনখামেনের মমির

অভিশাপের কথা ইতিহাসে লেখা আছে। যাঁরা তুতেনখামেনের কবর খুঁড়ে তার মমি আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁরা একে একে সবাই রহস্যময়ভাবে মারা পড়েন।

আজিমুদ্দিনের মমির কি তেমন কোনও অভিশাপ আছে?

'জরুর!'

কর্নেল চমকে উঠে তাকালেন। সবিস্ময়ে দেখলেন, কখন সেই কালো আলখেল্লা পরা ফকির এসে বাংলোর বারান্দায় তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ফকির কি অলৌকিক শক্তিধর? জাদুকর সে? সে কি অদৃশ্য থেকে দৃশ্য হতে পারে?

আর কর্নেলের মনের কথাই বা জানতে পারল কী ভাবে? কর্নেল অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন—'আসুন ফকির সাহেব! আপনার সঙ্গে দেখা করব বলেই আমি এখনও এখানে রয়ে গেছি।'

ফকির মৃদু হেসে বলল—'বেটা তুমি শোচ করছিলে কী, আজিমুদ্দিনের লাশে কোন লানৎ (অভিশাপ) আছে কি না। তাই তো?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কি মনের কথা বুঝতে পারেন ফকির সায়েব?'

'বেটা! মানুষের মনের কথা তার মুখে ফুটে ওঠে।'

'বসুন ফকির সায়েব। আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।'

'কথা আমারও আছে। তবে এখানে নয়, ঘরে চলো। গোপনে বলব।'

দুজনে ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

ফকির কিছুক্ষণ চোখ বুজে কী যেন ভাবতে থাকল। কর্নেল তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ফকির চোখ খুলল। এদিক ওদিক তাকিয়ে চাপা গলায় বলল—'আমি সংসারবিরাগী ফকির। ধনের লোভ আমার নেই, বেটা। যারা আজিমুদ্দিনের লাশের মাথা কেটেছে, তাদের শাস্তি খোদা দেবেন। বললুম না? আজিমুদ্দিনের আত্মার অভিশাপ লাগবেই তাদের। তাই তোমাদের বলি, যদি অভিশাপ থেকে বাঁচতে চাও, বাকসোটা ফেরত দাও। কবরের মধ্যে রেখে এস।'

কর্নেল চমকে উঠে বললেন—'বাকসোটা আমাদের কাছে আছে, কে বলল আপনাকে?'

ফকির হাসল। 'আমি জানি। মিথ্যা বলে লাভ নেই বেটা।'

কর্নেল কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বললেন—'ঠিক আছে। বাকসো ফের কবরে রাখা হবে। কিন্তু আজিমুদ্দিনের কাটা মাথার হদিশ জানতে চাই। আপনি আমার সাহায্য করুন তাহলে।'

ফকির বলল—'জরুর। বলো, কী সাহায্য চাও?'

'আপনি কোন কোন লোককে এ পর্যন্ত আজিমুদ্দিনের কবরের ওই বাকসো এবং তার চাবির কথা বলেছেন? আগে এসব কথা জানতে চাই।'

ফকির অনুশোচনার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল একটুখানি। তারপর উর্দুমেশানো বাংলায় যা বলল, তা হল এই :

কমলাক্ষবাবু কোনও ইংরেজি কেতাবে জায়গিরদার ও তার অকালমৃত ছেলের কাহিনি পড়েছিলেন। এই ফকির বংশানুক্রমে এলাকার ইতিহাস জানে। তাই কমলাক্ষ বারবার তার কাছে এসে কবরের হদিশ জানতে চাইতেন। তিনি বলতেন—এলাকার পুরাকীর্তি এবং প্রত্নদ্রব্য সংরক্ষণ করাই তাঁর ব্রত—যাতে ওগুলো ধ্বংস না হয়ে যায়। ফকিরের পা ছুঁয়ে তিনি প্রতিজ্ঞাও করেছিলেন, গুপ্ত কবরের খোঁজ দিলে সেখানে সরকারি সাহায্যে একটা দরগা বানিয়ে দেবেন এবং ফকিরকেই তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেবেন।

শেষপর্যন্ত ফকির তাঁর কথায় রাজি হয়ে গুপ্ত কবরের হদিশ দিয়েছিল। কিন্তু কমলাক্ষের মনে যে এমন শয়তানি লোভ আছে, ভাবেনি।

একথা শোনার পর কর্নেল জিগ্যেস করলেন—'কমলাক্ষবাবু ছাড়া আর কাকেও কি গুপ্ত কবরের কথা বলেননি ফকিরসায়েব? মনে করে দেখুন তো?'

ফকির চোখ বুজে ভাবতে থাকল। তারপর সে নড়ে বসল। বলল—'না, আর কাকেও বলিনি। তবে ...'

'তবে?' বলে কর্নেল আগ্রহের সঙ্গে তার দিকে তাকালেন।

ফকির বলল—'আমার মনে হচ্ছে, আরেকজনের পক্ষে ব্যাপারটা জানা সম্ভব।'

'কে? কে সে?'

'সেই জায়গিদারের বংশধর বলে দাবি করে একটা লোক। তার নাম লতিফ খাঁ।'

'কোথায় থাকে সে?'

'লিটনগঞ্জেই। লোকটা হেকিমি চিকিৎসা করে। তোপখানার কাছে তার হেকিমি দাওয়াখানা আছে। লোকটা কিন্তু পাজির পাঝাড়া। যেমনি তিরিক্ষি মেজাজ, তেমনি কুচুটে। আমার সঙ্গে তার বনিবনা নেই।'

কর্নেল বললেন—'ঠিক আছে। আপনি ভাববেন না ফকির সাহেব। বাকসোটা আমরা কবরেই ফেরত দেব এবং ওখনে যাতে স্থায়ী রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা হয়, কেন্দ্রীয় সরকারের পুরাতত্ত্ব দফতরকে সেজন্য অনুরোধ জানাব। তবে তার আগে আমি মমিমুণ্ডটা উদ্ধার করতে চাই।'

ফকির হাত তুলে বলল—'খোদার দয়ায় তুমি সফল হও বেটা।'

তারপর সে দ্রুত উঠে দাঁড়াল এবং বেরিয়ে গেল। কর্নেল তার পিছনে-পিছনে বেরুলেন। কিন্তু বেরিয়েই হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ফকিরকে দেখতে পেলেন না। এ ফকির কি সত্যি অলৌকিক শক্তিধর কোনও সিদ্ধপুরুষ? কর্নেল ভারী একটা নিশ্বাস ফেলে ভাবলেন—মানুষ এই বিস্ময়কর বিশ্বের কতটুকুই বা জানতে পেরেছে? কত আশ্চর্য শক্তি বিজ্ঞানের আয়ত্তের বাইরে তো এখনও রয়ে গেছে! ...

কলকাতা থেকে দুঃসংবাদ

কর্নেলের গোয়েন্দাগিরি ছাড়াও এক বিচিত্র নেশা আছে। পাখি, প্রজাপতি বা পোকামাকড়ের জীবন সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল অসামান্য। দুপুরে খাওয়ার পর রোদ্দুরে লনে চেয়ার পেতে বসেছিলেন, হঠাৎ নদীর ধারে কোনও গাছ থেকে কী একটা পাখির ডাক শুনে নড়ে বসলেন।

তারপর ঘর থেকে তক্ষুনি বাইনোকুলারটা এনে চোখে রেখে পাখিটাকে খুঁজতে থাকলেন।

হ্যাঁ, ওই তো গাবগাছের ডালে ছোট্ট রঙিন পাখিটা মনের সুখে গান গাইছে।

কর্নেল একটু অবাক হলেন। এমন পাখি তো এর আগে কখনও দেখেননি। কেতাবে পড়েছিলেন বটে। এই দুর্লভ প্রজাতির পাখির একটা ছবি তুলে রাখা দরকার। দৌড়ে ঘরে গেলেন ফের ক্যামেরা আনতে।

কিন্তু সেই সময় ফোন বেজে উঠল ক্রিরিরিরিরিং! ক্রিরিরিরিরিং।

কী আপদ! বিরক্ত হয়ে ফোন তুলে বললেন—'হ্যালো! কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি।'

এক্সচেঞ্জ অফিস থেকে সাড়া এল—'ধরুন। কলকাতা থেকে ট্রাঙ্ককল আছে।'

কর্নেল সঙ্গে সঙ্গে পাখির কথা ভুলে গেলেন। শংকর ছাড়া আর কে ফোন করবে কলকাতা থেকে? কোনও গণ্ডগোল হয়নি তো?

একটু পরে শংকরের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'কর্নেল! কর্নেল! যা বলছিলেন, তাই হয়েছে! বাকসো উধাও!'

কর্নেল চমকে উঠে বললেন—'সে কী!'

'হ্যাঁ কর্নেল! এইমাত্র পৌঁছে আবিষ্কার করলুম, দেয়ালের ছবিটা সরিয়ে কে গুপ্ত আলমারি থেকে বাকসোটা হাতিয়েছে। হারাধন কান্নাকাটি করছে। সে কিছু জানে না।'

'হুম্। বাড়ি থেকে তোমার কোনও লোক উধাও হয়নি তো?'

'হ্যাঁ হয়েছে। বাজার সরকার মদনবাবু থলে হাতে সকালে বাজার করতে গিয়েছিলেন, আর ফেরেননি। এখন বেলা প্রায় দুটো বাজে।'

'পুলিশকে জানিয়েছ নাকি?'

'না। এই তো সবে ঘরে ঢুকে সব দেখে তারপর আপনাকে ফোন করছি।'

'ঠিক আছে।' তুমি লোকাল থানায় খবর দাও। তবে বাকসোর কথা বলো না। বলো যে টাকাকড়ি চুরি করে ভদ্রলোক কেটে পড়েছেন। একটা ফোটো আছে কি মদনবাবুর?'

'আছে। বাবার মৃত্যুর সময় গ্রুপ ফোটো তোলা হয়েছিল। তার মধ্যে...'

'ভালো। ফোটোটা পুলিশকে দাও।'

'কিন্তু ন্যাড়াকে তাহলে হয়তো আর বাঁচানো যাবে না কর্নেল!'

'ভেব না শংকর। বরং বাকসোটা যখন ওরা মদনবাবুর সাহায্যে হাতিয়েছে, তখন ন্যাড়াকে ধরে রাখার দরকার হবে না। দেখবে, ওকে ওরা ছেড়ে দেবে। এসব ক্ষেত্রে খুনখারাপি করলে ওদেরই বিপদের ঝুঁকি আছে। কাজেই নিশ্চিন্ত থাকো।'

'আপনি শিগগির চলে আসুন, কর্নেল! বাকসোটা ...'

'বাকসো যদি কমলাক্ষ হাতিয়ে থাকেন, আমার কলকাতা ফেরার দরকার দেখি না। বরং তুমিই চলে এস লিটনগঞ্জে।'

'বাপ্‌স্। আবার একশো কিলোমিটার মোটরজার্নি?'

'পারবে না?'

এক মুহূর্ত পরে শংকর বললেন—'ঠিক আছে। পারব।'

'পেটপুরে খেয়ে তবে বেরিও কিন্তু। তার আগে থানায় খবরটা দাও।'

'আচ্ছা। ছাড়ছি!'

'আচ্ছা।'

কর্নেল ফোন রেখে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেল পাখিটার কথা। অমনি ক্যামেরা আর বাইনোকুলার নিয়ে দৌড়ে বেরুলেন।

চৌকিদার তার ঘরের বারান্দা থেকে বুড়ো কর্নেলকে ওইভাবে দৌড়তে দেখে হকচকিয়ে উঠেছিল।

কিন্তু কর্নেল নদীর ধারে গাবগাছের নিচে দাঁড়িয়ে ক্যামেরা তাক করছেন দেখে সে আপন মনে হাসতে লাগল। এই বুড়োসাহেব বড্ড খামখেয়ালি মানুষ!

ওদিকে শাটার টেপার আগেই পাখিটা ফুড়ুৎ করে উড়ে চোখের আড়ালে কোথায় উধাও। কর্নেল অপ্রস্তুত।

বাইনোকুলার চোখে রেখে তন্নতন্ন খুঁজেও আর দেখতে পেলেন না। দুঃখিত মনে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর আনমনে একটা চুরুট ধরালেন।

তারপর গাছের তলায় বসে চুরুটটা টানতে থাকলেন। নিচে নদীর বুকে কোথাও সোনালি বালির চড়া পড়েছে। কোথাও স্বচ্ছ নীল জল তিরতির করে বয়ে যাচ্ছে। জায়গাটার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুলনীয়। কর্নেলের চোখ প্রকৃতির দিকে, কিন্তু কান পাখপাখালির ডাক শুনছে। তন্ময় হয়ে রয়েছে। মনে ক্ষীণ আশা, সেই ছোট্ট সুন্দর পাখিটা আবার যদি ডেকে ওঠে!

হেকিমি দাওয়াই ও খুনখারাপি

হ্যাঁ, আবার পাখিটা ডেকে উঠল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে। প্রকৃতি যাকে কণ্ঠস্বর দিয়েছে, সে কি গান না গেয়ে পারে? কর্নেল কান পাতলেন। এবার কিন্তু ডাকটা ভেসে আসছে অনেক দূর থেকে।

কতক্ষণ ঠাহর করার পর বুঝলেন, কখন পাখিটা নদী পেরিয়ে ওপারে চলে গেছে। ওপারে ঘন বাঁশবন। বাঁশবনের ভেতর সে নিরিবিলিতে মনের সুখে গান ধরেছে।

কর্নেল বাইনোকুলার চোখে রেখে নদীতে নামলেন। এসব সময় তাঁর পা কোথায় পড়ছে, খেয়াল থাকে না। জায়গায় জায়গায় সোনালি বালির চড়া, আবার কোথাও ঝিরঝিরে কাজল জলের স্রোত। কোথাও আবার ডোবার মতো জল জমে রয়েছে। আচমকা কর্নেল তেমনি একটি ডোবামতো জায়গায় হুড়মুড় করে পড়লেন। কোমর অব্দি ডুবে গেল।

এই শীতের ঋতুতে ব্যাপারটা আরামদায়ক নয় মোটেও। ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে উঠে পড়লেন বটে, কিন্তু চোখে বাইনোকুলারটা রয়ে গেল।

এমনি করে ওপারে পৌঁছে কাঁটাঝোপের ভেতর দিয়ে বাঁশবনে গিয়ে ঢুকলেন। তারপর ক্যামেরা তাক করে পাখিটার ছবি তুললেন। পরপর কয়েকটা।

তারপরই পাখিটা যেন টের পেল, তার ছবি তোলা হচ্ছে। অমনি সে ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল বাঁশবনের ওপর দিয়ে। তাকে লক্ষ করতে গিয়ে কর্নেলের চোখে পড়ল, একটু তফাতে ঝোপের মধ্যে এইমাত্র কেউ হেঁট হল। তার মাথার একটা কিম্ভুত গড়নের ছুঁচলো টুপি রয়েছে। টুপি পরে ঝোপের মধ্যে হেঁট হওয়াটা স্বাভাবিক ব্যাপার মোটেও নয়। তাই কর্নেল পা টিপে টিপে বাঁশবনের ভেতর ঝোপঝাড়ের আড়ালে চলতে থাকলেন।

ভেজা প্যান্ট শার্ট কোর্টে কোমর অব্দি হিমে জমে অবশ হয়ে গেছে। কিন্তু কর্নেল এ বয়সেও হাড়ে প্রচুর তাকত রাখেন। গ্রাহ্য করলেন না।

বাঁশবনের শেষে একটা আগাছার জঙ্গল। তার ওপাশটা মুসলিমদের গোরস্থান বলে মনে হল। একটা উঁচু ও চওড়া ঝোপের পাশে উঁকি মেরে বসে পড়ে কর্নেল।

একটা ঢ্যাঙা রোগা গড়নের লোক হাঁটু দুমড়ে বসে একটা কিছু করছে। তার মাথার ছুঁচোলো টুপিটার মতোই চেহারাও বিদঘুটে। যেন হাড়গিলে শকুন। নাকটা বেজায় লম্বা! গাল বলতে কিছু নেই। চিবুক থেকে লম্বা এক চিলতে ছাগল দাড়ি এসে বুকে নেমেছে। তার পরনে ময়লা জোকারের মতো জামা আর চুস্ত পাজামা। পায়ে নাগরা জুতো। কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলছে।

দু হাতে একটা খুরপি ধরে সে মাটি কোপাচ্ছে।

কর্নেল সামান্য একটু মাথা উঁচু করে যা দেখলেন, তাতে যত অবাক হলেন, তত আতঙ্কে শিউরেও উঠলেন।

লোকটা যেখানটায় কোপাচ্ছে, সেখানটা একটা মাটির কবরের অংশ। কবরটা গ্রামের কোনও সাধারণ মানুষেরই কবর। তত বেশি পুরোনো নয়। কবর খুঁড়ছে কেন লোকটা? ও কি কঙ্কালটা চুরি করতে চায়? কঙ্কাল বিক্রি হয় গোপনে। চিকিৎসাবিদ্যার প্রয়োজনে কঙ্কাল লাগে। চোরাবাজারে তাই দেশবিদেশের কঙ্কাল বিক্রি হয় মোটা টাকায়।

এরপর লোকটা বসে পড়ল। কর্নেল শুধু তার মাথার পেছনটা আর কাঁধের কিছু অংশ দেখতে পাচ্ছিলেন। সে কী করছে পুরোটা দেখতে গেলে অনেকটা ঘুরে ওপাশে যেতে হয়। কিন্তু তা করতে গেলে তার চোখে পড়ার সম্ভাবনা।

একটু পরে লোকটা উঠে দাঁড়াল।

তার হাতে একটা বাঁকাচোরা শেকড় দেখতে পেলেন কর্নেল। তখন কর্নেল মনে মনে হেসে ফেললেন।

না, লোকটা কঙ্কাল চুরি করছিল না। নেহাত একটা গাছের শেকড় সংগ্রহ করছিল। গাছটা কবরে গজিয়েছিল নিশ্চয়।

হুম্, এই লোকটাই তাহলে লিটনগঞ্জের সেই হেকিম লতিফ খাঁ নয় তো? কর্নেল চমকে উঠে দেখলেন, সর্বনাশ! লোকটা হন হন করে তার ঝোপটার দিকেই এগিয়ে আসছে যে!

সরে পড়ার ফুরসত পেলেন না কর্নেল। সে ঝোপ ঠেলে হুড়মুড় করে এসে একেবারে তার গায়ের ওপর পড়ল এবং ভয়ে কিংবা রাগে চেঁচিয়ে উঠল—'অ্যাই বাপ!'

কর্নেল অপ্রস্তুত হেসে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আদাব ঠুকে সসম্ভ্রমে বললেন—'সেলাম হেকিমসাহেব! সেলাম, বহুৎ সেলাম!'

হ্যাঁ লোকটা হেকিম লতিফ খাঁ-ই বটে। ভুরু কুঁচকে বলল—'আপনি কে আছেন? এই জঙ্গলে কী করছেন?'

কর্নেল বাইনোকুলার ও ক্যামেরা দেখিয়ে বিনীতভাবে বললেন—আমি পাখপাখালির ছবি তুলতে বেরিয়েছি হেকিমসাহেব। ওই ডালে একটা পাখি বসে ছিল। তার ছবি তুলছিলাম। আপনি তো বুঝতেই পারছেন, পাখির ছবি তুলতে হলে চুপিচুপি এইভাবে গা ঢাকা দিয়ে বসতে হয়।'

হেকিম এবার দাঁত বের করে হাসল। 'হাঁ, হাঁ। আপনারা ইউরোপিয়ান সাহাব আদমির এইসা খ্যাল আছে বটে। একবার এক সাহাবলোক এসে ঠিক এমনি করে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। হামি দেখেছে। তবে আপকা মাফিক বাংলা বোলি সে বলতে পারত না।'

কর্নেল বুঝলেন, তাঁর চেহারা দেখে হেকিম খাঁটি ইউরোপবাসী বলে ভুল করেছে। এটা স্বাভাবিক। এ ভুল তাকে দেখে সবাই করে। যাই হোক, এ সুযোগে তিনি ইউরোপীয় হয়ে গেলেই মঙ্গল। বললেন—'জি হাঁ হেকিমসায়েব। আমি বাংলা মুল্লুকে অনেক বছর আছি কিনা। তবে উর্দুও বলতে পারি।'

এরপর দুর্জন উর্দুভাষায় কথা বলতে বলতে নদীতে নামলেন। সে-সব কথাবার্তা হল এই :

'আমি যে হেকিম, তা কীভাবে বুঝলেন?'

'কেন? আপনার হাতে গাছের শেকড় আর ওই খুরপি।'

'ঠিক, ঠিক।'

'তাছাড়া এখানে এসে আপনার কত নাম শুনেছি। আপনার দাওয়াই খেলে মড়াও নাকি উঠে বসে।'

'তা মা বাবা আর খোদার দয়ায় ওকাজটা আমি ভালোই পারি।'

'দেখুন হেকিমসায়েব, আমার কোমরে প্রায়ই খুব ব্যথা হয়। দাওয়াই দেবেন?'

'নিশ্চয় দেব। ওই তো আমার কাজ। তবে আমার দাওয়া-খানায় যেতে হবে।'

'তাই যাব। তবে দয়া করে আসুন, ওই বাংলোয় আমি যাচ্ছি। একটু চা খেয়ে যাবেন।'

'বেশ তো চলুন।'

নদী পেরিয়ে দুজনে বাংলোয় পৌঁছলেন। কর্নেল চৌকিদারকে চায়ের আদেশ দিলেন। তারপর ঘরে ঢুকে মুখোমুখি বসলেন।

ফকির বলেছিল, হেকিম লতিফ খাঁ বদমেজাজি লোক। কিন্তু তাকে মোটেও তেমন মনে হল না কর্নেলের। লোকটি যে ভদ্রবংশীয় তা তার আদবকায়দা আর কথার ভঙ্গিতেই বোঝা যাচ্ছে।

কথায়-কথায় কর্নেল একসময় বলল—'আচ্ছা হেকিমসায়েব, শুনেছি এখানে নাকি এক মস্তো জায়গিরদার ছিলেন। আপনি তারই বংশধর?'

লতিফ খাঁ মাথা উঁচু করে বলল—'আপনি ঠিকই শুনেছেন।'

'আচ্ছা খাঁ-সাহেব, ইতিহাসের কেতাবে পড়েছিলাম এখানে আপনার পূর্বপুরুষদের আমলে কেউ মারা গেলে তার মৃতদেহ মমি করা হত। তা কি সত্যি?'

হেকিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—'কিছুটা সত্যি। আপনি বিদেশি। আজ আছেন, কাল নেই। তাই সে গোপন কাহিনি আপনাকে বলছি।'

বলে হেকিম লতিফ খাঁ এই কাহিনি শোনাল :

আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগের কথা। জায়গিরদার মুইনুদ্দিন শাহ আল-তমাসের মনে সুখ ছিল না। কারণ তাঁর কোনও পুত্রসন্তান নেই। তাই তিনি আরব ও পারস্যের নানা মুসলিম তীর্থে ফকির ও অলৌকিক শক্তিধর সাধকের কাছে পুত্র কামনায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। অবশেষে খোঁজ পেলেন, মিশরদেশের এক সাধক আজম শাহের কাছে গেলে তার মনস্কামনা পূর্ণ হতে পারে।

মুইনুদ্দিন তখনই মিশরে গিয়ে সেই সাধকের শরণাপন্ন হলেন। অনেক কাকুতি-মিনতির পর আজম শাহ বললেন—'ঠিক আছে। আজ রাতদুপুরে তুমি আমার আস্তানায় একা এসো। তোমাকে আমি একটা অত্যাশ্চর্য জিনিস দেব। সেটা নিয়ে গিয়ে তুমি ও তোমার স্ত্রী ধুয়ে জল খাবে। তাহলে তোমাদের পুত্রলাভ হবে। কিন্তু সাবধান, এই জিনিসটি অপার্থিব একটি রত্নবিশেষ। একটি কৃষ্ণবর্ণ ধাতুনির্মিত ছোট পেটিকার মধ্যে এটা রেখে দেবে। আর দেখ মানুষ মরণশীল প্রাণী। তোমার পুত্রও একদিন মারা যাবে। তার যখনই মৃত্যু হোক, তার কবরের মধ্যে ওই রত্নসমন্বিত পেটিকাটিও অবশ্য সমাহিত করতে হবে। নতুবা সাংঘাতিক বিপদ ঘটবে।'

মুইনুদ্দিন সেই অত্যাশ্চর্য কৃষ্ণবর্ণ রত্নপেটিকা নিয়ে দেশে ফিরলেন। সাধক তাকে পেটিকার চাবি দিয়েছিলেন। চাবির সাহায্যে পেটিকা খুলে রত্নটি বের করে ধুয়ে স্বামী-স্ত্রী মিলে সেই জল পান করলেন।

পরবৎসর তাঁর পুত্রলাভ হল। সাধকের নাম অনুসারে তার নাম রাখলেন আজিমুদ্দিন।

কিন্তু দুঃখের কথা, বারো বছর বয়সে সেই সুন্দর ছেলেটি এক অজ্ঞাত ব্যাধিতে মারা পড়ল। শোকে ভেঙে পড়লেন মুইনুদ্দিন।

তিনি মিশরে গিয়ে ওইসময় একজন কারিগরের খোঁজ পেয়েছিলেন—যে মৃতদেহ মমি করতে জানত। তাকে তিনি খেয়ালবশে সঙ্গে করে এনেছিলেন।

আজিমুদ্দিনের মৃতদেহ মমি করার ইচ্ছা হল হতভাগ্য পিতার। মিশরবাসী সেই লোকটি তাঁর আদেশ পালন করল। কিন্তু সাধক আজমশাহের নির্দেশে সেই রত্নপেটিকা কবরে রাখতে হবে। সাধারণ কবরে রাখলে তা চুরি যাবার আশঙ্কা ছিল। কারণ এই আজব পেটিকা ও রত্নের কথা ততদিনে রটে গিয়েছিল।

তাই ভূগর্ভে গোপন কবর দেওয়া হল আজিমুদ্দিনকে। রত্নপেটিকাটিও তার কবরের মধ্যে রাখা হল।....

হেকিম লতিফ খাঁ চুপ করলে কর্নেল বললেন—'তারপর?'

'আর কী?'

'সেই গুপ্ত কবরের সন্ধান। নিশ্চয় আপনি রাখেন?'

মুহূর্তে হেকিমের মেজাজ বদলে গেল। বিকৃতমুখে বললেন—'না। আপনাকে যে কাহিনি বললুম, তা আমার বাবার কাছে শোনা। কিন্তু এই গাঁজাখুরি গল্পে আমার একটুও বিশ্বাস নেই।'

চৌকিদার ইতিমধ্যে চা এনে দিয়েছিল। হেকিম চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে তেমনি বিকৃতমুখে হেসে ফের বলল—'দয়া করে এ সম্পর্কে আমায় আর কোনও প্রশ্ন করবেন না সায়েব! যদি কোমরের বেমারির দাওয়াই চান, আমার সঙ্গে আসতে পারেন।'

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন—'এক ভদ্রলোক দেখা করতে আসবেন। তাই এখন যাওয়ার অসুবিধা আছে। সন্ধ্যায় যাবখন।'

'আচ্ছা আদাব।' বলে হেকিম লতিফ খাঁ বেরিয়ে গেল।

কর্নেল অবাক হয়ে বসে রইলেন। মমি করার ব্যাপারটা হেকিম কিছুটা সত্যি বলে স্বীকার করল। কিন্তু বাকিটা গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দিল কেন?

অথচ আজিমুদ্দিনের কবরে সত্যি একটা অদ্ভুত ধাতুতে তৈরি কালো পেটিকা পাওয়া গেছে এবং সেটা কর্নেল স্বচক্ষে দেখেছেন। কর্নেল আগাগোড়া ব্যাপারটা ভাবতে থাকলেন। ঘণ্টা দুই পরে ফোন বাজল। কর্নেল ফোন তুলে বললেন—'হ্যালো। কর্নেল বলছি।'

'কর্নেল, আমি অজিতেশ।'

'কী খবর ডার্লিং?'

'খবর সাংঘাতিক! একটু আগে তোপখানার কাছে পোড়ো একটা বাড়িতে একটা লাশ পাওয়া গেছে। টাটকা খুন। তাকে ছোরা মেরে পালিয়েছে কেউ। নিহত লোকটা...'

'কে, কে অজিতেশ?'

'শংকরবাবুর সেই বাজার সরকার। কারণ তার পকেটে তার নাম ঠিকানা লেখা একটা পোস্টকার্ড পাওয়া গেছে। ঠিকানায় কেয়ার অফ শংকরবাবুর নাম রয়েছে।'

'আমি যাচ্ছি!' বলে কর্নেল ফোন রেখে দিলেন।

গোরস্তানে অভিযান

তোপখানার এদিকটায় মুসলমানপাড়া। এলাকা জুড়ে প্রাচীন ঐতিহাসিক ধ্বংসস্তূপ ছড়িয়ে রয়েছে। সেইসব ধ্বংসস্তূপে আগাছার জঙ্গলও গজিয়েছে। একপাশে মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা আর কয়েকটা ল্যাম্পপোস্ট দূরে দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শীতের বেলা ফুরিয়ে গেছে। বাতি জ্বলেছে সবে। কর্নেল ওই রাস্তায় ভিড় দেখতে পাচ্ছিলেন। একদঙ্গল পুলিশ সেই ভিড় ঠেকিয়ে রেখেছে। পুলিশের জিপ, ভ্যান আর একটা অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

অজিতেশ কর্নেলকে দেখে এগিয়ে এলেন। কর্নেল বললেন—'লাশ কোথায়?'

'ওই যে, ওখানে পোড়োবাড়ির মধ্যে।'

বলে অজিতেশ কর্নেলকে নিয়ে রাস্তার পাশে আগাছার জঙ্গল ঠেলে ঢুকলেন। পোড়ো বাড়িটা আসলে কোনও একটা নবাবি অতিথিশালার একটা অংশ। ভেঙেচুরে একাকার। শুধু একটা ঘর কোনওক্রমে টিকে আছে। একটা হ্যাসাগ রাখা হয়েছে লাশের কাছে। লাশটা সেই ঘরের মেঝেয় উপুড় হয়ে পড়ে আছে। পিঠে কাঁধের কাছে একটা ছোরা তখনও বিঁধে রয়েছে। তাই বেশি রক্ত বেরুতে পারেনি।

হাসপাতালের ডাক্তারবাবু পুলিশ সুপারের নির্দেশের অপেক্ষা করছিলেন। ইশারা পেয়ে ছোরাটা টেনে বের করলেন। এক ঝলক জমাট রক্ত বেরিয়ে এল। কর্নেল মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

আরও সব পুলিশ অফিসার লাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তারা ততক্ষণে মোটামুটি তদন্ত করে ফেলেছেন ঘটনাটার। কিন্তু কর্নেলের ব্যাপার-স্যাপার অন্যরকম।

কর্নেল হেঁট হয়ে ঘরের মেঝে পরীক্ষা করতে থাকলেন। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এলেন। বারান্দা থেকে উঠোনে টর্চের আলো ফেলে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করলেন। পুলিশ অফিসাররা তাই দেখে বাঁকা মুখে হেসে পরস্পর তাকাতাকি করছিলেন। এ বুড়ো আবার কে—বেমক্কা নাক গলাতে এসেছে এবং পুলিশ সুপার তাকে এত খাতির করছেন!

কর্নেল উঠোনের কোনা থেকে কী একটা কুড়িয়ে পকেটে রাখলেন।

ওদিকে লাশ ধরাধরি করে হাসপাতালের লোকেরা অ্যাম্বুলেন্সে তুলল। মর্গে নিয়ে গিয়ে পোস্টমর্টেম করা হবে। ডাক্তারবাবুও চলে গেলেন।

অজিতেশ এতক্ষণে কর্নেলের কাছে এসে বললেন—'কী বুঝলেন কর্নেল?'

কর্নেল বললেন—'আপাতদৃষ্টে মনে হচ্ছে, মদনবাবু কারুর কথামতো সেই কালো বাকসোটা কলকাতা থেকে এনে এই পোড়ো বাড়িতে অপেক্ষা করছিলেন। আচমকা তাঁকে পিছন থেকে ছোরা মেরে খুনি বাকসোটা নিয়ে ভেগেছে। ছোরাটা তুলে নেওয়ার সময় পায়নি বলেই মনে হচ্ছে।'

'কেন সময় পায়নি, অনুমান করতে পারছেন?'

'সম্ভবত কেউ এসে পড়েছিল।'

'কোনও সূত্র খুঁজে পেলেন কি কর্নেল?'

'কিছু পেয়েছি বইকি।' বলে কর্নেল একটু হাসলেন।

'বলতে আপত্তি আছে?'

কর্নেল বললেন—'তোমায় বলতে আপত্তি কীসের? প্রথম সূত্র—ঘরের ভেতর ভাঙা কড়িকাঠ স্তূপের আড়ালে সুরকির গুঁড়োয় জুতোর ছাপ আছে দেখলুম। কেউ মদনবাবুর জন্যে আগে থেকেই ওখানে লুকিয়ে অপেক্ষা করছিল। তবে সে ছোরা মারেনি। যে মেরেছে, সে বাইরে থেকে আচমকা ঢুকে মেরেছে এবং সম্ভবত এক-ঝটকায় মদনবাবুর ব্যাগটা হাতিয়ে নিয়ে পালিয়েছে।'

বলে কর্নেল পকেট থেকে একটুকরো বাঁকাচোরা শেকড় বের করলেন।

অজিতেশ অবাক হয়ে বললেন—'ওটা কী? কোথায় পেলেন?'

'উঠোনের কোনায়। খুনি পালাবার সময় এটা তার হাত থেকে পড়ে গেছে।'

'ওটা একটা শেকড় না?'

'হ্যাঁ শেকড়। আর এই দ্যাখো, এতে একটু রক্ত লেগে রয়েছে।'

অজিতেশ অবাক হয়ে বলল—'খুনির হাতে এই শেকড় ছিল? কেন?'

কর্নেল একটু হেসে বলল—'অজিতেশ! খুনি কে আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তাকে সম্ভবত এখন বাড়িতে পাওয়া যাবে না। তবু চেষ্টা করতে দোষ কী?'

অজিতেশ ব্যস্তভাবে বললেন—'দোহাই কর্নেল! দয়া করে আর হেঁয়ালি করবেন না। বলুন, কে সে? এখনই তাকে গ্রেফতারের জন্য পুলিশবাহিনী পাঠাব।'

কর্নেল আনমনে বললেন—'আমারই বুদ্ধির ভুল! আঃ তখনই যদি....'

'কর্নেল! আবার হেঁয়ালি করছেন আপনি!'

কর্নেল স্থিরদৃষ্টে পুলিশ সুপারের দিকে তাকিয়ে বললেন—অজিতেশ! জনা চার-পাঁচ বুদ্ধিমান এবং অভিজ্ঞ অফিসার নিয়ে তুমি এখনই আমার সঙ্গে এস। আমার ধারণা, বড্ড দেরি হয়ে গেছে! তবু চেষ্টা করতে দোষ কী?'

অজিতেশ তক্ষুনি পুলিশ অফিসারদের ডেকে জিপে উঠতে বললেন। তারপর কর্নেলকে ডেকে বললেন—'আমরা রেডি। চলে আসুন কর্নেল।'

কর্নেল জিপের সামনে অজিতেশের পাশে বসে বললেন—'সোজা আমার বাংলোয় চলো। ওখানে জিপ রেখে আমরা যথাস্থানে রওনা দেব।'

জিপ প্রচণ্ড বেগে ছুটল। আলো আর ভিড়েভরা বাজার এলাকা ছাড়িয়ে জিপ নদীর ধারে সরকারি বাংলোয় পৌঁছোল। কর্নেল বললেন—'সবাই আমার সঙ্গে আসুন। কোনও শব্দ করবেন না। টর্চ রেডি রাখুন। কেউ যেন গুলি ছুঁড়বেন না। সাবধান! যদি কেউ আক্রমণ করে, তাহলে অবশ্য ভিন্ন কথা। তবে কেউ আক্রমণ করবে বলে মনে হয় না!'

অজিতেশ ও পুলিশ অফিসাররা কর্নেলকে অনুসরণ করলেন।

কর্নেল অন্ধকারে নদীর দিকে হাঁটছিলেন। সেই গাবতলায় পৌঁছে একটু দাঁড়ালেন। তারপর ফিসফিস করে বললেন—'নদীর ওপারে যেতে হবে আমাদের। দেখবেন, কেউ যেন জলে না পড়েন।'

কুয়াশার মধ্যে মিটমিটে নক্ষত্রের আলো নদীর জলে কোথাও কোথাও ঝিকমিক করছে। সাবধানে বালির চড়া পেরিয়ে সবাই ওপারে পৌঁছলেন।

সামনে বাঁশবন নিঃঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে। বাঁশের পাতা থেকে শিশির পড়ার টুপটাপ শব্দ শোনা যাচ্ছে। একবার প্যাঁচা ডেকে উঠল বিশ্রী শব্দে। তারপর গোরস্থানের ওদিকে শেয়াল ডাকতে লাগল।

কর্নেল আগে, পুলিশ অফিসাররা পেছনে। কাঁটাঝোপে বারবার কাপড় আটকে যাচ্ছে। আছাড় খেতে হচ্ছে। শুকনো পাতা শিশিরে ভিজে গেছে বলে জুতোর শব্দ হচ্ছে না। কিছুটা চলার পর কর্নেল দাঁড়ালেন। কান পেতে কী যেন শোনার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু কোনও শব্দ শোনা গেল না। আবার কিছুটা এগিয়ে কর্নেল ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন—'রেডি! টর্চ জ্বালাতে হবে। ওয়ান টু থ্রি...'

সঙ্গে সঙ্গে সাতটা টর্চ জ্বলে উঠল।

সেই উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেল, জায়গাটা একটা গোরস্থান। আর সেখানে একদঙ্গল শেয়াল মাটি শুঁকছে একটা সদ্যখোঁড়া কবরের কাছে। তাদের চোখগুলো নীল।

হঠাৎ আলোয় তারা ভড়কে গিয়ে চোখের পলকে গা ঢাকা দিল। কর্নেল সদ্যখোঁড়া কবরটার কাছে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।

অজিতেশ বলে উঠল—'কী ব্যাপার কর্নেল? এর মাথামুণ্ডু কিছু যে বুঝতে পারছি না।'

কর্নেল মাটির কবরের গর্তে আলো ফেলে হতাশস্বরে বললেন—'দেরি হয়ে গেছে! আজিমুদ্দিনের মমি-মুণ্ডু এখানেই লুকিয়ে রেখেছিল সে। মদনবাবুকে খুন করে বাকসোটা হাতিয়ে সোজা এখানে এসেছিল। তারপর মমি-মুণ্ডুটা তুলে নিয়ে গোপন জায়গায় চলে গেছে। এতক্ষণে নিশ্চয় সে মুণ্ডু থেকে চাবি খুঁজে বের করেছে এবং বাকসো খুলে রত্নটিও পেয়ে গেছে।'

অজিতেশ উত্তেজিত ভাবে বললেন—'কর্নেল! কর্নেল! কী সব বলছেন আপনি? কার কথা বলছেন?'

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে জবাব দিতে যাচ্ছেন, হঠাৎ গোরস্থানের অন্যপ্রান্ত থেকে কার বিকট চিৎকার শোনা গেল—'ইয়া পির মুশকিল আসান! যাঁহা মুশকিল তাঁহা আসান!'

টর্চের আলো গিয়ে পড়ল ওদিকে। দেখা গেল সেই কালো আলখেল্লা ও কালো টুপিপরা ফকির হাসতে হাসতে এগিয়ে আসছে।

অজিতেশ অবাক হয়ে বললেন, 'আরে! এ তো দেখছি পিরের মাজারের সেই পাগলা ফকির! এ আবার এখানে জুটল কেন?'

কর্নেল বললেন—'চুপ্‌। ফকির কী বলে আগে শোনা যাক্‌।'

ফকির নির্ভয়ে গটগট করে চলে এল সামনে। তারপর বলল—'বাবালোক! সরকারের টর্চের ব্যাটারি কি খুব সস্তা হয়ে গেছে? না কি কোম্পানিকা মাল, দরিয়ামে ডাল! কর্নেলসাহাব! ওনাদের বলুন, বেফায়দা আলো জ্বেলে লাভ কী? এটা গোরস্থান। এখানে পিদিমের আলোই মানায়।'

বলে সে তার হাতের লণ্ঠনটি রেখে আলখেল্লার ভেতর থেকে দেশলাই বের করে জ্বালল। কর্নেল বললেন—'টর্চ নিভিয়ে ফেলুন আপনারা!'

তারপর ফকিরকে বললেন—'ফকির সায়েব! আপনার কথাই সত্যি হল। হেকিম লতিফ খাঁ সত্যি আজিমুদ্দিনের মুণ্ডু চুরি করে এনে এই কবরে লুকিয়ে রেখেছিল। তারপর ...'

বাধা দিয়ে ফকির বলল—'তারপর বাকসো চোরকে খুন করে বাকসোও হাতিয়েছে। এই তো?'

কর্নেল বললেন—'আপনি তাহলে সবই জানেন দেখছি!'

"বেটা আমি সর্বচর। সব জায়গায় ঘুরে বেড়াই। তো সেলাম পুলিশসায়েব! আপনিও এসেছেন দেখছি। লেকিন লতিফ খাঁকে আর ঢুঁড়ে বের করতে পারবেন? সে এখন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে!

অজিতেশ কী বলতে যাচ্ছিলেন, কর্নেল তাঁকে থামিয়ে বললেন— 'ফকিরসায়েব! আপনার অজানা কিছুই নেই। লতিফ খাঁ এখন কোথায়, আপনি নিশ্চয় জানেন!'

ফকিরের মুখ বিকৃত হয়ে গেল। সে বলল—'তাকে ধরে ফেলব বলে আমিও তার পিছু নিয়েছিলাম। কিন্তু ব্যাটা খুব ধূর্ত। অন্ধকারে ঘুরপথে এগিয়ে আমাকে বোকা বানিয়ে দিয়েছে। তবে যেখানেই লুকিয়ে বাকসো খুলে আজব মণি বের করুক, তাকে আমি পাকড়ে ফেলব।'

বলেই ফকির গতকাল সন্ধ্যার মতো আলখেল্লার ভেতর থেকে কী একটা বের করে লণ্ঠনের ওপর ছড়িয়ে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে দুর্গন্ধ: সাদা একরাশ ধোঁয়ায় সারা গোরস্থান ঢেকে গেল। কর্নেল চেঁচিয়ে উঠলেন—'সরে আসুন! সরে আসুন সবাই। বিষাক্ত গ্যাসে মারা পড়বেন।'

সবাই এক দৌড়ে অনেকটা তফাতে সরে গেলেন। একটু পরে ধোঁয়া মিলিয়ে গেলে টর্চের আলোয় দেখা গেল, গোরস্থান নির্জন। ফকির অদৃশ্য হয়েছে।

অজিতেশ গম্ভীর মুখে বললেন—'তাহলে কী করা যাবে কর্নেল?'

কর্নেল বললেন—'কিছু মাথায় আসছে না। লতিফ খাঁ হেকিমকে খুঁজে বের করা আর খড়ের গাদা থেকে হারানো ছুঁচ উদ্ধার করা একই ব্যাপার। বিশেষ করে এই রাত্রিবেলার অন্ধকারে এ কাজ অসম্ভব!'

'আমার অসহ্য লাগছে কর্নেল! ব্যাটা খুনি তো বটেই, তার ওপর আজিমুদ্দিনের কবরের বহুমূল্য রত্ন নিয়ে নির্বিবাদে ভেগে পড়বে?'

কর্নেল পা বাড়িয়ে বললেন—'সকাল হোক তারপর দেখা যাবে। বরং তুমি এ রাতে তোমার গোয়েন্দাবাহিনীকে কাজে লাগাও, অজিতেশ! যদি তারা কোনও হদিশ দৈবাৎ পেয়ে যায়, ভালোই।'

সবাই মিলে নদীর দিকে পা বাড়ালেন। নদী পেরিয়ে বাংলোয় পৌঁছে কর্নেল বললেন—'তাহলে এসো অজিতেশ। আমি বড্ড ক্লান্ত। বিশ্রাম করতে চাই।'

পুলিশ সুপার সদলবলে জিপে চেপে গেলেন।

কর্নেল গেট পেরিয়ে লনে পা বাড়াতেই দেখলেন, বারান্দায় শংকর বসে আছেন। কর্নেল বললেন—'শংকর যে! কখন এলে!'

'এইমাত্র। এসে তো সব শুনে ভীষণ ঘাবড়ে গেছি!'

'হ্যাঁ, তোমার বাজার সরকার ভদ্রলোক বেঘোরে খুন হয়ে গেছেন।'

'পাপের প্রতিফল, কী বলব? কিন্তু কর্নেল, শ্রীমান ন্যাড়ার জন্যে আর যে মন মানছে না! খালি মনে হচ্ছে, তাকে ওরা মেরে ফেলেছে। ওদিকে ওর বাবা-মার অবস্থা শোচনীয়। সব কথা খুলে বলিনি বটে, কিন্তু কতক্ষণ চেপে রাখব আর?'

কর্নেল চেয়ারে ধুপ করে বসে বললেন—'হ্যাঁ, বাকসো হাতছাড়া হয়ে গিয়ে কমলাক্ষ খেপে গেছে নিশ্চয়। কিন্তু না—আমার বিশ্বাস, ন্যাড়াবাবাজীবনকে সে মেরে ফেলবে না। কারণ তাতে তার আর এখন কোনও লাভই হবে না। তুমি ভেব না শংকর। বরং আমাকে ভাবতে দাও।...' বলে কর্নেল চোখ বুজে কী যেন ভাবতে থাকলেন।

ন্যাড়ার বাড়ি ফেরা

ন্যাড়া দুপুরবেলায় মাঝগাঙে বুড়ো জেলের নৌকোয় ইলিশ মাছের ঝোল দিয়ে মনের সুখে পেট ভরে ভাত খেয়েছে। বন্দিদশায় কি খেতে ভালো লাগে? তাই খিদেয় নাড়ি চোঁ চোঁ করছিল। তার ওপর টাটকা ধরা গঙ্গার ইলিশ।

ন্যাড়াকে দেখে বুড়ো জেলে আর তার জোয়ান ছেলের খুব মায়ামমতা জেগেছিল মনে। আহা, ভদ্দর লোকের সুন্দর ছেলেটা—বয়স কতই বা হয়েছে? দশ বারো বই নয়। তাকে কিনা ছেলে ধরা ডাকুরা চুরি করে এনেছিল। তবে বুড়ো জেলে হেসে খুন হয়েছিল।—খুব নবডংকাটি দেখিয়ে কেটে পড়েছে বাবা। ওরা যেমন বুনো ওল, তুমি তেমনি বাঘা তেঁতুল! এবারে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। চলো, তোমায় আমরা স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসি। রেলগাড়ি করে চলে যাবে।

বুড়ো বিকেলে তাই করেছে। বাপ-ব্যাটা মিলে ইছাপুর রেল-স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছে ন্যাড়াকে। ঘাটে নৌকো বেঁধে রেখে এসেছে।

তারপর লিটনগঞ্জের টিকিট কেটে দিয়েছে। ন্যাড়া তার সঙ্গে দাদু পাতিয়েছে। বলেছে—ও দাদু! তোমার ঠিকানা বলো লিখে নিচ্ছি। টিকিটের টাকাটা পাঠিয়ে দিতে বলব বাবাকে।

জেলেবুড়ো জিভ কেটে বলেছে—ছি, ছি! ও কী কথা নাতি ভাই! ও টাকা ফেরত নেব না। বরং বাপ বেটা মিলে নৌকো নিয়ে আমরা উজানে যাব যখন, তখন তোমাদের লিটনগঞ্জে গিয়ে উঠবখন। তখন তোমার মায়ের কাছে দু-মুঠো খেয়ে আসব। ওতেই সব শোধ!

ন্যাড়া বলেছে—কবে যাবে জেলেদাদু!

—এখন তো শীত। বর্ষায় যাব। ঠিক যাব। আমরা তো জলচরা মানুষ ভাই।

ট্রেন এসে গেছে। তখন ন্যাড়াকে তুলে নিয়ে বুড়ো জানালার পাশে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় সাবধান করে দিয়েছে। আর যেন বদমাশদের পাল্লায় না পড়ে ন্যাড়া! ট্রেন ছেড়ে দিলে কয়েক পা সঙ্গে সঙ্গে এগিয়েছে জেলে বুড়ো। তারপর হঠাৎ তার খেয়াল হয়েছে—এই গো, সারাদিন সঙ্গে রইলে। নামটা তো জানা হল না ছেলের।

ন্যাড়া চলন্ত ট্রেনের জানালায় মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে বলেছে—স্বপনকুমার রায়। ওখানে সবাই আমায় ন্যাড়া বলে ডাকে—এ-এ-এ!

ট্রেনে বড্ড ভিড় ছিল। দিনটা শনিবার। তাই শহুরে বাবুর দল রবিবারের ছুটি কাটাতে যে-যার দেশের বাড়ি চলেছে।

তবু ন্যাড়া খুব সাবধানে নজর রেখে বসে রইল। কমলাক্ষ বা মেধো গুন্ডা যদি তার খোঁজে দৈবাৎ এ ট্রেনে উঠে থাকে!

প্রতি স্টেশনে লোকেরা উঠল-নামল। কিন্তু ওদের দেখা না পেয়ে ন্যাড়া আশ্বস্ত হল। লিটনগঞ্জ প্রায় চার ঘণ্টা লেগে গেল পৌঁছতে। চেনা স্টেশনে নামল যখন, তখন ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় রাত সাড়ে আটটা বাজে। বেশ শীত করছে। গায়ে মোটে একটা শার্ট, পরনে হাফ প্যান্ট। পায়ের জুতো সেই ঘরে পড়ে আছে।

প্ল্যাটফর্মের ভিড়ে ন্যাড়া ভয়ে-ভয়ে ফের চারদিকে তাকিয়ে কমলাক্ষদের খুঁজল। তারপর গেটে টিকিট দিয়ে রাস্তায় হনহন করে এগোল। স্টেশন রোডে ল্যাম্পপোস্ট থেকে যে আলো ছড়াচ্ছে, তা কুয়াশায় ম্লান। ন্যাড়া শীতে ঠকঠক করে কেঁপে প্রায় দৌড়ুচ্ছিল। বাস রিকশো আর পায়েচলা লোকের সঙ্গে দেখা অবশ্য হচ্ছে। কিন্তু একটু পরে বাঁদিকে মোড় নিয়ে যে রাস্তায় তাদের পাড়ায় ঢুকতে হবে, সেটা বেশ নির্জন। নাকি বাজার ঘুরে অন্যপথে বাড়ি ঢুকবে?

এই লিটনগঞ্জেই ন্যাড়ার জন্ম। এর নাড়িনক্ষত্র এ বয়সেই তার জানা। অথচ তার জীবনে এমন একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটেছে যে, এখন এই রাতেরবেলা চিরচেনা লিটনগঞ্জ তার কাছে অজানা এক রহস্যময় আর বিভীষিকায় ভরা শহর হয়ে উঠেছে।

খালি মনে হচ্ছে, সামনের ওই লোকটাই বদমাশ কমলকাকু কিংবা মেধো গুন্ডা। কখনও মনে হচ্ছে, অন্ধকার জায়গাগুলো থেকে ওরা তার দিকে নজর রেখেছে। এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে। আবার তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখবে।

মোড়ে এসে ন্যাড়া একটু দাঁড়াল। বাজার ঘুরে অন্য রাস্তায় বাড়ি যাবে, নাকি এই রাস্তায় শর্টকাটে পৌঁছুবে? এ রাস্তার দুধারে ফাঁকায় একটা করে বাড়ি আর মাঝেমাঝে ফুলফলের বাগিচা। এ পাড়াটা খুব নির্জন। এটা হাউসিং কলোনি একটা। সবখানে এখনও বাড়ি তৈরির কাজ শেষ হয়নি। আগাছার জঙ্গল বা গাছপালাও রয়ে গেছে।

মোড়ে যেখানে ন্যাড়া দাঁড়িয়েছে, সেখানে শহরের জলের ট্যাংক। উঁচু লোহার ফ্রেমের মাথায় বসানো। হঠাৎ ন্যাড়া দেখল, ওই উঁচুতে রাখা বিশাল ট্যাংকের পেছন দিকে ঘন ছায়ায় ভেতর থেকে একটা লোক সাঁৎ করে বেরিয়ে এল।

লোকটা বেজায় ঢ্যাঙা। মাথায় ছুঁচলো একটা টুপি রয়েছে। তাঁর কাঁধে একটা ভারী ব্যাগ ঝুলছে। ব্যাগটা এক হাতে চেপে সে কুঁজো হয়ে এদিক-ওদিক চাইতে-চাইতে উলটোদিকের ইট ও টালিভাটার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

ন্যাড়া লোকটিকে তক্ষুনি চিনতে পেরেছে। আরে। এ তো সেই মুসলমান পাড়ার হেকিমসায়েব!

রাস্তায় ওকে দেখলেই ন্যাড়া তার বন্ধুরা পেছনে লাগে। সুর ধরে চেঁচায়— 'ও খাঁ-সায়েব! ও খাঁ-সায়েব! একটু দাওয়াই দেবে?'

হেকিম বড় বদমেজাজি আর পাগলাটে স্বভাবের লোক। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে তাড়া করে ওদের। ন্যাড়ারা তখন হাসতে হাসতে পিছু হটে।

হেকিমসায়েব এমন করে চুপিচুপি ভাটার দিকে কোথায় গেল? ন্যাড়া হাঁ করে তাকিয়ে রইল। বাড়ি যাবার কথা, কমলাক্ষ বা মেধো গুন্ডার কথা—সব ভুলে গেল।

ইট ও টালিভাটাটা এখন পোড়ো হয়ে গেছে। বিশাল এলাকা জুড়ে বড় বড় পুকুরের মতো গর্ত বা খাল আর ঢিবি রয়েছে। ঢিবিতে জঙ্গল গজিয়েছে। সতুবাবুরা একসময় রোডস ডিপার্টমেন্টের জন্য ইট ও টালি সাপ্লাই দিতে ওখানে ভাটা বানিয়েছিলেন। দুটো মস্তো চিমনি রয়ে গেছে।

হেকিমসায়েব ওখানে ঢুকল কেন? আর ওর ব্যাগে কী এমন ভারী জিনিস আছে যে অমন করে কুঁজো হয়ে পা ফেলছিল সে?

ন্যাড়ার মাথায় এই এক রোগ। তার খেয়াল চড়লে আর জ্ঞানগম্যি থাকে না। সে দৌড়ে রাস্তার ওপাশে গিয়ে দেখার চেষ্টা করল, হেকিমসায়েব যাচ্ছেটা কোথায়? কিন্তু ওদিকটা ঘন অন্ধকার। কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না।

কিছুক্ষণ হতাশভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর ন্যাড়ার সম্বিৎ ফিরল। এদিকটা শীতটাও বেজায় বেড়ে গেছে। দাঁতে দাঁত ঠেকে কাঁপুনিতে অস্থির। ন্যাড়া ওখান থেকে মোড়ে ফিরে এল। তারপর প্রায় চোখ বুজে নির্জন রাস্তা দিয়ে দৌড় লাগাল।

এক দৌড়ে পরের মোড়ে এসে সে ডান দিকে ঘুরল। তারপর গলিরাস্তায়, আরেক দৌড়ে একেবারে বাড়ির দরজায় পৌঁছোল।

রোয়াকে উঠেই সে চেঁচিয়ে উঠল—'মা! ওমা!'

সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে তার মায়ের গলা ভেসে এল—'কে রে?'

ন্যাড়া ভয়ে-ভয়ে বলল—'আমি।'

সুনন্দা দরজা খুলেই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন—'ওগো! ন্যাড়া এসেছে! ন্যাড়া!' তারপর ছেলেকে দু হাতে বুকে জড়িয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন।

ভেতরে রমেনবাবু—ন্যাড়ার বাবা চুপচাপ বসেছিলেন। শুনতে পেয়ে লাফিয়ে উঠে গর্জে বললেন—'ওরে হতভাগা! আয়, মজা দেখাচ্ছি তোর!'

ন্যাড়া মায়ের বুকে মিশে আছে। নির্ঘাত বাবা একচোট চড়থাপ্পড় আগে মেরে বসবেন—ব্যাপারটা কত সাংঘাতিক তা বুঝতেই চাইবেন না হয়তো।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, রমেনবাবুরও চোখে জল। ধরা গলায় বললেন—'অমন করে বাড়িপালানো অভ্যাস করলে তুই কি মানুষ হতে পারবি খোকা? দেখো দিকি কাণ্ড। আজ দুদিন ধরে বাড়িতে রান্নাখাওয়া বন্ধ!'

যাক্, বাবাও কেঁদে ফেলেছেন। ন্যাড়া নিশ্চিন্ত। বাড়িতে খুব সাড়া পড়ে গেছে। দিদি অমিতা ওর গালে চিমটি কেটে গরম জল করতে গেল। বাবা একটা গরম চাদরে ন্যাড়াকে জড়িয়ে ফেললেন। সুনন্দা ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন বাড়িময়।

সেই হট্টগোলের সময় হঠাৎ কোত্থেকে শংকরবাবু হাজির।

বাড়ি ঢুকে ন্যাড়াকে দেখে তিনি কয়েকমুহূর্ত হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না।

ন্যাড়া মিটিমিটি হাসছিল।

শংকরবাবুর মুখে কথা ফুটল অবশেষে। বলে ফেললেন—'তোকে ওরা ছেড়ে দিল তাহলে?'

ন্যাড়া বলল—'হুঁ, তাই বুঝি? আমি বুদ্ধি করে পালিয়ে এসেছি।'

রমেনবাবু ও সুনন্দা অবাক হয়ে বললেন—'অ্যাঁ! সে কী কথা!'

শংকরবাবু বললেন—'সব বলছি। সে এক সাংঘাতিক ব্যাপার। ন্যাড়া যে প্রাণে বেঁচে পালিয়ে আসতে পেরেছে, এজন্যে ওকে পুরস্কার দেওয়া দরকার।'

রমেনবাবু বললেন—'আহা! বলবে তো কী হয়েছিল?'

শংকরবাবু জবাব দিতে যাচ্ছেন, হঠাৎ ন্যাড়া বলে উঠল—'ছোটমামা! একটা কথা শোনো। আমি স্টেশন থেকে আসছি, তখন সতুবাবুদের ভাটার মধ্যে মুসলমানপাড়ার হেকিম লোকটা ভারী ঝোলা কাঁধে নিয়ে চুপিচুপি ঢুকে পড়ল। তারপর...'

শংকরবাবু সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠেছিলেন। বললেন—'জামাইবাবু! আমি একটু পরে আসছি।' বলে সবাইকে অবাক করে বেরিয়ে গেলেন। তারপর....

নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন

লিটনগঞ্জের বাজার এলাকা বাদে রাত নটা না বাজতে বাজতেই এই শীতে সবগুলো পাড়া নিশুতি নিঃঝুম হয়ে পড়ে। বাজারেও অবশ্যি খাঁ খাঁ অবস্থা। কিছু-কিছু দোকান খোলা এবং লোকেরা আড্ডা দিচ্ছে। ল্যাম্পপোস্টের টিমটিমে বাতি কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে মাঝে-মাঝে। এই নির্জন নিঃঝুম রাস্তায় পুলিশ সুপারের জিপ এগিয়ে চলেছে স্টেশনরোডের দিকে। একটু পেছনে চলেছে একটা মস্তো পুলিশভ্যান। তাতে বসে রয়েছেন সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর কয়েকজন অফিসার।

জিপে আছেন পুলিশ সুপার অজিতেশ, কর্নেল আর শংকর।

শংকরের মুখে খবর পেয়েই এই অভিযান। সতুবাবুদের পোড়ো ইটভাটার দিকে ঘুরপথে এগিয়ে চলেছেন ওঁরা।

জলের ট্যাংকের কাছে পৌঁছে কথামতো পুলিশভ্যান থামল। সশস্ত্র সেপাইরা আর অফিসাররা নিঃশব্দে ইটভাটার চারদিক ঘিরে ফেলতে এগিয়ে গেলেন অন্ধকারে। ঝোপে জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে শিকারি বাঘের মতো ওরা পা বাড়ালেন।

জিপটা একটু তফাতে রেখে কর্নেল, শংকর আর অজিতেশ দ্রুত এগিয়ে চললেন ভাটার দিকে।

বিশাল পোড়োভাটায় খানাখন্দ, ঢিবি, আর চিমনির কথা আগেই বলা হয়েছে। পুরো এলাকা ঘন অন্ধকারে ঢাকা। তার ওপর কুয়াশা।

ভাটায় ঢোকার জন্য সরু একফালি পথ আছে। সে-পথে ইতিমধ্যে ঘাস ও জঙ্গল গজিয়েছে। কিন্তু পথটায় খোয়া বিছানো থাকায় চলতে অসুবিধা হচ্ছিল না। কিছুটা এগিয়ে কর্নেল থমকে দাঁড়ালেন।

ফিসফিস করে বললেন—'এই ভাটার নিশ্চয় একটা অফিসঘর ছিল। সেটা কাছাকাছি থাকা উচিত।'

অজিতেশ বললেন—'হ্যাঁ। দিনে এখান দিয়ে যেতে চোখে পড়েছে বটে। মনে হচ্ছে সামনে ঢিবিমতো জায়গায় দরমার বেড়ার কয়েকটা ঘর আছে।'

শংকর বললেন—'টর্চ জ্বেলে দেখে নিলে হত।'

কর্নেল বললেন—'মাথা খারাপ? অন্ধকারেই এগুতে হবে। এ ব্যাপারে আমার অবশ্যি অসুবিধে হয় না। কেন না, বনেজঙ্গলে বহুবার রাতবিরেতে জন্তু জানোয়ারের ছবি তুলতে যাওয়ার অভ্যাস আছে আমার। তোমরা আমার পেছনে-পেছনে এস।'

এসব কথা ফিসফিস করেই বলাবলি করছিলেন তিনজনে। খানিকটা এগিয়ে অন্ধকারে আবছা একটা উঁচু জায়গা নজরে এল। খোয়াবসানো পথটা সোজা সেখানে উঠে গেছে। হ্যাঁ, ওই তো ভাটার সেই অফিসগুলো সারবেঁধে দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ তিনজনেই থমকে দাঁড়ালেন। একটা আলো জ্বলে উঠল কোথাও। হয়তো ওই ঘরের মধ্যেই দরমাবেড়ার দেয়ালের কোনও ফাটল দিয়েই আলোটা দেখা যাচ্ছে বুঝি।

পা টিপে টিপে তিনজনে আলোটা লক্ষ করে এগুতে থাকলেন। সেই সময় কী একটা জন্তু দৌড়ে পালিয়ে গেল ঝোপঝাড় ভেঙে। শেয়াল-টেয়াল হেবে। দরমাবেড়ার ঘরগুলোর পেছনে ঘন ঝোপ গজিয়েছে। সেই ঝোপে ঢুকে একটা ফাটলে কর্নেল উঁকি মারতে যাচ্ছেন, এমন সময় ঘরের ভেতর চাপা গলায় কে কথা বলে উঠল—'লতিফ খাঁ! তোমায় এখনও সাবধান করে দিচ্ছি, পবিত্র ওই মণি তোমার পাপের হাতে ছোঁবার চেষ্টা কোরো না। সর্বনাশ হবে!'

কী অবাক! এ তো সেই পিরের মাজারের জাদুকর ফকিরের গলা!

দরমাবেড়ার দেয়ালের অবস্থা ঝাঁঝরা। এখন তিনজনে তিনটে ফাটলে চোখ রেখেছেন। ভেতরে এক বিচিত্র দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন।

কালো আলখাল্লাধারী ফকির দাঁড়িয়ে আছে মেঝেয়। তার সামনে উবু হয়ে বসে আছে হেকিম লতিফ খাঁ। তার চোখেমুখে একটা ক্রূর ভঙ্গি। তার হাতের কাছে সেই ঐতিহাসিক কালো পেটিকা বা ছোট্ট বাকসোটা রয়েছে।

আর তার চেয়েও সাংঘাতিক, পেটিকার পাশে আজিমুদ্দিনের মমি-মুণ্ডুটা রয়েছে।

হেকিমের হাতে একটা সুচের মতো সূক্ষ্ম মিহি জিনিস। সে ফকিরের কথার জবাবে অদ্ভুত ভঙ্গিতে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল। —'এ আমার বংশের সম্পদ। আমারই প্রাপ্য; ওসব ভয় আমায় দেখিও না। তাছাড়া তুমি তো বাপু সংসারত্যাগী ফকির, তোমার এসব বাজে ব্যাপারে নাক গলানোর দরকারটা কী? যাও! এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাও! নৈলে তোমাকেও জবাই করে ফেলব!'

বলে লতিফ খাঁ বাঁ হাতে একটা মস্ত ছোরা বের করে উঁচিয়ে ধরল।

ফকির এক পা পিছিয়ে গিয়ে বলল—'আমি জানি তুমি তা পারবে। তুমি ছদ্মবেশী শয়তান! জায়গিরদার বংশের কলঙ্ক তুমি! কিন্তু এখনও সাবধান করে দিচ্ছি লতিফ খাঁ, ওই মণি স্বর্গের বস্তু। মিশরের সাধক আজমশাহ কঠোর সাধনায় ওই রত্ন আশীর্বাদ স্বরূপ পেয়েছিলেন এক দেবদূতের কাছে। দোহাই তোমার, যদি বাঁচতে চাও—পেটিকা খুলো না!'

লতিফ খাঁ বাঁকা হেসে বলল—'এটার মধ্যে নিছক একটা নীলকান্ত মণি আছে—পুরুষানুক্রমে আমরা শুনে আসছি। কিন্তু কেউ আজিমুদ্দিনের কবরের খোঁজ পায়নি বলেই মণিটা হাতাতে পারেনি! এতদিনে আমার পূর্বপুরুষের সম্পদ আমি হাতিয়েছি। তুমি...'

বাধা দিয়ে ফকির বলল—কিন্তু কবরের সন্ধান আমিই তোমায় দিয়েছিলুম লতিফ খাঁ! ওঃ! কী ভুলই না করেছিলুম!'

লতিফ খাঁ বলল—'কীসের ভুল? তুমি ঠিকই করেছিলে! কিন্তু মাঝখানে ব্যাটা কমলাক্ষ কী ভাবে টের পেয়ে বাগড়া দিয়েছিল। তাকে তো এবার পুলিশ ধরবেই! ইতিমধ্যে মণিটা নিয়ে আমি ইরানে পালিয়ে যাব। তুমি যদি আমার সঙ্গে যেতে চাও, বলো। হ্যাঁ—তোমাকে আমি এই মণিবেচার টাকার কিছু ভাগ দিতে রাজি আছি।'

ফকির বলল—'লতিফ খাঁ! বাচালতা কোরো না। আবার বলছি, তুমি ওই মমি-মুণ্ডু আর বাকসো কবরে রেখে এস গে। ওঠো, আমি তোমাকে সাহায্য করব। কবরের ওখানে পুলিশ সারাক্ষণ—পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু তুমি তো জানো, আমি এরকম বিষাক্ত ধোঁয়া তৈরি করতে জানি। সেই ধোঁয়ার দাপটে পুলিশ দূরে সরে যাবে। সেই সুযোগে ঝটপট দুজনে কবরের মধ্যে এগুলো রেখে আসব।'

লতিফ খাঁ তেমনি বিদঘুটে খ্যাঁক খ্যাঁক হাসি হেসে হেসে বলল—'চুপ্! এই দেখো, তোমার সামনেই আমি পেটিকা খুলছি। আমার পূর্বপুরুষের ঐশ্বর্য দেখে চোখ দুটো সার্থক করো, ফকিরসায়েব!'

বলে সে সূচের মতো চাবিটা বাকসের একস্থানে চেপে ধরল। ফকির দু হাত তুলে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল—'লতিফ খাঁ! সাবধান!'

কর্নেল, অজিতেশ ও শংকর নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছেন। অবাক হয়ে এবার দেখলেন, কালো পেটিকার ওপরের অংশ আস্তে আস্তে ঠেলে উঠছে। তার এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটতে থাকল।

পেটিকার ফাঁক দিয়ে অত্যুজ্জ্বল নীল আভা ঠিকরে বেরুতে লাগল। ঘরের ভেতর নীল তীব্র আলো পড়তে থাকল।

আবার ফকিরের চিৎকার শোনা গেল—'হুঁশিয়ার লতিফ খাঁ! পালিয়ে এস! পালিয়ে এস!'

তারপর ফকির এক লাফে বাইরে গিয়ে পড়ল। আর পেটিকার ওপরের অংশ খাড়া হয়ে ওঠার পর দেখা গেল, গোলাকার একটুকরো নীল উজ্জ্বল বস্তু রয়েছে ভেতরে এবং ঘরের ভেতরে সুতীব্র নীল আলোর ঝলকানি। লতিফ খাঁ দুচোখে আতঙ্ক ঠিকরে পড়ছে। সে স্থির হয়ে গেছে।

তারপর ঘটল এক বিস্ময়কর ঘটনা। নীল মণিটা একটু করে শূন্যে ভেসে উঠতে থাকল। কিন্তু লতিফ খাঁ তেমনি স্থির। যেন নীলরঙের একটা মমি হয়ে গেছে সে।

নীল মণিটা এবার শূন্যে ভেসে দরজার দিকে চলল। বাইরে ফকিরের চিৎকার শোনা গেল ফের—'হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার!'

কর্নেল, অজিতেশ আর শংকর একলাফে ঘরের সামনের দিকটায় চলে গেলেন। তারপর দেখলেন, নীলবর্ণ উজ্জ্বল সেই মণি নক্ষত্রের মতো ভেসে চলেছে ভাটার ওপর। সারা এলাকা তীব্র নীল বৈদ্যুতিক আলোয় ভরে গেছে।

তারপর হঠাৎ মণির গতিবেগ বাড়ল। হু হু করে আকাশে উঠে পড়ল। তারপর প্রচণ্ড বেগে নক্ষত্রের দিকে উড়ে চলল। দেখতে দেখতে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সেটা আকাশের নক্ষত্রলোকে মিলিয়ে গেল। আবার অন্ধকারে ঢেকে গেল চারদিক।

তিনজনে হতবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন। এবার কর্নেল বলে উঠলেন— 'লতিফ খাঁর সাড়া নেই কেন?' বলে টর্চ জ্বেলে ঘরের ভেতর আলো ফেললেন।

লতিফ খাঁ তেমনি হাঁটু দুমড়ে স্থির হয়ে বসে আছে। কর্নেল ঘরে ঢুকে বলে উঠলেন—'লতিফ খাঁ! লতিফ খাঁ!' তাঁর দুপাশে শংকর ও অজিতেশ এসে দাঁড়ালেন।

পেছন থেকে ফকিরের গলা শোনা গেল—'লতিফ খাঁ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে কর্নেল সায়েব!'

ফকির দৌড়ে এসে তার লম্বা চিমটেটা লতিফ খাঁয়ের গায়ে ঠেকাতেই সবাই স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন গুঁড়ো গুঁড়ো একরাশ জমাট ছাই ছাড়া ওই দেহটা আর কিছুই নয়। ফকির কালো পেটিকা আর মমি-মুণ্ডটা দু হাতে তুলে নিয়ে বলল—'আর কী? চলুন সবাই এগুলোকে আজিমুদ্দিনের কবরে রেখে আসি।'...

দরমাবেড়ার ঘরের মধ্যে লোভী লতিফ খাঁয়ের ভস্মীভূত মৃতদেহ পড়ে রইল। ওঁরা সবাই ভাটা থেকে রাস্তায় গিয়ে পৌঁছলেন।

অজিতেশ এবার হুইসল বাজিয়ে পুলিশ বাহিনীকে ফেরার সংকেত দিলেন। ভাটার চারদিক ঝোপের আড়ালে বসে সেই বিস্ময়কর দৃশ্য সবাই দেখেছে! এবার নিঃশব্দে একে একে ফিরে আসছিল।

এবার জিপ ও ভ্যান এগিয়ে চলল স্টেশনের ওধারে সেই পোড়ো জমিতে বটতলার দিকে—যেখানে বালক আজিমুদ্দিনের কবর আছে। ফকির জিপের সামনে কর্নেলের পাশে বসে আছে। তার কোলের ওপর মমি-মুণ্ড আর কালো পেটিকা।

যেতে-যেতে কর্নেল একবার শুধু বলে উঠলেন—'এই বিরাট পৃথিবীতে এখনও কত রহস্য রয়েছে, বিজ্ঞান তার সীমানায় যেতে পারেনি। তবে যাই বলি না কেন, এত রহস্য আছে বলেই জীবনটা এত লোভনীয় এবং বরণীয়।

ফকির অস্পষ্ট স্বরে বিড়বিড় করে কী মন্ত্রপাঠ করতে থাকল। আর কেউ কোনও কথা বললেন না।....

তখন ন্যাড়া মায়ের পাশে শুয়ে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে। ঘুমের মধ্যে সে একটা আশ্চর্য স্বপ্ন দেখছিল।

আকাশ থেকে একটা নীলরঙের উজ্জ্বল নক্ষত্র খসে পড়ল। স্টেশনের ওপাশের মাঠে দাঁড়িয়ে আছে সে। দৌড়ে যেই নক্ষত্রটা কুড়োতে গেছে, অমনি ফের সেটা উড়ে চলেছে। দুঃখিত মনে ন্যাড়া দাঁড়িয়ে রইল। তারপর নীল নক্ষত্রটা আকাশে ভেসে গিয়ে একস্থানে আটকে যেতেই ন্যাড়া ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল।

সুনন্দা ডাকছিলেন—'ন্যাড়া! ও নেড়ু! কাঁদছিস কেন? স্বপ্ন দেখছিলি বুঝি!'

ন্যাড়া জেগে উঠেছে! জবাব না দিয়ে মায়ের বুকে মাথা গুঁজে দিল। আজ রাতে শীতটাও বড্ড পড়েছে। কুঁকড়ে আরামে শুয়ে রইল। কিন্তু স্বপ্নটা তার মন খারাপ করে দিয়েছে।

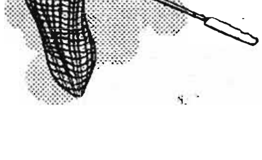

কোদণ্ডের টঙ্কার

কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের জাদুঘরসদৃশ বিশাল ড্রয়িংরুমে ইদানীং রবিবারের আড্ডাটা দারুণ জমজমাট হয়ে ওঠে। পুলিশের গোয়েন্দা ও অপরাধ দফতরের হোমরাচোমরা লোকেরা তো আসেনই, কর্নেলের মতো রিটায়ার-করা সামরিক অফিসাররাও কেউ কেউ এসে জোটেন। নিজের-নিজের লাইনে সবাই তাঁরা অভিজ্ঞ লোক এবং রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা কারুর কম নেই। কাজেই প্রত্যেকেরই যেন চেষ্টা থাকে, কে কত সাংঘাতিক অভিজ্ঞতার কথা বলে অন্যদের টিট করতে পারবেন।

এ রবিবারে কথার সূত্রপাত সম্প্রতি গঙ্গাসাগর মেলায় সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশী এক স্মাগলারকে গ্রেফতার নিয়ে। ডিটেকটিভ দফতরের রণবীর মণ্ডল ঘটনার রোমাঞ্চকর জায়গায় সবে পৌঁছেছেন, ব্রিগেডিয়ার ইকবাল সিং বেমক্কা বলে উঠলেন, 'ওয়েট, ওয়েট। এভাবে বাধা দেওয়ার জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু মণ্ডলসায়েব তো ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীর কথা বলছেন। নেপাল বর্ডারে আমি সীমান্ত বাহিনীতে থাকার সময় এক সত্যিকার সন্ন্যাসীকে স্মাগলিংয়ের কারবারে জড়িত থাকার জন্য পাকড়াও করেছিলুম।'

ক্রাইম ব্রাঞ্চের মণি চ্যাটার্জি মুচকি হেসে বললেন, 'সত্যিকার সন্ন্যাসী? সাধু-সন্ন্যাসী-ফকির এঁরা তো মশাই সংসারত্যাগী পুরুষ! এঁরা স্মাগলিং করতে যাবেন কোন্ দুঃখে?'

ব্রিগেডিয়ার ইকবাল সিং বললেন, 'তা বলতে পারব না। যা দেখেছি, তাই বলছি। সন্ন্যাসীর বোঁচকার ভেতর পাওয়া গিয়েছিল একগাদা কোকেন, মারিজুয়ানা, এলএসডি, কয়েকরকম নার্কোটিক্স।'

ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের রঘুবীর শর্মা তাঁকে সমর্থন করে বললেন, 'চ্যাটার্জিসায়েব! সত্যি বলতে কী, সাধু বলুন, সন্ন্যাসী বলুন, ফকির বলুন, কেউ সংসারত্যাগী নন।'

চ্যাটার্জি বললেন, 'কেন নন?'

শর্মা হাসলেন। 'মশাই, কোনও মানুষের পক্ষে কি সত্যিই সংসার ত্যাগ করা সম্ভব? একটু ভেবে দেখলেই ব্যাপারটা বুঝবেন। ওঁরা আসলে নিজেদের ব্যক্তিগত সংসার ত্যাগ করেছেন, তার মানে পরিবার বা আত্মীয়স্বজনকে ছেড়েছেন। কিন্তু তার বদলে অন্যান্য মানুষকে নিয়েই তাঁদের চলতে হয়। আমাদের মতোই তাঁদের ট্রেনে-বাসে চাপতে হয়।'

ব্রিগেডিয়ার সিং দাড়ি চুলকে মন্তব্য করলেন, 'প্লেনেও।'

'হ্যাঁ, প্লেনেও,' শর্মা জোর দিয়ে বললেন। 'তাছাড়া তাঁদের পেটে খেতেও হয়। না খেলে তো বাঁচা যায় না।'

মণ্ডল বললেন, 'শুনেছি, কোনও-কোনও সাধু নাকি স্রেফ বাতাস খেয়ে থাকেন।'

কর্নেল এক কোণায় বসে আপনমনে আতশকাচ দিয়ে এক টুকরো হাড়ের মতো দেখখে কী একটা জিনিস পরীক্ষা করছিলেন। মুখ তুলে ফোড়ন কাটালেন, 'সাপকে বায়ুভুক বলা হত প্রাচীনকালে। কথাটা ভুল।'

'ভুল তো বটেই,' শর্মা দাপটের সঙ্গে বললেন। 'শুধু বাতাস খেয়ে কোনও প্রাণীর পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয়। কাজেই যা বলছিলুম, নিছক খাদ্যের জন্যও সাধু-সন্ন্যাসী-ফকিরদের সংসারের নাগালে থাকতেই হয়।'

চ্যাটার্জি বললেন, 'কী বলছেন! হিমালয়ের দুর্গম স্থানে কত সাধু থাকেন।'

ইকবাল সিং হাসতে-হাসতে বললেন, 'আপনার কথায় লজিক নেই। যদি দুর্গম স্থানে সত্যি কেউ থাকেন, তাঁকে দেখল কে? তাছাড়া হিমালয় বাস্তবিক তত দুর্গম নয়। প্রাচীন যুগ থেকেই মানুষের পা তার সবখানেই পড়েছে। আমি দেখেছি, হিমালয়ে যত সাধু থাকেন, সকলের ডেরা কোনও-না-কোনও তীর্থে অথবা তীর্থপথের ধারে। তীর্থপথের আনাচে-কানাচেও কাউকে থাকতে দেখেছি। শর্মাসায়েব ঠিকই বলেছেন। সাধু-সন্ন্যাসীদের সংসারত্যাগী বলা হয় বটে, কিন্তু সংসারী মানুষদের ছাড়া তাঁদের চলে না। অবশ্য বলতে পারেন, ছোট সংসার ছেড়ে বড় সংসারে ঢোকেন তাঁরা।'

মণ্ডল বললেন, 'তা না হয় মেনে নিচ্ছি। কিন্তু সাধুদের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে আপনার কী বক্তব্য?'

'মানুষের সমস্ত ক্ষমতা লৌকিক,' শর্মা বললেন, 'সাধুরা কেউ কেউ ম্যাজিক দেখান আসলে।'

ইকবাল সিং তাঁকে সমর্থন করে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, চ্যাটার্জি বলে উঠলেন, 'ম্যাজিক কী বলছেন মশাই! কোনারকের ওখানে এক সাধুকে এক হাত উঁচুতে, স্রেফ শূন্যে বসে ধ্যানস্থ দেখেছি।'

শর্মা এবং সিং হো-হো করে হেসে উঠলেন। মণ্ডল বললেন, 'বলেন কী! হঠযোগীরা এমন করেন শুনেছি।'

চ্যাটার্জি বললেন, 'নিজের চোখকে তো মশাই অবিশ্বাস করতে পারব না, সে আপনারা যাই বলুন। সমুদ্রের ধারে পরিষ্কার জ্যোৎস্না ছিল। সাধুবাবা মিনিট-দুয়েক ওইভাবে শূন্যে থাকার পর মাটিতে নামলেন।'

একটু তফাতে আমার পাশে বসে ছিলেন প্রাইভেট গোয়েন্দা কৃতান্তকুমার হালদার। কে কে হালদার নামে ইদানীং পরিচিত। ঢ্যাঙা গড়নের মানুষ। পেল্লায় গোঁফ। পুলিশের সিআই ছিলেন মফস্বলে। রিটায়ার করে প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছেন গণেশ অ্যাভেনিউতে, তিনতলা একটা বাড়ির ছাদে অ্যাসবেস্টসের চাল চাপানো একটা ছোট্ট ঘর। রাস্তা থেকে সাইন বোর্ডটা চোখে পড়ে : হালদার ডিটেকটিভ এজেন্সি। তলায় ইংরেজিতে লেখা : রহস্যের ধাঁধায় পড়লে, চলে আসুন।

হালদারমশাই আজ কর্নেলের আড্ডায় কেন এসেছেন জানি না। কর্নেলের কাছে বোধ করি কোনও ব্যাপারে পরামর্শ নিতেই এসে থাকবেন। হোমরা-চোমরাদের কথার মধ্যে এতক্ষণ নাক গলাতে ভরসা পাচ্ছিলেন না হয়তো। কিছুক্ষণ থেকে ওঁকে উসখুস করতে এবং ঘন ঘন নস্যি নিতে দেখছিলুম। বাথরুমে বারবার হাঁচতে যাচ্ছিলেন, সে অবশ্য হলফ করে বলতে পারি। এবার আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। বললেন, 'যদি কিছু মনে না করেন স্যার—'

ব্রিগেডিয়ার সিং বললেন, 'না, না। বলুন কী বলতে চান।'

হালদারমশাই বললেন, 'চ্যাটার্জিসায়েব তো শূন্যে সাধুবাবাকে ধ্যান করতে দেখেছেন। আমি সম্প্রতি কোদণ্ডগিরির জঙ্গলে গিয়েছিলুম বেড়াতে। সেখানে আমার এক ভাগ্নে ফরেস্ট অফিসার। খুব তেজি আর সাহসী—'

শর্মা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আহা! কী দেখেছেন, তাই বলুন।'

হালদারমশাই মুখে বিস্ময় ফুটিয়ে বললেন, 'স্বচক্ষে দেখে এলুম স্যার, এক সাধুবাবা বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন, আবার দৃশ্য হচ্ছেন। এক্ষুনি অদৃশ্য হচ্ছেন, আর তক্ষুনি দৃশ্য হচ্ছেন। এই অশরীরী, এই শরীরী। একবার দেখছি নেই, একবার দেখছি আছেন।'

বলার ভঙ্গিতেই ঘরে অট্টহাসির ঘুম পড়ে গেল। তারপর শর্মা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'আপনাকে চেনা-চেনা লাগছে যেন? আপনি?'

'অধমের নাম কে কে হালদার,' হালদারমশাই কাঁচুমাচু মুখে বললেন। 'তবে চিনবেন বইকী স্যার! আপনিই তো আমার প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির লাইসেন্সের দরখাস্তে কাউন্টারসাইন করেছিলেন। নইলে লাইসেন্স পাওয়া কঠিন হত।'

শর্মা হাসতে হাসতে বললেন, 'তাই বলুন! আপনিই সেই গোয়েন্দা হালদার? বুঝেছি। এবার এইসব গুলতাপ্পি ঝেড়ে মক্কেলের সংখ্যা বৃদ্ধির মতলব করেছেন বুঝি?'

বিব্রত হালদারমশাই জিভ কেটে বললেন, 'ছি, ছি! এ কী বলছেন স্যার! এই জয়ন্তবাবুকে জিজ্ঞেস করুন, ওঁদের দৈনিক সত্যসেবকে এ-খবর বেরিয়েছে কি না।'

চ্যাটার্জি বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখেছিলুম বটে।'

শর্মা আমার দিকে চোখের ঝিলিক তুলে বললেন, 'বাঃ! তাহলে জয়ন্তকে ম্যানেজ করে ফেলেছেন! সত্যি, আপনার কোনও তুলনা হয় না হালদারমশাই!'

আমি ঝটপট বললুম, 'কখনও না। খবরটা নিউজ এজেন্সি থেকে পাওয়া। তাছাড়া হালদারমশাইও ব্যাপারটা যে দেখে এসেছেন, এ আমি এইমাত্র শুনছি।'

ব্রিগেডিয়ার সিং দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, 'নিউজ এজেন্সির যে রিপোর্টার এই খবর জোগাড় করেছে, তার সঙ্গে হালদারমশাইয়ের যোগাযোগ ঘটেছিল কি না আমরা অবশ্য জানি না।'

হালদারমশাই কী বলতে যাচ্ছিলেন, চ্যাটার্জি ঘড়ি দেখে লাফিয়ে উঠলেন। 'মাই গুডনেস! সাড়ে দশটা বাজে। করছি কী আমি? সিপি-র সঙ্গে জরুরি কনফারেন্স! মিঃ শর্মা, মিঃ মণ্ডল, কী ব্যাপার? আপনাদের তাড়া দেখছি না যে!'

দু'জনেই 'তাই তো' বলে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর তিন পুলিশ-জাঁদরেল কর্নেলের উদ্দেশে 'বাই' হেঁকে বেরিয়ে গেলেন। ব্রিগেডিয়ার সিংও হাই তুলে উঠে দাঁড়ালেন। তিনিও কর্নেলের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

ষষ্ঠী ডাইনিং ঘরের দরজায় পর্দা ফাঁক করে উঁকি দিচ্ছিল। বলল, 'যা বাব্বা! আবার যে কোফি করলুম একগাদা। খাবে কে এত?'

কর্নেল হাড়ের মতো জিনিসটা আর আতশকাচ রেখে বললেন, 'কোফি করেছিস?'

'আজ্ঞে বাবামশাই।'

কর্নেল হালদারমশায়ের উদ্দেশে বললেন, 'কী হালদারমশাই, সাধুকে তো অদৃশ্য হতে দেখেছেন। কিন্তু কখনও কোফি খেয়েছেন কি? এ বস্তু একমাত্র ষষ্ঠীই বানাতে পারে।'

ষষ্ঠী ট্রে নিয়ে আসছিল। জিভ কেটে বলল, 'কঁফি! কঁফি!'

'ঠিক আছে। কঁফিই খাওয়া যাক।' কর্নেল উঠে আমাদের কাছে এসে বসলেন।

কর্নেলের এ পরিহাসে মন নেই হালদারমশাইয়ের। ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'কীরকম অপমানিত হলুম দেখুন কর্নেল! আপনার মতো বহুদর্শী জ্ঞানী লোক আমার কথাটা উড়িয়ে দিতে পারছেন না। আর এই সব পুঁচকে ছোকরা অফিসার—আমার ছেলের বয়সী সব!'

'দুঃখ করবেন না হালদারমশাই,' কর্নেল সান্ত্বনা দিয়ে বললেন। তারপর নিজের হাতে কফি ঢেলে প্রচুর দুধ মিশিয়ে পেয়ালা এগিয়ে দিলেন তাঁর দিকে। 'বাস্তব কিছু-কিছু ঘটনা অনেককে প্রচণ্ড ধাক্কা দেয়। জানেন তো, ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন?

বললুম, 'কোদণ্ডগিরির সাধুর ব্যাপারটা আপনি বাস্তব ঘটনা বলছেন নাকি?'

কর্নেল আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না। হালদারমশাই সড়াক শব্দে গরম কফি টেনে ব্যস্তভাবে গিলতে গিলতে বললেন, 'বাস্তব মানে? স্বচক্ষে দেখে এসেছি আমি। মাত্র একটা ঝরনার এধার-ওধার। ওধারে পাথরের উপর সাধুবাবা, এধারে পাথরের আড়ালে আমি।'

'দিনে, না রাত্তিরে?'

'রাত্তিরে। তবে জ্যোৎস্না ছিল। পরিষ্কার ঝলমলে আলো। তাছাড়া শুধু ওখানে নয়, পরে ট্রেনেও।'

ফোন বাজলে ওঁর কথায় বাধা পড়ল। কর্নেল হাত বাড়িয়ে ফোন তুলে সাড়া দিলেন। তারপর বললেন, 'কে? কে কে হালদার? হুঁ, আছেন। ধরুন, দিচ্ছি।'

হালদারমশাই খপ করে ফোন কেড়ে নিয়ে চড়া গলায় বললেন, 'দুলাল নাকি?...কী? পালিয়ে গেছে? হতভাগা বাঁদর ছেলে! তোকে পইপই করে বলা আছে...না, না। কোনও কথা শুনতে চাইনে তোর। যেমন করে পারিস, খুঁজে ধরে নিয়ে আয়। নইলে...হ্যাঁ, হ্যাঁ। আশেপাশে....কাছাকাছি...যত্ত সব!'

শব্দ করে ফোন রেখে হালদারমশাই গোঁজ হয়ে বসলেন কর্নেল মৃদু স্বরে বললেন, 'পাখি নাকি?'

'হুঁঃ!'

'কথা-বলা পাখি?'

'হুঁঃ!'

বুঝতে পারছিলুম, হালদারমশাই রেগে আগুন হয়ে আছেন এবং আনমনে হুঁঃ দিচ্ছেন শুধু। এবার কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, 'কথা-বলা পাখিটা কি কোদণ্ডগিরির জঙ্গল থেকে এনেছিলেন হালদারমশাই?'

কৃতান্ত হালদার তড়াক করে ঘুরে বললেন, 'আরে, ওটার ব্যাপারেই তো আসা আপনার কাছে। এখন দেখুন তো কী করি! আমার ভাগ্নে দুলালকে নজর রাখতে বলে এসেছিলুম। পর-পর দু'রাত্তির বাড়িতে চোর আসছে। অদ্ভুত ব্যাপার, চোর জানালার ধারে দাঁড়িয়ে শিস দেয়। তখন পাখিটাও শিস দেয়। বড় রহস্যময় ব্যাপার নয়, কর্নেল?'

'রহস্যময় বলেই মনে হচ্ছে। তা পাখিটা পালাল কীভাবে?'

'দুলাল বলল, বাইরে কে ডাকছিল। গিয়ে দ্যাখে, কেউ না। তারপর ফিরে এসে দ্যাখে, বারান্দার খাঁচা খোলা। অথচ দেখুন, বারান্দায় গ্রিল আছে।'

'বাড়িতে আর কোনও লোক নেই?'

'আজ্ঞে না।' হালদারমশাই নস্যির কৌটো বের করে অনেকটা নস্যি নাকে গুঁজে হাঁ করে রইলেন। কিন্তু হাঁচি এল না।

কর্নেল বললেন, 'পাখিটা কি কাকাতুয়া, না ময়না?'

'ময়না', হালদারমশাই করুণ মুখে বললেন। 'ওটার ব্যাপারেই আপনার সঙ্গে কনসাল্ট করতে আসা কর্নেলস্যার! আপনি ঠিকই ধরেছেন। কোদণ্ডগিরির জঙ্গলে একটা আদিবাসী ছেলে ফাঁদ পেতে পাখিটা ধরেছিল। কথা বলতে পারে দেখে কিনে নিয়েছিলুম।'

'তাহলে নিশ্চয় কারুর পোষা পাখি। উড়ে গিয়ে জঙ্গলে বেড়াচ্ছিল।'

'ঠিক বলেছেন। কিন্তু সেটা কোনও রহস্য নয়। রহস্য হল পাখিটার বুলি। প্রথমে বুঝতে পারিনি। পরে বুঝলুম, বলছে : মাই নেম ইজ গঙ্গারাম। আই অ্যাম কিল্‌ড্‌ বাই গঙ্গারাম। গঙ্গারাম কেন গঙ্গারামকে কিল করবে, এটা একটা রহস্য নয় স্যার?'

'অবশ্যই।' কর্নেল পর্যায়ক্রমে টাক এবং সাদা দাড়িতে ঘন ঘন হাত বুলোতে থাকলেন।

বুঝলুম, রহস্যটা মনে ধরেছে আমার বৃদ্ধ বন্ধুর। তাতে আরও একটু জোগান দেওয়ার ইচ্ছেয় বললুম, 'রাত্তিরে চোর এসে শিস দিচ্ছিল বললেন হালদারমশাই!'

হালদারমশাই বললেন, 'আর পাখিটাও পালটা শিস দিচ্ছিল! মজাটা বুঝুন একবার।'

কর্নেল একটু হাসলেন। 'সুতরাং রহস্য ঘনীভূত হল বলা যায়।'

আমি বললুম, 'হালদারমশাই, এর সঙ্গে সেই অদৃশ্য হতে পারা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন সাধুর ব্যাপারটার কোনও যোগাযোগ নেই তো?'

হালদারমশাই এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে নিয়ে চাপা স্বরে বললেন, 'আছে বলেই তো কর্নেলস্যারের কাছে আসা। ট্রেনে পাখিটাকে লুকিয়ে আনছিলুম। নইলে রেলবাবুরা আপত্তি করতেন। তো মাঝরাত্তিরে হঠাৎ চোখ খুলে দেখি, এক সাধু আমার বাংকের কাছে এসে উঁকিঝুঁকি মারছে। তড়াক করে উঠে বসেছি। আর অবাক কাণ্ড, সাধু অদৃশ্য। বেমালুম হাওয়া।'

কর্নেল বললেন, 'আশা করি, স্বপ্ন দেখছিলেন না?'

'কখনও না। ট্রেন জার্নিতে আদপে আমার ঘুম হয় না।'

আবার ফোন বাজল। কর্নেল ফোন তুলে সাড়া দিয়েই কৃতান্ত হালদারকে দিলেন। হালদারমশাই আগের মতো চড়া গলায় বললেন, 'দুলাল?...কী? লোম? সাদা লোম? বলিস কী?...যাচ্ছি। এখনই যাচ্ছি।'

ফোন ছেড়ে উত্তেজিতভাবে হালদারমশাই বললেন, 'কর্নেল, এক্ষুনি আমার সঙ্গে চলুন দয়া করে। খাঁচায় আর বারান্দা জুড়ে একগাদা সাদা লোম দেখতে পেয়েছে দুলাল। কী সাংঘাতিক রহস্য বুঝুন।'

দুই

'এই লোমরহস্য আমার তত সাংঘাতিক মনে হচ্ছে না হালদারমশাই', কর্নেল সাদা লোমগুলো পরীক্ষা করতে করতে বললেন। 'এগুলো নিছক বাঁদরের লোম। তবে সাধারণ বাঁদর নয়, খুদে বাঁদর। স্কুইরেল মাংকি বলে যাদের।'

কৃতান্ত হালদার অবাক হয়ে বললেন, 'স্কুইরেল মানে তো কাঠবেড়ালি।'

'হ্যাঁ। কাঠবেড়ালির সঙ্গে অনেকটা মিল আছে বটে। বাঁদরটা দশ-বারো ইঞ্চি লম্বা। দিব্যি পকেটে রাখা যায়।'

'কিন্তু এখানে কোত্থেকে এল অমন উদ্ভুট্টে জীব? কিছু যে বোঝা যাচ্ছে না স্যার!'

কর্নেল গ্রিল-দেওয়া বারান্দায় একটু ঘোরাঘুরি করে এদিকে-ওদিক দেখে নিয়ে বললেন, 'পাখিটার কিছু পালক পড়ে আছে দেখেও বুঝতে পারছেন না?'

'আমার বুদ্ধিসুদ্ধি গুলিয়ে গেছে, কর্নেল!' বারান্দায় একটা চেয়ারে হতাশভাবে বসে পড়লেন হালদারমশাই। 'ডাক্তার পরের রোগ ধরে চিকিৎসা করেন! কিন্তু নিজের রোগ হলে অন্য ডাক্তার ডাকেন। কেন ডাকেন, হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারছি। উরেব্বাস! বিস্তর রহস্য ঘেঁটেছি, এবার আমাকেই রহস্য-রোগ এসে জাপটে ধরেছে।'

কর্নেল হাসলেন। 'স্কুইরেল মাংকির লোম আর ময়নাপাখির পালক পড়ে থাকাটা মূল রহস্যরোগ নয়, হালদারমশাই! নেহাত উপসর্গ।'

কখন থেকে মুখ খোলার জন্য উসখুস করছিলুম। এবার বললুম, 'ব্যাপারটা ধরতে পেরেছি মনে হচ্ছে।'

কর্নেল বললেন, 'বলো ডার্লিং!'

'কেউ একটা ট্রেন্ড খুদে বাঁদর পাঠিয়ে পাখিটা খাঁচা থেকে হাতিয়ে নিয়েছে। মিথ্যা করে বাইরের দরজায় কলিং বেল টিপেছে। দুলাল দেখতে গেছে কে ডাকছে, আর এদিকে তার বাঁদর গ্রিলের ভেতর দিকে ঢুকে খাঁচা খুলে পাখিটা ধরেছে। পাখি আর বাঁদরে একটু ধস্তাধস্তি হওয়া স্বাভাবিক। তাই এসব লোম আর পালক।'

কৃতান্ত হালদার লাফিয়ে এসে আমাকে জাড়িয়ে ধরলেন। 'শাবাশ জয়ন্তবাবু! শাবাশ! দেখছেন? এই সামান্য ব্যাপারটা কিছুতেই আমার মাথায় আসছিল না।'

কর্নেল ততক্ষণে বাইরে চলে গেছেন। বাড়িটা একতলা এবং পুরনো পূর্ব শহরতলি এলাকার

নিরিবিলি পরিবেশে অবস্থিত। আশেপাশে পোড়ো জঙ্গলে জমি, একটা পুকুর আর প্রচুর গাছপালাও রয়েছে। কিছু নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে এখানে-ওখানে। তার ওপরে একটা বিস্তীর্ণ মুসলিম গোরস্থান। এমন জায়গায় শুধু চোর কেন, ভূতপেরেতদেরও দিনদুপুরে হানা দেওয়া স্বাভাবিক।

হালদারমশাইয়ের ভাগ্নে শ্রীমান দুলালের বয়স পনেরো-ষোলোর বেশি নয়। সবে স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে। এখনও রেজাল্ট বেরোয়নি। মামার মতোই লম্বাটে ছিপছিপে গড়ন। মুখচোরা ছেলে বলে মনে হচ্ছিল। এই কাণ্ডের পর বেচারা ভীষণ মুষড়ে পড়েছে। দেয়ালে হেলান দিয়ে প্যাটপ্যাট করে তাকাচ্ছে খালি। আমার কথা শোনার পর সে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। বাইরের দরজা খুলে কাউকে দেখতে না পেয়ে যখন রাস্তা দেখছি, পাখিটার চ্যাঁচামেচি কানে এসেছিল যেন। এতক্ষণে মনে পড়ল।'

ভাগ্নেকে ভেংচি কেটে হালদারমশাই বললেন, 'অ্যাঁতক্ষণে মনে পড়ল! স্কুলে তুই স্ট্যান্ড করিস না হাতি করিস! মুখস্থ বিদ্যের শিরোমণি! রিয়্যাল লাইফে তুই স্ট্যান্ড করতে পারবি ভেবেছিস? সে-গুড়ে বালি।'

দুলালকে কাছে টেনে নিয়ে বললুম, 'আহা! মিছিমিছি ওকে বকবেন না হালদারমশাই! আপনি বাড়িতে একা থাকলেও একই ব্যাপার ঘটত না কি?

বুঝতে পেরে হালদারমশাই ধাতস্থ হলেন। গোঁফ চুলকে বললেন, 'কিন্তু মাই নেম ইজ গঙ্গারাম। আই অ্যাম কিল্‌ড বাই গঙ্গারাম। ব্যাপারটা কী বলুন তো? পাখিটা এমন উদ্ভুট্টে কথা শিখল কী করে? ধরে নিচ্ছি, কেউ শিখিয়েছে। কিন্তু গঙ্গারাম গঙ্গারামকে খুন করে কীভাবে? সুইসাইড মনে হয় না আপনার?'

বললুম, 'হ্যাঁ, সুইসাইড ধরে নিলে একটা অর্থ দাঁড়ায়।'

কর্নেল বাইরে থেকে ঘুরে এসে বললেন, 'এখানে আর কোনও সূত্র মিলবে না, হালদারমশাই! কোদণ্ডগিরিতে গেলে কিছু সূত্র মিলতেও পারে। পাখিটা যখন সেখানেই পেয়েছিলেন!'

হালদারমশাই বললেন, 'তা না হয় যাওয়া গেল। কিন্তু গঙ্গারাম ইজ কিল্‌ড্ বাই গঙ্গারাম ব্যাপারটা যে আত্মহত্যা, তাতে জয়ন্তবাবু আর আমি একমত হয়েছি কর্নেল স্যার!'

কর্নেল আনমনে বললেন, 'পাখির কথা ঠিকমতো বুঝতেও ভুল হতে পারে। আমি একবার শুনতে পেলে হয়তো বুঝতে পারতুম, ঠিক কী বলছে।'

দুলাল নড়ে উঠল। 'আমি টেপ করে রেখেছি। শুনবেন?' বলে দৌড়ে সে ঘরে গিয়ে ঢুকল। তারপর একটা টেপরেকর্ডার নিয়ে এল।

কৃতান্ত হালদার খি-খি করে হেসে বললেন, 'ওর জন্মদিনে আমার ছোটবোন—মানে ওর মাসি প্রেজেন্ট করেছে। দেখছেন কাণ্ড? পাখির কথা টেপ করে বসে আছে।'

টেপ চালিয়ে দিল দুলাল। প্রথমে কিছুক্ষণ কাক আর চড়ুইদের ডাক শোনা গেল। তারপর শোনা গেল দুলালের গলা। 'নাও বিগিন মিঃ ব্ল্যাকি! বিগিন!....ও নো নো! প্লিজ মিঃ ব্ল্যাকি!' তারপর শিসের শব্দ। ময়নাপাখির গায়ের রং কালো। ঠোঁট টুকটুকে হলুদ। দুলাল ওকে মিঃ ব্ল্যাকি নাম দিয়েছিল তাহলে। একটু পরেই ব্ল্যাকির কথা শোনা গেল : 'মাই নেম ইজ গঙ্গারাম। আই অ্যাম কিল্‌ড্ বাই গঙ্গারাম।' একবার নয়। বার পাঁচ-ছয় একই কথা।

কর্নেল বললেন, 'আরেকবার টেপটা চালাও তো দুলাল।'

দুলাল টেপটা উলটো দিকে ঘুরিয়ে নিল রিভার্স বোতাম টিপে। তারপর প্লে বোতামটা টিপল। আবার সেইসব শব্দ। দুলালের কথা। তারপর পাখির গলা।

কর্নেল চোখ বুজে শুনছিলেন। দুলাল টেপ বন্ধ করে বলল, 'আবার চালাব কর্নেলদাদু?'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'না। হালদারমশাই, আপনি ভুল শুনেছেন।'

'ভুল?' হালদারমশাই বললেন। 'সে কী! গঙ্গারামই তো বলল। তাই না জয়ন্তবাবু?'

সায় দিয়ে বললুম, 'তাই তো মনে হল।'

কর্নেল বললেন, 'পাখিটা বলছে, মাই নেম ইজ গঙ্গারাম। আই অ্যাম কিল্‌ড্ বাই বংকারাম।'

'বংকারাম! এমন নাম আবার হয় নাকি? গঙ্গারাম নাম শুনেছি বটে।'

'হয় ডার্লিং!' কর্নেল একটু হাসলেন। 'কোদণ্ডগিরি তো ওড়িশায়। ওড়িশায় বংকাবিহারী, বংকারাম এসব নাম খুব কমন।'

হালদারমশাই উত্তেজিতভাবে বললেন, 'তাহলে তো আর দেরি করা উচিত নয়, স্যার! এখনই কোদণ্ডগিরি রওনা দিতে হয়।'

একটু পরে হালদারমশাইয়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লুম আমরা। বেলা প্রায় বারোটা বাজে। আমার সাদা ফিয়াট গাড়িটা আস্তেসুস্থে চালিয়ে আনছিলুম। দু'দিন থেকে গণ্ডগোল করছে গাড়িটা। যখন-তখন অদ্ভুত শব্দ করতে করতে স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। একটু ঠেলে দিলে আবার স্টার্ট নিচ্ছে অবশ্য। ওবেলা গ্যারেজে না দিলেই নয়।

আজ হালদারমশাইয়ের বাড়ি আসার সময় কোনও গণ্ডগোল করেনি। কিন্তু ফেরার পথে সুন্দরীমোহন অ্যাভেনিউতে পৌঁছেই ঘড়ঘড় করতে করতে থেমে গেল। একটু হেসে বললুম, 'কর্নেল। ঠেলতে হবে।'

কর্নেল গুম হয়ে বসে ছিলেন। চোখ বন্ধ এবং দাড়িতে আঙুলের চিরুনি। বুঝতে পারছিলুম, গোয়েন্দাপ্রবর গঙ্গারাম বনাম বংকারাম নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। আমার কথায় চোখ খুলে বেজায় চমকানো গলায় বললেন, 'কী বললে?'

'ঠেলতে হবে।' বলে দরজা খুলে সবে নেমেছি, অবাক হয়ে দেখলুম কর্নেলও হন্তদন্ত নামলেন বটে, কিন্তু নেমেই প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে হঠাৎ দৌড়তে শুরু করেছেন। হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। তারপর দেখি উনি সামনের বাসস্টপে সদ্য-এসে-দাঁড়ানো একটা বাসের পাদানিতে উঠে পড়লেন। তারপর বাসটা ছেড়ে গেল।

এতকাল ধরে ওঁর বিস্তর উদ্ভুটে আচরণ দেখে আসছি। কিন্তু এমনটি কখনও দেখিনি। রাগ করার মানে হয় না, বিশেষ করে এমন একটা ক্ষেত্রে। ফুটপাথের বাসিন্দা একদঙ্গল ছেলে আমার অবস্থা দেখে দৌড়ে এল। তাদের কিছু বলতে হল না। তারা গাড়িটা ঠেলতে শুরু করল। গাড়ি স্টার্ট নিলে তাদের বখশিশ দিয়ে নিজের ডেরায় ফিরে চললুম।

ছুটির দিন আজ। কাগজের আপিসে যাওয়ার তাড়া নেই। খেয়েদেয়ে অভ্যাসমতো ভাতঘুম দিয়ে যখন উঠে পড়লুম, তখন প্রায় পাঁচটা বাজে। মার্চের মাঝামাঝি বেশ গরম পড়েছে। লোডশেডিং না হয়ে গেলে ছ'টা অব্দি বিছানায় পড়ে থাকতুম।

ব্যালকনিতে বসে তারিয়ে-তারিয়ে চা খাচ্ছি, আমার রাঁধুনি-কাম-কাজের ছেলে ফটিক এসে বলল, 'সেই দাড়িওলা সায়েব এসেছেন দাদাবাবু!'

তারপর কর্নেলের গলা শুনতে পেলুম 'ডার্লিং, আশা করি এ বুড়োর ওপর থেকে রাগটা এতক্ষণে পড়ে গেছে। হুঁ, মুখের অবস্থা দেখে বুঝতে পারছি, প্রিয় ভাতঘুমখানা চমৎকারই হয়েছে। রাগের পক্ষে নিরেট একখানা ঘুমই যথেষ্ট। যাই হোক, ঝটপট তৈরি হয়ে নাও। কোদণ্ডগিরি এক্সপ্রেস ট্রেন সওয়া ছ'টায় ছাড়বে হাওড়া থেকে। ভাগ্যিস মিঃ রাঘবনকে ফোনে পেয়েছিলুম। আস্ত একখানা ক্যুপের ব্যবস্থা করা গেছে।' কর্নেল আমার কাঁধে থাবা হাঁকড়ালেন। 'উঠে পড়ো, উঠে পড়ো! হালদারমশাই এতক্ষণে স্টেশনে পৌঁছে হাপিত্যেশ করছেন আমাদের জন্য।'

কিছুক্ষণ পরে ট্যাক্সিতে যেতে যেতে ভাবলুম, তখন অমন করে হঠাৎ আমাকে ফেলে পালিয়ে যাওয়ার কারণ জানতে চাইব। কিন্তু গোয়েন্দাপ্রবর তখনকার মতো চোখ বুজে দাড়িতে আঙুলের

চিরুনি চালাচ্ছেন এবং বলা যায় না, তখনকার মতোই যদি হঠাৎ 'রোখ্‌কে' বলে ট্যাক্সি থামিয়ে আবার বেমক্কা অদৃশ্য হয়ে যান। ওঁকে বিশ্বাস নেই। অতএব চেপে গেলুম।

দশ নম্বর প্ল্যাটফর্মের গেটে কৃতান্ত হালদার দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাদের দেখে উত্তেজিতভাবে চাপা গলায় বললেন, 'পাখি বাঁদর সাধু! সব একত্র, সব!'

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, 'একবার শরীরী, একবার অশরীরী? এই আছে, এই নেই!'

হাত প্রচণ্ড নেড়ে হালদারমশাই ফিসফিস করে বললেন, 'আপন্ গড। একটু আগে এক সাধু আমার দিকে চোখ কটমট করে তাকাতে তাকাতে প্ল্যাটফর্মে ঢুকল। তার কাঁধের ঝোলায় স্পষ্ট দেখলুম একটুকু একটা বাঁদরের মুণ্ডু উঁকি মেরে আছে।'

বললুম, 'আর পাখি?'

কর্নেলের পিছন-পিছন হালদারমশাই প্ল্যাটফর্মে ঢুকে তেমনি ফিসফিসিয়ে বললেন, 'পাখিটা নির্ঘাত ঝোলার ভিতর আছে। এটা অঙ্কের ব্যাপার, বুঝলেন না? সাধু আর বাঁদর যেখানে, পাখি সেখানে থাকতে বাধ্য। আর জানেন? সাধু একা নয়, তার সঙ্গে একজন চেলাও আছে দেখলুম।'

কোদণ্ডগিরি এক্সপ্রেস দাঁড়িয়ে ছিল প্ল্যাটফর্মে। আমাদের ক্যুপেটা পিছনে গার্ডের কামরার লাগোয়া। সামনে একটা গুডস কম্পার্টমেন্ট। ছোট্ট ক্যুপে মাত্র তিনটে বাংক। জিনিসপত্র রেখে আমি ও কর্নেল বসে পড়লুম। হালদারমশাই সাধুবাবাকে খুঁজতে গেলেন। গাড়ি ছাড়ার এখনও মিনিট-দশেক দেরি আছে। ভাবলুম, ট্রেন ছাড়লে তবে কর্নেলের অমন করে ছুটে গিয়ে বাসে ওঠার ব্যাপারটা তুলব। কর্নেল আর যাই করুন চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ দেবেন না নিশ্চয়।

কর্নেল চুরুটের বাক্স বের করে পছন্দসই একটা চুরুট বেছে নিলেন। তারপর লাইটার জ্বেলে চুরুটটা ধরিয়ে একরাশ ধোঁয়ার মধ্যে হঠাৎ বললেন, 'ডঃ সীতাকান্ত পট্টনায়কের কথা তোমার মনে থাকা উচিত, ডার্লিং।'

একটু অবাক হয়ে বললুম, 'খুব মনে আছে। ফরেনসিক এক্সপার্ট সেই ওড়িয়া ভদ্রলোক তো?'

'শুধু ফরেনসিক এক্সপার্ট নন উনি, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাতেও ওঁর অগাধ জ্ঞান। যেমন ধরো, আণবিক জীববিজ্ঞান জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান। এমনকী, সম্প্রতি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ওপর ওঁর একটা গবেষণাপত্র বিদেশে খুব হইচই সৃষ্টি করেছে। এমন অল-রাউন্ডার জিনিয়াস সচরাচর দেখা যায় না—বিশেষ করে যুগটা যখন স্পেশালিস্টদেরই, তখন এতগুলো বিদ্যায় যিনি সমান স্পেশালিস্ট তাঁকে এতদিন কেন নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়নি, জানি না।'

কর্নেলের বক্তব্যের উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে বললুম, দেবে'খন। কিন্তু হঠাৎ ডঃ পট্টনায়কের কথা কেন?'

কর্নেল হাসলেন। 'সম্প্রতি ডঃ পট্টনায়ক কলকাতা এসেছেন। সুন্দরীমোহন অ্যাভেনিউতে ফরেনসিক ল্যাবরেটরি এবং ডিটেকটিভ ট্রেনিং সেন্টারটা তুমি দেখে থাকবে, জয়ন্ত। আজ রবিবার বারোটায় ওঁর সেখানে একটা লেকচার দেওয়ার কথা ছিল।'

'কী কাণ্ড!' হাসতে হাসতে বললুম। 'তাই হঠাৎ অমন করে দৌড়ে গেলেন—'

আমার কথা কেড়ে কর্নেল বললেন, 'তুমি যেই বললে 'ঠেলতে হবে' অমনি প্রাচীন গ্রিক বিজ্ঞানী আর্কিমেডিসের মতো আমার মাথা খুলে গিয়েছিল। সেই ইউরেকা ব্যাপারটা ঘটে গিয়েছিল আর কি! তক্ষুনি ফরেনসিক ল্যাবরেটরির হলে পৌঁছে ডঃ পট্টনায়কের কানে কানে বললুম, রহস্য ফাঁস করেছি ডঃ পট্টনায়ক! PUSHPA শব্দটা আসলে PUSH PANEL A অর্থাৎ এ-মার্কা প্যানেলটা ঠেলতে হবে। খামোখা পুষ্প বা ফুল নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলুম।'

'কিন্তু জিনিসটা কী?'

'জিনিসটা আজ সকালে তুমি আমার হাতে দেখেছ, ডার্লিং!'

'ভ্যাট! ওটা তো একটুকরো হাড় বলে মনে হচ্ছিল, কিংবা পাথুরে ফসিল!'

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন, 'মোটেও না জয়ন্ত। ছোট্ট মাউথ অর্গানের মতো জিনিসটা আসলে একটা রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্র। দুটো প্যানেলে ভাগ করা, এ এবং বি। এ-কে ঠেলে দিতেই ওটা চালু হয়ে গেল। কিন্তু আমার বা ডঃ পট্টনায়কের তো জানা নেই মূল কোন যন্ত্রকে এটা চালিত করে দূর থেকে। তাই সঙ্গে সঙ্গে বি প্যানেলটা ঠেলে নিষ্ক্রিয় করে দিলুম। হ্যাঁ তোমাকে বলা উচিত, এই অদ্ভুত যন্ত্রটা মাস দুই আগে পট্টনায়কই কুড়িয়ে পেয়েছিলেন পার্বতী নদীর বালির চড়ায়। বালিতে প্রায় পুরোটা ঢাকা অবস্থায় ছিল। কিন্তু সিলিকন ধাতুর পাতে মোড়া। তাই ময়লা হয়ে গেলেও নষ্ট হয়ে যায়নি।'

'পার্বতী নদীর নাম তো কখনও শুনিনি! সেটা আবার কোথায়?'

'কোদণ্ডগিরি এলাকায়।'

'কী?' আমি নড়ে বসলুম এবং ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম।

কর্নেল চুরুটের ধোঁয়ার মধ্যে বললেন, 'সুতরাং হালদারমশাই আসার আগেই কোদণ্ডগিরি যাত্রার জন্য তৈরি হচ্ছিলুম ভেতর-ভেতর। যথাসময়ে জানতে পারতে। আশা করি, কাল সকালের মধ্যে ডঃ পট্টনায়কও প্লেনে ভুবনেশ্বর পৌঁছে যাবেন। কোদণ্ডগিরি টাউনশিপে আমাদের সাক্ষাৎ হবে। তারপর কাজে নামব আমরা।'

এই সময় হালদারমশাই হাঁফাতে হাঁফাতে এসে পড়লেন। চাপা গলায় বললেন, 'সাধু, পাখি, বাঁদর—সব একত্র। সামনে দুটো কম্পার্টমেন্টের পরেরটায় উঠেছে। কর্নেলস্যার। রহস্য একেবারে জমজমাট।'

তিন

হালদারমশাই বলেছিলেন, ট্রেন জার্নিতে তাঁর নাকি আদপে ঘুমই হয় না। অথচ সারা পথ দেখলুম, দিব্যি নাক ডাকিয়ে ওপরের বাংকে ঘুমোচ্ছেন। ভোর সাড়ে-ছ'টায় কোদণ্ডগিরি স্টেশনে যখন ট্রেন ঢুকছে, তখন উনি ঘুমে কাঠ। ওঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেওয়ামাত্র তড়াক করে উঠে বসলেন এবং বললেন, 'খড়গপুর এল মনে হচ্ছে।'

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, 'না হালদারমশাই, কোদণ্ডগিরি এসে গেছি। নিন, উঠে পড়ুন।'

হালদারমশাই 'অ্যাঁ' বলে দমাস করে বাংক থেকে লাফ দিলেন। ট্রেন তখনও থেমে যায়নি। সে অবস্থায় দরজা খুলে প্ল্যাটফর্মে আর একটা ঝাঁপ দিলেন। আছাড়ও খেলেন দেখলুম। তারপর আর ওঁকে দেখতে পেলুম না। বুঝলুম সাধু, পাখি ও বাঁদরের খোঁজেই উধাও হলেন।

সত্যিই উধাও। প্ল্যাটফর্মে বিস্তর ছোঁড়াছুঁড়ি করেও আর ওঁর পাত্তা পাওয়া গেল না। অগত্যা ওঁর বোঁচকা আমাকেই বইতে হল। কর্নেলকে কিন্তু একটুও উদ্বিগ্ন মনে হল না। নির্বিকার মুখে বললেন, 'চলো জয়ন্ত, আমাদের এখন প্রায় বারো কিলোমিটার পাড়ি জমাতে হবে। হালদারমশাইয়েরই ভাগ্নেবাড়ি। কাজেই যথাসময়ে উনি পৌঁছে যাবেন।'

একটা অটো-রিকশো ভাড়া করে আমরা রওনা দিলুম। আমার কিন্তু ব্যাপারটা মোটেও ভাল ঠেকছিল না। হালদারমশাই কোনও বিপদে পড়েননি তো? কর্নেল সেটা আঁচ করে মৃদু হেসে বললেন, 'ভেবো না জয়ন্ত! হালদারমশাই সারা জীবন পুলিশে চাকরি করেছেন। তত নিরীহ মানুষ নন।'

তবু আমার উদ্বেগ রয়ে গেল। স্টেশনের আশেপাশে খনি এলাকা। চারদিকে রুক্ষ টিলা পাহাড় আর কলকারখানা। অনেকটা গিয়ে তারপর সবুজের ছোপ চোখে পড়ল। পুরনো কোদণ্ডগিরি আসলে একটা গ্রাম। তার পাশে দিয়ে হাইওয়ে চলে গেছে। পার্বতী নদীর ব্রিজ পেরিয়ে টাউনশিপ

শুরু। এটাই নতুন কোদণ্ডগিরি এবং চেহারা-চরিত্রে আধুনিক শহর। এবার উঁচু পাহাড় চোখে পড়ছিল। টাউনশিপটা সেই সব পাহাড়ের মাঝখানে এক উপত্যকায় গড়ে উঠেছে।

টাউনশিপ ছাড়িয়ে আবার পার্বতী নদী চোখে পড়ল। একেবারে নদীর ধারেই একটা টিলার গায়ে সুন্দর ছবির মতো একটা বাংলোবাড়ি দেখিয়ে কর্নেল বললেন, 'ওই দ্যাখো জয়ন্ত, ওটাই কোদণ্ডগিরি ফরেস্ট কনজারভেটর প্রদীপ রায়ের বাংলো। আমাদের হালদারমশাইয়ের অসংখ্য ভাগ্নের একজন।'

বলে উনি বাইনোকুলারে সম্ভবত পাখি খুঁজতে থাকলেন। হাইওয়ে ছেড়ে আমাদের অটো-রিকশো প্রাইভেট রোডে ঢুকল। রাস্তাটা এঁকেবেঁকে টিলায় উঠেছে। গেটের কাছে একজন শক্তসামর্থ গড়নের এবং সাদা স্পোর্টিং শার্ট, শর্টস ও টেনিস জুতো পরা ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর মাথার টুপিটাও সাদা। আমাদের হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন। ইনিই প্রদীপ রায়।

প্রদীপবাবু একটু হেসে বললেন, 'একটু আগে মামাবাবু ফোন করছিলেন স্টেশন থেকে। একটা কাজে আটকে গেছেন। পৌঁছুতে সামান্য দেরি হতে পারে। অবশ্য আপনাদের খবরও মামাবাবু জানিয়ে দিয়েছেন। আমি দুঃখিত, কাল থেকে আমার জিপটা গ্যারাজে। নইলে আপনাদের আনার জন্য পাঠিয়ে দিতুম।'

তাহলে গোয়েন্দাগিরিতে পুরোপুরি নেমে পড়েছেন হালদারমশাই। হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বেন না। বাংলোর দক্ষিণ-পূর্ব কোনার সবচেয়ে সুন্দর ঘরখানায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেছেন প্রদীপবাবু। দ্রুত ব্রেকফাস্ট খাইয়ে দিলেন আমাদের। তারপর কফির পেয়ালা হাতে গল্প করতে থাকলেন আমাদের সঙ্গে। আমাদের আসার কথা গতকাল বিকেলেই ট্রাঙ্ককল করে জানিয়ে দিয়েছেন হালদারমশাই। ভুবনেশ্বর থেকে ডঃ সীতাকান্ত পট্টনায়কের আসার কথাও বলেছেন।

আমরা দক্ষিণের বারান্দায় বসে ছিলুম। পার্বতী নদী এই টিলার পূর্ব ও দক্ষিণ দিয়ে বইছে। কিছুটা এগিয়ে বাঁক নিয়ে পাহাড়ের ভেতর অদৃশ্য হয়েছে। নদীটা মাঝারি গড়নের। বিশেষ জল নেই,খালি বালি আর পাথরে ভর্তি। ওপারে ঘন জঙ্গল দেখা যাচ্ছিল। কাছে এবং দূরে প্রায় সব পাহাড়ই জঙ্গলে ঢাকা। এই জঙ্গল পুরোটাই সংরক্ষিত এবং পশুপাখিদের অভয়ারণ্য। তাই গাছ কাটতে দেওয়া হয় না। প্রদীপবাবু বলছিলেন, তবু লুকিয়ে গাছ কেটে নিয়ে যায় লোক। চোরাশিকারিদেরও খুব উপদ্রব। কালই একটা শম্বর মেরেছিল। নিয়ে যেতে পারেনি ফরেস্ট গার্ডদের তাড়া খেয়ে। শেষে শম্বরের মাংসটা আদিবাসীদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হল। এই জঙ্গলকে ওরা প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। তাই চোরাশিকারি বা গাছ চোরদের দেখলে ওরা নিজেরাই তাড়া করে, আবার খবরও দিয়ে যায় চুপিচুপি।

কর্নেল হঠাৎ বললেন, 'আপনার মামাবাবু একটা ময়নাপাখি কিনেছিলেন এখানে। পাখিটা নাকি অদ্ভুত কথা বলে!'

প্রদীপবাবু বললেন, 'হ্যাঁ—পাখিটা চুরি গেছে শুনলুম। ব্যাপারটা ভারি অদ্ভুত, জানেন? দিন-পনেরো আগে মামাবাবু এসেছিলেন বেড়াতে। যাওয়ার দিন জঙ্গলে কোথায় একটা আদিবাসী ছেলের কাছে পাখিটা কেনেন। পাখিটা আর কোনও কথা বলে না। খালি বলে, 'মাই নেম ইজ গঙ্গারাম। আই অ্যাম কিল্‌ড্‌ বাই গঙ্গারাম'। গঙ্গারাম কে, কে জানে! আর গঙ্গারাম গঙ্গারামকে খুন করল, এর মানেই বা কী?'

কর্নেল বললেন, 'উঁহু ভুল শুনেছেন। কথাটা হবে 'আই অ্যাম কিল্‌ড্‌ বাই বংকারাম।' গঙ্গারাম নয়।

চার

প্রদীপবাবু চমকে উঠে বললেন, 'বংকারাম! কী আশ্চর্য!'

কর্নেল বললেন, 'চেনেন নাকি বংকারামকে?'

'চিনতুম—খুবই চিনতুম,' প্রদীপবাবু অবাক হয়ে বললেন। 'ওঁকে এখানকার লোকে বাবু বংকারাম সেনাপতি বলে জানত। রাজাগজা লোক বললেই চলে। পুরনো কোদণ্ডগিরিতে ওঁর বাড়ি। ওঁর পূর্বপুরুষেরা নাকি এই কোদণ্ডগিরি পরগনার শাসক ছিলেন। পরে রাজত্ব ঘুচে গিয়েছিল ইংরেজের কোপে পড়ে। সেটা ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের সময়কার ঘটনা। যাই হোক, বাবু বংকারাম ছিলেন দুর্ধর্ষ প্রকৃতির লোক। পুলিশের খাতায় খুনে ডাকাত বলে নাম লেখা ছিল। কিন্তু পুলিশ ওঁকে কিছুতেই ধরতে পারছিল না। গত বছর মার্চ মাসে জঙ্গলের ভেতর একটা ঝরনার কাছে দেখি, একটা খাকি পোশাক পরা লোক রাইফেল হাতে নিয়ে বসে আছে। এ জঙ্গলে শিকারের পারমিশন দেওয়া হয় না। তাই সোজা গিয়ে চার্জ করলুম। লোকটা আমাকে গ্রাহ্যই করল না। বলল, 'আমি কে জানো? বাবু বংকারাম সেনাপতির নাম শুনেছ? আমি সেই।' শুনে তো ভয় পেয়ে গেলুম। ওঁকে ঘাঁটাতে সাহস হল না। তাছাড়া আমি নিরস্ত্র এবং একা ছিলুম। তাই চুপচাপ চলে এলুম। দিন দুই পরে হঠাৎ বাবু বংকারাম সন্ধ্যার সময় আমার এই বাংলোয় হাজির। তাঁকে খাতির করে বসালুম। বাবু বংকারাম বললেন, আমার উপর খুব খুশি হয়েছেন। কারণ পুলিশের কানে তুলিনি যে, ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। এখন আসল কথাটা হল, জঙ্গলের ভেতর ওঁর কিছু গোপন কাজকর্ম আছে। জঙ্গলের রেঞ্জার বা গার্ডদের যেন আমি সাবধান করে দিই, ওঁকে দেখতে পেলেও যেন না ঘাঁটায় এবং পুলিশের কানে না তোলে। আদিবাসীরা ওঁর ভক্ত। কাজেই তারা ওঁর বিরুদ্ধে কিছু করবে না।'

প্রদীপবাবু দম নিয়ে ফের বললেন, 'তার কিছুদিন পরে সেই ঝরনার ধারে বাবু বংকারামের ডেডবডি পাওয়া গেল।'

কর্নেল নড়েচড়ে বসলেন। বললেন, 'ডেডবডি?'

'হ্যাঁ। গলায় একটা মিহি নাইলনের দড়ির ফাঁস অটকানো। জিভ বেরিয়ে রয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, দড়িটা অন্তত সাত-আট মিটার লম্বা। কেউ যেন অতটা দূর থেকে হ্যাঁচকা টানে শ্বাস রুদ্ধ করে ওঁকে মেরে ফেলেছে।'

আমি বললুম, 'আত্মহত্যা নয় তো?'

প্রদীপবাবু জোর গলায় বললেন, কক্ষনো নয়। অমন মিহি দড়ি—প্রায় সুতোই বলতে পারেন, তা দিয়ে আত্মহত্যা করা যাবে কীভাবে? গাছের ডালে বেঁধে ঝুলে পড়লেই তো ছিঁড়ে যাবে। তাছাড়া জায়গাটা ফাঁকা। ঝোপঝাড় অবশ্য আছে প্রচুর। কিন্তু কাছাকাছি দশ-বারো বর্গমিটারের মধ্যে কোনও উঁচু গাছই নেই।'

কর্নেল বললেন, 'রাইফেলটা?'

'ওঁর রাইফেলটার কথা বলছেন কি? নাঃ, ওটা পাওয়া যায়নি। যে ওঁকে ফাঁস আটকে মেরেছিল, সম্ভবত সেই নিয়ে পালিয়েছিল। পুলিশের সন্দেহ, কাজটা গোপেশ্বর নামে ওঁর এক স্যাঙাতের। সে-ও সাংঘাতিক লোক।'

কর্নেল দাড়ি চুলকে বললেন, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে, পাখিটার কথা যদি সত্যি হয়, গঙ্গারামকে বংকারাম খুন করেছিল এবং শেষে বংকারামকেও কেউ খুন করল।'

আমি বললুম, 'গঙ্গারামের অনুগত গোপেশ্বর প্রতিশোধ নিয়ে থাকবে।'

প্রদীপবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'মামাবাবু যদি পাখিটার কথা বুঝতে ভুল না করতেন, তাহলে বাবু বংকারামের হত্যা-রহস্য নিয়ে উঠে-পড়ে লাগতেন।'

কর্নেল বললেন, 'আপাতত আপনার মামাবাবু গঙ্গারামের হত্যারহস্য নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন। দেখা যাক, কত দূর এগোতে পারেন। তবে এটুকু বলতে পারি, শেষ পর্যন্ত বংকারামের হত্যারহস্যেই জড়িয়ে পড়বেন হালদারমশাই—বিশেষ করে সাধু, পাখি, আর বাঁদরের নাগাল যখন পেয়ে গেছেন।'

'সাধু, পাখি আর বাঁদর? সে আবার কী?'

কর্নেল সংক্ষেপে ঘটনাটা বললেন। শোনার পর প্রদীপবাবু খুব অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ,—সাধুর ব্যাপারটা কিন্তু সত্যি আশ্চর্য, জানেন? ইদানীং সারা এলাকা জুড়ে খালি ওই নিয়ে আলোচনা। যাকে জিজ্ঞেস করবেন, সে-ই বলবে, সে স্বচক্ষে দেখেছে এক সাধুবাবা হঠাৎ তার সামনে দেখা দিয়েই নাকি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন।'

কর্নেল বললেন, 'আপনার মামাবাবুও নাকি দেখেছেন স্বচক্ষে!'

'হ্যাঁ—মামাবাবু নাকি জঙ্গলের ভেতর সেই ঝরনার কাছে দেখেছেন। আর লোকেরা দেখেছে রাস্তাঘাটে, বাড়ির দরজায়, কিংবা নিরিবিলি গাছতলায়। এমনকী, আমার রাঁধুনি হলধর ঠাকুর দেখেছে কিচেনের জানালার বাইরে। ডাকব নাকি ওকে?' প্রদীপবাবু হাসতে লাগলেন।

'না, থাক,' কর্নেল বললেন। 'ব্যাপারটা সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?

প্রদীপবাবু একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'সমস্যা হচ্ছে, মামাবাবুকে অবিশ্বাস করতে বাধছে। নইলে নিছক গুজব বলেই উড়িয়ে দিতে পারতুম। মামাবাবু অবশ্য ভুল দেখতে পারেন, তাও ঠিক। তবে ঝরনার ওখানে পাহাড়ের ওপর এক সাধুকে নাকি আমাদের গার্ডরা কয়েকবার দেখেছিল। অদৃশ্য হতে দেখেনি যদিও। কিন্তু—'

কর্নেল বললেন, 'কিন্তু?'

প্রদীপবাবু একটু হাসলেন। 'ওই ঝরনা সম্পর্কে এখানে খুব ভয়ঙ্কর সব গল্প আছে। জায়গাটা নাকি ভূতের বাথান। রাতবিরেতে আলো-টালো দেখা যায়। হ্যাঁ, আলো আমি নিজেও দেখেছি কয়েকবার। কিন্তু কাল দিনদুপুরে একটা ব্যাপার দেখে খুব অবাক হয়ে গেছি।'

কর্নেল সোজা হয়ে বসে বললেন, 'বলুন।'

'কালকের ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্য, জানেন?' প্রদীপবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন। 'তখন প্রায় একটা বাজে। সবে খাওয়া-দাওয়া করে এই বারান্দায় এসে বসেছি, হঠাৎ দেখি কী—' বলে উনি হাত বাড়িয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আঙুল নির্দেশ করলেন। 'ওই যে ছুঁচলো অদ্ভুত গড়নের পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছেন—নিচের দিকটা কতকটা পিরামিডের মতো আর মাথাটা গির্জার চূড়া বা মিনারের মতো উঠে গেছে?'

দেখতে দেখতে বললুম, 'কী আশ্চর্য! আমি তো ওটা পাহাড়ের ওপর বাদশাহি আমলের কোনও মসজিদের মিনার বলে ভাবছিলুম। আগ্রার কাছে ঠিক এমনি একটি স্থাপত্য দেখেছি।'

প্রদীপবাবু বললেন, 'না। ওটা একটা প্রাকৃতিক স্থাপত্যই বলতে পারেন। লক্ষ্য করে দেখুন, পাহাড়টা যেন বাণ-লাগানো বিশাল এটা ধনুক। কোদণ্ড মানে ধনুক। স্বয়ং শিবের ধনুক। আর গিরি হল পাহাড়। ওই পাহাড়টারই নাম তাই কোদণ্ডগিরি। তাই থেকে এলাকা এবং জনপদটার নামও হয়েছে কোদণ্ডগিরি। তা গতকাল বেলা একটা নাগাদ হঠাৎ দেখি কী, ওই ছুঁচলো চুড়ো থেকে একটা গোলমতো প্রকাণ্ড জিনিস আকাশে ছিটকে গেল। ছাইরঙা মস্ত বড় একটা গোলা যেন। মাত্র কয়েক সেকেন্ড সেটা ভেসে রইল আকাশে। তারপর নেমে এল চুড়োর মাথায়। তারপর আর দেখতে পেলুম না। ভাবলুম চোখের ভুল নাকি!'

কর্নেল নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, 'একটা বাজে তখন?'

'হ্যাঁ! প্রায় একটা।'

'জিনিসটা কয়েক সেকেন্ডের জন্য দেখেছিলেন!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ছাইরঙের গোলাকার জিনিস?'

'হ্যাঁ, প্রকাণ্ড। এখান থেকে ওই পাহাড়টার দূরত্ব প্রায় পাঁচ কিলোমিটার। ঝরনাটা আছে ঠিক তার নিচেই।'

'মিঃ রায়, আপনি নিশ্চয় চন্দ্র-অভিযানের লুনার মডিউলের ছবি দেখেছেন, কিংবা আমাদের দেশ মহাকাশে যেসব কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়েছে, তাদেরও ছবি দেখেছেন?'

প্রদীপবাবু চোখ বড় করে বললেন, 'মাই গুডনেস! আপনি—'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'আপনি সম্ভবত ওই ধরনেরই কোনও জিনিস দেখে থাকবেন। এমনও হতে পারে, জিনিসটা আধুনিক কোনও আকাশযান। তথাকথিত উড়ন্ত চাকি বা ফ্লাইং সসারের মডেলে তৈরি।'

'সে কী!' প্রদীপবাবু নড়ে বসলেন।

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। 'কাল বেলা একটা নাগাদ কয়েক সেকেন্ডের জন্য দেখেছেন তো?' বলে পা বাড়ালেন ঘরের দিকে। 'আমার ধারণা, আমি আপনাদের হয়তো একটা বিস্ময়কর ম্যাজিক দেখাতে পারব। অন্তত নিরানব্বুই শতাংশ চান্স আছে।' কর্নেল পরদা তুলে ঘরে ঢুকে গেলেন।

একটু পরে বেরিয়ে এলেন। হাতে গতকাল সকালে দেখা সেই হাড়ের টুকরো অথবা মাউথ অর্গান অথবা 'রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্র' নিয়ে। চেয়ারে বসে বললেন, 'দেখা যাক, কী ঘটে। মিঃ রায়, জয়ন্ত! তোমরা ওই ছুঁচলো পাহাড়টার দিকে লক্ষ্য রাখো। রেডি—ওয়ান, টু, থ্রি!'

আমাদের চোখের সামনে সকালবেলার উজ্জ্বল রোদে পাঁচ কিলোমিটার দূরের ওই পাহাড়ের ছুঁচলো ডগা থেকে একটা গোলাকার ধূসর রঙের প্রকাণ্ড জিনিস ছিটকে গেল আকাশে। স্থির ভেসে রইল। কর্নেল বললেন, 'বেশিক্ষণ এই ম্যাজিক দেখানো ঠিক নয়। আরও কারুর চোখে পড়তে পারে। অতএব ম্যাজিকের খেলা সাঙ্গ হল। জয়ন্ত, এই খেলাটার নাম দিলাম, কোদণ্ডের টঙ্কার।'

গোলাটা নেমে এসে যেন চূড়ায় মিশে গেল। শ্বাস ছেড়ে বললুম, 'হুঁ—PUSH PANEL A এবং PUSH PANEL B-এর জাদু। কোদণ্ডের টঙ্কার।'

'ঠিক বলেছে ডার্লিং!' বলে কর্নেল প্রদীপবাবুর দিকে ঘুরলেন। প্রদীপবাবু হতবাক হয়ে বসে আছেন।

উনি মুখ খুলতে যাচ্ছেন, এমন সময় ওঁর মালি এসে সেলাম দিয়ে বলল, 'গেটের কাছে এই চিঠ্‌ঠি লটকানো ছিল, স্যার।' প্রদীপবাবু চিঠিটা খুলে পড়ে ভীষণ গম্ভীর মুখে কর্নেলকে এগিয়ে দিলেন। উঁকি মেরে দিখে, ইংরেজিতে যা লেখা আছে, তার মানে হল : 'তোমার আঙ্কেলকে আমরা আটকে রেখেছি। রাত দশটায় ঝরনার কাছে একা দেখা করবে। তখন কথা হবে। সাবধান, গণ্ডগোল বাধানোর মতলব করলে আঙ্কেলের মুণ্ডু উপহার পাবে।'

পাঁচ

বেনামী চিঠিটা পেয়ে প্রদীপবাবু খুব মুষড়ে পড়েছিলেন। কর্নেল ওঁকে আশ্বাস দিয়ে আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। ডঃ সীতাকান্ত পট্টনায়ক দুপুরের আগে এসে পৌঁছতে পারবেন বলে মনে হয় না। ততক্ষণ একটু ঘোরাঘুরির ইচ্ছে হয়েছিল কর্নেলের। রাস্তায় একটা খালি অটো-রিকশো পাওয়া গিয়েছিল। পুরনো কোদণ্ডগিরিতে পৌঁছে কর্নেল হিন্দিতে রাস্তার একটা লোককে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবু বংকারাম সেনাপতির বাড়িটা কোথায়?'

লোকটা অবাক হয়ে আমাদের দেখতে দেখতে বলল, 'বাবু বংকারাম তো মারা গেছেন গত বছর।'

'জানি। তাঁর বাড়িতে তো লোকজন আছে।'

লোকটা আরও অবাক হয়ে বলল, 'কেউ নেই। আর বাড়ি তো শুধু নামেই। চলে যান সিধে রাস্তা ধরে। জঙ্গলের ভেতরে ভাঙা দালানবাড়ি দেখতে পাবেন।'

গ্রামটা এক সময় হয়তো সমৃদ্ধ ছিল। এখন প্রায় জনহীন ছন্নছাড়া বসতি। যারা বাস করছে, তাদের বোধহয় অন্য কোথাও যাওয়ার সুযোগ নেই। আগাছার জঙ্গল, ধ্বংসস্তূপ তার মধ্যে একটা করে কুঁড়েঘর। কিছুটা যাওয়ার পর ডান দিকে গাছপালা আর ঝোপের ভেতর একটা ভাঙা দেউড়ি দেখা গেল। লতাপাতায় ঢাকা দেউড়ির পাশ দিয়ে সাবধানে এগিয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছলুম আমরা। সামনে, ডাইনে, বাঁয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা ঘরগুলোর বুকে ঘন আগাছা গজিয়ে উঠেছে। কর্নেল চারিদিক দেখতে দেখতে আনমনে বললেন, 'আশ্চর্য তো!'

জিজ্ঞেস করলুম, 'আশ্চর্যটা কী?'

কর্নেল একটু হাসলেন। 'ডাকাত হওয়ার আগে বাবু বংকারাম নিশ্চয় এই বাড়িতে বাস করতেন। কিন্তু থাকার মতো আস্ত কোনও ঘর তো দেখতে পাচ্ছি না। লক্ষ্য করে দ্যাখো জয়ন্ত, এসব ঘর অন্তত পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে ভেঙে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে।'

'তাই হচ্ছে বটে, কিন্তু এই ভূতের আস্তানায় আপনার হানা দেওয়ার উদ্দেশ্য খুঁজে পাচ্ছি না।'

কর্নেল আমার কথার জবাব না দিয়ে পা বাড়ালেন। একটু তফাতে একটা ফোকর দেখা যাচ্ছিল। ফোকরটা লতাপাতায় প্রায় ঢাকা পড়েছে। আমি বারণ করার আগেই কর্নেল গুঁড়ি মেরে ঢুকে পড়লেন। অগত্যা আমি ওঁকে অনুসরণ করলুম। একটা সুড়ঙ্গ পথই বলা যায়। দিনদুপুরে আঁধার হয়ে আছে। একটু পরে সামনেটা ফাঁকা হয়ে গেল। একটা ছোট চত্বরে পৌঁছলুম আমরা। কর্নেল বললেন, 'এদিকটাই ছিল বাড়ির অন্দরমহল।'

এখানেও একই অবস্থা। উঁচু সব ধ্বংসস্তূপ চারপাশে আগাছা আর লতাপাতার ঝালরে ঢাকা। বুনো ফুলের কড়া গন্ধ মউমউ করছে এই ধ্বংসপুরীতে। পাখপাখালির ডাকাও শোনা যাচ্ছে। কিন্তু কর্নেলের এখন পাখি দেখার মন নেই। এমনকী ওঁর দাড়ি ঘেঁসে প্রজাপতিও আনাগোনা করছে, যেন দেখতেও পাচ্ছেন না। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখানে ওপাশ থেকে একটা বটগাছের ডালপালা ঝুঁকে এসেছে আমার মাথার উপর। হঠাৎ উপর থেকে কী-একটা জিনিস ধুপ করে আমার ঘাড়ে পড়ল। আঁতকে উঠে লাফ দিতেই গলায় হ্যাঁচকা টান এবং সঙ্গে সঙ্গে দম আটকে এল। গোঁ গোঁ করতে করতে পড়ে গেলুম ঘাসের উপর।

তারপর কানে এল গুলির শব্দ। তারপর মাথার কাছে কর্নেলের ডাক শুনতে পেলুম, 'জয়ন্ত! জয়ন্ত!'

আস্তে আস্তে উঠে বসলুম। তাকিয়ে দেখি, কর্নেলের হাতে কতকটা কাঠবেড়ালির মতো দেখতে একটা খুদে বাঁদর। পিটপিট করে তাকাচ্ছে বাঁদরটা। কর্নেল তার কাঁধটা শক্ত করে ধরে রেখেছেন। তাই বাঁদরটার নড়াচড়ার সাধ্য নেই। আমাকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে দেখে কর্নেল বললেন, 'জোর বেঁচে গেছ ডার্লিং! আর একটু দেরি হলে বাবু বংকারামের অবস্থা হত তোমার। যাই হোক, গলার ফাঁসটা এবার খুলে ফেলো।'

এবার শিউরে উঠে দেখলুম, আমার গলায় মিহি নাইলনের সুতো জড়ানো। ব্যাপারটা বুঝতে এক সেকেন্ডও দেরি হল না। কাঁপা কাঁপা হাতে গলা থেকে সুতোটা খুলে ফেললুম।

কর্নেল বললেন, 'ভ্যাগ্যিস বাঁদরটাকে আগে দেখতে পেয়েছিলুম। তোমার মাথায় উপর ওই ডাল বেয়ে এগিয়ে আসছিল। ফাঁসটা নিয়ে যেই তোমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছে, আমিও এক লাফে এগিয়ে ওকে ধরে ফেলেছি। তবে ফাঁস ধরে যে টান দিয়েছিল, তাকে দেখতে পাইনি। আন্দাজে রিভলভারের গুলি ছুড়ে তাকে ভাগিয়ে দিয়েছি। লোকটা সম্ভবত বটগাছের গুঁড়ির উপর কোথাও বসে ছিল। কারণ তার লাফিয়ে পড়া আর দৌড়ে যাওয়ায় ধুপধুপ শব্দ শুনতে পেয়েছি।'

উঠে দাঁড়ালুম। মাথা ঝিমঝিম করছে। কুৎসিত বাঁদরটার দিকে তাকাতেও আতঙ্ক হচ্ছে। ওই ব্যাটা আমার ঘাড়ে লাফিয়ে ফাঁসটা আটকে দিয়েছিল আর ওর শয়তান মনিব নাইলনের শক্ত এই

সুতোটার অন্য প্রান্ত থেকে ছিপে খ্যাঁচ মেরে মাছ বেঁধানোর মতো হ্যাঁচকা টান মেরেছিল। মানুষ মারার বিদঘুটে ফন্দি বটে। এমনি করেই তাহলে বাবু বংকারামকে দম আটকে খুন করা হয়েছিল।

সুতোটা প্রায় দশ-বারো মিটার লম্বা। ল্যাসোর কে খুদে সংস্করণ আর কি! গুটিয়ে পকেটে রাখলুম, কর্নেলের জাদুঘরে উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসেবে উপহার দেব এটা। সঙ্গে একটা চিত্রকুটে লেখা থাকবে : এই নিরীহ সুতোটি প্রখ্যাত সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরিকে যমের বাড়ির দরজা অব্দি টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'এই সেই ময়নাচোর স্কুইরেল মাংকি, ডার্লিং! হালদারমশাইয়ের সাধু, পাখি আর বাঁদরের মধ্যে বাঁদরটা হাতে এল। বাকি রইল পাখি আর সাধু। একটুর জন্য সাধু ফসকে গেছে। তবে আশা করি, আবার তার দেখা আমরা শিগ্‌গির পাব। শুধু পাখিটার জন্য ভাবনা হচ্ছে।'

বললুম, 'আমার আর এক সেকেন্ডও এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না কর্নেল। তাছাড়া শ্বাসনালিতে ব্যথা করছে।'

কর্নেল বললেন, 'ঠিক আছে। চলো, ফেরা যাক। পরে আবার এসে বাবু বংকারামের ডেরা খোঁজা যাবে।' তারপর খুদে প্রাণীটাকে জ্যাকেটের ভিতরকার পকেটে ঢুকিয়ে বোতাম আঁটলেন। বাঁদরটা নড়ল না একটুও।

গ্রামের রাস্তায় ফিরে যাওয়ার সময় একটা ভিড় চোখে পড়ল। একটা কুঁড়েঘরের সামনে পুরুষ, স্ত্রীলোক, কাচ্চাবাচ্চা ভিড় করে কী যেন দেখছে। উঁকি মেরে দেখি, একটা কালো মরা পাখি পড়ে আছে মাটিতে। সেটাই সবাই ভিড় করে দেখছে। কর্নেলের দিকে তাকালুম। খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। গোয়েন্দাপ্রবর। একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার, মরা পাখি দেখার জন্যে এত ভিড় কেন?'

সে বলল, 'সায়েব, এটা একটা ময়নাপাখি।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি। পাখিটা মরল কী করে?'

একজন বুড়ো বলল, 'হুজুর, পাখিটা আমার নাতনি কুড়িয়ে পেয়েছে মাঠে। তখনও ধুঁকছিল। এনে মুখে জল দিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করল। বাঁচল না। এ পাখিটা আমরা চিনতে পেরেছি। সেজন্য এই ভিড়।'

'পাখিটা কার?'

'বাবু গঙ্গারাম দাস বলে একটা লোক ছিল, এ তারই পাখি। পাখিটা ভাল বুলি বলতে পারত, হুজুর! ওড়িয়া, হিন্দি আবার ইংরেজিতেও নাকি বুলি বলত। বাবু গঙ্গারাম দাস ছিল লেখা-পড়াজানা লোক। বড্ড খেয়ালি আর দিলদরিয়া ছিল তার মেজাজ। গরিব লোকদের জন্য খুব দয়া ছিল তার।'

আমি চমকে উঠেছিলুম। কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন, 'তিনি এখন কোথায় আছেন?'

বুড়ো বলল, 'জানি না হুজুর! বাবু গঙ্গারাম থাকত বাবু বংকারামের বাড়িতে। শুনেছি ওরা নাকি ছিল মাসতুতো ভাই। বছরখানেক আগে বাবু বংকারাম জঙ্গলে ঝরনার ধারে খুন হয়েছে। বাবু গঙ্গারাম তারপর থেকে নিপাত্তা। পুলিশ তাকে আর গোপেশ্বর নামে একটা লোককে খুনি বলে সন্দেহ করেছিল বটে, কিন্তু আমরা এ কথা বিশ্বাস করি না; অমন নিরীহ আর দয়ালু লোক গঙ্গারাম মানুষ খুন করতে পারে! খুনোখুনির কাজ গোপেশ্বর পারত বটে। সেও ছিল এক সাংঘাতিক ডাকাত। বাবু বংকারামের স্যাঙাত।'

কর্নেল পাখিটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ পাখি যে বাবু গঙ্গারামের, তোমরা চিনলে কেমন করে?'

সবাই হইচই করে উঠল জবাব দেওয়ার জন্য। সবাইকে থামিয়ে বুড়ো বলল, 'ওই যে দেখছেন পাখিটার একটা পায়ে রুপোর আংটা। বাবু গঙ্গারাম সবসময় পাখিটাকে কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াত।

ওই আংটার সঙ্গে ছিল সরু চেন। চেনটা থাকত বাবু গঙ্গারামের গলায় জড়ানো। মনে হচ্ছে, আংটা থেকে চেন ছিঁড়ে কী ভাবে পাখিটা পালিয়ে বেড়াচ্ছিল এতদিন।'

কর্নেল হাঁটু ভাঁজ করে ঝুঁকে পাখিটাকে ভাল করে দেখতে গেছেন, অমনি তাঁর জ্যাকেটের ভিতর থেকে দুটো বোতামের মাঝখান দিয়ে বজ্জাত খুদে বাঁদরটা সুড়ুত করে পিছলে পড়ল। তারপর লোকগুলোর পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে চোখের পলকে কুঁড়েঘরের চালে চড়ে বসল। এবার তাজ্জব হয়ে দেখলুম, বাঁদরটা মরা পাখিটাকে হাতিয়ে নিয়েছে।

সবাই হকচকিয়ে গিয়েছিল। কর্নেলও হতভম্ব। হাঁ করে তাকিয়ে আছেন। আমিও তাই, তারপর লোকগুলো চেঁচিয়ে উঠল, 'ভুণ্ডুরাম! ভুণ্ডুরাম!'

চ্যাঁচামেচিতে হয়তো ভয় পেয়েই বাঁদরটা পাখিটা নিয়ে এক লাফে কুঁড়েঘরের পেছনের দিকে উধাও হয়ে গেল। ওর গতি আর ভঙ্গি অবিকল কাঠবেড়ালির মতো। কর্নেল বাজখাই গলায় চেঁচিয়ে বললেন, 'পাকড়ো। পাকড়ো! বখ্‌শিশ মিলেগা!'

বখশিশের লোভে হইচই করতে করতে অনেকেই ছুটে গেল। বুড়ো কর্নেলকে আশ্বস্ত করে বলল, 'চুপ করে বসে থাকুন হুজুর! খাটিয়া এনে দিচ্ছি। ভুণ্ডুরামকে ওরা এক্ষুনি ধরে ফেলবে। ওটা তো একটা পোষা বাঁদর।'

সে ঘর থেকে দুটো খাটিয়া এনে দিল। আমরা বসলুম। তারপর কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন, 'বাঁদরটাও তোমাদের চেনা দেখছি!'

বুড়ো হাসতে হাসতে বলল, 'হুজুর কি ভুণ্ডুরামকে কিনে আনলেন ভগিয়ার কাছ থেকে?'

কর্নেল বললেন, 'বাঁদরটা আমি ভগিয়ার কাছে কিনিনি। অন্য একজনের কাছে কিনেছি।'

বুড়ো অবাক হয়ে বলল, 'সে কী! ভগিয়া ভুণ্ডুরামকে তাহলে বেচে দিয়েছিল! কার কাছে বলুন তো হুজুর?'

কর্নেল বললেন, 'নাম জানি না। বাবু বংকারামের বাড়ির ওখানে একটা লোক—'

বুড়ো কথা কেড়ে বলল, 'বুঝেছি। বেঁটেমতো, মাথায় টাক আছে তো? নব।'

'ভগিয়া কে?'

'নবর ভাই। ভগিয়া যে সারাদিন ভুণ্ডুরামকে নিয়েই ব্যস্ত থাকত। তাই নব বলত বটে, বাঁদরটাকে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসবে, নয়তো কাউকে বেচে দেবে।'

'ভগিয়া এমন জাতের বাঁদর পেল কোথায়?'

'জঙ্গল থেকে নাকি ধরে এনেছিল। খেলা শিখিয়েছিল। যা বলত, তাই শুনত ভুণ্ডুরাম।'

'ভগিয়াকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে?'

'বলা কঠিন। শুনেছি সে নাকি এক সাধুবাবার চেলা হয়েছে। কোথায়-কোথায় ঘোরে সাধুবাবার সঙ্গে।'

'এক সাধুবাবা নাকি অদৃশ্য হতে পারেন—তাঁরই চেলা হয়নি তো ভগিয়া?'

বুড়ো মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'সে সাধুবাবা স্বয়ং শিব। ভগিয়া তার চেলা হবে? তাহলে পুবের সূর্য পশ্চিমে উঠবে না? হুজুর, ভগিয়ার সাধুবাবা আর কেমন হবে? ভগিয়ার মতোই হবে। কেউ কেউ বলে, সাধুটা নাকি গোপেশ্বর। পুলিশের ভয়ে সাধু সেজে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে।'

লোকগুলো হইচই করে ফিরে এল। ফাঁসুড়ে ভুণ্ডুরামকে ধরে এনেছে ওরা। মরা পাখিটাকে এখনও বজ্জাতটা আঁকড়ে ধরে রয়েছে। কর্নেল বাঁদরটাকে আগের মতোই জ্যাকেটের ভিতর পকেটে চালান করলেন এবং একটা হাত চেপে রাখলেন, যাতে আর না পালাতে পারে। মরা পাখিটাকে আমি রুমালে জড়িয়ে নিলুম কর্নেলের আদেশে।

ওদের বখ্‌শিশ দিয়ে বুড়োর কাছে বিদায় নিয়ে কর্নেল হঠাৎ আমাকে চাপা গলায় ইংরেজিতে বললেন, 'জয়ন্ত, দূরে একটা লোককে দৌড়ে আসতে দেখছি। মনে হচ্ছে, লোকটা ভগিয়ার দাদা

নব। ওই দ্যাখো, সামনে বড় রাস্তার মোড়ে একটা অটোরিকশো দাঁড়িয়ে রয়েছে। দৌড়নোর জন্য তৈরি হও। ওয়ান, টু, থ্রি—রান!'

পিছনের লোকগুলো নিশ্চয় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকিয়ে আছে। জীবনে এমন দৌড় কখনও দৌড়ইনি, কিংবা পঁয়ষট্টি বছরের খ্রিসমাস সান্টা ক্লজ চেহারার এই বৃদ্ধ ভদ্রলোককেও দৌড়তে দেখিনি।

অটো-রিকশোয় চেপেই কর্নেল বললেন, 'ডবল ভাড়া সর্দারজি! তুরন্ত্ চালিয়ে, ইধার টাউনশিপ হোকে সিধা।'

ড্রাইভার কী বুঝল কে জানে, তক্ষুনি, স্টার্ট দিয়ে বাহনটাকে রকেটের বেগে ছুটিয়ে দিল পার্বতী নদীর ব্রিজের দিকে। ব্রিজ পেরিয়ে গিয়ে সে মুচকি হেসে বলল, 'ইধার গোপেশ্বর ডাকু রহতা হ্যায়! কভি ইধার মাত আইয়ে জি।'

প্রদীপবাবুর বাংলোবাড়িতে পৌঁছে দেখি, সবে ডঃ সীতাকান্ত পট্টনায়ক ভুবনেশ্বর থেকে নিজেই জিপ চালিয়ে হাজির। কর্নেল পকেট থেকে ভুণ্ডুরামকে বের করলে উনি চমকে গিয়ে বললেন, 'স্কুইরেল মাংকি মনে হচ্ছে? কোথায় পেলেন?'

কর্নেল হালদারমশাইয়ের প্রসঙ্গ থেকে শুরু করলেন। কথা শেষ হলে পট্টনায়ক বললেন 'কী আশ্চর্য! কাল দুপুরে কলকাতার ফরেনসিক ল্যাবরেটরি হলে যখন আপনি আমার সঙ্গে দেখা করলেন, তখন যদি গঙ্গারামের ব্যাপারটা বলতেন, তখনই সব জানিয়ে দিতুম আপনাকে।'

কর্নেল বললেন, 'চেনেন নাকি গঙ্গারামকে?'

'ভীষণ চিনি', ডঃ পট্টনায়ক উত্তেজিতভাবে বললেন। 'ভদ্রলোক ছিলেন বাঙ্গালোর স্পেস রিসার্চ সেন্টারের জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী। খুব খেয়ালি স্বভাবের মানুষ। হঠাৎ চাকরি ছেড়ে নিখোঁজ হয়ে যান। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ওল্ড কোদণ্ডগিরিতে বাবু বংকারামের বাড়িতে এসে জুটেছিলেন।'

'বাবু বংকারামের নাকি মাসতুতো ভাই উনি।'

'হতে পারে,' ডঃ পট্টনায়ক বললেন। 'কেন এখানে এসেছিলেন, তাও আঁচ করতে পারছি। জঙ্গলের ভেতর কোদণ্ডগিরি পাহাড়ে নিশ্চয় গোপনে মহাকাশ সংক্রান্ত গবেষণা করছিলেন। একটু আগে মিঃ রায়ের কাছে যা শুনলুম তাতে ওঁর সাফল্যের প্রমাণও পেয়েছি। এমন একটা রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেম এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয়নি।

'হ্যাঁ। রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্রটা সত্যি বিস্ময়কর।'

'কিন্তু এসব কাজের জন্য প্রচুর টাকা দরকার। এত টাকা কোথায় পেলেন জি আর ডি?' ডঃ পট্টনায়ক একটু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ,—ডঃ গঙ্গারাম দাস জি আর ডি নামেই বিজ্ঞানীমহলে পরিচিত ছিলেন।'

কর্নেল বাঁদরটার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'তাহলে কি বাবু বংকারামকে ডাকাতি করে টাকা জোগাড় করার জন্য উনিই প্ররোচিত করেছিলেন? হয়তো বাবু বংকারামকে কোনও লোভ দেখিয়েছিলেন।'

প্রদীপবাবু এসে বললেন, 'লাঞ্চ রেডি। দেড়টা বাজতে চলল। এবার দয়া করে উঠে পড়ুন।'

ছয়

খাওয়াদাওয়ার পর মরা ময়নাপাখিটা নিয়ে কর্নেল এবং ডঃ পট্টনায়ক কী-সব পরীক্ষায় বসলেন। ডঃ পট্টনায়কের সঙ্গে সবসময় একটা খুদে পোর্টেবল ল্যাবরেটরি থাকে। দেখতে সেটা একটা প্রকাণ্ড স্যুটকেসের মতো। টেবিলে সেটা খুলে বসেছেন।

ফাঁসুড়ে ভুণ্ডুরাম এখন প্রদীপবাবুর জিম্মায়। ওকে বন্য প্রাণী গবেষণাগারের হেফাজতে দেওয়া হবে। রাত জেগে ট্রেন জার্নি, তার ওপর যমের দুয়ার থেকে ফেরার ধাক্কায় আমি ক্লান্ত হয়ে শুয়ে

পড়েছিলুম। শ্বাসনালির ব্যথাটা গরম জলের গার্গলে অনেকটা কমেছে। সবে চোখ বুজে আসছে ভাতঘুমে, এমন সময় কর্নেল এবং ডঃ পট্টনায়কের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে ঘুমের রেশ ছিঁড়ে গেল। কর্নেল বললেন, 'কী আশ্চর্য! এ যে দেখছি একটা নকশা!'

ডঃ পট্টনায়ক বললেন, 'হ্যাঁ—ব্লুপ্রিন্ট বলতে পারেন। নিশ্চয় গোপনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্লুপ্রিন্ট। তা না হলে পাখির পায়ে রুপোর আংটার মধ্যে রোল করে লুকিয়ে রাখা হবে কেন? এটা কিন্তু সাধারণ কাগজ নয়। গুপ্তচররা ব্যবহার করে এগুলো। এক বর্গফুট কাগজও রোল করে নখের মধ্যে লুকিয়ে রাখা যায়। এবার বোঝা গেল, পাখিটা পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। ফাঁদে আটকে আদিবাসী ছেলেরা ওকে ধরে। হালদারমশাই কিনে নিয়ে যান। তাঁর বাড়ি থেকে পাখিটা উদ্ধার করে আনার সময় আবার হাত ফসকে পালিয়েছিল। পালাতে গিয়ে বিদ্যুতের শক খেয়ে শেষে মারা পড়ে।'

কর্নেল বললেন, মাঠে পড়ে ছিল নাকি পাখিটা। ওখানে বিদ্যুতের তার গেছে দেখছি।'

'ডি সি বিদ্যুতের শকে ছিটকে পড়াই সম্ভব। এ সি হলে তারে আটকে থাকত।'

'বুঝেছি। হালদারমশাইয়ের সঙ্গে সাধু আর তার চেলা যখন ধস্তাধস্তি করছিল, তখনই পাখিটা পালিয়ে থাকবে।'

'হালদারমশাইয়ের সঙ্গে ধস্তাধস্তি?' কর্নেল হাসলেন। 'বেনামী চিঠিতে বলা হয়েছে, ওঁকে ওরা আটকে রেখেছে। তার মানে ধস্তাধস্তিটা খুব সাংঘাতিকই হয়েছে। হালদারমশাই তো সহজে বন্দি হবার পাত্র নন। ওঁকে কায়দা করতে হাত ফসকে পাখির পালানোই স্বাভাবিক।'

ডঃ পট্টনায়ক আবার নকশাটার উপর আতশকাচ নিয়ে ঝুঁকে পড়লেন। তারপর চাপা গলায় বললেন, 'কর্নেল, আমার মনে হচ্ছে, এটা কোদণ্ডগিরি পাহাড়ে জি আর ডি'র ল্যাবরেটরি এবং স্পেস রিসার্চ সেন্টারের ব্লুপ্রিন্ট। ওই গোপন জায়গায় যাওয়ার হদিশও এতে আছে যেন। এই চিরুনির মতো চিহ্নটা দেখুন। এটা সম্ভবত ঝরনা। আর তার উলটোদিকে এই লাল ফুটকিটা কি সেই লাল রঙের প্রকাণ্ড পাথরটাই—যেটা আমি দেখে গিয়েছিলুম জানুয়ারিতে এসে?'

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। 'এখনই বেরিয়ে পড়া যাক। আড়াইটে বাজাতে চলল। দিনের আলো থাকতে থাকতে বেরিয়ে পড়াই ভাল। জয়ন্ত, তুমি যাবে নাকি?'

তড়াক করে উঠে বসলুম। বললুম, 'যাব না মানে? দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার লক্ষ-লক্ষ পাঠক হা-পিত্যেশ করে বসে আছে না?'

ডঃ পট্টনায়ক বললেন, 'হাঁটা-পথেই যাব। অবশ্য পথ বলা ভুল। জানুয়ারিতে এসে কোদণ্ডগিরি পৌঁছতে খুব হন্যে হয়েছিলুম। একবার হাতির পালের সামনে, আর একবার চিতাবাঘের সামনেও পড়েছিলুম। আমার সঙ্গে ছিলেন অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশনের এক বিশেষজ্ঞ। তিনি তো আতঙ্কে মারা পড়ার দাখিল।'

প্রদীপবাবু এসে ওঁর কথা কান খাড়া করে শুনছিলেন। বললেন, 'জানুয়ারিতে এসেছিলেন আপনারা? জঙ্গলে বেড়াতে নাকি?'

'না মিঃ রায়। নিছক বেড়াতে এলে তো আপনি জানতে পারতেন। আপনার শরণাপন্ন না হয়ে উপায় ছিল না। আমরা এসেছিলুম একটা সরকারি তদন্তে। কোদণ্ডগিরি পাহাড়ে নাকি অদ্ভুত সব আলো দেখা যায়। আগুনের গোলাও দেখা যায়। আমার ধারণা ছিল, ওখানে প্রচুর প্রাকৃতিক গ্যাস আছে ভূগর্ভে। কিন্তু এসে কিছুই হদিশ করতে পারিনি। আর পাহাড়টায় চড়াও একেবারে অসম্ভব। পুরোটা গ্রানাইট শিলায় তৈরি। যাই হোক, ফেরার পথে পার্বতী নদীর ধারে বালির চড়ায় ওই রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্রটা কুড়িয়ে পেয়েছিলুম।'

প্রদীপবাবু বললেন, 'আগুনের গোলার কথা আমিও শুনেছিলুম।'

কর্নেল বললেন, 'আজ সকালে দেখতেও পেলেন।'

প্রদীপবাবু চমকে উঠে বললেন 'কিন্তু ওটা তো আগুনের গোলা নয়। ছাই-রঙের একটা গোলক।'

'রাতে ওটা থেকে রশ্মি ঠিকরে পড়ে। তাছাড়া মহাকাশযান বা কৃত্রিম উপগ্রহ রাতের আকাশে আগুনের গোলার মতো দেখাতে পারে।'

প্রদীপবাবুও আমাদের সঙ্গ ধরলেন। এতে খুশিই হলেন কর্নেল এবং ডাঃ পট্টনায়ক। প্রদীপবাবু কোদণ্ডগিরি জঙ্গলের নাড়িনক্ষত্র জানেন। রাস্তা ভুল হওয়ার চান্স থাকবে না।

পাহাড়ি জঙ্গলের সৌন্দর্য তুলনাহীন। তাছাড়া এখন বসন্তকাল। কত রকম ফুল ফুটেছে চারিদিকে। মিঠে গন্ধে মউ-মউ করছে বনপথ। পাখ-পাখালি গান ধরেছে মনের সুখে। কিন্তু এসব দিকে আমাদের কারুর মন নেই। প্রদীপবাবু সতর্কতার জন্য একটা শটগান হাতে নিয়েছেন। বুনো জন্তুর পাল্লায় পড়লে ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর জন্যই। এ জঙ্গলে পশুপাখি হত্যা নিষিদ্ধ।

একবার হাতির চিৎকার কানে এল। প্রদীপবাবু বললেন, 'পার্বতী নদীতে দিনের শেষে খেলতে নেমেছে হাতির পাল। বাতাস ওদিক থেকে বইছে। কাজেই আমাদের গন্ধ পাবে না ওরা।' একখানে টিলার উপর মহুয়া গাছে ভালুক দেখিয়ে দিলেন। বহু দূরে একবার যেন বাঘের গর্জনও শুনলুম।

পাঁচ কিলোমিটার দূরত্ব পেরুতে ঘণ্টা-দেড়েক লেগে গেল। এর কারণ রাস্তা বেশ দুর্গমই। চড়াই-উতরাই বিস্তর। ঝরনা এড়িয়ে আমরা কোদণ্ডগিরির পশ্চিমে গিয়ে দাঁড়ালুম। পাহাড়টা অন্তত হাজার-দশেক ফুট উঁচু। দূর থেকে শর লাগানো ধনুক বা পিরামিডের মতো মনে হয় বটে, কাছ থেকে সেটা বোঝা যাচ্ছিল না। শুধু মিনারের মতো খাড়া ছুঁচালো চূড়াটা চোখে পড়ছিল। পাহাড়ের নিচে বিশাল-বিশাল পাথর পড়ে আছে। অনেকটা জায়গা জুড়ে পাথর আর ঝোপ। তারপর উঁচু গাছের জঙ্গল। তাই এখানে বিকেলের গোলাপি রোদ ছড়িয়ে আছে।

কর্নেল ও ডঃ পট্টনায়ক সেই নকশা আঁকা চিরকুট খুলে পরামর্শ করছিলেন। হঠাৎ কর্নেল বললেন, 'লাল ফুটকি? হুঁ, দেখুন তো ডঃ পট্টনায়ক! ওই লাল পাথরটাই তো?'

ডঃ পট্টনায়ক বললেন, 'হ্যাঁ, ওটাই। চলুন, দেখা যাক।'

কর্নেল বললেন, 'সাবধান! সবাই গুঁড়ি মেরে পাথরের আড়ালে-আড়ালে এগিয়ে চলুন।'

লাল পাথরটার কাছে পৌঁছে আবার দু'জনে নকশা দেখে নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় পরামর্শ করলেন। তারপর কর্নেল বললেন, 'সবাই হাত লাগান। দেখা যাক, পাথরটা সরানো যায় কি-না।'

লালপাথরটা কিন্তু তত ওজনদার নয়। একটু ঠেলতেই সরে গেল। ওটা যত সরল, তত নিচের দিকে একটা গর্ত দেখা যেতে থাকল। কর্নেল বললেন, 'এই তো দেখছি সুড়ঙ্গের মুখ। একে একে নামা যাক। টর্চ জ্বালতে হবে মনে হচ্ছে।'

প্রথমে কর্নেল, তারপর ডঃ পট্টনায়ক, তারপর আমি এবং সব শেষে প্রদীপবাবু গর্তে নামলেন। ধাপে ধাপে সিঁড়ি একটু নেমে যাওয়ার পরে উপরের দিকে উঠে গেছে। কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ টের পাচ্ছি। টর্চের আলোয় কালো পাথরের ধাপ ক্রমশ উঠছে তো উঠছেই। আমরাও উঠছি। অনেকখানি ওঠার পর কিছুটা করিডোরের মতো সমতল জায়গা। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলুম, সামনে আলোর ছটা বেরিয়ে আসছে। কর্নেল থমকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আবার পা বাড়ালেন। করিডোরের মতো জায়গাটা প্রায় দু'মিটার চওড়া। আলোটা আসছে বাঁদিক থেকে। করিডোর বেঁকে গিয়ে আবার সিঁড়ির মুখে শেষ হয়েছে। সিঁড়ির মাথায় হলুদ একবিন্দু আলো। ঠিক আলো নয়। অদ্ভুত একটা রশ্মি যেন। কর্নেল ধাপে পা রেখেছেন, অমনি গমগমে গলায় কেউ বলে উঠল, 'সাবধান গোপেশ্বর! আর এক পা এগোনোর চেষ্টা কোরো না। বুঝতে পেরেছি, তুমি এতদিনে আমার ল্যাবরেটরিতে ঢোকার নকশা পেয়েছ। আমার দুর্ভাগ্য গোপেশ্বর, পাখিটা শয়তান বংকারাম চুরি করে নিয়ে পালিয়েছিল। তাছাড়া আমার আরসিএস যন্ত্রটাও চুরি করেছিল ডাকাত হতচ্ছাড়া। ওকে খুন করে তুমি সব হাতিয়েছ আমি জানতুম। কাল দুপুরে এবং আজ সকালে আমার স্পেসশিপ দু-দুবার ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল। আমি জানি, তুমি আরসিএস তো হাতিয়েছ। উপরন্তু ওটা ব্যবহার করার কৌশলও জেনে গেছ। শোনো গোপেশ্বর, আমি তোমাকে ঢুকতে দেব একটা শর্তে।

কর্নেল বলে উঠলেন, 'বলো গঙ্গারাম!'

'তোমার বাঁ দিকে একটা ঘুলঘুলি দেখতে পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি।'

'নকশা আর, আরসিএস যন্ত্রটা ওখানে দিয়ে ঢুকিয়ে দাও।'

'তাহলে ঢুকতে দেবে তো গঙ্গারাম?'

'দেব।'

দেখলুম ডঃ পট্টনায়ক কর্নেলকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু কর্নেল গ্রাহ্য করলেন না ওঁকে। নকশা আর সেই রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্র ঘুলঘুলির ভিতর ফেলে দিলেন। অমনি হা-হা হাসির শব্দ এসে আমাদের কানে ধাক্কা দিল। হলদে আলোর ফুটকিটা নিভে গেল। নেপথ্য থেকে নিষ্ঠুর কথা গমগম করে ভেসে এল, 'গোপেশ্বর, বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মৃত্যু। মৃত্যুর জন্য তৈরি হও।'

কর্নেল চিৎকার করে বললেন, 'ডঃ দাস, আমি গোপেশ্বর নই। কর্নেল নীলাদ্রি সরকার! আমার সঙ্গে আছেন আপনার পুরনো বন্ধু ডঃ সীতাকান্ত পট্টনায়ক, সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরি এবং এই জঙ্গলের কনজারভেটর প্রদীপ রায়। আপনি আগে দেখুন, আমরা কারা। তারপর শাস্তি দেবেন।'

ডঃ পট্টনায়কও জোরে চেঁচিয়ে বললেন, 'জি আর ডি! আমি পট্টনায়ক।'

অন্তত এক মিনিট পরে কথা ভেসে এল, 'গোপেশ্বর কোথায়?'

'আমরা জানি না ডঃ দাস,' কর্নেল বললেন। 'দয়া করে আমাদের ঢুকতে দিন। সব বলব।'

'আপনারা আসুন।'

আবার হলুদ আলোর ফুটকি দেখতে পেলুম। সিঁড়ি বেয়ে আমরা উঠতে থাকলুম। শেষ ধাপের পর আবার একটা করিডোর। বাঁ দিকে একটা কালো দরজা খুলে গেল। একে একে ভিতরে ঢুকলুম। হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। বিশাল এক ল্যাবরেটরি। একপাশে রকেটের মতো দেখতে এটা প্রকাণ্ড সাদা চোঙা ছাদ ফুঁড়ে চলে গেছে। সেখানে রেলিং ঘেরা। অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে নানারকম। শোঁ শোঁ....ব্লপ্ ব্লিপ্....কিটকিট....বিচিত্র সব শব্দ। কিন্তু কোনও লোক দেখতে পাচ্ছি না।

ডঃ পট্টনায়ক বললেন, 'জি আর ডি, কোথায় তুমি?'

অমনি সামনে একটু তাকাতে চোখ-ধাঁধানো নীল আলো খেলে গেল এক সেকেন্ডের জন্য। তারপর দেখি, সেখানে লম্বা রোগা ফর্সা, একমাথা সাদা চুল, গেরুয়া আলখাল্লার মতো পোশাক পরা এক সৌম্য চেহারা প্রৌঢ় দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে মিটিমিটি হাসি। 'কী পট্টনায়ক, অলৌকিক কীর্তি ভাবছ নাকি? তোমাকে বলেছিলুম পট্টনায়ক, যে-কোনও পদার্থকে ভরহীন ফোটনে পরিণত করা যায় এবং তা চর্মচক্ষে অদৃশ্য মনে হবে। তুমি বলেছিলে, ফোটনে পরিণত হলে তা আলোর সমান গতিবেগ পাবে এবং তাই বিশ্বজগতে ছড়িয়ে পড়বে। ঠিক ঠিক। কিন্তু লেসার রশ্মি দিয়ে ফ্রেমের মতো ঘিরে রাখতে পারলে তা ছড়াবে না এবং ফোটনগুলোকে আবার আগের মতো ভরযুক্ত পদার্থ-কণিকায় রূপান্তরিত করা যাবে। এখন স্বচক্ষে দেখলে তো পট্টনায়ক, সেই অসম্ভব আমি সম্ভব করেছি?'

'দেখলুম ভাই! তোমার কোনও তুলনা হয় না।'

বিজ্ঞানী গঙ্গারাম দাস কর্নেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একসময় খবরের কাগজ পড়তুম। তখন আপনার অনেক কীর্তিকলাপ কাগজে পড়েছি। বসুন, বসুন। আপনারা আমার সম্মানিত অতিথি।'

আমরা বসলুম। ডঃ দাস বিশাল টেবিলের ওধারে বসলেন। তারপর বোতাম টিপলেন। তক্ষুনি খটখট শব্দে একটা ছোট্ট মানুষের গড়নের রোবট এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল। ডাঃ দাস বললেন, 'চা কফি কোল্ড ড্রিংক্স—যা খেতে চান, সেই বোতাম টিপুন। পেয়ে যাবেন।'

কর্নেল কফির বোতাম টিপলেন। খট করে একটা কাগুজে পেয়ালা পড়ল রোবটের পেটের নিচের খোঁদলে। তারপর গড়গড় করে কফি বেরিয়ে পেয়ালা ভর্তি হয়ে গেল।

আমরা সবাই কফিই নিলুম। তারপর রোবটটা চলে গেল। ডঃ পট্টনায়ক বললেন, 'পাহাড় কেটে এই ল্যাবরেটরি বানিয়েছ দেখে অবাক লাগছে জি আর ডি! এ যে দৈত্যের কীর্তি! কী করে বানালে?'

জি আর ডি বললেন, 'আমি তো বানাইনি, ভাই। এটা বংকারামের পূর্বপুরুষের তৈরি গোপন দুর্গ। এটার জন্যই ওর সঙ্গে ভাব করেছিলুম। ওকে মিথ্যা লোভ দেখিয়েছিলুম, দুর্গের ভিতর ওর পূর্বপুরুষের গুপ্তধন আছে। উদ্ধার করে দেব। কিন্তু ও চিরকালের বজ্জাত। যখন বুঝল আমি ল্যাবরেটরি বানাচ্ছি, তখন থেকে বদমাইশি শুরু করল। গোপেশ্বর নামে ওর এক ডাকাত-স্যাঙাত আছে। তাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করল শয়তানটা। যাকগে, গোপেশ্বর ওকে খুন করেছে। তবু আরসিএস এবং নকশাটা হাতাতে পারেনি।'

কর্নেল সংক্ষেপে আগাগোড়া সব ঘটনা বললেন। ডাঃ পট্টনায়ক আরসিএস যন্ত্রটা কোথায় পেয়েছিলেন, তাও বললেন। ডঃ দাস খুব হাসতে লাগলেন শুনে। শেষে গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কিন্তু মিঃ রায়ের মামা প্রাইভেট ডিটেকটিভ ভদ্রলোকের কথা শুনে আমার ভয় হচ্ছে। গোপেশ্বর ডাকু সাংঘাতিক লোক। ওকে কিছু বিশ্বাস নেই। তবে এটুকু আশ্বাস দিতে পারি, ঝরনার ধারে রাত দশটায় ব্যাটা আসবে বলেছে তো? তখনই আমি ওকে ধরতে রোবট পাঠিয়ে দেব। রোবটের টিপুনি খেয়ে সে কবুল করবে মিঃ হালদারকে কোথায় আটকে রেখেছে। তারপর ব্যাটাকে পুলিশের কাছে জিম্মা দেবেন মিঃ রায়।'

কর্নেল বললেন, 'একটা কথা ডঃ দাস। পাখিটাকে অমন কথা কেন শিখিয়েছিলেন?'

বিজ্ঞানী মুচকি হেসে বললেন, 'বংকারাম যদি আমাকে সত্যি খুন করে, তাহলে পাখিটা সাক্ষ্য দিতে পারবে, এই ভেবেই। ওকে আমি বিশ্বাস করতে পারছিলুম না যে।'

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে এবং ল্যাবরেটরি দেখে আমরা বিদায় নিলুম। এবার আমাদের উল্টো দিকে ঝরনার ধারের গোপন দরজা খুলে বের করে দিলেন ডঃ দাস। তারপর আমাকে চমকে দেওয়ার জন্য আবার হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন, বুঝলুম হালদারমশাই তাহলে ঠিকই দেখেছিলেন।

বাংলোয় ফিরে আমরা আবার অবাক। হালদারমশাই জলজ্যান্ত বসে রয়েছেন। শুধু মাথায় একটা ব্যান্ডেজ। বললেন, 'আমার নাম কে. কে. হালদার। আমাকে আটকে রাখবে ওই পুঁচকে দুটো লোক? রেলইয়ার্ডে সাধু আর তার চেলাকে ফলো করছিলুম। হঠাৎ ওরা মালগাড়ির আড়ালে লুকিয়ে গেল। আসলে ওত পেতে বসেছিল, বুঝলেন? যেই গেছি, লাফিয়ে পড়েছে। শেষে মাথায় ডাণ্ডার বাড়ি। জ্ঞান হলে দেখি, মালগাড়ির ওয়াগনে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছি। গায়ে জোর আসতে দেরি হচ্ছিল, তাই। নইলে কখন বাঁধন কেটে বেরিয়ে আসতুম। যাক গে, এবার আপনাদের খবর বলুন, কর্নেল স্যার?' হালদারমশাই মাথার ব্যান্ডেজে হাত বুলোতে থাকলেন।

কর্নেল বললেন, 'আপাতত খবর হল, আজ রাত দশটায় আপনার সেই সাধু ওরফে গোপেশ্বর আর চেলা ভগিয়া ঝরনার ধারে রোবটের হাতে বন্দি হবে।'

হালদারমশাই বললেন, 'রোবট? যাঃ!' খি-খি করে বেজায় হাসতে লাগলেন গোয়েন্দা কৃতান্ত হালদার।

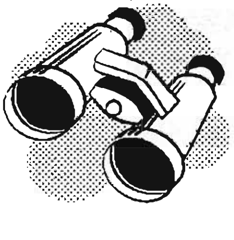

ওজরাকের পাঞ্জা

কালো পাথরের মতো দেখতে জিনিসটাকে...আলো পড়লেই ঠিকরে পড়ত হরেক রশ্মি...চর্কির মতো ঘুরত রশ্মিগুলো...ধাতু বিজ্ঞানীও বলতে পারেননি ধাতুটা কী! রহস্যময় এই বস্তুটাই চুরি গেল আরও রহস্যজনকভাবে রাতদুপুরে কান্দ্রা উপত্যকায়...পাহাড় থেকে নেমে এল ঝোড়ো হাওয়া...শোনা গেল ঘুঙুরের শব্দ...নিভে গেল সব আলো! তারপর?

বেহালা রোগ

সেদিন সকালে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের ডেরায় গিয়ে তাঁর প্রিয় ভৃত্য ষষ্ঠীচরণকে কেমন যেন মনমরা লক্ষ্য করছিলুম। কর্নেল তখনও ছাদে ক্যাকটাস এবং অর্কিডের সেবায় মশগুল। এসব সময় অবস্থা মৌনীবাবাদের মতো। তাই নিচের ড্রইংরুমে অপেক্ষা করছিলুম। ষষ্ঠী যথারীতি কফি দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মুখটা বেজায় গম্ভীর। চেহারা উস্কোখুস্কো। চোখের তলায় যেন কালি। জিগ্যেস করেছিলুম, অসুখ-বিসুখ নাকি?

ষষ্ঠী শুধু মাথা নেড়েছিল। এরকম মাথা নাড়ার মানে হ্যাঁ বা না যে কোনওটাই হতে পারে।

কিছুক্ষণ পরে কফির পেয়ালা নিতে এল সে। তখন বললুম, তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন ষষ্ঠী?

ষষ্ঠীচরণ দাঁড়িয়ে মুখ নামিয়ে আঙুল খুঁটতে থাকল। তারপর গলার ভিতর বলল, ঠিক বুঝতে পারছি না দাদাবাবু!

—আহা! তোমার হয়েছে কী বলবে তো?

এবার ষষ্ঠী নিজের মাথাটা দু'হাতে আঁকড়ে ধরে বলল, আমি হয়তো আর বাঁচব না দাদাবাবু। আমার মাথার ভিতর কী একটা হয়েছে দু'দিন থেকে। বাবামশাইকে বললুম তো হেসে উড়িয়ে দিলেন। ইদিকে আমার মাথার ভিতর খালি বেহালা বাজছে!

অবাক হয়ে বললুম, বেহালা বাজছে? সে আবার কী?

আজ্ঞে হ্যাঁ। এই তো এখনও বাজছে।—ষষ্ঠী করুণ মুখে বলল।—মাঝে মাঝে বাজছে, আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। প্রথমে ভেবেছিলুম কেউ কোথাও বেহালার বাজনা শিখছে। এ বাড়ির সব ফেলাট, আশেপাশের বাড়ির সব ফেলাট, খুব খোঁজাখুঁজি করেছি। শেষে বুঝতে পেরেছি আমার খুলির ভিতর বাজছে। আমার বড় কষ্ট দাদাবাবু!

হঠাৎ চমকে উঠলুম। এ কী! আমার মাথার ভিতরও যেন বেহালা বাজছে। এতক্ষণ খেয়াল করিনি। এবার স্পষ্ট বুঝতে পারছি, অত্যন্ত ক্ষীণ সুরে ঝিঁঝিপোকার ডাকের মতো কোঁ কোঁ করে বেহালা বাজছে। ষষ্ঠী আমার মুখের অবস্থা দেখে কী বুঝল কে জানে, ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে কফির পাত্র নিয়ে চলে গেল।

বড় ভাবনায় পড়ে গেলুম। কলকাতায় একেক সময় একেক রকম উদ্ভুট্টে রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এই বেহালা-রোগ নিশ্চয় সংক্রামক। ষষ্ঠীর হাতে কফি খাওয়ামাত্র আমাকে ধরেছে। দু'হাতে মাথা আঁকড়ে ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিলুম। মাথায় বারকয়েক গাঁট্টা মারলুম। তখন হঠাৎ অতিসূক্ষ্ম বেহালার সুরটা থেমে গেল।

কিন্তু একটু পরেই ফের শুরু হয়ে গেল মারাত্মক সেই বাজনা। কোঁ কোঁ কোঁ কোঁ—অস্বস্তিকর হতচ্ছাড়া একটা সুর। আতঙ্কে আমার গলা শুকিয়ে গেল। এই সময় কোনার দিকে সিঁড়িতে আমার প্রাজ্ঞ বন্ধুর পায়ের শব্দ শোনা গেল। আর্তনাদের সুরে চেঁচিয়ে উঠলুম, কর্নেল! কর্নেল!

কর্নেলের পরনে গার্ডেনিংয়ের পোশাক। হাতে খুরপি এবং সাদা দাড়িতে শুকনো পাতা। আমার দিকে দৃকপাত না করে সটান বাথরুমে ঢুকলেন। আমি মরিয়া হয়ে আবার মাথায় গাঁট্টা মারতে থাকলুম। বাজনাটা যেন কর্নেল আসার পরই বেড়ে চলেছে। মনে হচ্ছে একটা অদৃশ্য বেহালার ছড় ধারালো করাতের মতো আমার ঘিলুকে ফালা-ফালা করছে।

তারপর কর্নেলের ডাক শুনতে পেলুম।—জয়ন্ত কি ইদানীং বক্সিং শিখতে শুরু করেছ? আমার মনে হয়, নিজের মাথার চেয়ে এ ব্যাপারে বালি ভর্তি একটা বস্তাই উপযুক্ত জিনিস।

বোবা ধরা গলায় বললুম, বক্সিং নয়, বক্সিং নয়। মাথার ভিতর কী একটা কেলেঙ্কারি।

—অ্যাসপিরিন বড়ি খাও!

—না, না। বেহালার বাজনা। ওঃ! আমার মাথার ভিতর কেউ বেহালা বাজাচ্ছে!

কর্নেল আসতে আসতে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। পর্দার ফাঁকে ষষ্ঠীচরণের মুণ্ডু দেখা যাচ্ছিল। সে বলে উঠল, বাবামশাইকেও ধরবে বেহালা রোগে। পেথমে আমাকে ধরল। তা'পরে কাগুজে দাদাবাবুকে ধরল। প্রিতিকার না করলে আপনাকেও ধরবে। তখন বুঝবেন কী কষ্ট!

কর্নেল ঘুরে চোখ কটমটিয়ে তাকালেন ওর দিকে। ষষ্ঠী মুণ্ডু সরিয়ে নিল পর্দার আড়ালে। তারপর কর্নেল আমার দিকে ঘুরে হো হো করে হেসে উঠলেন।

ক্ষুব্ধ হয়ে বললুম, আপনি হাসছেন! পারছেন হাসতে? কোথায় ডাক্তার ডাকার ব্যবস্থা করবেন, তা নয়, মজা দেখছেন। ঠিক আছে। আমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি।

উঠে দাঁড়াতেই কর্নেল এগিয়ে এসে আমার কাঁধে থাবা হাঁকড়ালেন। তারপর হিড়হিড় করে টেনে একটা একোয়ারিয়ামের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, ওটা কী?

হকচকিয়ে গিয়েছিলুম। একোয়ারিয়ামের ভিতর একটি কালচে বাদামি রঙের জলচর জীব রয়েছে। দেখতে দেখতে বললুম, কাঁকড়া বলে মনে হচ্ছে।

—এই কাঁকড়াটির সঙ্গে তোমার এবং ষষ্ঠীর বেহালা-রোগের সম্পর্ক আছে।

—তার মানে?

কর্নেল আবার অট্টহাসি হেসে বললেন, দেখতে পাচ্ছ? কাঁকড়ার সামনে একটা লম্বাটে ঠ্যাং মুখের কাছে বেঁকে তিরতির করে কাঁপছে। জলে বুজকুড়ি ওঠাও তো দেখতে পাচ্ছ।

—পাচ্ছি। কিন্তু—

—একে বলে ফিডলার ক্র্যাব। বেহালা-বাজিয়ে কাঁকড়া।

সঙ্গে সঙ্গে ঘিলু পরিষ্কার হয়ে গেল। আমিও হো হো করে হাসতে লাগলুম। পর্দার আড়ালে ষষ্ঠীরও খিক খিক হাসি শোনা গেল। ওই হতচ্ছাড়া কাঁকড়াটাই তাহলে বেহালা বাজাচ্ছে এমন সুরে!

কর্নেল একোয়ারিয়ামের দিকে ঝুঁকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, লক্ষ্য করো ডার্লিং, ফিডলার কাঁকড়ার দু'পাশের দুটো সাঁড়াশির মতো হাত কিন্তু একই গড়নের নয়। একটা ছোট্ট, অন্যটা বড়। এ এক সৃষ্টিছাড়া জীব। জীবজগতে যেসব প্রাণীর হাত আছে, তাদের দুটো হাতের গড়ন ও আয়তন একইরকম। শুধু ফিলডার কাঁকড়া ব্যতিক্রম। এক অদ্ভুত বৈষম্যের প্রতীক।

আমরা সোফায় এসে বসলুম। কর্নেলের ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেল। কর্নেল আমাকে হাত লাগাতে ইশারা করলেন। বললুম, ধন্যবাদ। জব্বর ব্রেকফাস্ট সেরেই বেরিয়েছি।

খেতে খেতে কর্নেল আবার ফিডলার কাঁকড়া নিয়ে পড়লেন।—ফিডলার কাঁকড়াকে অদ্ভুত বৈষম্যের প্রতীক বলেছি। কেন বলেছি, তার ব্যাখ্যা করতে হলে পদার্থ বিজ্ঞানের ল অফ প্যারিটি বা সাদৃশ্যের নিয়ম সম্পর্কে মোটামুটি কিছু ধারণা দরকার।

বেগতিক দেখে বললুম, কী দরকার আর? বেহালা-রোগ তো সেরে গেছে!

কর্নেল গ্রাহ্য করলেন না আমার কথা। বললেন, জয়ন্ত, পদার্থবিজ্ঞানীরা দেখছেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রকৃতি যা কিছু সৃষ্টি করেছে, সবই যেন জোড়ায়-জোড়ায় করেছে। একটা অপরটার

ঠিক উল্টো। উপমা দিয়ে বলছি—যেমন কিনা, তোমার ডানহাত আর বাঁহাত। সাদৃশ্যের নিয়ম অনুসারে বলা যায়, প্রকৃতি কিছু জিনিস যেন ডানহাতের পাকে—তকলিতে পাক ঘুরিয়ে সুতো কাটার মতো আর কি, এবং কিছু জিনিস বাঁহাতের পাকে তৈরি করেছে। ইংরেজিতে একে বলে, নেচারস রাইটহ্যান্ড টুইস্ট অ্যান্ড লেফটহ্যান্ড টুইস্ট। একটা অন্যটার উল্টো—যেমন দর্পণবিম্ব। দেখা যাবে, সব অসমানুপাতিক গড়নের জিনিসের দর্পণবিম্ব একেবারে উল্টো। যেমন আয়নার সামনে দাঁড়াও। দেখবে তোমার ডানহাত বাঁহাত হয়ে গেছে এবং বাঁহাত হয়ে গেছে ডানহাত। কিন্তু সমানুপাতিক গড়নের জিনিস—ধর একটা গ্লাস, আয়নার ভিতর একই রকম দেখাবে। উল্টো দেখাবে না। মজাটা হল, মানুষের হাত বা জলের গ্লাস এসব উদাহরণ নেহাত স্থূল উপমা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অনেক অসমানুপাতিক আণবিক গড়নের জিনিস পরীক্ষা করে দেখা গেছে এরকম দুটো জিনিস বাইরে-বাইরে দেখতে একই রকম, অথচ আণবিক গড়নে পরস্পর উল্টো। একটা যেন অপরটার দর্পণবিম্ব। ইংরেজিতে বলা হয়, মিরর ইমেজ। কিন্তু এখানেই বিপদ। কোনও জিনিস যদি তার ওই মিরর-ইমেজের মতো জিনিসের—তার মানে উল্টোসত্তার সংস্পর্শে আসে, সঙ্গে সঙ্গে তা ধ্বংস হয়ে যাবে। ধ্বংসটা কী রকম তারাও উপমা দিই। ধর, একটা লাঠির গায়ে একটা দড়ি ডানপাকে ঘুরিয়ে জড়িয়ে রেখেছ। কিন্তু দড়িটা বাঁপাকে ঘোরালেই কী ঘটবে? দড়ি ও ছড়ি আলাদা হয়ে যাবে। এই হল নেচারস রাইটহ্যান্ড টুইস্ট আর লেফটহ্যান্ড টুইস্টের রহস্য।

কান ভোঁ ভোঁ করছিল। কর্নেল জলের গ্লাস তুলে নিয়ে জল খেতে গিয়ে হঠাৎ থামলে আবার শুরু করবেন ভেবে দ্রুত বললুম, বুঝেছি আপনি আসলে ম্যাটার অ্যান্টিম্যাটারের কথা বলছেন।

কর্নেল জল খেয়ে গ্লাসটা রেখেছেন, এমন সময় কলিং বেল বাজল। তারপর ষষ্ঠী এসে ভিজিটিং কার্ড দিল। কার্ডটাতে চোখ বুলিয়ে কর্নেল যেন চঞ্চল হয়ে উঠলেন। হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে।

কর্নেলের সঙ্গে যিনি ঢুকলেন, তাঁকে দেখে আমিও চঞ্চল হয়ে উঠলুম। কান্দ্রার নবাব মির্জা আজমল খানের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল গত ডিসেম্বরে দিল্লিতে ওয়ার্লড ওয়াইল্ড লাইফ প্রোকেটেশন সোসাইটির সম্মেলনে। ভদ্রলোক একজন প্রখ্যাত ওরিন্থোলজিস্ট অর্থাৎ পক্ষিবিজ্ঞানী। বোম্বের সালিম আলির ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সালিমসায়েবও সেই সম্মেলনে এসেছিলেন।

মির্জাসায়েব অমায়িক এবং খেয়ালি প্রকৃতির মানুষ। কর্নেলের মতোই তাগড়াই ফর্সা, চেহারা। তবে কর্নেলের মুখে সাদা দাড়ি এবং এবং মাথায় প্রশস্ত টাক, মির্জাসাহেবের মুখে শুধু বিশাল গোঁফ, মাথা ভর্তি ঝাকড়া মাকড়া চুল। বয়সে দু'জনেই অবশ্য ষাটের ওধারে।

মির্জাসায়েব সোফায় বসেই ঘোষণা করলেন, আপনাদের নিতে এলুম।—বলে আমার দিকে ঘুরলেন।—হ্যাঁ, আপনাকেও। কারণ ভেবে দেখলুম, একজন সাংবাদিকেরও এসব বিষয়ে জড়িত থাকা উচিত।

কর্নেল একটু হেসে বললেন, কীসব বিষয়ে বলুন তো?

—বলছি। বলে হঠাৎ মির্জাসাহেব মাথাটা জোরে নাড়া দিলেন। বললেন, আরে কী মুশকিল!

—কী হল মির্জাসাহেব?

—হঠাৎ মাথার ভিতর কী যেন—

—বেহালার বাজনা নয় তো?—বলে উঠলুম সঙ্গে সঙ্গে।

মির্জাসাহেব মাথাটা আবার ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, সর্বনাশ! বেহালার বাজনার মতো মাথার ভিতর এ কী বিশ্রী উপদ্রব শুরু হল!

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, ফিডলার ক্র্যাব। ওই একোয়ারিয়ামে বসে বেহালা বাজাচ্ছে।

তাই বলুন! —কান্দ্রার নবাব হা হা করে অট্টহাসি হাসতে লাগলেন।...

ঘুঙুরপরা চোর!

কফিতে চুমুক দিয়ে মির্জাসাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, এখনও লোকে আমাকে মির্জানবাব বলে ডাকে। খাতিরও করে। কিন্তু নবাবি তো কবে ঘুচে গেছে। প্রিভিপার্স বাবদ বার্ষিক বৃত্তিও সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। সেজন্য অবশ্য আমি মোটেই দুঃখিত নই। ধনসম্পদে আমার কোনওদিনও রুচি ছিল না। কিন্তু জিনিসটা আমার পূর্বপুরুষের সংগৃহীত সম্পদ। বাজারে নিশ্চয় ওটার অনেক টাকা দাম। দামের জন্য নয়, একটা পারিবারিক ও বংশানুক্রম পবিত্র স্মৃতির প্রতীক বলেই আমার কষ্ট হচ্ছে।

কর্নেল বললেন, জিনিসটা বলতে কোনও রত্নের কথাই হয়তো বলছেন। সেটা কি চুরি হয়ে গেছে?

কান্দ্রার নবাব নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, হ্যাঁ। খুব রহস্যময় চুরি।

—কবে চুরি গেছে?

—গত ২৫ মার্চ রাত্রে। আমি তখন কান্দ্রা লেকের ধারে তাঁবুতে ছিলুম। খবর পেয়েছিলুম হিন্দুকুশ থেকে এক ঝাঁক ভরত পাখি এসেছে। দু'দিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম। ২৬ মার্চ সকালে খবর পেলুম 'নুরে আলম' চুরি গেছে। নুরে আলম কথাটার মানে ব্রহ্মাণ্ডের জ্যোতি। এমন নামের কারণও ছিল। ওটা একটা অত্যাশ্চর্য রত্ন। বিস্তর জহুরিকে দেখানো হয়েছে। কেউ বলতে পারেনি ওটা কী। কালো রঙের পাথরের মতো দেখতে। অথচ আলো পড়লেই নীল লাল সাদা সবুজ হরেক রঙের রশ্মি ঠিকরে পড়ত আর সেই রশ্মিগুলো চর্কির মতো ঘুরত। একবার এক ধাতুবিজ্ঞানীকে দেখিয়েছিলুম। তিনিও চিনতে পারেননি ওটা কী ধাতু।

—হুঁ। কীভাবে চুরি গেছে?

—কান্দ্রা উপত্যকায় এই সময়টা মাঝরাতে পাহাড় থেকে একটা ঝোড়ো হাওয়া নেমে আসে। গ্রীষ্ম অব্দি এটা দেখা যায়। ২৫ মার্চ রাতে ঝড়টা যখন আসে, হঠাৎ বাড়ির সব আলো নিভে গিয়েছিল। ঝড়টা মিনিট কুড়ি ছিল। ওই সময় দারোয়ান একটা অদ্ভুত শব্দ শোনে। শব্দটা কতকটা ঘুঙুরের মতো। কেউ যেন পায়ে অসংখ্য ঘুঙুর বেঁধে ঝমঝম করে হেঁটে বেড়াচ্ছে। বাবুর্চি কিসমত খাঁ বলেছে, সে অন্যরকম শব্দ শুনেছে। শিসের শব্দের মতো। তারপর—

—আগে বলুন, নুরে আলম ছিল কোথায়?

—আমার বেডরুমে দেয়ালে আঁটা আয়রনচেস্টের ভিতর। চোর সেটার একটা পাল্লা সম্ভবত গ্যাসের আগুনে—তার মানে, অ্যাসিটিলিনে গলিয়ে তরল করেছে। তারপর জিনিসটা হাতিয়েছে।

—দরজা বন্ধ ছিল বাইরে থেকে?

—নিশ্চয় ছিল। তালা গলিয়ে ফেলেছে। কিন্তু ভয়ঙ্কর ব্যাপার হল, দরজার বাইরে আমার এক পরিচারক কুদরত খাঁয়ের লাশ পড়ে ছিল। নিশ্চয় সে টের পেয়ে ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার, তার লাশ একেবারে পুড়ে ছাই! একদলা ছাই তুলে কবর দেওয়া হয়েছে।

—ছাই! কর্নেল অবাক হয়ে বললেন।—পোস্টমর্টেম হয়নি?

—কীভাবে হবে? তবে একমুঠো ছাই পুলিশ দিল্লির ফরেন্সিক এক্সপার্টদের কাছে পাঠিয়েছিল, তাঁদের মতে, প্রচণ্ড ভোল্টের বিদ্যুৎ বয়ে গেছে কুদরত খাঁর শরীরে।

—বাজ পড়ে মারা গেলেও কিন্তু লাশ পুড়ে ছাই হয় না।

—হ্যাঁ। তাছাড়া ঘরের ভিতর বাজ ঢুকবে কীভাবে? বাজের তো ঠ্যাং গজায়নি।

আমি বললুম, শ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লিতে মড়া পুড়িয়ে ছাই করা হয়। নিশ্চয় অতটা ভোল্টেজ না হলে কুদরত খাঁর দেহ ছাই হত না!

মির্জানবাব কফি শেষ করে বললেন, তাহলেই বুঝুন কেমন চোর!

কর্নেল একটু হেসে বললেন, বৈদ্যুতিক চোর!

মির্জাসায়েবের মুখে অবশ্য হাসি ফুটল না। উনি জ্যাকেটের পকেটে হাত ভরে কিছু বের করেছিলেন। ভাবলুম সিগারেটের প্যাকেট বের করছেন। কিন্তু তার বদলে বের করলেন কাগজে জড়ানো একটা চাকতির মতো জিনিস। মোড়ক খুললে দেখলুম, জিনিসটা একটা কালো রঙের চাকতি। আয়তনে রুপোর টাকার চেয়ে সামান্য বড়। চাকতিটার দু'পিঠেই সাদা আঁকজোক।

সেটা কর্নেলের হাতে দিয়ে কান্দ্রার নবাব বললেন, এই জিনিসটা কুদরত খাঁয়ের লাশের কাছে পড়েছিল। ফরেন্সিক টেস্ট করানো হয়েছে। ওঁরা বলতে পারেননি এটা কোনও ধাতু না পাথর। কোনও জৈব পদার্থও নয়। মোট কথা, এটা বিজ্ঞানীদের এ পর্যন্ত জানা কোনও পদার্থের মধ্যে পড়ে না।

কর্নেল উঠে গিয়ে তাঁর আতস কাচ নিয়ে এলেন। তারপর পরীক্ষা করতে করতে বললেন, উঁহু—এই আঁকজোকগুলো ফার্সি নয়। কী ভাষা কে জানে।

মির্জাসায়েব বললেন, কর্নেল, এই জিনিসটাকে কান্দ্রার লোকেরা বলে ওজরাকের পাঞ্জা।

কর্নেল মুখ তুললেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, ওজরাকের পাঞ্জা!

আমি অবাক হয়ে বললুম, ওজরাক! সে আবার কে?

কান্দ্রার নবাব বললেন, ওখানকার লোকে—বিশেষ করে পশুপালক গুজর উপজাতির লোকেরা বংশপরম্পরায় বিশ্বাস করে, কান্দ্রা উপত্যকার পশ্চিমের পাহাড়ে বাস করে ওজরাক নামে এক মায়াবী জাদুকর। তার নাকি উড়ান-খাটোলা বা উড়ন্ত খাটিয়া আছে। তাতে চেপে মাঝে মাঝে ওজরাক বেড়াতে যায় নক্ষত্রের দেশে।

হাসতে হাসতে বললুম, রীতিমতো রূপকথা!

কে কানে!—মির্জাসায়েব বললেন।—ওজরাক নাকি খেয়াল বশে কখনও তার পাহাড়পুরী থেকে নেমে আসে কান্দ্রা উপত্যকায়। যখনই আসে, এই পাঞ্জা ফেলে রেখে যায়। যেন জানিয়ে যায়, আমি এসেছিলুম।

—আপনি বিশ্বাস করেন এসব কথা?

মোটেও করি না। কিন্তু ২৫ মার্চ রাত্রে যখন লেকের ধারে তাঁবুতে ছিলুম, ঝড় ওঠার সময় দূর আকাশ থেকে একটা আলো নেমে আসতে দেখেছিলুম। ভেবেছিলুম, উল্কা কিংবা কান্দ্রা অবজারভেটরির আবহাওয়া বেলুন। কে জানে কী!

—আর কারুর কাছে ওজরাকের পাঞ্জা আছে জানেন? দেখেছেন এমন পাঞ্জা?

—দেখেছি। গুজরদের সর্দার হালাকু একটা পাঞ্জা কুড়িয়ে পেয়েছিল। সেটা যত্ন করে রেখে দিয়েছে। দেখিয়েছিল আমাকে।

কর্নেল চাকতিটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। কান করে শুনি, বিড়বিড় করে বলছেন, ওজরাকের পাঞ্জা....ওজরাকের পাঞ্জা...ওজরাক...ওজরাক...

তারপর সোজা হয়ে বসলেন।—মির্জাসাহেব! এগুলো হরফ নয়। প্রতীক চিহ্ন। পাঁচটা করে আঁকা-বাঁকা সাদা রেখে আসলে বজ্রচিহ্ন।

এই বলে উনি হন্তদন্ত উঠে গেলেন বুকশেলফের কাছে। একটা প্রকাণ্ড বই টেনে পাতা ওল্টাতে থাকলেন। তারপর উজ্জ্বল হাসি নিয়ে সোফায় ফিরলেন। বললেন, আমার স্মৃতিশক্তি ক্ষয়ে যাচ্ছে দ্রুত। প্রকৃত বার্ধক্যের লক্ষণ চুলদাড়ি সাদা হওয়া বা বয়স বেশি হওয়াতে নেই। যাই হোক, এই বইটা হল রিচার্ড কেলির লেখা 'এ শর্ট ওয়াক ইন দি কারাকোরাম অ্যান্ড হিন্দুকুশ।' পর্যটক কেলি ১৮৭৯ সালে কাশ্মীর, আফগানিস্তান আর পামির অঞ্চলে কিছুদিন ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। ওই সময় তিনি স্থানীয় লোকেদের কাছে ওজরাকের পাঞ্জার কথা শোনেন। তবে তিনি জিনিসটা দেখেননি।

মির্জাসায়েব জিগ্যেস করলেন, ওজরাকের গল্পও তাহলে শুনে থাকবেন কেলি। লিখেছেন কিছু?

কর্নেল জবাব দিলেন, হ্যাঁ। কেলির মতে, ওটা স্রেফ রূপকথা।

কর্নেলের হাত থেকে পাঞ্জাটা চেয়ে নিলুম। দেখতে দেখতে বললুম, এটাকে পাঞ্জা বলার কারণ কী?

মির্জাসায়েব বললেন, পাঞ্জা এসেছে পাঞ্জ শব্দ থেকে। ফার্সি পাঞ্জ আর সংস্কৃত পঞ্চ একই শব্দ। কিন্তু পাঞ্জা বলতে বোঝায় হাতের পাঁচটা আঙুলের ছাপ। আগের দিনে বাদশারা কোনও হুকুমজারি করলে কিংবা সরকারি চিঠিপত্তর পাঠালে তাতে পাঁচটা আঙুলের টিপছাপ মেরে দিতেন। সই জাল করা যায়। কিন্তু আঙুলের ছাপ জাল করলে ধরা পড়বেই। কারণ প্রত্যেকটি মানুষের আঙুলের ছাপ আলাদা। এই কালো চাকতির পাঁচটা বজ্রচিহ্নকে কান্দ্রার লোকেরা ওজরাকের পাঁচ আঙুলের ছাপ বলে বিশ্বাস করে।

কর্নেল মন্তব্য করলেন, ওজরাকের পাঞ্জায় বজ্রচিহ্ন থাকার অর্থ দাঁড়াচ্ছে, ওজরাক বজ্রদেবতা।

আমার মাথায় চমক খেলে গেল। বললুম, কর্নেল! ওজরাক শব্দটা বজ্রের অপভ্রংশ নয় তো?

তুমি হয়তো ঠিকই বলেছ, জয়ন্ত। কর্নেল বইটা রাখতে গেলেন শেলফে। রেখে এসে ফের বললেন, ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের মতে, ওইসব অঞ্চলের সব ভাষা ও উপভাষার উদ্ভব ঘটেছে একটা পুরনো ভাষা থেকে, যাকে বলা যায় ইন্দো-ইরানি মূল ভাষা। তাই ভারতীয় প্রধান ভাষা সংস্কৃতের সঙ্গে ওদের মিল দেখা যায় এত।

মির্জাসায়েব একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন, ভাষাতত্ত্ব থাক, কর্নেলসায়েব! আমার নুরে আলম চুরির ব্যাপারে কী করছেন বলুন!

কর্নেল অভ্যাসমতো চোখ বুজে দাড়িতে আঙুলের চিরুনি টানছিলেন। সেই অবস্থায় বললেন, ইদানীং দেশের বিভিন্ন জাদুঘর বা প্রত্নশালা থেকে বেশ কিছু ঐতিহাসিক রত্ন এবং মূর্তি চুরির হিড়িক পড়ে গেছে। না—কোথাও ওজরাকের পাঞ্জা পড়ে থাকতে দেখা যায়নি। তবে চুরির পদ্ধতি অনেকটা একরকম। অ্যাসিটিলিন প্রায়োগ করেছে চোর। সেই সঙ্গে আরও একটা মিল এখন দেখতে পাচ্ছি। চুরি হয়েছে দুপুর রাতে এবং....

হঠাৎ নড়ে বসলেন কর্নেল। চোখ খুলে বললেন, কী আশ্চর্য!

মির্জাসায়েব বললেন, কী ব্যাপার?

—ঝড় বা ঝোড়ো হাওয়া!

—তার মানে?

—প্রত্যেকটি চুরি হয়েছে গভীর রাতে এবং সেই সময় ঝড় বইছিল।

আমি বললুম, ঝড়ের সময় মওকা বুঝেই চোর এসেছিল হয়তো!

কর্নেল উঠে পায়চারি করতে করতে উত্তেজিতভাবে বললেন, শুধু ঝড় নয়, অদ্ভুত সব শব্দ। মির্জাসায়েব বলছিলেন, দারোয়ান যেন ঘুঙুরের শব্দ শুনেছে। প্রত্যেকটি চুরির রিপোর্টে এর উল্লেখ আছে। রক্ষীরা বলছে, যেন কোথায় ঝমর ঝম শব্দে ঘুঙুর বেঁধে কেউ নাচছিল।

আমি ও কান্দ্রার নবাব নিঃশব্দে দেখাদেখি করছিলুম পরস্পরের দিকে। বলার কিছু খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

ওজরাকের ইন্দ্রজাল

কান্দ্রা উপত্যকার চারিদিকেই উঁচু সব পাহাড়। পূর্বদিকে একটা গিরিবর্ত্ম আছে, যার নাম 'হায়দার পাস', কান্দ্রার নবাবের পূর্বপুরুষের নামে। স্থলপথে কান্দ্রায় ঢুকতে হলে হায়দার পাস হয়ে যেতে হয়। কিন্তু শীতের দু-তিনটে মাস ওই গিরিবর্ত্ম বরফ জমে বন্ধ হয়ে যায়। তবে এ যুগে বিমানের দৌলতে কান্দ্রা যাতায়াতে আগের মতো বাধাবিপত্তি নেই। বারোমাসই যাতায়াত চলে শীতের সময়টা বিমানে বাকি সময় মোটর গাড়িতে।

এখন এপ্রিলে হায়দার পাস খুলে গেছে। কান্দ্রায় বসন্ত ঋতুর সমারোহ। তবে এই ভূস্বর্গ ভ্রমণে খুব কড়াকড়ি আছে সরকার থেকে। প্রতিরক্ষা দফতরের কড়া নজর পর্যটকদের দিকে। অবজারভেটরি, রেডার কেন্দ্র, স্পেস রিসার্চ ল্যাবরেটরি, বিমানবাহিনীর ব্যারাক এবং একটি বিমানক্ষেত্র—কান্দ্রা ভ্যালিতে এতসব ব্যাপার। কাজেই কড়াকড়ি থাকা স্বাভাবিক।

সম্প্রতি কান্দ্রা অবজারভেটরিতে যে টেলিস্কোপটি বসানো হয়েছে, সেটা এশিয়ার বৃহত্তম। অবজারভেটরির ডিরেক্টর ডঃ শীলভদ্র সোম কর্নেল এবং আমাকে ঘুরে-ফিরে সব দেখাচ্ছিলেন। কর্নেলের সঙ্গে ওঁর পরিচয় আছে দেখে অবাক হইনি। আজকাল কর্নেলের কোনও ব্যাপারে অবাক হই না।

দেখাশোনা শেষ হলে ডঃ সোম আমাদের নিয়ে গেলেন তাঁর অফিস ঘরে। এখান থেকে কান্দ্রা উপত্যকার বহুদূর পর্যন্ত নজরে পড়ে। কর্নেল চুরুট জ্বেলে ধোঁয়ার ভিতর থেকে বললেন, ডঃ সোম ২৫ এবং ২৬ মার্চের অবজার্ভেশন্ রিপোর্টটা এবার দেখতে চাই।

কর্নেল ফাইলে মনোনিবেশ করলেন। ততক্ষণে কফি আর স্ন্যাক্স এসে গেল। নবাববাড়ি লাঞ্চ সেরে আমরা বেরিয়েছি। এখন প্রায় তিনটে বাজে।

কফি খেতে খেতে রিপোর্ট পাঠ শেষ করে কর্নেল মুখ তুলে একটু হাসলেন।—মাঝরাতের ঝড়টার কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল তাহলে!

ডঃ সোম বললেন, ছিল। ১০ মিনিট ৫৭ সেকেন্ডের ঝড়। সারা কান্দ্রা ভ্যালির পাওয়ার ফেল করেছিল অতক্ষণ। আমাদের অবজার্ভেটরির সব যন্ত্রপাতি নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিল। সূক্ষ্ম কিছু যন্ত্র একেবারে অকেজো হয়ে গিয়েছিল। সেগুলো রিপ্লেস করতে হয়েছে। মেরামত করেও চালু করা যায়নি। কিন্তু তার চেয়ে সাংঘাতিক ব্যাপার, কসমিক ডাস্ট পাওয়া গেছে ছাদের ফুলগাছের পাতায় এবং খোলা ট্যাংকের জলে।

কসমিক ডাস্ট মহাজাগতিক ধূলিকণা!—কর্নেল সোজা হয়ে বললেন।

ডঃ সোম হাসতে হাসতে বললেন, যেন মহাজাগতিক ঝড়ের একটা বিক্ষিপ্ত প্রবাহ পৃথিবীর আবহমণ্ডলে ঢুকে পড়েছিল সে রাতে!

কর্নেল ব্যস্তভাবে বললেন, এখানকার রেডার স্টেশন কী বলে?

ডঃ সোম একটা ফাইল নিয়ে এলেন। চোখ বুলিয়ে দেখে বললেন, হ্যাঁ—রেডারে দশ সেকেন্ডের জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম আকাশে অজানা কোনও বিমানের সংকেত পাওয়া গিয়েছিল। তারপর সেটা রেডার-স্ক্রিন থেকে সরে যায় ডানদিকে—নিচে। এই দেখুন, গতিটা ধনুকের মতো বাঁকা দেখানো হয়েছে।

কর্নেল ফাইলটা নিয়ে কিছুক্ষণ চোখে বুলিয়ে বললেন, বিমানক্ষেত্রে ওইসময় কোনও বিমান নামেনি তাহলে?

—না। ওঁরা বলেছেন, প্রায়ই চীনা বিমান ভারতীয় এলাকায় ঢুকে পড়ে এবং পালিয়ে যায়। এও কোনও উন্নতধরনের চীনা বিমান হওয়া সম্ভব। কারণ ম্যাগনেটিক ফিল্ডে প্রচণ্ড অভিঘাত ধরা পড়েছিল।

আমি বললুম, নবাব মির্জাসায়েব লেকের ধারে তাঁবু থেকে ওদিকে একটা আলো নামতে দেখেছিলেন!

ডঃ সোম চমকে উঠলেন। কর্নেল একটু হেসে বললেন, উফো! আনআইডেন্টিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট!

ডঃ সোম হাসতে লাগলেন।—ঠিক তাই! শুধু মির্জাসায়েব কেন, কান্দ্রা এলাকার লোকে প্রায়ই উফো দেখে। এসআরএল থেকে তদন্ত করে দেখা গেছে, কোনওটা আমাদের আবহাওয়াবেলুন, কোনওটা উল্কা, আবার কোনওটা চীনা গুপ্তচর বিমান অথবা কোনও স্পাইং ডিভাইস।

কর্নেল আবার ফাইলে চোখ রেখেছিলেন। বললেন, কান্দ্রা ভ্যালির পশ্চিম পাহাড় কি সত্যি দুর্গম, ডঃ সোম?

—ভীষণ দুর্গম। কোনও মানুষের পক্ষে ওই খাড়া গ্রানাইট দেয়াল বেয়ে ওঠা সম্ভব নয়।

—প্লেনে?

—প্লেনের পক্ষে আজকাল অসম্ভব তো কিছুই নেই। কিন্তু তার ওধারে চীনের অসংখ্য ঘাঁটি আছে। তাই প্লেনে ওদিকে ঘোরাঘুরি নিরাপদ নয়।

—আপনি ওজরাকের কথা শুনেছেন, ডঃ সোম?

ডঃ সোম হাসতে হাসতে বললেন, ছেলে ভুলোনো রূপকথা!

—মির্জাসায়েবের পরিচারকের মৃতদেহ ছাই হওয়ার ব্যাপারে কী বক্তব্য?

ডঃ সোম গম্ভীর হয়ে বললেন, নবাববাড়িতে চুরি হওয়ার কথা শুনেছি। ওসব ব্যাপার পুলিশের এক্তিয়ারে পড়ে। তবে এটুকু বলতে পারি, চুরির সঙ্গে একটা বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনাও জড়িত।

—কিন্তু সেজন্য যে প্রচণ্ড ভোল্টেজ দরকার, তা নবাববাড়ির ডোমেস্টিক লাইনে নেই।

—দেখুন কর্নেল, কোনওভাবে যদি আর্থ লাইন নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে অনেকক্ষেত্রে হেভি ভোল্টেজ দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। আবার ট্রান্সফর্মার যে সাপ্লাই লাইনে এসেছে, তার আর্থ লাইন নষ্ট হলে ট্রান্সফর্মারও জ্বলে যায়। নবাববাড়ির পিছনেই একটা ট্রান্সফর্মার আছে। সেটা জ্বলে গিয়েছিল শুনেছি। কাজেই ডেডবডি ছাই হওয়ার মধ্যে অলৌকিক কিছু থাকতে পারে না। অনেক সময় সাপ্লাই লাইনে আর্থ লাইনের গণ্ডগোলের জন্য আলো প্রচণ্ড বাড়ে ও কমে—যাকে বলে ফ্লাকচুয়েশন! একবার আমার কোয়ার্টারেই এমন হয়েছিল। ধোঁয়া বেরুতে শুরু করেছিল। বাল্ব কেটে গিয়েছিল। টি. ভি. ফ্রিজ ইত্যাদি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

কর্নেল উঠলেন।—চলি ডঃ সোম! আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রয়োজনে আবার আপনাকে বিরক্ত করতে আসব।

অবশ্যই আসবেন।—ডঃ সোম করমর্দন করলেন কর্নেলের সঙ্গে তারপর আমার করমর্দন করে বললেন, জয়ন্তবাবু! আমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে আশা করি কাগজে লিখবেন।

ডঃ সোমের কাছে বিদায় নিয়ে যখন বেরুলুম, তখন কান্দ্রা উপত্যকায় বিকেলের গোলাপি রোদ্দুর নেমেছে। পাহাড়ের গা কেটে রাস্তা নেমেছে ঘুরে-ঘুরে। মির্জাসায়েবের গাড়িতে আমরা এসেছিলুম। ড্রাইভারের নাম বদর খাঁ। একখানে হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে সে হিন্দিতে বলল, দেখুন সায়েব! ওজরাকের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন—ওই দেখুন ওজরাকের দেশ! আজব জাদু দেখুন!

কর্নেল মুখ বাড়ালেন। আমি বললুম কই জাদু, বদর খাঁ?

বদর খাঁ বলল, পশ্চিমদিকে নজর দিন, সায়েব!

আমাকে গাড়ি থেকে নামতে হল। কারণ গাড়ির মুখ উত্তরে এবং কর্নেল বসেছেন বাঁদিকে, আমি ডাইনে। নেমে গিয়ে হতবাক হয়ে পড়লুম।

ওই পার্থিব সৌন্দর্যের কোনও তুলনা নেই। পশ্চিমের পাহাড়গুলোর চুড়ো কোনওটা গির্জার মতো ছুঁচলো, কোনওটা পিরামিডের মতো তিনকোনা। আর তাদের ফাঁকে গলিয়ে পিচকিরির মত রংবেরঙের আলোর দীর্ঘ দীর্ঘ ফালি উপত্যকার সবুজ সমভূমিতে নেমে আসছে। পাহাড়গুলোর কাঁধে ঘন নীল কুয়াশার আলোয়ান চাপানো যেন। কিন্তু বড় মায়াময় ওই রামধনুর মতো অথবা প্রিজমের মতো বিচ্ছুরিতবর্ণালী! এমন আশ্চর্য রঙের খেলা আর কখনও দেখিনি।

দেখতে দেখতে ওজরাকের ওপর যেন বিশ্বাস এসে গেল। ওখানে কোনও মায়াবী জাদুকর বাস করে, তা মিথ্যা নয়। তার খেয়ালি হাতের অপরূপ ওই ইন্দ্রজাল দেখে তারিফ করবে না সে কোন মূর্খ! আমি ভাবে গদ গদ হয়ে বললুম, অপূর্ব খাসা! কর্নেল, ওজরাককে আমার প্রণাম করতে ইচ্ছে করছে।

কর্নেল চোখে বাইনোকুলার রেখেই নামিয়ে ফেললেন।—নাঃ! খালি চোখেই রঙের খেলাটা দেখা যাচ্ছে। তবে ডার্লিং। তুমি যতই বলো, এর মধ্যে কোন জাদু আমি দেখতে পাচ্ছি না। আশা করি, দার্জিলিঙের টাইগার হিল থেকে তুমি সূর্যোদয় দেখেছ!

আপত্তি করে বললুম, এটা সূর্যাস্ত। তাছাড়া কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা! কর্নেল, শুধু রঙিন আলো হলেও কথা ছিল! আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না ওজরাকের জাদুপুরীও ক্রমশ ভেসে উঠেছে! ওই দেখুন, যেন রংবেরঙের সাতমহলা প্রাসাদ ভাসছে শূন্যে।

বদর খাঁ বিড়বিড় করে কী আওড়াচ্ছিল চোখ বুজে। এবার দু'হাতে মুখ ঘষে তাকে গাড়িতে ঢুকতে দেখলুম। বলল, চলে আসুন সায়েব! বেশিক্ষণ দেখলে চোখ নষ্ট হয়ে যাবে। ওজরাক হল গিয়ে শয়তানের চেলা। শয়তানের কাছে জাদু শিখে মানুষকে ভোলায় সে। সেদিন ঠিক এমনি সময়ে হালাকুর মেয়ে ভেড়া চরাতে গিয়ে ওজরাকের পাল্লায় পড়েছিল! জোর বেঁচে পালিয়ে এসেছে।

গাড়ি আবার এগোল। কর্নেল বললেন, বদর খাঁ! হালাকু থাকে কোথায়?

বদর খাঁ বলল, লেকের দক্ষিণে এখান থেকে ছ-সাত মাইল দূরে ওদের তাঁবু।

—সেখান গাড়ি করে যাওয়া যায় না বদর খাঁ?

—লেক অব্দি গাড়ি যাবে। তারপর আধামাইল পায়দল যেতে হবে।

—নিয়ে যাবে আমাদের?

বদর খাঁ হাসল।—হজুর নবাবসায়েবের হুকুম আছে। যেখানে যেতে চাইবেন, এ বান্দা সেখানেই নিয়ে যাবে। তবে গুজরদের তাঁবুর এলাকায় সাবধানে যেতে হবে, সায়েব! ওদের কুকুরগুলো বড্ড বেতমিজ।

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, কুকুর বশ করার ব্যাপারে আমিও এক ওজরাক, বদর খাঁ!

রিয়া ও তার প্রতিবিম্ব

কান্দ্রা ও লেকের কাছে গাড়ি থামিয়ে বদর খাঁ বলল, একটু অপেক্ষা করুন আপনারা। গাড়িটা কোথাও লুকিয়ে রেখে আসি। আজকাল এ তল্লাটে খুব গাড়ি চুরি হচ্ছে।

সে একটু তফাতে উইলোঝোপের আড়ালে গাড়িটাকে এমনভাবে রেখে এল, রাস্তা থেকে ঠাহর হচ্ছিল না ওখানে কোনও গাড়ি আছে। গাড়িটার রংও অবশ্য ঘন সবুজ।

ফিরে এসে বদর খাঁ বলল, আপনাদের সঙ্গে টর্চ আছে তো? ফিরতে আঁধার হয়ে যাবে।

কর্নেল বললেন, আছে। এমনকী কুকুর-বশ করা যন্ত্রও আছে!

বদর খাঁ খুব অবাক হয়ে পা বাড়াল। অবাক হলুম আমিও। নিশ্চয় রসিকতা করছেন কর্নেল। পাইনবনের ভিতর এখনই আবছা আঁধার জমেছে। পায়ে চলা রাস্তা ধরে বনটা পেরুলে খোলামেলায় পৌঁছলুম। এবার আর রাস্তার চিহ্ন নেই। এখানে-ওখানে পাথরের বোল্ডার পড়ে আছে। ঘন ঘাসের জঙ্গল গজিয়ে রয়েছে সবখানে। তার মাঝে মাঝে কিছু গাছপালা। এটা মোটামুটি একটা সমতলভূমি বলা যায়। পশ্চিমে পাহাড়ের সেই আলোর জাদু আর চোখে পড়ছে না। সূর্য একটা তিনকোনা চূড়ার আড়ালে নেমে গেছে। তাই সারা তৃণভূমির উপর পাহাড়ের বিশাল ছায়া নেমেছে। ঘাসের জঙ্গলের ভিতর গুজরদের তাঁবু চোখে পড়ছিল। কিছুক্ষণ পরে তাদের খোঁয়াড় দেখা গেল। বেড়ায় ঘেরা বিশাল খোঁয়াড়ে অসংখ্য ভেড়া-ছাগল-দুম্বা জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কর্নেল আমাকে গাছপালা চেনাচ্ছিলেন।—ওই দেখছ—ওটা ওক। ওইটে হল বুনো আখরোট। ওগুলো পপলার। আর ওই গাছটা লক্ষ্য কর—মালবেরি। যাকে বলে তুঁতফলের গাছ।

হঠাৎ বদর খাঁ থমকে দাঁড়াল। আঁতকে ওঠা গলায় বলল, কুকুর সায়েব! কুকুর আসছে!

চমকে উঠে দেখি, খোঁয়াড়ের দিক থেকে তিনটে তাগড়াই কুকুর জিভ বের করে দৌড়ে আসছে আমাদের দিকে। আমি পকেট থেকে ঝটপট রিভলভার বের করতেই কর্নেল বললেন, আঃ! কী করছ জয়ন্ত! রিভলভার লুকিয়ে ফেলো শিগগির।

বলে উনি সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর জ্যাকেটের ভিতর পকেট থেকে একটা কাচের টিউব বের করলেন। কুকুর তিনটে যখন প্রায় হাত দশেক তফাতে এসে গেছে, তখন সেই টিউব বাড়িয়ে দিলেন সামনের দিকে এবং ছিপি খুলে ফেললেন।

সঙ্গে সঙ্গে তিনটে কুকুরই থেমে গেল। মুখ নিচু করে কেঁউ কেঁউ শব্দ করতে থাকল। কর্নেল হাসতে হাসতে একটুখানি এগিয়েছেন, আর তিনটে, কুকুরই লেজ গুটিয়ে কুঁকড়ে পিঠটানা দিল। বদর খাঁ খ্যা খ্যা করে হেসে কুকুর তিনটেকে দুয়ো দিতে থাকল।

অবাক হয়ে বললুম, ব্যাপারটা কী কর্নেল?

কর্নেল মুচকি হেসে পা বাড়িয়ে বললেন, আমার সাম্প্রতিক উদ্ভাবন। এর নাম দিয়েছি ফরমুলা-ডগ। অ্যামোনিয়ার সঙ্গে উনিশরকম রাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে এটা তৈরি করেছি। এর এমনই উৎকট গন্ধ যে কুকুর কেন, কেঁদো বাঘও কেঁচো হয়ে পালিয়ে যাবে। অবশ্য মানুষের উপর এখনও পরীক্ষা করিনি। এখনই করা যেতে পারে।—বলে টিউবটা আমার দিকে ঘোরালেন।

গন্ধ পেলুম কি না জানি না, আঁতকে উঠে নাক বন্ধ করে পিছিয়ে এলুম। —দোহাই কর্নেল! এই কুকুর তাড়ানো ফরমুলা-ডগ প্রয়োগের জন্য আরও মানুষ পাবেন।

কর্নেল ছিপি এঁটে টিউবটা প্যাকেটের ভিতর চালান করলেন। বদর খাঁ নাকের ফুটোয় আঙুল ঢুকিয়ে বলল, বহৎ বদ বু নিকালতা।

গুজরদের তাঁবুতে ততক্ষণে কুকুরের ব্যাপারটা ওরা টের পেয়ে গেছে হয়তো। একদঙ্গল লোক বেরিয়ে আমাদের দেখছে। বদর খাঁ চেঁচিয়ে ডাকল, হালাকু! হালাকু! জলদি ইধর আও। কলকাত্তাসে সাবলোগ তুমহারা মুলাকাত মাংতা।

একজন প্রৌঢ় তাগড়াই গড়নের লোক ভিড় থেকে আমাদের দিকে দৌড়ে এল। তার মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি, পরনে ঢিলে কোর্তা আর শালোয়ার। পা অবশ্য খালি। সেলাম দিয়ে বদর খাঁ-র দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। বদর খাঁ বলল, নবাববাহাদুর এঁদের পাঠিয়েছেন। এঁরা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।

গুজর সর্দার আমাদের খুব খাতির দেখিয়ে তাঁবুতে নিয়ে গেল। তাঁবুগুলো চামড়া সেলাই করে তৈরি। কোনওটার উপর তেরপলও চাপানো হয়েছে। খোলা জায়গায় উনুন পেতে মেয়েরা রাতের রান্নায় ব্যস্ত। কেউ চাপাটি বানাচ্ছে। কেউ প্রকাণ্ড পাত্রে দুধ জাল দিচ্ছে। ভিড় হটিয়ে হালাকু চামড়ার আসন পেতে আমাদের বসাল। আশেপাশে কোথাও কুকুরের লেজের ডগটুকুও দেখতে পাচ্ছিলুম না।

কর্নেল লোকের সঙ্গে ভাব জমাতে ওস্তাদ। হালাকু সর্দারের সঙ্গে খোশগল্প জুড়ে দিয়েছেন। হালাকু ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে কথা বলছে। আমরা নবাববাহাদুরের মেহমান শুনে সে একেবারে ভক্তিতে গদগদ। বলল, এবার শীতকালটা কান্দ্রায় এসে ভালই কাটল। যেখানেই ঘুরে বেড়াই, কান্দ্রার জন্য মন পড়ে থাকে আমাদের। পুরুষানুক্রমে কান্দ্রার নবাব আমাদের মা-বাপের মতো। এই যে ঘাসের জঙ্গল দেখছেন, তার মালিক ওঁরা। কোনও খাজনা কখনও দাবি করেননি। আমরা এসে তাই ভেট দিই। ছাগল ভেড়া, কখনও মাখন দুধ চর্বি—যা পারি দিই। তো নবাববাহাদুর কিছুতেই নিতে চান না। বলেন, মিলিটারিদের দিয়ে এস। ওরাই নাকি এখন এই ঘাসের জঙ্গলের মালিক। আমি বিশ্বাস করি না, হুজুর।

কর্নেল বললেন, এবার গ্রীষ্মে কোথায় যাবে, সর্দার?

হালাকু বলল, পামির এলাকায় যাব। সেখানে চীনাদের রাজত্ব। সেখান থেকে যাব কাশগড়,

তারপর উত্তরে মাকরান। সেখানে হুজুর, রুশ মুল্লুক। সেখান থেকে আবার কান্দ্রায় ফিরে আসব। ওসব মুল্লুকে শীতের সময় খালি বরফ আর বরফ। জানোয়ার কী খেয়ে বাঁচবে?

কর্নেল বললেন, আমি তোমার কাছে এসেছি ওজরাকের কথা শুনতে। তোমার কাছে নাকি ওজরাকের পাঞ্জা আছে।

হালাকু চোখ বড় করে তাকাল। তার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। দুর্বোধ্য ভাষায় কাউকে কী বলল, তারপর উঠে তার তাঁবুতে ঢুকল। একটা লোক ব্যস্তভাবে আমাদের সামনে একপাঁজা কাঠ এনে আগুন ধরাল। বেশ ঠাণ্ডা টের পাচ্ছিলুম। আগুনের কুণ্ড ঘিরে বসলুম আমরা। তারপর হালাকু বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে।

তার হাতে সেই ওজরাকের পাঞ্জা। কর্নেলের হাত দিয়ে সে বলল, আমি খুব ভাবনায় পড়ে গেছি হুজুর। আজই ভাবছিলুম, পাঞ্জাটা যেখানে পেয়েছিলুম, ফেলে দিয়ে আসব নাকি। এটা আর কাছে রাখতে সাহস হচ্ছে না।

—কেন সর্দার?

হালাকু উদ্বিগ্ন মুখে বলল, আমার মেয়ে রিয়া দু'দিন আগে ওজরাকের পাল্লায় পড়েছিল। খুব বেঁচে গেছে।

কথাটা বদর খাঁ বলেছিল। তখন অতটা গ্রাহ্য করিনি। তাই বললুম, ব্যাপারটা খুলে বলো তো সর্দার!

হালাকু বলল, পশ্চিমপাহাড়ের নিচে একটা নহর আছে। লেক থেকে নহরটা বেরিয়ে পশ্চিমপাহাড়ের নিচে দিয়ে চলে গেছে। এখন নহরে অল্প একটু জল আছে। আমরা নহরের ওপারে কখনও যাই না। রিয়া সেটা জানে। তবে ওর দোষ নেই। আমায় একটা মদ্দা ভেড়া খুব বদমাশ। পাল থেকে প্রায়ই পালিয়ে যায়। সেটা নহরের ওপরে চলে গিয়েছিল। রিয়া সেটাকে ধরে আনতে গিয়েই ওজরাকের পাল্লায় পড়েছিল।

কর্নেল বললেন, তোমার মেয়ের মুখেই ব্যাপারটা শুনতে চাই সর্দার। তাকে ডাকো।

হালাকুর ডাকে একটি কিশোরী এগিয়ে এল। ছিপছিপে গড়ন, পাকা আপেলের মতো গায়ের রং। পরনে সালোয়ার-কামিজ। চুলে লাল একটা রুমাল বাঁধা। হালাকু তাদের ভাষায় কিছু বলল।

রিয়া কাঁচুমাচু হাসছিল। কর্নেল পকেট থেকে একটা চকোলেটের প্যাকেট বের করে বললেন, নাও রিয়া! এটা তোমার জন্য এনেছি।

হালাকুর ইশারায় রিয়া সেটা নিল। তারপর ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে যা বলল, তা যেমন অদ্ভুত, তেমনি রোমাঞ্চকর। আমার তো বিশ্বাস করতেই বাধছিল। ঘটনাটা এই :

সেদিন বিকেলে বাধ্য হয়ে গাড়োলটার (মদ্দা ভেড়া) জন্য সে নহর (খাল) পেরিয়ে ওপারে গিয়েছিল। হঠাৎ সে দেখল কী, অবিকল তার মতো একটি মেয়ে একটা পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আছে। একই পোশাক, একই গড়ন। ভাল করে দেখার জন্য সে এগিয়ে গেল। তারপর ভীষণ অবাক হল। মেয়েটি হুবহু তার মতো দেখতে। আয়নার ভিতর নিজের মুখ তো সে দেখেছে। রিয়া গুজর মেয়ে। ভীতু নয় সে। রেগে গিয়ে বলল, তুমি কে?

মেয়েটিও গুজর ভাষায় বলল, তুমি কে?

রিয়া বল, আমি রিয়া।

মেয়েটিও বলল, আমি রিয়া।

—মিথ্যে বোলো না। তোমার বাবার নাম কী?

রিয়া পাথর তুলে তেড়ে যেতেই মেয়েটা যেন শূন্যে ছিটকে গেল। আকাশে ভেসে সে রিয়াকে যেন ভেংচি কাটতে লাগল। রিয়া পাথর ছুড়ল। মেয়েটি অমনি যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। তখন রিয়া ভয় পেয়ে দৌড়ে পালিয়ে এল নহর পেরিয়ে।...

রিয়ার মুখে আদিম সরলতা। তবু কথাগুলো সে বানিয়ে বলছে কি না বোঝা কঠিন। কর্নেল বললেন, হুঁ—আর গাড়োলটার কী হল?

জবাব দিল হালাকু।—রিয়ার মুখে এসব শুনে আর গাড়োলটার খোঁজে যেতে আমরা সাহস পাইনি! সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। পরদিন সকালে দলবেঁধে শিঙ্গা, ঢোল এসব নিয়ে সেখানে গেলুম। নহরের ধারে ওজরাকের পুজো দিলুম। আগুনে ঘি আর ভেড়ার রক্ত দিয়ে পুজো দেওয়ার নিয়ম। পুজো দিয়ে সাহস করে নহরের ওপারে গেলুম। বেশিদূর যেতে হয়নি। গাড়োলটা ঘাসের ভিতর মরে পড়েছিল। কিন্তু হুজুর, তাজ্জব ব্যাপার—যেই মরা জানোয়ারটাকে ওঠাতে গেছি, দেখি কী, পুরোটাই ছাই!

কর্নেল, আমি ও বদর খাঁ একসঙ্গে বলে উঠলুম, ছাই!

—হ্যাঁ—একদলা ছাই। অথচ দেখে বোঝার উপায় ছিল না। যেমনকার চেহারা, লোমের রং তেমনি ছিল। কিন্তু হাত ঠেকাতেই ছাই হয়ে গেল। আমরা ভয় পেয়ে পালিয়ে এলুম। গুজরাক বড় জাদুকর, হুজুর! সে তো মানুষ নয়, সে হল পরীদের রাজা। পশ্চিম-পাহাড়ে আছে পরীস্তান। তার বাস সেখানেই। চিরকাল তার কথা শুনে আসছি আমরা।

বদর খাঁ মন্তব্য করল, ওজরাক তাহলে একজন জিন। কেতাবে জিনের কথা আছে বটে।

ওজরাকের আবির্ভাব

নবাবপ্রাসাদের ডাইনিং হলে ডিনার খেতে খেতে কর্নেল হালাকুর মেয়ে রিয়ার ঘটনাটা মির্জাসায়েবকে শোনাচ্ছিলেন। মির্জাসায়েব বললেন, এবার মনে হচ্ছে ওজরাকের ব্যাপারটা হয়তো রূপকথা নয়। একজন মুসলিম হিসেবে অবশ্যই আমি জিন বিশ্বাস করতে বাধ্য। আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে, খোদাতালা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানুষের মতো জিনকেও সৃষ্টি করেছেন। অবশ্য জিনের সৃষ্টি আগুন থেকে। তারা আকাশের অন্য একটা স্তরে বাস করে। আমার ধারণা, এর মধ্যে একটা তত্ত্ব লুকিয়ে আছে। আধুনিক বিজ্ঞান অন্য গ্যালাক্সিতে পৃথিবীর মতো গ্রহ এবং প্রাণী থাকার সম্ভাবনা অস্বীকার করে না। ইসলামি শাস্ত্রে উল্লিখিত আগুনের দেহধারী জিন কি তাহলে অন্য কোনও গ্রহের উন্নত কোন জীব? মুসলিম লোকশাস্ত্রে বলা হয়েছে, জিনরা পুরুষ। পরীরা হল তাদেরই স্ত্রীজাতি। জিন-পরীর ছটা লেগে নাকি মানুষের মারাত্মক অসুখ হয়। তার মানে, বহু আলোকবর্ষ দূরের কোনও অজ্ঞাত গ্রহের ওইসব প্রাণীদের শরীর আলোর কণিকা দিয়ে হয়তো তৈরি। তা থেকে যে রশ্মি ঠিকরে পড়ে, পৃথিবীর মানুষের পক্ষে তা ক্ষতিকর। তাই তাদের সংস্পর্শে গেলে মানুষ দুরারোগ্য অসুখ-বিসুখে ভুগে মারা পড়ে। আপনার কি মনে হয় কর্নেল?

কর্নেল একটু হেসে বললেন, পবিত্র কোরান আমিও পড়েছি মির্জাসায়েব! অবশ্য ইংরেজি অনুবাদে। কোরানে ঈশ্বর বলেছেন : আমি মানুষ ও জিন সৃষ্টি করেছি। তাছাড়া ১৮টি ব্রহ্মাণ্ড বা গ্যালাক্সির কথাও কোরানে বলা হয়েছে।

মির্জাসায়েব উৎসাহে চঞ্চল হয়ে বললেন, তাহলে দেখুন, আধুনিক বিজ্ঞানেও—

আমি ওঁর কথা কেড়ে বললুম, মহাভারত এবং রামায়ণেও বিস্তর ব্যাপার আছে, যা আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলে যায়। যেমন, সৌরভ নগরী—যা মহাকাশে ভাসমান এক পুরী। কৃত্রিম উপগ্রহ নয়? তারপর নারদের বাহন ঢেঁকি। রকেট ছাড়া আর কি হতে পারে? ঢেঁকির সঙ্গে রকেটের গড়নের আশ্চর্য মিল! তারপর পুষ্পক রথ হল বিমান। মহাভারতের যুদ্ধের বর্ণনা পড়লে তো মনে হয় পারমাণবিক অস্ত্রের লড়াই।

কর্নেল বলে উঠলেন, ডার্লিং, আমরা হয়তো দানিকেনের আজগুবি তত্ত্বের দিকে এগোচ্ছি। মির্জাসাহেব, বরং শাস্ত্র-পুরাণ থাক আপাতত। আপনার হতভাগা পরিচারক কিংবা হালাকুর পালছাড়া গাড়োল জিনের বাদশা ওজরাকের সংস্পর্শে এসে ছাই হয়ে গেছে কি না এখনও প্রমাণ

পাইনি। ক্রমশ আমার মাথায় একটা চিন্তা ভেসে আসছে। কেউ কি লেসার রশ্মি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে? কে জানে!

মির্জাসাহেব বললেন, কিন্তু, ঝড়, পাওয়ার ফেল, আকাশ থেকে অদ্ভুত আলো নেমে আসা, ঘুঙুরের মতো শব্দ, তীব্র শিস—

—ওজরাক যদি জিনই হয়, সে আপনার এবং দেশের পাঁচটা প্রত্নশালার ধাতুরত্ন ও মূর্তি চুরি কেন করবে, ভেবে পাচ্ছি না মির্জাসাহেব। জিন যদি সত্যি থাকে, তার বাস সম্ভবত বহু আলোকবর্ষ দূরের কোন ব্রহ্মাণ্ডে। ধরে নিচ্ছি, সে কান্দ্রার পশ্চিম পাহাড়ে এসে ঘাঁটি করেছে। কিন্তু প্রত্নদ্রব্য আর মূল্যবান রত্নে তার লোভ কেন হবে? এসব তো নেহাত পৃথিবীর জিনিস। এসবের চেয়ে মূল্যবান আর বিস্ময়কর জিনিস আশা করি অন্য ব্রহ্মাণ্ডের গ্রহে বিস্তর আছে।

শুনেছি, জিনেরা খুব খেয়ালি। ওজরাকও নাকি খেয়ালি জাদুকর।

মির্জাসায়েব আনমনে বললেন।—তবে আমার পূর্বপুরুষের সংগৃহীত নুরে আলম রত্নের কথা ভাবুন। এ রত্ন নিশ্চয় অন্য কোনও গ্রহের জিনিস। ধাতু-বিজ্ঞানীদের অজানা এ রত্ন। আমার মনে হচ্ছে ওজরাক এতদিনে হয়তো তা টের পেয়ে চুরি করে নিয়ে গেছে। কে বলতে পারে, আমার পূর্বপুরুষদের কেউ এ রত্ন পশ্চিমের পাহাড়ে কুড়িয়ে পাননি। রত্নটা হয়তো ছিল ওজরাকেরই।

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, ওজরাক যদি জিন এবং মায়াবি জাদুকর, তাহলে রাত-দুপুরে তাকে চুরি করতে হয় কেন? মির্জাসায়েব, ন্যায়শাস্ত্রে কাকতালীয় যোগ বলে একটা ব্যাপার আছে। কাক এসে তালগাছে বসল এবং অমনি একটা তাল পড়ল এই দেখে কেউ যদি ভাবে, কাক এসে বসাই তাল পড়ার কারণ, তাহলে সে ভুল করবে। যোগাযোগটা আকস্মিক।

মির্জাসায়েব ভুরু কুঁচকে বললেন, তার মানে?

কর্নেল সে কথার জবাব না দিয়ে বললেন, একটা কাজ আপনাকে করতে হবে। আপনি কালই প্লেনে দিল্লি চলে যান এবং খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিন : 'নুরে আলম' চুরি গিয়ে আপনি আপনার পূর্বপুরুষের সংগৃহীত বিখ্যাত কয়েকটি রত্ন আর রাখতে সাহস পাচ্ছেন না। তাই নিলামে বেচে দিতে চান। নিলামে যাঁরা কিনতে চান, তাঁরা যেন এক সপ্তাহের মধ্যে যোগাযোগ করেন।

—সে কী! আর তেমন রত্ন কীই বা আছে? আমার পরলোকগতা স্ত্রীর কিছু জড়োয়া অলঙ্কার ছাড়া আর কিছু তো নেই! বলেছিলুম না? আমি এখন নামেই নবাব!

—সত্যি কিছু বেচতে হবে না মির্জাসাহেব। শুধু বিজ্ঞাপন দিতে বলছি।

আমি মুখ খুলতে যাচ্ছিলুম, কর্নেল এমন চোখ কটমট করে তাকালেন যে ঢোক গিলে থেমে গেলুম। মির্জাসায়েব বললেন, ঠিক আছে। তাই হবে।

কর্নেল বললেন, কাল সকালে আমরা হালাকুর অতিথি হয়ে যাচ্ছি। ফিরে এসেই আপনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আমার ইচ্ছা দুটো দিন অন্তত গুজরদের সঙ্গে কাটাব।...

কিছুক্ষণ পরে অতিথিশালায় শুতে এসে কর্নেলকে বললুম, আপনি যাই বলুন, ওজরাক অন্য গ্রহের কোনও উন্নত স্তরের প্রাণী। মানুষেরই উন্নত সংস্করণ—সুপারম্যান।

কর্নেল চুরুটের ধোঁয়ার ভিতর বললেন, কেন ডার্লিং?

—রিয়ার প্রতিবিম্বের কী ব্যাখ্যা হতে পারে? আপনি আমাকে ল অফ প্যারিটি এবং মিরর-ইমেজতত্ত্ব বোঝাচ্ছিলেন সেদিন। ওজরাক মিরর-ইমেজ সৃষ্টি করতে জানে। ওই ঘটনা শোনার পর আমার অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডের গল্পটা মনে পড়ছে। অ্যালিস যেমন আয়নার ভিতরকার দেশে গিয়েছিল, রিয়াও হয়তো তেমনি—

বাধা দিয়ে কর্নেল বললেন, উল্টো মানুষদের দেশ, বলো জয়ন্ত। আয়নার ভিতরকার মানুষে একেবারে উল্টো নয় কি? তার পিলে ডাইনে, লিভার বাঁয়ে, হার্ট ডানদিকে এবং তার চোখ, নাকের ফুটো, হাত, পা সবই উল্টো। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অবিকল

উল্টো বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড আছে কোথাও—হুবহু প্রতিবিম্ব যেন। সেই এলাকায় গিয়ে পড়লে মহাকাশচারী তার মহাকাশযান সমেত উল্টো হয়ে যাবে, অথচ সে তা টের পাবে না। তারপর সে যখন তার নিজের বিশ্বে ফিরে আসবে, অমনি হবে সাংঘাতিক কাণ্ড। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সে তার যান-সমেত পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তোমাকে দড়ি ও ছড়ির উপমা দিয়েছিলুম। আশা করি মনে আছে!

বললুম, হ্যাঁ—ম্যাটার এবং অ্যান্টিম্যাটার পরস্পরের সংস্পর্শে এলে ধ্বংস হবে। কর্নেল! রিয়া বেচারি জোর বেঁচে গেছে বলা যায়। উল্টো-রিয়ার সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হলেই কী হত ভেবে দেখুন!

হুঁ, ঠিক তাই ঘটত। ওজরাক যেই হোক, খুব সাবধানী এবং কৌতুকপ্রিয়।—কর্নেল রাতের পোশাক পরতে ব্যস্ত হলেন। ফায়ারপ্লেসে আগুনের সামনে গিয়ে বসে ডাকলেন, এখানে এস ডার্লিং!

আরাম করে বসলুম আগুনের সামনে। বললুম, আচ্ছা কর্নেল, মিরর-ইমেজ বলুন বা উল্টো বস্তুই বলুন, বুঝলুম তার আণবিক গড়ন আপনার তত্ত্ব অনুসারে অসমানুপাতিক। কিন্তু তা অ্যান্টিম্যাটার কেন?

—কোনও অসমানুপাতিক আণবিক গড়নের বস্তুর মধ্যে পজিটিভ চার্জ করা ইলেকট্রন অর্থাৎ পজিট্রনের সঙ্গে নেগেটিভ চার্জ করা প্রোটনের সন্নিবেশ ঘটলে সেটি অ্যান্টিম্যাটার হয়ে যায়।

—তাহলে তো ম্যাটারকে অ্যান্টিম্যাটারে পরিণত করা সম্ভব?

—হ্যাঁ—তত্ত্বের দিক থেকে সম্ভব।

—বাস্তবেও সম্ভব হয়েছে বৈকি। রিয়ার প্রতিবিম্বের আর কী ব্যাখ্যা হয়? প্রকৃতির ডান হাত বাঁ হাতের লেখার কথা বলছিলেন। মানুষ তো প্রকৃতির বহু নিয়ম জেনে বিস্তর খেলা খেলতে পেরেছে। প্রকৃতির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেনি কি মানুষ?

—হুঁ—তা তো হয়েইছে।

প্রকৃতির লেফট হ্যান্ড টুইস্টের নিয়ম ওজরাক জানে।

কর্নেল হাসলেন।—ওজরাকের প্রতি তোমার বিশ্বাস ও ভক্তি দেখে আশঙ্কা হচ্ছে, ডার্লিং! ওজরাক তোমাকে তুলে নিয়ে না যায়! সাবধান!

হাসতে হাসতে বললুম, নিয়ে গেলে খুশিই হব। পৃথিবীটা গলে পচে গেছে। এখানে আর থাকতেই ইচ্ছে করে না।

কর্নেল আগুনে আবার একটা কাঠ গুঁজে দিয়ে হেলান দিলেন। চোখ বুজে রইলেন। আমি হাই তুলে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লুম।

নতুন জায়গায় গিয়ে সহজে ঘুম আসে না। কাল রাতে ভাল ঘুম হয়নি। এ রাতেও তাই। চোখ বুজে ঘুমোনোর চেষ্টা করছিলুম। ঘুম আসছিল না। মাঝে মাঝে চোখ খুলে দেখছিলুম, কর্নেল তখনও ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে আছেন হেলান দিয়ে। চোখ বন্ধ। ওখানেই ঘুমচ্ছেন নাকি? অবশ্য ওঁর ঘুমের লক্ষণ হল নাক ডাকা। নাক যখন ডাকছে না, তখন ঘুমচ্ছেন না। চিন্তাভাবনা করছেন নিশ্চয়।

তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে সেটা টের পেলুম। বাইরে চাপা শোঁ শোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ঝড় হচ্ছে নাকি? কান্দ্রা উপত্যকায় মাঝরাতে ঝড় আসে শুনেছি। তাহলে সেই ঝড়! কিন্তু ঘরের ভিতর এত অন্ধকার কেন? জানালার পর্দার মাথায় কাচের খানিকটা অংশ বাইরের আলো এসে প্রতিফলিত হতে দেখেছি। তার ফলে ঘরের আলো নেভালেও ঘরের ভিতর আবছা সবকিছু দেখা যায়। কিন্তু বাইরে আলো নিভে গেছে। ঝড়ের শব্দটা বাড়ছে। ফায়ারপ্লেসের আগুনও নিভে গেছে। টেবিলল্যাম্পের সুইচ টিপলেও আলো জ্বলল না। কর্নেলের নাক ডাকছিল। ডাকলুম, কর্নেল! কর্নেল!

নাক ডাকা থেমে গেল ওঁর। জড়ানো গলায় বললেন, কিছু না। ঘুমোও!

বললুম, ঝড় বইছে। পাওয়ার ফেল! আলো জ্বলছে না।

তারপর চমকে উঠলুম চাপা ঝমর-ঝম ঘুঙুরের শব্দে। এক লাফে কর্নেলের বিছানার কাছে গিয়ে ওঁকে ধাক্কা দিতে দিতে বললুম, ঘুঙুরের শব্দ হচ্ছে, ওই শুনুন।

এবার কর্নেল উঠে বসলেন। অন্ধকারে ওঁকে দেখতে পাচ্ছিলুম না। ব্যস্তভাবে বললেন, কী আশ্চর্য! টর্চটাও জ্বলছে না দেখি। জয়ন্ত, তোমার টর্চটা দেখো তো?

আমার বিছানা হাতড়ে টর্চ পেলুম। কিন্তু জ্বলল না। বললুম, আমার টর্চটাও যে জ্বলছে না!

কর্নেল বললেন, বেরিও না। জানালা খুলে দেখা যাক, ব্যাপারটা কী?

ঘুঙুরের শব্দটা সমানে শোনা যাচ্ছে। ঝমর ঝম ঝমর ঝম ঝমর ঝম...একজন নয়, যেন অসংখ্য নর্তক-নর্তকী স্টেজে উদ্দাম নাচ জুড়েছে। ঘুঙুরের আওয়াজ অবশ্য চাপা, যেন বহুদূর থেকে শোনা যাচ্ছে। কর্নেলকে জানালা ফাঁক করতে দেখলুম। তখন তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। আকাশ পরিষ্কার। ঝকমক করছে নক্ষত্র। অথচ জোরালো একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে শোঁ শোঁ শন-শন শব্দে। ঘুঙুরের শব্দটা কিন্তু বদ্ধ-ঘরের ভিতর যেমনটি শুনছিলুম, বাইরেও তেমনটি। ফিডলার কাঁকড়ার বেহালার বাজনা যেমন মাথার ভিতর বাজছে মনে হচ্ছিল, এও কতকটা তেমনি।

হঠাৎ অনেক দূরে একটা আলোর মতো জিনিস চোখে পড়ল। বললুম, ওটা কী কর্নেল?

কর্নেল জবাব দিলেন না।

আলোটা ভারি অদ্ভুত। মাটি থেকে সামান্য উঁচুতে ভাসছে। একটু পরে বুঝতে পারলুম, ওটা নিজেই আলোকিত। কিন্তু অন্য কোনও জিনিসকে আলোকিত করছে না। তাহলে ওটা নিশ্চয় আলো নয়।

অথচ ওটা যেন ঘুরছে। দেখতে কতকটা সিলিং ফ্যানের গোলাকার অংশটার মতো। ঘুরছে বলছি, কারণ ওটার গায়ে কিছু লাল নীল সবুজ হলুদ ফুটকি দেখতে পাচ্ছি এবং ফুটকিগুলো স্থান বদল করছে।

মিনিট তিনেক পরে অদ্ভুত আলোর মতো জিনিসটা উপরের দিকে উঠতে শুরু করল। অনেক উঁচুতে পৌঁছে স্থির হয়ে রইল আধ মিনিট। তারপর হঠাৎ একটা ছুড়ে মারা ডিসকাসের মতো কাত হয়ে বিদ্যুৎবেগে দূরে চলে যেতে যেতে মিলিয়ে গেল নক্ষত্রের মধ্যে।

খেয়াল করে দেখি, ঝড়টা থেমে গেছে। ঘুঙুরের শব্দও নেই। তারপর প্লেনের শব্দ শুনতে পেলুম। কর্নেল বললেন, মনে হচ্ছে বিমানবাহিনীর বিমান এতক্ষণে ওটার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। যাই হোক, জয়ন্ত! তাহলে ওজরাকের উড়ন-খাটোলা স্বচক্ষে দর্শনের সৌভাগ্য হল আমাদের। অবশ্য উফো-দর্শনও বলা যায়। তুমি কলকাতা ফিরে দৈনিক সত্যসেবকে দারুণ জাঁকালো একটি রিপোর্ট লিখবে, আশা করি।—বলে কর্নেল জানালা বন্ধ করলেন। অমনি বাইরে আলো জ্বলে উঠল।

বললুম, নিশ্চয় লিখব।—তারপর টেবিল ল্যাম্পের সুইচ টিপলুম। আলো জ্বলল।

কর্নেল তাঁর বিছানায় গিয়ে চিত হলেন। বললেন, ব্যাপারটা গোলমেলে হয়ে গেল দেখছি। আমাকে আবার গোড়া থেকে সাজাতে হবে।

জিগ্যেস করলুম, কী?

—ওজরাক এবং ওইসব চুরিচামারি নিয়ে একটা থিওরি দাঁড় করিয়েছিলুম।

দরজায় টোকার শব্দ এবং মির্জাসায়েবের উত্তেজিত ডাকাডাকি শুনে দরজা খুলে দিলুম। মির্জাসায়েব হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, কর্নেল! কর্নেল! বড় তাজ্জব ঘটনা—

কর্নেল বাধা দিয়ে বললেন, সব দেখলুম, মির্জাসায়েব! বড় রহস্যময় ব্যাপার।

—আমার বড় ভয় ভয় করছে, কর্নেল! ওজরাক আবার কেন এসেছিল?

—এ প্রশ্নের জবাবের জন্য আমাকে দুটো বা তিনটে দিন সময় দিন।

মির্জাসায়েবের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, উনি আশ্বস্ত হতে পারছেন না।...

উল্টো-কর্নেলের পাল্লায়

সকালের ফ্লাইটে মির্জা নবাব দিল্লি গেলেন কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে। আমরা বিমানঘাঁটিতে ওঁকে বিদায় দিয়ে ডঃ সোমের কোয়ার্টারে গেলুম। বদর খাঁ গাড়ি নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করতে থাকল। সে আমাদের কান্দ্রা লেকে পৌঁছে দেবে।

ডঃ সোম বললেন, সাংঘাতিক ব্যাপার, কর্নেল। কাল রাতে উফো নেমেছিল। তাকে তাড়া করে যাচ্ছিল এয়ারফোর্সের একটা মিগ বিমান। সেটা পশ্চিমের পাহাড়ে নিখোঁজ হয়ে গেছে। সম্ভবত কোথাও ভেঙে পড়েছে। আজ সকালে দুটো হেলিকপ্টার গেছে খুঁজতে।

কর্নেল একটু হেসে বললেন, আপনি উফো বলছেন!

ডঃ সোমও হাসলেন।—প্রতিরক্ষাবিজ্ঞানী রামস্বরূপ ব্রহ্মের মতে নাকি অত্যন্ত উন্নত ধরনের চীনা বিমান। চৌম্বকশক্তিসম্পন্ন আরোহীবিহীন বিমান। বহু দূরের ঘাঁটিতে বসে রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেমে চালানো যায় এই ম্যাগনেটিক প্লেনকে। ডঃ ব্রহ্মের ধারণা, ভূপৃষ্ঠের চৌম্বক প্রবাহের সংস্পর্শে এলেই স্বাভাবিক নিয়মে চুম্বকে চুম্বকে বিকর্ষণ ঘটে এবং বিপজ্জনক ঝড় সৃষ্টি হয়। পাওয়ার ফেল করে। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

—আপনার মতামত কী?

ডঃ সোম দাঁতের ফাঁকে উচ্চারণ করলেন আন-আইডেন্টিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট। কারণ নিঃসংশয়ে এখনও কিছু বলা যাচ্ছে না। অবশ্য 'উফো' বললেই সেটা অন্য গ্রহের মহাকাশযান বোঝায় না। শুধু বোঝায়, অজানা উড়ন্ত জিনিস।

কফি না খাইয়ে ছাড়বেন না ডঃ সোম। কথাবার্তার ফাঁকে কফি এল। কফি খেতে খেতে ফোন বাজল। ডঃ সোম ফোনে কিছুক্ষণ কথা বলে গম্ভীর মুখে ফিরে এলেন আমাদের কাছে। বললেন, স্পেস রিসার্চ ল্যাবরেটরির ডিরেক্টর ডঃ হোসেন ওজরাকের পাঞ্জা কুড়িয়ে পেয়েছেন।

কর্নেল ও আমি চমকে উঠলুম। কর্নেল বললেন, কোনও ডেডবডি?

—তা তো বললেন না! ছাদের সোলার প্যানেলের ভিতর পড়ে ছিল বজ্রচিহ্ন আঁকা চাকতি।

—কিছু চুরি গেছে কি?

ডঃ সোম আস্তে বললেন, এ এম ডি এস যন্ত্রটা কম্পিউটারসুদ্ধ উপড়ে নিয়ে গেছে চোর।

—জিনিসটা কী?

—অ্যান্টিম্যাটার ডিটেকশন সিস্টেম।

কর্নেল নড়ে বসলেন। আমি হকচকিয়ে গেলুম। কর্নেল বললেন, যন্ত্রটা আয়তনে নিশ্চয় ছোট ছিল? নইলে চোরের অসুবিধে হওয়ার কথা।

—খুবই ছোট। একটা পকেট-রেডিওর মতো দেখতে। তার কম্পিউটারের আয়তন আরও ছোট। একটা মাউথ-অর্গানের সাইজ।

ডঃ সোম উঠে দাঁড়ালেন।—ডঃ হোসেনের ওখানে যেতে হচ্ছে এখনই। আপনারা ইচ্ছে করলে আসতে পারেন আমার সঙ্গে।

কর্নেল বললেন, থাক্। বরং পরে একদিন গিয়ে আলাপ করব ওঁর সঙ্গে। আমার একটা জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।...

বদর খাঁ কাল রাতের ঘটনা নিয়ে উত্তেজিতভাবে আলোচনা করতে করতে গাড়ি চালাচ্ছিল। জিনের বাদশা ওজরাকের ভয়ে সে তটস্থ। রাতে ওজরাকের উড়ন-খাটোলা নামতে দেখেছে অনেকে। তাই নিয়ে সারা এলাকা জুড়ে নাকি আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। কেউ কেউ কান্দ্রা ছেড়ে চলে যাওয়ার কথাও নাকি ভাবছে।

লেকের কাছে আমাদের পৌঁছে দিয়ে বদর খাঁ বলল, আপনারা কখন ফিরবেন সায়েব?

কর্নেল বললেন, পরশু সকালে ঠিক এই সময় তুমি গাড়ি নিয়ে চলে আসবে এখানে। আমরা এই চেনার গাছের তলায় তোমার অপেক্ষা করব।

বদর খাঁ গাড়ি নিয়ে চলে গেল। আমাদের দু'জনের পিঠেই ছোটখাট দুটো বোঁচকা। বিস্তর টুকিটাকি জিনিসে ভর্তি। পাইন বনটা পেরিয়ে তৃণভূমিতে পৌঁছে গুজরদের কুকুরগুলোর কথা মনে পড়ল। কিন্তু দূর থেকে নজর রেখেও তাদের লেজের ডগাটুকুও দেখতে পাচ্ছিলুম না।

ঘাসের মাঠে কয়েকটা ঘোড়া চরছে। খোঁয়াড়টা শূন্য। ভেড়া-ছাগল-দুম্বার পাল চরাতে নিয়ে গেছে গুজর রাখালেরা। তাঁবুর সামনে বুনো আখরোট গাছের তলায় কিছু মেয়ে মাখন তৈরি করছে। মাটির মাত্রে দুধ জ্বাল দিচ্ছে কেউ। বুড়োরা চামড়ায় নুন মাখিয়ে রোদে দিচ্ছে। হালাকু সর্দার আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। এগিয়ে এসে আমাদের সে অভ্যর্থনা করল।

হালাকু একটু তফাতে ওক গাছের তলায় একটা নতুন তাঁবু দেখিয়ে বলল, ওই আপনাদের ডেরা হুজুর। আশা করি, কোনও তকলিফ হবে না। যে নহরের কথা বলেছিলুম, সেটা পিছনেই। খুব পরিষ্কার জল পাবেন। আর পাখির কথা বলেছিলেন, নহরের ওখানে হরেকরকম হাড়ি পাখি দেখতে পাবেন। যত খুশি, ফোটো খিঁচুন—ওরা ভয় পায় না। নবাববাহাদুরও ওখানে এসে ডেরা পাতেন। গত মাসেও এসে কিছুদিন ছিলেন ওখানে।

তাঁবুটা ছাগলের চামড়া সেলাই করে তৈরি। কেমন একটা আঁশ গন্ধ। কর্নেল আমার মুখের ভাবে সেটা টের পেয়ে বললেন, ডার্লিং, ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে সয়ে যাবে।

সন্ধ্যার মতো দু-পাত্র টাটকা ছাগলের দুধ নিয়ে এল হালাকু। সঙ্গে মেয়ে রিয়া! হালাকু বলল, সায়েবদের খাতিরযত্নের ভার রিয়ার উপর। যা দরকার, একে বলবেন।

হালাকু কাল রাতের উড়ন-খাটোলা নামার গল্প করতে লাগল। কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন, ঠিক কোন জায়গায় নেমেছিল বলতে পার সর্দার?

জবাব দিল রিয়া।—আমি জানি। আগের বারও সেখানে নেমেছিল।—বলে সে পূর্ব-দক্ষিণ দিকে আঙুল নির্দেশ করল।

হালাকু অবাক হয়ে বলল, তুই কেমন করে জানলি?

রিয়া বলল, সেদিন সকালে পাল চরাতে গিয়ে পোড়া ঘাস দেখেছিলুম। তুমি আজকাল সব কথা ভুলে যাও। তাই শুনে তুমি বকাবকি করেছিলে না?

কর্নেল পাশে পড়ে থাকা একটা পাথরের উপর উঠে চোখে বাইনোকুলার রাখলেন। দেখতে দেখতে বললেন, হুঁ, রিয়া ঠিকই দেখিয়েছে। ওখানে মিলিটারি ভ্যান নিয়ে একদল অফিসার তদন্ত করতে এসেছে। আরে! ডঃ সোমও এসে গেছেন দেখছি। জোরালো তদন্ত হচ্ছে তাহলে।

নেমে এসে ফের বললেন, তাহলে এবেলা আর ওখানে যাওয়া হল না। সর্দার, বিকেলে তোমার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে জায়গাটা দেখতে গেলে আপত্তি করবে না তো?

হালাকু একগাল হেসে বলল, হুজুর! মা-হারা একটি মোটে মেয়ে। তাকে আপনার জিম্মায় দিয়েছি! ইচ্ছে করলে টাউনে নিয়ে গিয়ে লেখাপড়া শেখান, মেমসাব বানিয়ে দিন!

সে খুব হাসতে লাগল।

রিয়া গাল ফুলিয়ে বলল, আমি লেখাপড়া শিখব না। মেমসায়েবও হব না।

কর্নেল বললেন, তাহলে কী হতে চাও তুমি?

—কিছু না।

—বুঝেছি, মাঠে মাঠে জানোয়ারের পাল নিয়ে ঘুরে বেড়াতেই তোমার ভাল লাগে।

রিয়া আস্তে বলল, খুব ভাল লাগে।

হালাখু বলল, ওর জন্ম হয়েছিল পামির এলাকার রিয়ায়। তাই ওর নাম রেখেছিলুম রিয়া। সেখানে এমনি ঘাসের মাঠ, হুজুর। ওই মুল্লুকে রিয়া কথার মানে ঝরনা।

রিয়ার সঙ্গে কর্নেলের খুব ভাব হয়ে গেল। আমার প্রতি তার লক্ষ্য কম। বুঝতে পারছিলুম, কর্নেলের দাড়িই ওকে বশ করে নিয়েছে। কিছুক্ষণ পরে আমরা দু'জনে বেরিয়ে পড়লুম।

পিছনের নালাটা প্রায় ফুট তিরিশেক চওড়া। পাথরে ভর্তি। তার ফাঁকে ঝিরঝিরে স্বচ্ছ জল বয়ে যাচ্ছে। একখানে ডোবার মতো গর্ত করে জল জমানো হয়েছে। কর্নেল কিছুক্ষণ পাখি দেখায় মন দিলেন। টেলিলেন্স লাগানো ক্যামেরায় ছবিও তুললেন প্রচুর। নালার দু'ধারে রংবেরঙের ফুলের ঝোপ। মনে হচ্ছিল, স্বর্গে চলে এসেছি। পাখির গান, ফুলের রং, গাছপালার সবুজ জেল্লা আর স্নিগ্ধ রোদ নিয়ে চারদিকে আশ্চর্য এক পবিত্র সরলতা। একঝাঁক পপলারের ভিতর দিয়ে বাতাস বয়ে যেতে যেতে যেন অর্কেস্ট্রার বাজনা বাজিয়ে যাচ্ছে।

তুঁতগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছিলুম। কর্নেলকে দেখলুম নহরের বুকে পাথরে পা রেখে রেখে ওপারে চলে গেলেন। তারপর চোখে বাইনোকুলার স্থাপন করে ঝোপের আড়ালে উধাও হলেন।

উধাও তো উধাও! ওপারে ঘাসের জঙ্গল প্রায় ফুট পাঁচেক উঁচু হয়ে দূরে পাহাড়ের গায়ে মিশে গেছে। যেন এক সবুজ সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে ধূসর-নীল কঠিন শিলার উপর। মাঝে মাঝে দ্বীপের মতো উঁচু গাছের জটলা এবং কোথাও গ্রানাইট শিলার টিপি।

কর্নেলের ছাইরঙা টুপি একবারের জন্য চোখে পড়ল। বুঝলুম কোনও বিরল প্রজাতির পাখির পিছনে ধেয়ে চলেছেন। তার মানে এবেলার মতো ওঁর আশা বৃথা।

সিগারেট ধরিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্যে মন দিলাম। কর্নেলের এমন বাতিকগ্রস্ত আচরণ নতুন দেখছি না। পপলারশ্রেণীর ভিতর বাতাসের অর্কেস্ট্রা বেড়ে গেছে ততক্ষণে। রঙিন ফুলগাছগুলো তালে তালে নাচ জুড়েছে। একসময় হঠাৎ আমার মাথায় উপর তুঁতগাছের ডালপালা থেকে একঝাঁক টিয়াপাখি বেসুরে চেঁচিয়ে উঠল এবং ট্যাঁ ট্যাঁ করে চেঁচাতে চেঁচাতে পালিয়ে গেল।

তারপরই বাঁদিকে কয়েক হাত তফাতে কর্নেলকে দেখতে পেলুম। কিন্তু এমন কেন দেখাচ্ছে ওঁকে? মুখে কেমন পাগলাটে হাসি। চোখ দুটো রাঙা। বললুম, অমন করে তাকাচ্ছেন কেন? কী হয়েছে?

কর্নেল নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে তেমনি পাগলাটে হাসি ঠোঁটে রেখে একটু এগিয়ে এলেন। অবাক হয়ে বললুম, কথা বলবেন তো? অমন করছেন কেন?

কর্নেল প্যান্টের পকেট থেকে চুরুট বের করলেন। দৃষ্টি কিন্তু আমার দিকেই। চুরুটটা ঠোঁটে রেখে লাইটার ধরাচ্ছেন, সেই সময় লক্ষ্য করলুম, চুরুটটা বাঁহাতে বের করেছেন এবং লাইটার ধরাচ্ছেন ডানহাতে।

এতকাল ওঁর অভ্যাসের সঙ্গে পরিচিত আমি। ডানহাতে চুরুট নিয়ে বাঁহাতে লাইটার জ্বালেন। দ্বিতীয়বার খটকা লাগল ওঁর কপালের দিকে তাকিয়ে। ওঁর কপালে বাঁদিকে একটু কাটা দাগ আছে। কিন্তু এখন দেখছি দাগটা ডানদিকে।

দেখামাত্র আঁতকে পিছিয়ে এসে চেঁচিয়ে উঠলুম, কর্নেল! আপনি উল্টো মানুষ!

সঙ্গে সঙ্গে কর্নেল অদৃশ্য। আমিও ঝোপজঙ্গল ভেঙে পাথরে আছাড় খেতে খেতে একেবারে তাঁবুর সামনে গিয়ে ধপাস করে বসে পড়লুম। হালাকু দৌড়ে এসে বলল, কী হয়েছে হুজুর?

বললুম। কিছু না।...

আবার এক মৃতদেহ

ধাক্কাটা সামলে নিতে সময় লাগল। বার বার মনে হচ্ছিল, ব্যাপারটা হয়তো আমি চোখ দিয়ে দেখিনি, মন দিয়ে দেখেছি। অর্থাৎ নিতান্তই দিবাস্বপ্ন! তুঁতগাছের ছায়ায় স্নিগ্ধ বাতাসে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে অকারণ দিনদুপুরে ভূত দেখার মতোই উল্টো-কর্নেল দর্শনের কোনও মানে হয় না।

হালাকু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তখনও। একটু ধাতস্থ হওয়ার পর বললুম, তেমন কিছু না সর্দার! নহরের ওপারের জঙ্গলে বাঘের মতো কী যেন দেখলুম।

হালাকু হাসতে হাসতে বলল, এ মুল্লুকে শের কোথায় হুজুর? নিশ্চয় তাহলে বোজি কুহি দেখেছেন।

—বোজি কুহি? সে আবার কী জানোয়ার?

—বুনো পাহাড়ি ছাগল।

হালাকু নিশ্চয় আইবেক্সের কথা বলছে। সে কিছু ক্ষণ 'বোজি কুহি' নিয়ে বকবক করল। তারপর চলে গেল তাদের তাঁবুর দিকে। একটা গাছের তলায় ভেড়ার মাংস কাটা হচ্ছে। আমাদের সম্মানে গুজরদের ডেরায় আজ ভোজ দেওয়া হবে। রান্নাবান্নার আয়োজন চলেছে ওখানে। একটু পরে রিয়া এল সুন্দর নকশা আঁকা চীনা মাটির পাত্রে একগাদা শুকনো ফল নিয়ে বলল, ছোটসায়েব, বাবা এই ফলগুলো দিয়ে পাঠাল। বড়সায়েব এলে দু'জনে মিলে খাবেন আপনারা। রান্না হতে আজ বিকেল হয়ে যাবে কিনা!

থালাটা সে বাঁহাতে নামিয়ে রাখতেই আঁতকে উঠে বললুম, ও কী রিয়া! তুমি বাঁহাতে থালা রাখছ যে?

অপ্রস্তুত হয়ে সে ডানহাত ঠেকাল থালায়। মুখে কাঁচুমাচু হাসি।

তবু সন্দেহ গেল না। মায়াবি ওজরাক রিয়ার প্রতিবিম্বকে পাঠিয়েছে কি না বোঝা দরকার। বললুম, আচ্ছা রিয়া, তুমি কোন হাতে খাবার খাও?

রিয়া খুব অবাক হয়ে ডানহাতটা দেখাল। তখন সন্দেহটা চলে গেল। শুকনো ফলের থালাটা তাঁবুর ভিতর রেখে একটা পাথরের ওপর বসে রইলুম। দৃষ্টি পশ্চিমে নহরের ওদিকে। কিছুক্ষণ পরে দূরে ঘাসের জঙ্গলে চলমান একটা ছাইরঙা টুপি দেখতে পেলুম। অমনি সতর্ক হয়ে উঠলুম।

টুপিপরা লোকটি ঘাসের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে নহরের পাড়ে এল। হ্যাঁ, কর্নেল নীলাদ্রি সরকার তো বটেই। কিন্তু আসল, না জাল? প্রকৃত কর্নেল, না দর্পণবিম্ব কর্নেল? সিধে কর্নেল, না, উল্টো কর্নেল? ওজরাকের দেশের সীমান্তে এসে এবার থেকে পদে পদে সতর্ক থাকা দরকার।

নহর পেরিয়ে সিধে বা উল্টো কর্নেল হনহন করে এগিয়ে আসছেন। বুকে ক্যামেরা ও বাইনোকুলার তেমনি ঝুলছে। প্রজাপতি-ধরা লাঠি ও জাল অবশ্য নিয়ে বেরোননি। ওকতলায় পৌঁছে হাসিমুখে যেই সম্ভাষণ করেছেন, হ্যালো ডার্লিং, অমনি পকেট থেকে রিভলভার বের করে গর্জে উঠেছি, হ্যান্ডস আপ!

থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন দু'হাত তুলে।

বললুম, একটু নড়লেই গুলি ছুড়ব। দাঁড়ান, আগে পরীক্ষা করি। তারপর—

—জয়ন্ত! জয়ন্ত! কী আশ্চর্য!

সতর্কভাবে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে কপালের দাগটা দেখলুম। ঠিক বাঁদিকেই আছে। তবু নিঃসন্দেহ হওয়া দরকার। বললুম, চুরুট বের করে লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে নিন।

কর্নেল হো হো হেসে হাত নামিয়ে বললেন, ডার্লিং, আমি উল্টো-টুল্টো নই। একেবারে সিধে। হুঁ, বুঝেছি। কিছুক্ষণ আগে ওই ঘাসের জঙ্গলে আমিও একজন উল্টো-জয়ন্তকে দেখে এলুম।

হকচকিয়ে গিয়ে বললুম, বলেন কী!

—তুমি কোথায় উল্টো-কর্নেলকে দেখলে?

—ওই তো ওখানে!

কর্নেল পাথরটাতে বসে বললেন, উল্টো-তুমি একেবারে রাশিয়ান ব্যালে নাচ দেখিয়ে আমাকে মুগ্ধ করে দিয়েছ! ওঃ! সে কী নাচ তোমার। বলশয়ের স্টেজে অমন হংসনৃত্য নাচলে রুশ-নাচিয়েদের মাথা হেঁটে হয়ে যেত।

—উল্টো-আপনি কিন্তু বদ্ধপাগল!

—তা স্বাভাবিক। সিধে-আমির মধ্যে কিছু পাগলামি থাকা যখন সম্ভব!

—বাপস! মুখে পাগলাটে হাসি, চোখে পাগলাটে চাউনি!

ওজরাক যেই হোক, আমাদের নিয়ে তামাশা শুরু করেছে দেখছি। —কর্নেল চুরুট বের করে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে জ্বেলে নিলেন। ধোঁয়ার মধ্যে ফের বললেন, আমার সব থিওরি তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে, জয়ন্ত! এতকাল অসংখ্য রহস্যের মোকাবিলা করেছি এবং অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনার চুলচেরা ব্যাখ্যা করতে পেরেছি। কিন্তু এবার যে রহস্যের সামনে এসে পড়েছি, তার সম্ভবত কোনও পার্থিব ব্যাখ্যা নেই।

অবাক হয়ে বললুম, আপনি কি তাহলে জিনের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হলেন, কর্নেল?

—জানি না। সত্যি কিছু জানি না।

আমার প্রাজ্ঞ বন্ধুকে এমন হতাশাগ্রস্ত কখনও দেখিনি। সারা দুপুর তাঁকে ভীষণ গম্ভীর ও চিন্তাকুল দেখছিলুম। গুজরদের সামাজিক ভোজে গিয়ে উনি নামমাত্র আহার করলেন। প্রকাণ্ড চাপাটি, ভেড়ার মাংস, মধু, ছাগলের দুধ, শুকনো ফল—আয়োজনে কোনও ত্রুটি ছিল না। খাওয়ার পর উদ্দাম নাচগান শুরু করল ওরা। রিয়াও খুব নাচল। একফাঁকে আমরা দু'জনে কেটে পড়েছিলুম। তাঁবুতে একটু বিশ্রাম নেওয়ার পর কর্নেল বললেন, ইচ্ছে ছিল রিয়াকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করব। কিন্তু আর সাহস করে ঝুঁকি নিতে পারছি না। চলো, দু'জনেই রওনা হই।

কথাটা বুঝতে পারলুম না। জিগ্যেস করেও কোনও জবাব পেলুম না কর্নেলের। শুধু মনে পড়ল, হালাকুকে কর্নেল সকালে বলছিলেন, রিয়াকে নিয়ে সেই 'উফো' নামার জায়গায় যাবেন।

মাইলতিনেক পাথুরে মাটি আর ঘাসের জঙ্গল ভেঙে যেখানে পৌঁছলুম, সেখান থেকে পূর্বে কান্দ্রা শহর এবং এসআরএল অবজারভেটরি ইত্যাদি পরিষ্কার দেখা যায়। পশ্চিমের পাহাড়ে আজও সেই আলোর অপরূপ নানা রঙের খেলা দেখা যাচ্ছিল।

কর্নেল বললেন, কালরাত্রে মনে হচ্ছিল উফো নামার জায়গাটা এতদূরে নয়। নেহাত চোখের ভুল। দেখতে পাচ্ছ জয়ন্ত, কতখানি জায়গায় ঘাস পুড়ে ছাই হয়ে গেছে?

প্রায় তিরিশ বর্গমিটার জায়গা কালো হয়ে আছে। কর্নেল সাবধান করে না দিলেও ওই ছাইয়ের ত্রিসীমানায় ঘেঁসতুম না। কর্নেল হাঁটু মুড়ে একপ্রান্তে বসে ছাই দেখতে দেখতে বললেন, সকালে ডঃ সোম এবং আর যাঁরা এসেছিলেন, অনেক ছাই তুলে নিয়ে গেছেন দেখছি। তেজস্ক্রিয়তা থাকাও হয়তো সম্ভব ছাইয়ের মধ্যে।

—তাহলে অত কাছে বসে আছেন কেন? উঠে আসুন।

কর্নেল একটু হাসলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, থাকলেও সে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ খুব সামান্যই হবে। ক্ষতি করার ক্ষমতা হয়তো খুবই কম।

চারদিকে চক্কর দিয়ে এলেন কর্নেল। মনে মনে হিসেব কষে বললেন, উফোটা যদি চৌম্বকশক্তিসম্পন্ন বিমানই হয়, আয়তনে খুবই ছোট। ব্যাস বড় জোর দশফুট—তার বেশি কিছুতেই নয়। তিনটে ঠ্যাং ছিল। ওই দেখ, তিনটে গর্ত। আকার কাল রাত্রে যা দেখেছি, কিছুটা কমলালেবুর মতো—ওপর ও নিচেটা চাপা।

—আমার তো মনে হচ্ছিল, ফ্যানের বডি-অংশটার মতো।

কতকটা তাই বটে।—কর্নেল ঘুরে পিছনে কী দেখছিলেন।—কী ওটা?—বলে এগিয়ে গেলেন। তারপর হেঁট হয়ে যে জিনিসটা কুড়িয়ে নিলেন, সেটা আমার পরিচিত। ওজরাকের পাঞ্জা!

কর্নেল পাঞ্জাটা দেখতে দেখতে বললেন, ডঃ সোমদের এটা চোখে পড়া উচিত ছিল। পড়েনি কেন?

বললুম, ওঁরা চলে যাওয়ার পর ওজরাক হয়তো পাঞ্জাটা আপনার জন্য রেখে গেছে।

কর্নেল আমার রসিকতায় মন দিলেন না। পাঞ্জাটা পকেটস্থ করে বললেন, চলো তো, ওদিকটা দেখে আসি।

আমরা সিধে নাকবরাবর পশ্চিমদিকে হেঁটে চললুম। চূড়ায়-চূড়ায় সেই বিচিত্র বর্ণালী এখনও বিচ্ছুরিত হচ্ছে। পিচকিরির ধারার মতো নেমে আসছে সবুজ তৃণভূমিতে। চোখ-ধাঁধানো ওই অপার্থিব ইন্দ্রজাল মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। মাইলটাক এগিয়ে সেই নহর দেখতে পেলুম। একটু দ্বিধা হচ্ছিল। অস্বস্তি জাগছিল। কিন্তু কর্নেলকে অনুসরণ করতেই হল।

নহরের ওপারে কিছুদূরে গিয়ে পাহাড়ের ছায়ার মধ্যে পৌঁছেলুম আমরা। আরও কিছুটা যাওয়ার পর চূড়ার বর্ণালী আর দেখা যাচ্ছিল না। আমাদের সামনে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে কঠিন গ্র্যানাইট শিলার আকাশভেদী দেয়াল। নিচে বিশাল বিশাল পাথরের চাঁই পড়ে আছে। যুগ যুগ ধরে ভেঙে পড়েছে ওই দেয়ালের চাবড়া। সেগুলোর ভিতর দিয়ে এগিয়ে কর্নেল একখানে দাঁড়ালেন। তারপর বাইনোকুলারের সাধারণ লেন্সে আরও একটা লেন্স এঁটে দিলেন।

কিছুক্ষণ চূড়াগুলো খুঁটিয়ে দেখার পর বললেন, আশ্চর্য তো! এই পাহাড়ের কোনও চূড়াতেই একচিলতে বরফ জমেনি। এ তো অসম্ভব ব্যাপার! চারদিকের সব পাহাড়ের মাথায় বরফ জমে আছে। শুধু এই অংশটায় বরফ নেই। অবাক লাগছে, ডঃ সোম এই বৈশিষ্ট্যের কথা তো বলেননি!

সূর্য কালো পাহাড়ের পিছনে নেমেছে। তাই চূড়াগুলোর শীর্ষরেখা রঙিন দেখাচ্ছে এবং আকাশেও খানিকটা জায়গা জুড়ে ছোপ পড়েছে।

সেদিকে তাকিয়েছিলুম তন্ময় হয়ে। হঠাৎ কোথাও গুলির শব্দ শোনা গেল কয়েকবার এবং কর্নেলের চাপা গলার ডাকে সম্বিৎ ফিরল। কর্নেল চাপাস্বরে বললেন, তুমি এখানে অপেক্ষা কর। আমি আসছি। তুমি বরং বাঁদিকে—

দ্রুত বললুম, কোথায় যাবেন? চলুন, আমি যাচ্ছি।

—না। তুমি এখানে পাথরের আড়ালে বসে বাঁদিকে লক্ষ রাখো। কাউকে দেখতে পেলে কি না আমাকে বলো। ওদিকে লক্ষ রাখার জন্য তোমাকে এখানে থাকতে হবে।

মাথামুণ্ডু বুঝলুম না। একা থাকতে আমার অস্বস্তিও হচ্ছিল। কিন্তু বরাবর ওঁর কথা মেনে চলেছি, এখনও মেনে নিলুম। ভেবে পেলুম না, কে এমন জায়গায় এসে গুলি ছুড়ছে? কেনই বা ছুড়ছে?

কর্নেল গুঁড়ি মেরে এগিয়ে পাথর ও ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি ওঁর কথামতো একটা পাথরের আড়ালে বসে বাঁদিকে লক্ষ রাখলুম।

বসে আছি তো আছি। তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ জ্বালা করছে। দিন শেষের আবছায়া ক্রমে ঘন হয়ে যাচ্ছে। কনকনে ঠাণ্ডা বইতে শুরু করেছে। কিন্তু কর্নেলের যেমন ফেরার নাম নেই, তেমনি বাঁদিকে তাকিয়ে এতক্ষণ কারুর টিকিটি পর্যন্ত চোখে পড়েনি। আঁধার জমে এলে অসহ্য লাগল। অস্বস্তিটাও বেড়ে গেল। এখন কর্নেল ফিরে এলে তিনি সিধে না উল্টো কর্নেল তাও বোঝা কঠিন হবে যে।

তাছাড়া একেবারে ওজরাকের এলাকায় এসে পড়েছি। খপ করে ধরে মহাকাশে কোনও অজানা গ্রহে নিয়ে গিয়ে ফেললে আর এর চিরচেনা পৃথিবীতে ফেরার চান্স নেই।

মরিয়া হয়ে উঠে দাঁড়ালুম। টর্চ জ্বেলে নাড়তে নাড়তে গলা ফাটিয়ে ডাকাতে লাগলুম, কর্নেল! কর্নেল।—সত্যি বলতে কী, এ ডাকাডাকি নেহাত আতঙ্কের চোটেই।

কোনও সাড়া এল না। আরও বারকতক ডেকে হঠাৎ মাথায় এল, কর্নেলের নিশ্চয় কোনও বিপদ ঘটেছে। এতকাল কত সাংঘাতিক বিপদ থেকে, এমনকী মৃত্যুর মুখ থেকে ওই বৃদ্ধ আমাকে উদ্ধার করে এনেছেন! আর আমি ওঁর বিপদের সময় আতঙ্কে পাগলের মতো কাণ্ড করছি।

পকেট থেকে গুলিভরা রিভলভার বের করে উনি যেদিকে গেছেন, সেদিকে এগিয়ে চললুম। এবার আমার মনে সাহস আর জেদ ফিরে এসেছে। ওজরাক হোক আর যেই হোক, একটা হেস্ত-নেস্ত না করে ছাড়ব না।

কিছুদূর এগিয়ে পাহাড়ের দেয়ালের ঠিক নিচে একখানে টর্চের আলো ফেলে চমকে উঠলুম। কেউ চিত হয়ে পড়ে আছে পাথরের উপর। বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখি কর্নেল নন। অচেনা একজন লোক! চোখ বুজে নিস্পন্দ পড়ে আছে। পরনে সাধারণ প্যান্ট-শার্ট আর চামড়ার জ্যাকেট। মুখের গড়নে কাশ্মীরি বলেই মনে হচ্ছিল।

বেঁচে আছে কি না হাতের নাড়ি পরীক্ষা করে দেখার জন্য ওর ডান হাতটা যেই তুলতে গেছি, একমুঠো ছাই উঠে এল হাতে। ওমনি হাত ঝেড়ে পিছিয়ে এলুম। টর্চের আলো কমে এসেছে ততক্ষণে। ব্যাটারি ফুরিয়ে গেছে তাহলে। ভীষণ অসহায় বোধ করলুম। সেই সঙ্গে আতঙ্কটা আবার টেনে ধরল আগের মতো। এই হতভাগ্য লোকটিও নির্ঘাত ওজরাকের বলি! এখানে কেন এসেছিল সে? কর্নেলও কি এমনি ছাই হয়ে পড়ে আছেন কোথাও?

টর্চের আলো নিভিয়ে দিলুম। তারপরই একটু দূরে কর্নেলের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলুম।—জয়ন্ত নাকি?

আমার গায়ে টর্চের আলো পড়ল। বোবাধরা গলায় বললুম, আপনি কর্নেল তো?

—হ্যাঁ, ডার্লিং! তুমি যা ভাবছ, তা নই।

টর্চ নিভে গেল। তখন আমার টর্চ জ্বেলে দেখি, কর্নেল এবং একজন লোক এগিয়ে আসছে। কপালের কাটা দাগটা দেখে নিতে ভুল করলুম না। প্রকৃত কর্নেলই বটে। উত্তেজিতভাবে বললুম, এখানে একটা ডেডবডি পড়ে আছে। একেবারে ছাই হয়ে গেছে পুড়ে। অথচ চেহারা অবিকৃত, পোশাকও!

কর্নেল বললেন, দেখেছি। কিন্তু তোমার ভয় পেয়ে ছুটোছুটি চ্যাচামেচি করা উচিত ছিল না। জোর বেঁচে গেছ। তোমাকে ওখানে বসে থাকতে বলেছিলুম।

আঁধারে কিছু দেখা যাচ্ছিল না যে! তাছাড়া আপনার দেরি দেখে—

কর্নেল বাধা দিয়ে বললেন, ঠিক আছে। কাশিমসায়েব, আর এখানে নয়, চলুন। যেতে যেতে কথা হবে। হতভাগ্য বশির খাঁয়ের ডেডবডি ফেলে রেখে যেতে হচ্ছে, এটাই দুঃখ।

লাল আপেলের খপ্পরে

কাশিম খাঁ প্রতিরক্ষা দফতরের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের একজন অফিসার। আর যে লোকটা পুড়ে ছাই হয়ে পড়ে আছে, সেই বশির খাঁ তাঁরই একজন স্থানীয় এজেন্ট। বশির তাঁকে গোপনে খবর দিয়েছিল, পশ্চিম পাহাড়ের ওখানে কিছুদিন থেকে সন্দেহজনক লোকের গতিবিধি তার নজরে পড়েছে।

আসলে বশির ছিল 'ডাবল-এজেন্ট'। চীন ও পাকিস্তানের সাহায্যে একটি দেশদ্রোহী গোষ্ঠী কাশ্মীরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন রাষ্ট্র করার জন্য বহুদিন থেকে চক্রান্ত করছে। সেই গোষ্ঠীর সাংকেতিক নাম 'লাল আপেল'। বশির এদের কাছেও টাকা খেত।

গত রাত্রে 'উফো' নামের ফলে কান্দ্রা এলাকায় প্রতিরক্ষা দফতরের লোকেদের মধ্যে খুব উত্তেজনা ছিল। বশির এই সুযোগে কাশিম খাঁকে পশ্চিম পাহাড়তলিতে যেতে বলেছিল মিথ্যা খবর দিয়ে। সেখানে ওত পেতে বসে ছিল 'লাল আপেলে'র একজন ঘাতক।

কিন্তু তারপরই ঘটেছিল ভারি অদ্ভুত ঘটনা।

কাশিম খাঁ যখন বশিরের কথামতো নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছেছেন, দেখলেন বশির পাহাড়ের খাড়া দেয়ালের নিচে দাঁড়িয়ে তাঁকে ইশারায় ডাকছে। এই রকমই অবশ্য কথা ছিল। কিন্তু কাশিম খাঁ ওর কাছে যাওয়ার জন্য সবে পা বাড়িয়েছেন, হঠাৎ দেয়াল ফুঁড়ে এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বশির পড়ে গেল নিঃশব্দে। বিদ্যুতের ঝলকটা বড়জোর এক সেকেন্ডের জন্য।

কাশিম খাঁ থমকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তারপর দেখলেন, বশিরের বাঁদিকে একটা পাথরের আড়াল থেকে একজন লোক পড়ি-কী-মরি করে দৌড়ে পালাচ্ছে। তার মাথায় লাল রুমাল বাঁধা। সঙ্গে সঙ্গে কাশিম খাঁ বুঝতে পেরেছিলেন লোকটা 'লাল আপেল'। তাই রিভলভার তাক করে গুলি ছুড়েছিলেন।

কাশিম খাঁর তাড়া খেয়ে সে লুকিয়ে পড়েছিল। এই সময় কাশিম খাঁ কর্নেলকে ছুটে আসতে দেখেন। দিন-শেষের আবছা আলোয় কর্নেলকে দেখে তিনি ভ্যাগিস চিনতে পেরেছিলেন। নইলে কর্নেলকে গুলি খেয়ে পড়ে থাকতে হত।

ততক্ষণে কাশিম খাঁ বশিরের মতলব বুঝতে পেরেছেন। কর্নেল এবং তিনি সেই 'লাল আপেলে'র ঘাতককে খুঁজতে থাকেন। কিন্তু লোকটাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তার কিছুক্ষণ পরেই আমি কর্নেলের খোঁজে সেখানে গিয়ে পড়ি।

কাশিম খাঁর রিভলভারের গুলি খেয়ে আমাকেও চিত হয়ে পড়ে থাকতে হত। ভাগ্যিস কর্নেল তাঁকে বাধা দিয়েছিলেন।...

গুজরদের তাঁবুতে ফিরে আসার পথে কর্নেল এই কাহিনি আমাকে শুনিয়ে বললেন, জয়ন্ত। ওজরাক যেই হোক, মারাত্মক লেসার রশ্মিকে অস্ত্র হিসাবে সে ব্যবহার করছে। তবে আমরা লেসার অস্ত্র বলতে যা বুঝি, তার চেয়ে উন্নতমানের এবং সাংঘাতিক তার অস্ত্র।

—কিন্তু বশিরের উপর তার রাগের কারণ কী?

কাশিম খাঁ হাসতে হাসতে বললেন, বশির কোনও বেয়াদপি করে থাকবে তার সঙ্গে।

কর্নেল বললেন, আপনার জিপ তো লেকের কাছে। তাহলে কিছুক্ষণ আমাদের তাঁবুতে কাটিয়ে যান!

কাশিম খাঁ বললেন, আজ থাক, কর্নেল! দেরি হয়ে যাবে। এখনই ফিরে গিয়ে আমাকে এই ঘটনার রিপোর্ট দিতে হবে। তাছাড়া গুজরদের তাঁবুতে আমার যাওয়া ঠিক নয়। ওদের মধ্যেও 'লাল আপেলে'র চর আছে।

—বলেন কী!

—সেইরকমই খবর আছে আমাদের হাতে। আপনারা একটু সাবধানে থাকবেন।

একটু দূরে গুজরদের তাঁবুতে আলো দেখা যাচ্ছিল। কাশিম খাঁ বিদায় নিয়ে অন্ধকারে উধাও হয়ে গেলেন। ভদ্রলোকের সাহসের প্রশংসা করতে হয়। এমন কাণ্ডের পর নার্ভ ঠিক রেখেছেন এবং অন্ধকারে ঘাসের জঙ্গল আর পাথরের দুর্গমতা পেরিয়ে অকুতোভয়ে কেমন হেঁটে গেলেন।

ওকগাছটা ফাঁকা জায়গায় কালো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তলায় একটা কাঠ পুঁতে মশাল জ্বেলে বেঁধে রেখেছে হালাকু। পাথরটাতে বসে বোধ হয় আমাদের তাঁবু পাহারা দিচ্ছে সে। হাতে বল্লম।

আমাদের দেখে সেলাম দিয়ে বলল, খুব ভাবনায় ছিলুম হুজুর। যাকগে, দেওতাজির কৃপায় ভালয় ভালয় ফিরতে পেরেছেন।...

রাত এগারোটা অব্দি ওদের তাঁবুর ওদিকে নাচগান চলল। শুকনো ঘাসের উপর চামড়ার বিছানা আর বালিশে শুয়ে অনভ্যাসের দরুন ঘুম অসম্ভব ব্যাপার। কর্নেলের রীতিনীতি আলাদা; উনি গাছের ডালে শুয়েও নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে পারেন দেখেছি।

শুয়ে ঘুমজড়ানো গলায় বললেন, খামোকা মির্জাসায়েবকে কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে পাঠালুম। একগাদা টাকা গচ্চা যাবে। নিশুতি রাতে নবাবী রত্নালঙ্কারের লোভে কোনও চোর আসবে না। আসলে আমি ওজরাককে ভুল বুঝেছিলুম।—ল অফ প্যারিটি....নেচারস লেফট হ্যান্ড টুইস্টের পদ্ধতি...

নাক ডাকার মধ্যে কর্নেল যেন ঘুমের দেশে যেতে যেতে প্রলাপ বকছেন। বিরক্ত হয়ে ডাকলুম, কর্নেল! কর্নেল!

নাক ডাকা থামাল। বললেন, বলো ডার্লিং!

—কী শুধু ল অফ প্যারিটি-প্যারিটি করছেন! আসল ব্যাপারটা কী?

—মিরর-ইমেজ তৈরির কৌশল ওজরাক জানে।

—তা তো জানেই। সেটা আমি আর আপনি স্বচক্ষে দেখেছি দু'জনে। রিয়াও দেখেছিল।

আবার নাক ডাকতে থাকল কর্নেলের। আমার খোঁচা খেয়ে জড়ানো গলায় শুধু বললেন, জেরক্স মেশিনের মতো একটা ডুপ্লিকেটিং মেশিনই যথেষ্ট। তার সঙ্গে আই আর প্রোজেক্টর।

—কী বলছেন?

—ইমেজ রিফ্লেকশন প্রোজেক্টর।

—কর্নেল! প্লিজ! খুলে বলুন।

তালে তালে নাক ডাকতে থাকল। আর হাত বাড়িয়ে খোঁচা-খুঁচি করেও জাগাতে পারলুন না। শরীর তো নয়, পাথর।

তাঁবুর সামনে হালাকু আগুনের কুণ্ড জ্বেলে দিয়েছিল। এখনও আগুন জুগজুগ করছে। ওদের নাচগান থেমে গেছে। নিঃসাড় স্তব্ধ তৃণভূমিতে মাঝে মাঝে রাতপাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। কখনও ঘুম জড়ানো গলায় কুকুরগুলো ডেকেই চুপ করে যাচ্ছে। হালাকু যে কম্বল দিয়েছে, সেটা খুবই কর্কশ। ভেড়ার লোম দড়ির মতো পাকিয়ে তৈরি। তার উপর আঠা দিয়ে একরাশ পশম এঁটেছে। কিন্তু যত নরম হোক কিংবা গরম হোক, অস্বস্তিকর।

রাত বারোটার পর সেই পাহাড়ি ঝোড়ো হাওয়াটা শনশনিয়ে এসে গেল। ঘাসের জঙ্গলে ভূতুড়ে শব্দ হতে থাকল। আমাদের তাঁবুর মুখ পুর্বদিকে। ঝড়টা বইছে পশ্চিম থেকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁবুর তলা দিয়ে কনকনে বিচ্ছিরি হাওয়া ঢুকে তোলপাড় জুড়ে দিল। তাঁবুটাই মাঝে মাঝে উড়ে যাওয়ার ভঙ্গি করছে। চুপচাপ কম্বলের ভিতর সেঁটে থাকলুম।

হঠাৎ খেয়াল হল, হালাকু বলে গেছে, কুণ্ডের আগুনটা যেন শোওয়ার আগে নিভিয়ে ফেলি। কারণ, রাতের ঝড়টা এলে অঙ্গার উড়ে ঘাসের জঙ্গলে পড়বে এবং আগুন ধরে যাবে।

পর্দার ফাঁকে উঁকি মেরে দেখি, ঝড়ের ধাক্কায় প্রায় নিভে যাওয়া আগুন চাঙ্গা হয়ে উঠেছে এবং ফুলকি ছড়াচ্ছে চিড়বিড়িয়ে।

দেখামাত্র বেরিয়ে গেলুম। পাশেই জলভরা মাটির পাত্র আছে। পাত্র থেকে জল ঢেলে আগুনের কুণ্ডটা নিভিয়ে দিলুম। তারপর হেঁট হয়ে তাঁবুতে ঢুকতে যাচ্ছি, মাথার পিছনে খটাস করে আঘাত লাগল। প্রচণ্ড আঘাত। মাথা ঘুরে গেল। এক সেকেন্ডের জন্য মনে হল, তাঁবুর কাঠেই হয়তো ধাক্কা লেগেছে।

তারপর কী হয়েছে, জানি না।....

চোখ খুলে কিছু বুঝতে পারছিলুম না। একটা বদ্ধ পাথরের ঘর, ঢালুমতো এবড়ো-খেবড়ো তার ছাদ এবং একটা গোল ঘুলঘুলি দিয়ে দিনের আলো এসে পড়েছে। দু'জন লোক একপাশে

বসে ফ্লাস্ক থেকে চা বা কফি ঢেলে খাচ্ছে। তাদের মাথায় লাল রুমাল বাঁধা। পাশে দুটো স্টেনগান পড়ে আছে।

অমনি মনে পড়ে গেল 'লাল আপেল'-এর কথা। উঠে বসার চেষ্টা করলুম। কিন্তু মাথায় যন্ত্রণা। অনেক কষ্টে অবশ্য উঠতে পারলুম। লোক দুটো কুতকুতে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে পাত্রে চুমুক দিচ্ছিল। একজন দুর্বোধ্য ভাষায় অপরজনকে কিছু বলল। অপরজন মাথা নাড়ল। তখন প্রথমজন ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে আমাকে বলল, এই বাঙালি বুড়বাক! তুই কি খবরের কাগজের লোক?

বললাম, হ্যাঁ। তোমরা আমাকে ধরে এনেছ কেন?

—তোকে আমাদের লড়াইয়ের কথা লিখে তোর কলকাতার কাগজে পাঠাতে হবে।

—কী লড়াই তোমাদের?

—কাশ্মীরের লোক চাই স্বাধীন কাশ্মীর। তাই তারা লড়াই করছে।

হাসবার চেষ্টা করে বললুম, কাশ্মীরের লোক ভারতে থাকতেই চায়। কাশ্মীর ভারতেরই অংশ। তাই স্বাধীনতার পর এতকাল ধরে তারা ভোট দিয়ে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতো সরকার গড়ছে। স্বাধীন কাশ্মীর চাইলে তারা কেউ ভোট দিত না। ভোট বয়কট করত।

দ্বিতীয় লোকটি দাঁত খিঁচিয়ে বলল, ভোট দিচ্ছে তারা বাধ্য হয়ে।

—তোমাদের সঙ্গে তর্ক কথার ইচ্ছে নেই। কারণ তোমরা মিথ্যাবাদী।

দ্বিতীয় লোকটি আমার চোয়ালে ঘুষি মারল। প্রথম লোকটি তাকে বাধা দিয়ে বলল, মেজাজ ঠিক রাখো দোস্ত। এই বুড়বাক। শোন। কাশ্মীরি বুড়বাকরাই ভোট দিচ্ছে। তুই আমাদের নায্য লড়াইয়ের কথা লিখে দস্তখস্ত করে দিবি। আমাদের লোক কলকাতায় তোর কাগজের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবে।

—আমি লিখলেও তা ছাপা হবে না।

দু'জনেই একটু অবাক হল। প্রথমজন বলল, কেন ছাপা হবে না? তুই তো তোর কাগজের রিপোর্টার! যা পাঠাবি, তাই ছাপা হবে।

—না হবে না। খবরের কাগজ যা খুশি ছাপতে পারে না।

দ্বিতীয় লোকটি খাপ্পা হয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, বলেছিলুম দোস্ত, এভাবে কাজ হবে না! ওকে পাহাড় থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিই, চল। ওকে ছেড়ে দিলে উল্টে আমাদের বিরুদ্ধে লিখে সরকারকে খেপিয়ে দেবে।

প্রথম লোকটি কাঁধের ব্যাগ থেকে একটা কাগজ বের করে আমাকে দিল। ইংরেজিতে টাইপ করা কাগজ। পড়ে আমার চক্ষুস্থির। আমি দৈনিক সত্যসেবকে খবর পাঠাচ্ছি : কাশ্মীরের জনগণের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পেরেছি, তারা স্বাধীন কাশ্মীর চায় ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বুঝলুম, 'লাল আপেলের' উগ্রপন্থীরা রীতিমতো শিক্ষিত এবং চতুর লোক। সব খবর ওদের নখদর্পণে। প্রথম লোকটি বলল, দস্তখত করে দে!

কাগজটা ছিঁড়ে ওর মুখে ছুড়ে মারলুম। সঙ্গে সঙ্গে সেও উঠে দাঁড়াল। সঙ্গীকে কিছু বলল। তারপর দু'জনে আমাকে হ্যাঁচকা টানে ওঠাল। ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল।

দরজার সামনে একটা চাতাল মতো। সেখানে গিয়েই আমার বুক কেঁপে উঠল। মাথা ঘুরতে থাকল। চারদিকে খাড়া সব পাহাড় এবং সামনে অতল খাদ। সেই খাদের নিচে অন্ধকার থমথম করছে।

তাহলে এবার নরকে গিয়ে রিপোর্টারি কর!—বলে দু'জনেই আমাকে প্রচণ্ড ধাক্কা মারল। গড়িয়ে পড়লুম শূন্যে। আর্তনাদ করলুম কি? জানি না। শুধু টের পাচ্ছিলুম অনন্তকাল ধরে শূন্য তলিয়ে যাচ্ছি এবং নিচে থমথমে অন্ধকার হাঁ করে আছে।...

স্বপ্ন কিংবা স্বপ্ন নয়

হঠাৎ কিসের ছোঁয়া লাগল। খুব আরামদায়ক নরম জিনিসে আটকে গেলুম, অথবা কোনও অলৌকিক বিশাল করতল আমাকে লুফে নিল। কোনও ঝাঁকুনি পর্যন্ত লাগল না।

আস্তে আস্তে চোখ খুলে তাকালুম। একটা বিস্ময়কর পরিবেশ! এটা একটা ঘরই বটে। কিন্তু চারপাশের দেয়াল ও ছাদ অনুজ্জ্বল নানা রঙের আলো দিয়ে যেন তৈরি। এত রং, অথচ চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে না। কিন্তু তার চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, আমি শূন্যে চিত হয়ে ভাসছি। পিঠের নিচে কিছু নেই।

আমার সামনে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে আছে একটা মানুষের গড়নের পুতুল। হ্যাঁ, পুতুলই বটে। সাদা কাচের পুতুল। তার সারা দেহে নানা রঙের আলোর স্রোত বইছে। তার পরনে কোনও পোশাক নেই, অথবা ওই হরেক-রঙা চঞ্চল আলোই তার পোশাক।

বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। তার মুখটা পুতুলের মুখের মতো আঁকানো। চুলগুলো লাল। চোখ দুটো নীল। ঠোঁট দুটোও লাল। তার চোখের উপর ভুরু বলতে কিছু নেই। অথচ কী সুন্দর তার চেহারা! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীর তুলিতে আঁকা একটি ছবি।

সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলুম। পারলুম না। যতবার পা দুটো নিচের মেঝের দিকে নিয়ে যাচ্ছি, আবার ভেসে উঠছি। এবার মনে হল, আমি ভরশূন্য অবস্থায় আছি সম্ভবত। মহাকাশযানের ভিতর মহাকাশচারীদের এমনি অবস্থা টিভিতে কতবার দেখেছি।

তারপর টের পেলুম, ওই রঙিন পুতুলের মতো প্রাণীটা আমাকে কিছু বলছে। তার ঠোঁট দুটো কিন্তু নড়ছে না। অথচ আমার মাথার ভিতর তার কথা ভেসে উঠছে অনুভূতিমালার মধ্যে দিয়ে। সে বলছে, তোমার কোনও ক্ষতি করব না। ভয় পেও না। আর দেখো, আমি তোমার সঙ্গে স্নায়বিক তরঙ্গের ভাষায় কথা বলছি। তুমিও বলার চেষ্টা করো। আমি বুঝতে পারব। নাও, চেষ্টা করো।

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। স্নায়বিক তরঙ্গের ভাষাটা আবার কেমন?

—বন্ধু! ব্রেনওয়েভের কথাই আমি বলছি। মনকে তোমার বক্তব্যের দিকে একাগ্র করতে হবে। তুমি যা বলতে চাইবে, তার সঙ্গে অন্য চিন্তাকে এনে ফেলো না। চেষ্টা করে দেখো, পারবে।

মনকে একাগ্র করে চিন্তার মধ্যে বললুম, তুমি কে, বন্ধু?

—ওজরাক।

চমকে উঠলুম।—তুমিই তাহলে ওজরাক!

আমার স্নায়ুতরঙ্গে ওজরাকের হাসি প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। চিন্তা দিয়ে বললুম, আমাকে কোথায় এনেছ?

—আমার পৃথিবীর ঘাঁটিতে। কান্দ্রার পশ্চিম পাহাড়ে।

—আর কোথায় আছে তোমার ঘাঁটি?

—তোমাদের জানা গ্রহ বৃহস্পতিতে।

—তোমার দেশ কোথায়?

—আলফা সেন্টোরির একটি গ্রহে। এখানে থেকে ৪.৩ আলোকবর্ষ দূরে। এ অবশ্য তোমাদের হিসাব। তোমাদের সময়ের মাপের সঙ্গে আমাদের সময়ের মাপের কোনও মিল নেই।

—তুমিই কি পাঞ্জা ফেলে রাখো যেখানে সেখানে?

—হ্যাঁ। তোমাদের মনে কৌতূহল সৃষ্টির জন্য। যদি কেউ যোগাযোগ করে, সেই ভেবে।

—কান্দ্রার নবাবের 'নুরে আলম' কি তুমিই নিয়ে এসেছ?

—হ্যাঁ, জিনিসটা আমারই। অসাবধানে পড়ে গিয়েছিল। একটা লোক কুড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তোমাদের সময়ের হিসাবে এ ঘটনা দুশো বছর আগেকার। যাই হোক, পরে জানতে পেরে রোবট পাঠিয়ে নিয়ে এসেছি।

—আমাদের বিভিন্ন জাদুঘর থেকে যেসব রত্ন আর মূর্তি চুরি গেছে, তাও কী তোমার কীর্তি?

—আমারই।

—কেন এসব করেছ?

—ওগুলোর বস্তু-প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করব বলে। কাজ হয়ে গেলেই ওগুলো ফেরত পাঠাব।

—প্রতিবিম্ব কেন সৃষ্টি করবে?

—দেশে ফিরে গিয়ে সবাইকে দেখাব। কিছু নিদর্শন নিয়ে যাওয়া তো উচিত।

—কিন্তু এসআরএল থেকে অ্যান্টিম্যাটার ডিটেকশন যন্ত্র কেন নিয়ে এসেছ?

—দরকার হয়েছে। এ ধরনের জিনিস আজও আমরা তৈরি করতে পারিনি। তাই বহুবার অ্যান্টিম্যাটার গ্যালাক্সি—যাকে বলা যায় প্রতিবিম্ব সেখানে দৈবাৎ গিয়ে পড়ে আমাদের অনেকে ধ্বংস হয়েছে। আমাদের শরীর আলো-কণিকায় গড়া। কিন্তু অ্যান্টি-পার্টিকল নয়। আলফা-সেন্টৌরি এলাকা এই গ্যালাক্সিরই অন্তর্ভুক্ত। তবে তোমাদের যন্ত্রটার বস্তু-প্রতিবিম্ব তৈরি করে ফেরত পাঠাব রোবটের হাতে। অন্যের জিনিস আমরা নিই না। নিলে তা ফেরত দিই। রোবট এনেছি সেইজন্যই।

তোমরাও তাহলে রোবট তৈরি করেছ?

—বন্ধু! আমার একই গ্যালাক্সির প্রাণী। পরিবেশের দরুন আমাদের দেহের উপাদানে যতই তফাত থাক, একই গ্যালাক্সিতে একই ধরনের সভ্যতার বিকাশ ঘটবে, এটাই প্রকৃতির নিয়ম। তবে তোমরা এখনও পিছনে পড়ে আছে। আমাদের যন্ত্র-প্রাণী তোমাদের চেয়ে বহু উন্নত।

—তোমাদের খাদ্য কী?

—এনার্জি। নক্ষত্র থেকে এনার্জি সংগ্রহ করে আমাদের খাদ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়েছে।...তুমি হাসছ কেন বন্ধু?

—রিয়ার, আমার আর আমার বৃদ্ধ বন্ধুর প্রতিবিম্ব পাঠিয়েছিলে কেন?

—কৌতুক ছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না।

—বশির খাঁকে মারলে কেন?

—আমার রোবটের পাল্লায় পড়েছিল। ওর নাম বুরাখ। বুরাখ এই ঘাঁটি পাহারা দেয়। ও যাকে ছোঁয়, সে মারা পড়ে। পৃথিবীতে এসে বুরাখ বড় নিষ্ঠুর আর বদরাগী হয়ে গেছে। ওকে সামলানো যাচ্ছে না।

—রিয়াদের মদ্দা ভেড়াটা কী দোষ করেছিল?

—বুরাখ গাড়োলটা দেখে অবাক হয়েছিল। তাই ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছিল।

—বুরাখের পায়ে কি ঘুঙুর বেঁধে রেখেছ?

—সে আবার কী জিনিস? ওটা যন্ত্রের শব্দ। আমার স্পেসশিপের মতো বুরাখও ম্যাগ্নেটিক এলিমেন্টে তৈরি।

—আমাকে উদ্ধার করল কে?

—বুরাখ। আমার হুকুমে।

—আমি পুড়ে ছাই হইনি যে?

—আমি ওর ধ্বংস-ক্ষমতা নিউট্রাল করে দিয়েছিলুম।

—আমাকে কী বন্দি করে রাখবে, বন্ধু?

—না। তোমার বস্তু-প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে নিয়ে তারপর তোমাকে রেখে আসব।

বলে ওজরাক পিছনের আলোর দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেল। এতক্ষণে আমার মাথাটা ঝিমঝিম করতে থাকল। আবার চোখ বুজে এল। চেষ্টা করেও চোখ খুলতে পারলুম না। শূন্যে ভাসার আরামদায়ক অনুভূতি আমাকে ঘুমের দিকে টানছিল।...

বিদায় বন্ধু ওজরাক!

কেউ যেন দূর থেকে ডাকছিল। চোখ খুলে দেখি, ওজরাক দাঁড়িয়ে আছে। আমার মস্তিষ্কের স্নায়ুতে তার স্নায়ুতরঙ্গের প্রতীকী ভাষা প্রতিধ্বনিত হল : বন্ধু! বন্ধু! তোমার বস্তু-প্রতিবিম্ব দেখো। কেমন হয়েছে বল?

ভরহীন অবস্থায় ভেসে থেকে দেখলুম, অবিকল 'আরেক আমি' দাঁড়িয়ে আছে ওজরাকের পাশে। মুখ দিয়ে মানুষের ভাষায় বলার চেষ্টা করলুম, হাই জয়ন্ত চৌধুরি! কোনও শব্দই বেরুল না। তখন হাত নাড়লুম। আমার প্রতিবিম্ব বাঁ হাত নেড়ে একটু হাসল।

ওজরাক জানিয়ে দিল, বাতাস না থাকায় শব্দ হবে না। বাতাসের বদলে আমরা আলোকতরঙ্গ থেকে শ্বাসপ্রশ্বাস নিই। আমরা কথা বলি স্নায়ুতরঙ্গের মাধ্যমে।

—বন্ধু ওজরাক! আমার প্রতিবিম্ব তো অ্যান্টিম্যাটার। তবু বিস্ফোরণ ঘটছে না কেন?

—শক্তিশালী কণিকা ট্যাকিওনের ফ্রেমে ঘিরে রেখেছি।

—ওই স্কেলের মতো জিনিসটা কী?

—ডুপ্লিকেটিং মেশিন। ওটা বস্তু-প্রতিবিম্ব তৈরি করে।

—রিয়ার, আমার বা কর্নেলের প্রতিবিম্ব তৈরি করেছিলে ওতে?

—হ্যাঁ। তবে ওটার সঙ্গে আই আর প্রোজেক্টর জুড়ে তবেই তোমাদের প্রতিবিম্ব পাঠাতে পেরেছিলুম।

—ইমেজ রিফ্লেকশন প্রোজেক্টর! আমার বৃদ্ধ বন্ধু কর্নেল নীলাদ্রি সরকার এই যন্ত্রটার কথা বলছিলেন বটে!

—বুড়ো লোকটিকে আমার খুব পছন্দ।

—ওঁকে ধরে আনতে বুরাখকে পাঠিয়ে দাও না কেন?

—হাতে সময় নেই। ডাক এসে গেছে। আমাকে রওনা দিতে হবে।

ওজরাকের চাঞ্চল্য অনুভব করছিলুম। আমার স্নায়ুতে প্রচণ্ড চাপ লাগছিল। সে একটা হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। এবার দেখতে পেলুম ওর হাতের তালু থেকে আঙুল পর্যন্ত আঁকাবাঁকা পাঁচটা সাদা রেখা ঝিকমিক করছে। বজ্রের প্রতীক। ভয়ে ভয়ে হাত বাড়িয়ে দিলুম। কোনও অনুভূতি জাগল না। মনে হল না কিছু আঁকড়ে ধরেছি বা স্পর্শ করেছি। যেন শূন্যে করমর্দন করছি। কিন্তু চোখে দেখতে পাচ্ছি। তার হাতে আমার হাত। দুটে হাতই পরস্পর ঝাঁকুনি দিচ্ছি। স্নায়ুতরঙ্গের প্রতীকী ভাষায় বিদায় জানাচ্ছি পরস্পরকে।

তারপর ওজরাক আলোর দেয়ালের দিকে ঘুরল। অমনি একটা বেঁটে মূর্তি বেরিয়ে এল। সঠিক বর্ণনা অসম্ভব। বড় জোর বলা যায়, জল দিয়ে একটা বেঁটে ও চ্যাপ্টা পুতুল বানানো সম্ভব যদি হত, এইরকমই দেখাত। ওজরাক চিন্তার ভাষায় আদেশ দিল, বুরাখ! আমার পৃথিবীর বন্ধুকে রেখে এস।

বুরাখ আমাকে ধরল। তার শরীর তুলতুলে স্পঞ্জের মতো। আমার প্রতিবিম্ব মমির মতো দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে হাত নেড়ে চিন্তার ভাষায় বললুম, বিদায় জয়ন্ত চৌধুরি।

হতচ্ছাড়া দ্বিতীয় জয়ন্ত কেন জানি না, গোমড়া মুখে দাঁড়িয়ে রইল। নির্বাসনের দুঃখেই কি? ওজরাক হাত তুলল। বিদায় বন্ধু!

ওজরাক, না মুসা!!

কেউ ডাকছিল। চোখ খুলেই ভড়কে গেলুম। আমার উপর ঝুঁকে আছে চিরচেনা দাড়িওয়ালা একটা মুখ। মুখে সস্নেহ হাসি—কেমন বোধ করছ, ডার্লিং? একটু অপেক্ষা করো। কাশিম খাঁ অ্যামবুল্যান্স আনতে গেছেন।

উঠতে গিয়ে টের পেলুম, শরীর প্রায় নিঃসাড়। মাথার পিছনে যন্ত্রণা। আস্তে বললুম, আমি কোথায়?

—কান্দ্রার তৃণভূমিতে।

—বুঝেছি! ওজরাকের রোবট বুরাখ আমাকে এখানে রেখে গেছে।

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, ওজরাকের রোবট নয় জয়ন্ত, গুজর রাখাল ছেলেরা।

—অসম্ভব!

—উঁহু। দক্ষিণে পাহাড়ের ধারে গভীর খাদে একটা ডোবা আছে। জলের ধারে তুমি পড়েছিলে। রাখাল ছেলেরা এতদূরে বয়ে এনে আমাকে খবর দিতে গিয়েছিল।

এবার দেখলুম, চারপাশে ভিড় করে গুজররা দাঁড়িয়ে আছে। হালাকু এবং রিয়াও আছে। হালাকু ভয় পাওয়া গলায় বলল, হুজুর! উনি ওজরাকের চেলা বুরাখের নাম করছেন! ওঝা ডাকাই উচিত ছিল।

রাগ করে বললুম, ওজরাক আমার বন্ধু। তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। সে আলফা-সেন্টোরি নক্ষত্রজগতের বাসিন্দা। সে এক আলোর মানুষ।

কর্নেল নির্বিকারভাবে বললেন, আলোর নয়, নেহাতই রক্তমাংসের। তার নাম মুসা।

—কী বলছেন! কে মুসা?

—একসময়কার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পদার্থবিজ্ঞানী। কাশ্মীরের লোক। ল অফ প্যারিটি নিয়ে গবেষণায় সুনাম ছিল। দুঃখের বিষয়, তিনি পরে কট্টর ভারতবিরোধী হয়ে পড়েন। লাল আপেল দল তাঁরই গড়া।

বললুম, আমি বিশ্বাস করি না। ওজরাকের সঙ্গে আমার কত কথা হয়েছে। সে—

কথা কেড়ে কর্নেল বললেন, তুমি পাহাড় থেকে ডোবার জলে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে ডার্লিং! অজ্ঞান অবস্থায় বোধ করি একটি উদ্ভট স্বপ্ন দেখেছ। আমরা আজ দুপুরে পশ্চিম পাহাড়ের ভিতর লাল আপেল-নেতা মুসার গোপন ঘাঁটি আবিষ্কার করেছি। মুসা তাঁর ম্যাগ্নেটিক ফ্লাইং শিপে চেপে আকসাই চীনের দিকে পালিয়ে গেছেন। সঙ্গে রোবটটিকেও নিয়ে গেছেন। তবে তাঁর আবিষ্কৃত ম্যাটার ডুপ্লিকেটিং মেশিন, ইমেজ রিফ্লেক্টর, কিছু লেসার অস্ত্র আর চুরি যাওয়া জিনিসগুলো উদ্ধার করতে পেরেছি।

অবাক হয়ে বললুম, রত্ন আর মূর্তি চুরি কেন করতেন মুসা?

—ডুপ্লিকেটরে ওগুলোর অসংখ্য বস্তু-প্রতিবিম্ব তৈরি করে বিদেশে বেচে দলের জন্য অর্থ সংগ্রহই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু মুসা প্রথমে খেয়াল করেননি, বস্তু-প্রতিবিম্বের অ্যান্টি-ম্যাটার হওয়ার চান্স আছে। ওতে হাত দিলেই বিস্ফোরণ ঘটবে। পরে ব্যাপারটা খেয়াল হওয়ায় স্পেস রিসার্চ ল্যাব থেকে অ্যান্টি-ম্যাটার ডিটেকশন সিস্টেম চুরি করেন।

—কীভাবে চুরি করতেন?

—ম্যাগ্নেটিক ফ্লাইং শিপ রেডার স্ক্রিনের পাল্লার বাইরে কোথাও রেখে মিসাইল সিস্টেমের সাহায্যে রোবটটিকে নির্দিষ্ট টার্গেটের দিকে পাঠাতেন। ধরো, কোনও জাদুঘরে রত্ন বা মূর্তি হাতাতে চান। আগে থেকে লাল-আপেলের চররা দর্শকদের ভিড় সেই জাদুঘরে গিয়ে জিনিসটা কোথায় আছে এবং কীভাবে সে ঘরে পৌঁছনো যাবে, সবকিছু তথ্য সংগ্রহ করেছে। নকশা তৈরি করেছে। মুসা সেইসব তথ্য ও নকশার ডাটা কোড-ল্যাংগুয়েজে রূপান্তরিত করে রোবটের মাথায়

ভিতরকার কম্পিউটারে ফিড করিয়েছেন। রোবটের বুকে টিভি ক্যামেরা ফিট করে দিয়েছেন। এবার রোবটটি কম্পিউটারের সাহায্যে টার্গেটে পৌঁছে কাজ করবে। লেসার বিমের তাপে ঘরের তালা গলাবে। লকারে রত্ন থাকলে লকার গলিয়ে ফেলবে। মূর্তির বেলায় অবশ্য কাজটা সহজ। যদি রোবট ভুল করে, সেজন্য সাবধানী মুসা ফ্লাইং শিপে বসে টিভি স্ক্রিনে লক্ষ রাখতেন। বেগতিক দেখলে রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেমে রোবটকে সাহায্য করতেন। রোবটের সামনে মানুষ পড়লে রোবট লেসার বিম প্রয়োগ করে তাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। আশা করি, পদ্ধতিটা বুঝতে পেরেছ?

—কিন্তু ঘুঙুরের শব্দ, শিস, ঝড়?

—ডঃ সোম ঠিক বলেছিলেন। মুসার ম্যাগ্নেটিক ফ্লাইং শিপ এবং পৃথিবীপৃষ্ঠের চৌম্বক প্রবাহের মধ্যে বিকর্ষণঘটিত এবং বিকর্ষণজনিত অভিঘাত বায়ুমণ্ডলে তরঙ্গ সৃষ্টি করত। ঝড় এবং ওইসব অদ্ভুত শব্দ তারই ফলাফল।

একটু চুপ করে থেকে বললুম, রিয়ার প্রতিবিম্ব, আমার বা আপনার প্রতিবিম্ব নিয়ে কি তামাশা করতেন মুসা?

কর্নেল হাসলেন। তামাশা নয়। ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্বের মরীচিকা প্রতিফলিত করে ভয় দেখানোই ছিল উদ্দেশ্য, যাতে কেউ পশ্চিম পাহাড় তল্লাটে পা না বাড়াই! ওজরাকের কিংবদন্তিকে কাজ লাগাতে চেষ্টা করেছেন মুসা।

—ওজরাকের পাঞ্জাও কি ওঁর তৈরি?

—না জয়ন্ত! ওগুলো ন্যাচারাল রক ফর্মেশন। হাজার হাজার বছর আগে এই এলাকায় উল্কা পড়েছিল। উল্কার উপাদান আর ভূ-পৃষ্ঠের শিলা-উপাদানে বহু রাসায়নিক পদার্থ আছে। উভয়ের মিশ্রণে বিক্রিয়ার ফলে ওই চাকতিগুলো ব্যাঙের ছাতার মতো সৃষ্টি হয়েছিল। শিলাছত্রাক বলতে পার। তবে মুসা এগুলো ওজরাক-রহস্যের নিদর্শন হিসাবে কাজে লাগাতেন। চোখে ধুলো দেওয়ার প্রচেষ্টা আর কী!

সামরিক বাহিনীর অ্যাম্বুল্যান্স এসে গেল। গুজরদের ভিড় হটিয়ে কাশিম খাঁ এলেন। সঙ্গে স্ট্রেচার নিয়ে দু'জন স্বাস্থ্যকর্মী। স্ট্রেচারে যখন আমাকে ওঠানো হয়েছে, চোখ গেল পশ্চিম পাহাড়ের দিকে। অমনি ওজরাকের ইন্দ্রজাল দেখতে পেলুম। কী অপরূপ বর্ণবিচ্ছুরণ! ধারায়-ধারায় নেমে আসছে অজস্র রঙের ঝরনা। কান্দ্রার তৃণভূমিকে স্বর্গের সৌন্দর্যে সাজিয়ে তুলেছে। কে বলে ওজরাক নিছক স্বপ্ন? ওই তো দেখছে পাচ্ছি, আঁকাবাঁকা বর্ণালীরেখায় স্পষ্ট ফুটে উঠেছে তার ছাপ। যে আলোর আঙুল আমি দেখেছি, ওই তো তার বিস্ময়কর প্রতীক!

তারপরই আমার হাসি পেল। স্বপ্নের ওজরাক আমার প্রতিবিম্ব নিয়ে চলে গেছে ৪.৩ আলোকবর্ষ দূরের আলফা সেন্টৌরি নক্ষত্রলোকে। এতক্ষণ কি সেখানে ওজরাকের ডাইনিংরুমে বসে দ্বিতীয় জয়ন্ত চৌধুরি খিদের চোটে গপগপ করে এনার্জি খাচ্ছে? সে কি বুঝতে পারছে, সে বাঁহাতে খাচ্ছে এবং তার পিলে পেটের ডানদিকে, যকৃৎ বাঁদিকে, হার্ট ডানদিকে—সে এক উল্টো-মানুষ?

তা না বুঝলে সে বড্ড বোকা। স্নায়ুতরঙ্গের ভাষায় ওজরাকের উদ্দেশে বললুম, বন্ধু! জয়ন্তের ঘিলুতে অন্তত এক চামচ কসমিক ইনটেলিজেন্স মিশিয়ে দিও। সে বরাবর বড্ড বোকা।...

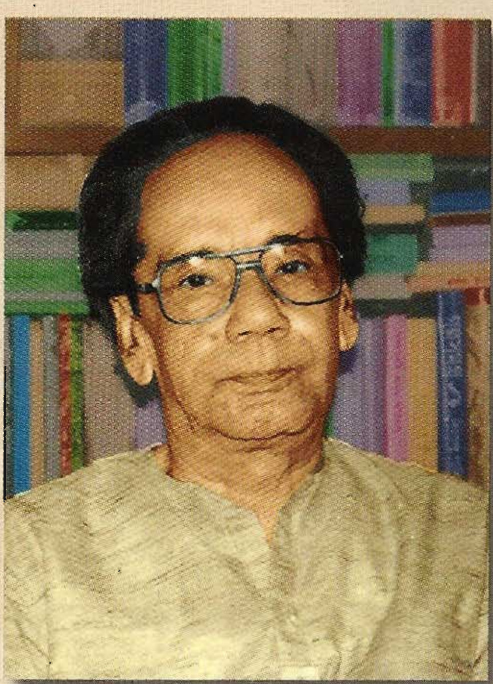

রহস্য কাহিনির নায়ক হিসেবে কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বাংলা সাহিত্যে এক অনবদ্য সৃষ্টি। বয়সে তিনি বৃদ্ধ কিন্তু শরীরে যুবকের শক্তি। নেশা প্রজাপতি-পাখি-ক্যাকটাস-অর্কিড। বাতিক অপরাধ রহস্যের পিছনে ছুটে বেড়ানো। গত প্রায় আড়াই দশক ধরে লেখা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোটদের জন্য কর্নেলের অজস্র রহস্য গল্প ও উপন্যাস ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল নানা জায়গায়। এবার সেগুলি এক মলাটের মধ্যে এনে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের এই প্রয়াস।